গজেন্দ্রকুমার মিত্র
রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

বহ্নিবন্যা

॥ ১ ॥

১২৬৩ সনের অগ্রহায়ণ মাস। দুটি বাঙালী ব্রাহ্মণ হাঁটা-পথে মীরাট যাচ্ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠের নাম মৃত্যুঞ্জয়, কনিষ্ঠটি তাঁর ভাগ্নে—নাম হীরালাল। মৃত্যুঞ্জয়ের বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, হীরালাল সতেরো পার হয়ে আঠারোয় পা দিয়েছে—তরুণ বালক মাত্র।

আমরা যে দিনের কথা বলছি সে দিনটা হীরালালের সুপ্রভাত হয় নি। ভোর হতেই মামা বকাবকি ও গালাগালি শুরু করেছেন। আর এখনও, এই বেলা প্রথম প্রহর পার হবার মুখেও, তা বন্ধ হয় নি। মামার রাগের কারণ মুখ্যত এই যে, তিনি বহুদিন পশ্চিমে চাকরি করছেন, এখানকার শীত সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, তিনি চেয়েছিলেন একটি 'রেজাই' আনতে (পশ্চিমে লেপকে রেজাই বলে), এই অর্বাচীন ভাগ্নেটি তা আনতে দেয় নি। তরুণ ভাগ্নে থাকতে মামা আর কিছু মাল বইবেন না, তাকেই সেই বোঝাটি বইতে হবে—বোধ করি এইটে বুঝেই সে প্রবল আপত্তি তুলেছিল। বলেছিল, 'এই তো সবে শীতের শুরু—এখন কাঁথাতেই বেশ ভাল চলে যাবে। আর ক'টা দিনই বা, রানীগঞ্জ পর্যন্ত যখন রেলগাড়িতে যাচ্ছি তখন আর ভাবনা কি, বাকী পথ তো শুনেছি পনেরো দিনে মেরে দেওয়া যায়।'

কিন্তু বাংলাদেশে শীতের শুরু হলেও, পশ্চিমে এর মধ্যেই জাঁকিয়ে শীত পড়েছে, জলে এমন কামড় লাগছে যে সকালে সেদিকে ঘেঁষা দুষ্কর। সূর্যোদয়ের পরও স্নান করে সন্ধ্যা করতে বসলে আঙুল বেঁকে যায়। ফলে ক'দিন শীতে ঘুম হচ্ছে না ভাল করে। গতকাল যে চটিতে ছিলেন সেখানে চটিওয়ালা দয়া করে দুখানা কম্বল দিয়েছিল, কিন্তু তাতে হিতে বিপরীতই হয়েছে। কম্বল দুখানি পিশুতে বোঝাই ছিল—ঘুম তো হয়ই নি—সারারাত বসে দুজনে গা চুলকেছেন। আরও আশঙ্কা, তাঁদের কাঁথাতে বা পিরানেও বোধ করি দু-চার শ চালান হয়ে গেল। সেই ভয়ে ব্রাহ্মণ ভোরবেলা উঠেই কাঁথাগুলো নিজে হাতে করে রোদে মেলে দিয়েছেন ; তবে তাতেই যে পিশু মরবে, সে আশ্বাস খুব নেই মনে মনে ; এখনও কত দিনরাত জেগে কাটাতে হবে তার ঠিক কি! পথ পনেরো দিনে না হোক, এক মাসেই শেষ করা যেত—কিন্তু দলছাড়া হয়ে পথ চলা নিরাপদ নয়। তাঁরা যে দলের সঙ্গে যাচ্ছেন, সে দলে তিন-চারটি বৃদ্ধ এবং একটি সদ্যঃপ্রসূতা নারী আছে। তাদের গোরুর গাড়িতে চাপানো হয়েছে। ফলে দৈনিক দু বেলা মিলিয়েও সাত-আট ক্রোশের বেশি হাঁটা যাচ্ছে না।

এগুলো মুখ্য কারণ।

বিরক্তির কতকগুলো গৌণ কারণও আছে।

এবার তাঁর স্ত্রীর সুপারিশ ছিল ছোট শালাটির জন্য। কিন্তু বিধবা বোন কান্নাকাটি করায় তাকে আনতে পারেন নি। আসবার সময় স্ত্রীর অপ্রসন্ন মুখ দেখে আসতে হয়েছে। আগেকার দিন হলে দুজনকেই আনা চলত, কিন্তু সে-সব দিন আজকাল আর নেই। সাহেব স্পষ্টই বলে দিয়েছেন, 'তোমরা এক-এক বার দেশে গিয়ে যদি তিন-চারটে করে বেকার ছোকরা ধরে আন তো আমি নাচার।

অত চাকরি আমার কাছে নেই। তা হলে কিন্তু সেপাইএর চাকরি নিতে হবে। একটি করে এনো—চেষ্টা করব। Remember, one at a time.'

কমিসারিয়েটের চাকরি—মেজর সাহেবের সুপারিশ ছাড়া হবার জো নেই। আর সাহেবও এক কথার মানুষ। সুতরাং শ্যালাকে আনতে ভরসা হয় নি। তার এখন ষোল বছর বয়স। এধারে ভাগ্নে আঠারোয় পড়েছে। বোন সেই যুক্তিতেই জিতে গেছেন, 'সতেরো পার হল দাদা, এখনও যদি উপায় করতে না পারে তো কবে করবে? নীলাম্বরের তো যেটের এই ষোল সবে—দুবছর পরেই নিয়ে যেয়ো না! চাই কি, ওর এখেনে, কলকাতাতেও একটা উপায় হয়ে যেতে পারে। ওর তো মাথার ওপর বাপ আছেন, তোমার ভাগ্নের কে আছে বল?'

অকাট্য যুক্তি। তবু মনটা ঠিক খুশী হয় নি। বোনের সঙ্গে ঘর করতে হয় না, স্ত্রী গৃহিণী, তাঁর হাতেই সব। এর শোধ তুলতে তাঁর এত কষ্টের পয়সা কতগুলি যে পিত্রালয়ে চালান করবে, তার ঠিক কি? মৃত্যুঞ্জয়ের আশঙ্কা সেইখানেই।

এছাড়াও বিরক্তির কারণ আছে।

টানা রেলগাড়ি চলছে আজকাল রানীগঞ্জ পর্যন্ত, তাতে চড়লে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া চলত। তাতেও বাদ সাধলেন স্ত্রী। উড়ুনির প্রান্ত চেপে ধরে মাথার দিব্যি দিলেন, 'রেলগাড়িতে আর বাঙালীর যাবার জো নেই; আমি মেসোমশায়ের কাছে শুনেছি। গোরারা নাকি বড্ড মার-ধোর করে। ধরে নিয়ে গিয়ে খিষ্টান করে দেয়। তুমি আমায় বাক্যি দিয়ে যাও যে—হাঁটা-পথে যাবে। নয়তো সোজা নৌকোয় যাও।'

'হ্যাঁ—তা যাবে না! আমার বাবার জমিদারি আছে কিনা! নৌকোয় যাবে! তা ছাড়া নৌকোয় আজকাল হামেশা ডাকাত পড়ছে।'

'বেশ, তা হলে হাঁটা-পথে যাও। না না—আমায় বাক্যি দিয়ে যাও, নইলে আমার মাথা খাবে, মরা মুখ দেখবে!'

অগত্যা 'বাক্যি' দিতে হয়েছে। কিন্তু দোষ যারই হোক, সে ঝালটাও বেচারা হীরালালের ওপর পড়েছে।

সকাল থেকেই চলছে গজগজানি, 'তোমার বাপু যত বিপরীত কাণ্ড, বুঝেছ? তোমার বয়সে আমরা স্বরূপগঞ্জের হাট থেকে দু-মণ চালের বস্তা মাথায় করে এনেছি। এত বড় সাজোয়ান ছেলে, বললুম যে একখানা রেজাই নিয়ে যাই, তা নয়। বলে, ভারী হবে, কটা দিনই বা, কাঁথা নিয়ে চলুন!—না-হয় আমিই বইতুম রে বাপু। এখন কাঁথায় শীত মানছে? তাই দে না হয় তোর কাঁথাখানাও—কেমন বয়েসের জোর দেখি। থাক্ গে খালি গায়ে।... তাও তো দেখি তোমার শীত আমার চেয়ে বেশি। চান করতে নামবে এক-প'র বেলায়—তাও হি-হি কর! বলি মায়ের দুধ খেয়েছিলে, না খাও নি?'

স্নান-আহ্নিক সব কিছুর ফাঁকে ফাঁকেই চলছে আক্রমণ। হীরালালের সুগৌর মুখ ক্ষণে ক্ষণেই রক্তবর্ণ ধারণ করছে। বিধবা মায়ের ছেলে, এতখানি বয়স পর্যন্ত খেলাধুলো করে বেড়িয়েছে, কখনও মার কাছে বকুনি খায় নি। বার বার তাই তার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কিন্তু এখানে অভিমানের কোন মূল্য নেই বলেই সে প্রাণপণে সেই উদ্গত অশ্রু দমন করতে লাগল।

সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করে, পশ্চিমের তোফা সোনালী রঙের মুঠি-গুড় দুই

ডেলা গালে ফেলে, মৃত্যুঞ্জয় একঘটি গঙ্গার জল প্রাণপণে দাঁত বাঁচাতে বাঁচাতে, 'উঃ আঃ' শব্দ করে গলায় ঢেলে দিলেন, তার পর অকস্মাৎ হীরালালের ওপর আর এক দফা ঝেঁজে উঠলেন, 'বলি নবাব-পুত্তুরের মত বসে থাকলেই চলবে? কাঠ-কুটো আনতে হবে না? উনুন ধরাতে হবে না? না তাও আমাকেই করতে হবে? তোমাকে সঙ্গে আনাই দেখছি আমার ঝকমারি হয়েছে। চাল-ডাল চেয়ে এনেছ দোকানীর কাছ থেকে? বাসনগুলোয় একবার গঙ্গামৃত্তিকে বুলিয়ে নিয়েছ?'

হীরালাল নিঃশব্দে চাল-ডালের পুঁটুলিটা মামার সামনে রেখে উনুন ধরাতে বসল। মামার আগে সে স্নান ও সন্ধ্যা-গায়ত্রী শেষ করেছে। বটগাছের ছায়ায় রান্নার জায়গা বেছে নিয়ে জল-হাত দিয়ে লেপেও রেখেছে। উনুন অর্থে এখানে তিনটি নুড়ি-পাথর। তাই সাজিয়ে সে কাঠ ধরাতে বসল। দোকানী ঘুঁটের ওপর কিছু আংরা দিয়েছে, তাতেই প্রাণপণে ফুঁ দিতে দিতে তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল।

মামা কিন্তু তখনও থামেন নি, 'বলি পাথর তিনটে ধুয়েছিলে বাপু—না কি? কে-না-কে হয়তো রেঁধে ফেলে রেখে গেছে—সাত্তিক জাতের সক্‌ড়ি খাব নাকি শেষ পর্যন্ত?'

'পাথর তিনটে যে চান করার আগেই গঙ্গা থেকে ধুয়ে এনে রাখলুম মামা।'

'কে জানে বাপু, তোমাদের কি সে আক্কেল আছে! আক্কেল থাকলে আর এমন কাণ্ড হয়! লোকে কথায় বলে—এক ব্যান্নন নুনে পোড়া! একখানা কাঁথা ভরসা, তাও গেল পিশুতে বোঝাই হয়ে। পিশু কি আর রোদে মরে। এখনও এত পথ বাকি—এখন থেকে রাতের বেলা ধুনি জেলে সারারাত বসে কাটাও আর কি! ঘুম আর হচ্ছে না—সে দফা গয়া!'

অতি কষ্টে কাঠ ধরল। মৃত্যুঞ্জয় গজগজ করতে করতে রান্না চাপালেন। কিন্তু ডাল নামিয়ে সেই হাঁড়িতেই ভাত চাপাতে গিয়ে আর এক বিভ্রাট বেধে গেল। জলের ঘটি থেকে আলগোছে জল ঢালতে গিয়ে ঘটিটা গেল হাঁড়িতে ঠেকে।

'এই নাও, ঘটিটা গেল আবার সক্‌ড়ি হয়ে!...যাও দিকি বাপু, চট করে ঘটিটা মেজে আর একঘটি জল নিয়ে এস দিকি। নাও নাও,—হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না হাঁদার মত, শরীরটা একটু নাড়ো।'

রান্না এখনও চলছে, শেষ পর্যন্ত ঘটিটা মেজেই ঝুলিতে পোরা হবে, সুতরাং এখন ঘটিটা সক্‌ড়ি হয়ে গেলে এমনই বা কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে হীরালাল তা বুঝতে পারল না, তবে মামার হুঙ্কারটা বুঝল। সে দিশেহারা হয়ে ছুটল গঙ্গার দিকে মামার অসাবধানতার প্রায়শ্চিত্ত করতে। কিন্তু আগেই বলেছি যে দিনটা তার সুপ্রভাত হয় নি। সেখানে আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। বাঁধা ঘাট নয়, শক্ত এঁটেল মাটির উঁচু-নীচু পাড়। তারই ওপর একটা উঁচু জায়গা থেকে হাত বাড়িয়ে ধুতে গিয়ে ঘটিটা হাত ফসকে নদীতে পড়ে গেল এবং দেখতে দেখতে অনেকখানি জলের ভেতর গিয়ে পড়ল। শীতকালের কাক-চক্ষু জল—তার মধ্যে বহুবার-মাজা ঘটিটা দেখতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। ঘটিটা এত দূরেই গিয়ে পড়েছে যে, এক-কোমর জলে না নামলে আর উদ্ধারের আশা নেই।

এক মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করল সে। গিয়ে কাপড়টা ছেড়ে শুকনো গামছা পরে আসাই উচিত, কিন্তু সেই অত্যল্পকালের মধ্যেই অসহিষ্ণু মামার উগ্রমূর্তি চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল। সে আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে কোমরে উড়ুনি বাঁধা অবস্থাতেই জলে নেমে পড়ল। কাপড় এবং উত্তরীয় দুটোই ভেজানোর যে

কোন প্রয়োজন নেই—একথা ভাববারও সময় পেল না।

অদৃষ্ট মন্দ হলে বিভ্রাট বেড়েই যায়। এ'টেল মাটির ঘাট, যেখানে সকলে স্নান করে সেখানে তবু খানকতক ই'ট বিছানো আছে—তাড়াতাড়ি হবে বলে হীরালাল সেদিকে যায় নি, সামনেই এক জায়গায় নেমে পড়েছিল! ফলে পা পিছলে অকস্মাৎ গভীর জলে গিয়ে পড়ল। একে সে সাঁতার জানত না, কলকাতার ছেলে, সাঁতার শেখার সুবিধে হয় নি, তার ওপর তখনকার পশ্চিমের গঙ্গা এখনকার মত ছিল না, তখন বড় বড় জাহাজ চলত। দেখতে দেখতে হীরালাল ডুবজলে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে খরস্রোতে ভেসে চলল।

॥ ২ ॥

তখনকার দিনে 'রইস' বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নৌকোয় যাতায়াতই পছন্দ করতেন। তাই নদীর বুকে হামেশাই নানা ধরনের বজরা নৌকো ঘোরাফেরা করত। অদৃষ্টক্রমে হীরালাল যেখান দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল, তার কাছেই একটা বজরা অনেকক্ষণ থেকে অলস মন্থরভাবে ভাসছিল। ভাবগতিক দেখে অনায়াসেই অনুমান করা চলে যে, তার এখান থেকে যাবারও ইচ্ছে নেই—আবার কূলে ভিড়তেও আপত্তি আছে। মাঝি ঠিক নোঙর করে নি, কিন্তু হাল ধরে বসে নৌকোটা যতদূর সম্ভব এক জায়গাতেই রাখার চেষ্টা করছিল। কোন ধনী লোকের বজরা হবে, কারণ জানলায় ভেলভেটের পর্দা লাগানো; সমস্ত বজরাটিতে গালার রং, দরজা-জানলার মাথায় হাতির দাঁতের কাজ-করা। দাঁড়ি-মাঝিদেরও বেশভূষা সাধারণ মাঝিদের থেকে একটু ভিন্ন ধরনের—কিছু মূল্যবান।

হীরালাল এ বজরা লক্ষ্য করে নি, করবার কথাও নয়। কারণ এমন বজরা নিত্য কত যাওয়া-আসা করে গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে, এ ক'দিন দেখে দেখে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু নৌকোর মালিক বা আরোহী তাকে লক্ষ্য করেছিলেন। কারণ তিনি বহুক্ষণ থেকে পর্দার ফাঁকে দূরবীন লাগিয়ে বসে আছেন এবং নদী-তীরের নরনারীদের লক্ষ্য করছেন। অলস কৌতূহলে, হীরালাল যখন থেকে ঘটি হাতে নদীতে নেমেছে, তখন থেকে তাকেও লক্ষ্য করেছেন। তার অগাধ জলে পড়ে যাওয়াও তাঁর চোখ এড়ায় নি, কিন্তু তিনি গোলমাল বা চেঁচামেচি করেন নি। তাঁর অব্যর্থ সন্ধানী দৃষ্টিতে তিনি চকিতের ভেতর দেখে নিয়েছেন যে, স্রোতের যে গতি তাতে ছেলেটি অবিলম্বে নৌকোর পাশ দিয়েই ভেসে যাবে।

আরোহী ঠিক নয়—আরোহিণী। কারণ দূরবীন হাতে যে বসে ছিল সে স্ত্রীলোক।

স্ত্রীলোক—তবে ঠিক সাধারণ স্ত্রীলোকের মত নয়। বুদ্ধি বা তৎপরতা কোনটারই যে তার বিন্দুমাত্র অভাব নেই, সেটা তার পরবর্তী আচরণেই ধরা পড়ল।

সে কাউকে ডাকল না, মুহূর্তমাত্র ইতস্ততও করল না। চোখের নিমেষে গায়ের ওড়নাটা ফেলে দিয়ে জানলা দিয়েই জলে লাফিয়ে পড়ল এবং এক হাতে জানলার চৌকাঠটা ধরে আর এক হাত বাড়িয়ে মজ্জমান হীরালালের কোমরে-বাঁধা উড়ুনিটা ধরে টেনে আনল।

ইতিমধ্যে তার জলে পড়ার শব্দে মাঝি-মাল্লারা ছুটে এসেছে। তারাই এবার হীরালালকে টেনে তুলল। স্ত্রীলোকটি কিন্তু কারও সাহায্যের অপেক্ষা করল না, অবলীলাক্রমে অত্যন্ত লঘুসঞ্চারে নিজেই লাফিয়ে ওপরে উঠে পড়ল। তার মুখ আগের মতই প্রশান্ত, ভাবলেশহীন। যেন এমন একটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটে নি। শুধু ভাল করে লক্ষ্য করলে তার বঙ্কিম ওষ্ঠাধরের প্রান্তে সামান্য একটুখানি সাফল্যের হাসি চোখে পড়তে পারত।

হীরালাল এর মধ্যেই বেশ খানিকটা জল খেয়ে ফেলেছিল। তবে মাঝি-মাল্লারা এসব ব্যাপার ভাল বোঝে, তাদের চেষ্টায় শীগ্‌গিরই সে খানিকটা জল বমি করে ফেলে সুস্থ হল এবং খানিক পরে তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

আরও একটু পরে সে চোখ মেলে তাকাল। ততক্ষণে তাকে একটা শুকনো কাপড়ে জড়িয়ে গালচের ওপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। সে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে একটু একটু করে চারদিকে চেয়ে দেখল। দেখল, সে একটি বজরার ভেতরে শুয়ে আছে। চারিদিকে দামী আসবাবপত্র, ভাল ভাল ছবি, ফুলদানিতে ফুল। আর—আর তার সামনে একটি সুন্দরী তরুণী। তার পরনে পশ্চিমী পোশাক, মাথার ওপর হাল্কা রেশমের উত্তরীয়। সবটা জড়িয়ে স্বপ্নের মতই মনে হল তার।

কিন্তু সে মোহ রইল অল্পক্ষণই—হীরালাল তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

এবার তরুণীটি কথা বলল। হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রশ্ন করল, 'তুমি কে? কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাবে? জলে পড়লে কি করে? আমি না থাকলে যে মারা পড়তে!'

কাছেই মাঝি দাঁড়িয়েছিল, সে এবার হাত-পা নেড়ে হীরালালকে বুঝিয়ে দিল, 'মালেকান্ নিজে জলে নেমে তোমাকে টেনে তুলেছেন—তা জান? আমরা কেউ আগে দেখতেও পাই নি।'

হীরালাল বাল্যকালে মুনশীর কাছে কিছু কিছু ফার্সী পড়েছিল। তা ছাড়া এই ক'দিনে পথে শুনে শুনে কিছু হিন্দীও শিখেছে। সে কোনমতে তার সঙ্গে কিছু বাংলা মিশিয়ে সংক্ষেপে নিজের ইতিহাস বিবৃত করল।

শুনে তরুণীটির মুখ ক্ষণেকের জন্য যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল, 'ও, তুমি কমিসারিয়েটে কাজ করবে—সে তো ভাল কথা!'

'কাজ পাব কিনা জানি না, কাজের জন্যে যাচ্ছি।'

'ঠিক পাবে। নিশ্চিত আশা না থাকলে কি আর তোমার মামা নিয়ে যাচ্ছেন!'

হীরালাল এবার একটু জল চাইল।

স্ত্রীলোকটি ইতস্তত করে বলল, 'তোমাকে এখানে জল খেতে দেব না। তোমার গলায় তো পৈতে দেখছি—নিশ্চয়ই হিন্দু। আমি মুসলমান।'

হীরালাল বেশ গুছিয়ে জবাব দিল, 'আমি ব্রাহ্মণ। কিন্তু তা হোক, আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন। আমার কাছে আপনি প্রণম্য।'

'সে কথা থাক্। চল তোমাকে পাড়ে নামিয়ে দিই গে। তোমার মামা বোধ হয় এতক্ষণে তোমার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। ওখানে নেমে জল খেয়ো।'

তরুণীর ইঙ্গিতে বজরা এবার তীরের দিকে ফিরল।

হীরালাল বলল, 'আপনার কাছে চির-ঋণী রইলাম।'

তরুণী হেসে বলল, 'ঋণ রাখতে আমি দেব না। দেখো, একদিন কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করিয়ে নেব।'

হীরালাল জোর দিয়ে বলল, 'সে তো আমার পক্ষে সৌভাগ্য !'

'দেখা যাক্, যখন পাওনাদার দোরে গিয়ে দাঁড়াবে তখনও সৌভাগ্য ভাব কিনা !'

বজরা তীরের কাছাকাছি গিয়ে থামল। ঘাট নেই—তাই ঘাটে লাগতে পারল না। মাঝি নামবার সুবিধের জন্যে একখানা লম্বা তক্তা ফেলে দিল।

সত্যিই মৃত্যুঞ্জয় এর ভেতর কেঁদে-কেটে মাথা খুঁড়ে হাট বসিয়ে দিয়েছেন। জলের ধার থেকে অনেক দূরে নিরাপদে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছেন, 'ওরে, তার যে একটা ছেলে রে, আমি তাকে গিয়ে কী জবাব দেব রে ! ওরে, ছোঁড়া কি অক্ষণে আমার সঙ্গে বেরিয়েছিল রে ! ওরে, ওকে এনে এস্তক আমি যে জেরবার হয়ে গেলুম রে ! কোথা থেকে এমন শত্রু সঙ্গে এল রে !'

দু-চার জন জলেও খানিকটা করে নেমেছে। কিন্তু হীরালাল ঠিক কোন্-খানে ডুবেছে—ডুবেছে কি ভেসে গেছে—কিছুই কেউ জানে না। তাই, ঠিক কী করতে হবে তাও কেউ বুঝতে পারছে না। শুধু খানিকটা হৈ-চৈ করছে মাত্র।

জানলার পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে একবার দেখেই তরুণী ব্যাপারটা বুঝে নিল। একটু হেসে বলল, 'তাড়াতাড়ি যাও, ওঁরা বড় কাতর হয়েছেন।'

হীরালাল একটু ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু আপনার নাম-ঠিকানা কিছুই যে জানা হল না।'

'কিছু দরকার নেই। সময় হলে আমিই যাব তোমার কাছে। শুধু নামটা জেনে রাখ—আমিনা। তবে লোকে আমাকে ডাকে হুসেনী বিবি বলে।'

ব্রাহ্মণ হয়ে মুসলমানের মেয়েকে নমস্কার করা হয়তো ঠিক হবে না, আশীর্বাদ করারও বয়স হয় নি, বিদায় সম্ভাষণটা কিভাবে জানানো উচিত ঠিক করতে না পেরে হীরালাল খানিকটা বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে এমনিই বেরিয়ে এল।

মামা প্রথমটা তাকে দেখেই আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন। খানিকটা গালিগালাজ করলেন, আশীর্বাদও করলেন কিছু কিছু। তার পর সংক্ষেপে সব ইতিহাস শুনে নিজে আর একবার স্নান করলেন, হীরালালকেও করালেন। আবার নতুন করে রান্নার যোগাড় হল, কারণ সে ভাতে কাকে মুখ দিয়েছে। আবার শুরু হল বকাবকি—গজগজ করা। এবার বরং কিছু বেশিই—কারণ বাড়তি হিসেবে ঘটিটার শোকও যোগ হয়েছে।

গোলমালে ঘটিটার কথা কারও মনে ছিল না, তা ছাড়া সম্ভবত লোকের পায়ে-পায়ে সেটা আরও দূরে গিয়ে পড়েছিল। এখন অনেক চেষ্টা করেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

॥ ৩ ॥

এখনকার কানপুর শহর, বিশেষত এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের কানপুর দেখে কেউ এক শ বছর আগেকার কানপুর কল্পনা করতে পারবেন না। তখন শহরের মধ্যে এখানে ওখানে অনেক ফাঁকা মাঠ ও পুষ্করিণী ছিল সত্যি, কিন্তু যেখানে বসতি ছিল সেখানে একেবারে ঘিঞ্জি, ঘেঁষাঘেঁষি ঘরবাড়ি, গায়ে গায়ে লাগানো। পথ নিতান্তই সংকীর্ণ, ডুলি বা পালকি ছাড়া কিছুই যাবার উপায় ছিল না ; এক্কা চলত বটে, তাও সে নিতান্তই গায়ের জোরে। চওড়া রাস্তা তৈরী করে জমি অপব্যয় করার কোন অর্থ সেকালের লোক বুঝত না—

একালের বড় বড় মোটরগাড়ি, বাস্ বা লরী যাতায়াতের কথা তখন কেউ কল্পনা করে নি। তা ছাড়া, বহুলোক কাছাকাছি বাস করার একটা নিরাপত্তাও ছিল। অরাজকতা তখন চারিদিকেই,—রাহাজানি ও ডাকাতি তো ছিল প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক। এখনও এই কারণেই, গ্রামাঞ্চলে চারিদিকে অজস্র ফাঁকা জমি পড়ে থাকা সত্ত্বেও, মানুষ বাস করে একেবারে গায়ে গায়ে ঘর বেঁধে, ফলে মহামারী বাধলে গাঁ উজাড় হতে দেরি লাগে না।

কিন্তু আমরা বলছিলাম কানপুরের কথা।

সেই ঘিঞ্জি কানপুরের আরও ঘিঞ্জি পাড়া হল উকিল-মহল্লা। সংকীর্ণ পাথর-বাঁধানো রাস্তা, তার দু দিকে দোতলা তিনতলা বাড়ি। একটির কার্নিস এসে লেগেছে আর একটির কার্নিসে। সেজন্যে দিনের বেলাও নীচের দিকে সূর্যালোক প্রবেশ করে না। একতলার ঘরে চিরাগ না জ্বাললে, আর যাই হোক, লেখাপড়ার কাজ চলে না। পথের দু ধারে বিপণিশ্রেণীর অভাব নেই—দুধ-দই-পেঁড়া থেকে শুরু করে চাল-ডাল-তেল-ঘি এবং তামাক-হুঁকা-টিকিয়ার অসংখ্য দোকান চারদিকে। ছোট ছোট দোকানই বেশি—সূর্যোদয় থেকে রাত-দুপুর পর্যন্ত দোকান সাজিয়ে বসে থাকে খদ্দেরের আশায় এবং সেই কারণেই রাস্তাটা কিছু আলোকিত থাকে। কারণ এইসব দোকানেই দিনরাত একটা করে অর্ধ-মশাল জ্বলতে থাকে। দোকানের সামনেই পাস্তুয়া বা পাশবালিশ যা-ই বলুন—ঐ আকারের একটা গোলাকার ধাতু-পাত্র ঝোলে। তার গায়ে বদনার মত নল লাগানো। সেই নলে থাকে একগোছা ছেঁড়া নেকড়া—সলতের মত, ঐ পাত্রে থাকে রেড়ি বা 'কড়ুয়া'র তেল। সলতের গোছা সেই তেলের জোরে মশালের মত জ্বলে। তাতে আলো যত না হোক—ধোঁয়া হয় প্রচুর। সে ধোঁয়া, পথটুকু তো বটেই, অধিকাংশ সময় দোতলা অবধি দু ধারের বাড়িগুলোকে ঝাপসা আচ্ছন্ন করে রাখে। শীতকালে ভাল করে চোখ মেলে তাকানোই যায় না।

এই উকিল-মহল্লারই এক প্রান্তে মুনশী নানকচাঁদের বাড়ি। সাধারণ দোতলা বাড়ি, বিশেষত্বের মধ্যে নীচের তলায় প্রবেশের কোন সদর দরজা নেই। দু দিকে দুখানি হিসেবে দোকানঘর, আর তারই মধ্যে দিয়ে সোজা খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে একেবারে দোতলা পর্যন্ত। ডানদিকে দেওয়ালের গা বেয়ে একগাছা মোটা দড়ি টাঙানো না থাকলে সে সিঁড়িতে ওঠানামা করাই কষ্টসাধ্য হত।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একটি পাথরের নীচু ফালি-বারান্দা। সেই বারান্দার চারদিকে কয়েকটি আধা-অন্ধকার ঘর। এগুলি হল মুনশী সাহেবের দপ্তরখানা। একটিতে তাঁর মোহরার বসে; একটিতে কাগজপত্র থাকে—আলকাতরা মাখানো সারি সারি টিনের বাক্সয়। পথের দু দিকে যে দুটি ঘর,—সিঁড়ির ঠিক দু পাশে—তার একটি হল স্বয়ং নানকচাঁদের গদি বা অফিস ঘর, আর একটি তাঁর বৈঠকখানা। সেখানে একজনের মত একটু শোবার ব্যবস্থাও আছে।

এই বারান্দারই অপর প্রান্তে অন্দরমহলে যাবার রাস্তা। সেখানে পৌঁছলে নীচে নামবার একটা সিঁড়ি মেলে। আর সেখান দিয়েই আছে আর একটি পথ—সে পথে পিছনের একটা অব্যবহার্য পরিত্যক্ত খাপরার বাড়িতে যাওয়া যায়। এই বাড়িটা সদাসর্বদাই চাবি-দেওয়া পড়ে থাকে। এটুকুও নানকচাঁদের সম্পত্তি। এটি তিনি নাকি এক আতরওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে রেখেছেন। সে তার ফুঁকো কাচের শিশি আর তেল রাখবার পাতলা চামড়ার 'কুপি' রাখে ওই ঘরগুলোতে। কিন্তু আসলে এটি পিছনের সংকীর্ণতর গলিপথে বের হবার

একটি গোপন রাস্তা।

নানকচাঁদের বৃত্তি কি তা এক কথায় বলা শক্ত। নানারকম ব্যবসা আছে—কিছু প্রকাশ্য, কিছু গোপনীয়। এ ছাড়া মামলা-মোকদ্দমার তদবিরেও তাঁর অসাধারণ খ্যাতি, তাতেই তাঁর সব চেয়ে মোটা আয়। এক শ্রেণীর মানুষ আছে—আদালতে ঘুরেই যাদের সুখ। নানকচাঁদও সেই শ্রেণীর। তবে অবশ্য নানকচাঁদ এ থেকে একটা মোটা আয়ও করে থাকেন। সেজন্যে অনেকে তাঁকে উকিল সাহেব বলেই জানে।

নানকচাঁদের কিছু সম্ভ্রান্ত মহিলা-মক্কেল ছিল—তাদেরই জন্য পেছনের এই গলিপথটি ব্যবহৃত হত। অনেক সময় তাঁদের জনসাধারণের দৃষ্টি বাঁচিয়ে আসার প্রয়োজন হত। পূর্বাহ্নে সংবাদ দিলে নানকচাঁদ এই বাড়ির দরজা খোলা রাখবার ব্যবস্থা করতেন। মক্কেলরা সংকেত করলেই একটি প্রায় মূক দাসী নিঃশব্দে কপাট খুলে ডিব্বার আলোতে পথ দেখিয়ে উপরে নিয়ে আসত—আবার কাজ মিটলে তেমনি সেই পরিত্যক্ত হানাবাড়ির ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে পথে তুলে দিত। ঐ পেছনের রাস্তা দিয়ে সাধারণত যারা যাতায়াত করত, তারা এই ভাঙাচোরা খাপরার বাড়িটার সঙ্গে নানকচাঁদের প্রাসাদোপম তিনমহলা বাড়িটার যোগাযোগ কল্পনা পর্যন্ত করতে পারত না।

নানকচাঁদের দোতলার বৈঠকখানা ঘরে পৌষমাসের মাঝামাঝি এক সন্ধ্যাবেলায় কয়েকজন লোক একত্র হয়েছিলেন। মাঝারি আকারের ঘর, তার একপ্রান্তে একটা খাটিয়া। খাটিয়াতে একটি শয্যা গোটানো আছে। প্রয়োজনমত নানকচাঁদ সেটি ব্যবহার করেন। ফাঁকা মেজের সবটাই জুড়ে ফরাস পাতা। সাধারণ 'দরি' বা শতরঞ্চির ওপর দামী জাজিম পাতা—আর তার ওপর গোটাকতক তাকিয়া ফেলা। একদিকে দেয়াল-ঘেঁষে একটি ছোট কাঠের বাক্স, তাতেই বোধ করি নানকচাঁদের কাগজপত্র থাকে, আবার বাক্স বন্ধ করে তার ওপর কাগজ রেখে লেখাও চলে—অর্থাৎ বর্তমানকালে যাকে 'ডেকসো' (ডেস্ক) বলে তারই দেশী সংস্করণ। কারণ বাক্সর পাশেই আছে মাটির দোয়াতদান, গোটা দুই খাগের কলম, আর একটা বালির পাত্র। ঐ বালিই ব্লটিং কাগজের কাজ করে।

বাক্সর পাশেই একটি মাটির 'চিরাগ-দানে' একটি চিরাগ বা প্রদীপ জ্বলছে। দরকার হলে আর একটি আলোও জ্বালা যেতে পারে—ঘরের কোণে সে ব্যবস্থাও আছে। একটি পেতলের বাতিদানে দেশী মোমবাতি সাজানো আছে। সম্ভবত রাত্রে লেখাপড়ার দরকার হলে উকিলসাহেব সেটি জ্বালান।

আমরা যে বিশেষ সন্ধ্যাটির কথা বলছি, সেই সন্ধ্যাবেলায় যাঁরা নানকচাঁদের ঘরে জমায়েত হয়েছিলেন তাঁরা কেউই সাধারণ অর্থে মক্কেল নন। সাধারণ মক্কেলরা অবশ্য এ ঘরে বসেন না—তাঁদের জন্য গদিঘর আছে। বিশেষ মক্কেল এলেই এই ঘরটির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আজ বাক্স বন্ধ—কাগজপত্রের কোন চিহ্ন নেই। বাক্সর পেছনে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে নানকচাঁদ গুড়গুড়িতে তামাক টানছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর—বরং একটু চিন্তাকুল। তিনি ছাড়া ঘরে আছেন আর দুটি মহিলা। দুজনেই তরুণী এবং অত্যন্ত সুশ্রী। দুজনের মুখের গঠন এবং বেশভূষা দেখলে মোটামুটি এটা কল্পনা করতে বাধে না যে এঁরা দুজনে দুই বোন, এঁদের অবস্থা ভাল এবং এঁরা মুসলমান। এঁদের জন্যেও গুড়গুড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। সেকালে হিন্দুর বাড়িতে মুসলমানের জন্য এবং

মুসলমানের বাড়িতে হিন্দুর জন্য আলাদা গুড়গুড়ির ব্যবস্থা থাকত।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নানকচাঁদ ফরাসির মুখ থেকে নিজের মুখ সরিয়ে কথা বললেন, 'যার জন্যে তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি, অনেক আগেই তার আসা উচিত ছিল। এখনও কেন এসে পৌঁছল না তা জানি না। একটু ভাবনা হচ্ছে—কারণ সে বিলায়েত-ফেরত লোক, জবানের ঠিক রাখে।...তবে ভয় আর কি—কোথাও আটকে পড়েছে হয়তো। যাক্—আমিনা, তোমার কথা বল একটু —শুনি ততক্ষণ।'

আমিনা বিবি নিঃশব্দে তামাক টানছিল, সেও ফরাসির নল সরিয়ে বোনের হাতে দিয়ে বলল, 'লোকটি কে উকিলসাহেব? কী তার পরিচয়? আমি কি তাকে দেখি নি?'

নানকচাঁদ বললেন, 'পরিচয় সে দিতে বারণ করেছে। তা ছাড়া পরিচয় তার আমিও ঠিক জানি না। নামটা জানি। কিন্তু নামটা সে নিজেই বলবে। এটুকু শুধু বলতে পারি যে, সে লিখাপাঢ়ি জানা লোক—খানদানী ঘরের ছেলে। লিখাপাঢ়ি সে বহুত করেছে। সাহেবদের মত আংরেজি বলতে পারে। দু দফে সে বিলায়েত গিয়েছিল। একবার নেপালের জঙ্‌বাহাদুর রানার সঙ্গে আর একবার আজিমুল্লা খাঁর সঙ্গে মুনশী হয়ে। তোমাদের যা লক্ষ্য তারও তাই লক্ষ্য। কি করে সে খবর পেয়েছে যে নানাসাহেবের পেয়ারের হুসেনী বিবি এরই ভেতর সমস্ত ফৌজী ঘাঁটি, মায় বাংলা মুলুকের বারাকপুর, দমদম, কলকাত্তা পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। সঙ্গে এনেছে কলকাত্তা কিলার নক্‌শা। তাই সে আমাকে এসে ধরেছে যে, একবার হুসেনী বিবির সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দিতে হবে।'

আমিনার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। বলল, 'এ খবর কে আর দেবে—নিশ্চয়ই আপনি দিয়েছেন।'

এতখানি জিভ কেটে নানকচাঁদ বললেন, 'জয় রামজীকি! তা কখনও হতে পারে? কারুর কথা কারুর কাছে বললে, আজ কি আর নানকচাঁদকে করে খেতে হত বিবিসাহেব—না, তা হলে তোমরাই এমন করে বিশ্বাস করতে পারতে? সে ভয় নেই বিবি, তেমন বাপে আমার জন্ম দেয় নি। যা কান দিয়ে শুনব তা মুখ দিয়ে আর বেরুবে না—বোল্‌নেওয়ালার হুকুম না হলে। এ খবর সে-ই যোগাড় করেছে। এ-ও সে জানে যে, তোমার মেহেরবানি আছে এ বান্দার ওপর। তাই আমাকে এসে ধরেছে। অবিশ্যি—' এবার একটু গলাখাঁকারি দিয়ে নানকচাঁদ গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন—'অবিশ্যি তার জন্যে সে কিছু দিয়েছেও। জান তো বিবি আমার নিয়ম, কিছু নগদ হাতে না পেলে কোন পরোপকাব আমি করি না।'

আমিনা হেসে বলল, 'তা জানি। হ্যাঁ, আমারও একটু কাজ আছে।'

সে নিজের কামিজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একছড়া মুক্তোর মালা বার করে নানকচাঁদের সামনে ফেলে দিল। বলল, 'টাকা চাই। ইহুদী জহুরীর কাছ থেকে কিনেছিল নানাসাহেব। বিশ হাজার টাকা দাম এর।'

নানকচাঁদ চিরাগের আলোয় মালাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, 'জানি। কিনেছিলেন কিন্তু আদালা বেগমের জন্য। এ তো চোরাই মাল বিবি, বেশী দাম এর পাবে না। এ বেচা কঠিন।'

আমিনার চোখের কোলে বিদ্যুৎ খেলে গেল, 'যে কাজে নেমেছি মুনশীজী, সেখানে সত্য, ধর্ম, ইমান সব তুচ্ছ। টাকা চাই-ই আমার। কৃপণ নানাসাহেব

যা দেয় তাতে কুলোয় না। বিশেষত আলাদাই তার বেশী পেয়ারের। আজিজন বেচারী একা আর কত দেবে বলুন। এ মালা আমাকেই দেবার কথা—আলাদা জোর করে আদায় করেছে। তেমনি জব্দ করেছি ওকে, বেমালুম সরিয়েছি, সে টেরও পায় নি। সে কথা যাক—কাল সন্ধ্যের ভেতর আমায় দশ হাজার টাকা চাই উকিলসাহেব।'

উকিলসাহেব চিন্তিতমুখে আর একবার মালাটি বাতির আলোতে তুলে ধরলেন। তার পর বললেন, 'এখানকার জহুরীরা এ মালা দেখলেই চিনতে পারবে। শেষে কি বুড়োকালে মান খোয়াব?'

দ্বিতীয় তরুণীটি এতক্ষণ একমনে তামাক টানছিল, সে এবার মুখ খুলল, 'আপনার শতেকদুয়ার খোলা উকিলসাহেব। আর সেই জন্যই তো আপনার কাছে আসি। একে আপনি ঠিক চোরাই মালের কারবার বলে ভাবছেন কেন—এ তো দেশেরও কাজ।'

নানকচাঁদ মুখ তুলে তার দিকে চাইলেন। হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'তোমরা তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস কর বলেই তোমাদের এই আব্দারগুলো আমি মেনে চলি। নইলে পোদ্দারি করা আমার ব্যবসা নয়। অর্থলোভ আমার আছে, কিন্তু চোরা-গোপ্তা এসব কাজ করায় বড় ঝুঁকি আজিজন বিবি।...তবে এটাও আমি বলে রাখছি—এর আগেও বলেছি, তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আংরেজ সরকার তোমরা ভাঙতে পারবে না। আর তাতে দরকারও নেই। অনেকদিন পরে একটু শান্তির মুখ দেখেছি। আবার ঘুরে-ফিরে তোমার ঐ নানাসাহেবের খপ্পরে গিয়ে পড়লে দেশ বলতে আর কিছু থাকবে না। আবার মারাঠার নামসর্বস্ব পেশোয়াদের হাতে কিংবা মুঘল-বংশের ঐ কুলাঙ্গারদের হাতে দেশকে তুলে দিতে চাই না আমি। তবে তোমরা বিশ্বাস কর—তোমাদের কথা আলাদা।'

আমিনা প্রদীপের কম্পমান শিখাটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে নানকচাঁদের কথা শুনছিল, সে উত্তর দিল, 'এতদিন বলি নি, আজ বলে রাখছি বাবু নানকচাঁদ, ইংরেজ সরকার এদেশ থেকে অত সহজে যাবে তা আমিও বিশ্বাস করি না। যেত, যদি এই নানাসাহেব তাত্যা টোপীর দল মানুষ হত! যেমন ধুন্ধুপন্থ পেশোয়া, তেমনি তার মুনশী ঐ আজিমুল্লা! ঘেন্না করে উকিলসাহেব, ওদের দিকে চাইলে আমার ঘেন্না করে। আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি ইংরেজদের সঙ্গে মিশেছি, আমরা দুই বোনই ইংরেজি জানি। আমি জানি, ওদের তাড়ানো, কি দেশ শাসন করা, এই লম্পট, কামুক, বিলাসী, অকর্মণ্য লোকগুলোর কাজ নয়। ওদের হাতে দেশ পড়লে দেশ জাহান্নমে যাবে এ-ও জানি। কিন্তু, কিন্তু আমাদেরও উপায় নেই উকিলসাহেব।'

বলতে বলতে আমিনার কণ্ঠ যেন সাপের মতই হিস হিস করে উঠল, 'আমরা যে আগুন জ্বালতে চলেছি তাতে আমরাও পুড়ে মরব—তা জানি। তবু, তবু জ্বালতেই হবে। আর কোন কথা আমি জানি না—আমি শুধু জানি এ আগুন জ্বললে কতকগুলো ইংরেজ মরবে। সে-ই আমার পরম লাভ! পারলে আমি ওদের দেশটা সুদ্ধ মহাসাগরের জলে ডুবিয়ে দিতুম। কিন্তু তা সম্ভব নয়—এমন কি ওদের এদেশ থেকে তাড়ানোও সম্ভব নয়। তাই যেটুকু সম্ভব সেই-টুকুই করে যাব—যতদূর সম্ভব তাই করে যাব। ইংরেজ মারতে হবে—এই আমার ব্রত, এই আমার তপস্যা। নিজের হাতে, হ্যাঁ, নিজের হাতেও মারতে

পারতুম ! কিন্তু সে কটা মারব ! একটা, দুটো—নয়তো দশটা। তাতে আমার তৃষ্ণা মিটবে না বাবুজী। আমি চাই শ'এ শ'এ হাজারে হাজারে ইংরেজ মারতে। সেই পরিমাণ আগুন জ্বালাতে হবে। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জ্বালাব সে আগুন। তারই ইন্ধন খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

বোধ করি দম নেবার জন্যই থামল আমিনা, তার পর বলল, 'এরা রাজা হবে ! ঐ লোভী স্বার্থসর্বস্ব কামুক বাঁদরগুলো। আমি কি পাগল বাবুজী, যে তাই বিশ্বাস করব ! ওরাও ইন্ধন—কালে ওরাও পুড়বে। আমার তপস্যার, আমার মারণযজ্ঞের ফলাফল আমিই ভাল জানি নানকচাঁদজী—চোখ বুজলেই আমি তা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।...তবু, তবু থামতে আমি পারব না। টাকা আমার চাই-ই। তার জন্য চুরি-জোচ্চুরি কিছুতেই পিছপা হলে চলবে না।'

বলতে বলতে আমিনা বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। চোখে তার উম্মাদিনীর দৃষ্টি, সারা শরীর বংশী-বিমুগ্ধা সর্পিণীর মত দুলছে, নিশ্বাস দ্রুত হতে দ্রুততর হয়ে উঠেছে—সারা মুখে যেন কে আগুনের-রং লেপে দিয়েছে এমনি লাল—এই দারুণ শীতের রাতেও তার ললাট কণ্ঠ ঘামে ভরে গিয়েছে। তার সে মূর্তির দিকে চাইলে ভয় করে। নানকচাঁদও ভয় পেয়ে হাত দুই সরে বসলেন।

॥ ৪ ॥

পশ্চিমের বাড়িতে সেকালে জানলা বড় একটা থাকত না। এ ঘরেও ছিল না। থাকার মধ্যে গোটা-দুই দরজা—শীতের ভয়ে তাও বন্ধ ছিল। ফলে প্রদীপের ধোঁয়ায় তামাকের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস বেশ ভারী হয়ে উঠেছিল।

কতকটা সেই কারণেই—হয়তো আমিনার ললাটের স্বেদ-বিন্দু লক্ষ্য করেও নানকচাঁদ উঠে গিয়ে একটা দরজা খুলে দিলেন। একটু দাঁড়িয়ে কান পেতে কী যেন শোনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। শীতের ভয়ে অন্তঃপুরিকারাও যে যার ঘরে দরজা দিয়ে রেজাই-এর নীচে ঢুকেছেন। ভেতর দিকে একবার চেয়ে দেখলেন—সেখানে না দেখা যায় কোনও আলো, বা না পাওয়া যায় কোনও শব্দ। তখন আবার কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে নানকচাঁদ নিজের আসনে এসে বসলেন।

'একটু গরম দুধ খাবে আজিজন বিবি ?'

আজিজনের আগেই আমিনা উত্তর দিল, 'না না, কিছু দরকার নেই। আমি শান্ত হয়েছি, আপনি স্থির হয়ে বসুন।'

আমিনা আজিজনের হাত থেকে ফরাসিটা টেনে নিল।

নানকচাঁদও তাকে আর একটু শান্ত হবার অবকাশ দিলেন। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে তামাক টানবার পর প্রশ্ন করলেন, 'তার পর, কি রকম দেখে এলে, সব প্রস্তুত ?'

আমিনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'শুধু দেখতেই যাই নি উকিলসাহেব, প্রস্তুত করতেও গিয়েছিলুম। সে কাজ যতদূর সম্ভব সেরে এসেছি। সমস্ত উত্তর ভারতে যেখানে যত ব্যারাক আছে সব জায়গাতেই এ কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে ইংরেজরা তাদের ধর্ম নষ্ট করতে চায়, সবাইকে খ্রীষ্টান করবে এই ওদের ইচ্ছে। সুবিধেও বিহু হয়ে গেল বৈকি ! নতুন বন্দুক

এনেছে কোম্পানি—তার টোটা তৈরি হচ্ছে কলকাতার কিলায়। সে টোটায় জড়ানোর জন্যে একরকম তেলা-কাগজ আমদানি করেছে, সে-রকম কাগজ এর আগে দেখি নি কখনও।'

নানকচাঁদ সাগ্রহে বললেন, 'কি রকম তেলা—তুমি দেখেছ?'

আমিনা উত্তর দিল, 'দেখেছি বৈকি! শক্ত অথচ তেলা—এপিঠ-ওপিঠ দেখা যায়। এমনি পাতলা কাগজে তেল মাখালে যেমন দাঁড়ায় তেমনি, অথচ কোন তেল হাতে লাগে না।...আমাদের সুবিধে হয়ে গেল। আমরা রটিয়ে দিয়েছি যে, শুয়োরের চর্বি দিয়ে এই কাগজ তৈরী। শুয়োরের চর্বি না হলে এমন কখনও হতে পারে না। শুয়োরের চর্বিতে হিন্দু-মুসলমান দুএরই জাত যাবে—আর তখনই ধরে সবাইকে খ্রীষ্টান করে দেবে।'

নানকচাঁদ অবিশ্বাসের সুরে বললেন, 'একথা কি সবাই বিশ্বাস করবে? মানুষ কি এতই বোকা?'

'অনেকেই করবে উকিলবাবু। আমাদের দেশের লোক ধর্মের কথায় ঠিক এতটাই বোকা হয়ে পড়ে। কথাটার কানাঘুষো শুনেই কিলা থেকে তিন-চার জন সিপাই জমাদার হাবিলদার ডেকে কাগজ পুড়িয়ে সাহেবরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিল যে, কাগজে চর্বি নেই। কিন্তু তবু কেউ বিশ্বাস করে নি।... আরও রটিয়েছি—রটিয়ে দিয়েছি যে, সিপাইদের যে আটা দেওয়া হচ্ছে—তাতে আছে গরু আর শুয়োরের হাড়ের গুঁড়ো। তা ছাড়া বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে সিপাইদের যে, এই কটা ইংরেজের এত জোর নেই যে এতবড় দেশটায় রাজত্ব করে। যা কিছু করছে সিপাইরা—আর ইংরেজ বসে বসে খামকা ওদের ওপর রাজত্ব করছে।'

'তার পর?' নানকচাঁদ সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

'সিপাইদের অসন্তোষের আরও কারণ আছে।' আমিনা বললে, 'মাইনে কম, অথচ প্রত্যেকেরই বড় সংসার। অনেক সিপাইএর দুটো-তিনটে করে বউ আছে। এদেশে কোম্পানির ফৌজে কেউ কাজ করছে শুনলে তার আত্মীয়স্বজন সব ভাবে যে, সে তাদের খাওয়াতে বাধ্য—সবাই এসে ঘাড়ে চাপে। মানমর্যাদা হারাবার ভয়ে সিপাইও চুপ করে থাকে। ফলে সবাইকারই দেনা। সিপাইদের একথাও বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, কাজ সমানই করে ওরা, বরং ইংরেজের চেয়ে বেশীই করে। অথচ ওদের চেয়ে ইংরেজ সিপাইদের মাইনে বহুগুণ বেশী। বুঝেছেন? আয়োজনে কোনও দিক থেকে খুঁত থাকছে না।'

নানকচাঁদ ক্ষণকাল নিঃশব্দে আমিনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমিনার মুখে সগর্ব হাসি। সে পুনশ্চ বললে, 'আর একটা ভারি সুবিধে হয়ে গেছে, জানেন? স্বয়ং খোদাতালা সুবিধেটা করে দিয়েছেন।'

'কি রকম?'

'কারা যেন একটা মজার খেলা শুরু করেছে। দুপুর রাত্রে গ্রামে কোন একজনের বাড়ি কেউ দুখানা রুটি ফেলে দিয়ে যায়। তার সঙ্গে লেখা থাকে যে তাকেও এমনি করে ছটা গ্রামে এই রুটি পৌঁছে দিতে হবে, নইলে অনিষ্ট হবে। সে বেচারা প্রাণের ভয়ে তা-ই করে। এমনি করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলেছে রুটির খেলা। আমরা সেই সুযোগে সিপাইদের ভেতর রটিয়ে দিয়েছি যে, সমস্ত দেশ তৈরী আছে। সিপাইরা জাগলে দেশও জাগবে—লড়াই শুরু হলে সবাই দলে দলে এসে সিপাইদের দিকে যোগ দেবে। টাকা আর রুটি—

অন্তত এ-দুটোর অভাব হবে না। এই যে রুটি চালাচালি চলছে—এতে আসন্ন বিপ্লবের খবরই পাঠানো হচ্ছে।'

নানকচাঁদ আবারও অবিশ্বাসের সুরে বললেন, 'এ কথা তারা বিশ্বাস করছে?'

'করছে বৈকি!'

'তাজ্জব!...ভারি তাজ্জব! ফৌজে গেলে কি মানুষ এতই বোকা হয়!'

আজিজন বলল, 'কেন, এতে অবিশ্বাস করবারই বা কি আছে?'

'আছে বৈকি বিবিসাহেবা! আমাকে কেউ একথা বোঝাতে এলে আমি প্রশ্ন করতুম যে, বিদ্রোহ আসন্ন এই খবরটা দেওয়া হচ্ছে, না বিদ্রোহ করতে বলা হচ্ছে? প্রস্তুত থাকতে বলা হচ্ছে, না প্রস্তুত আছে এই খবর দেওয়া হচ্ছে? এ রুটির অর্থ কি?'

'যে যা প্রশ্ন করছে, সুবিধামত তাকে সেই জবাবই দেওয়া হচ্ছে।'

'কিন্তু গ্রামের লোক এ রুটির কি খবর খুঁজে পাবে? রুটি পাঠানোর দরকারই বা কি? কেউ কি এ প্রশ্ন করছে না?'

'সে প্রশ্ন করলে আমরা বলব যে, সোজাসুজি বিদ্রোহের খবরটা তো আর প্রচার করা যায় না। তাই এই রুটির ছদ্মবেশ।'

'কিন্তু রুটি পাঠানোর যে এই অর্থ—সেটা তো আগে তা হলে প্রচার করতে হয়েছে। নইলে শুধু মাঝরাত্রে রুটি এসে পৌঁছলে সাধারণ লোক কি বুঝবে? আর রুটি পাঠানোর অর্থ যদি আগে প্রচার করা হয়ে থাকে তো রুটি পাঠানোর কোন প্রয়োজনই থাকে না। না বিবিজান—এ বড় গোঁজামিলের ব্যাপার। এ যারা বিশ্বাস করছে তাদের গর্দানের ওপর মাথাটা নেই। ফৌজের সম্বন্ধে ক্রমেই হতাশ হচ্ছি!'

আমিনা ও আজিজন দুজনেই হেসে উঠল। আমিনা বলল, 'সবাই যদি আপনার মত বুদ্ধিমান হত তো আমাদের কাজ চলত কি করে? আর তা হলে তারা আট টাকা মাইনেতে ফৌজেই বা কাজ করতে যাবে কেন? তারা তো উকিল নানকচাঁদের মত মাথা খাটিয়েই হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারত!'

নানকচাঁদ এ কথার উত্তর না দিয়ে নীরবে আরও কিছুক্ষণ তামাক টানতে লাগলেন। পরে বললেন, 'পাঞ্জাবী সিপাইরা তোমাদের দিকে আসবে মনে কর?'

'না বাবুজী। ওরা এক আশ্চর্য জাত। এই সেদিনের মার-খাওয়া একবারে ভুলে গেল।'

'কিংবা ভোলে নি। যারা মেরেছে তাদের হিম্মত জানে। আবার তাদেরই হাতে মার খাবার ইচ্ছে নেই।—রাজপুতরা?'

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রাজপুত রাজারা যে কি করবেন!'

'তারা কেউ তোমাদের দিকে আসবে না। অন্তত নানাসাহেবের নাম থাকলে তো নয়ই। মারাঠাদের হাতে বহু দুঃখ তারা পেয়েছে, ইংরেজদের তাড়িয়ে সে জায়গায় মারাঠারাজ বসাতে তারা চাইবে না।...হুঁ। বোঝা গেল। —তেলেঙ্গীরা?'

'সন্দেহ আছে এখনও।'

'না বিবিসাহেব। তা হলে এ কাজে এগোনো তোমাদের উচিত হয় নি। আশা-ভরসা বড়ই কম। আগুন জ্বলছে বটে—তবে সে আগুনে পতঙ্গের মত তোমাদেরই ঝাঁপ দিয়ে মরতে হবে।'

'দেখা যাক। দিল্লী থেকে দমদম মায় কলকাতা পর্যন্ত—ইংরেজ ফৌজ

যা আছে, সিপাই আছে তার দশগুণ ! আর এইখানকার ইংরেজ যদি ঘায়েল করতে পারি—বোম্বাই, মাদ্রাজ সব জায়গার সিপাইরাই জাগবে। বেগতিক দেখলে চাই কি রাজপুত আর পাঞ্জাবী সর্দাররাও আমাদের দিকে আসবে !'

'ওরাও মুলুক থেকে ফৌজ আনাবে।'

'শুনেছি বাবুজী, আড়াই মাস সময় লাগে ওদেশ থেকে এদেশে পৌঁছতে।'

'আড়াই মাস খুব বেশী সময় নয়, হুসেনী বিবি। তা ছাড়া, গোর্খারা আছে। ইংরেজদের হাতে না রাখলে জঙ্‌বাহাদুরের চলবে না।...এখনও সময় আছে, এখনও নিরস্ত হও। মুঘলরাজ মরে পচে গেছে, দিল্লীতে এখন চিল শকুনের আড্ডা, পেশোয়া-বংশও মরে গিয়েছে বিবি, সে আর বাঁচবে না। পুষ্যি-পুত্তুরকে দিয়ে পরলোকের নামে পিণ্ডিই দেওয়া চলে শুধু, ইহলোকে আর কোন সুবিধে হয় না। দেখ—ভাল করে ভেবে দেখ !'

আমিনা পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'না, ফেরার আর কোন উপায় নেই। নরকের পথে অনেকদূর নেমে এসেছি। যেদিন এই দেহটা ঐ নানাসাহেবের লালসার খোরাক করে দিয়েছি, সেই দিনই তো চিতাশয্যা বিছিয়েছি নিজে হাতে বাবু-সাহেব, পুড়ে মরা ছাড়া এর তো আর কোন গতি নেই। আর পুড়ি যদি তো আরও দু-চারজনকে পোড়াতে ছাড়ব কেন। কার কি হবে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। আমরা দুই বোন আগুন জবালাতে এসেছি, আগুন জবালিয়ে চলব—যতক্ষণ বাঁচি। নিজের দেহকে স্ফুলিঙ্গ করে—ভারতব্যাপী ইন্ধনের উপযুক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—তাই না ?...না, আর বাঁচবার, সাবধান হবার, ফেরবার কোন পথ কোথাও খোলা নেই।'

নানকচাঁদের কান কিন্তু শেষের দিকে আমিনার কথায় ছিল না। তাঁর অভ্যস্ত কান কোন দূরে পদশব্দ শুনছিল। আমিনার বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলে উঠলেন, 'ঐ বোধ হয় তিনি এসেছেন—এতক্ষণে !'

তার পর উঠে গিয়ে আবার কপাট খুলে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে প্রদীপের শিখাটা কাঁপিয়ে তুলল। আজিজন ঘাড়টা উঁচু করে দেখল—বাইরের জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্যে একটা ক্ষীণ আলোকশিখা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। একটু পরেই আগন্তুক ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গের আলোক-সহচরীটি যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনিই নিঃশব্দে ফিরে চলে গেল। নানকচাঁদ আবার সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

যিনি এসে দাঁড়ালেন, প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে তাঁকে বেশ ভাল করে দেখা গেল। তিনিও মুসলমান, ঠিক যুবাপুরুষ না হলেও মধ্যবয়সে পৌঁছতে এখনও দেরি আছে। অত্যন্ত সুপুরুষ, উজ্জবল গৌরবর্ণের সঙ্গে ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত দাড়ি ও গোঁফ বড় চমৎকার মানিয়েছে। চোখ মুখ নাক ও ললাট—সমস্তই সুডৌল ও সুশ্রী। চোস্ত পাজামা ও চাপকান পরনে, মাথায় সাদা সুতোর কাজ-করা টুপি। ঘরের মাঝামাঝি এসে লোকটি দুটি মহিলার মাঝা-মাঝি একটা স্থানের দিকে মুখ করে ঈষৎ অভিবাদনের ভঙ্গি করলেন।

নানকচাঁদ ততক্ষণে নিজের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন। এবার তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'এই যে, এঁর কথাই তোমাদের বলছিলুম। ইনিই আমার সেই বন্ধু—মহম্মদ আলি খাঁ, রোহিলখণ্ডের লোক। আর এঁরা—এঁদের পরিচয় তো জানেনই।'

ক্ষীণ আলোর প্রথম অস্পষ্টতা সয়ে গেছে। দু পক্ষই দু পক্ষকে ভাল করে দেখে নিয়েছেন, ফলে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে।

নানকচাঁদ আগে অতটা বুঝতে পারেন নি। এখন আমিনার দিকে তাকিয়ে তার স্তম্ভিত দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ তুলে মহম্মদ আলি খাঁর দিকে তাকালেন।

মহম্মদ অ্যালি খাঁ স্থির নিস্পন্দ পাথরের মূর্তির মত অবিচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে। তাঁর দৃষ্টি বিস্ময়-বিস্ফারিত, স্থির। নানকচাঁদ দেখলেন, একটু একটু করে সেই প্রসারিত চোখদুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল—ক্রমে সে বাষ্প গলল। আয়ত চোখের কোল বেয়ে সে জল ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে কপোল ভাসিয়ে শ্মশ্রু-প্রান্ত বেয়ে বুকের কাছে জামাটা ভিজোতে লাগল।

ততক্ষণে রমণী দুটিরও স্তম্ভিত অবস্থা কেটেছে। আজিজন নিজের কঙ্কণ দিয়ে নিজের ললাটে আঘাত করল। আমিনা অস্ফুটকণ্ঠে কি একটা বলে উঠল। ভাল করে তার কণ্ঠে স্বরও ফুটল না। পরমুহূর্তেই সে চেতনা হারিয়ে আজিজনের কোলে ঢলে পড়ল।

॥ ৫ ॥

নানকচাঁদের বাড়ির বৈঠক ভাঙল সেদিন অনেক রাত্রে। প্রথম প্রহর তার বহু পূর্বে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—দ্বিতীয় প্রহরও শেষ হয় হয়। নীচের দোকানপাট বন্ধ করে দোকানদাররা যে যার ঘরে চলে গিয়েছেন; দু-একজন এখনও মায়া কাটাতে পারেন নি বটে—তবে তাঁরাও ঝাঁপ বন্ধ করে ভেতরে বসে কাজ করছেন। ফলে পথ জনবিরল ও অন্ধকার—সেদিকে চাইলে সাধারণ গৃহস্থেরও ভয়-ভয় করে।

নানকচাঁদই প্রথমে কপাট খুলে বাইরে এলেন—তাঁর পেছনে পেছনে বাকি তিন জন। যে দাসী মহম্মদ আলি খাঁকে পথ দেখিয়ে এনেছিল সে তখনও অপেক্ষা করছে। বোধ হয় এই রকমই হুকুম ছিল। এধারের বারান্দা থেকে অন্তঃপুরে যাবার পথে সিঁড়ির মুখটায় সে একটা অতিশয় মলিন কাঁথা মুড়ি দিয়ে শীতে কুকুর-কুণ্ডলী অবস্থায় বসে আছে—অথবা বলা উচিত বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার সামনের ডিব্বাটা তখনও জ্বলছিল—কুয়াশাচ্ছন্ন নিবাত আবহাওয়ার জন্য তার শিখাটা নিষ্কম্প স্থির, যদিও তাতে আলো অপেক্ষা ধোঁয়াই বেরুচ্ছিল বেশী। নানকচাঁদ বুড়িকে ডাকলেন না—হয়তো সেটা শুধু অনুকম্পাই নয়, তার মূলে সতর্কতার প্রশ্নও কিছু ছিল—তিনি কাছে এসে সাবধানে ডিব্বাটা তুলে নিলেন ও তার শিখাটা একটু উজ্জ্বল করে দিয়ে পাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

বোধ করি অনাবশ্যক বোধেই তিনি তাঁর অনুগামীদের দিকে ফিরে চাইলেন না—অথবা তাদের সঙ্গে আসতে কোন ইঙ্গিত করলেন না। তারাও সেজন্য অপেক্ষা করল না। নিঃশব্দে সেই সংকীর্ণ সিঁড়িপথে কোনমতে 'জান' বাঁচিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে একজনের পর একজন অনুগমন করতে লাগল। সিঁড়ি পার হয়ে একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে সুঁড়ি পথ—তার পর সামান্য একটু উঠোন। উঠোনটায় রাশীকৃত আবর্জনা—কোথাও কোথাও বর্ষায় আগাছাও গজিয়েছিল, এখনও তার চিহ্ন রয়েছে। ফুঁকো কাচের শিশিভাঙাই বেশি—

তার মধ্যে দিয়ে খালি-পা বাঁচিয়ে যাওয়া কঠিন। উপস্থিত সকলকার পায়েই জুতো থাকাতে অবশ্য সেজন্যে কোন অসুবিধা হল না। যথাসম্ভব সাবধানেই তাঁরা উঠোন পার হলেন। নানকচাঁদ, চাবি দিয়ে দরজা খুললেন, তার পর এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে তাঁদের বাইরে যাবার পথ দিলেন।

মহম্মদ আলি খাঁ ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন—সে ঘোড়া বাইরে বাঁধা ছিল। শিক্ষিত ঘোড়া—আলো দেখে যেন আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু কোন শব্দ করল না। মহম্মদ খাঁ কোন বিদায়-সম্ভাষণ করলেন না—নানকচাঁদের দিকে ফিরে ঘাড়টা ঈষৎ একটু নত করলেন মাত্র—তার পর নিঃশব্দ ত্বরিতগতিতে ঘোড়ার ওপর উঠে বসলেন। ঘোড়াও বোধ হয় এই ইঙ্গিতটুকুরই অপেক্ষা করছিল, সে চোখের নিমেষে সেই পাথর-বাঁধানো সড়কে ক্ষুরের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমিনা ও আজিজনের ডুলিওয়ালারাও অপেক্ষা করছিল। এবার তারা ডুলি এনে একেবারে দরজার সামনে নামাল। আজিজনের সাধারণ ডুলি—শুধু বসবার জায়গায় একটু দামী গদি পাতা। আমিনার ডুলি কিন্তু ধনী গৃহিণীরই উপযুক্ত—চারদিকে ভেলভেটের ঘেরাটোপ, তাতে সলমা-চুমকির কাজকরা—ডিব্বার আলোতে ঝকমক করে উঠল।

আজিজনও নানকচাঁদকে দু হাত জোড় করে নমস্কার করল শুধু—কোন বিদায়সম্ভাষণ জানাল না। কেবল ডুলিতে পা দিয়ে একবার কি মনে করে আমিনার দিকে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হল না। নিঃশব্দে গিয়ে আবার নিজের ডুলিতে উঠল।

আজিজনের ডুলি পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমিনা এতক্ষণ কেমন একরকম তন্দ্রাচ্ছন্নের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নানকচাঁদকে শুধু বলল, 'কাল সন্ধ্যের সময় ?'

নানকচাঁদ ঘাড় নাড়লেন।

আমিনা ডুলিতে উঠে বাহকদের নির্দেশ দিল, 'ঘাটে চল।'

শহরের একপ্রান্তে সতীচৌরা ঘাট। কবে কোন্ বিস্মৃত অতীতকালে কোন্ সতী এখানে সহগমন করেছিলেন, তারই স্মৃতি বহন করছে এই ঘাটটি। সে সতীদেবীর একটি মন্দিরও আছে—কিন্তু তৎসত্বেও এ অঞ্চলে ভদ্রলোকদের আসা-যাওয়া খুব কম। প্রধানত জেলে-নৌকার মাঝিদেরই আড্ডা এখানটায়—মন্দিরটিও তারাই জিইয়ে রেখেছে। কাছাকাছি বসতিও বিশেষ নেই, ঘাটের দু দিকে উঁচু পাড়ে ঘন আগাছার জঙ্গল। জেলেরা দিনের বেলা তবু ঘাটে কিছু ভিড় করে—সন্ধ্যের পর যে যার নৌকোয় আশ্রয় নেয়। নৌকোগুলোও ঠিক ঘাটে থাকে না, কিছু দূরে জলের মধ্যে একটার সঙ্গে আর একটা বাঁধা থাকে। ফলে কোন এক খুঁটিকে কেন্দ্র করে যেন একটি ভাসমান দ্বীপ গড়ে ওঠে।

আমিনার ডুলি যখন এসে ঘাটের মুখে থামল, তখন সতীচৌরা ঘাট নিযুতি হয়ে গেছে। গরমের দিনে অনেক রাত্রি পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে, তখন এখানে কিছু কিছু গান-বাজনাও হয়, কিন্তু এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে, গঙ্গার হাড়-কাঁপানো হাওয়ায় কোন ভক্ত বেশী রাত্রে মন্দিরে পুজো দিতে আসবে—এ সম্ভাবনা কম। সুতরাং পুজারী বহুক্ষণ আগেই মন্দির বন্ধ করে বাসায় চলে

গেছেন—সম্ভবত এতক্ষণে রেজাইএর নীচে তাঁর নাসিকা গর্জন চলছে। সারা ঘাট জনমানবশূন্য। নৌকোগুলোতেও আলোর চিহ্ন নেই। বস্তুত কুয়াশায় জল নৌকো কিছুই ভাল করে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না—সব যেন লেপে মুছে একাকার হয়ে গেছে।

আমিনা সেই গাঢ় অন্ধকারেই সিঁড়ি বেয়ে জলের দিকে খানিকটা নেমে গেল। তার পর, একেবারে শেষ ধাপের কাছে গিয়ে, খুব আস্তে একটা শিস দিল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা শিসে তার উত্তর এল। খুব কাছেই কেউ দাঁড়িয়ে আছে, এবং যে আছে সে পুরুষই—শিস শুনলে তা অনুমান করতে দেরি হয় না।

কিছুই দেখা যায় না—কাউকেই না। আমিনার বুকটা কি একটু ছাঁৎ করে উঠল ?

কিন্তু ভয় পেলেও সে বিহ্বল হল না। তার কোমরে গোঁজা ছিল একটা ছোট্ট পিস্তল, দ্রুত হাতে সেটা খুলে নিয়ে চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, 'কে ?'

'আমি—বেটী। আমি—'

'ও, মৌলবীসাহেব! আসুন—সালাম।'

এতক্ষণে চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আমিনা দেখল ঘাটেই একটা নৌকো বাঁধা আছে, একেবারে তার সামনে—আর সেই নৌকো থেকেই দীর্ঘদেহ এক মৌলবী নেমে এলেন।

আমিনা নিশ্চিন্ত হয়ে পিস্তলটি কোমরে গুঁজল। মৌলবী তা এই অন্ধকারেও লক্ষ্য করলেন, হেসে বললেন, 'ভয় পেয়েছিলি বেটী ?'

'সব রকম বিপদের জন্যেই প্রস্তুত থাকা ভাল নয় কি ? যদি অপর কেউ হত ?'

'তা বটে, ঠিকই।'

মৌলবী সিঁড়িরই একটা পইঠের ওপর বসলেন। তার পর পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ব'স আমিনা।'

আমিনা বসল বটে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরেই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল। বলল, 'তার পর ?'

মৌলবী বললেন, 'আমার কাজ আমি করে যাচ্ছি। আরা, বক্সার, কাশী, চুনার, এলাহাবাদ, মির্জাপুর—শেষ করেছি। এবার যাব লক্ষ্ণৌ হয়ে ফৈজাবাদ, জৌনপুর। যেখানে যাচ্ছি, আগুন জ্বালাচ্ছি। যে কোন মুসলমান 'মুসলমান' পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করে—তারই রক্ত তাতিয়ে তুলতে পারব বেটী, তুমি কিছু ভেবো না। কিন্তু, টাকা চাই—অনেক টাকা। মোল্লাদের টাকা না খাওয়ালে চলবে না, আমার একার দ্বারা তো সব কাজ হতে পারে না।'

'টাকা তৈরী আছে। কাল এমনি সময় সর্দার খাঁ টাকা নিয়ে ঘাটে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু আপনি—আপনি একটু সাবধানে থাকবেন মৌলবীসাহেব! ইংরেজ জাত বড় শয়তান।'

'তা আমি জানি আমিনা। শয়তানের নজর পড়েছে। ছায়ার মত গোয়েন্দা ফিরছে আমার পিছু পিছু ক'দিন থেকেই। আজ অনেক কষ্টে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে এসেছি—কুয়াশা ছিল বলেই সুবিধে।'

'যদি আপনাকে কয়েদ করে—যদি, যদি আর কিছু—'

আমিনার কণ্ঠস্বরে আন্তরিক উদ্বেগ ফুটে উঠল।

মৌলবীসাহেব করুণ প্রসন্ন হাসি হাসলেন। বললেন, 'যদি কি—ফাঁসি দেয় যদি ? আহমেদউল্লা অনেকদিন তোমার বাপের নিমক খেয়েছে। তোমাদের অপমানের শোধ নিতে, তোমাদের কাজে যদি তার জান যায় তো সে পরোয়া করবে না আমিনা। তবে তোমার কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এই যা আফসোস।'

আমিনা দু হাত বাড়িয়ে তাঁর ডান হাতখানা চেপে ধরল, বলল, 'দরকার নেই মৌলবীসাহেব। আমার জন্যে আপনি অনর্থক জীবন বিপন্ন করবেন না। যা পারি আমিই করব। আপনার যদি কোন ক্ষতি হয় তো আমি খোদাতালার কাছে কী জবাব দেব ?'

'সে জবাব আমিই না হয় তোমার হয়ে দেব মা! তুমি কিছু ভেবো না।'

বলতেই তাঁর অভ্যস্ত কান খাড়া হয়ে উঠল। দূরে মাঝদরিয়া দিয়ে কোন একটা ডিঙ্গি যাচ্ছে, যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে—তবু সেই সামান্যতম শব্দও সেই অখণ্ড নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল।

চকিতের মধ্যে আহমেদউল্লা উঠে দাঁড়ালেন। আমিনার মাথায় হাত রেখে বোধ করি কী একটা আশীর্বাদই করলেন—তার পর আরও চাপা গলায় শুধু বললেন, 'কাল এমনি সময়ে!' তার পরই এক লাফে তাঁর ডিঙ্গিতে উঠে ঘাটের সিঁড়িতে একটা ধাক্কা দিলেন—ডিঙ্গিটা নিঃশব্দে সোজা গিয়ে মাল্লাদের নৌকোর দীপের সঙ্গে লেগে গেল। আর তার কোন পৃথক অস্তিত্ব রইল না।

দূরের নৌকোটি কাছে আসছে। আমিনাও ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে দ্রুতগতিতে ওপরে উঠে গেল। ডুলিতে উঠে বাহকদের আদেশ করল, 'বাড়ি চল—জলদি।'

॥ ৬ ॥

কানপুরের মূল শহর থেকে তিন চার ক্রোশের ভেতরেই বিঠুর প্রাসাদ। শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও যখন গদিচ্যুত হন তখন তাঁকে কোথায় রাখা হবে—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে তা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক তকরার ও আবেদন-নিবেদনের পর বড়লাট এই বিঠুর স্থানটি নির্বাচন করেন। প্রথমটা বাজীরাও কিছুতেই বিঠুরে থাকতে রাজী হন নি, কারণ তিনি শুনো-ছিলেন যে, জায়গাটা বড়ই অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঐখানেই থাকতে হয় এবং ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫১ পর্যন্ত—এই তেত্রিশ বছর ওখানে কাটিয়ে তিনি প্রমাণ করে দেন যে, জায়গাটার জল-হাওয়া খুব খারাপ নয়।

এই দীর্ঘকালে বিঠুর ও তার আশপাশে এক বিরাট বসতি গড়ে উঠেছে। রাজা নির্বাসিত হলেও রাজা তো বটেই—তাঁর লোকজন সিপাহি-সান্ত্রী জাঁকজমক কিছু না কিছু থাকবেই। রাজার উপযুক্ত বার্ষিক ভাতা না পেলেও পেশোয়ার পোষ্যপুত্র নানা ধুন্ধুপন্থ সেসব ছেঁটে ফেলতে পারেন নি—নামে বা মর্যাদায় না হোক, ইংরেজ কোম্পানির চোখে না হোক—ওদের কাছেই পেশোয়া সেজে বসে আছেন।

বংশ এবং পেশোয়া উপাধিকে চিরস্থায়ী করতে বন্দী ও নির্বাসিত বাজীরাও কম চেষ্টা করেন নি। রাজ্যচ্যুত হবার পরও বহুবার বিয়ে করেছিলেন এবং সেদিকে যখন কোন আশা-ভরসা থাকে নি, তখন প্রায় একসঙ্গে তিনটি পোষ্যপুত্র নিয়েছেন। আমরা যখনকার কথা বলছি তখন তাঁদের একজন গিয়েছেন, দুজন আছেন—নানাসাহেব ও বালাসাহেব।

কিন্তু এত কাণ্ড করেও পেশোয়া উপাধি অব্যাহত থাকে নি। ইংরেজ কোম্পানি স্বীকার করেন নি নানাসাহেবকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেও নানাসাহেব পেশোয়া বাজীরাওএর আট লক্ষ টাকা বার্ষিক ভাতার অধিকারী হন নি। তার জন্য নানা লড়েছেন ঢের। বহু টাকা খরচ করে আজিমুল্লা খাঁকে বিলাতে পাঠিয়েছেন বিলাতী দরবারে আবেদন-নিবেদন জানাতে, কিন্তু কোন ফল হয় নি। সত্তর লাখ টাকা খরচ করে আজিমুল্লা খাঁ দু হাত ভরে বিলাতী প্রীতি আনলেও কোম্পানির ওপর কোন হুকুমনামা আনতে পারেন নি।

এর পর অনুমান করা অস্বাভাবিক নয় যে, নানাসাহেব ইংরেজদের বিষ-নজরে দেখবেন। কিন্তু বাহ্যত সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি—বরং তাঁর ইংরেজ-প্রীতি যেন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। বিঠুর প্রাসাদে খানা ও নাচের মজলিস আগেও বসত—এখন তো প্রায় প্রতি শনিবারে বাঁধা-বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। এবং সে মজলিসে আসেন না কে! জেলা হাকিম, কমিশনার থেকে শুরু করে কানপুর গ্যারিসনের মিলিটারি অফিসাররা সকলেই দলে দলে তাতে যোগ দেন—সস্ত্রীক তো বটেই, কখনও পরিবারের অন্য পরিজন সমেতও। বিঠুরের নিমন্ত্রণ এমনই লোভনীয় যে, পেলে কেউই প্রত্যাখ্যান করেন না।

তার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত নানাসাহেব 'সাহাব লোগ'এর সম্মান জানেন—অর্থাৎ কাকে কতটুকু খাতির করতে হবে সে সম্বন্ধে তাঁর দিব্য জ্ঞান আছে। পানভোজনের বন্দোবস্তটা ইংরেজী মতেই হয়—এমন কি কাঁটা-চামচগুলি পর্যন্ত খাস শেফিল্ডের। 'খানা' ও 'পিনায়' অর্থব্যয় করতে নানার কিছুমাত্র কার্পণ্য নেই। ভাল আহার্য ও দামী বিলাতী সুরা—এর কদর তিনি জানেন। তাছাড়া সাহেবদের সঙ্গে নানা মিশতেও জানেন। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, তাঁর রসিকতা প্রভৃতি ঠিক অন্যান্য দেশীয় রাজাদের মত নয়—অর্থাৎ ভোঁতা নয়। নাচের সময় গদিতে দেহ এলিয়ে দিয়ে 'মজা' দেখেন না; সামান্য ভুঁড়ি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও কখনও নিজে তো যোগ দেনই, অন্য সময়েও অতিথিদের ভেতর ঘুরে বেড়িয়ে তাঁদের সাহচর্য উপভোগ করেন। এইসব কারণে নানাসাহেব তাঁর জাতশত্রু সাহেবদের—প্রিয় তো বটেই, বিশ্বাসভাজনও।

যে রাত্রে আমিনা নানকচাঁদের বাড়ি গিয়েছিল সেদিন ছিল শুক্রবার। পরের দিন শনিবার—সাহেবদের আপ্যায়িত করতে নানা ব্যস্ত থাকবেন, এই জেনেই আমিনা নানকচাঁদ ও আহমেদউল্লার সঙ্গে টাকা লেনদেনের ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু কার্যকালে তা ঠিক ঘটল না। সন্ধ্যায় আমিনা নিজের ঘরে বসে কয়েকটা চিঠি লিখছে, এমন সময় দাসী এসে সংবাদ দিল—মহামান্য পেশোয়া এই দিকেই আসছেন।

চকিতে আমিনা অসমাপ্ত চিঠিটা বিছানার নীচে লুকিয়ে ফেলল—তার পর আয়নার দিকে তাকিয়ে দ্রুত হস্তে বেশভূষা একটু ঠিক করে নিয়ে নিশ্চিন্ত আলস্যে একখানা বই হাতে করে শুয়ে পড়ল—যেন এতক্ষণ সে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে এই বইখানাই পড়ছিল।

নানাসাহেব নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর বয়স যৌবনের সীমাকে পেছনে ফেলে এসেছে, কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে প্রবেশ করতে তাঁর এখনও অনেক দেরি। ভুঁড়িটা একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বটে, তবু তাঁর চালচলন থেকে যৌবনদৃপ্ততা একেবারে মুছে যায় নি। নানাসাহেবের পরনে সাধারণ মারাঠীর পোশাক, কেবল কোমরবন্ধ ও উষ্ণীষে আভিজাত্যের চিহ্ন কিছু কিছু আছে। মাথা ও দাড়ি

কামানো, স্থূলে অধরোষ্ঠের দরুন গোঁফ থাকলেও তা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে নি। তাঁর ললাটে তখনও সকালের পূজার চিহ্ন বিভূতি রয়েছে। দু কানের মুক্তালঙ্কারের মূলে চন্দনের চিহ্ন—গলায় একটি মুক্তার মালা।

নানা ঘরে ঢুকে একেবারে আমিনার শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তার পর তাঁর অভ্যস্ত মিষ্টকণ্ঠে ডাকলেন, 'হুসেনী!'

আমিনা যেন চমকে উঠল, 'এ কি, পেশোয়াজী স্বয়ং! কি ভাগ্য আমার! আজ এমন নিশীথরাত্রে সূর্যোদয় ঘটল!'

নানাসাহেব হাসলেন। বললেন, 'হুসেনীবিবি, বিলেত হলে এসব কথাবার্তা তোমার বহুৎ কাজে লাগত। মূর্খ পাহাড়ীর কাছে বিদ্যেটা একেবারে মাঠে মারা যাচ্ছে।'

আমিনা শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এখন নানাসাহেবকে বসতে বলে সে নিজেও নীচে তাঁর পায়ের কাছে বসল। নানা সস্নেহে তার কাঁধে একটা হাত রাখলেন।

আমিনা বলল, 'তার পর? দাসীকে কী হুকুম?'

'হুকুম ছাড়া কি আসার অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না হুসেনী?

'সে এখানে কেন থাকবে জনাব? তার জন্য আপনার পিয়ারী আদালা বেগম আছে। তাছাড়া, এমন অসময়ে, রূপসী মেমসাহেবদের জব্বর রোশ্‌নী চোখের সামনে থাকতে, কি মাটির চিরাগদের এমনি মনে পড়ে?'

নানাসাহেবের মুখে বারেক একটা ছায়াপাত হল। তিনি বললেন, 'আদালার কথা আর ব'ল না। সে বড় ক্ষেপে আছে কাল থেকে। তার একটা—তার একটা দামী জিনিস চুরি গেছে!'

'ও, তাই নাকি! কী জিনিস মহারাজ?'

'একটা দামী মুক্তোর মালা!'

'এই! তা এতে আর দুঃখ করার কী আছে? তাকে রোজই তো কত দামী উপহার দিচ্ছেন। তার ভেতর কী গেল আর কী রইল—তারও কি হিসেব থাকে নাকি আদালার? বোঝা গেল, সেইজন্যই মহারাজ তাকে এত পেয়ার করেন। খুব হুঁশিয়ার মেয়ে।'

নানাসাহেবের দু চোখ নিমেষের জন্য জ্বলে উঠল। তিনি বললেন, 'আমার পিতা-পিতামহ প্রত্যহ দামী জিনিস উপহার দেওয়ার হিম্মত রাখতেন ঠিকই, কিন্তু আমি—আমার কি আর সে ক্ষমতা আছে হুসেনী? তা হলে আর ভাবনা কি ছিল? আমি তো আজ ভিখিরী।'

'আপনার দাসী হুসেনীর জীবনের স্বপ্নই হল যে, আপনাকে সে হিন্দুস্তানের মসনদে দেখবে, জনাব!'

'ও তোমার পাগলামি হুসেনী। ইংরেজ প্রবল—আজ ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে সারা হিন্দুস্তানে এমন শক্তি কই?'

'যদি ঈশ্বর দিন দেন তো ওদের শক্তি দিয়েই ওদের মারব মহারাজ। আপনি শুধু ক্ষণকাল ধৈর্য ধরুন!'

'ওসব কথা থাক হুসেনী, শুধু শুধু মন খারাপ করে লাভ নেই। আমি ভাবছি আদালার ঘর থেকে ওর গহনা চুরি করলে—এ প্রাসাদে এমন সাহস কার!'

ছোট্ট একটা হাই হাতের আড়ালে সামলে নিয়ে আমিনা বলল, 'খোঁজ করুন চোর ধরা পড়বে বৈকি।'

'ওর ঝিকে আমি প্রথম চোটে কয়েদে রাখতে বলেছি। তাতেও না হয়, দুদিন ঠাণ্ডিগারদে রাখলেই পেট থেকে কথা বেরুবে। সে কথা থাক, শোন, যে দরকারে আমি এসেছি!'

'হ্যাঁ, সেইটেই তো জানতে চাইছি। দরকার ছাড়া যে এমন অসময়ে দাসীর কাছে আপনি আসেন নি, তা আমি জানি!' আমিনার মুখে ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি।

ধরা পড়ে গিয়ে নানা অপ্রতিভ হলেন! হেসে বললেন, 'শোন, আজ ওদের ব্যারাক থেকে এওয়ার্ট সাহেব এসেছেন। তিনি কথায় কথায় বলেন যে, নেটিভ মেয়েদের কাছে ইংরেজী লেখাপড়া এখনও স্বপ্নের অগোচর। তার জবাবে আমি হঠাৎ বলে ফেলেছি যে, আমার মহালেই এমন ভারতীয় মেয়ে আছে যে মেম-সাহেবের মতই ইংরেজী বুলি বলতে পারে।...সেই শুনে পর্যন্ত তিনি পীড়াপীড়ি করছেন—তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন। তুমি একবারটি চল, লক্ষ্মীটি!'

'আমি বাইরে যাব—একঘর অচেনা পুরুষের মধ্যে?'

'দোষ কি? তুমি তো ঠিক অপর মেয়েদের মত পর্দানশীন নও। তা ছাড়া হয়তো এওয়ার্ট সাহেব ভাবছেন যে, আমি একটা মিছে চাল দিয়েছি ওঁর কাছে।'

আমিনা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তার পর বলল, 'আপনি তো জানেন পেশোয়া, ইংরেজদের ওপর আমার একটা বিজাতীয় ঘৃণা আছে। আমার মালিকের সঙ্গে যারা বেইমানি করেছে, তাদের দিকে তাকাতে পর্যন্ত আমার ঘৃণা বোধ হয়।' শেষের দিকে আমিনার কণ্ঠস্বর বুঝি একটু গাঢ়ও হয়ে এল।

নানাসাহেব সস্নেহে ও সপ্রেমে তার কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বললেন, 'জানি হুসেনী, তুমি ছাড়া আমার এ দিকটা কেউ এমন করে ভাবে না। তবু আমারই সম্মান রাখতে তোমার যাওয়া দরকার। নইলে আমাকে তারা হয়তো মিথ্যাবাদী ভাববে।'

আরও মুহূর্তকয়েক আমিনা চুপ করে রইল। বোধ করি তার মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে গেল এই অল্প সময়েই। তার পর শান্তকণ্ঠে সে জবাব দিল, 'আপনি যান জনাব, আমি এই পোশাকটা বদলে নিয়ে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, তাই এসো। বেশ একটু সেজেগুজে।' খুশী হয়ে নানাসাহেব চলে গেলেন।

নানা অদৃশ্য হতেই আমিনার ললাটে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল। স্থির নিশ্চল-ভাবে দাঁড়িয়ে কী যেন খানিকটা ভেবে নিল সে। তার পর অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকল, 'মুসম্মৎ!'

'জী বেগমসাহেবা! আমাকে ডাকছিলেন?' দাসী এসে দাঁড়াল।

গলা আরও নীচু করে আমিনা বলল, 'সর্দার খাঁকে ডাক্। খুব তাড়াতাড়ি। এখানে নয়—ঐ পাশের ঘরে। আর শোন্, সে যখন আসবে আর কেউ না এসে পড়ে, একটু হুঁশিয়ার থাকবি।'

মুসম্মৎ এসবে বোধ করি অভ্যস্ত। সে নিঃশব্দে বার হয়ে গেল। আমিনাও যথাসম্ভব ক্ষিপ্রহস্তে তার প্রসাধন সারতে লাগল। বেশ পরিবর্তন তখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নি, মুসম্মৎ এসে সংবাদ দিলে, 'সর্দার খাঁ এসেছে বেগমসাহেবা!'

'এসেছে—ওঃ! আচ্ছা, তা হলে এখানেই নিয়ে আয়। তুই বাইরে থাক্—মহলের দরজার কাছে। কেউ না বিনা এত্তেলায় চলে আসে।'

মুসম্মৎ আবার বার হয়ে গেল। আমিনা আয়নার দিকে ফিরে ললাটের ওপর থেকে চূর্ণকুন্তলগুলি সরিয়ে অভ্যস্ত লঘু হাতে দু চোখে সুর্মার রেখা টেনে

নিল।

এবং সে রেখা টানা তখনও শেষ হয় নি, তার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখের প্রতিচ্ছবির পাশে আর একটি মুখের ছায়া ফুটে উঠল দর্পণে। পুরুষের মুখ—কিন্তু সাধারণ নয় ঠিক। কুৎসিত। এত কুৎসিত, এত বীভৎস মুখ কল্পনা করাও কঠিন। যে এক তার দীর্ঘ স্থূল দেহ, ঘোরকৃষ্ণ বর্ণ, ছোট্ট চোখ, স্থূল অধরোষ্ঠ, ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজি, কুঞ্চিত কেশ এবং তদুপরি সারা মুখে বসন্তের সুগভীর ক্ষতচিহ্ন। সবটা মিলিয়ে তাকে একটা দৈত্যের মতই দেখাচ্ছিল। তবু সেই ভয়াবহ মুখের দিকে চেয়েই আমিনার সারা মুখ উজ্জ্বল ও প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে দর্পণের ভেতর দিয়েই আগন্তুককে ইঙ্গিত করে কাছে আসতে বলল।

সর্দার খাঁ কাছে এলে আমিনা ঘুরে দাঁড়াল এবং কোন প্রকার ভূমিকা না করে বলল, 'সর্দার, খুব জরুরী দুটো কাজ আছে—মন দিয়ে শুনে রাখ। উকিলপাড়ায় নানকচাঁদ বাবুজীর বাড়িতে যাবি। তিনি তোকে দু থলি টাকা দেবেন। সেই টাকা নিয়ে তুই যাবি সতীচোরা ঘাটে। সেখানে মৌলবী সাহেব অপেক্ষা করবেন। দু বার আস্তে শিস দিবি, তা হলেই তিনি যেখানে থাকুন কাছে আসবেন। তাঁকে এক থলি টাকা দিবি—আর এক থলি নিয়ে এখানে আসবি। শুনেছিস ভাল করে? ভুল হবে না তো? টাকা কেউ রাহাজানি করে না নেয়, তা হলে আর তোর মুখ দেখব না।'

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে আমিনা চুপ করল। সর্দার খ এতক্ষণ একদৃষ্টে আমিনার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। সে ভয়ঙ্কর মুখে কোন ভাব ফোটা কঠিন, কিন্তু তার ক্ষুদ্র বর্তুলাকার চোখের ভাষা পড়া সম্ভব হলে দেখা যেত, সবটা জড়িয়ে একটা তন্ময় মুগ্ধ ভাবই ফুটে উঠেছে সে মুখে। এতক্ষণ পরে সে কথা বলল, গম্ভীর অথচ শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কোন গোলমাল হবে না মালেকান্, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

আমিনার মুখ প্রসন্নতর হ'ল—তার দু চোখে ফুটে উঠল অবিশ্বাস্য একটা স্নেহ। সে আরও কাছে এসে সর্দার খাঁর দু কাঁধে দুটো হাত রাখল। তার পর ঈষৎ গাঢ়কণ্ঠে বলল, 'সে আমি জানি সর্দার, এ পৃথিবীতে একমাত্র তুই-ই আমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসিস। এক এক সময়—হাঁ, এক এক সময় একথাও মনে হয় যে, থাক এ সব, সব কিছু ছেড়ে কোন দূর গাঁয়ে গিয়ে তোর সঙ্গেই ঘর বাঁধি। আমার জীবন তো গেছেই—এই তুচ্ছ দেহটা দিয়ে তোর জীবন যদি সার্থক হয় তো হোক, কিন্তু—না, সে তুই বুঝবি না সর্দার, তুই যা!'

সর্দারের সেই দানবীয় মুখও কিছুকালের জন্য যেন স্নেহে, প্রেমে, কৃতজ্ঞতায়, চরিতার্থতায় রমণীয় ও স্নিগ্ধ হয়ে এল। কিন্তু সে কোন কথা বলল না, অধিক কিছু আশা করল না—যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বার হয়ে গেল।

॥ ৭ ॥

খুব সূক্ষ্ম মসলিনের ওড়নায় মুখ ঢেকে আমিনা এক সময় নাচঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল। তখন পানভোজন মিটে গেছে, কিন্তু আমোদ-আহ্লাদের আয়োজন শুরু হয় নি। এমন কি অন্য দিনের মত সাহেবদের প্রসন্ন হাস্যের হুঙ্কার এবং মেমসাহেবদের কলহাস্যের রজতবাদ্যও শোনা যাচ্ছে না। আমিনা বিস্মিত হয়ে দেখল সাহেব-মেমরা উপস্থিত ভারতীয়গণ থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত

অথচ চাপা গলায় কি আলোচনা করছেন।

আলোচনার বিষয়বস্তুটা অনুমান করতে আমিনার দেরি হল না। অল্প একটু চাপা হাসিও তার ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিল, কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য। তার পরেই মুখে একটা অপরিসীম প্রশান্তি টেনে এনে আমিনা নানাসাহেবের দিকে অগ্রসর হ'ল।

আমিনা কথা বলে নি—অথবা তার পায়ের মুক্তাখচিত ভেলভেটের জুতোতেও কোন শব্দ ওঠে নি, তার ব্যক্তিত্বের মধ্যেই বোধ করি কোন চৌম্বক শক্তি ছিল, নানাসাহেব এবং তাঁর অতিথিবৃন্দ তার আগমনের অল্পক্ষণ মধ্যেই সচকিত হয়ে উঠলেন। সাধারণ অপর কোন রমণীর পক্ষে যা শুধুই আগমন—এই স্ত্রীলোকটির পক্ষে তা যেন আবির্ভাব। মুগ্ধ বিস্মিত চোখে ও উজ্জ্বল মুখে নানাসাহেব এগিয়ে এলেন। সাহেব-মেমদের বৈঠক নিমিষে ভেঙে গেল—তাঁরাও সকলে এসে ঘিরে দাঁড়ালেন।

নানাসাহেব সহাস্যবদনে খাঁটি বিলাতী ভঙ্গিতে পরিচয় করিয়ে দিলেন—'ইনিই হুসেনী বেগম—মিস্টার মুর, কর্নেল এওয়ার্ট, মিসেস এওয়ার্ট, লেফটেনাণ্ট হুইটিং, মিসেস হুইটিং—'

মধুর হাসিতে মুখ রঞ্জিত করে আমিনা বাঁ হাতের তর্জনী তুলে নানাসাহেবকে নিরস্ত করল, 'একটু আস্তে পেশোয়াজী, এমনভাবে কি পরিচয় করায়? দাঁড়ান, একে একে পরিচয়টা পাকা করে নিই।'

এই বলে বিস্মিত সাহেবদের অধিকতর বিস্মিত করে আমিনা তার ক্ষুদ্র কোমল সুগৌর হাতখানি কর্নেল এওয়ার্টের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'Glad to meet you Colonel Ewart, how do you do?'

এওয়ার্টের বহু দিনের অভ্যস্ত মিলিটারী শিক্ষাও কিছুক্ষণের জন্য গোলমাল হয়ে গেল। এমন কি বাড়িয়ে দেওয়া হাতখানির দিকে হাত বাড়াতেও তাঁর কয়েক লহমা দেরি হ'ল। বস্তুত শুধু তিনি নন—উপস্থিত সকলেই যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে জড় হয়ে গিয়েছিলেন। যাই হোক, এওয়ার্টই সম্বিৎ ফিরে পেলেন সর্বাগ্রে। তিনি শ্বেতপদ্মের মত সেই হাতখানি নিজের দু হাতে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বিলাতী আপ্যায়নের গৎগুলি আউড়ে গেলেন।

পরিচয়-পর্ব শেষ হতে আমিনা ইশারায় একজন খিদমৎগারকে ডেকে তার হাতে-ধরা বিদুরির কাজকরা হায়দ্রাবাদী থালায় সাজানো বিলাতী সুরার ক্ষুদ্র পাত্রগুলি একে একে অতিথিদের হাতে তুলে দিল। এবং সকলকে দেওয়া শেষ হলে, অবশিষ্ট পাত্রটি হাতে নিয়ে সে যখন আর কেউ বাকি আছে কিনা লক্ষ্য করছে, তখন অকস্মাৎ মুর তাঁর নিজের হাতের পাত্রটি বাড়িয়ে 'Your health, ma'am!' বলতেই, অনায়াসে ও স্বচ্ছন্দে তাঁর পাত্রের সঙ্গে নিজের পাত্র ঠেকিয়ে অতি সহজ ভাবেই সে পাত্রটি নিজের মুখে তুলল।

নানা ঠিক এতটা আশা করেন নি। কিন্তু খুশীই হলেন। গর্বে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ইংরেজদের অবজ্ঞা লক্ষ্য না করার মত মূর্খ তিনি নন। নির্বোধ নন বলেই তিনি তা লক্ষ্য না করবার ভান করেন। আজ যে-কোন তুচ্ছ ব্যাপারেই হোক, তাদের উপর এক হাত নিতে পেরে তাঁর আনন্দের অবধি ছিল না। তিনি তখনই মনে মনে হুসেনী বিবিকে পুরস্কৃত করবার একটা সংকল্প নিয়ে ফেললেন।

পান-পর্ব শেষ হতে সাহেব-মেমরা আমিনাকে কেন্দ্র করে ঘিরে বসলেন।

আমিনা তাঁদের কাছে এখন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। নানার রক্ষিতা উপপত্নী—এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজী কথা বলবে, এ তাঁদের কাছে স্বপ্নেরও অগোচর বৈ কি!

মিসেস মূর প্রশ্নটা করেই বসলেন,—'আপনি কি কোন মেমসাহেবের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন—না বিলেতে গিয়েছিলেন কখনও?'

আমিনা উত্তর দিল, 'না, বিলেত যাই নি—এখানেই শিখেছি।'

'কার কাছে বলুন তো?' মিসেস মূরের কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠে।

'কনভেন্টে।'

'ও, তাই বলুন!' মিসেস এওয়ার্ট বলে ওঠেন।

মিসেস মূর বলেন, 'কোন্ কনভেন্টে বলুন তো?'

আমিনা প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়, 'Somewhere in the hills—ছেলেবেলায় পাহাড়ে থাকতাম।'

মিসেস মূর বলেন, 'মাপ করবেন, এমন উঁচুদরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যে এদেশে আছে তা-ই আমাদের জানা ছিল না। নামটা জানতে পারলে ভাল হ'ত।'

আমিনা মাথা নীচু করে ঈষৎ অন্তরঙ্গ নিম্নস্বরে বলল, 'যাঁদের কাছে পড়েছি তাঁদের আমি দেবীর মতই শ্রদ্ধা করি। আজ এমন জায়গায় নেমেছি যে তাঁদের নাম মুখে আনাই পাপ বলে মনে হয়। সুতরাং আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না।'

মিসেস মূর ক্ষুন্ন হলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের স্বজাতীয়দের প্রতি এতাদৃশ শ্রদ্ধা দেখে খুশীও না হয়ে পারলেন না।

আমিনা বলল, 'আমি যাই এবার। মনে হচ্ছে আপনাদের কোন জরুরী আলোচনার ভেতর এসে পড়ে ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। সুতরাং—'

'না, না, কিছুতেই না।'

চারিদিক থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল।

'এমন কোন কথা নয় বেগমসাহেবা।'

হুইটিং বুঝিয়ে দিলেন, 'আমাদের এক সার্জেন্ট ম্যাককার্থি আজ এইমাত্র কলকাতা থেকে এসে পৌঁচেছে। সে-ই সব খবর দিচ্ছিল। কতকগুলো বদমাইশ লোক নানারকমে কোম্পানির সঙ্গে শত্রুতা করছে।'

'কি রকম? কি রকম?' কৌতূহলে আমিনা সোজা হয়ে বসে, 'তাদের সাহস তো কম নয়। আজ কোম্পানিই তো তামাম হিন্দুস্তানের বাদশা। মুঘলরাও এমনভাবে পুরো দেশটা দখল করতে পারে নি। অতবড় শিবাজী মহারাজের বাদশাহি, তাও তো কোম্পানির হাতে—সেই কোম্পানির সঙ্গে দুশমনি করে এত সাহস কার?'

লেফটেনাণ্ট হুইটিং 'With your permission ma'am' বলে পাইপে তামাক ভরতে ভরতে জবাব দিলেন, 'কলকাতায় একটা বদমাইশের আড্ডা হয়েছে। ধর্মের নামে তারা প্রকাশ্যে বদমাইশি করে বেড়াচ্ছে। নাম দিয়েছে ধর্ম-মহাসভা।'

'ওঃ, ধর্ম!' অবজ্ঞার সুরে আমিনা বলে ওঠে, 'ধর্মের কথা আজকাল আর কে শুনছে!'

'না ম্যাম, ধর্মের কথা শোনে বৈকি। ওই সব অশিক্ষিত বর্বরদের কাছে এখনও ঐ শব্দটার মূল্য আছে। আর অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ঐ বদমাশ বেটারা নানা কথা রটনা করছে।...জানেন সেদিন কি হয়েছে? এক বেটা জাহাজী

লস্কর এসেছিল কলকাতার কিল্লায়—তেষ্টা পায় তার, এক সিপাহীর কাছে জল চেয়েছিল। জানেন তো সিপাহীদের ছুঁই-ছুঁই-এর ব্যাপার! সে লোটা করে আলগোছে ঢেলে দিতে চেয়েছিল কলাপাতার নল লাগিয়ে, তাতে লস্করটা একটু চটে যায়, বলে লোটাটা দাও, আমি জল ঢেলে খাচ্ছি। সিপাহী বলে, লোটা তোমার হাতে দিলে ও লোটা আমাকে ফেলে দিতে হবে। লস্করও গরম—বলে, লোটা মেজে নিও না হয়। সিপাহী তার জবাবে বলে যে, তোমার ছোঁয়া লোটা ঘরে নিলে আমার জাত যাবে। তখন লস্করটা জল না খেয়েই চলে যায়। বলে যায় যে, আমারই ভুল হয়েছিল তোমার কাছে জল খেতে চাওয়া। তোমার জল খেলে আমারই জাত যেত। তোমার আছে কি ! শুয়োরের চর্বি মুখে তুলেছ—যা নাকি মুসলমানেরও হারাম। তোমরা যে নতুন টোটা দাঁতে কেটে বন্দুক ভর—তার মোড়কে শুয়োরের চর্বি আছে জান না ?···সে লোকটা তো এই অনিষ্টটি করে দিয়ে সরে পড়ল, এখন তাই নিয়ে নাকি মহা হৈ-চৈ পড়ে গেছে।'

আমিনা এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মত অবিচল মুখে বসে শুনছিল, এখন তার অঙ্কিত ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করল, 'সত্যিই তাই আছে নাকি ?'

'আপনি কি পাগল হয়েছেন ম্যাম ? ওটা স্রেফ ওর বানানো কথা। রাগের মাথায় একটা শেষ কামড় দিয়ে যাওয়া—'

'তা আপনারা সে কথাটা জানিয়ে দেন না কেন ?' নিতান্ত ভালোমানুষের মত প্রশ্ন করে আমিনা।

'আর বলবেন না! সব জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্যে প্যারেডে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, কারুর কোন সন্দেহ আছে কি না। যারা সন্দেহ প্রকাশ করেছে তাদের নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে ও কাগজগুলো এমনিভাবেই তৈরি—তাতে চর্বি মাখাবার দরকার হয় না। আগুনে ধরে দেখানো হয়েছে যে সহজে পোড়ে না। কিন্তু কে কার কড়ি ধারে বলুন! কুসংস্কার এমনই জিনিস যা চোখকেও ঠিক দেখতে দেয় না, কানকেও ঠিক শুনতে দেয় না। ওরা যে উল্টোটা বিশ্বাস করবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে। ওদের কানে যে আগে থেকেই বিষ ছড়ানো হচ্ছে। ফলে ভেতরে ভেতরে নাকি গোলমাল বেড়েই চলেছে।'

'কারা এ বিষ ছড়াচ্ছে ? তাদের কী স্বার্থ ?' আমিনা আবারও সরলভাবে প্রশ্ন করে।

'কারা যে ঠিক করছে সেইটেই এখনও জানা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই কোন স্বার্থান্বেষী লোক আছে, যারা স্বপ্ন দেখছে যে, ইংরেজদের তাড়িয়ে দেশে আবার অরাজকতা আনবে—আর সেই সুযোগে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করবে। ওখানে ঐ ধর্ম-মহাসভাই খানিকটা কাজ করছে। আর এখানে এক মৌলবী—লক্ষ্ণৌ থেকে কাশী পর্যন্ত লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এদেরও পেছনে লোক আছে বেগমসাহেবা, এ আপনি নিশ্চিত জানবেন।'

আমিনা কথাটা নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের সুরে বলল, 'কারা আছে, তাদের খোঁজ করে ধরে ধরে লটকে দিলেই তো হয়!'

'মুশকিল কি হয়েছে জানেন ম্যাম, আমাদের বড়লাট বাহাদুর হয়েছেন বড়ই ভদ্রলোক। তিনি কেবলই ভাবেন যে, এই বুঝি ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হ'ল—ঐ বুঝি নেটিভরা মনে ব্যথা পেল। অবশ্য এবার নাকি তাঁর সুমতি হয়েছে। আপাতত ঐ মৌলবীটাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম হয়েছে।'

'ধরা পড়েছে সে ?'

আমিনার কণ্ঠে কি উদ্বেগের ইঙ্গিত ফুটে ওঠে ?

'না। লোকটা ভয়ানক ধূর্ত আর ধড়িবাজ। আজ তিন-চারদিন কেবলই আমাদের চোখে ধুলো দিচ্ছে। আসলে পুলিসগুলোও হয়েছে ফাঁকিবাজ, বুঝলেন না! নইলে একটা লোক—আর এতগুলো পুলিস! কি করে চোখে ধুলো দেয় বলুন তো!'

আমিনা ইশারায় একটা খিদমৎগারকে ডাকে। আবারও পানীয় পরিবেষণ চলে।

অবশেষে আমিনা হুইটিংকেই পুনশ্চ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, এদের—মানে মৌলবীদের পেছনে কারা আছে আপনি মনে করেন ?'

হুইটিং নীচু গলায় উত্তর দেন, 'আমার তো মনে হয়, মাফ করবেন বেগম-সাহেবা, কোন কোন দেশীয় রাজারা আছেন। নইলে টাকা যোগাচ্ছে কে ? We have not yet seen enough of them! এঁরা বড় সাংঘাতিক জীব। এঁদের শায়েস্তা করার জন্য ডালহৌসির মত ক্যালিবারের লোক দরকার।'

আমিনার চোখে নিমেষে বিদ্যুৎ খেলে গেল, কিন্তু তা নিমেষের জন্যই। যথাসম্ভব নিরাসক্তভাবেই সে বলল, 'কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে, এদের ভেতর যদি সে অসন্তোষ এসেই থাকে তো সেজন্য প্রধানত ঐ লর্ড ডালহৌসিই দায়ী। তিনি অকারণ বহু রাজাকে বা রাজপরিবারকে শত্রু করেছেন।'

'তা হয়তো করেছেন। কিন্তু তা না হলেও অসন্তোষ কিছু থাকতই বেগমসাহেবা, কে আর অল্পে খুশী থাকে বলুন! রাজত্ব থাকলেও স্বাধীন রাজাদের সুযোগ-সুবিধে তো তাঁরা ঠিক পেতেন না।'

'তা পেতেন না। তেমনি পেতেন নিরাপত্তা, পেতেন নিশ্চিন্ত আরাম।... না লেফটেনাণ্ট হুইটিং, এঁদের আপনারা বন্ধুরূপেই পেতে পারতেন—অন্তত অধিকাংশকেই।'

এই সময় মিসেস হুইটিং স্বামীর কাঁধে হাত রেখে ঘড়িটার দিকে দেখালেন। ঘরের চারিদিকেই ঘড়ি—ছোট বড় নানা আকার ও মূল্যের। প্রায় সব ঘড়িতেই একই সময়—বারোটা বাজে।

'বাই জোভ, এবার তো তা হলে উঠতে হয়।'

সকলেই উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আরও কিছুক্ষণ হাসি-তামাশা চলল—তার পর যথারীতি বিদায়-সম্ভাষণান্তে সাহেব-মেমরা সকলেই বিদায় নিলেন। রইলেন শুধু নানাসাহেবের অন্তরঙ্গ দু-চারজন লোক। কিন্তু নানাসাহেব ইঙ্গিতে তাদেরও দূরে থাকতে বলে আমিনার কাছে এসে বসলেন। তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি এই জন্যেই বাংলা মুলুকে গিয়েছিলে হুসেনী ?'

'হ্যাঁ জনাব, এই জন্যেই। আর এই জন্যেই হুসেনী মাঝে মাঝে টাকা টাকা করে আপনাকে বিরক্ত করে। নইলে তার নিজের প্রয়োজন সামান্যই। জানেন তো, আপনার এ বাঁদী কখনও কোন অলংকার চেয়ে নেয় নি আপনার কাছ থেকে।' হুসেনীর কণ্ঠে বিজয়-গর্ব চাপা থাকে না।

'হুসেনী, কিন্তু এ যে বড় সাংঘাতিক খেলা। ইংরেজ জাত সাপের চেয়েও খল, বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর।'

নানাসাহেবের ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছিল।

তা লক্ষ্য করে আমিনা নিজের রেশমী রুমালে নানাসাহেবের ললাট মুছে

নিয়ে বলল, 'মিছিমিছি এত বেশি ভাববেন না হিন্দুস্তানের ভাবী বাদশা ! সাপের মন্ত্র আছে—বাঘকেও ফাঁদে ফেলা যায়। তা ছাড়া, আপনার ভয় কি, আপনি তো কোন ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে যাচ্ছেন না। আপনাকে বাদ দিয়েই আপাতত চলুক না। দেখুন না, ঘটনা-স্রোত কোন্ দিকে নিয়ে যায় আমাদের !'

'কে জানে হুসেনী, বড় ভয় করে। একদিকে তুমি আর একদিকে আজিমুল্লা খাঁ—বন্ধু ও প্রেয়সী। দুজনে তোমরা একই দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছ আমাকে। জানি না এর পরিণাম কি। কোথায় ছিল এইসব বাঁদীর বাচ্ছা ভিখিরীর দল, ভেবে দেখ হুসেনী, সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এসে এত বড় মুঘল শক্তি, এত বড় মারাঠা শক্তি ভেঙে চুরমার করে দিল ! এদের সঙ্গে তোমরা পারবে ?'

'এরা কিছুই ভাঙে নি পেশোয়াজী ! মুঘল শক্তি আর মারাঠা শক্তি নিজেদের পাপের ভারে নিজেরাই ভেঙে পড়েছে। তেমনি এদেরও পাপের ভরা পূর্ণ হয়ে এসেছে। এরাও যাবে। আপনি তো কিছু কিছু ইতিহাস পড়েছেন জনাব, রোম সাম্রাজ্যের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। সারা দুনিয়ার অর্ধেকটাই নাকি তাদের ছিল। সে শক্তিও থাকে নি। কিছুই চিরকাল থাকে না। আমরাও থাকব না। এত ভয় কিসের ? ভেবে দেখুন, শিবাজী মহারাজ কয়েকজন লোক নিয়েই আলমগীর বাদশার শক্তির অহঙ্কার চূর্ণ করেছিলেন। আপনি সেই দেশেরই লোক, সেই জাতিরই নেতা। আপনার সাহস এত কম, উচ্চাশা এত অল্প !'

নানাসাহেব লজ্জিত বোধ করলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হুসেনী, তুমি আমার ঋণ বাড়িয়েই দিচ্ছ ! তুমিই ঠিক আমার সহধর্মিণী হবার উপযুক্ত, ভাগ্যদোষে মুসলমানের ঘরে গিয়ে পড়েছিলে।'

এইবার তাঁর অন্তরঙ্গরা যেখানে চক্রাকারে বসে আড্ডা জমিয়েছিল, নানা সেই দিকে রওনা হলেন। আমিনা কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, 'ঠিকই ধরেছ পেশোয়া, ভাগ্যদোষই বটে, তোমারও—আমারও !'

তার পর যেমন নিঃশব্দে এক সময় তার আবির্ভাব ঘটেছিল, তেমনিই নিঃশব্দে এক সময় সে অন্তর্হিত হ'ল।

॥ ৮ ॥

মীরাটে এসেও হীরালাল মামার হাত থেকে অব্যাহতি পেল না। কারণ ভাগ্য বিরূপ। মৃত্যুঞ্জয় অফিসে গিয়ে দেখলেন যে, কোন এক অজ্ঞাত কারণে মেজর সাহেবের মেজাজ গরম হয়ে আছে। মৃত্যুঞ্জয়ের আভূমিনত সেলামেও তাঁর ভ্রূকুটি সরল হ'ল না—এমন কি ঘর থেকে আনা আমসত্ত্ব ও মোরব্বা বার করে সামনে রাখতেও বিশেষ কোন সুফল পাওয়া গেল না। মুখটা যেমন মেঘাচ্ছন্ন ছিল তেমনিই রইল।

বেগতিক দেখে মৃত্যুঞ্জয় কথাটা সেদিন পাড়তে সাহস করলেন না। ফলে বাসায় ফেরবার পর ঝালটা সম্পূর্ণ পড়ল এসে হীরালালের ঘাড়েই।

'অপয়া, অপয়া, ছোঁড়াটা বিশ্ব-অপয়া ! জান হে মুখুয্যে, সকালে উঠে ছোঁড়ার মুখ দেখলে হাঁড়ি ফাটে !'

মুখুয্যে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ ছোঁড়া ?'

'কে আবার—আমার ঐ গুণধর ভাগ্নে! এই তো এতদিন চাকরি করছি, বাড়ি থেকে আমসত্ত্ব এনে দিলে মুখে হাসি ফোটে না সায়েবের, এ তো আমি কখনও দেখি নি রে বাবা!...মুখে যেন গেরন লেগে আছে। মনে হচ্ছে যেন সাতখানা নুনের জাহাজ ডুবে যাবার খবর পেয়েছে!'

'না হে গাঙ্গুলী, বোঝ না। এর ভেতর ঢের ব্যাপার আছে!'

'ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু। এবার বেরিয়ে-ইস্তক এই ব্যাপার চলেছে!'

'কেন, পাঁজি দেখে বেরোও নি?'

'তা কেন বেরোব না! তাতে কি হবে। মূর্তিমান অযাত্রা যে আমার সঙ্গে। সারা পথ জ্বলেছি ছোঁড়ার জন্যে—এখানে পৌঁছেও তো এই। চাকরি যা হবে তা তো বুঝেছিই—ঢু ঢু—অষ্টরম্ভা! এখন বসে থাক্ আমার ঘাড়ে—বিধবা মেয়ের মত আর কি! অদেষ্টে যা আছে তাই হবে তো। আমি কি করব! শালাটাকে আনলে এ সব কিছু হ'ত না। তাদের এখন দিন ভাল চলেছে। মাঝখান থেকে হ'ল এই যে, গিন্নী রইলেন বেঁকে—আমাকে জব্দ করবার জন্যে অর্ধেক মাল পাচার করে দেবেন বাপের বাড়িতে—সে আর দেখতে হবে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা আমার, তা কি দুখ-দরদ করবে ভেবেছ? রামচন্দর! মেয়েমানুষ জাতটাই এমনি নেমোখারাম!'

এক নিশ্বাসে ভাগ্নে থেকে শুরু করে বিশ্বের তাবৎ স্ত্রীলোকের সদ্গতি করে, বোধ করি বা নিশ্বাস নেবার জন্যেই, মৃত্যুঞ্জয় থামলেন। হীরালালের এতদিনে অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল, পথে আসতে আসতে বহুবারই সে পাতালে-প্রবেশের প্রাক্কালে সীতা দেবীর মনোভাবটা উপলব্ধি করেছে, কিন্তু তবু আজকের এই অপমানটা তার গলাধঃকরণ করা কঠিন হয়ে পড়ল। কোনমতে দাঁতে দাঁত চেপে কান্নাটা দমন করল এবং সকলের অলক্ষ্যে দু ফোঁটা অবাধ্য অশ্রু উত্তরীয়ের প্রান্তে মুছে ফেলল। পথে যাদের সামনে অপমানিত হয়েছে তারা মুসাফির—তা ছাড়া অধিকাংশই অ-বাঙালী। তাদের সঙ্গে জীবনে আর হয়তো কখনও দেখাই হবে না। এখানকার কথা আলাদা। কমিসারিয়েটে যতগুলি বাঙালী কাজ করেন প্রায় সকলেই থাকেন এই বাসায়। কেউ কেউ রেঁধে খান, কিন্তু বেশির ভাগই মেস করে বাস করেন—কনৌজী পাচক আছে একজন—সে-ই রেঁধে দেয়। যদি সত্যিই হীরালালের চাকরি হয় তো তাকেও এখানে থাকতে হবে—এঁরা সকলেই দীর্ঘদিনের নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবেন। তাঁদের সামনে, বলতে গেলে প্রথম পরিচয়েই, এই ধরনের অপমানে চোখে জল আসবারই তো কথা।

মুখুয্যে এতক্ষণে কথা বলবার সুযোগ পেয়ে বললেন, 'ওহে, ব্যাপারটা আগে শোনই না।...কলকাতায় কি-সব গোলমাল বেধেছে—সেপাইরা নাকি গোলমাল করছে। এধারে লক্ষ্ণৌ ফৈজাবাদেও এক মৌলবী নাকি সেপাইদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে।...মেজর সায়েব মনে করেন যে, একটা বড় রকমের হাঙ্গামা বাধা বিচিত্র নয়।...আসলে তাইতেই মেজাজ খারাপ।...ভয়, বুঝলে গাঙ্গুলী, ভয়!'

'হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা, সায়েবদের আবার ভয়!'

'যা বলছি শোন না—বাবারও বাবা আছে, কটা সায়েব আছে বল তো এদেশে! জোর তো এই সব সেপাইদেরই।'

'দেশ থেকে গোরা আনবে রে বাবা। জাহাজ জাহাজ গোরা আনিয়ে ফেলবে —এই এত্ত বড় বড় জাহাজ বোঝাই করে।' মৃত্যুঞ্জয় বোধ করি জাহাজের আকৃতিটা বোঝাতেই দু হাত বিস্তার করে অনেকখানি শূন্য দেখালেন।

'তা হলে তো কথাই ছিল না। আসল কথা হচ্ছে কি, এইসব সাহেবরা যারা সেপাইদের সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ করে, তারা যতটা ভয় পেয়েছে বড় সাহেবরা তত ভয় পায় নি। সেই তো হয়েছে বিপদ। কাল সকালেই মেজর সাহেব জেনারেলের কাছে কথাটা পাড়তে গিয়েছিলেন, জেনারেল হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাতেই সাহেবের মেজাজ অত গরম ছিল।'

'দেবেই তো, দেবেই তো, হেসে উড়িয়ে দেবারই তো কথা। দিশি সেপাই, সায়েব দেখলে যাদের কাপড় নোংরা হয় তারা করবে গোলমাল গোরাদের সঙ্গে, তুমি ক্ষেপেছ মুখুয্যে!'

'কে জানে ভাই, ওরাই যখন ভয় পাচ্ছে—'

'মেনিমুখো—ওরা সব মেনিমুখো! আসলে আমাদের এই মেজরটি হয়েছেন পয়লা নম্বরের গাড়ল।'

তার পরই প্রচণ্ড এক হাই তুলে ভাগ্নের উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়লেন—'কৈ হে নবাবপুত্তুর, দয়া করে একটু সন্ধ্যা-আহ্নিকের যোগাড় করে দেবে, না কি সেটাও নিজেকে করে নিতে হবে? কুঁড়ে-পাতর গেলবার সময় তো দুনো খোরাক উসুল কর—একটু গতর নাড়তে পার না?'

'কি কর গাঙ্গুলী!' ওদিক থেকে চৌধুরী মৃদু ধমক দিলেন—'খামকা এসে ইস্তক ছেলেটাকে খিঁচোচ্ছ কেন?'

বয়োজ্যেষ্ঠ শুধু নয়—মাইনেও পান মোটা। এ বাসায় চৌধুরীর প্রতিপত্তি বেশি। সুতরাং তখনকার মত মৃত্যুঞ্জয় চুপ করে যেতে বাধ্য হলেন।

পরের দিনও মেজরের মুখের মেঘ কাটল না। কিন্তু আর কতকাল অপেক্ষা করা চলে! অগত্যা আম্‌তা আম্‌তা করে বারকতক ঘাড় চুলকে মৃত্যুঞ্জয় কথাটা পেড়েই ফেললেন, 'সার, ইয়োর অনার, মাই নেফিউ সার, মাই সিস্টারস্ সন!'

'ইয়োর—হোয়াট?' সাহেব যেন গর্জন করে উঠলেন।

সে গর্জনে সামান্য ইংরেজী বিদ্যে যেটুকু জানা ছিল তাও মৃত্যুঞ্জয় ভুলে গেলেন, ওখানের এই দারুন শীতেও তাঁর গায়ে ঘাম দেখা দিল। ঢোক গিলে বললেন, 'ইয়োর অনার বাত দিয়া থা হুজুর—একঠো নোকরি, আই মিন সার্ভিস, দেগা। মেরা বহিন্‌কি লেড়কা—মা-বাপ কোই নেই হ্যায়—আপনি মা-বাপ হ্যায় হুজুর।'

'শাট আপ! নেহি মাংতা—কোইকো নেহি মাংতা। নেটিভ আউর নেহি লেঙ্গে। বেইমান কাঁহেকা—তুম লোগ সব বেইমান হ্যায়। কোইকো নোকরি আউর নেহি দেঙ্গে—যাও হিঁয়াসে, ভাগো!'

খরচ কম হলেও মাসে তিন-চার টাকা। ভাগ্নেকে বসে খাওয়াতে হবে নাকি?

মৃত্যুঞ্জয় মরীয়া হয়ে আবারও কি বলতে গেলেন। কিন্তু মেজর সাহেব এবার একেবারে অগ্নিমূর্তি—চীৎকার করে উঠলেন, 'গো টু হেল, ডু ইউ হিয়ার —ড্যাম্‌ড্ সোয়াইন! ফিন বাত বোলনেসে জুরমানা কিয়া যায়গা—ভাগো হিঁয়াসে।'

মৃত্যুঞ্জয় কাঁপতে কাঁপতে বার হয়ে এলেন। বুঝলেন কলিতে স্ত্রীই গুরুজন—তার কথাটা ঠেলা ঠিক হয় নি। শ্যালককেই আনা উচিত ছিল।

সেদিন রাত্রে মৃত্যুঞ্জয় দাঁতে কুটোটিও কাটলেন না—হীরালালের তো কথাই ওঠে না। চৌধুরী, মুখুয্যে, ঘোষাল—অনেকেই অনুরোধ করতে এলেন কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় জলস্পর্শ করলেন না। হীরালালের কিছু একটা ঘাড়ে দশটা মাথা নেই যে, সে-ক্ষেত্রে সে একা আহারে বসবে। আগে হলে চৌধুরীই ভরসা দিতেন—'চাকরির জন্যে ভাবনা কি, সে হয়ে যাবে'খন', কিন্তু গত কয়েকদিন অফিসের হাওয়াটা তেমন ভাল লাগছে না। তিনি কোন আশ্বাসই দিতে পারলেন না।

এর পরেরও দু-তিনটে দিন হীরালালের যেভাবে কাটল তার বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক। পাঠক-পাঠিকারা যতটা পারেন কল্পনা করুন, তবুও অনেকখানি পেছনে পড়ে থাকবেন—এটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকব। শেষ অবধি তৃতীয় রাত্রিও বিনিদ্র কাটবার পর হীরালাল সংকল্প করল—সে গঙ্গাতে প্রাণ দেবে। চুপিচুপি এই দু-তিন ক্রোশ রাস্তা হেঁটে গড়মুক্তেশ্বর যাবে এবং সেখানেই গঙ্গাতে ঝাঁপ দিয়ে মরবে। তার অদৃষ্টে এই মৃত্যু আছে—তাই মা-গঙ্গা পূর্বেই টেনেছিলেন। মাঝখান থেকে ঐ রমণী তাকে বাঁচিয়ে ঘটনাটা অনর্থক বিলম্বিত করল। লাভের মধ্যে এই কয়েকদিন অতিরিক্ত কষ্টভোগ।

সে চতুর্থ দিন প্রত্যুষে সেই সংকল্প মতই খালি পায়ে আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে বের হয়ে পড়ল। গড়মুক্তেশ্বর কোন্ দিকে তা সে জানে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে নিতে পারবে। আপাতত সে পথে পড়ে যে-কোন একদিকে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। বাসা ও মামার কাছ থেকে আগে অনেকটা দূরে যাওয়া আবশ্যক।

কিন্তু কিছুদূর যাবার পরেই এক বাধা।

লক্ষ্য করল একটা এক্কা তার পেছনে ছুটে আসছে এবং সে এক্কার একমাত্র আরোহী বোধ হয় তাকেই লক্ষ্য করে কি বলছে।

প্রথমে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল—মামা নয় তো ?

পরেই ভুল ভাঙল। এর মাথায় টুপি আছে। লোকটা এদেশীয় কেউ হবে। মামা তো শামলা আঁটেন মাথায়। সে দাঁড়িয়ে গেল।

এক্কা কাছে এসে থামতে আরোহী নেমে এসে বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রশ্ন করল, 'তুমি কি বাঙালী ?'

লোকটি এদেশীয়ই। তবে সাধারণ বেশভূষা, কম-দামী ধুতি ও পিরান পরনে—অর্থাৎ হোমরা-চোমরা কেউ নয়।

হীরালাল মাথা নেড়ে জানাল যে, সে বাঙালীই বটে।

লোকটি হেসে বলল, 'নাঙ্গা শির দেখে তাই আন্দাজ করেছি—তেলেঙ্গী নয় তো বাঙালী! তা তেলেঙ্গী আর এদেশে কোথায় এত। আচ্ছা, এখানে বাঙালীদের একটা বাসা আছে কোথায় চেন ?'

হীরালাল যথাসাধ্য হিন্দীতেই কথাবার্তা চালাল। সে বলল, 'চিনি।'

'তুমি কি সেখানে থাক ?'

'থাকি।'

'হীরালাল চাটারজি বলে এক ছোকরা সেখানে এসেছে ?'

হীরালাল তো স্তম্ভিত। তার খোঁজে আবার কার প্রয়োজন পড়ল ? তাকে

এখানে চেনেই বা কে ? কেমন একটা ভয়ও হ'ল মনে মনে।

এধারে তাকে নিরুত্তর দেখে লোকটি পুনশ্চ প্রশ্ন করল, 'কি, জান নাকি ?'

শুষ্ক ওষ্ঠে একবার জিহ্বা বুলিয়ে নিয়ে হীরালাল জবাব দিল, 'আমারই নাম হীরালাল।'

'চ্যাটার্জি ?'

'হ্যাঁ।'

'সোহি শোচা থা। কেঁও কি অয়সাই উমর হোগা—বাতা দে গিয়া।'

'কিন্তু কে—মানে—আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, কৈ আমাকে তো এখানে কেউ চেনে না।'

'কানপুর থেকে খবর এসেছে বাঙালীবাবু। একঠো জরুরী চিঠি আছে। হুসেনী বেগমকে চেন ?'

'বেগম-টেগম কাউকে আমি চিনি না। নিশ্চয় ভুল হয়েছে।'

'উঁহু, ভুল হয় নি। তোমার চেহারাও মিলে যাচ্ছে। ভাল করে ভেবে দেখ।'

অকস্মাৎ বিস্মৃতির মেঘ কেটে গেল ; তার রহস্যময়ী প্রাণদাত্রী—হ্যাঁ, হ্যাঁ—এই রকমই কী একটা যেন নাম বলেছিল সে। সে কি তার ঋণের বদলে কিছু চায় ? মন্দ কি—মরণের আগে ঋণটা শোধ করে মরতে পারবে।

'হুসেনী বিবি একজনকে চিনি বটে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওই। যে হুসেনী বিবি সে-ই হুসেনী বেগম। তিনি এই চিঠিটা তোমাকে দিতে বলেছেন। বলেছেন যে, তোমার এখানে কমিসারিয়েটে চাকরি পাবার কথা। যদি কোন কারণে না পাও তো এই চিঠি যার নামে আছে সেই সাহেবকে দিও—চাকরি মিলবে।'

খামে মোড়া একখানা চিঠি সে পিরানের জেব থেকে বার করে হীরালালের হাতে দিল। তার পর বলল, 'ব্যস, আমার কাজ খতম। যদি কিছু বকশিশ দেবার থাকে তো দিতে পার।'

দাঁত বার করে লোকটা হাসল একবার—কাষ্ঠ হাসি।

বিব্রত হীরালাল বলল, 'কিন্তু আমি তো···আমার কাছে তো এখন কিছুই নেই !'

মা রাহাখরচের টাকা বলে মামার হাতেই কয়েকটা টাকা দিয়েছেন। আর গোপনে দিয়েছেন তার হাতে মাত্র দুটি টাকা, কিন্তু সেও তো তার পুঁটুলিতে কাপড়ের সঙ্গেই বাঁধা আছে।

'হ্যাৎ তেরি বেশরম বাংগালী !'

অবজ্ঞাসূচক স্বরে কথা কটা বলে সে লোকটা আবার একায় উঠে বসল এবং একা ঘুরোতে বলে নিজেও মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মামার অপমানের কাছে এ অপমান তুচ্ছ। তবু জাতিগত ধিক্কারে হীরালালের তরুণ রক্ত গরম হয়ে উঠল। কিন্তু একা এই অপরিচিত জায়গায় সে কী-ই বা করতে পারে। বিশেষত দোষ তো তারও কিছু আছে। সুসংবাদ বহন করে আনলে পুরস্কৃত করাই নিয়ম।

মোদ্দা হীরালালের আর মরা হ'ল না। কে এক অপরিচিতা তরুণী, অজ্ঞাতকুলশীলা—নিয়তির মত বার বার তার জীবন রক্ষা করছে ! সে যে-ই হোক—মনে মনে সেই দেবী-স্বরূপিণীকে সে হাত জোড় করে নমস্কার জানাল।

বাসায় পা দিতেই মামা যেন বোমার মত ফেটে পড়লেন, 'বলি কোথায়—কোথায় যাওয়া হয়েছিল নবাবপুত্তুরের, তাই শুনি। তোমার দ্বারা কি আমার এক কড়ার উপকার হবে না? সকালবেলাই উধাও! হাওয়া খেতে গেছলে নাকি সায়েবদের মত? তাও তো পারলে বুঝতুম! মেজর সাহেব ভোরবেলা যখন হাওয়া খেতে বেরোয়, তখন তার পায়ের কাছে গিয়ে সটান উপুড় হয়ে পড়লেও তো একটা কাজ হয়। দেখ বাপু, এই সাফ বলে দিলুম, চাকরি-বাকরি যদি না হয় তো ঐ রসুয়ে ঠাকুরের কাছে থেকে রান্নাবান্নাটা শিখে নাও। খোরাকি ছাড়া মাসে দু টাকা মাইনে—কম যাচ্ছে না তো! সেটাই না হয় রোজগার কর।'

আজ কিন্তু হীরালাল মাথা হেঁট করল না। সাহসে ভর করে চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরে কোনমতে ঢোক গিলে বলে ফেলল, 'চাকরি বোধ হয় হবে।'

হীরালাল যে কোন দিন তাঁর বকুনির পর উত্তর দিতে পারবে, এটা মামার স্বপ্নেরও অগোচর। তা ছাড়া তিনি কথাটা ঠিক বুঝতেও পারলেন না। খানিকটা হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তার মানে? তার মানে কি বাপু?'

'এই চিঠিখানা যাঁর নামে আছে, তাঁকে দিলে বোধ হয় আমার চাকরি হবে।'

'এ কার নামে চিঠি? তোমাকে কে দিলে?'

কিন্তু মামা হাত দেবার আগেই চৌধুরীমশাই চিঠিটা টেনে নিলেন, 'এ কি! এ যে খোদ জেনারেল সাহেবের নামে দেখছি। লিখেছেও তো সাহেব কেউ—এমন জড়ানো লেখা তো নেটিভ কারুর নয়! কে দিয়েছে এ চিঠি বাবা হীরালাল?'

হীরালালের ঠিক এতখানি হাটের মাঝে কথাটা বলবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মামাই জেরার পর জেরা করে অস্থির করে তুললেন। তখন সব কথাই খুলে বলতে হ'ল—শুধু আত্মহত্যার সংকল্পটা বাদ রইল।

মামার মুখে এতক্ষণ পরে সকৌতুক হাসি ফুটে উঠল। তিনি মুখুয্যের দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন, 'বলি ভাগ্নের আমার চেহারাটি তো খারাপ নয়। একে খুবসুরত চেহারা, তায় কাঁচা বয়স—মোচলমান মাগী ঢলেছে আর কি! তা মন্দ কি, এই ফাঁকে যদি গুছিয়ে নিতে পারিস তো নে! তবে ওরা সব কাঁচাখেগো, দেখো যেন জাতকর্ম খুইয়ে বসে থেকো না!'

লজ্জায় হীরালালের মুখখানা আবীরের মত রাঙা হয়ে উঠল। তার চেহারাটা সত্যিই ভাল। দীর্ঘ গঠন, গৌর বর্ণ এবং কৈশোরে নিয়মিত ভাবে আখড়াতে গিয়ে কসরৎ করার ফলে—এই বয়সেই পেশীগুলো সুগঠিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতগুলো বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের সামনে গুরুজনের মুখে এই ধরনের ইঙ্গিত শুনে তার মনে হ'ল—এ চেহারাটা কোথাও গোপন করতে পারলে সে বেঁচে যেত। তা ছাড়া, সেই দেবী সম্বন্ধে—অন্তত হীরালালের অন্তরলোকে সে মহিলা দেবীর আসনেই অধিষ্ঠিতা—এ ধরনের কটূক্তিতে সে একটু ব্যথাও অনুভব করল।

'কিন্তু চিঠিটা কে দিয়েছে—কী লেখা আছে ওতে, তাও তো জানা গেল না।' মুখুয্যেই কথাটা তুললেন।

'লেফাফাটা যে আঁটা রয়েছে।'

'তাতে কি। দাও, আমি খুলে দিচ্ছি।' ঘোষাল হাতটা বাড়িয়ে দিলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে ভাতের হাঁড়ির ভাপ লাগিয়ে সুকৌশলে খামখানা খুলেও ফেললেন।

জড়ানো জড়ানো লেখা। কোনমতে এইটুকু বোঝা গেল—কানপুর গ্যারিসনের কোন সাহেব এখানকার জেনারেল সাহেবের কাছে জনৈক হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের চাকরির জন্য সুপারিশ করেছেন।

সকলেই নিশ্চিন্ত হলেন। খামখানিও বেমালুম আবার জোড়া হল। এখন কথা উঠল—জেনারেলের কাছে নিয়ে যাবে কে? এবং ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেলে মেজর সাহেব যদি মৃত্যুঞ্জয়ের কোন অনিষ্ট করেন!

অনেক যুক্তির পর স্থির হল চৌধুরী পরদিন ভোরবেলা নিয়ে গিয়ে দূর থেকে জেনারেল সাহেবকে দেখিয়ে দেবেন এবং হীরালাল সেলাম করে চিঠিখানা তাঁর হাতে দেবে। আপাতত মৃত্যুঞ্জয়ের পরিচয় দেবার কোন কারণ নেই। জেনারেল সাহেব ভোরবেলা ঘোড়ায় চড়ে নদীর দিকে বেড়াতে যান—সেই সময় তাঁকে ধরাই সমীচীন।

অনেক দিন পরে হীরালাল ভাল করে আহার করল এবং মামা অফিস চলে গেলে প্রাণভরে দিবানিদ্রা দিল। মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু মনে মনে অপ্রসন্ন হয়েই রইলেন। ভাগ্নের চাকরি পাওয়ার ষোল আনা কৃতিত্বটা তাঁর রইল না, বরং ভাগ্নের দিকেই বেশিটা পড়ল—এটা মনে করে তিনি একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তবে শেষ পর্যন্ত এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন, 'আমি সঙ্গে করে না নিয়ে এলে তো আর ঐ মাগীর সঙ্গে পরিচয় হত না।'

॥ ৯ ॥

মুনশী কালকাপ্রসাদ কিছুদিন থেকেই বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। চিন্তার এমন কোন কারণ নেই—যতই তিনি একথা মনকে বোঝাতে চেষ্টা করেন মন ততই বেশি করে চিন্তা করে। আজ কয়েক দিন হল তিনি সে চেষ্টাই ছেড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ ভেবেই চলেছেন আকাশ-পাতাল।

চিন্তার কারণটা প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় কি?

কালকাপ্রসাদ নামকরা ব্যবসাদার গ্রীনওয়ে সাহেবের মুনশী। পদটা এমন কিছু গৌরবের নয়—মূল্যবান তো নয়ই। তবু সাধারণ লোক ঠিক মুনশী শব্দটার সম্যক্ অর্থ অবগত না থাকায় এবং একজন হোমরা-চোমরা সাহেবের সঙ্গে পদাধিকারটা জড়িয়ে থাকায় প্রায় সকলেই কালকাপ্রসাদকে সম্ভ্রমের চোখে দেখত। বাজারে তিনি ধার পেতেন প্রচুর এবং মহাজনরা তাগাদা করতে সাহস পেত না। যেখানে তিনি যেতেন সেখানেই সকলে তাঁকে সম্মানের আসনটি ছেড়ে দিত। এই পদাধিকার বলেই তিনি এই বয়সে রামশঙ্করের সর্বাঙ্গসুন্দরী দশমী কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পেরেছেন। তিনটি স্ত্রী বিদ্যমানে এমন সুন্দরী কন্যা তাঁকে কে দিত!

কিন্তু এখন সেই সম্পদই দায় হয়ে দাঁড়াল যে! কেউ মুখে কিছু বলে না, কিন্তু তাদের চোখে চোখে চাপা সেই অবজ্ঞার আভাস পান। হয়তো বা কিছু বিদ্রূপও। গুজব কানে আসে প্রায়ই। কিন্তু খোদ সাহেব সে-কথা আলোচনা করেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করারও সাহস নেই কালকাপ্রসাদের। পথের লোকের সঙ্গে কিছু এসব আলোচনা করা যায় না। সাধারণ মানুষের মতো যাকে-তাকে জিজ্ঞাসা করতে সম্ভ্রমে বাধে। বিশেষত লোকে তাঁর কাছ থেকেই খবরটা আশা করে। হাজার হোক, সাহেবের মুনশী!

সুতরাং চিন্তিত না হয়ে উপায় কি।

কয়েকদিন ধরে ভেতরে ভেতরে ছট্‌ফট করলেন ভদ্রলোক। তার পর আর ধৈর্য ধরতে না পেরে একদিন ভোরবেলাই রওনা হয়ে গেলেন বন্ধু কানহাইয়া-লালের বাড়ি। কানহাইয়ালাল বহুদিনের বন্ধু—তার কাছে অত লজ্জা-শরম করার প্রয়োজন হবে না।

কালকাপ্রসাদ যখন রওনা হলেন তখনও ভাল করে ফর্সা হয় নি। পথে বিশেষ লোকজনও চলছে না। সারারাত দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় নি বলে একটু বেশী সকালেই উঠে পড়েছেন, তখনও পর্যন্ত রাস্তায় এক্কা চলতে শুরু করে নি। কিন্তু কালকাপ্রসাদ সেজন্য পিছপা হলেন না—প্রয়োজন হলে সারা পথটাই হেঁটে যেতে পারবেন তিনি, সে শক্তি—বলতে নেই ভগবান বজরঙ্গবলীর আশীর্বাদে এখনও তাঁর আছে। নইলে তিনটি স্ত্রীর ওপর আর একটির পাণি-গ্রহণ করতে সাহস করতেন না। তিনি বেশ জোরে জোরেই পা চালালেন।

অবশ্য বেশী দূর তাঁকে যেতে হল না। নবাবগঞ্জের প্রান্তে পীর সাহেবের আস্তানা, তার ধারেই একটা এক্কার আড্ডা। দূর থেকে দেখা গেল—তত ভোরেই একখানা এক্কা প্রস্তুত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। এতটা পথ হাঁটবার সংকল্প করা আর হাঁটা এক কথা নয়। এক্কা দেখেই কালকাপ্রসাদের গতি মন্থর হয়ে গেল।

এক্কাওয়ালা আলিজান মিয়া পরিচিত লোক। সে এই অঞ্চলে আজ ত্রিশ বছর এক্কা চালাচ্ছে—এখানকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের সকলেই চেনে। দূর থেকে কালকাপ্রসাদকে দেখে সে-ও এক্কা নিয়ে এগিয়ে এল, 'সেলাম আলায় কম—মুনশীজী, কঁহি চলনা হ্যায় কেয়া ?'

কালকাপ্রসাদও জবাবে 'আলায়কম্ সেলাম' জানিয়ে একেবারে এক্কায় চড়ে বসলেন এবং কানহাইয়ালালের বাড়িতে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে পুনশ্চ গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

কিন্তু আলিজান তাঁকে বেশীক্ষণ চিন্তা করতে দিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ি চালাবার পরই মৃদু কেসে গলাটা সাফ করে নিয়ে ডাকল, 'মুনশীজী !'

কালকাপ্রসাদ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। সারারাত বিনিদ্র কাটাবার পর হয়তো বা ভোরাই হাওয়াতে, চিন্তার ভেতরেই একটু তন্দ্রা এসেছিল। তিনি চমকে প্রশ্ন করলেন, 'কি ? কী হয়েছে ?'

'না, কিছু হয় নি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব যদি গোস্তাকি না ধরেন !'

'কী কথা ?'

মুখে প্রশ্ন করলেও কথাটা অনুমান করতে দেরি হল না কালকাপ্রসাদের। এই তো—এখানেই তো একটা উপায় হয়ে গেল।

আলিজান আরও একটু ইতস্তত করে বলল, 'কী সব গুজব শুনছি মুনশীজী—এসব কি সত্যি ?'

'গুজবটা কী শুনেছ আগে তাই বল—তবে তো বুঝব !' তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই যেন কথাটা বলেন কালকাপ্রসাদ।

আলিজান মিয়া উৎসাহিত হয়ে বলল, 'শুনছি নাকি আংরেজদের শাহি আর থাকবে না ? সিপাইরা নাকি খুব গরম হয়েছে। শুনেছি বিলায়েত থেকে ওখানকার বাদশা-বেগমের হুকুম এসেছে ফৌজের সবাইকে ইসাই* করতে হবে। সেই হুকুম মোতাবেক এখানে গরু আর শুয়োরের চর্বি খাইয়ে নাকি রাতারাতি

* ইসাই—ইসার মতাবলম্বী ; খৃস্টান। যীশু মুসলমানদের কাছে ইসা রূপেই

হিন্দু মুসলমান সবাইকার জাত মারবার চেণ্টা হয়েছিল—একটুর জন্যে নাকি সব বেঁচে গেছে ? তাইতে সব সিপাই খাপ্পা হয়ে উঠেছে—আংরেজশাহি ঘুচিয়ে দিয়ে মুঘল বাদশার হাতে আবার বাদশাহি ফিরিয়ে দেবে—এসব কি সত্যি ?'

কালুকাপ্রসাদ হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'গুজবটা যারা ছড়িয়েছে তাদের মাথা আছে—মানতেই হবে। ওহে বাপু, দেশের বাদশাহিটা কি এই সব সিপাইরা হাতে করে তুলে দিয়েছিল আংরেজদের হাতে যে, এখন ইচ্ছে করলেই ফিরিয়ে নেবে ? আংরেজরা নিজেদের হিম্মতে কেড়ে নিয়েছে। একটা আংরেজ একশটা সিপাইর মহড়া নিতে পারে—তা কি জান না ? সিপাইরা লড়বে আংরেজদের সঙ্গে—পাগল আর কি !'

একটা পরিপূর্ণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আলিজান বলল, 'বাঁচলাম বাবুজী। খবরটা শুনে পর্যন্ত আমার ভাবনায় ঘুম হচ্ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, আংরেজদের হাতে শাহি পড়ে তবে একটু শান্তির মুখ দেখেছি। আবার কি হবে—কার হাতে মুলুক যাবে—এই সব ভেবে বড়ই অশান্তি হচ্ছিল—আমার তো বয়স কম হল না বাবুজী, চার কুড়ি হতে চলল—অনেক দেখলাম। আমি তো বেরিলীর লোক—রোহিলা-নবাবদের রাজত্বে বাস করেছি। বলতে গেলে কানপুর শহরে পালিয়ে এসেছিলুম। জোর যার মুলুক তার—এ সবাই জানে। কিন্তু একজন জবরদস্ত বাদশার শাসনে থাকা ঢের সুবিধে, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়—তাই না বাবুজী ?'

কালুকাপ্রসাদ সত্যিই মনে খানিকটা বল পেলেন। হোক না সামান্য এক্কাওয়ালা—এরাই তো দেশের সাধারণ লোক। এর মনোভাব নিশ্চয়ই আরও অনেকের মনোভাব।

তিনি কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই, একশবার।'

আরও খানিকটা নিঃশব্দে এক্কা চালাবার পর আলিজান বলল, 'আচ্ছা, ও ইসাই করবার খবরটা তা হলে বিলকুল ঝুট্—কি বলেন ?'

'বিলকুল !'

উৎসাহিত হয়ে আলিজান বলল, 'তাই তো আমিও বলি মুনশীজী, এত বড় জাত, এত এলেমদার লোক ওরা—ওরা কি এমন দুশমনি করতে পারে রায়তদের সঙ্গে ? তা হলে আল্লা ওদের এত বড় করবেন কেন ?...আসল কথাটা কি জানেন, ঐ ইসাই করবার খবরটা শুনেই একটু দমে গিয়েছিলুম।'

কালুকাপ্রসাদ বেশ জোর দিয়েই বললেন, 'ওসব কতকগুলো মতলববাজের কাণ্ড, বুঝলে না ?—ওসব গুজবে কান দিও না।'

কানুহাইয়ালাল দীক্ষিতও কিছু চিন্তিত মুখেই বসে ছিলেন। এমন কি গুড়গুড়িতে তামাকটা যে বৃথা পুড়ে যাচ্ছে, সেদিকেও তাঁর খেয়াল ছিল না। এখন অকস্মাৎ কালুকাপ্রসাদকে দেখে যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন।

'আরে এস এস কালুকাপ্রসাদ, ঠিক তোমার কথাই ভাবছিলুম।'

পরিচিত। পশ্চিমা মুসলমানদের কাছে খৃষ্টান শব্দটি তত প্রচলিত নয়। ইসাহী বা ইসাই শব্দটিই বহুল-ব্যবহৃত। 'নাসারা'ও বলেন কেউ কেউ—যীশু নাসরতের লোক বলেই বোধ হয় (Jesus of Nazareth)।

'কেন বল তো—ব্যাপার কি ?' কাল্‌কাপ্রসাদ যতটা সম্ভব হাল্কা ভাবে কথা বলার চেষ্টা করেন।

কান্‌হাইয়ালাল তাঁর বাড়ির বাইরে একটা নিমগাছতলায় চারপাই পেতে বসে ছিলেন। কাল্‌কাপ্রসাদের প্রশ্নের উত্তরে তখন কোন জবাব দিলেন না—গুড়গুড়ির নলটা কাল্‌কাপ্রসাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে উঠে গেলেন এবং বাড়িতে ঢোকবার সদর দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এসে প্রশ্ন করলেন, 'এ সব কি শুনছি বল তো কাল্‌কাপ্রসাদ, আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না !'

কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কাল্‌কাপ্রসাদ বললেন, 'কী শুনেছ তাই আগে শুনি !'

'শুনেছ নিশ্চয় তুমিও—আর তাই এত ভোরবেলা ছুটে এসেছ !' কান্‌হাইয়ালাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকান।

কাল্‌কাপ্রসাদ তবু ভাঙেন না। বলেন, 'তবু তুমি ঠিক কী শুনেছ আগে তাই বল না !'

কান্‌হাইয়ালাল গলা আরও খাটো করেন। বলেন, 'গুজব তো নানা রকম। তবে এটা ঠিক যে, একটা বড় গোছের গোলমাল বাধবে। বাংলা মুলুকে যে-সব হিন্দুস্থানী সিপাই আছে তারা তো ক্ষেপে উঠেছেই—আবার তারাই চেষ্টা করছে এ মুল্লুকের সিপাইদেরও ক্ষেপাতে। কি সব নাকি চাপাটি পাঠানো চলছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—সারা মুলুকই নাকি ক্ষেপে উঠবে ! ইংরেজ-রাজত্ব নাকি আর থাকবে না।...তুমি কী শুনেছ বল তো ?'

কাল্‌কাপ্রসাদও গলা নামালেন, 'তুমি যা শুনেছ তা সবই আমি শুনেছি। বাংলা মুলুকে গোলমাল তো রীতিমত পেকেই উঠেছে। বিলাতের মহারাণী সাহেবা নাকি হুকুম দিয়েছেন যে, এ মুলুকের সবাইকে ক্রেস্তান করতে হবে। তা করতে গেলে আগে সিপাইদের হাত করা দরকার। শুধু ইংরেজ ফৌজের আর জোর কত ! সিপাইদের যদি ক্রেস্তান করা যায় তো তারাই তখন সাহেবদের দিক টানবে – তারা চাইবে যে, তাদের যখন জাত গেছে তখন সকলেরই জাত চলে যাক। আর সেই মতলবেই নাকি নতুন এক টোটা এনেছে, তাতে গরু আর শুয়োর—দুই জানোয়ারেরই চর্বি আছে। দাঁতে কেটে বন্দুকে পুরতে হবে—আপনিই জাত চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। এ ছাড়া নাকি আটার সঙ্গে গরুর হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে দিচ্ছে—যাতে রুটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাত চলে যায়।'

কান্‌হাইয়ালাল কিছুকাল নির্বাক থেকে বললেন, 'এসব তুমি বিশ্বাস কর ?'

'আমি তো ভাই করি না, কিন্তু—'

'কিন্তু কি ?'

'অনেকেই তো করে দেখছি।...বাজারে আটার দাম আগুন হয়ে উঠেছে, তবু সিপাইরা বাইরে থেকে আটা কিনছে, ব্যারাকে যে-সব আটা দেওয়া হচ্ছে তা খাচ্ছে না। গুজব বেশ ভাল করেই ছড়িয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য কি ?'

কান্‌হাইয়ালাল বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। গুড়গুড়ির মাথার আগুন অনেকক্ষণ নিভে গেছে। তবু অন্যমনস্কভাবে তাতেই গুটি দুই টান দেবার চেষ্টা করলেন। তার পর বললেন, 'দেখ কাল্‌কাপ্রসাদ, আমিও এই কথাটাই কদিন ধরে ভাবছি। একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা চলছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাধাচ্ছে কারা ? এ গুজব সিপাইদের মধ্যে কেউ বেশ ভালভাবেই ছড়াচ্ছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়—রোজ রোজ নতুন

নতুন। কিন্তু কেন? কার এতে স্বার্থ? এদেশী রাজারা আর নবাবরা? তাদের স্বার্থ আছে স্বীকার করি—তারা হয়তো আবার স্বাধীন রাজা হবার স্বপ্ন দেখছে তাও ঠিক, কিন্তু তারা এত মিলেমিশে কাজ করতে পারবে বলে তো বিশ্বাস হয় না। তাই ভাবছি কালকাপ্রসাদ, এর পেছনে কারা আছে— আর তাদের শক্তি কত? শত্রুকে দেখতে পেলে ভয় কমে যায়—অদৃশ্য শত্রুই বেশী ভয়ঙ্কর।'

কালকাপ্রসাদও খানিক গুম খেয়ে রইলেন। তার পর প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, সিপাইরা কি সত্যিই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যেতে সাহস করবে শেষ পর্যন্ত? তুমি কী মনে কর?'

কানহাইয়ালাল বললেন, 'যেতে পারে। কারণ কি জান? সাহস-দুঃসাহসের কথা নয়, পেটের কথা। একটা গোলমাল বাধা মানেই লুটতরাজের সুযোগ। এর আগে ওরা মাইনে পেত না—মুঘল-বাদশাহের আমলে তো দু বছর তিন বছর করে মাইনে বাকি পড়ে থাকত, কিন্তু তখন মাইনের অত তোয়াক্কা করত না। ইংরেজ আমলে জবরদস্তিটা বন্ধ করতে হয়েছে যে—তাতে ভারি মুশকিল!'

'কিন্তু ভবিষ্যৎ?'

'ভবিষ্যৎ অত ভাবার মত যদি মাথা থাকত কালকাপ্রসাদ, তো তারা ফৌজে যাবে কেন—তোমার মত মুনশীগিরি করত।'

'আচ্ছা, এই ক্রেস্তান করার কথাটা তুমি কি বিশ্বাস কর?'

'না, করি না, এ বিলকুল ঝুট। ইংরেজরা অত বোকা নয়। আর তাতে তাদের লাভই বা কি? শুনেছি আলমগীর বাদশা পর্যন্ত এ কাজ করতে পারেন নি—ভাল করে বাদশা বনবার আগেই ইংরেজরা তা করতে সাহস করবে—এ তো মনে হয় না।'

আবার কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

কালকাপ্রসাদ খানিক পরে উঠে কানহাইয়ালালের চারপাইতেই এসে বসলেন। তার পর গলা নামিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের মত ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'এখন তোমার আমার কর্তব্য কি?'

কানহাইয়ালাল উত্তর দিলেন, 'সেই কথাই তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম। তুমি তো সাহেবের সঙ্গে বাস কর—কী রকম বুঝছ বল দিকি!'

'কিছুই বুঝছি না। তা নইলে আর এই সাত-সকালে প্রাণের দায়ে ছুটে আসব কেন।...কোন কথাই তোলে না। তবে মনটা যে খুব ভাল নেই তা মুখ দেখেই বুঝতে পারি। চিন্তিত একটু—কিন্তু সে ঐ পর্যন্তই।'

কানহাইয়ালাল নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'তা হলে আমাদের এখন কিছুদিন চুপচাপ থাকাই ভাল, বুঝলে? ব্যাপারটা কোনদিকে গড়ায় দেখা যাক। সিপাইরা যদি সত্যিই ক্ষেপে—তা হলেও যে শেষ পর্যন্ত কোন সুবিধা করতে পারবে তা মনে হয় না। ইংরেজ জাত বড় শক্ত জাত, বুঝলে কালকা-প্রসাদ, ওদের এখনও পুরো চেনে নি এরা। ওরা মার খেয়ে হাল ছাড়তে শেখে নি—এইটে বড় কথা। না, আরও কিছুকাল দেখ!'

'কিন্তু', কালকাপ্রসাদ বললেন, 'আমাদের অবস্থাটা যে সাংঘাতিক। আমরা যে আগেই বিষদৃষ্টিতে পড়ব। ধনপ্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে—'

'আমি বলি কি—পয়সাকড়ি যা আছে, এই বেলা সরাও। মেয়েদের না হয়

কোন ছলছুতোয় দেহাতে পাঠিয়ে দাও। তার পর বেগতিক দেখলে নিজেরাও গা-ঢাকা দেবে। এ ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি না।'

কালকাপ্রসাদ বললেন, 'নাকি গোপনে গোপনে এদের একটু সাহায্য করে হাতে রাখব ? দু দলেই থাকা যাক না!'

'উঁহু।' দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়লেন কানহাইয়ালাল, 'দু নৌকোয় পা দেওয়া ঠিক নয়। ওভাবে তুমি কাউকেই খুশী করতে পারবে না, দু দলই চটে থাকবে ; তা ছাড়া কথাটা বেশীদিন গোপনও থাকবে না। তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কেউই বিশ্বাস করবে না। না না কালকাপ্রসাদ, ও-কাজে যেও না। দীর্ঘদিন ইংরেজের নোকরি করেছি, নিমক খেয়েছি—আমাদের এখন ভোল পালটাতে যাওয়া ঠিক হবে না। সিপাইদের আমি বিশ্বাস করি না—তাদের যারা ক্ষেপাচ্ছে তাদেরও না। ইংরেজের বাদশাহী সবে-শুরু। ভগবান তাদেরও কিছুদিন সময় দেবেন—এই আমার বিশ্বাস।'

'কিন্তু সারা দেশ যদি ক্ষেপে ওঠে ?'

'তা সম্ভব নয়। দেশের লোককে তুমিও চেন, আমিও চিনি। আর তা যদি ক্ষেপে তো আমরাও তখন ক্ষেপব। নদীতে বান এলে ঘরদোর ভাসবেই—ইচ্ছে করলেও তো তুমি স্থির থাকতে পারবে না ভাই।'

কালকাপ্রসাদ অনেকক্ষণ গুম খেয়ে বসে রইলেন। তার পর বললেন, 'তোমার কথাগুলোই ঠিক বলে মনে হচ্ছে। সেই জন্যেই তো ভাই তোমার কাছে ছুটে এলুম। হাজার হোক, একের বুদ্ধি বুদ্ধিই নয়!...তা হলে তাই করি, কি বল—মেয়েদের সব দেহাতে রওনা করিয়ে দিই ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সবাইকে একসঙ্গে নয়। আমিও সরাতে শুরু করেছি। স্ত্রী দুজনকে পাঠিয়েছি তাদের বাপের বাড়ি। ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে আজকে আমার বহিনের বাড়ি। এই ভাবে সরাচ্ছি। রটিয়ে দিয়েছি বহিনের ননদের বিয়ে—তাই ওদের পাঠাচ্ছি। নইলে নানারকম গুজব উঠবে।'

'ঠিক, ঠিক। আমিও তাই করব। দেখি, বাড়ি গিয়ে মার সঙ্গে পরামর্শ করি।'

কালকাপ্রসাদ উঠে পড়লেন।

কানহাইয়ালাল বললেন, 'চললে নাকি ? একটু ব'স না, গরম দুধ খেয়ে যাও একটু।'

'না ভাই, আজ থাক। পুজাপাঠ হয় নি এখনও—চলি।'

কানহাইয়ালাল গলির মোড় পর্যন্ত বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে এসে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, 'একা ডেকে দেব নাকি ?'

'না থাক, এখন খানিকটা হাঁটি। দরকার হয়, একটা চলতি একায় উঠে পড়ব।'

বড় রাস্তায় উঠে কালকাপ্রসাদ খানিকটা স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। একবার চারদিকে চেয়ে দেখলেন। ততক্ষণে শহর কর্মমুখর হয়ে উঠেছে। পথ-ঘাটে পুরোদমে লোক-চলাচল শুরু হয়েছে। খালি একার অভাব নেই। কিন্তু কালকাপ্রসাদের সত্যি সত্যিই গাড়ি চড়তে ইচ্ছে হল না। মাথাটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কোন কথাই ভাল করে বুঝতে পারছেন না। খানিকক্ষণ হন হন করে হাঁটতে পারলে বোধ হয় সুস্থ হতে পারতেন।

কালকাপ্রসাদ প্রথমটা বেশ জোরে জোরেই পা চালালেন।...

বেলা প্রথম প্রহর তখনও উত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু প্রথম বসন্তের সূর্য তখনই প্রখর হয়ে উঠেছে। উষ্ণ বাতাস দুঃসহ না হলেও সুখসেব্য আর নেই। কালুকাপ্রসাদ ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। চারিদিকেই অস্বস্তি।

না, এভাবে হাঁটা আর চলবে না।

তিনি ইঙ্গিতে একখানা একাই ডাকলেন।

একায় চড়ে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তভাবে আর একবার শহরের দিকে তাকালেন। কর্মব্যস্ত শহরের রাজপথে যে যার কর্মে চলেছে। দোকানপাটে স্বাভাবিক বেচা-কেনার ভিড়, সবই প্রতিদিনকার মতো ঠিক চলছে; কিন্তু তবু কালুকাপ্রসাদের কেমন যেন মনে হল—কোথায় একটা কি ভাবী বিপর্যয়েরই চিহ্ন ফুটে উঠছে। সব ঠিক আগেকার মত নেই। শান্ত নগরী যেন ঝড়ের পূর্বের শান্ত সমুদ্রের মতো—ঈশান কোণে মেঘ দেখা দিলেই তুফান উত্তাল হয়ে উঠবে। এ স্তব্ধতা সেই তুফানেরই পূর্বাভাস।

এ কি তাঁর অকারণ আতঙ্ক?

তাঁর ভীত মনেরই প্রতিক্রিয়া?

অথবা এই আপাত-শান্ত জনতার গতিবিধির মধ্যে সত্যিই কোন ঝড়ের সঙ্কেত বোঝা যাচ্ছে?

কে জানে!

কালুকাপ্রসাদ কাঁধের গামছাখানা টেনে ললাটের ঘাম মুছলেন।

জীবনে বুঝি সুখশান্তি বলে কোন জিনিস সত্যিই নেই। ওটা কবির কল্পনা।

॥ ১০ ॥

আজিমুল্লা খাঁ সাধারণত একটু বেশী বেলাতেই শয্যা ত্যাগ করতেন। বিলাত যাওয়ার ফলে এই অভ্যাসটি তাঁর হয়েছিল—এখানে ফিরেও তা ত্যাগ করতে পারেন নি। সুতরাং সেদিন যে চাকরের ডাকাডাকিতে অত ভোরে ঘুম ভাঙল বলে বিরক্ত হবেন সে আর বিচিত্র কি। গায়ের মোটা চাদরখানা সরিয়ে রীতিমত ভ্রূকুঞ্চিত করেই প্রশ্ন করলেন, 'কি, ব্যাপার কি? বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে নাকি?'

ভৃত্য আলিমন্দী সে দৃষ্টির সামনে ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। কিন্তু তার যে উভয়-সঙ্কট। দরজার বাইরে যে দৈত্যটা দাঁড়িয়ে আছে সে-ও কিছু অবহেলার নয়। সে মাথাটা চুলকে উত্তর দিল, 'আজ্ঞে, বিঠুর থেকে—'

'বিঠুর থেকে কী? লোক এসেছে? তার জন্যে এই শেষরাত্রের ঘুম ভাঙালি?'

আজিমুল্লার কণ্ঠস্বর আরও উগ্র হয়ে উঠল।

এই বেয়াদব ও মূর্খ ভৃত্যটাকে আজই তাড়াতে হবে। এতদিনে তার বোঝা উচিত যে, আজিমুল্লা নানাকে এতটা পরোয়া করেন না যে নানা লোক পাঠালেই আজিমুল্লাকে ভোরের সুখনিদ্রাটি ত্যাগ করতে হবে।

আলিমন্দী তাড়াতাড়ি বলল, 'আজ্ঞে নানা নন—হুসেনী বেগম!'

'হুসেনী বেগম! লোক পাঠিয়েছে?'

আজিমুল্লার ঘুমের ঘোর কেটে গেল। কণ্ঠস্বরও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে এল।

'হুসেনী বেগম ! কী চায় তার লোক ?'

'আজ্ঞে, খুব নাকি জরুরী খবর। একেবারে দানোর মতো একটা লোক পাঠিয়েছে, সে এসেই জুলুম করতে শুরু করেছে। এখনই আপনাকে না ডাকলে সে বোধ হয় আমায় তুলে আছাড় দিত !'

'ও—তা—আচ্ছা, নিয়ে আয় তাকে।'

খাটিয়া ত্যাগ করে আজিমুল্লা একখানা চেয়ারে এসে বসলেন।

তিনি একটু বিস্মিতই হলেন।

হুসেনী তাঁর এই বাসস্থানের খবর পেল কেমন করে ?

কানপুরে আজিমুল্লা খাঁর নির্দিষ্ট কোন বাসা নেই। বাড়ি অবশ্যই একটা আছে—এই বাড়ি—কিন্তু এখানে তিনি ক্বচিৎ রাত্রিবাস করেন। এক-এক দিন রাত বেশী হয়ে গেলে বিঠুরেই থেকে যান—সেখানে তাঁর জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট আছে, খানসামাও একজন আছে। এ ছাড়া শহরের তিন-চারটি জায়গায় তাঁর সম-সংখ্যক রক্ষিতা আছে—তাদের বাড়িতেও পালা করে থাকতে হয়। পূর্বাহ্নে কাউকেই খবর দেন না—রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হলে কোথায় যাবেন সেটা ঠিক করেন। কেবল যেদিন অখণ্ড বিশ্রামের প্রয়োজন হয় সেদিনই এখানে আসেন। কারণ এ বাড়িতে বিশ্রামের ব্যাঘাত করার মতো কেউ নেই। তাঁর বিবি বড়লোকের মেয়ে, সে বেশির ভাগই তার পিত্রালয় জৌনপুরে থাকে। থাকার মধ্যে এক বুড়ী নানী—তিনি আজিমুল্লার গতিবিধির কোন খবরই রাখেন না, বিশেষ কোন কৌতূহলও নেই।

কাল বহুরাত্রে আজিমুল্লা ঠিক করেছিলেন এখানে আসবেন। সে খবর তো কারও পাবার কথা নয়। তবে ? তবে কি হুসেনী বেগম তাঁর গতিবিধির ওপর গোয়েন্দাগিরি করে ?

আজিমুল্লা খাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

আলিমন্দীর পিছু পিছু এসে ঢুকল হুসেনীর লোক। একে আজিমুল্লা আগেও কোথায় দেখেছেন, কিন্তু ঠিক স্মরণ করতে পারলেন না। তবে আলিমন্দী মন্ড মিছে বলেনি—লোকটা সাক্ষাৎ দানো বা দৈত্যই বটে। হুসেনী বিবি এমন দূতটিকে কোথা থেকে খুঁজে বার করল ? এ তো বিঠুরের কোন ভৃত্য নয়। অন্তত বিঠুরে একে তিনি বেশি দেখেন নি। লোকটা সেলামের ভঙ্গি মাত্র করে বিনা ভূমিকাতেই কাজের কথা পাড়ল, 'মালেকান্ হুসেনী বেগমসাহেবা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। কখন কোথায় আপনার সুবিধে হবে জানতে চেয়েছেন।'

আজিমুল্লা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আমি যে কাল এখানে থাকব বেগমসাহেবা জানলেন কী করে ?'

'আমাকে খবর নিতে বলেছিলেন।' প্রশান্ত মুখেই সর্দার খাঁ উত্তর দেয়।

'তুমিই বা খবর নিলে কী করে ?' আজিমুল্লার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল।

'বাইরে এসে অপেক্ষা করছিলাম। আপনি গাড়িতে উঠে গাড়িবানকে এখানেই আনতে হুকুম করলেন, শুনলাম।'

'ওঃ !' বিস্ময়, নিশ্চিন্ততা ও প্রশংসা মিলে এই একটি স্বরই আজিমুল্লার গলা দিয়ে বার হল।

তারপর অপেক্ষাকৃত সহজ কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, কী বলছিলে ?

বেগমসাহেবা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান? সে তো সৌভাগ্যের কথা। তাঁকে ব'ল যে, তাঁর এ বান্দা তাঁরই মর্জির অপেক্ষা করবে।'

'তা হলে আজ সন্ধ্যার পরে?'

'তাঁর যদি হুকুম হয় তো তাই হবে।'

'কোথায়?'

'এখানে—কিংবা যেখানে তিনি হুকুম করবেন।'

'তা হলে এখানেই তিনি আসবেন—সন্ধ্যের পর।'

লোকটা আবারও সেলামের ভঙ্গি মাত্র করে চলে যাচ্ছিল, আজিমুল্লা ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন।

চেয়ারের পাশেই দামী মেহগ্নি কাঠের ডেস্ক। সেটাকে খুলে একটা টাকা বার করলেন। টাকাটা লোকটির হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমার বকশিশ!'

টাকাটা হাত পেতে নিয়ে সে আবারও সেলামের ভঙ্গিতে মাথাটা ঝুঁকোল।

কিন্তু সে চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াবার আগেই আজিমুল্লা মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম কি ভাই, সেটা তো জানা হল না?'

'আমার নাম সর্দার খাঁ—আপনার বান্দা।'

'বিঠুরে কতদিন কাজ করছ? তোমাকে তো দেখি নি?'

'আমি তো বিঠুরে কাজ করি না।'

'অ……তা তবে তুমি কী কর?'

'আমার বাজারে মাংসের দোকান আছে।'

'তা হলে তোমার সঙ্গে বেগমসাহেবার যোগাযোগটা—' বিস্ময় চাপতে পারেন না আজিমুল্লা।

'যদি দরকার বোধ করেন তো বেগমসাহেবাকেই জিজ্ঞাসা করবেন।'

সর্দার খাঁ আর কিছুমাত্র প্রশ্নোত্তরের অবকাশ না দিয়ে আর একবার মাত্র মাথা হেলিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

নীচে তখন সদরের কাছে বসে আলিমন্দী দাঁতন করছিল। তার পাশ দিয়ে সর্দার খাঁ প্রায় ঝড়ের বেগেই বার হয়ে গেল, কিন্তু সেই সচল পর্বতের অপসরণজনিত দমকা হাওয়াটা আলিমন্দীর গায়ে এসে লাগার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কি পদার্থ তার কোলের ওপর এসে পড়ল। প্রথমটা সে দস্তুরমত ভয় পেয়েছিল, কিন্তু তার পর আশ্বস্ত হয়ে দেখলে—জিনিসটা কোন অসার বস্তু নয়, একটি গোলাকার রুপোর টাকা!

•

আজিমুল্লা সারাটা দিন বলতে গেলে অধীর আগ্রহে হুসেনী বেগমের অপেক্ষায় রইলেন। সময়টা, এই প্রথম তাঁর মনে হল, বড় দীর্ঘ—সূর্যদেবের গতি বড়ই মন্থর।

হুসেনী তাঁর কাছে আসছে—হুসেনী!

স্বেচ্ছায়! তাঁকে তার প্রয়োজন পড়েছে!

তিনি কি অকারণেই এত অধীর হচ্ছেন?…তাঁর মতো তীক্ষ্ণধী লোকের বুদ্ধি এতটা অধীরতা শোভা পায় না।

অথচ আজিমুল্লা বুদ্ধিজীবী লোক। আর যাই থাক, তাঁর বুদ্ধির অভাব আছে এমন অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারবে না। সামান্য খিদমৎগারের পুত্র তিনি। সেনা-ব্যারাকের এক সাহেবের খিদমৎগারি করতেন আজিমুল্লার পিতা।

এ তো এই সেদিনও—বেশ বড় হয়েও—আজিমুল্লা দেখেছেন। এবং সেজন্য তিনি লজ্জিতও নন। পিতার সেই খিদমৎগারিই আজিমুল্লার জীবনে উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। বরং সে পরিচয় যে আজ সম্পূর্ণরূপে ঢেকে দিতে পেরেছেন—নিজের এই কৃতিত্বে আজিমুল্লা গর্বিতই।

ব্যারাকে ব্যারাকে খিদমৎগার পিতার সঙ্গে ঘুরে বাল্যেই মেধাবী আজিমুল্লা বহু ইংরেজী শব্দ আয়ত্ত করেন—এমন কি কিছু ফরাসীও। সে-ইংরেজী ব্যাকরণ-সম্মত না হলেও খাঁটি সাহেবী ইংরেজী। উচ্চারণের ভঙ্গিটা পর্যন্ত সাহেবী। আরও একটা সুবিধা, বহু উচ্চশিক্ষিত লোকও, সাহেব বিশেষত স্কচ সাহেবের মুখের উচ্চারণ এক বর্ণও বোঝেন না, কিন্তু আজিমুল্লা শুনেই শিখেছিলেন—সে অসুবিধে তাঁর নেই।

আজিমুল্লা নিজেও অনেক রকম কায়িক শ্রমের কাজ করেছেন। কাফিখানায় পেয়ালা ও সানকি ধোওয়ার কাজও একসময় তাঁকে করতে হয়েছিল। কিন্তু সাহেবদের সংস্পর্শে গোটা বাল্যকালটা কাটার ফলেই হোক বা সহজাত ব'লেই হোক, উচ্চাভিলাষ তাঁকে কখনও ত্যাগ করে নি। সেই উচ্চাভিলাষেই একদা তিনি কানপুর শহরে পৌঁছে ইংরেজী স্কুলের হেডমাস্টার গঙ্গাদীনকে খুঁজে বার করেন এবং তাঁর কাছে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেন। শুনে শুনে ইংরেজী ভাষায় যতই দখল থাক—লিখতে ও পড়তে না পারলে সবই বৃথা—এ কথাটা আজিমুল্লা ভালই বুঝেছিলেন।

তাঁর সে দূরদৃষ্টি ও অধ্যবসায়ের ফল ফলতেও দেরি হয় নি। গঙ্গাদীনের কাছে মোটামুটি পাঠ সমাপ্ত করে ঐখানেই শিক্ষকতা করতে শুরু করেন বটে, কিন্তু তাঁকে কেউই সাধারণ স্কুল-মাস্টার বলে কোনদিন অশ্রদ্ধা করতে পারে নি। তাঁর সুশ্রী চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি এবং ইংরেজদের মতই ইংরেজী উচ্চারণ শীগগিরই তাঁর একটি খ্যাতি রচনা করল। তখনকার দিনে সে ধরনের ইংরেজীনবিশ লোক এত ছিল না, সুতরাং খ্যাতি না রটাই বিচিত্র। সে খ্যাতি একদা নানাসাহেবের কানেও পেঁৗচেছিল। তিনি তার পূর্ব থেকেই কোম্পানির অবিচারের বিরুদ্ধে মহারানীর কাছে নালিশ করবার কথা ভাবছিলেন। আজিমুল্লা খাঁকেই তাঁর এ বিষয়ে উপযুক্ত লোক বলে বোধ হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!

নানার উকিল আজিমুল্লা গেলেন নবাবের মতোই। বিলেতের লোক অত বোঝে না—ধনী ভারতীয় হিন্দু মাত্রেই তাদের কাছে রাজা, ধনী মুসলমান মাত্রেই নবাব। আজিমুল্লারও নবাব বলে খ্যাতি রটতে বিলম্ব হল না। আজিমুল্লা মুঠো মুঠো করে নানা সাহেবের সোনা ওখানে ছড়াতে লাগলেন। ফলে লন্ডন শহরের বহু ধনী ও অভিজাত পরিবারের দ্বারই তাঁর সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বিলেতী অভিজাত সমাজে মেশবার সবরকম যোগ্যতাই তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। শৃগাল-শিকার ও বিলাতী নাচে তাঁর বেশ খ্যাতি রটে গেল। নেচে ও নাচিয়ে আজিমুল্লা শীগগিরই রীতিমত বিখ্যাত ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। কিন্তু এধারে হৃদ্যতা যতই থাক, ইংরেজ কার্যকালে বিগলিত হয় না কখনও। আজিমুল্লাকেও শুধু-হাতেই ফিরতে হল। মক্কেলের সত্তর লক্ষ টাকা খরচ করে রিক্ত-হাতে ফেরাটা উকিলের পক্ষে মোটেই গৌরবের নয়। এক্ষেত্রে মক্কেলের বিষদৃষ্টিতেই পড়বার কথা, কিন্তু তীক্ষ্ণধী আজিমুল্লার পক্ষে দোষটা অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া এমন কিছু কঠিন হল না। আজিমুল্লা অনায়াসেই নানাসাহেবকে 'বুঝিয়ে' দিতে পারলেন।

তবে ইংল্যান্ড থেকে একেবারেই শুধু-হাতে ফেরেন নি তিনি। ইংল্যান্ড যাত্রার সময় তাঁর সেক্রেটারী হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন মহম্মদ আলি খাঁকে। এই ছেলেটি উচ্চশিক্ষিত। বেরিলী কলেজের ছাত্র—রুড়কি কলেজের পাস-করা ইঞ্জিনিয়ার। কিছুদিন কোম্পানির কাছে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকরিও করেছিল। কিন্তু সে অল্পকালের জন্যই। সে চাকরি ছেড়ে ভাল ইংরেজি-নবিশ হিসেবে জঙ্‌বাহাদুরের সেক্রেটারীর চাকরি শুরু করে। তাঁর সঙ্গে সে বিলেতেও গিয়েছিল। ছেলেটি শুধু মেধাবী বা বিদ্বান নয়—সে যেন মনুষ্যরূপী বহ্নি। এত ইংরেজ-বিদ্বেষ আজিমুল্লা আর কারও দেখেন নি—বোধ করি নানাসাহেবেরও না। তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলত, চাকরির ক্ষেত্রে তার প্রতি অবিচারই এই বিদ্বেষের হেতু। তার চেয়ে অনেক কম-শিক্ষিত সাহেব বা আধা-সাহেব তার চেয়ে অনেক বেশী মাইনে পেত এবং কর্তৃত্ব করত। সেই অপমানেই সে চাকরি ছাড়ে এবং আজও সে অপমান ভুলতে পারে নি। কিন্তু আজিমুল্লা তা বিশ্বাস করেন নি। আরও গূঢ় কারণ সন্দেহ করেছেন। যদিচ সে সন্দেহের সঠিক কোন কারণ খুঁজে পান নি।

তবে সে যাই হোক, এই ছেলেটি দীর্ঘকালের সাহচর্যে তার সেই সুতীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষ আজিমুল্লার মনেও সংক্রামিত করেছিল। শুধু তাই নয়, ঐ ছেলেটি ইংরেজের শক্তির প্রতি তাঁর অখণ্ড শ্রদ্ধাকেও বিচলিত করে। সে-ই প্রথম শোনায় যে ইংরেজ অপরাজেয় নয়। নেপোলিয়নের কাছে সে স্থলযুদ্ধে প্রচুর মার খেয়েছিল এবং ভারতেও তার যে সুদীর্ঘ বিজয়ের ইতিহাস, তা রচনা করেছে দেশী সিপাইরাই—নইলে শুধু ইংরেজ সৈন্য কিছুই করতে পারত না। ইংল্যান্ড দেশ এতটুকু—ইংরেজও মুষ্টিমেয়। সাতসমুদ্র পার হয়ে এসে তাকে লড়াই করতে হয়েছে। তেলেঙ্গী সিপাইরা না থাকলে ক্লাইভ কি করতে পারতেন? ফরাসীরাই আজ ভারতের অধীশ্বর হয়ে বসত...ইত্যাদি।

এক কথায় মহম্মদ আলি খাঁ তাঁর শোণিতে নতুন নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। তারই প্ররোচনায় তিনি ফেরবার পথে কুস্তুন্তুনিয়া* থেকে যাত্রা পাল্টে ক্রিমিয়া যান, সেখানে ইংরেজ সৈন্যদের দুরবস্থা ও তাদের হতদারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখেন। ১৮ই জুন ইংরেজদের শোচনীয় পরাজয়ের দিনে তিনি সে পরাজয় নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করেন। তাতে মহম্মদ আলি খাঁর কথার যাথার্থ্যই প্রমাণিত হয়। ইংরেজ অপরাজেয় নয়—ইংরেজদের শক্তি বা সম্পদও অফুরন্ত নয়।

তবু ফিরে এসে আজিমুল্লার একার পক্ষে হয়তো কিছুই করা সম্ভব হত না। নানাকে তাতানোই মুশকিল। বাকি যেসব শক্তিমান রাজা আছেন, তাঁদের সঙ্গে আজিমুল্লার পরিচয় নেই। ভাগ্যান্বেষী একজন তরুণ মুসলমানের কথা তাঁরা বিশ্বাস করবেনই বা কেন? তা ছাড়া, সতর্ক ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি রেসিডেন্টরূপে প্রত্যেকেরই বলতে গেলে ঘরের মধ্যে জেঁকে বসে আছে। এক্ষেত্রে সহায়-সম্বলহীন আজিমুল্লা কীই বা করতে পারতেন?

কিন্তু খোদার ইচ্ছা বুঝি অন্যরূপ।

নইলে ঠিক সেই বিশেষ মুহূর্তে হুসেনী বেগম তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে কেন?

একটা প্রবল বিদ্বেষের স্রোত আর একটা প্রচণ্ডতর স্রোতের সঙ্গে মিলবে

* কনস্টান্টিনোপল্‌

কেন ? একটা সর্বনাশা বহ্নি আর একটা প্রলয়ঙ্কর বহ্নির সঙ্গে মিশবে কেন ?

নানা ধন্দধুপন্থ একদিন প্রীতির আকস্মিক অভিশযো আজিমুল্লাকে সঙ্গে করেই গিয়েছিলেন হুসেনী বেগমের মহলে—সে কোন্ এক অশুভ লগ্নে। সে-ই প্রথম চারটি চোখ মিলেছিল।

অন্তত আজিমুল্লার পক্ষে তো অশুভ লগ্ন বটেই।

সে-ই থেকে আজ পর্যন্ত আজিমুল্লা মনে শান্তি পান নি। ঐ রমণীরত্নকে তাঁর বক্ষোলগ্ন না করতে পারলে বুঝি শান্তি পাবেনও না।

সম্ভোগ ? বহু স্ত্রীলোককেই তিনি এ বয়সে সম্ভোগ করেছেন—দেশী-বিলেতী বহু। কিন্তু আর কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গেই বুঝি এই স্ত্রীলোকটির তুলনা হয় না।

রূপ ?

না, শুধু রূপ নয়। আরও আছে হুসেনী বেগমের। কী এক আগুন—যা দেখলে মন-পতঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়ে নিঃশেষে নিজেকে দগ্ধ করতে না পারা পর্যন্ত শান্তি পায় না।

আজিমুল্লা সেদিন ফিরেছিলেন মূর্ছাহতের ন্যায়।

কিছু ব্যথিতও হয়েছিলেন বৈকি। নিজে খানদানী ঘরের লোক না হলেও আজিমুল্লা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় হুসেনীর চালচলন আচার-ব্যবহার চিনতে কিছুমাত্র ভুল করেন নি।

সামান্যা রূপোপজীবিনী কখনই নয় হুসেনী বেগম। কোন খানদানী ঘরেরই কন্যা। সে কিনা ঐ স্থূলোদর কাফেরটার কাছে আত্মবিক্রয় করছে !

আজিমুল্লা সুযোগের জন্য ব্যস্ত হলেন। তাঁর মতো লোক কোন একটা সুযোগ খুঁজলে তা মিলতেও বিলম্ব হয় না। বিশেষত প্রয়োজনবোধে মুক্তহস্তে টাকা ছড়াতে তিনি জানেন।

হুসেনী বেগমরই এক দাসী এসে একদিন আজিমুল্লার বক্তব্য নিবেদন করল—আজিমুল্লা নির্জনে দর্শন-প্রার্থী।

সেদিন বিচিত্র এক হাসি ফুটে উঠেছিল আমিনার মুখে—রহস্যময়, কুটিল এবং ভয়ঙ্কর সে হাসি।

অবশ্য অনুমতি আর নির্দেশ দুই-ই মিলেছিল। ফলে আজিমুল্লা নিশীথ রাত্রে একা হুসেনীর মহলে যেতে পেরেছিলেন এবং নির্বোধ প্রথম প্রণয়ীর মতোই আবেগরুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে হুসেনীর প্রণয়-ভিক্ষা করেছিলেন।

হুসেনী তাতে হেসেছিল। পরিষ্কার সহজ কণ্ঠে ঈষৎ বিদ্রূপের সুর মিশিয়ে প্রশ্ন করেছিল, "কিন্তু মনিবকে ছেড়ে চাকরের ঘর করতে যাব কিসের দুঃখে বলতে পারেন খাঁ সাহেব ?'

আজিমুল্লার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠলেও কথাটার ভাল জবাব দিতে পারেন নি সেদিন।

আরও মর্মভেদী আঘাত হেনেছিল হুসেনী, 'আপনি তো নানাসাহেবের টাকাতেই জীবনধারণ করেন, নানাসাহেবের চেয়ে বেশি কী দেবার আশা করেন ? কী এমন লোভ দেখাতে চান আমাকে ?'

তখনও প্রথমটা আজিমুল্লাকে নিরুত্তর থাকতে হয়েছিল।

অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ পরে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি আপনাকে ঘর দেব, মর্যাদা দেব—নেকা করব আপনাকে।'

'এ পথে যখন এসেছি খাঁ সাহেব, তখন ওসব ভুয়ো সম্মানের লোভ আমার নেই।...আপনার অনেকগুলি পত্নীর একজন হওয়ার চেয়ে নানাসাহেবের উপপত্নী হওয়াতেও লাভ বেশি।'

তার পর সহসা নিরুত্তর আজিমুল্লার নিকটে এসে সর্পিণীর মতোই হিস্ হিস্ করে বলেছিল, 'আমি তোমাকে চিনি আজিমুল্লা খাঁ। তুমি আমাকে আজ দেখছ—আমি তোমাকে দেখছি বহু দিন। তোমার সব গতিবিধির খবর রাখি। তোমার উচ্চাভিলাষ আছে আমি জানি। আমারও উচ্চাভিলাষ আছে জেনে রাখ। অনেক বড় আশা আমার। হিন্দুস্তানের তক্ত্ চাই আমি। পারবে দিতে? যেদিন সেই আসনে উঠবে, সেইদিন তোমার সেবা করবে তোমার এই বাঁদী—তার আগে নয়।'

সামনে সাপ দেখলে অন্ধকার রাত্রে পথিক যেমন চমকে ওঠে, তেমনিই বুঝি সেদিন চমকে উঠেছিলেন আজিমুল্লা। মনের অতল গহনে সীমাহীন অন্ধকারে যে উচ্চাশা সবেমাত্র অংকুরিত হয়ে সেখানেই চাপা পড়ে আছে, যার অস্তিত্ব তিনি নিজের কাছেও স্বীকার করতে প্রস্তুত নন—তার খবর কেমন করে পেল এই মায়াবিনী!

হুসেনী তেমনিই বলে চলেছে, 'তুমিও যেমন তাতাচ্ছ নানাসাহেবকে—আমিও তেমনি। দুজনেরই লক্ষ্য এক—ইংরেজ-বিতাড়ন। তার জন্য চাই উপলক্ষ। নানাসাহেব সেই উপলক্ষ মাত্র। নানাসাহেবের নামে সিপাহীরা বশ হবে। যদি নানাসাহেবকে কোনদিন ভারতের তক্তে বসাতে পার তো তাকে সরাতে কতক্ষণ?...কেমন—এই না তোমার মতলব? নিজেকে ঠকিও না আজিমুল্লা খাঁ—স্বীকার কর।'

আজিমুল্লা নতমস্তকে বসে ছিলেন—জবাব দিতে পারেন নি, অস্বীকার করতেও পারেন নি।

হুসেনী তাঁর একটা হাত ধরে ছিল।

'তুমি একা পারবে না আজিমুল্লা। আমিও একা পারব না। এস আমরা মিলিত হই। তুমি ও আমি। আমরা মিলিত হলে সম্ভব হবে। নানাকে তাতাবার ভার তোমার। অন্য বহু ব্যবস্থা আমি করতে পারব। কিন্তু নানা হিসেবী, নানা বুদ্ধিমান—যে নিতান্তই তার পদলগ্না দাসী, শুধু তার কথায় এত বড় ভরসা করবেন না। তুমি এই ভার নাও। আজ থেকে তুমি আমার অংশীদার হও। কাজ যদি কোন দিন ফতে করতে পার সেদিন তুমি পুরস্কার পাবে—রাজত্ব আর রাজকন্যা, যেমন রূপকথায় লেখা থাকে...দেখ, রাজী?'

সেই কোমল রক্তপদ্মের মতো হাত দুটি চেপে ধরে আজিমুল্লা উত্তর দিয়েছিলেন, 'রাজী—খোদা জামিন।'

সেদিন থেকে শুরু হয়েছে তাঁদের এই অদ্ভুত অভিযান, বিচিত্র অংশীদারি। আজিমুল্লাকে বহু সাহায্য করেছেন হুসেনী আড়াল থেকে। বহু পথ খুলে গিয়েছে আজিমুল্লার সামনে। কিন্তু হুসেনী কোথায়?

তাঁরা দেখেন পরস্পরকে ঠিকই, কিন্তু দেখাশোনা হয় না। যোগাযোগ আছে, কাজও করেন পরস্পরের নির্দেশমত, তবে নির্জনে দেখা হওয়ার সুযোগ মেলে না। আজ সেই দুর্লভ সুযোগ মিলেছে। যা ছিল একেবারেই নাগালের বাইরে, আজ বুঝি তাই স্বেচ্ছায় এসে হাতে ধরা দিচ্ছে।

তবে কি—তবে কি হুসেনীর মন এতদিনে তিনি পেয়েছেন?

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যচরিত্রে অভিজ্ঞ আজিমুল্লার মুখে হতাশার হাসি ফুটে ওঠে।

সে 'চীজ' হুসেনী নয়।

নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর খবর আছে। কোন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে কোথাও। তবু—তবু একটু অধীরতার সঙ্গেই অপেক্ষা করেন বৈকি আজিমুল্লা। হোক সে আশা সুদূর—তবু একান্তে কাছে পাওয়ার সৌভাগ্যই কি কম?

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসারও অনেক পরে হুসেনী বেগমের ডুলি এসে থামল। প্রায় নিঃশব্দেই এসেছিল, তবু যেটুকু শব্দ উঠেছিল, অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষমাণ আজিমুল্লার কানে তা এড়ায় নি। তিনি নিজে তাড়াতাড়ি বার হয়ে এলেন এবং সসম্ভ্রমে ডুলির ওপরের ভেলভেটের ঘেরাটোপটা সরিয়ে ধরলেন।

রাজেন্দ্রাণীর মতই ধীর ও নিরুদ্বিগ্ন ভাবে নেমে এল আমিনা। তার সর্বাঙ্গে ঢাকাই মসলিনের ওপর লক্ষ্ণৌ-এর চিকন-কাজ-করা বোরখা। সে এক হাতে বোরখার কাপড় সামলে আজিমুল্লার পেছনে পেছনে এসে বাড়িতে ঢুকল এবং সিঁড়ি বেয়ে ওপরে তাঁর খাস কামরায় এসে বসল।

বিলেত থেকে ফেরবার সময় আজিমুল্লা অনেক আসবাবপত্র এনেছিলেন—বিলেতী জর্জিয়ান আসবাব, ভাল ভাল চামড়ায় ঢাকা কুর্সি, মেঝেতে পাতার ইস্পাহানী কার্পেট। দরজায় মূল্যবান দামাস্কের পরদা। সেকালের প্রবাসী ধনী ইংরেজের মতই গৃহসজ্জা।

আমিনা একখানা চেয়ারে বসে নিঃসংকোচে মুখের ওপর থেকে বোরখা সরিয়ে দিল। ইতিমধ্যেই, বোধ করি পূর্ব নির্দেশমত, আলিমদ্দী বিলেতী কাটা কাচের দামী পাত্রে শরবৎ এনে রেখে গেল। আলিমদ্দী চলে গেল দরজার পর্দাটা ভাল করে টেনে দিয়ে। আজিমুল্লা খাঁ নিজের চেয়ারে এসে বসলেন।

'তার পর, বেগমসাহেবা! বলুন কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

'শুধু কি আমারই জন্যে?'

বিশুদ্ধ ইংরেজীতে আমিনা উত্তর দেয়। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস তার কণ্ঠে।

আজিমুল্লাও ইংরেজীতে বলেন, 'হ্যাঁ, শুধু তোমারই জন্যে। যা কিছু সব তোমারই জন্যে বেগমসাহেবা!'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসেন।

সে হাসিতে উত্তেজনা ও হতাশা দুই-ই বুঝি ফুটে ওঠে।

কিন্তু আমিনার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। কণ্ঠে তার রীতিমত উদ্বেগ। বলে, 'শোন, মৌলবীসাহেব ধরা পড়েছেন।'

'বল কি! কে বললে?'

'কাল রাত্রে খবর পেয়েছি। ইংরেজরা তাঁকে ধরেছে। লক্ষ্ণৌ-এর কয়েদখানায় পুরেছে তাঁকে। বিচার একটা হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে কবে তা কেউ জানে না। মৌলবীসাহেব ভেতর থেকেই আমাকে খবর পাঠিয়েছেন। আশ্বাসও দিয়েছেন যে, আমি যেন না ভাবি; ইংরেজের কোন জেলখানা তাঁকে বেশী দিন ধরে রাখতে পারবে না, তিনি বেরিয়ে আসবেনই।'

'বেশ তো, তা হলে অত ভাবছ কেন?'

অন্যমনস্কভাবেই কথা কটা বলেন আজিমুল্লা। আমিনার রূপে বুঝি নেশা

আছে। সুরার চেয়েও তেজস্কর।

ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবেই আমিনা বলল, 'কথাটা বুঝছ না, নানাসাহেবকে সামলাবে কে?'

'নানাসাহেব!'

'আঃ খাঁ সাহেব! আজ তোমার হল কি? মৌলবীকে আমি এ কাজে লাগিয়ে রেখেছিলুম কেন?...নানাসাহেবকে এখনও তোমরা কেউ পুরো চেন নি। তার উচ্চাশা যতটা, লোভ যতটা, হিসাব-বুদ্ধি তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। তুমি এবং আমি যতই তাতাই, তিনি কিন্তু এখনও ইতস্তত করছেন—এ ব্যাপারে নামবেন কি না। মনে মনে ইংরেজের শক্তির পরিমাণ বিচার করছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে একটা কথায় রাজী করিয়েছি। চৈত্রের খাজনা ঘরে উঠে গেলে তিনি নিজে বেরোবেন দেশের অবস্থা বুঝতে। এটা নানাসাহেব বোঝেন যে, এক দল দু দল সিপাই ইংরেজকে তাড়াতে পারবে না। দেশের সাধারণ লোক কী চায় এবং তারা যথেষ্ট তেতেছে কি না—তিনি তা নিজে জানতে চান। সেই সঙ্গে নানান ব্যারাকের সিপাইদের মনোভাব এবং ইংরেজদের জোর তিনি বুঝতে চান। এ আমি জানতুম—পেশোয়াকে এটুকু আমি চিনেছি। তিনি নিজে না দেখে এবং না বুঝে এ-কাজে নামবেন না। যা আয়ত্তের বাইরে, তার লোভে হাতে যেটুকু আছে সেটুকুও খোয়াতে তিনি রাজী হবেন না।'

'তার পর?' আজিমুল্লার দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় বুঝি চোখের কূল ছাপিয়ে ওঠে।

'নানা ধুন্ধুপন্থ যে এই প্রস্তাব করবেন তা আমি জানতুম। তাই আগে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিলুম। মৌলবীজী বহুদিন থেকে অযোধ্যার গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন।...এখন তো তিনি কয়েদখানায় চলে গেলেন।...তিনি কবে বেরুতে পারবেন তা জানি না। আমাদের কিন্তু অপেক্ষা করার সময় নেই। নানাসাহেব যখন বেরোবেন, তখন তিনি যেন আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতিকূল কিছু না দেখেন, না শোনেন। তিনি যেখানে যাবেন সেখানেই যেন তিনি দেখতে পান যে, দেশের লোক তাঁকেই চাইছে—তাঁর রাজত্ব চাইছে, কোম্পানির ওপর তাদের কোন আস্থা নেই। এই ব্যবস্থাটা এখন তোমাকে করতে হবে। আমি স্ত্রীলোক—একা যতটা করবার তা করেছি। এবার আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এবার আসছে পুরুষের কাজ। এবার তুমি ভার নাও খাঁ সাহেব! আমি টাকা যোগাব, কিছু বুদ্ধিও—ভেতর থেকে যতটা পারি সাহায্য করব।'

অনেকক্ষণ নীরব থেকে আজিমুল্লা উঠে দাঁড়ালেন। একবার ঘরের ও-প্রান্ত থেকে এ-প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে নিলেন, তার পর আমিনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বেশ, এ ভার আমি নিলাম হুসেনী বেগম। কাজের কোন ত্রুটি হবে না।'

'আমি নিশ্চিন্ত রইলাম।'

অকস্মাৎ আবেগের প্রাবল্যে আজিমুল্লার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল, 'তোমার সব হুকুমই আমি তামিল করব হুসেনী, তোমার জন্য সব-কিছু করব। তোমার কোন কাজ কোথাও এতটুকু আটকাবে না। শুধু তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও—আমি, আমি যে আর পারি না!'

উত্তেজনার আতিশয্যে আজিমুল্লা সহসা আমিনার কাঁধ দুটো চেপে ধরলেন। তিনি থর থর করে কাঁপছিলেন।

আমিনা সামান্য একটা ভঙ্গি করে কাঁধ দুটো মুক্ত করে নিয়ে একেবারে উঠে দাঁড়াল।

'পহ্‌লে কাম, পিছে সেলাম—মীর মুনশীজী!'

কণ্ঠে সেই বিদ্রূপের সুর।

সে বিদ্রূপ চাবুকের মত এসে আজিমুল্লাকে আঘাত করল। তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় আবেগ সংবরণ করে নিলেন।

আমিনা আবারও বোরখাটা মুখের ওপর টেনে দিয়ে সহজ নিরুদ্বিগ্ন ভাবে মহিমময় ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। আজিমুল্লা পূর্বের মত সসম্ভ্রমে পিছু পিছু এসে বিদায় নিয়ে গেলেন।

'সেলাম বেগমসাহেবা, আদাব।'

'সেলাম মীর মুনশীজী, আদাব!'

ডুলিতে ওঠবার সময় আমিনা অনুচ্চকণ্ঠে প্রধান বাহককে নির্দেশ দিল, 'তাত্যা টোপীজীর বাড়ি।'

॥ ১১ ॥

এখন যাঁরা বিলেত যান তাঁরা ওখানকার আধুনিক রাস্তাঘাট ও যানবাহন দেখে শতবর্ষ আগেকার অবস্থা কিছুতেই কল্পনা করতে পারবেন না। গ্রামাঞ্চলের কথা ছেড়ে দিন—শহরের অবস্থাও ছিল অবর্ণনীয়। খাস লণ্ডন শহরের পাথর-বাঁধানো রাস্তারই এক-এক জায়গায় কাদাতে জুতোর অর্ধেকটা পর্যন্ত বসে যেত। অপর শহরগুলির কথা তো না তোলাই ভাল।

আজ আমরা এমনিই একটা শহর—ডোভারের কথা বলতে বসেছি। ডোভারের অবস্থা অনেক বেশী খারাপ। কারণ এই শহরটি হল, বলতে গেলে, ইউরোপে যাওয়ার সদর দরজা। ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে ক্যালে—এপারে ডোভার। ক্যালে হয়ে সারা ইউরোপের ডাক যায় এখান থেকে। তা ছাড়াও অপর কতকগুলি ডাক সোজা ডোভার থেকে অন্যান্য বন্দরে যায়। শুধু ডাকই নয়, নানা প্রয়োজনের মানুষও আসে এখানে—ইউরোপের পথে। মাল পাঠাবার কাজে যদিও লিভারপুল, পোর্টসমাউথ প্রভৃতি বন্দরগুলি বেশী প্রাধান্য লাভ করেছে, এবং সরকারও সেই কারণে বাধ্য হয়ে সেখানকার পথঘাট-নির্মাণে বেশী মনোযোগ দিয়েছেন—তবু ডোভারের ভিড় এবং ঝামেলা কিছুমাত্র কমে নি।

তখনও ডাকগাড়ি বলতে ঘোড়ায়-টানা গাড়িই বোঝাত। রেলগাড়ির শুরু হলেও ঘোড়ায়-টানা 'স্টেজ কোচ' বিলুপ্ত হয় নি। বরং বেশির ভাগ লোকই ঐ গাড়িতে চলাচল করতেন। এই গাড়িগুলির একদিকের প্রধান আড্ডা ছিল ডোভার। অর্ধেক-কাঁচা পথঘাট গাড়ির চাকায় ভেঙে ও বৃষ্টির জলে গলে ভীমগাড্ডায় পরিণত হত। এক-এক জায়গায় গাড়ির চাকা এমনই বসে যেত যে, সেখান থেকে টেনে তুলতে ঘোড়া বা সহিস-কোচম্যানে কুলোত না—যাত্রীদেরও মধ্যে মধ্যে এসে চাকা ঠেলতে হত।

পথের তো ঐ অবস্থা। শহরের বাসিন্দাদের অবস্থাও তথৈবচ। রাহীদের জন্য অসংখ্য সরাইখানা চারদিকে। নানারকমের লোক সেখানে এসে জড়ো

হয়। মদের হুল্লোড় চলে প্রায় দিনরাত। সরাইখানাগুলিতে মদ, ঝলসানো মাংস এবং আস্তাবলের গন্ধ মিলে, ভেতর তো বটেই, বহুদূর পর্যন্ত বাতাস ভারী হয়ে থাকে হৈ-হল্লা, চিৎকার এবং গালিগালাজে—এসব এখানকার লোকের সয়ে গেছে। হঠাৎ নতুন কোন লোক এলে সে কিছু বিস্মিত হয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে—ডোভারের হৈ-হুল্লোড় যেন কিছু বেড়েছে। তার কারণ ক্রিমিয়া-প্রত্যাগত হাইল্যাণ্ডার সৈন্যদের ডোভারেই জড়ো করা হয়েছে। কঠিন বন্ধুর দুর্গম হাইল্যাণ্ড বা স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য-অঞ্চলের এই অধিবাসীগুলি এমনিতেই যথেষ্ট বুনো—বর্বর বলা চলে অনায়াসে। ওরা তখনও বিশ্বাস ও আচার-আচরণে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারকে বহন করে চলেছে। ওদের বংশগত বিবাদের শেষ হয় না কখনও, পুরুষানুক্রমে গড়িয়ে চলে। সৈন্য হিসেবে ওদের খ্যাতি খুব, কারণ প্রাণের মায়া রাখে না ওরা—প্রাণ নিতেও যেমন কুণ্ঠা নেই, তেমনি দিতেও দ্বিধা করে না।

সে বছর শীতে যে হাইল্যাণ্ডারগুলি ডোভারে এসে পৌঁছেছিল, তাদের হৈ-হুল্লোড় চরমে পৌঁছবার কারণও ছিল। ক্রিমিয়াতে তাদের কঠোর পরীক্ষা হয়ে গেছে—ব্রিটিশ প্রেস্টিজেরই অগ্নিপরীক্ষা বলা যায়। যুদ্ধের জয়-পরাজয় জাতির জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়েছিল। সেখানে যে লড়াই-এর সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা কোনক্রমেই শৌখিন লড়াই নয়। এবং বলতে গেলে এই হাইল্যাণ্ডারগুলির জন্যই সেখানে কোনমতে সম্মান রক্ষা হয়েছে। সেই লড়াই থেকে ফিরে যদি তারা কিছু বেশী মাত্রাতে উদ্দাম হয়ে ওঠে তো দোষ দেওয়া যায় না। একে তো এমনিতেই তখনকার দিনে যারা লড়াই করতে যেত তাদের অধিকাংশেরই অক্ষর-পরিচয় মাত্র সম্বল—তার ওপর হাইল্যাণ্ডারদের সরস্বতীর সঙ্গে প্রায় সম্পর্কই থাকত না। অশিক্ষিত বর্বর উদ্দাম এই পার্বত্য সৈন্যগুলি, সদ্য-মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসে, যে ধরনের আচরণ এক্ষেত্রে আশা করা যায়, সেই ধরনের আচরণই করছিল। মদ্য এবং স্ত্রীলোকে তারা আকণ্ঠ ডুবে ছিল এবং বলা বাহুল্য তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক হিসেবে যা যা থাকা স্বাভাবিক তা সবই ছিল। এক কথায় ডোভারের নাগরিকদের অবস্থা সেদিন, আর যাই হোক, ঈর্ষার বস্তু ছিল না।

এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ খবর এল হাইল্যাণ্ডস্ রেজিমেণ্টগুলির পুনর্গঠন হবে। চীনে গোলমাল বেধেছে, তাদের সায়েস্তা করার জন্য লোক পাঠানো দরকার। এবং 'যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল' হিসেবে এই হাইল্যাণ্ডারদেরই পাঠানো হবে। নচেৎ সে 'হলদে শয়তানগুলো'র সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না।

স্থির হল তিরানব্বই সংখ্যক সাদারল্যাণ্ড হাইল্যাণ্ডার রেজিমেণ্ট বা সৈন্যবাহিনীটিকেই আপাতত চীনে পাঠানো হবে। তবে তাতে যথেষ্ট লোক নেই—যারা আছে তাদেরও অনেকের বয়স বেশী হয়ে গেছে—অথবা চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। তা ছাড়া ক্রিমিয়ায় অনেকেই এমন আহত হয়ে পড়েছে যে, তাদের নিয়ে অন্তত আর দূর দেশে যুদ্ধযাত্রা করা সম্ভব নয়। সুতরাং উপর থেকে হুকুম এল—অশক্ত ও বয়স্কদের ছেঁটে বাদ দিয়ে নতুন তরুণদের দ্বারা সংখ্যা পুরোতে হবে, তবে হাইল্যাণ্ডারদের দ্বারাই তা পূরণ করা হবে। সেই কথামত ৪২নং, ৭২নং এবং ৯০নং হাইল্যাণ্ডবাহিনী থেকে কিছু কিছু

লোক চেয়ে পাঠানো হল। তবে একথাও জানিয়ে দেওয়া হল যে, যারা স্বেচ্ছায় আসতে চাইবে কেবল তারাই আসবে—অবশ্য যতক্ষণ না এই রেজিমেণ্টের এগারো শ সংখ্যা পূর্ণ হচ্ছে।

এসব কাজ দু-এক দিনে হয় না, তা বলা বাহুল্য। ফলে আরও বেশ কিছুদিন ঐ পাহাড়ে-গোরা-সিপাইরা ডোভারে ভিড় জমাল। ডোভারের উঁচুনীচু সড়কের দুপাশে, অথবা জলের ধারের সরাইখানাগুলিতে তেমনি ভিড় জমতে লাগল। পথেঘাটে হৈ-হল্লা ও গুণ্ডামিও কিছুমাত্র কমল না।

এরই মধ্যে একদিন অপরাহ্নে সাতটি স্কচ সিপাই ৯৩ নম্বরের অফিসঘরের সামনে এসে জড়ো হল। এরা সকলেই ৭২ নম্বরের রেজিমেণ্টের লোক, চীন-অভিযানে যোগ দিতে এসেছে। ৭২নং রেজিমেণ্টের ঘাঁটি একটু দূরে—চ্যাথামের রাস্তায়। কিন্তু এরা হেঁটে আসে নি—কোথা থেকে একটা গাড়ি যোগাড় করেই এসেছে। ফলে এদের চেহারা দাঁড়িয়েছে অদ্ভুত। কারণ নিতান্ত প্রাকৃতিক খেয়ালেই কদিন জলবৃষ্টি হয় নি—পথে কাদা নেই, তার বদলে আছে প্রচুর ধুলো। এবং সে ধুলো কতকটা সাদাটে। কারণ ডোভার শহরটি বলতে গেলে খড়ি-পাথরের পাহাড়ের গায়ে। সেই পাথরই চক্রে পিষ্ট হয়ে নিয়ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। অশ্বক্ষুর এবং চক্রোৎক্ষিপ্ত সেই সূক্ষ্ম শ্বেতাভ ধূলিকণা এদের কেশে, ভ্রূ-যুগলে, গুম্ফে এবং পোশাকে বেশ পুরু হয়েই জমেছে।

অফিসের বাইরে পেঁছে এরা শুনল সেনাপতি আদ্রিয়ান হোপ এবং ক্যাপ্টেন ডসন দুজনেই অফিসে আছেন—এখনই দেখা করা সুবিধা। আগন্তুকদের ভেতর ছ'জনেই ভিড় করে অফিসে ঢুকে গেল—শুধু একজন বাইরের বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগল।

যে ছ'জন ভেতরে ঢুকল তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ক্যাপ্টেন ডসনের পরিচিত। বিশেষত একজনকে খুবই অন্তরঙ্গ মনে হল। তাকে দেখে ডসনের মুখ মধুর হাস্যে প্রসন্ন হয়ে উঠল। তিনি বলে উঠলেন, 'কি খবর জন ম্যাকলিয়ড ? লড়াইএর আশ মেটে নি ?'

ম্যাকলিয়ড হাসি-হাসি মুখে জবাব দিল, 'কৈ আর মিটল। তাই তো আপনার খাতায় নাম লেখাতে এসেছি।'

'বেশ বেশ, ভালই তো! তোমরা থাকলে হলদে ব্যাটাদের জব্দ করতে আর বেশীক্ষণ লাগবে না। লর্ড এলগিনের কাজটা সহজ হয়ে যাবে।...আর এ'কেও তো চেনা চেনা মনে হচ্ছে—ডোনেলি না ?'

ডোনেলি একটু এগিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ, সার।'

'তুমিও চীনে যেতে চাও নাকি ?'

'হ্যাঁ, সার।'

'আর, তুমি ? তোমার নাম মারে, না ?'

মারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, 'আপনার মনে আছে দেখছি!'

'ওহে তোমাদের কি ভোলা যায়। তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পারা তো সৌভাগ্য।'

সেনাপতি অনারেবল আদ্রিয়ান হোপ এই সময় তাঁর কামরা থেকে হাতে দস্তানা পরতে পরতে বের হয়ে এলেন। ডসন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। সকলেই তাঁকে যথারীতি সামরিক কায়দায় সেলাম দিল।

আদ্রিয়ান হোপ বললেন, 'কি, এরা সব চীনে যেতে চায় নাকি ?'

'হ্যাঁ, স্যার !'

'ভাল। নাম ঠিকানা সব ঠিক করে লিখে নাও। ২০শে মে আমরা রওনা হব কিন্তু—তৈরী তো ?'

'আপনার হুকুম তামিল করতে আমরা সর্বদাই তৈরী কর্নেল।'

হোপ হাসলেন। তার পর সহসা বাইরের দিকে চেয়ে পর্দার মধ্যে দিয়েই অপেক্ষমাণ সপ্তম ব্যক্তির অস্তিত্বটা অনুভব করে বলে উঠলেন, 'বাইরে কে দাঁড়িয়ে ? তোমাদের সঙ্গে কেউ এসেছে নাকি ?'

'হ্যাঁ কর্নেল, ও হল কোয়েকার ওয়ালেস !'

'কোয়েকার ওয়ালেস ! সে আবার কে ?'

ম্যাকলিয়ড সামনে এসে আর এক দফা অভিবাদন করে বলল, 'যদি অনুমতি দেন তো বলি, ও একটি অদ্ভুত চীজ ! ওর নাম ওয়ালেস নয়, সেটা বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু কী যে নাম তাও জানি না। ঐ নামেই ও পরিচয় দেয়। এমনি সিপাইএর চাকরি করে, কিন্তু লেখাপড়া ভালই জানে। এমন কি, ল্যাটিন ফরাসী পর্যন্ত ভাল জানে।'

বাধা দিয়ে হোপ বলে উঠলেন, 'বল কি ! ল্যাটিন ফরাসী জানে—আর সে করে সিপাইএর চাকরি !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কি করা যাবে বলুন, ওকে অনেকবার কর্তারা প্রমোশন দিতে চেয়েছিলেন—ও-ই নেয় না। বলে যে, ও নাকি বিশেষ এক উদ্দেশ্যেই সেনাদলে নাম লিখিয়েছে, উন্নতিতে ওর দরকার নেই। তা থাকলে ও অন্য কাজে যেত।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি। ঐ ভাবেই থাকে। ওর যে কোন কুলে কেউ আছে তাও তো মনে হয় না। না ও কাউকে চিঠি লেখে—না কেউ ওকে চিঠি দেয়। কারুর সঙ্গে মেশে না, মদ খায় না, মুখ খারাপ করে না। রবিবারে-রবিবারে নিয়মিত উপাসনায় মন দেয়—যখন-তখন ভগবানের নাম করে। হাসি-ঠাট্টা তো কখনও শুনি নি ওর মুখে। সেই জন্যেই আমরা ওকে কোয়েকার* ওয়ালেস নাম দিয়েছি !'

'আশ্চর্য, অদ্ভুত লোক তো ! আচ্ছা ও-ও কি ৯৩-তে নাম লেখাতে এসেছে ?'

'তাই তো বলেছিল।'

'তবে বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ? একজন কেউ ওকে ডাক না !'

হেন্ডারসন নামে একজন গিয়ে ওয়ালেসকে ডেকে আনল। ধীর গম্ভীরভাবে সে ভেতরে এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল। তার সেলাম করা ও দাঁড়ানোর ভঙ্গি নিখুঁত।

ডসনই প্রথমে প্রশ্ন করলেন, 'তুমিও কি তিরানব্বুইতে নাম লেখাতে চাও ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' শান্তকণ্ঠে উত্তর দেয় ওয়ালেস।

'তা হলে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন ?'

'নাম লেখাবার আগে আমার একটা প্রশ্ন জানবার ছিল। খবরটা পেলে তবে

---

* অত্যন্ত গোঁড়া ধার্মিক এবং নীতিবাগীশ একটি খ্রীষ্টান সম্প্রদায়।

নাম লেখাতুম। সেই জন্যেই আগে এসে বিরক্ত করি নি। এ'দের কাজ চুকে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলুম।'

'এদের কাজ চুকে গেছে। এবার বল কী জানতে চাও।'

'আচ্ছা, হোপ বলে কি কেউ এই রেজিমেণ্টে নাম লিখিয়েছে?'

'হোপ?' কর্নেল হোপ চমকে ওঠেন।

'মাপ করবেন কর্নেল হোপ, আপনাকে কে না চেনে। আমি একজন সাধারণ সৈনিকের কথা জিজ্ঞাসা করছি। সেও বাহাত্তর নম্বর দলে ছিল।'

'আচ্ছা দেখছি।'

ডসন কতকগুলো খাতাপত্র দেখে বললেন, 'হ্যাঁ এই তো, কালই সে এখানে এসেছিল।'

'তা হলে আমারও নামটা লিখে নিন। দয়া করে যদি হোপ যে কোম্পানিতে থাকবে আমাকেও সেই কোম্পানিতে রাখেন তো বড় বাধিত হব।'

ডসন একটু বিস্মিত হয়ে তাকালেন। বললেন, 'আমার কাছেই আছে দেখছি। আচ্ছা তোমার নামও আমি এইখানে লিখে রাখলাম। বল—পুরো নাম ধাম বিবরণ।'

লেখার হাঙ্গামা চুকে গেলে ডসন প্রশ্ন করলেন, 'হোপ তোমার বিশেষ বন্ধু বুঝি?'

কয়েক মুহূর্ত মৌন হয়ে রইল ওয়ালেস। বোধ হল যেন তার চোখ দুটো বারেক হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মাথা নামিয়ে শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, 'না, ঠিক তা নয়।'

তার পর আর বাদানুবাদের অবসর না দিয়ে পুনশ্চ অভিবাদন করে বেরিয়ে এল।

কর্নেল হোপ দ্বারপ্রান্তেই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি প্রায় তার পিছু পিছুই বের হয়ে এলেন। পিছন থেকে ডাকলেন, 'ওয়ালেস, শোন।'

ওয়ালেস ঘুরে দাঁড়াল।

'তুমি নাকি খুব ভাল ল্যাটিন ও ফরাসী জান?'

'আজ্ঞে সে কিছু নয়—সামান্যই।'

'হিব্রু জান নাকি?'

'সে আরও কম—কাজ চলার মত।'

'আশ্চর্য, এত লেখাপড়া করে, শেষ পর্যন্ত···আচ্ছা, এই সিপাইএর কাজ ভাল লাগে তোমার?'

'ভাল লাগবে বলেই তো এসেছি কর্নেল—জীবনে আর কিছুই ভাল লাগার নেই আমার।'

বোধ করি সেনাপতির প্রতি সম্মানবশতই আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ওয়ালেস তাঁকে পুনশ্চ অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।···

আদ্রিয়ান হোপ যদি সে সময় তার পশ্চাদনুসরণ করতেন তো দেখতে পেতেন, ওয়ালেস সেখান থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গীদের মত 'তিন ভল্লুক চিহ্নিত' পানালয়ে ঢুকে মদ্যপান করতে বসে নি। সে সেখান থেকে বের হয়ে কিছু দূরে সমুদ্রের ধারেই গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে আর কেউ নেই। খড়ি-পাথরের পাহাড়ের যে অংশটা খাড়া সমুদ্রের ওপর ঝুলে আছে, সেই বড় পাথরের চাইটার

ওপরই গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওয়ালেস। তার পায়ের নীচে—অনেক নীচে বড় বড় নৌকোগুলো থেকে মদমত্ত কোলাহলের রেশ ভেসে আসছে—কিন্তু তার কান বা দৃষ্টি সেদিকে নেই। সে চেয়ে আছে দূর সমুদ্রের ঢেউগুলোর দিকে। সেখানে একটা জাহাজের মত বড় নৌকো শুভ্র পাল তুলে দূর চক্রবালে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওয়ালেসের চোখের দৃষ্টি স্থির, বোধ করি বা পলকও পড়ছে না। তার দীর্ঘ ঋজু দেহটাও তেমনি অনড়—শুধু বাতাসে তার মাথার চুল ও গায়ের কামিজটা সামান্য উড়ছে মাত্র। পশ্চিমের অস্তরাগ তার মুখের শুভ্র ধূলিকণায় পড়ে অপূর্ব এক বর্ণ-বিপর্যয় ঘটিয়েছে।

অনেকক্ষণ সেই ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর কামিজের মধ্যে হাত ঢুকোল সে। গলায় ঝুলোনো সূক্ষ্ম চেন-এ বাঁধা একটি ক্রস আর তার সঙ্গে সুকৌশলে লাগানো একটি লকেট। ওয়ালেস লকেটটি বের করে খুলতেই দেখা গেল তার ভেতর এক রমণীর চিত্র সযত্নে অঙ্কিত রয়েছে। কঠোর-হৃদয় সংযত-চরিত্র ওয়ালেসের এই গোপন রহস্যটুকুর সন্ধান পেলে, শুধু হোপ কেন, অনেকেই বিস্মিত হতেন। এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ওয়ালেস। তার চালচলন ভাব-ভঙ্গির সঙ্গে কোনমতেই স্ত্রীলোকের যোগাযোগ ভাবা যায় না। বিশেষত যে পুরুষ নারীর প্রতিকৃতি বুকে ঝুলিয়ে রাখে, সে ধরনের পুরুষ ওয়ালেসের ঘৃণার পাত্র—এই কথাই সকলে এতকাল ভেবে এসেছে। আরও বিস্মিত হতেন তাঁরা, যদি তার কাঁধের পেছন থেকে উঁকি মেরে ছবিখানা দেখবার সুযোগ তাঁদের মিলত। কারণ ছবিটি কোন শ্বেতাঙ্গিনী নারীর নয়—অ-ইউরোপীয় কোন মহিলার।

ওয়ালেস অনেকক্ষণ একদৃষ্টে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার লকেটটি বন্ধ করে জামার মধ্যে পুরে ফেলল। তাকে এখনই ব্যারাকে ফিরতে হবে। দিবাস্বপ্নের সময় কোথা ?

॥ ১২ ॥

তাত্যা টোপীর বাড়ি থেকে অনেক রাত্রে আমিনা যখন নিজের মহলে ফিরে এল, তখন তার কতকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত অবস্থা। সন্ধ্যাবেলাকার সেই নিরুদ্বিগ্ন শান্ত ভাব নেই। চোখের কোলে যেন কে কালি লেপে দিয়েছে। বিলেতী প্রসাধনের প্রলেপ ভেদ করেও ললাটে ফুটে উঠেছে সারি সারি দুশ্চিন্তার রেখা। তাকে যৎপরোনাস্তি ক্লান্তও দেখাচ্ছিল। কিন্তু নিজের ঘরে ফিরেও একান্তে বিশ্রামের অবসর পেল না। মহলের প্রবেশ-পথেই সংবাদ পাওয়া গেল—আজিজন বিবি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘরের মধ্যেই অপেক্ষা করছেন।

ঈষৎ উদ্বিগ্ন মুখে আমিনা শুধু প্রশ্ন করল, 'পেশোয়াজী ?'

মুসম্মৎ হেসে বলল, 'ভয় নেই, তিনি আদালার ঘরে গেছেন।'

যে সংবাদে অপর কোন স্ত্রীলোকের ঈর্ষিত হবার কথা, সে সংবাদে যে তার মালেকান খুশী হন—এ তথ্যটি মুসম্মৎ ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছিল।

কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আমিনা নিজের ঘরে এসে ঢুকল। বোরখাটা খুলে মুসম্মতের হাতে দিয়ে একটা বড় গালিচায় একেবারে শুয়ে পড়ে সে আদেশ করল, 'জুতোটা খুলে নে, আর বনফসার শরবৎ তৈরী করে দিতে বল্—জলদি !'

আজিজন আমিনার মুখের দিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন হলেও সে উদ্বেগ প্রকাশ করল না। সে বুঝেছিল যে অপরিসীম ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার কোন কারণ

ঘটেছে, নইলে আমিনা এত বিচলিত হত না। সুতরাং সর্বাগ্রে তাকে বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া প্রয়োজন।

খানিক পরে বলকারক বনফসার শরবৎ পান করে আমিনা কতকটা সুস্থ হয়ে উঠল। একটা তাকিয়ায় ভর দিয়ে খানিকটা কাৎ হয়ে বসে বলল, 'কি খবর আজিজন?'

'টীকা সিং আর শামসুদ্দিন খাঁ কুঁয়ার সিং-এর কাছে গিয়েছিল।'

'তার পর?'

'কুঁয়ার সিং আমাদের দিকে যোগ দিতে রাজী হয়েছেন—কিন্তু একটি শর্তে।'

'কী শর্ত?'

'বাহাদুর শা বা নানাসাহেব—যে খুশি দোয়াবের মালিক হ'ন তাঁর তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু দোয়াবের পূর্ব দিকে পাটনা পর্যন্ত তাঁর চাই। এবং তিনি সেখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করবেন।'

আমিনা হাসল—ক্লান্ত ম্লান হাসি।

বলল, 'আশ্চর্য! এখনও এরা এই সব শর্তে বিশ্বাস করে! মুখে শর্ত করতে কি নানা কোনদিন পেছপা হবে? তার পর সে শর্ত মানবে কি না—সে তো ঠিক হবে গায়ের জোর বুঝে। কুঁয়ার সিং-এর যদি সে জোর থাকে তো তিনি পাবেন বৈকি!'

তার পর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজিজন, তুই তো কুঁয়ার সিংকে দেখেছিলি—কেমন লোক?'

আজিজন বলল, 'খাঁটি ইস্পাত। সে লোক তুমি নানার এই সব মোসাহেব-দের দেখে কল্পনা করতে পারবে না দিদি। অমন সাচ্চা মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। তা ছাড়া এত বয়স হয়েছে—শালের চারার মত সোজা আছেন এখনও। কে বলবে বুড়ো। কোন মানুষকে তো পরোয়া করেনই না—যমকেও না।'

আমিনা আর কথা বলল না। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আজিজনের ভেলভেটের পাজামার প্রান্তে সলমা-চুমকির কাজটার দিকে চেয়ে বসে রইল। চোখের দৃষ্টিতে যেন কোন্ এক সর্বনাশের ছায়া ঘনিয়ে আসছে—যে দৃশ্য তার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা ভীষণ অথচ মনোমুগ্ধকর। ললাটে চিন্তার রেখাগুলি আবারও একে একে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

আজিজন তা লক্ষ্য করল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। স্থির হয়েই বসে রইল।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে আমিনা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'তাই তো ভাবছি আজিজন, এই সব লোকগুলোকেও এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলছি! বেশ ছিল ওরা, হয়তো এমনিতে ভালই থাকত। ওদের এই নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে টেনে আনছি—ভাবতে বড় খারাপ লাগছে আজিজন।'

আজিজন কোন উত্তর দিল না। চুপ করেই বসে রইল। এমন ভাবান্তর আমিনার একেবারে নতুন নয়। এ ভাব আবার আপনিই কেটে যাবে।

খানিক পরে আজিজন বলল, 'তুমি তাত্যা টোপীর বাড়ি গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।' নড়ে-চড়ে বলল আমিনা, 'সেইখানে গিয়েই মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

'কেন?'

'ওখানে ছিলেন হেড মাস্টার গঙ্গাদীন। তাঁকেই তাত্যা পাঠিয়েছিল

ঝাঁসিতে। রানী লক্ষ্মীবাই রাজী হয়েছেন আমাদের দিকে যোগ দিতে। অবশ্য খানিকটা দেখে—অবস্থা বুঝে। আগেই নিজেকে জড়াতে তিনি চান না, তবে সহানুভূতি আছে ষোল আনা, গোপনে সাহায্যও করবেন বলেছেন।'

'সে তো আনন্দের কথা!'

'ঠিক আনন্দের কথা নয়, আজিজন। এ যুদ্ধের পরিণাম কি আমি জানি না ভাবছিস? দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি ইংরেজই শেষ পর্যন্ত জিতবে। কতকগুলো ইংরেজ মরবে—এইটে দেখবার নেশায় এ কি ছেলেমানুষি করে ফেললুম! যে আগুনে জ্বলবে, সে আগুনে আমরা পুড়ি, নানাসাহেবের মত লোক পোড়ে তাতে তো দুঃখ নেই, কিন্তু লক্ষ্মীবাঈ, কুঁয়ার সিং এঁদের কথা যে আলাদা। বেচারী লক্ষ্মীবাঈ—ছেলেকে সিংহাসনে বসাবে এই ওর স্বপ্ন। সে স্বপ্নের কি পরিণাম তা যদি জানত!' বলতে বলতে আমিনা আবার নীরব হয়ে গেল।

আরও কিছুক্ষণ একদিকে স্থিরদৃষ্টিতে চুপ করে তাকিয়ে থাকবার পর আমিনা পুনরায় বলল, 'আমি—তাত্যাকে অনুরোধ করলাম, লক্ষ্মীবাঈকে এই আবর্তের মধ্যে টেনে না আনতে। অনুনয় করলাম—কিন্তু তাত্যা রাজী হল না। সে হেসে বলল, 'ঐ জন্যেই স্ত্রীলোক এসব কাজের অনুপযুক্ত। অত বাছবিচার করতে গেলে চলে না। আমাদের প্রাণ কি প্রাণ নয়? লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রাণেরই কি এত বেশী মূল্য!'

এবার আজিজন কথা বলল, 'ঠিকই বলেছে তাত্যা, দিদি। মানুষের পাপের ভরা যখন পূর্ণ হয়, তখনই খোদা দৈব-দুর্বিপাক আনেন। আসে বান—ওঠে ঝড়—ভূমিকম্পে মাটি কেঁপে ফেটে বসে যায়। ঈশ্বরের সেই কোপ যখন পড়ে, তখন কি তুমি বলতে চাও, শুধু অপরাধীরাই শাস্তি পায়, আর নির্দোষিরা বেঁচে যায়? তা হয় না দিদি। যখন গ্রামকে গ্রাম ভাসিয়ে নদীর বন্যা আসে, তখন যে-সব ঘরবাড়ি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তার মধ্যে কি কোন সাধু-সন্ত-ফকিরের আস্তানা পড়ে না? নিশ্চয়ই পড়ে। এ সব বৃহৎ কাজে, ভয়ঙ্কর আয়োজনে নিতান্তই তুচ্ছ হৃদয়াবেগের কোন মূল্য নেই দিদি। মরবে বৈকি—কুঁয়ার সিং, লক্ষ্মীবাঈ—সবাই হয়তো মরবে। আর দেখ, এ কি নিতান্তই আমরা ওদের এর মধ্যে জড়াচ্ছি?—ওদের লোভই ওদের জড়াচ্ছে। আশি বছরের কুঁয়ার সিং স্বপ্ন দেখছে সমগ্র বিহারের মসনদ—লক্ষ্মীবাঈ স্বপ্ন দেখছে স্বাধীন ঝান্সির সিংহাসন। সেই লোভেই ওরা আসছে। তুমি মিছে মন খারাপ করে কী করবে?'

আমিনা যেন একটা ঘুম থেকে জেগে উঠল।

'ঠিক বলেছিস তুই। এসব আর ভাবব না। ইন্ধন—ওরাও ইন্ধন মাত্র। যজ্ঞ এখনও অপূর্ণ—এখন এসব ভাববার সময় নেই।'

আজিজন বলল, 'তাত্যাকে কেমন দেখলে?'

'তাত্যা ঠিক আছে।' আমিনা হেসে ফেলল, 'তাত্যাও কি আমাদের জন্যে এগোচ্ছে? তাত্যারও স্বপ্ন আছে আজিজন—সেও চোখের সামনে দেখছে সেই মারাঠা সাম্রাজ্য—এক ব্রাহ্মণ সেখানে সম্রাট। কিন্তু ব্রাহ্মণ কি নানা ধুন্ধুপন্থ? বোধ হয় না। সেই অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে তাত্যা নিজেকেই মনে মনে কল্পনা করছে—এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি, আজিজন। তাঁর স্বপ্নে বাহাদুরও নেই—নানাও নেই!'

আজিজনও হাসল। বলল, 'মানুষের এই লোভ-ঈর্ষা প্রভৃতি গুণগুলো আছে বলেই তো আমাদের সুবিধে দিদি। এরাই তো আমাদের প্রধান সহায়।'

আজিজন তার ওড়না গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল।

আমিনাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে তার পাশে এসে দাঁড়াল। তার পর তার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আসল কথাটা কি জানিস বহিন? আজ সন্ধ্যার পর আজিমুল্লার বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাত্যার ওখানে যেতে যেতে এক আশ্চর্য খোয়াব দেখেছি। খোয়াবই বা বলি কেন—আমি তোকে সত্যিই বলছি, আমি একটুও ঘুমুই নি। ডুলির চার দিকে তো ঘেরাটোপ দেওয়া—ভেতর অন্ধকার, আমি বেশ জেগেই ভাবতে ভাবতে চলেছি—'

এই পর্যন্ত বলে আমিনা চুপ করল। ততক্ষণে তার দু চোখ স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে, তারই মধ্যে সমস্ত মুখে ফুটে উঠেছে এক সর্বনাশা ঐকান্তিক প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা। সে যেন তখনও দেখছে সেই ছবি—যা কিছুক্ষণ পূর্বে অন্ধকার ডুলিতে দেখেছে। তার চোখের সামনে থেকে—জীবনের সামনে থেকে আর সব কিছুই যেন ধুয়ে মুছে গিয়েছে—আছে শুধু সেই স্বপ্ন। সে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থেকে যেন সমস্তটা আদ্যন্ত আর একবার দেখে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'তারই মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেলুম তাকে, যেন একটা সাদা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে সে আমার দিকে চেয়ে আছে। তার দু চোখে অনুনয়, সে যেন বলতে চাইছে—ফিরে যাও, ফেরো, তুমি এ-সবে এসো না। এ সর্বনাশের আগুন জেবলো না।...একেবারে স্পষ্ট চোখের সামনে দেখলাম।'

বলতে বলতে আমিনার সেই মৃদু কণ্ঠস্বরও কেঁপে উঠল বার বার। শুধু গলা নয়, সারা দেহই কাঁপতে লাগল।

শুনতে শুনতে আজিজনের মুখও বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার মসৃণ উজ্জ্বল ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল—ঠোঁট দুটি কিছুক্ষণ ধরে থর থর করে কাঁপল। তার পর যেন প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত এবং কঠিন করে নিয়ে শুষ্কস্বরে বলল, 'ডুলিতে যেতে যেতে ঘুমিয়েই পড়েছিলে দিদি, আর—আর তোমার বোধ হয় শরীর খারাপ হয়েছে। তাইতেই ঐরকম খোয়াব দেখেছ।'

আমিনার বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে আজিজন ধীরে ধীরে বার হয়ে গেল।

তার এই কঠিন সংযমে ঘা খেয়ে আমিনার হৃদয়াবেগ লজ্জিত, সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। সে যেন নিজেকে গোটাকতক ঝাঁকানি দিয়ে প্রকৃতিস্থ করে নিল। ছিঃ ছিঃ! এ কী করছে সে! সত্যিই সে পাগল হয়ে গেল নাকি!...

খানিকটা সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কণ্ঠস্বরকে সহজ করে নিয়ে মুসম্মৎকে ডেকে আদেশ করল, 'গোসলখানায় গরম পানি দিতে বল, আমি স্নান করব।'

'স্নান করবেন! এত রাত্রে?'

'হ্যাঁ। আমার শরীরটা ভাল নেই—স্নান না করলে ঘুমোতে পারব না। আর শোন্, হাকিমের কাছ থেকে যে ঘুমের ওষুধ আনিয়েছিলুম, তার খানিকটা আছে তো? আমাকে রাত্রে দুধের সঙ্গে সেই ওষুধ একটু দিস মনে করে।'

॥ ১৩ ॥

সুখ বস্তুটা সংসারে বুঝি শান্তির মতই দুষ্প্রাপ্য। আমাদের হীরালাল এ কথাটা আজকাল কতক কতক বুঝতে শুরু করেছে।

অথচ কিছুদিন আগেও যে অবস্থাটা সুখের সর্বপ্রধান অন্তরায় বলে বোধ হয়েছিল, সে অবস্থা এখন আর নেই। চাকরি পেয়েছে। চৌধুরীর পরামর্শ ঠিক ঠিক খেটেছে—কতকটা দৈববাণীর মতই। কাজ ভাল—বেতন আরও ভাল। মৃত্যুঞ্জয় একদা যে বেতনে কাজে ঢুকেছিলেন তার চেয়েও পাঁচ টাকা বেশী বেতনে সে বহাল হয়েছে, সেজন্য মৃত্যুঞ্জয় প্রকাশ্যেই একটু ঈর্ষিত—যদিচ ভাগ্নেকে একটু একটু যেন সমীহ করে চলছেন আজকাল। তবু হীরালালের মনে তেমন সুখ নেই।

প্রথমত মামার ঈর্ষায় সে ব্যথিত। বেশ একটু অসুবিধাও বোধ করে। কারণ সময়ে-অসময়ে কোথা দিয়ে যে তাঁর মর্মভেদী বাণ এসে বেঁধে তার ঠিক নেই।

কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়।

আসলে ইদানীং একটা চিন্তা তাকে যেন পেয়ে বসেছে, সে তার জীবন-দাত্রীর চিন্তা।

কে এই হুসেনী বেগম? বার বার নিয়তির মতই তার জীবনে আবির্ভূতা হচ্ছেন। এ কি সত্যই ঈশ্বরের অনুগ্রহ? তার মা প্রত্যহ মা-কালীকে ডাকেন, তাঁর পটের সামনে জবাফুল না দিয়ে কোনদিন জল খান না। আবার তুলসীতলাতেও নিত্য সন্ধ্যায় প্রদীপ দেন, নিত্য প্রত্যূষে জল দেন, মার্জনা করেন। এই দৈব অনুগ্রহ কি তারই ফল? এক-এক বার মন সেইটেই বিশ্বাস করতে চায়, আবার সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুমন তার—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুণ্ঠিত সংকুচিত হয়ে পড়ে। হিন্দু দেবীদের কোন অনুচরীকে মুসলমান মহিলারূপে কল্পনা করে অপরাধ করে ফেলছে না তো! মা-কালীর কোন ডাকিনী-যোগিনীকে কল্পনা করা হয়তো তত দোষের নাও হতে পারে, কিন্তু এই দেবী-প্রতিমার মত সুন্দরী মহিলার সঙ্গে সে রকম যোগাযোগ ভাবতেও ঠিক মন চায় না। এবং এই প্রসঙ্গে এমন কথাও তার মনে এক-এক সময় উঁকি মারে—এই ধরনের সুদূরতম কল্পনাতেও সে হয়তো মুসলমান নবী বা পীরদের কাছে কিছুটা অপরাধী হয়ে পড়েছে। ওদের দেব-দেবী নেই—ঈশ্বর আছেন, আর আছেন পীররা। এই কথাই সে জানে। মোট কথা তার অপরিপক্ব অপরিণত মনে প্রশ্নটা নিয়ে অশান্তির আর অবধি নেই।

এই যখন অবস্থা, তখন সহসা হীরালালের ওপর বুঝি ঈশ্বর আবারও প্রসন্ন হলেন। মীরাট থেকে কতকগুলি মাল কানপুর গ্যারিসনে পাঠানো হবে, তার সঙ্গে সিপাহী-সার্জেণ্ট তো যাবেই—একজন বাবুকেও যেতে হবে, এখান থেকে হিসেব বুঝে নিয়ে সেখানে বুঝিয়ে দেবার জন্যে। জেনারেল বাহাদুর এই কাজের জন্যে হঠাৎ হীরালালেরই নাম করে বসলেন। মেজর সাহেব তাকে ডেকে জেনারেলের ইচ্ছা জানিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি যাবে তো? কোন আপত্তি নেই?'

হীরালাল মনিবের এই সুনজরের মধ্যে ঈশ্বরেরই অনুগ্রহ দেখতে পেল। কিছুদিন ধরেই সে ভাবছিল যে, যদি কখনও কানপুর যাবার সুযোগ-সুবিধা

মেলে তো সে একবার হুসেনী বিবির খোঁজখবর করবে। অবশ্য তাঁর ঠিকানা জানে না হীরালাল—তিনি ঠিকানা দেনও নি। কিন্তু তাঁকে যে সুপারিশ-চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তা এসেছিল কানপুর গ্যারিসন থেকে। কানপুর থেকেই সেই লোকটি এসেছিল উক্ত চিঠি বহন করে। সুতরাং মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা তার ছিল যে, ওখানে গেলে একটা হদিস পেলেও পেতে পারে। তবে সেই সুযোগ যে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এত তাড়াতাড়ি মিলবে তা ভাবে নি। মনে মনে আর এক বার সে মাকে তথা মা-কালীকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখে বলল, 'নিশ্চয়ই সাহেব, মনিবের আদেশ পালন করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।'

সাহেব খুশী হলেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'দ্যাট্স্ গুড। দ্যাট্স্ দ্য প্রপার অ্যাটিচ্যুড। অল রাইট্, তুম্ যাও, সুবহ্ রওনা হোনে পড়েগা। তৈয়ার হো লেও।…ইউ মে গো চ্যাটার্জি।'

অফিসের ফেরত হীরালাল বাসায় ফিরে দেখল সংবাদটা তার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। ফলে নরক গুলজার হয়ে উঠেছে একেবারে। জেনারেল সাহেবের এই নির্বাচন পক্ষপাতেরই নামান্তর। অতএব ছোকরার যে বরাত ফিরে গেল, তাতে আর সন্দেহ নেই। এই পক্ষপাতের হেতু নিয়েই সকলে আলোচনা শুরু করেছেন। কী সূত্রে কেন সে বড় সাহেবের নজরে পড়ল—এইটেই সকলের আলোচ্য।

চৌধুরী বললেন, 'অল্প বয়স, ফুটফুটে দেখতে, মন দিয়ে কাজ করে—তাই সাহেবের চোখে লেগেছে। এতে আর অত গভীর অর্থ খোঁজার কী আছে!'

মুখুয্যে মাথা নেড়ে বললেন, 'রেখে ব'স দিকি, ভারি ফুটফুটে! সাহেবের কাছে আবার বাঙালী ফুটফুটে!'

'না, মানে বাঙালী যারা আছে তাদের মধ্যে তো—'

'উঁহু, উঁহু, অত সহজ নয় রে বাবা। আর কোন ব্যাপার আছে। সেই যে-সাহেব ওকে চিঠি দিয়েছিল, সে নিশ্চয়ই জেনারেল হুজুরের কোন প্রিয় বন্ধু!'

'তাতে কি? প্রিয় বন্ধু লিখেছে, চাকরি দিয়েছে—ফুরিয়ে গেছে ব্যাপার।' দত্তমশায় বলে উঠলেন, 'তার জন্য এ-রকম আ-দেখলে কাণ্ড করবে কেন? আমরা এতগুলো লোক থাকতে আমাদের ডিঙিয়ে, ও ছোকরাকে এ ভার দেবার মানেটা কি? কী কাজ জানে ও? কতদিন এসেছে, বয়সই বা কত?…এখনও মুখে দুধের গন্ধ, তেঁতুলতলায় গেলে গলায় দই বসে।…তাই কি ওদেরই লাভ হবে? এই যে যাওয়া-আসা, এর ভেতর কত দিক থেকে কত উপরি রোজগার হতে পারে সে জ্ঞান ওর আছে? ওরও লাভ হবে না—আমাদেরও লোকসান গেল।' সক্ষোভ দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন দত্তমশাই।

'এ সেই মোচলমান মাগী!' হুঙ্কার ছেড়ে ওঠেন মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী, 'আসলে সেই মোচলমান মাগীর কাণ্ড, এটা বুঝলে না বাপু? কে জানে সে বেটী কার কে—হয়তো জেনারেল সায়েবের সঙ্গেই তার আশনাই আছে।…কিংবা তাকে খুশী করলে জেনারেল সায়েবের লাভ। মোদ্দা সেই মাগীই আছে এর মধ্যে এই আমি বলে দিলুম। তা নইলে আমরা সবাই থাকতে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবে কেন? এমন ছিষ্টিছাড়া আহেক্সা কাণ্ড বাপের জন্মে দেখি নি!…

বলি কাজের ও জানেই বা কি—বোঝেই বা কি! কাজের দরকার থাকলে আমাদেরই ডাকত।'

সত্যিই, এ কথাটা তো হীরালাল ভেবে দেখে নি!

তবে কি এর মধ্যেও সেই দেবীর কোন হাত আছে? তবে কি—তবে কি তারই আশা সফল হতে চলেছে?

'এই যে বাপু নবাব-সায়েব এসেছ! শোন এদিকে—শুনে রাখ। যা বলছি মন দিয়ে শোন। হঠাৎ-বড় সায়েবের নজরে পড়ে গেছ বলে যেন ধরাকে সরা দেখো না! ও আমরা অমন ঢের দেখলুম। আজ সুনজরে আছ, কালই হয়তো বুটের ঠোক্কর মারবে। কথাতেই বলেছে——"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।" কাজেই এখন যা বলি মন দিয়ে শুনে রাখ। যখন দিন দিয়েছেন ভগবান, দিন কিনে নাও!'

এই বলে মৃত্যুঞ্জয় বিস্তৃত এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্দেশ দিতে লাগলেন: কোন্ বস্তুর চোরাবাজারে কী মূল্য—কোন্ বস্তু কী ভাবে সরাতে হয়—সাহেবদের হিসাব বোঝানো কত সোজা—হিসাবের মার-প্যাঁচ কত রকমের আছে—মালের রক্ষকদের সঙ্গে কী বন্দোবস্ত—কতর বেশী ভাগ দিলে বাজার খারাপ হয়—এরই বিস্তৃত তথ্যবহুল বিবরণ দিতে দিতে এক সময় রাত ঘনিয়ে এল। অন্য বাবুরা অনেক আগেই পুজো-আহ্নিকে চলে গেছেন। সেই অবসরে সর্বশেষে সর্বাধিক মূল্যবান উপদেশটি দিলেন—গলা খাটো করে বললেন, 'টাকা-কড়ি উপরি যা পাবে নিজের কাছে রেখো না. ধরা পড়লে বিপদ! আমার কাছে রেখে দিও। মারা তো যাবে না!'

তার পর কণ্ঠস্বর এক পর্দা চড়িয়ে বললেন, 'খাওয়া-দাওয়াটি খুব সাবধান বাপু। দুটো পয়সা রোজগারের জন্যে বিদেশে এয়েছ; তাই বলেই যে জাতধর্ম খোয়াতে হবে, তার কোন মানে নেই!…হিন্দু সেপাইদের জন্যে রান্না হবে বটে, তা তাদের সঙ্গেও না-ই বা খেলে। নিজে দুটো ভাতে-ভাত গাছতলায় ফুটিয়েই খেও। বলে তো বামুন, ও বেটাদের কি জাতের ঠিক আছে! বিশ্বাস তো হয় না।'

এই বলে তিনি উঠে পড়লেন।

'শ্রীহরি! শ্রীহরি! পরমানন্দ মাধব!…নাও, তুমিও এবার মুখ হাত ধুয়ে সন্ধ্যেটা সেরে নাও। তোমাকে আবার রাতের মধ্যেই গোছগাছ করে নিতে হবে তো! যাই, আমিও পুজোয় বসি গে। তোমার সঙ্গে বকতে বকতে বাপু সন্ধ্যে হয়ে গেল। এখন আর পুজো না সেরে দুধটা খেতে পারব না। জয় মা!'

তিনি চলে গেলেও হীরালাল বসে রইল। কত কী ভাবতে লাগল বসে বসে। নতুন কাজ, নতুন কর্তব্য। একদিকে গুরুজনদের অসাধু উপদেশ—আর একদিকে অন্তরের উচ্চ আদর্শ, যার নির্দেশ—'অধর্ম ক'র না কখনও, সত্যপথে থাকবে, অধর্মের পয়সা কখনও থাকে না।' এক সময় মনে হল—না গেলেই হয়, অসুখের অছিলায় স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু নতুন দেশ দেখার মোহ, তাও কতকটা আছে বৈকি। আর আছে তার সঙ্গে একটা আশা, হয়তো এবার সে তার জীবনদাত্রীর দেখা পাবে আর এক বার।

খড়মে খটাখট শব্দ তুলে পট্টবস্ত্র-পরিহিত মুখুয্যে বের হয়ে এলেন, বললেন, 'কি বাবাজী, এখনও ওঠ নি! নাও নাও সন্ধ্যেটা সেরে নাও।

একটু দুধ আর মোহনভোগ মুখে দাও। তোফা মোহনভোগ করেছে ঠাকুর।'

তার পর এদিক-ওদিক চেয়ে গলাটা নামিয়ে বললেন, 'মাইনেই বল, আর উপরিই বল—মামার হাতে যেন ভুলেও ধরে দিও না। যা পাবে নিজের কাছে রাখবে, নয়তো আজকাল ডাকে দিব্যি যাচ্ছে—পাঠিয়ে দেবে। নইলে এদেশের বেনিয়াদের গদিতে জমা দিয়ে হুণ্ডি নেবে। মামার খপ্পরে পড়েছ কি গিয়েছ। সে পয়সার মুখ আর দেখতে হচ্ছে না।'

এই পর্যন্ত বলে আবারও এদিক-ওদিক দেখে নিলেন তিনি, তারপর গুন্‌গুন্ করে একটি টপ্পা গাইতে গাইতে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

হীরালাল উঠল বটে, তবে তার তখন অভিভূতের মত, মোহাবিষ্টের মত অবস্থা। এক-এক বার সকলের অজ্ঞাতসারে মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে দেখতে লাগল—সে প্রকৃতিস্থ আছে তো?

পরের দিনই যাত্রা শুরু হল। কিছু জরুরী মাল আছে—নৌকোয় বা বলদে-টানা গাড়িতে পাঠানো চলবে না। ঘোড়ায়-টানা মালগাড়িতেই পাঠানো সাব্যস্ত হয়েছে। মালের সঙ্গে আটজন সিপাহী এবং একজন সার্জেণ্ট যাবে। তারাও ঘোড়ায় চড়ে যাবে। হীরালাল ঘোড়ায় চড়তে জানে না—মেজর হুকুম দিয়েছেন, সে একটা মালের গাড়িতে চালকের পাশে বসে যাবে। হীরালাল বেঁচে গেল। তবে তার সঙ্গে যে সার্জেণ্ট যাচ্ছিল, সে সাহস দিয়ে বলল, 'ডোন্‌ট্ ফিয়ার বাবু, হাম্ তুম্‌কো তিন রোজমে শিখলায় দেগা। সমঝা?'

হীরালালও প্রতিজ্ঞা করেছে—সার্জেণ্ট সাহেবের এই অনুগ্রহ সে অবহেলা করবে না, ঘোড়ায় চড়াটা সে শিখেই নেবে।

যাত্রার প্রথম কয়েক দিন কতকটা একঘেয়ে ভাবেই কাটল। প্রত্যূষে যাত্রা শুরু হয়—বেলা দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত একটানা গাড়ি চলে। তার পর একস্থানে ভাল দোকান-বাজার দেখে ঘোড়া খোলা হয়। পথেই সহিস পাওয়া যায়—তারা ঘোড়াগুলিকে খাওয়ানো ও দলাই-মলাইয়ের ভার নেয়। সিপাইরাও দু দলে রান্না করতে বসে। সার্জেণ্টটি মুসলমান সিপাইদের ভাগে পড়েছে—হীরালাল পড়েছে হিন্দুর দলে। মামার নির্দেশ সে রাখতে পারে নি, রাখতে চায়ও নি। সিপাই রামলগন তেওয়ারীকে তার মামার চেয়ে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলেই বোধ হয়েছে। তার হাতে খাওয়ায় আপত্তি কি? রামলগনেরই বরং গোড়ার দিকে আপত্তি ছিল। কারণ একে সে মছলি-খোর বাঙালী, তায় সে আবার 'চাওল' বা ভাত-খোর। তার জন্যে ভাত ফুটোতে হয়। সে গজগজ করে। শুধু সার্জেণ্টের শাসনে ও হীরালালের বিনয় ব্যবহারেই সে রাজী হয়েছিল। অবশ্য খাওয়া বলতে ডাল আর ভাত এবং একটা আলুর তরকারি, কিন্তু তাতে হীরালালের বিশেষ আপত্তি ছিল না।

আহারাদির পর তৃতীয় প্রহরে আবার গাড়ি ছাড়া হয়। রাত্রির প্রথম প্রহর পর্যন্ত চ'লে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে—মিলিটারি ঘাঁটি বা কোন থানায় পৌঁছলে তবে যাত্রা-বিরতি ঘটে। তখন আবার সেই ঘোড়ার পরিচর্যা, আহার্য প্রস্তুত এবং শয়ন। এই-ই চলছিল।

অকস্মাৎ একটু বৈচিত্র্য দেখা দিল পঞ্চম দিনে মেড়ু* পৌঁছে। সন্ধ্যার

* বর্তমান নাম হাথরাস।

পর এসে ঘাঁটিতে পেঁছিনো হয়েছে। প্রাথমিক ব্যবস্থাদির পর হীরালাল নিশ্চিন্ত হয়ে একটা গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছে—অর্থাৎ কম্বলখানা বিছিয়ে সটান হয়ে শুয়েছে। সারাদিন গাড়ির চালে বসে কোমরের যা অবস্থা হয় তা অবর্ণনীয়। এখন ভুক্তভোগীও কেউ নেই যে বুঝবেন। তখন পাকা সড়ক বলতে কিছু খোয়া বা পাথর-বিছানো রাস্তা বোঝাত। তার ওপর দিয়ে লোহা-বাঁধানো চাকা গড়িয়ে আসার সময় যে ঝাঁকানি লাগে তা এখনকার পিচ-বাঁধানো পথে রবার-টায়ার চাকার গাড়িতে চড়ে অনুমান করা সম্ভব নয়। হীরালাল সারাদিন ধরে এই মুহূর্তটির স্বপ্ন দেখে—কখন কোমরটা সোজা করে গড়াতে পারবে।

অন্যদিন এই ভাবে শোবার সঙ্গেই ঘুম পায়। আজ কে জানে কেন পায় নি। সে শুয়ে শুয়ে অলসভাবে চেয়ে ছিল দূরের বড় আমগাছটার তলায়—যেখানে সিপাই রামলগন তেওয়ারী রান্না চড়িয়েছে এবং গঙ্গানন্দন চৌবে আটা সানছে—সেইদিকে। অকস্মাৎ লক্ষ্য করল—অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত আরও দু-তিনটি লোক তাদের কাছে এসে বসল। চেনা লোক এবং সজাতি নিশ্চয়—নইলে বিনা প্রতিবাদে 'চৌকা'র কাছে বসতে দেবার কথা নয়। সুতরাং হীরালালের তখন কোনও কৌতূহল না। লোকগুলি অনেকক্ষণ ধরে এই দু জনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাল—কিন্তু খুব নীচু গলায়। একেবারে কাছে না হলেও হীরালাল খুব দূরেও ছিল না, তবু একটি শব্দও সে শুনতে পেল না—একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন ছাড়া। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার চোখের পাতা অবশেষে বুজেই এল।

একেবারে ঘুম ভাঙল আহারের ডাক আসতে। দূরে মুসলমান সিপাহীদেরও খানা তৈরী হয়ে গেছে—একটা চাদর বিছিয়ে তারাও আহারে বসেছে। সার্জেণ্টের দেখা নেই। সে এখানেই কোথায় শৌণ্ডিকালয় আবিষ্কার করেছে, সুতরাং অচিরে ফেরবার আশা কম। তার রুটি ও কাবাব সরানো আছে।… হীরালাল দূরে থেকে তাদের বার্তা নিয়ে আমগাছতলায় এসে খেতে বসল। প্রত্যেকেরই থালার পাশে এক-একটা লোটা ছিল। নিজের লোটা নিয়ে একটু দূরে গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে এল হীরালাল। গাড়ি থেকে নেমেই মুখহাত ধুয়ে সন্ধ্যা-গায়ত্রীটা সেরে নিয়েছিল। কিন্তু কাপড় ছাড়া হয় নি। এত কাপড় মুসাফিরিতে কাচা ও শুকোনো অসম্ভব। প্রত্যূষে সকলের সঙ্গে সেও স্নান সেরে যাত্রা করে—পথে যেতে যেতেই ভিজে কাপড় শুকোনো চলে। ওসব আর বার বার সম্ভব নয়।

আহারে বসবার সময় পর্যন্ত ঘুমটা ভাল করে ছাড়ে নি। খানিক পরে ছাড়ল। দৃষ্টি পরিষ্কার হলে দেখল তার অদূরে বসে যারা খাচ্ছে তাদের মুখভাব অস্বাভাবিক গম্ভীর। কারণটা বুঝতে না পেরে সে রুটি চিবোতে চিবোতে বার বার সেদিকে তাকাতে লাগল (রাত্রে কেউ আর ভাতের হাঙ্গামা করে না, তার জন্য অনভ্যস্ত রসনায় রুটি চিবোতে বহু বিলম্ব হয়), কিন্তু তবু ও-পক্ষ থেকে কোন সাড়া এল না। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে রামলগন স্তব্ধতা ভেঙে নীচু গম্ভীর গলাতেই বলল, 'বাঙ্গালী বাবু, একঠো বাত বোলেঙ্গে! লেকিন কসম খাও পহলে, কোইকো বোলোগে নেহি!'

উৎসুক—কিছু বা উৎকণ্ঠিত ভাবেও মুখ তুলে চাইল হীরালাল। মাথা নেড়ে বুঝি সম্মতি জানাল। তখন গলাটা সাফ করে নিয়ে রামলগন আসল

কথাটা পাড়ল।

হিন্দুস্তানের সিপাইরা সব মন স্থির করেছে—তারা আর বিধর্মী আংরেজের শাসনে থাকবে না। আকাশের থমথমে ভাব দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু শিগগিরই ঝড় উঠবে। নিঃশব্দে ও অলক্ষ্যে তার আয়োজন চলছে। সে মহাপ্রলয়ে ক্রিস্তান কেউ ভারতে থাকবে না—তা একেবারে নিশ্চিত। এখন কথা হচ্ছে যে, সেরকম সময়ে বাংগালী বাবুরা কী করবে—সিপাইদের দিকে যোগ দেবে, না বেইমানি করবে?

কথাটা এতই অবিশ্বাস্য—অন্তত হীরালালের কাছে যে, সবটা মাথার মধ্যে ধারণা করে নিতে কিছু সময় লাগল। তার পর মুখের খাদ্যটা যত শীগগির সম্ভব গলাধঃকরণ করে বলল, 'কিন্তু এইটেই যে বেইমানি!'

'কোন্‌টা?'

'এই ইংরেজদের সংগে লড়াই করাটা।'

'কেন?'

'আমরা তাদের নিমক খাই। মাইনের চাকর।'

'সে মাইনে তারা কোথা থেকে দেয়?…তারা বেইমানি করে এদেশের রাজগী নেয় নি? তারা কী করতে এসেছিল? মুঘলদের কাছ থেকে ভিক্ষে করে এক টুকরো জমি নিয়ে দোকান খুলতে! বেইমানদের সংগে আবার ইমানদারি কিসের?' গঙ্গানন্দন বেশ বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলল।

হীরালাল খানিকটা চুপ করে রইল। তার পর বলল, 'সে বিচার ভগবানের। কিন্তু আমরা ওদের চাকরি করি, আমরা ওদের নিমক খাই—এটা তো ঠিক? আমরা কেমন করে নেমকহারামি করব?'

'তা হলে তোমরা কেউ আমাদের দিকে আসবে না? দুশমনি করবে?'

'সকলের কথা কেমন করে বলব? তাছাড়া তোমাদের দিকে না এলেই বা দুশমনি করব কেন? কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা থাকলেও…তোমরা তো মহাভারত পড়েছ, ভীষ্ম ভগবান কি পাণ্ডবদের ভালবাসতেন না? রাজত্ব তো তাঁদেরও, কিন্তু তবু দুর্যোধনের কাছে বেতন নিয়েছিলেন বলে তার হয়েই লড়াই করতে হল—পাণ্ডবদের দিকে যেতে পারলেন না। তবে?'

বোঝা গেল এরা মহাভারত পড়ে নি, অথবা তাকে প্রামাণ্য বলে মনে করে না। সুতরাং সে কথায় তারা বিশেষ আমল দিল না। বরং আপসে গুজ-গুজ করে বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই কী সব বলাবলি করতে লাগল। তার মধ্যে থেকে 'ভ্রস্‌ট্‌' 'বেইমান' 'বে-শরম' প্রভৃতি বিশেষণগুলি মাত্র হীরালালের কানে গেল। সে গোলমাল করল না, করে লাভও নেই। এরা পাঁচ জন আর সে একা—সুতরাং নীরবে বসে বাকী আহারটুকু সম্পূর্ণ করে নিল। একেবারে লোটা ও থালা হাতে যখন সে উঠে দাঁড়িয়েছে, তখন রামলগন আবার কথা বলল, 'দেখ, কসম খেয়েছ মনে রেখো, কথাটা কাউকে বলবে না। আর যদি বল তো তোমার জানের কোন দাম থাকবে না, হুঁশিয়ার!'

হীরালাল বলল, 'দোস্তির এটাই যে বড় কথা তা জানি ভাই। চুক্‌লি আমি খাব না কিছুতেই। কিন্তু তোমরা কথাটা ভেবে দেখ এখনও।'

'বহুৎ ভেবে দেখেছি আমরা। এখন তোমরা ভাব। আসলে তোমরা ভীতু, তাই সাহেবদের সংগে লড়াই শুনলেই কেঁপে ওঠ, কেমন করে গোলমালটা এড়াবে তাই ভাবতে বস।'—একজন টিটকিরি মেরে বলল।

থালা মেজে থালা ও লোটা জমা করে দিয়ে হীরালাল এসে নিজের আসনে বসল। এখনও বেশ ঠান্ডা—ঘরেই শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সে তখনই কম্বল খোটাল না, সেখানেই বসে বসে কত কী ভাবতে লাগল।

একটা গোলমালের আভাস সে মীরাটেই পেয়েছিল সাহেবদের চোখেমুখে, বাবুদের কথায় টুকরোয়। কিন্তু সেটা যে এত আসন্ন এবং এমন অবশ্যম্ভাবী তা তো কল্পনাও করে নি।

অনেকক্ষণ সেই ভাবে স্থির হয়ে বসে রইল সে—তবু তার ক্লান্ত দেহে তন্দ্রার আভাস পর্যন্ত নামল না।

॥ ১৪ ॥

আরও দিন তিনেক পরে কানপুর পোঁছবার মুখে এক অঘটন ঘটে গেল।

আর মাত্র একদিনের পথ তখন বাকি। আগামীকালই মধ্যাহ্নে কানপুর পোঁছনো যাবে ভেবে হীরালালের মনটা খুশী। ফেরার মুখে দায়িত্ব থাকবে না—ক্লান্তিও কম হবে। খালি গাড়ি অনেক দ্রুত টেনে নিয়ে যাবে ঘোড়ারা। সেখানে ফিরে অবশ্য অদৃষ্টে দুঃখ আছে; কারণ উপরি সম্বন্ধে মামার উপদেশ-নির্দেশ একটাও সে কাজে লাগাতে পারে নি। সিপাহীরা উশখুশ করেছে—ওর ভাবগতিক দেখে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি; ফলে আরও বেশী রকম বিরক্ত হয়ে উঠেছে তার ওপর তাও সে জানে। তবু পারে নি। মামার তিরস্কার একরকম গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে—তা আর বেঁধে না। বিবেকের তিরস্কার আরও সাংঘাতিক, সেটার হাত এড়াতে পেরেছে—এই জন্যই সে কতকটা তবু নিশ্চিন্ত।

যা হোক, সে রাত্রে সে একটু হাল্কা মনেই ছিল। ঘোড়া খোলা হলে মালের পাহারা ঠিক আছে কিনা দেখে সে নিজের বোঁচকা-বুঁচকি সিপাইদের কাছে রেখে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বাইরে এল এবং লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে ডাকখানার* পাশের বিরাট আমবাগানটায় ঢুকে পড়ল। অন্ধকার রাত ঠিক নয়—শুক্লপক্ষের প্রথম দিক। তাই তখনও আমগাছগুলির ডগায় ডগায় অস্তগামী চাঁদের লালচে আলো লেগে আছে—বাগানের মধ্যে পায়েচলা-পথটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, হাঁটতে কোন অসুবিধা নেই। তা ছাড়া এদের লোক আমবাগানেরও 'পাট' করে—অদৃষ্টের ওপর ছেড়ে রাখে না—ফলে গাছতলাগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘাস-পাতার চিহ্নমাত্রও নেই। ঘনপল্লব গাছগুলির পাতার ফাঁক দিয়ে দু-এক জায়গায় প্রতিফলিত আলোতে চমৎকার আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে। হীরালালের তরুণ মন এখনই একেবারে টাকা-আনা-পাইএর মধ্যে নিজের সমস্ত কিছু বাঁধা দিয়ে বসে নি—তাই প্রকৃতির বিচিত্র রূপ আজও তাকে আকৃষ্ট করে, আজও সে প্রতিদিন সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সময় বিস্মিত উন্মনা হয়ে ওঠে।

সেদিনও এই আম্রবীথির মধ্য দিয়ে এই নিঃসঙ্গ অনর্থক ঘুরে বেড়ানো ভারি ভাল লাগছিল। এমন কি, এক সময় তার নিজের কণ্ঠের গুন্‌গুন্‌ সঙ্গীতও কোলাহল বলে বোধ হল। চারিদিকের নির্জন নিস্তব্ধতার সঙ্গে

* ঘোড়ার ডাক বদল করার আড্ডা।

নিজেকে একাত্ম করতেই বুঝি সে চুপ করে গেল এবং নিঃশব্দ লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এই ভাবেই কতক্ষণ যে ঘুরেছে তার নিজেরও খেয়াল নেই। অকস্মাৎ তার খুব কাছে—একেবারে পেছনেই—মৃদু পদশব্দ শুনে চমকে উঠল। মুখ ফেরাতে দেখল—কে একজন মানুষই বটে, তবে অন্ধকারে ভাল করে কিছুই ঠাওর হল না। সে ভাবল যে, সে বুঝি এমনি অনেকক্ষণ বেড়িয়েছে—ইতি-মধ্যে সিপাইদের রান্না শেষ হয়ে গেছে, তাই তারা ডাকতে পাঠিয়েছে কাউকে।

সে বলল, 'কে ভাই, রামলগন ?'

সাড়া মিলল না। যে আসছিল সে গতি কমালেও সোজা তার দিকেই আসছে।

'গঙ্গানন্দন ?'

সাড়া নেই।

'আশ্‌রেফীলাল ?'

তবুও সাড়া নেই।

অকস্মাৎ গা-টা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। চোর-ডাকাতও হতে পারে। তবে তার কাছে কী-ই বা আছে—চোর-ডাকাত কেন পিছু নেবে ? যা সামান্য কাপড়-চোপড় তাও তো ডাকখানায় সিপাইদের হেফাজতে। তবে ? তবে কি 'ওঁয়া'দের কেউ ? না, এত নির্জনে অন্ধকার বনপথে এতক্ষণ থাকাটা তার ঠিক হয় নি। দেখতে দেখতে গলাটা শুকিয়ে উঠল। গায়ত্রী জপ করলে নাকি এ রকম অবস্থায় সুরাহা হয় খানিকটা—অন্তত এ কথাটা সে বহুবার বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে শুনেছে। কিন্তু অদৃষ্ট এমনই খারাপ—ঠিক এই মুহূর্তে তার গায়ত্রীও মনে পড়ল না।

কিন্তু এসব চিন্তায় তার কয়েক পলকের বেশি যায় নি। এদিকে যে আসছিল, অমোঘ নিয়তির মতই সে একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল। ক্ষীণ পাণ্ডুর জ্যোৎস্না—কিন্তু তারই অস্পষ্ট আলোতে আগন্তুকের যতটা চোখে পড়ল তাতেই হীরালালের হাত-পা হিম হয়ে এল। তার সন্দেহই ঠিক। এ কোন অপদেবতা ! সাধারণ ভূতও নয়—খারাপ রকমের কোন প্রেত। কারণ যে আকার ধারণ করে এসেছে সে—সেটা দৈত্যাকৃতি। দীর্ঘ স্থূল দেহ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, একরাশ দাড়ি-গোঁফ এবং ক্ষুদ্র চোখের মধ্যে ভয়ংকর দৃষ্টি (এটুকু হীরালালের অনুমান)। সে প্রেতটা যে কেন সেই মুহূর্তেই তাকে ধরে ঘাড়টা মটকে দিল না, তা বুঝতে না পেরে শুধু তার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

কিন্তু অপদেবতাই হোক আর যা-ই হোক, যে এসেছিল সে মানুষের মতই কথা বলল। বরং আকৃতি হিসাবে কণ্ঠস্বরটা যেন কিছু মোলায়েমই শোনাল। বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে প্রশ্ন করল, 'আপনিই হীরালালবাবু ?'

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। উপর্যুপরি বিস্ময়ের আঘাতে হীরালাল হতভম্ব। কোনমতে মাথা নাড়ল সে। কিন্তু সে মাথা-নাড়া প্রেতটার চোখে পড়ল না। সে কিছু অসহিষ্ণু ভাবেই বলল, 'হীরালাল চ্যাটার্জী আপনি ?'

এতক্ষণে কণ্ঠে স্বর ফুটল—'হ্যাঁ।'

'ঠিক হয়েছে। আমার সঙ্গে আসুন।'

'কো-কোথায় যাব ?' কোনমতে প্রশ্ন করে হীরালাল।

'মালেকান আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'কে—কে বলেছেন?'

'মালেকান—হুসেনী বেগমসাহেবা।'

একসঙ্গে বুঝি মনের সেতারে সব-কটি তারে ঝঙ্কার উঠল। হীরালালের মনে হল সে চীৎকার করে ওঠে।

'হুসেনী বেগম? হুসেনী বিবি?'

'হ্যা, হ্যাঁ—তিনিই।' একটু অসহিষ্ণু ভাবেই উত্তর দেয় লোকটা।

'তিনি—মানে তিনি এখানে?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

দূরে একটা ক্ষীণ আলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে লোকটা বলল, 'এই বাগানের বাইরে ঐখানে একটা বাড়িতে তিনি অপেক্ষা করছেন।'

'ও, তা চল।'

হীরালাল সাগ্রহেই তার সঙ্গে চলল। কোন বদ্ মতলবে কেউ তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারে—এ কথাটা একবারও তার মাথাতে গেল না। কারণ তার এত কী দাম! তা ছাড়া হুসেনী বিবি বা হুসেনী বেগমের নাম গত কয়েকদিন ধরে বলতে গেলে সে জপ করেছে। হুসেনী বিবির দেখা মিলবে এ সম্ভাবনা ছিল একেবারেই সুদূর। কানপুর বিরাট শহর—সেখানে শুধু হুসেনী বেগম বললে কে তাকে সন্ধান দেবে?…এসব প্রশ্ন বারবারই তার মনে জেগে তাকে নিরুৎসাহ করেছে। সেই হুসেনী বেগম অপ্রত্যাশিত ভাবে তাকে নিজে এসে দেখা দেবেন—এ যে তার স্বপ্নেরও অগোচর। অত্যধিক আগ্রহে কোন প্রকার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার একটি কথাও তার মনে জাগল না। সে সেই জীবন্ত দানবটার পিছু পিছু যথাসম্ভব দ্রুত চলতে লাগল।…

আমবাগান পার হয়ে সংকীর্ণ একটা রাস্তা, তারই ওপর একতলা খাপরার চালের একটি এ-দেশী বাড়ি—অর্থাৎ জানালাহীন গারদখানার মত পদার্থ একটা। বাড়িটার সামনে পাঁচিল দেওয়া একটা 'হাতা' বা খালি জায়গা পড়ে আছে। ফটক দিয়ে সেই হাতাতে ঢুকতেই নজরে পড়ল সামনে বহুমূল্য ভেলভেটের ঘেরাটোপ দেওয়া একটা ডুলি। তার চার জন বাহক ডুলিটার মতই নিশ্চল নিস্তব্ধ ভাবে অপেক্ষা করছে। অর্থাৎ মালেকানের এটা বাসস্থান নয়—তিনিও এখানে আগন্তুক।

বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে—একান্তই জনহীন পোড়ো বাড়ি বলে মনে হয়। শুধু বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই যে ঘরটা তারই ভেতর আলো জ্বলছে। সেই আলোটাই বাগান থেকে নজরে পড়েছিল।

পথপ্রদর্শকের নির্দেশক্রমে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে হীরালাল সেই দরজাটার সামনে থমকে দাঁড়াল। ভেতরে যিনি ছিলেন তাঁকে দেখা গেল না। কিন্তু তিনি ওর উপস্থিতি টের পেলেন, বললেন, 'এস—ভেতরে এস।'

ঘরে একটা কুলুঙ্গিতে জোড়া মোমবাতি জ্বলছে। তার আলো খুব বেশি না হলেও অন্ধকার থেকে আসার জন্য হীরালালের কাছে সেইটেই যথেষ্ট উজ্জ্বল লাগল। এক লহমা চেয়েই সে বুঝল তার অনুমানই ঠিক—বাড়িটা পোড়ো বাড়িই। বহুকাল থেকেই খালি পড়ে আছে নিশ্চয়—ঘরের মেঝেতে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে। সে ধুলো কেউ পরিষ্কার করবারও চেষ্টা করে নি।

ঘরে আসবাবপত্রও বিশেষ নেই—মাঝখানে শুধু একটা খাটিয়ার ওপর কে একটা ছোট জাজিম বিছিয়ে দিয়েছে। তারই ওপর, খাটিয়ার একদিকের কাঠে সোজা হয়ে সন্তর্পণে বসে আছে হুসেনী বেগম। আর ঠিক তাঁরই সামনাসামনি একটা কাঠের বাক্স—তার ওপরও সাদা চাদর পাতা। সেই অদ্বিতীয় আসনটিই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মধুর হাস্যে ও মধুর কণ্ঠে হুসেনী বলল, 'ঐটেতেই ব'স—আর তো জায়গা নেই!'

যে দৈত্যটা পথ দেখিয়ে আনছিল সে আর ভেতরে ঢোকে নি—অন্ধকারকে যেন গাঢ়তর করেই বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে উদ্দেশ করে হুসেনী বলল, 'সর্দার, তুই বাইরে থাক—আর দোরটা ভেজিয়ে দে। কেউ যেন না ভেতরে আসে।'

বাইরের অন্ধকার থেকে একখানা হাত ভেতরে এসে কপাটের দুটি পাল্লাই টেনে বন্ধ করে দিল। নির্জন ঘরের মধ্যে রইল শুধু হীরালাল ও হুসেনী বেগম।

'কৈ, ব'স। বসছ না কেন? অমন করে অবাক হয়ে তাকিয়ে কী দেখছ?'

হুসেনীর কথায় হীরালালের যেন চমক ভাঙল। সত্যই সে বড় অভদ্রের মত তাকিয়ে আছে। কিন্তু না তাকিয়েই বা উপায় কী ছিল! হুসেনীকে সে এর আগে আর একবার মাত্র দেখেছে, কিন্তু তখন ভাল করে দেখবার মত অবস্থা বা মনোভাব ছিল না। সাধারণ সুশ্রী চেহারার একজন মহিলা—এই পর্যন্ত একটা ধারণা ছিল। সে যে এমন অসামান্য সুন্দরী, এমন অসাধারণ লাবণ্যবতী —তা যেন সে এই প্রথম দেখল। সে-রূপ আর সে-রূপসজ্জা অভিভূত করে দেওয়ার মতই। সুতরাং হীরালালকে বিশেষ কোন দোষ দেওয়া যায় না।

হীরালাল আত্মসংবরণ করে চোখ নামাল, তার পর নমস্কার করবে কি সেলাম জানাবে আজও তা ঠিক করতে না পেরে দুটোর মাঝামাঝি একটা ভঙ্গি করে বাক্সটার ওপর গিয়ে বসল।

হুসেনী আবারও হাসল। মধুর অভয়ভরা হাসি।—'কি বাবুজী, আমাকে চিনতে পার?'

নিমেষে কত কী উত্তর ভিড় করে হীরালালের কণ্ঠে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। সে যেন চিৎকার করে বলতে চাইল, 'চিনতে? আপনাকে চিনতে পারব না? তবে দিনরাত কাকে ধ্যান করেছি এতকাল। যাঁর দয়ায় আজও বেঁচে আছি, যিনি আমাকে দু-দু বার প্রাণে বাঁচিয়েছেন—তাঁকে চিনতে পারব না। আপনাকে কি ভোলা সম্ভব?' কিন্তু কেমন একপ্রকার সংকোচ তার কণ্ঠ রোধ করে ধরল। এসব কিছুই বলা হল না। শুধু নীরবে ঘাড় নাড়ল মাত্র।

'আমার লোক মীরাটে যে চিঠি তোমাকে পেঁছে দিয়েছিল, তাতে কাজ হয়েছে কিছু? না আগেই নৌকরি পেয়ে গিয়েছিলে?'

'না।' এতক্ষণে গলায় স্বর ফুটল, 'আপনার চিঠি না গিয়ে পেঁছলে কিছুই হত না।' তার পর কেমন একটা অসংলগ্ন ভাবে বলে উঠল, 'আমি—আমি সেদিন হতাশ হয়ে গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছিলাম।'

খিলখিল করে হেসে উঠল হুসেনী। তারপর মুখে একটা মমতাসূচক শব্দ করে বলল, 'এত ছেলেমানুষ তুমি! দুদিন এসে চাকরি পেলে না তো গঙ্গায় ডুবে মরতে হবে!...তোমাদের বুকের ছাতি বড় ছোট। ছিঃ! পুরুষমানুষ, কত কী-ই তো করবার আছে! ক্ষেতে কাজ করে, দোকান দিয়ে, পাথর ভেঙে—

কত রকমে অন্ন-সংস্থান করতে পারতে। দরকার হলে এক্কা হাঁকাতে—তাতেও শরম ছিল না। ইংরেজদের নৌকরিতে এত সুখ তোমাদের? ছিঃ!'

হীরালাল অধোবদনে বসে রইল। তার অবস্থা কেমন করে বোঝাবে সে? তাদের সমাজের, তাদের পরিবারের কথা। চাকরিই যে তাদের একমাত্র আশা এবং ভরসা। •

'ইংরেজের কাছে চাকরি করে এত সুখ পাও তোমরা? এরা দু দিন আগে কী ছিল তা জান বাবুজী? ঐ মুঘলদের কাছে, মারাঠাদের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে এতটুকু করুণা ভিক্ষা করেছে। তুমি তো ব্রাহ্মণ, ওরা তো ম্লেচ্ছ—ওদের কাছে চাকরি কর কী করে?'

'ওরা রাজার জাত। রাজা দেবতা।'

'কিসের রাজা ওরা, আজও বাহাদুর শা বসে আছেন তখ্‌তের ওপর।... ওরা বেনে—ব্যবসা করতে এসেছিল। যেমন ইরাণী সার্থবাহরা আজও আসে—তেমনি। কৈ, তাদের তো রাজা বল না। ছলনা প্রবঞ্চনা করে, নানা রকমের বেইমানি করে ওরা বাদশাকে কোণঠাসা করে বাদশা হয়ে বসেছে—ওরা রাজা?'

হীরালাল এবার মুখ তুলল। বলল, 'আমার বয়স কম। আমি বেশী দিনের কথা জানি না। আমি জ্ঞান হয়ে দেখছি যে, ওরাই এ-মুলুকের মালিক। মুঘল-বাদশার নাম এদেশে আমরা শুনেছি—আমাদের দেশে আজ কেউ নামও জানে না।'

'তবু নামে আজও তিনিই মালিক। ইংরেজ এখনও মালিকের নাম নিতে সাহস করে নি।'

হীরালাল চুপ করে রইল। এসব তর্কের জন্য সে প্রস্তুত হয়ে আসে নি। প্রাণদাত্রীর দেখা পেলে কৃতজ্ঞতা জানাবে—শুধু এই কথাই এত কাল ভেবেছে। তাঁর কাছে তিরস্কৃত হবে—একথা তার কল্পনারও অতীত।

বোধ করি হুসেনী তার মনোভাব বুঝল। সে কণ্ঠস্বর নরম করে আনল। 'শোন বাবুজী, তোমাকে ডেকে এনেছি—তার কারণ আছে। তুমি একদিন ঋণের কথা তুলেছিলে। আমি বলেছিলাম যে, সময় হ'লে আমি একদিন কড়ায়-গণ্ডায় সে ঋণ শোধ করে নেব। মনে আছে?'

'আছে বৈকি!' আবেগে হীরালালের গলা কেঁপে গেল, 'আপনি জানেন না—আমি জানি যে, আপনি একবার নয়—দুবার আমার প্রাণরক্ষা করেছেন। সে ঋণ আমি প্রয়োজন হয় তো প্রাণ দিয়েই শোধ করব।'

আবারও খিল খিল করে হেসে উঠল হুসেনী। মুক্তাঝরা সে হাসি। হাসলে মানুষকে এত সুন্দর দেখায় তা হীরালালের জানা ছিল না। একজোড়া মোমবাতির আলোতে যে এমন মোহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, তাও ছিল স্বপ্নের অগোচর।

'না না, অত ভয়ানক কিছু করতে হবে না তোমাকে। আর যা করতে হবে, তা একদিক দিয়ে তোমার কর্তব্য।'

এই বলে একটু চুপ করল হুসেনী। তার পর পুনশ্চ বলল, 'শোন বাবুজী, তোমরা যত সহজে ইংরেজকে মেনে নিয়েছ, আমরা তত সহজে পারি নি। তামাম হিন্দুস্তানের অনেকেই পারে নি। সিপাইরা ক্ষেপে উঠেছে, কারণ তাদের ধর্ম নষ্ট করবার কথা হচ্ছে। রাজারা ক্ষেপেছেন, কারণ তাঁদের বংশগত অধিকার ও মর্যাদায় হাত পড়েছে। হিন্দুস্তানব্যাপী আয়োজন চলছে

একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের, সেই অগ্নিতে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে, পবিত্র হয়ে, স্বাধীন হয়ে বেরিয়ে আসবেন দেশমাতা।'

'কিন্তু—কিন্তু সে যে বিদ্রোহ!'

'কিসের বিদ্রোহ? কে কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে? ন্যায্য অধিকার দাবি করা কি বিদ্রোহ? ইংরেজ যেদিন মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে, সেদিন সে বিদ্রোহ করে নি? যেদিন মারাঠামুলুকে পেশোয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, সেদিন সে বিদ্রোহ করে নি? মহীশূরে টিপু সুলতানকে উচ্ছেদ করা বিদ্রোহ নয়? আজ যদি বাদশা তাঁর অধিকার ফিরে পেতে চান—সেইটে হবে বিদ্রোহ?'

হীরালাল বিব্রত মুখে বলল, 'দেখুন, অত কথা আমি জানি না। তবে শুনেছি, লড়াই এমনি ওঁরা বাধান নি সব সময়ে। এদের তরফ থেকেও চুক্তি-ভঙ্গ এসব ছিল।'

'ঝুট্‌!' যেন গর্জন করে ওঠে হুসেনী, 'বেইমানি বিশ্বাসঘাতকতা এরাই শিখিয়েছে। এদের চেয়ে আর কেউ এসব বেশী জানে?'

বাইরে এই সময় খুব মৃদুভাবে শিকল নড়ে উঠল। যে দানবটা হীরালালকে ধরে এনেছিল, সে-ই বোধ হয় কপাটে মুখ রেখে বলল, 'মালেকান, ওদের খাবার এতক্ষণে তৈরী হয়ে গিয়ে থাকবে। বেশী দেরি করলে বাঙালী বাবুকে হয়তো খুঁজতে বেরোবে ওরা।'

'ঠিক আছে সর্দার। আমি তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছি।'

তার পর হীরালালের চোখের ওপর চোখ রেখে আমিনা বলল, 'দুবার তোমার জীবন রক্ষা করেছি, তুমি নিজেই স্বীকার করেছ। তার বদলে দুটি জিনিস আমি চাইছি। তা হলেই আমার ঋণ শোধ করা হবে।'

হীরালাল কথা বলল না, কেবল ব্যগ্র অথচ একটু ভীত দৃষ্টিতেই তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে যেন কেমন করে মনে মনে বুঝতে পেরেছে যে, যে হিসেব-নিকেশের জন্য সে ব্যস্ত, তার শেষ জমাখরচ অত সহজে হবে না।

হুসেনী বলল, 'সিপাইদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত। আজও যাদের দ্বিধা আছে, তাদের দ্বিধা আর থাকবে না। শুধু কমিসারিয়েট নিয়েই গোলমাল, কেননা ওটা পুরোপুরি আছে ইংরেজ আর বাঙালীদের হাতে। তোমাকে দুটি কাজ করতে হবে—প্রথম, বাঙালী বাবুদের বুঝিয়ে আমাদের দলে আনতে হবে; দ্বিতীয়, যখন দরকার হবে—কোথায় কি আছে রসদ-টসদ আমাদের খবরটা জানাবে। দেখ, এই দুটি কাজ করে দিলেই তোমার ছুটি—ঋণ শোধ!'

সে একটু উদ্বিগ্ন 'উৎসুক চোখে স্থির দৃষ্টিতে হীরালালের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হীরালালের সুগৌর মসৃণ ললাটে অনেকক্ষণই ঘাম দেখা দিয়েছিল—কতকটা ঘরের বদ্ধ আবহাওয়াতেও বটে, কতকটা উত্তেজনাতেও বটে। এখন সেই ঘর্মবিন্দুগুলি বড় বড় মুক্তার আকারে ঝরে পড়তে শুরু করল। তার সমস্ত মুখখানায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পর পর অনেকগুলি বর্ণ খেলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তা একেবারে শোণিতহীন বিবর্ণ হয়ে উঠল।

এ কি যুগপৎ পরম সৌভাগ্য ও একান্ত দুর্ভাগ্য তার!

ঋণ শোধ করবার কাম্য সুযোগ সামনে—অথচ তার কী চরম উপায়হীনতা! ভগবান এ কি বিপদে তাকে ফেললেন!

তার মুখের সেই বর্ণান্তর সামান্য বাতির আলোতেও হুসেনীর চোখ এড়ায়

নি। সে কিছুক্ষণ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করে তীক্ষ্নতর বিদ্রূপের সুরে বলল, 'কি, চুপ করে রইলে যে?'

এবার হীরালালকে কথা বলতেই হল। স্খলিত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'কী বলব তাই তো ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু আবাল্য এই শিক্ষাই পেয়েছি, বেইমানি বা নিমকহারামির তুল্য পাপ নেই। ইংরেজদের নুন খেয়েছি আমি—সে নুনের অপমান করতে পারব না।'

'কিন্তু সে নুন যে আদৌ ইংরেজের নয়।…আমাদেরই নুন—ইংরেজ চুরি করেছে।'

আবারও পুরাতন যুক্তি দিতে হ'ল।

'দেখুন, আমরা হিন্দু। মহাভারত আমাদের কাছে অতি পবিত্র বই। সে বইএর সবচেয়ে বড় চরিত্র হচ্ছেন ভীষ্ম। কৌরবরাও পাণ্ডবদের রাজ্য অধর্ম করে ভোগ করছিল। ভীষ্ম সেই সময়ই কৌরবদের কাছে চাকরি করেন—যদিও সে রাজ্যে সকলের আগে সব চেয়ে বেশী অধিকার ছিল ভীষ্মদেবেরই। তিনি তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন, তবুও তিনি যুদ্ধের সময় পাণ্ডবদের দিকে যেতে পারলেন না। অথচ পাণ্ডবদেরই তিনি ভালবাসতেন। তিনি চেয়েছিলেন ওদেরই জয় হোক। তিনি যেতে পারলেন না এই একই কারণে—কৌরবদের নিমক খেয়েছিলেন বলে।'

এক নিশ্বাসে—কতকটা বক্তৃতার ধরনে কথাগুলো বলে অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেল হীরালাল।

সে মাথা হেঁট করে ছিল, নইলে দেখতে পেত—হুসেনীর মুখভাব কঠিন হয়ে উঠেছে। সে কঠিন কণ্ঠেই বলল, 'তা হ'লে এই তোমার ঋণ-শোধের আগ্রহ! আমার ঋণ কি কিছুই নয়? ইংরেজদের নুন কি আরও বড়?…'

হীরালাল পরিধেয় ধুতিরই এক প্রান্ত তুলে ঘামটা মুছে নিল। তার পর ধীরে ধীরে বলল, 'আপনি প্রাণ দিয়েছেন আমাকে। আপনার জন্য প্রাণ দেওয়া আমার পক্ষে ঢের সহজ। হয়তো তাই দিয়েই আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, আপনার ঋণ শোধ করতেই চেয়েছিলাম।'

'থাক!' বিদ্রূপের সুরে বলে হুসেনী, 'তোমার ও প্রাণের এত দাম নেই। তোমার প্রাণ নিয়ে তুমি মার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাক গে।'

এই সমস্ত সময়টাই কিন্তু হুসেনীর তীক্ষ্ন দৃষ্টি একবারও হীরালালের মুখ থেকে সরে যায় নি। এখনও কথাটা বলে সে তেমনি ভাবেই চেয়ে রইল।

আবারও একবার আরক্ত হয়ে উঠল হীরালালের মুখ। কিন্তু কিছু পরে তেমনি বিবর্ণ হয়ে গেল। সে যেন কী জবাব দিতে গেল—কিন্তু দিতে পারল না। খানিকটা ইতস্তত করে সে একেবারে উঠে দাঁড়াল। হাত জোড় করে বলল, 'আমি হতভাগ্য, আপনার কাছে পেয়েই গেলাম—কিছু দিতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করতেও পারবেন না তা জানি। কিন্তু ঈশ্বর জানেন আমার উপায় নেই।…আপনার সামনে থেকে অকারণ আর বিরক্তি বাড়াতে চাই না। আমাকে বিদায় দিন।'

'দাঁড়াও!' তীব্র তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলে ওঠে হুসেনী—যেন এক লাফে কাছে এসে দাঁড়ায়। দু হাতে হীরালালের দুটো কাঁধ চেপে ধরে বলে, 'এখনই গিয়ে সাহেবদের খবরটা দেবে তো? প্রচুর ইনাম পাবে—না?'

'ছিঃ!' জিভ কেটে হীরালাল বলে, 'আমি অপদার্থ, কিন্তু ঠিক অতটা

অমানুষ নই বেগমসাহেবা। আমার দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে একথা কেউ শুনবে না।'

'তোমার কাছ থেকে এটুকুও আমি আর আশা করি না। তবু তোমাকে ছেড়েই দিলাম, নইলে—', একটু থেমে কঠিন এক রকমের হাসি হেসে সে বলল, 'নইলে ঐ বাইরে যে দাঁড়িয়ে আছে—তোমার মুণ্ডুটা শুধু হাতে করে ছিঁড়ে নিতে ওর এক লহমার বেশী সময় লাগত না।'

তার পর ছাড়তে গিয়েও আবার সে হীরালালকে একেবারে নিজের দিকে টেনে নিল—মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'দেখ—এখনও ভেবে দেখ। ঋণ শোধ ছাড়াও আরও কিছু পেতে পারতে। আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছ ? ভাল করে চেয়ে দেখ। আমি তোমার বাঁদী হয়ে থাকব। আমি। যেমন খুশী আমাকে কাজে লাগাতে পারবে।…অথচ, ভেবে দেখ, এতে তোমার লোকসান কিছু হ'ত না। আমরা জিতলে তুমি বড় চাকরি পাবে—ইংরেজ জিতলেও কিছু টের পাবে না, যেমন আছ তেমনি থাকবে। এতে তোমার ক্ষতি কিছু নেই—লোকসান নেই। সবই লাভ। না হয় দুটো দিন ভাববার সময় নাও।'

সে সস্নেহে নিজের রেশমী ওড়না দিয়ে হীরালালের মুখ মুছিয়ে দিয়ে দাড়িটা ধরে ওর আনত দৃষ্টি নিজের চোখের দিকে ফিরিয়ে ধরল।

হীরালালের সমস্ত দেহটা থর থর করে কেঁপে উঠল সে স্পর্শে। কিছুক্ষণের মত যেন সমস্ত সম্বিৎ চলে গেল—অবশ হয়ে এল তার সব অনুভূতি।

তার পরই প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে দুটি হাত জোড় করে বলল, 'আমাকে মাফ করবেন। আমি আপনার কোন কাজেই লাগলুম না। শুধু যদি এই অপদার্থ প্রাণটাকে কোন দিন আপনার দরকার হয় তো আদেশ করবেন—দেখবেন এক মুহূর্তও বিলম্ব হবে না তা আপনার সেবায় লাগাতে।… আপনি আমার জীবনদাত্রী, আপনি দেবী, আমি আপনাকে সেই চোখেই দেখি—সেই চোখেই দেখব চিরকাল।'

এই বলে কাঁধটা সংকুচিত করে কোনমতে হুসেনীর হাত ছাড়িয়ে একরকম ছুটেই দরজার কাছে এসে কপাটটা খুলে ফেলল।

কিন্তু তখনই বার হবার কোন উপায় ছিল না। সামনেই অচল পাহাড় একটা—সর্দার খাঁ পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে। সে প্রশান্ত কণ্ঠে সম্বোধনেই প্রশ্নটা করে নিল, 'মালেকান ?'

পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল হুসেনী। তেমনি ভাবেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলেশহীন কণ্ঠে জবাব দিল, 'যেতে দে !'

সেখান থেকে এক রকম ছুটেই বার হয়ে এল হীরালাল। বারান্দা থেকে নেমে হাতাটা পার হয়ে আমবাগানে পড়েও সেই ভাবেই খানিকটা দ্রুত হেঁটে চলল সে। তার পর একেবারে যখন পা দুটো কোনমতেই চলতে চাইল না, তখন অবসন্ন মূর্ছিতের মত একটা গাছতলাতেই বসে পড়ল।

দূরের সে আলোটা ততক্ষণে নিভে গেছে।

হীরালালের সেদিন সারা রাত ঘুম হ'ল না। সমস্ত রাত বসে বসে শুধু এই কথাটাই সে ভাবতে লাগল যে, আমবাগানে তন্দ্রার মধ্যে একটু আগে সে কোন স্বপ্ন দেখে এল,—না কি এসব সত্যই ঘটে গেল তার জীবনে? তার মত সামান্য প্রাণীকে কেন্দ্র করে এত বড় একটা নাটক অভিনীত হবে, এ যে একেবারেই অবিশ্বাস্য! তার এই অল্প কটি বছরের জীবনে কোন প্রকার বৈচিত্র্য বা নাটকীয়তার কোন ইতিহাসই কোথাও নেই—নিতান্তই অতি সাধারণ জীবন। অখ্যাত, অজ্ঞাত, নামমাত্র-শিক্ষিত দরিদ্র বালক সে, কোনমতে দিন-গুজরানের একটা উপায় হয়ে গেলেই যথেষ্ট। এর অধিক কোন কামনাও তার নেই। কিন্তু ভগবান তারই জীবনে এ সব কী গোলমাল বাধিয়ে তুললেন?

যদি এ স্বপ্ন না হয়, যদি সত্যই এইমাত্র যা সে দেখল ও শুনল—তা সত্যসত্যই দেখে বা শুনে থাকে তো এটা তার জীবনে একটা গুরুতর সমস্যা হয়েই দেখা দিল বৈকি! একদিকে তার স্নেহ-মমতাময়ী জীবনদাত্রীর অনুরোধ আর একদিকে কর্তব্যের ভ্রূকুটি। যদিচ সে তাঁকে উপেক্ষা করেই এসেছে এবং কর্তব্যকেই শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছে, তবু মন মানে কৈ! একজোড়া ভুবন-ভোলানো চোখের মিনতি, সুন্দর একজোড়া অধরোষ্ঠের কোণে কঠিন বিদ্রূপ, বাঁশির মত কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে অনুনয়ন ও ব্যঙ্গ—এ কি সহজে ভোলা যায়! বিশেষত হীরালালের এই নবীন বয়স, এই বয়সে ঐ রকম চোখের মিনতি নিয়তির মতোই দুর্লঙ্ঘ্য ঠেকে। এ বয়সে এমনি—কারও জন্যে কিছু করতে না পারলে জীবন ব্যর্থ মনে হয়। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ—আত্মত্যাগ এই বয়সেরই ধর্ম।

কিন্তু—

কিন্তুটাও যে অনেকখানি। বিধবা মায়ের সন্তান সে। তিনি সমস্তক্ষণ কাছে কাছে রেখে নিজের আদর্শমত মানুষ করেছেন। সে শিক্ষা, সে আদর্শ তার মজ্জাগত হয়ে গেছে। যা অন্যায় বলে জেনেছে তাকেই বা মেনে নেয় কেমন করে?...

সারা রাত ভেবেও এ সমস্যার কোন কূলকিনারা হ'ল না। লাভের মধ্যে রাত্রি-জাগরণ ও অনিদ্রায় তার দুচক্ষু আরক্ত হয়ে উঠল, সুন্দর মুখে কে যেন কালি মেড়ে দিল। সিপাহীরা তার এই ভাবান্তর এবং রূপান্তরকে ভীতি-জনিত দুশ্চিন্তা মনে করে, কাপুরুষতার চরম নিদর্শন ভেবে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিদ্রূপ-বাণে জর্জরিত করে ফেলল। এমন কি বাঙালী মাত্রেই যে বে-শরম এবং ভীতু—একথাও বার বার শুনতে হ'ল।

তার পরের দিন সকালবেলাই তারা কানপুর পৌঁছে গেল। কানপুরে পৌঁছে সে যেন বাঁচল। ভিড়ের মধ্যে কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে আবার মানুষ বলে বোধ হতে লাগল। আগের দিনের দুঃস্বপ্ন এবং দুর্ভাবনার মধ্যে এক রকমের হতাশা ও আত্মধিক্কার যেন তাকে একেবারে গ্রাস করতে বসেছিল। আজ কাজের মধ্যে আবার সে নিজেকে ফিরে পেল।

তারা ভোরে স্নান সেরেই যাত্রা করে। আজও করেছিল। সুতরাং কানপুরে পৌঁছেই মেজর সাহেবের কাছে এত্তেলা পাঠাল, তারা প্রস্তুত, তিনি

দয়া করে এখন মালপত্র বুঝে নিলে তারা অব্যাহতি পায়। মেজর অবশ্য বললেন যে, ওরা আহারাদি করে বিশ্রাম করুক—তিনি বিকেলেও মাল ও হিসেব বুঝে নিতে পারবেন। কিন্তু না সিপাহীরা আর না সার্জেণ্ট—কেউই রাজী হ'ল না। কানপুর ভারী শহর—রং-তামাশার আয়োজন চারিদিকে। সকালে কাজটা সেরে ফেলতে পারলে বিকেলটা হাতের মধ্যে পাওয়া যায়। অগত্যা মেজর সাহেব তখনই বার হয়ে এলেন।

মালপত্র বুঝে নিতে বেশ খানিকটা বেলা হয়ে গেল। মেজর সাহেব একটু বিস্মিতও হলেন। তাঁর এতকালের অভিজ্ঞতায় তিনি এমন কখনও দেখেন নি যে, সরকারী মাল সব ঠিকঠাক এসে পেঁছিয়। এত কাল ধরে পথের বিবিধ ও বিচিত্র বিপদ এবং ক্ষয়ক্ষতির যে সব বিবরণ শুনে এসেছেন—এই তরুণবয়স্ক বাবুকে তার একটাও না বলতে দেখে বেশ একটু সকৌতুকেই তার দিকে তাকালেন, তার পর বললেন, 'তুমি বুঝি একেবারে নতুন ঢুকেছ কমিসারিয়েটে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' হীরালাল সবিনয়ে উত্তর দিল।

'বোঝা যাচ্ছে যে, তোমাকে তৈরী করবার লোকও বিশেষ ছিল না মীরাটে—কী বল ? হাউএভার, তোমার সততাকে পুরস্কৃত করবার সরকারী কোন ব্যবস্থা যখন নেই, তখন সে ত্রুটি আমিই ঢেকে নিচ্ছি।'

তিনি পকেট থেকে পাঁচটি টাকা বের করে, হীরালালের অনিচ্ছুক হাতের মধ্যে প্রায় গুঁজে দিয়ে বললেন, 'সততার পুরস্কার বরাবরই কম। কিন্তু সততাই সততার পুরস্কার বাবু—এটা একদিন যেন বুঝতে পার। উইশ ইউ গুডলাক্ !'

সিপাহী, এমন কি সার্জেণ্টেরও অগ্নিদৃষ্টির মধ্যে দিয়ে মাথা হেঁট করে সেখান থেকে সরে এল হীরালাল। এই পাঁচটা টাকা ওদের মধ্যে ভাগ করে দিলে যদি ওরা খুশী হয় তো এখনই দিতে রাজী আছে সে। কিন্তু তা হবে কি ? ভাগে যে একটা করে টাকাও হয় না। তা ছাড়া সে-প্রস্তাব করতেও তার সাহসে কুলোয় না।...

আহারাদির পরও হীরালাল বিশ্রামের চেষ্টা করল না। গত রাত্রির অনিদ্রার ফলে তার দু চোখের পাতা ভারী হয়ে রয়েছে, তবু শুতে তার সাহস হ'ল না। মনে হ'ল নিরালায় বিশ্রাম করতে গেলেই গত রাত্রির সমস্ত সমস্যা আবার তাকে তেমনি করে ঘিরে ধরবে।

তা ছাড়া—তা ছাড়া তার মনের একান্তে আর একবার সেই জীবনদাত্রীকে দেখবার অসম্ভব দুরাশা জেগেছিল কিনা—তাই বা কে বলবে! সে খাওয়া-দাওয়ার পর সেই দুপুর রোদেই কানপুরের পথে পথে ঘুরতে বের হয়ে পড়ল।

সেকালের পশ্চিমে শহর। শহর বলতে বাজারের দিকটাকেই বোঝাত। সুতরাং হীরালাল ঘুরতে ঘুরতে বাজারের দিকেই এসে পড়ল। সংকীর্ণ পথের দুদিকে অসংখ্য বিপণি। পথের ওপরও বহু লোক পসার সাজিয়েছে। কিন্তু শুধু দোকানী বা ফেরিওয়ালা নয়, আরও নানা রকমের লোকও এ বাজারে দু-পয়সা কামাচ্ছে। বেদে আছে—তারা ঝুলির মধ্যে থেকে এটা-ওটা বের করে জাদুর খেলা দেখাচ্ছে। জুয়াওয়ালারা আছে—তারা একটু আড়াল দেখে

ঘ্ুঁটি ও ছক পেতে বসেছে। সারেঙ্গী-সমেত পথের নাচওয়ালীরা আছে—ইউরোপের 'ক্যাবারে' নটী'দের মত যেখানে-সেখানে ঘাঘরা উড়িয়ে একপাক নেচে পয়সা কুড়োচ্ছে। আর আছেন জ্যোতিষীরা। পথের পাশে পাশে খুঁঙিপুঁথি নিয়ে, কেউ বা ধুলোর ওপর ভাগ্যচক্রের ছক এঁকে, কেউ বা খাঁচার মধ্যে কয়েকটি পাখি কিংবা দড়িতে একটা বাঁদর বেঁধে নিয়ে বসেছে। এই ধারাটা শতাব্দী পার হয়েও অব্যাহত আছে। কলকাতার পথে যাঁরা হাঁটেন, তাঁদের আর বলে দিতে হবে না।

হীরালাল অনেকক্ষণ ধরে এই ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াল। ফলে শুধু যে শ্রান্তিতে তার পা-দুটো ভেঙে এল তা-ই নয়, অসম্ভব পিপাসা বোধ হতে লাগল।

সে এদিক-ওদিক দেখে একটা দুধের দোকানে গিয়ে এক পয়সা দিয়ে এক পোয়া গরম দুধ কিনল এবং দুধের ভাঁড়টা হাতে নিয়ে দোকানের সামনে পাতা চারপাইটাতেই ধপাস্ করে বসে পড়ল। প্রথমটা অত সে খেয়াল করে নি, নিজের পিপাসা-নিবারণেই ব্যস্ত ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ 'সিপাই' শব্দটা কানে যেতেই সচেতন হয়ে উঠল। আগে থেকেই দুধওয়ালার দোকানের ভেতর তিন-চারটি লোক বসে নিম্নস্বরে কী আলাপ করছিল—হীরালাল সেদিকে চেয়েও দেখে নি। এখন ভাল করে তাকিয়ে দেখল। অপেক্ষাকৃত ভদ্র চেহারা লোকগুলির—অর্থাৎ নিতান্ত পথের লোক নয়। ওরা এতক্ষণ আলাপটাকে নিম্নস্বরের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল, কিন্তু এখন ঈষৎ উত্তেজনায় সতর্কতার বাঁধ ভেঙেছে। হীরালাল কান খাড়া করে শুনল—এবং যা শুনল তা একেবারে বিচিত্র খবর তার কাছে। ঝড়ের সঙ্কেত নাকি উঠেছে—রুটি চলতে শুরু করেছে—ইংরেজের আর রক্ষা নেই। হিন্দুস্তানের তখ্‌তে অবশ্যই বাহাদুর শাহ বসবেন—কিন্তু মোটের ওপর হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল বলে—আর দেরি নেই।

এই রুটি-চলাটা যে কী বস্তু তা হীরালাল ঠিক বুঝল না। তবে এটুকু বুঝল যে, সিপাইরা গত সন্ধ্যায় যতটা গোপনীয়তার শপথই নিক না কেন, কথাটা আর গোপন নেই।...শুধু তাই নয়—সারাটা দেশেই একটা আলোড়ন জেগেছে। দুশ্চিন্তাটা একরকম ভুলেই ছিল এতক্ষণ। এখন আবারও হীরালালের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। সে দুধের শূন্য ভাঁড়টা নিয়ে স্থির নিষ্পলক চোখে সামনের নিমগাছটার দিকে চেয়ে বসে রইল।

নিমগাছটার দিকে চেয়ে রইল বটে, কিন্তু নিমগাছটা তার দৃষ্টিগোচর হয় নি অনেকক্ষণ। ধীরে ধীরে চোখের মধ্যে দিয়ে দেখার খবরটা যখন মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছল, তখন সে প্রথম অনুভব করল যে, গাছতলাটাতে একটু অস্বাভাবিক রকমের ভিড়। আর একটু ভাল করে চেয়ে দেখল যে, ভিড়টা ঠিক সাধারণ বেকার পথিকের ভিড় নয়। দু-চারখানা ডুলিও আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত লোকও সেখানে ভিড় জমিয়েছে। এবং সে ভিড় যে একটি কোন বিশেষ লোককে কেন্দ্র করে—তাও বলে দিতে হ'ল না।

হীরালাল দুধওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে বুঝি কোন বৈদ্য 'ওষুধ দিচ্ছে?'

'না না!' সে একটু বিস্মিত হয়েই তাকাল হীরালালের দিকে, 'ওখানে

সাধুবাবা হাত দেখছেন যে!'

'সাধুবাবা?'

'হ্যাঁ, এক সাধুবাবা আছেন। খুব ভাল হাত দেখেন। তবে বড় খাঁই—বড়লোক ছাড়া কেউ ঘেঁষতে পারে না। পাঁচ আনা করে পয়সা দিতে হয় পুজোর জন্যে—তবে উনি হাত দেখেন।'

'খুব ভাল গোনেন নাকি?'

'খুব ভাল। লোকে বলে উনি সর্বদর্শী—ত্রিকালজ্ঞ। লোকের উপকারের জন্যে এসে বসেন ওখানে।'

হীরালাল ভাঁড়টা ফেলে একটু জল চেয়ে হাত ধুলো। তার পর কৌতূহলী হয়ে সাধুবাবার চারদিকের ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। লাল কাপড়-পরা একটি মধ্যবয়সী লোক। দীর্ঘ চুল এবং দীর্ঘতর দাঁড়ি-গোঁফ। গলায় রুদ্রাক্ষ ও শঙ্খের মালা। অর্থাৎ তান্ত্রিক। তার মামার বাড়ির দেশে শ্মশানকালীর মন্দিরে এক তান্ত্রিক সাধক থাকেন—তাঁকে বহুবার দেখেছে হীরালাল। তান্ত্রিক সে মোটামুটি চেনে।

অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে তাঁর গণনা দেখল।...নানা লোককে নানা কথা বললেন। কারও মুখে হাসি ফুটল—কারও মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। পরিষ্কার এ-দেশোয়ালী বুলিই তিনি বলছেন। তবু হীরালালের কেমন একটা সন্দেহ হ'ল যে, সাধুবাবাটি বাঙালী।

বেশ খানিকটা পরে—সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ভিড় অনেকটা পাতলা হ'ল। এই সময় হঠাৎ একবার মুখ তুলে তাকিয়েই সাধুবাবা হীরালালকে দেখতে পেলেন। একবার ভাল করে চেয়ে দেখলেন। তার পর আরও যে দু-এক জন অবশিষ্ট ছিল তাদের সোজা হাঁকিয়ে দিলেন, 'আজ তোমরা যাও। আজ আর আমি দেখব না।'

তারা একটু-আধটু মিনতি করল, কিন্তু বেশী কিছু বলতে সাহস করল না। বোঝা গেল যে, সকলেই 'বাবাকে' একটু ভয় করে। সকলে চলে যেতে তিনি ইঙ্গিতে হীরালালকে কাছে ডাকলেন।

'তুমি বাঙালী—না বাবা? তোমার বাড়ি কোথায়?'

'আমার বাড়ি কলকাতাতেই।'

'এখানে? চাকরি উপলক্ষে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি মীরাটে কাজ করি। অফিসের কাজে এসেছি।'

'খুব সাবধানে থেকো বাবা তিন-চারটে মাস। খুব হুঁশিয়ার থেকো!'

হীরালালের মুখ শুকিয়ে উঠল। সে তাঁর সামনে বসে পড়ে বলল, 'আজ্ঞে, তা হলে কি—'

'হ্যাঁ, লড়াই বাধবে। বিষম লড়াই। দেখি তোমার হাতটা—'

হীরালাল সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল।

তিনি অনেকক্ষণ ধরে তার ডান হাতখানা দেখলেন। সূর্য অস্তগামী হলেও আলো একেবারে যায় নি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাতটা দেখে একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে হীরালালের কপালের দিকে তাকালেন। তার পর বললেন, 'না, তোমার ভয় নেই। বরং তোমার উন্নতিই হবে। তবে বিপদে পড়বে তুমি—অপরের জন্য। বোধ করি এক স্ত্রীলোকের জন্য।'

'আচ্ছা তার—তার কী হবে?'

'কার ? সেই স্ত্রীলোকের ?'...আর একবার হীরালালের কপালের দিকে চাইলেন, 'সে কি মুসলমানী ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ !'

'তারও ঘোরতর সংকট-যোগ আছে। এ-রকম যোগ থাকলে সাধারণত অপঘাত হয়।'

'এর অন্যথা হয় না ?'

'হয় বৈকি বাবা ! পুরুষকার দৈবকেও লঙ্ঘন করে মধ্যে মধ্যে তবে সে খুব কম ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়।'

'আচ্ছা, এ লড়াইএর পরিণাম কী ?'

'ইংরেজ জিতবে। বরং তাদের রাজত্ব আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হবে। আরও প্রায় শতবর্ষ-কাল তারা এদেশে রাজত্ব করবে।'

হীরালাল কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলল, 'কিন্তু আপনি এখানে কি করে... মানে—আপনার বাড়ি কোথায় ?'

'আমাদের পূর্বশরীরের কথা বলা নিষেধ বাবা। ঘটনাচক্রে এখানে এসে পড়েছি। ইচ্ছা আছে এখানে মা'র একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করব। কী হবে তা জানি না, হুকুম হলে কালই হয়তো এখান থেকে চলে যেতে হবে। তবু চেষ্টা করে দেখছি।...পয়সা চাই কিছু—সেই জন্যই এই দোকান দেওয়া। বসে বসে পয়সা কুড়োচ্ছি।'

হীরালাল আর কথা বলল না। হুকুমটা কিসের বা কার তা সে বুঝল না —প্রশ্নও করল না। পিরানের একটা জেব ছিল—তার মধ্যে থেকে সদ্য-পাওয়া পাঁচটি টাকার একটা বের করে তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করল।

সাধু টাকাটা গ্রহণ করলেন। বরং মনে হ'ল খুশীই হলেন। হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন, 'ব্রহ্মময়ী তোমার কল্যাণ করুন। তুমি শান্তি লাভ কর।...কিন্তু বাবা, ঐ মুসলমানীটি থেকে দূরে থেকে। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আর কী দরকারই বা—তোমার এই বয়স, এখন থেকে...তার ওপর ব্রাহ্মণ-সন্তান !'

হীরালালের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু সে প্রতিবাদ করে সাধুর ভুল ভাঙবার চেষ্টা করল না। সে নিজে যখন খাঁটি আছে, তখন মিছিমিছি এদের বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্য সময় নষ্ট করে লাভ কি ?

॥ ১৬ ॥

সাধুবাবার কাছ থেকে উঠে হীরালাল একটু দ্রুতপদেই ছাউনির রাস্তা ধরল। সে রাতটা তার ছাউনিতেই কাটাবার কথা। সেখানে আইন-কানুন বড় কড়া —সন্ধ্যার পরই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আহারের দফাও ইতি। অবশ্য সে বিদেশী—এখানে অতিথি—এখানকার নিয়ম তার ওপর প্রযোজ্য না-ও হতে পারে, কিন্তু যদি হয় ? বিদেশ-বিভুঁই জায়গা—রাত কাটাবে কোথায় ?

সে হন হন করেই চলেছে, অকস্মাৎ কাঁধের ওপর কোথা থেকে একটা ভারী হাত এসে পড়ল।

বিস্মিত হয়ে ফিরে দেখল—একটা দানো।

কালো রাত্রির অন্ধকারে দেখা হ'লেও চিনল, গত রাত্রের সেই দৈত্যটা—সর্দার খাঁ।

সর্দার খাঁ তার অভ্যাসমত বিনা ভূমিকাতেই বলল, 'মালেকান আর একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আর একটা কি' কথা বলবেন।'

'কিন্তু—', ভয়ে হীরালালের তালু শুকিয়ে উঠেছে। অহেতুক একটা ভয়। সে কোনমতে শুষ্ককণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমাকে যে ছাউনিতে ফিরতে হবে। এর পর তো আর ঢুকতে দেবে না।'

'আচ্ছা, সে ভার আমার। আমি রাত দশটাতেও ঢুকিয়ে দিতে পারব। তুমি নির্ভয়ে এসো।'

'কোথায় ?'

'এই কাছেই—উকিলপাড়ায়।'

কাল এই ব্যক্তির হাত থেকে মুণ্ডটা অল্প একটুর জন্য বেঁচে গেছে। সে কথা মালেকান স্বয়ং স্বীকার করেছেন। হয়তো বা সেই ভুলটুকু সংশোধনের জন্যই এই আয়োজন—নতুন একটা ফাঁদ। হীরালালের সমস্ত বুদ্ধি তাকে বার বার নিষেধ করল এই ফাঁদে পা দিতে—অকারণে অজ্ঞাত বিপদের পথে পা বাড়াতে। এটা শহরের প্রকাশ্য রাজপথ—এখান থেকে কিছু জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না, এখনও সময় আছে বাঁচবার। কিন্তু বুদ্ধিরও ওপরে একটা বস্তু আছে—সেটার নাম আবেগ, তার বাসাটা হৃদয়ে। সেই বস্তুটিরই জয় হ'ল। আর একবার সেই জীবনদাত্রী দেবীকে দেখবার জন্য সমস্ত প্রাণটা উন্মুখ হয়ে উঠল। সে মুহূর্তকয়েক ইতস্তত করে বলল, 'চল, কোথায় যাবে—আমি যাচ্ছি।'

তার যে' বয়স, সে বয়সে কেউ বিপদকে বিশ্বাস করে না ঠিক। আর এ বয়স হিসাব-নিকাশেরও ধার ধারে না।

কয়েকটা গলি-ঘুঁজি ঘুরে একেবারে নির্জন একটা পথে এসে পড়ল দুজনে। জনমানবশূন্য জায়গাটা। দুদিকে বাড়ি থাকলেও, মনে হয় যেন সব কটি বাড়িরই পিছন দিক এটা, অথবা কোন বাড়িতে কেউ বাস করে না। ওরই মধ্যে একটা পোড়ো খাপরার চালের বাড়ির দরজার সামনে এসে সর্দার খাঁ তিনটে টোকা মারল।

হীরালালের এতক্ষণে দারুণ ভয় হয়েছে। এই জনহীন পথ, এই পোড়ো বাড়ি—সবই তো তাকে বধ করবার পক্ষে অনুকূল! হায় হায়, তার বিধবা মা যে তার মুখ চেয়েই এতকাল এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়েছেন। তাঁর সঙ্গে বুঝি আর একবার দেখাও হ'ল না।

সে বেশ একটু কম্পিত কণ্ঠেই বলল, 'এ—এ আমরা কোথায় এলাম ?'

সর্দার খাঁ হাসল—সেই ভয়ংকর মুখের হাসিটাও বুঝি ভয়াবহ। আবছা অন্ধকারে মনে হ'ল—একটা ক্ষুধার্ত দানব দন্তবিকাশ করছে। সে হেসে বলল, 'ভয় নেই। তোমাকে মারবার দরকার হ'লে ঐ বড় শড়কেই শেষ করে দিতে পারতাম। আমাকে কেউ বাধা দিতে সাহস করত না। কিন্তু মারবার জন্য মালেকান ডাকেন নি। তোমার কোন বিপদ-আপদ না ঘটে—আমার ওপর এই হুকুমই আছে।'

বিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই, তবু হীরালাল কথাগুলো বিশ্বাসই করল। মালেকান সম্বন্ধে এই ধরনের বিশ্বাস করতেই যে ভাল লাগে। আশ্বস্তই হ'ল খানিকটা। তাই একটু পরেই যখন নিঃশব্দে কপাট জোড়াটা খুলে গেল এবং একটা প্রদীপ হাতে এক বৃদ্ধা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, তখন সে বিনা দ্বিধায় তার পিছু পিছু বাড়ির ভেতর প্রবেশ করল।

বাড়িটা সত্যিই পোড়ো বাড়ি। বোধ করি কাচের গুদাম-টুদাম হবে, কারণ উঠানময় ভাঙা ও গুঁড়ো কাচ ছড়ানো। তার ভেতর দিয়ে বুড়ীটা সাবধানে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সর্দার খাঁ সঙ্গে আসে নি - খুব সম্ভব বাইরে দাঁড়িয়েই পাহারা দেবার হুকুম আছে তার ওপর।

সংকীর্ণ উঠানটা পার হয়ে একটা গলিপথ-মত অতিক্রম করে একটা খাড়া পাথরের সিঁড়ি ভেঙে এক সময়ে একটা পাকাবাড়ির দ্বিতলে এসে হাজির হ'ল হীরালাল। এবার বুড়ীটাও থামল। আঙুল দিয়ে পাশের একটা ঘর দেখিয়ে আলোটা সেখানেই রেখে বসে পড়ল এবং নিমেষমধ্যে মুখের ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজল। তার গতিক দেখে বোধ হ'ল, সেই এক মুহূর্তের ভেতরেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু সেদিকে চেয়ে দেখবার সময় নেই। বুড়ী যে দরজাটা দেখিয়ে দিয়েছে—ধীরে ধীরে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল হীরালাল। কপাট ভেজানো ছিল, ঠেলে ঢোকা উচিত হবে কিনা ভাবছে—এমন সময় ভেতর থেকে পূর্ব-রাত্রিতে-শোনা সেই বিশেষ শব্দ কটিই যেন এক দিনরাত্রির ব্যবধান নিমেষে পার হয়ে কানে এসে পৌঁছল—'ভেতরে এস।'

সেই শব্দসমষ্টি, এবং সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বর। সঙ্গীতের মতো মিষ্টি না হোক—জাদু আছে সে কণ্ঠস্বরে। হীরালালের দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল—কয়েক পলকের মত যেন অবশ হয়ে এল সমস্ত শরীর।…কিন্তু দুর্বলতাকে সে বেশীক্ষণ প্রশ্রয় দিল না। মনে জোর এনে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

ফরাস-পাতা একটা সাধারণ ঘর। তারই মাঝখানে একটা কাঠের বাক্স এবং সেই বাক্সের ওপর জ্বলছে ডবল পলতের একটা আলো। বাক্সের পাশেই একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে হুসেনী বেগম বসে আছে। ঘরে আর কেউ নেই। আলোটা পাশে পড়ায় তার মুখখানা পড়েছে আলো-আঁধারিতে। ভাল করে দেখা যায় না—আর গেলেও বোধ করি সেদিকে মুখ তুলে চাইতে হীরালালের সাহসে কুলোত না। সে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়াল।

আমিনা তার সামনেটা দেখিয়ে বলল, 'ব'স। ভয় নেই—প্রতিজ্ঞা ভাঙবার জন্যে তোমাকে ডাকি নি। নির্ভয়ে ব'স।'

তার পর হীরালাল বসতে না বসতেই অকস্মাৎ প্রশ্ন করল, 'গণককে হাত দেখাচ্ছিলে বুঝি? কী বললে সে? শীগগিরই রাজা হবে, ভাল শাদি হবে, খুবসুরত বিবি হবে—এই তো। তা কত দিতে হ'ল?

হীরালাল স্তম্ভিত। তার বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না। এ কে? মায়াবিনী জাদুকরী, না সত্যিই স্বর্গের দেবী?

খিল খিল করে হেসে উঠল আমিনা। বলল, 'না গো বাংগালী বাবু, না! জীন কি হুরি কিছু নই আমি। তুমি যখন তন্ময় হয়ে হাত দেখাচ্ছিলে, তখন আমি তোমার সামনের রাস্তা দিয়েই ডুলি করে এসেছি। তুমি টের পাও নি। তা ছাড়া সর্দার খাঁ সারাটা দিনই তোমার পিছনে আছে—ছাউনি

থেকে বেরোনো পর্যন্ত। এ শহর ভারি খারাপ জায়গা—নানারকম বিপদ ঘটতে পারে। তাই ওকে একটু নজর রাখতে বলেছিলুম।'

হীরালাল এবার চোখ তুলে চাইল।

কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, অনুরাগ—দৃষ্টিতে যতটা নিবেদন করা যায়, ততটাই বুঝি সে ঢেলে দিতে চাইল এই মুসলমানীর পায়ে—এইমাত্র যার সংসর্গ এড়িয়ে চলতে সন্ন্যাসী উপদেশ দিয়েছিলেন।

আমিনা পুনশ্চ প্রশ্ন করল, 'কিন্তু কী বললে গণৎকার—তাঁ তো বললে না?'

হীরালাল সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে কণ্ঠস্বরে বেশ একটু দৃঢ়তা এনে বলল, 'ঐ গণক একজন নামকরা সাধু। খুব ভাল জ্যোতিষী। এখানে সকলে তাই বললে।'

'তাই নাকি!' আমিনা সোজা হয়ে বসল, আগ্রহের সুরে বলল, 'কী বললে সাধু?'

'বললে যে, ভারী লড়াই বাধবে, কিন্তু ইংরেজ হারবে না, বরং তার শক্তি আরও বাড়বে।'

ঈষৎ অবজ্ঞায় আমিনার ওষ্ঠকোণ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বলল, 'এ আমিও বলতে পারতাম বাবুজী। এর জন্য সাধু কি জ্যোতিষীর দরকার ছিল না।'

'তবে—তবে কেন আপনি এর ভেতর যাচ্ছেন?' সামনের দিকে ঝুঁকে বেশ একটু আবেগের সঙ্গেই সে বলল, 'আমি আপনার কথাও জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম। তিনি বললেন, আপনি এর ভেতর এসে বড্ড বিপদে পড়বেন—হয়তো, হয়তো—'

'আমার মৃত্যুও হতে পারে—এই তো?' আমিনা খুবই সহজভাবে বলল, 'তাতে আর আমার ভয় নেই।'

'কিন্তু কেন আপনি এই ঝুঁকি ঘাড়ে নিচ্ছেন—সব আয়োজন বৃথা জেনেও? আমি অনুনয় করছি আপনি এখনও ফিরুন। মিছিমিছি এই নিশ্চিত বিপদের মধ্যে যাবেন না। এ আপনার কাজ নয়। যারা করে তারা করুক—আপনি এর ভেতর নিজেকে জড়াবেন না।'

আমিনার আয়ত ও বিস্ফারিত দুটি চোখের দৃষ্টিতে বোধ করি কিছু বিস্ময়ই ফুটল। সে খানিকটা অপলক নেত্রে হীরালালের মিনতি-ভরা চোখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আমি মারা গেলে তুমি দুঃখিত হবে বাবুজী? তুমি—তুমি আমার জন্যে ভাবো?'

বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য কোমল হয়ে এল। তার দু চোখে যেন স্নেহ উপচে উঠল। তার পর সে কতকটা ছেলেমানুষের মতই বলে উঠল, 'তবে—তবে তুমি কেন আমাকে এটুকু সাহায্য করছ না?'

যেন কোন অদৃশ্য মন্ত্রবলে হীরালালের সব সংকোচ, সব কুণ্ঠা আজ দূর হয়ে গেছে—সে নিজের অজ্ঞাতেই আর একটু কাছে সরে এল। তেমনি আবেগের সঙ্গেই বলল, 'আপনার জন্যে ভাবি বলেই আপনাকে সাহায্য করতে রাজী নই! ভাবি বলেই অনুনয় করছি—আপনি এ সবের বাইরে থাকুন। আপনি এর ভেতর যাবেন না। আপনি নিরাপদে থাকলেই আমি খুশী—আর কারুর জন্যে ভাবি না।'

খানিকটা চুপ করে বসে রইল আমিনা। অন্যমনস্ক হয়ে যেন সেই অল্প সময়টুকুর ভেতরেই কত কী ভেবে নিল, অতীতের অনেকগুলি ছবিই বুঝি তার চোখের সামনে দিয়ে দ্রুতে ভেসে গেল—তারপর একটু ম্লান হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'আমার ফেরবার কোন পথ নেই বাবুজী—নিরাপদে বেঁচে থাকতেও আমি চাই না। আমার কথা তুমি ঠিক বুঝবে না। এখন…আমাকে এই দিকে একটু সাহায্য করলেই এখন আমার প্রকৃত উপকার করা হবে। আর তাতে তোমার কোন বিপদ নেই—তা থাকলে আমি তোমাকে কোন অনুরোধই করতাম না। তুমি এটুকু করতে পারবে না আমার জন্যে?'

সেই অবিশ্বাস্য মধুভরা কণ্ঠে ঐকান্তিক মিনতি!

এর কাছে বিবেক, সংস্কার, সত্য, ইহকাল, পরকাল সবই তুচ্ছ মনে হয়। আজও হীরালালের ললাটে স্বেদবিন্দু জমে উঠল। তার মনে হল—ঘরে আরও দু-একটা দরজা থাকলে ভাল হত, বাতাস বড় কম। সে পিরানটার গলার কাছে আঙুল দিয়ে টানাটানি করতে লাগল।

আমিনা নিঃশব্দে বসে আছে।

তার চোখে কি শুধুই মিনতি—শুধুই মায়া?

আরও অনেক কিছু বোধ করি আছে সে চোখে—যার কোন সংজ্ঞা নেই, যাকে কোন বিশেষণে অভিহিত করা যায় না। বিচিত্র সে চাউনি। হীরালাল বহুবার চেষ্টা করলে সে চোখে চোখ রাখতে—চোখে চোখ রেখে দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অন্তরের দৃঢ়তা বুঝিয়ে দিতে, কিন্তু কিছুতেই পারল না। একবার মাত্র সে চাউনি স্পর্শ করেই তার চোখ দুটো ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে কোণে কোণে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল।

উত্তর একটা দেওয়া উচিত, আর দিতেই হবে শেষ পর্যন্ত—তা সে বোঝে। কিন্তু উত্তরটা যে যোগায় না। শুধু অনর্থক আকুলতাতে কয়েক মুহূর্তকেই কয়েক যুগ বলে বোধ হয়।

অবশেষে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন বোধ হয় মা-কালীই!

খোলা দরজা দিয়ে নিঃশব্দে কে একজন ঘরে প্রবেশ করলেন। সম্ভ্রান্ত নাগরিকের পোশাক, বয়স পঞ্চাশের কিছু কমই হবে হয়তো, প্রশান্ত ও প্রশস্ত ললাটে সকালের 'রুরি' বা সিন্দুর-বিন্দু এখনও লেগে আছে। টুপির ভেতর দিয়ে টিকির প্রান্ত প্রকাশ পাচ্ছে—অর্থাৎ আগন্তুক হিন্দু।

তাঁকে দেখে আমিনা অভ্যর্থনা জানাল, 'আসুন বাবুজী।'

তার পর হীরালালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এঁরই বাড়ি—বাবু নানকচাঁদ।'

হীরালাল মাথা হেঁট করে নমস্কার করতে তিনিও প্রতি-নমস্কার করলেন। তার পর বসে বিনা ভূমিকাতে একেবারেই কাজের কথা পাড়লেন, 'দেখ বেগমসাহেবা, এ বাঙালী ছোকরাকে আমি চিনে নিয়েছি। মানুষ চরিয়ে খাই, আর যত রাজ্যের বদমানুষ—একে চিনতে আমার দেরি হয় নি। যতই যা কর, বেইমানি একে দিয়ে করাতে পারবে না। তার চেয়ে আমি যা বলি সেইটাই শোন।'

তার পর হীরালালের দিকে ফিরে বললেন, 'দেখ বাবুজী, আমিও তোমারই দলের। আমি বিশ্বাস করি না যে আংরেজ হারবে। সিপাইরা অন্তত যে জিতবে না এটা নিশ্চিত। কিন্তু কী করব, প্রথমত এদের—মানে

এই বেগমসাহেবাদের আমি স্নেহ করি, একেবারে এদের কথা এড়াতে পারি না। তা ছাড়া যদি চারদিকে আগুন জ্বলে—সোজাসুজি এদের বিরুদ্ধাচরণ করে বাঁচা মুস্কিল। তাই আমাকে কিছু কিছু সাহায্য করতেই হয়।... তুমি এঁকে স্নেহ কর অথবা ভক্তি কর—তা দেখতেই পাচ্ছি। সুতরাং তোমার ইমান সত্য থেকে ভ্রষ্ট না হয়ে যেটুকু উপকার করা সম্ভব সেটুকু তুমি এদের জন্যে করবে তা আশা করতে পারি তো?'

পরম আগ্রহের সঙ্গে হীরালাল বলে উঠল, 'নিশ্চয়—নিশ্চয় করব।'

'তবে শোন। তুমি তো দু-এক দিনের মধ্যেই মীরাট রওনা হবে? তুমি যেদিন পেঁছিবে তার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নানা ধুন্ধুপন্থও মীরাট পেঁছিবেন। তাঁকে তোমার নাম-ঠিকানা দেওয়া আছে। তিনি হয়তো তোমার খোঁজ করে তোমার সঙ্গে গোপনে দেখা করবেন। তিনি যাচ্ছেন খবর নিতে যে, সত্যিই সিপাইরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে সাহস করবে কিনা শেষ পর্যন্ত—অর্থাৎ সত্যিই তারা ক্ষেপেছে কিনা। এটা তুমি যা শুনেছ এবং জেনেছ সেটুকু বলতে পারবে তো? তুমি যদি জেনে থাক যে সিপাইরা ক্ষেপেছে, সেটা তাঁকে বলতে দোষ কি? এটা তো কারুর সঙ্গেই নিমকহারামি হল না—ইংরেজদের সঙ্গেও না, সিপাইদের সঙ্গেও না। কারণ তুমি তাদের দলের লোককেই খবরটা দিচ্ছ। যদি তোমার ছাউনি সম্বন্ধে কোন খবর জানতে চান তো তুমি সটান ব'ল যে, তুমি তা বলতে পারবে না—অথবা তুমি নতুন এসেছ, কিছু জান না। যা ভাল মনে কর তাই ব'ল। তোমাকে নিমকহারামি করতে আমি বলব না—শুধু তুমি ঐ খবরটি তাঁকে দিও। কেমন, রাজী আছ তো?'

হীরালাল মন দিয়ে কথাগুলি শুনছিল। শুনতে শুনতেই ঘাড় হেঁট করেছিল। নানকচাঁদের কথা শেষ হতেও অনেকক্ষণ সেইভাবে বসে রইল। তার পর সংক্ষেপে শুধু বলল, 'রাজী।'

আমিনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে নানকচাঁদের দিকে তাকিয়ে হীরালালকে বলল, 'আর একটি কথা—বেইমানি ঠিক নয়, ছোট একটা মিছে কথা, যদি আমার জন্যে বলতে পার তো তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব বাবুজী! খুব মিছেও নয়—একথা, যদি পার তো বিশ্বাস ক'র, এর মধ্যে অনেকটাই সত্য আছে। নানাসাহেবকে ব'ল যে, "সিপাইরা আপনার মুখ চেয়েই আছে। তারা আপনাকেই তাদের নেতা বলে মনে করে।—পারবে বলতে?"

তেমনি ঘাড় হেঁট করেই হীরালাল জবাব দিল, 'পারব'।

তার পর সে সোজা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এবার তা হলে আসি। ছাউনিতে ফিরতে হবে আমাকে।'

'ভয় নেই বাবুজী, সর্দার খাঁ ঠিক পেঁছে দেবে। না ফিরলেও তোমাকে কেউ কিছু বলত না। তোমার সঙ্গে যারা এসেছে, তারা কেউ আজ রাত্রে ছাউনির ভেতর কাটাবে না—বাইরেই তাদের প্রলোভন বেশী।'

'আমি কিন্তু ফিরব।' তাড়াতাড়ি বলল হীরালাল।

আমিনা সামনে এসে দাঁড়াল। তার ওষ্ঠের প্রান্তে সেই ভুবন-ভোলানো হাসি—চোখে সেই স্নেহ-মেশানো বিদ্রূপ। সে হেসে বলল, 'তুমি একেবারে ছেলেমানুষ বাবুজী! ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তোমাকে বাইরে রাত কাটাতে

বলছি না। আমি জানি সে প্রকৃতির লোক নও তুমি। চল, তোমাকে নীচে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

তার পর নিজের চম্পকাঙ্গুলি থেকে একটা বড় চারকোণা লাল পাথরের আংটি খুলে হীরালালের হাতে দিয়ে বলল, 'এই আংটির জোড়া যে তোমাকে দেখাবে, বুঝবে সে-ই আমার লোক। সে-ও তোমাকে চিনতে পারবে এই আংটি দেখালে। বুঝেছ? এই আংটি যে দেখাবে তুমি তার সঙ্গে নির্ভয়ে চলে যেও। সে-ই তোমাকে নানার কাছে নিয়ে যাবে।'

হীরালাল ঘাড় নেড়ে সায় দিল। কিন্তু পরক্ষণেই একটা কথা মনে পড়ায় ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু এ আংটি ফেরত দেব কেমন করে আবার? নানাসাহেবের হাতেই দেব কি?'

'না, না—নানাসাহেবকে তো নয়ই।' তার পর আর একটু হেসে আমিনা বাঁ হাতখানা হীরালালের কাঁধে রেখে ডান হাতে নিজের রেশমী ওড়না দিয়ে আজও সযত্নে তার ললাট ও কণ্ঠের ঘাম মুছে নিয়ে বলল, 'ফেরত না-ই বা দিলে। আমার আংটিটা কাছে রাখতে কি ঘেন্না করবে তোমার?'

হীরালালের মুখ অরুণবর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না, শুধু আংটিটা একবার নিজের মাথায় ঠেকিয়ে সযত্নে পিরানের জেব্-এ রেখে দিল।

আমিনা অল্পক্ষণ নিঃশব্দে তার আনত মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার পর একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সস্নেহ কণ্ঠে বলল, 'চল বাবুজী, তোমাকে সর্দারের জিম্মা করে দিই।'

হীরালাল দুজনকেই নমস্কার জানিয়ে আমিনার পিছু পিছু বের হয়ে এল।

॥ ১৭ ॥

অবশেষে এক সান্ধ্য-মজলিসে নানাসাহেব তাঁর অন্তরঙ্গ দু-এক জন বড় সাহেব-এর কাছে খবরটা ভাঙলেন। তিনি দিনকতকের জন্য একটু বাইরে ঘুরতে যাবেন—কাল্‌পী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, মীরাট। মাসখানেকের মধ্যেই অবশ্য ফিরবেন। ততদিন এঁদের একটু বিরহদশা ভোগ করতে হবে।

নানাসাহেব সাধারণত কানপুর ছেড়ে বড় একটা কোথাও নড়েন না। সুতরাং তাঁর ভ্রমণের সংবাদে তাঁর ইংরেজ বন্ধুরা বেশ একটু বিস্মিত হলেন বৈকি।

কিন্তু নানাসাহেব সকলকেই এক কথা বলে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করলেন—'এবার আদায়-আজ্ঞাম বড়ই খারাপ হয়েছে। কোনমতে সরকারী খাজনাটাই উঠেছে মাত্র। কিন্তু তাতে তো আমার চলবে না।' তার পর একটু ম্লান হেসে বললেন, 'এখন তো আর বাঁধা সরকারী পেনশন নেই—যা করে ঐ জমিজমাগুলোর আয়। এখন একটু দেখাশোনা করতে হবে বৈকি। তা ছাড়া কি জানেন, মাঝে মাঝে মালিক না গেলে গোমস্তা-তহসিলদাররা পেয়ে বসে। মনের সাধে চুরি শুরু করে দেয়। প্রজারা দিচ্ছে না—নাকি ওরাই চুরি করছে, সেটাও দেখা দরকার তো।'

এর পর আর কথা বলা চলে না। এমন কি একথাও জিজ্ঞাসা করা চলে

না যে, কোথায় কোথায় তোমার এত জমিদারি আছে, আর উত্তর ভারতেই বা এত জমিজমা কে কখন খরিদ করল। আর একথাও সত্য যে এখন তো আর বাৎসরিক আট লাখ টাকা পেনশন নেই—এমন রাজার হালে চলে কি করে? নিশ্চয়ই বেশ কিছু জমিজমা আছে।

তবু ম্যাজিস্ট্রেট হিলার্সডন সাহেব একবার প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আপনার তো এত কর্মচারী রয়েছে, যারপরনাই মিস্টার টোপীই রয়েছেন—তবু আপনাকে যেতে হবে?'

নিজের হাতে তাঁর স্ফটিকপাত্রে মূল্যবান বিলাতী সুরা ঢেলে দিতে দিতে নানা ধুন্ধুপন্থ জবাব দিয়েছিলেন, 'কৈ, ওদের দ্বারাও তো হচ্ছে না। যেখানে লাখ টাকার ওপর উসুল হবার কথা, সেখান থেকে এসেছে মাত্র ন হাজার টাকা।'

তার পর মুখ টিপে হেসে বলেছিলেন, 'তা ছাড়া এই ফাঁকে একটু ঘুরে আসাও হবে। এমনি তো বেড়ানো হয় না—কী বলেন?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। মাঝে মাঝে একটু বেড়ানো ভাল—খুব ভাল।' হিলার্সডন সাহেব মাথা নেড়ে বলেন।

কেবল এখানে নবাগত ফাইনান্স কমিশনার গাবিন্স্ সামান্য ভ্রূ কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনি যেসব স্থানগুলোর উল্লেখ করলেন—দিল্লী, মীরাট, লক্ষ্নৌ—সবই তো শহর। আপনার জমিজমা সব নিশ্চয়ই শহরে নেই?'

'না—না।' তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন ধুন্ধুপন্থ, 'শহরের নাম করলুম—আপনারা সহজে চিনবেন বলে। দেহাতেও যাব বৈকি। তার আগে শহরে গিয়ে কর্মচারীদের ডাকাব—তাদের কৈফিয়ত শুনব, তার পর সন্দেহ হলেই দেহাতে যাব। যেতে হবে বৈকি।'

গাবিন্স্ শুষ্ককণ্ঠে শুধু বললেন, 'ওঃ।'

নানা এক ফাঁকে একবার তাঁর মুখের দিকে আড়ে তাকিয়ে নিলেন। কিন্তু গাবিন্স্-এর মুখের প্রশান্তি তাতে নষ্ট হল না।

যথারীতি পান-ভোজন আদর-আপ্যায়নের পর সাহেবরা বিদায় নিলে নানাসাহেব ইঙ্গিতে আজিমুল্লাকে কাছে ডাকলেন। তাঁর মুখে বেশ একটু মেঘ ঘনিয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই। আজিমুল্লা তাঁর পাশে এসে বসলে চিন্তিত মুখেই বললেন, 'গাবিন্স্-এর কথাগুলো শুনলে? ওর গলার আওয়াজ বা মুখের ভাব কোনটাই ভাল বোধ হল না। ও কি কিছু সন্দেহ করেছে?'

আজিমুল্লা মুখে একটা তাচ্ছিল্যসূচক শব্দ করে উত্তর দিলেন, 'আপনি বড় সামান্যতেই বিচলিত হন পেশোয়াজী। গাবিন্স্ কী-ই বা সন্দেহ করবে? কতটুকু আপনি করেছেন? আপনি তো সত্যই এখনও কোন কাজে হাত দেন নি—কোন ষড়যন্ত্র করেন নি। গাছের পাতা নড়লেই যদি আপনি ঝড়ের আভাস পান, তা হলে আমরা নাচার।'

নানাসাহেব ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'না, তা নয়, ও লোকটা বড় ধূর্ত!'

'তা ঠিক।' আজিমুল্লাও সায় দেন সেই কথাতে, 'এই গাধাগুলোর মধ্যে ওরই যা একটু বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, কিন্তু তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। ওর কথা শুনে সতর্ক হবে—এমন বুদ্ধিও এদের নেই যে।'

নানাসাহেব চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত এবং

বিপজ্জনক নানা চিত্রই বোধ করি এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতবেগে তাঁর মানসচক্ষুর সামনে দিয়ে সরে সরে গেল।

এইভাবে আরও কতকাল বসে থাকতেন কে জানে, অকস্মাৎ দূর থেকে তাত্যা টোপীকে আসতে দেখে তাঁর চমক ভাঙল। তিনি আজিমুল্লার দিকে ঈষৎ হেসে চুপি চুপি বললেন, 'দেখ, একটা কথা, হুসেনীর সঙ্গে তো তোমার যোগাযোগ আছে, তার সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার দেখাও হয়—তাই না ?'

নানাসাহেব জানেন তাঁরা একই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন—এটা আজিমুল্লা আকারে-ইঙ্গিতে টের পেয়েছেন বহু বারই। কিন্তু ঠিক কতটা তাঁদের ঘনিষ্ঠতা তিনিও কোনদিন মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করেন নি, আজিমুল্লারও জবাব দেবার প্রয়োজন হয় নি। আজ অকস্মাৎ এই প্রশ্নে আজিমুল্লার অপরাধী মন একটু চমকে উঠল কি ?

উঠলেও তা অন্তত তাঁর শান্ত কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ল না। তিনি মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে বললেন, 'দেখা তো প্রকাশ্যেই হয়।'

'আড়ালে ?'

'হ্যাঁ, তাও একবার করতে হয়েছে। আপনারই প্রয়োজনে পেশোয়া।'

'না, না—আমি সেজন্যে কোন দোষ ধরছি না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে—তাকে তোমার কী মনে হয় ?…আমার জন্যে তার এত কী মাথা-ব্যথা ?'

আজিমুল্লা উত্তর দিলেন, 'দেখুন, মেয়েদের মনের পুরো খবর স্বয়ং খোদাতালাও রাখেন কিনা সন্দেহ। তবে আমার যা মনে হয়েছে তা আমি বলতে পারি, কিন্তু সে আমারই বিশ্বাস, আপনাকে আমি জোর দিয়ে কিছু বলছি না—আপনি জানেন হুসেনী বেগম আপনার দাসী, উপপত্নী ; কিন্তু সে শিক্ষিতা মেয়ে, সে আপনাকে স্বামী বলেই জানে। হিন্দুস্তানের কোন নারী না চায় স্বামীর অপমানের শোধ নিতে—কোন্ নারী না চায় স্বামীকে উচ্চাসনে বসাতে ? আমার মনে হয় এটা হুসেনী বেগমের আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমেরই নিদর্শন।'

নানার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বোধ করি কথাটা তাঁর আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে মিলল। তিনি বললেন, 'তা বটে। কিন্তু—'

বক্তব্যটা শেষ হল না, তাত্যা টোপী এসে জোড়হাতে নানাকে প্রণাম জানিয়ে নানারই ইঙ্গিতে সামনে বসলেন।

নানা প্রশ্ন করলেন, 'সব প্রস্তুত তো ?'

'সব। কাল ভোর চারটেতে গাড়ি তৈরী হয়ে আপনার দোরে হাজির থাকবে। লোক বেশি দিলুম না। আপনার তিন জন চাকর আর পঁচিশ জন সওয়ার—এই হলেই চলবে আশা করি।'

'খুব—খুব।'

আরও দু-একটি খুচরো আলাপের পর নানা উঠে দাঁড়ালেন—'আজিমুল্লা, তুমি আমাকে এদিকের খবর দিয়ে রোজ একখানা করে খত পাঠাবে। টোপীজী আপনিও। আমাদের যা সংকেত আছে, সেই মত লিখবেন—আমি বুঝে নেব। এখন উঠি। কাল চায়টের আগে স্নান-পুজা সেরে নিতে হবে। এধারে তো বারোটা বাজে।'

তাত্যা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আদালা বেগমের ঘরে থাকবেন তো ? কোথায় গিয়ে ডাকবে আপনাকে ?'

'আদালা ? না—না। আমি হুসেনী বেগমের ঘরে থাকব।'

নানা চলে গেলেন। তাত্যা হুসেনীর নাম শুনে হয়তো কিছু বিস্মিত হলেন, কিন্তু আজিমুল্লার ওষ্ঠের প্রান্তে একটু কৌতুকের হাসিই ফুটে উঠল।

তাত্যা টোপী খানিকটা নিষ্পলক নেত্রে আজিমুল্লার মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাঁর জন্য এত করছি তাঁর যদি তোমার অর্ধেকও বুদ্ধি আর সাহস থাকত আজিমুল্লা !'

আজিমুল্লা ঈষৎ মাথা নত করে ধন্যবাদ জানালেন, 'মনে হয় খোদাও মাঝে মাঝে ভুল করে বসেন। যে মনিব হতে পারত, তাকে পাঠান কর্মচারী করে—আর কর্মচারী হবার যার যোগ্যতা তাকে করেন মনিব। আমি ভাবি—যদি আপনার মত বুদ্ধি আর সাহস পেতাম টোপীজী !'

তাত্যা টোপী মুখ টিপে হাসলেন একটু।

নানাসাহেব বিদেশ-যাত্রার পূর্বরাত্রিটা প্রিয়তমা আদালা বা আউলা বেগমের ঘরে না কাটিয়ে হুসেনীর ঘরে কাটাবেন, এটা কেউ অনুমান করতে পারে নি—শুধু হুসেনী ছাড়া। হুসেনীর বসে থাকবার ভঙ্গিতে নানাসাহেবের মনে হল সে যেন তাঁরই অপেক্ষা করছিল।

'তুমিও এখনও ঘুমোও নি হুসেনী ?'

'না। আপনার প্রতীক্ষা করছিলাম।'

'তুমি আমাকে আশা করেছিলে ?' নানাসাহেব সত্যিই বিস্ময় বোধ করলেন।

'করেছিলাম বৈকি। পেশোয়াজী, আদালা বেগম আপনার নর্মসহচরী, কিন্তু কর্মসহচরী একমাত্র আপনার এই দাসী। আপনার মর্যাদা, আপনার প্রতিভা, আপনার শৌর্যের উপযুক্ত মূল্য বোঝবার মত শিক্ষা আদালার নেই। সে জানে না যে পুণ্যশ্লোক বিশ্বনাথ রাও, মহান বাজী রাও, কর্মবীর বালাজী রাও, দেশভক্ত মাধব রাওএর রক্ত আপনার ধমনীতে বইছে। সে জানে না যে ঈশ্বর আপনাকে সিংহাসনে বসে কোটি কোটি মানুষকে শাসন করবার জন্যই পাঠিয়েছেন—সুন্দরী নারীর আলিঙ্গনে দিন কাটাবার জন্যে নয়। আপনার জীবনে ক্রীতদাসীর স্থান আছে বটে—কিন্তু সে রণাঙ্গনের বিশ্রাম-মুহূর্তে শুধু।'

খুশী হলেন নানাসাহেব।

ঈষৎ হেসে পাগড়িটা খুলে তার হাতে দিলেন। সেটা সদ্য-ক্রীত একটা বিলেতী মেহগ্নি টেবিলের ওপর রেখে হুসেনী তাঁর কোমরবন্ধ, আঙরাখা ইত্যাদি খুলে নিল।

তার পর নানাসাহেব আরাম করে একটা দিওয়ানে বসলে সে তাঁর পা থেকে নাগরাটা খুলে নিয়ে একজোড়া ভেলভেটের চটি পরিয়ে দিয়ে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকল, 'মুসম্মৎ, তামাকু !'

মুসম্মৎ নানাকে আসতে দেখেই কলকেতে 'আগ চাড়িয়েছিল'—কলকেতে তামাকু-টিকে সাজানোই থাকে—এখন গুড়গুড়িটা রেখে সসম্মানে ও সসংকোচে ফরসির-মুখটা নানাসাহেবের হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করবার পর মুখ থেকে নলটা সরিয়ে নানাসাহেব বললেন, 'তুমি ঠিকই ধরেছ হুসেনী, আজ আর আদালাকে আমার প্রয়োজন নেই। আজ তোমাকেই

আমার দরকার। তোমাকে আমার একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

হুসেনীর মুখভাবে মনে হল সে প্রশ্নটাও অনুমান করতে তার বিলম্ব হয় নি। কিন্তু সে মুখে শুধু বলল, 'এখন খাবেন কিছু? মহারাজকে কিছু আনতে বলব আপনার জন্যে? একটু দুধ?'

'না—না, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমার যা খাবার তা আমি সন্ধ্যেবেলাই খেয়ে নিয়েছি।...হুসেনী, আজ একটা খবর পেলাম, তাতে আমি বড় বিচলিত বোধ করছি। তুমি নাকি মাঝে মাঝে মুন্সী নানকচাঁদের বাড়ি যাও? একি সত্যি? আমার তো বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না!'

হুসেনী একটু হাসল। মধুর সে হাসি—কিন্তু তার অন্তরালে কিছু বিদ্রূপ বোধ করি ছিল। সে বলল, 'খবরটা কার কাছ থেকে পেয়েছেন তাও আমি জানি। ডুলিওয়ালাদের ডেকে আমার গতিবিধি সম্বন্ধে জেরা করেছেন। পেশোয়াজী, যদি আমার একথা গোপন করবার প্রয়োজন হত তো আমি ডুলিওয়ালাদের নিষেধ করতাম। আর তা হলে—কেটে দুখানা করে ফেললেও আপনি ওদের কাছ থেকে এ খবর বার করতে পারতেন না। হ্যাঁ, আমি নানকচাঁদের বাড়ি মধ্যে মধ্যে যাই। কিন্তু এতে এত বিচলিত হবার মত কী হল পেশোয়াজী?'

শেষের দিকে কণ্ঠস্বরটা একটু তীক্ষ্ণই শোনাল।

ধুন্ধুপন্থ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তবু তিনি বেশ উত্তেজিত ভাবেই বললেন, 'বিচলিত হব না! নানকচাঁদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক তা তুমি জান না। কিছুই তো পেলাম না—যা আছে সামান্য, পৈতৃক ধুলিগুঁড়ি, তারই লোভে স্বর্গত পেশোয়ার ভাগ্নেরা আমাকে তিতবিরক্ত করে তুলেছে।...পঞ্চাশটা মকদ্দমা চালাচ্ছে। নীচের আদালতে হারলে ওপরের আদালত—সেখানে হারলে আবার নতুন করে নীচের আদালতে ফিরে আসছে। তাদের কী সাধ্য যে, আমার সঙ্গে এই শত্রুতা করে—এতকাল ধরে? শুধু ঐ নানকচাঁদ আর চিম্‌নে আপ্পা। আপ্পা টাকা যোগাচ্ছে—আর নানকচাঁদটা তদ্বির করে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে আমার হিতাকাঙ্ক্ষিণী প্রেয়সীর যোগাযোগ—এটা খুব সুখবর কি?

নানা ধুন্ধুপন্থ রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

হুসেনীর মুখের হাসি কিন্তু মিলোয় নি। সে হেসেই জবাব দিল, 'মালিক, আপনি রাজপুত্র, রাজা—মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে আপনার এর চেয়ে ঢের ঢের বেশী খবর রাখার কথা। নানকচাঁদ পাকা ব্যবসাদার, টাকা ছাড়া সে আর কিছুই চেনে না এ পৃথিবীতে। তবে তার একটি গুণ আছে—যার কাছে যেটুকু খায়, তার সেটুকু কাজ বিশ্বস্ত ভাবেই করে। ঋণটার পুরো উসুল দেয়।...চিম্‌না আপ্পার টাকা খেয়ে সে আপনার বিরুদ্ধে যতটা তদ্বির করছে—আপনার টাকা খেলে ঠিক ততটাই তদ্বির করবে চিম্‌না আপ্পার বিরুদ্ধে। হয়তো দু জনের কাজ একসঙ্গেই করবে, কিন্তু একের কথা অপরকে জানাবে না। নানকচাঁদের সঙ্গে আমার প্রয়োজনের সম্পর্ক। ষড়যন্ত্রের কাজে নানা মানুষকে প্রয়োজন হয় পেশোয়া—নানকচাঁদও সে প্রয়োজনের বাইরে নয়। তার যেটুকু কাজ সে ঠিকই করে এবং সে কথা কোন দ্বিতীয় প্রাণী জানতে পারে না। কালই সে আমাদের এক মহা উপকার করে দিয়েছে—কিন্তু সে কথা থাক। সে বিশ্বাস করে না যে আমরা জিতব, ইংরেজরা হারবে, তবু আমাদের যেটুকু

দরকার সেটুকু উপকার সে ঠিকই করে দিচ্ছে। অবশ্য—টাকা খেয়েই।'

ধুন্ধুপন্থ নিঃশব্দে ধূমপান করছিলেন, আরও কিছুক্ষণ তেমনিই বসে রইলেন, তার পর বললেন, 'কী করছ তোমরা, তা তোমরাই জানো। কী বিপদে শেষ অবধি পড়তে হবে তা কে জানে!'

হুসেনী তাঁর পায়ের কাছে এসে বসেছিল। এখন তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'খোদা পয়মান, কিছুই আটকাবে না পেশোয়া। এটা তো জানেন, পলাশীর লড়াই-এর পর ঠিক এক শ বছর পুরো হয়েছে। এইটেই ইংরেজের পতনের বছর।...আর এইটেই আপনার উত্থানেরও বছর।'

সে নানাসাহেবের চোখে চোখ রেখে একটু আবেগের সুরেই শেষের কথাগুলি বলল। নানাসাহেব তার গাল নেড়ে আদর করে বললেন, 'আপনার বলছ কেন—বল আমাদের উত্থান। আমি একা উঠব না হুসেনী, তুমিও উঠবে। যদি গণপতি ভগবান দিন দেন, সুদিন আসে—তোমাকে ভুলব না।'

হুসেনী নড়েচড়ে বসল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাত একটা বাজে। আর তিন ঘণ্টা বাদেই আপনার গাড়ি হাজির হবে। কাজের কথাগুলো এই বেলা সেরে নিই।...এই কাগজপত্রগুলো রাখুন। কোন্ কোন্ ছাউনিতে আমার কোন্ কোন্ লোক আছে, কোথায় কাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন—তার পুরো বিবরণ, তাদের নাম-ধাম সব লেখা রইল। কিন্তু খুব সাবধান, এ কাগজ আপনার কাছছাড়া করবেন না মোটে। করলে এ লোকগুলির তো জান যাবেই, আমাদের জানও খুব নিরাপদ থাকবে না।'

নানাসাহেব সবগুলি দেখে পড়ে ভাঁজ করে আঙরাখার জেবে রাখলেন। তার পর বললেন, 'আর সেই যে তুমি বলেছিলে, কমিসারিয়েটের একজনকে হাত করবে—ওখানকার খবর—'

হুসেনী উত্তর দিল, 'বড় মুস্কিল পেশোয়াজী, ওখানে সাহেব আর বাঙালী—এই-ই বেশি। বাঙালীরা বড় বেশি ইংরেজের ভক্ত, বিশেষ করে এই কেরানীরা। একটি ছেলেকে খানিকটা হাত করেছি, তবে সে কতটা খবর আপনাকে দিতে পারবে তা জানি না। যাই হোক, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি মিরাটে পৌঁছলে আমার লোক তাকে আপনার কাছে হাজির করে দেবে। তার নাম হীরালাল। খুবই কম বয়স—বালক বললেই হয়। সুশ্রী চেহারা—নম্র শান্ত ছেলে। তবে জোর করে তার কাছ থেকে কিছু আদায় করার চেষ্টা করবেন না। সে ভাঙবে কিন্তু মচকাবে না।'

নানাসাহেব তাকিয়াতে এলিয়ে পড়লেন।

তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার এধারের কী কী কাজ বাকি রইল—তা তো বললে না? আজিমুল্লা যে অনেক টাকা চাইছিল?'

'টাকাটার হুকুম দিয়ে রাখবেন খাজাঞ্চীকে। কাজের ফিরিস্তি আপাতত থাক। ঘুমে আপনার চোখ ঢুলে আসছে। আপনি ঘুমোন।'

হুসেনী লঘু কোমল হাতে তাঁর পায়ে হাত বোলাতে লাগল।

একটু পরেই নানাসাহেবের নিশ্বাস নিয়মিত হয়ে এল। গাঢ় ঘুমে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। হুসেনী এবার নিঃশব্দে তাঁর পদতল থেকে উঠে দাঁড়াল। তার পর পা টিপে টিপে একেবারে বাইরে এসে মৃদুকণ্ঠে ডাকল, 'মুসম্মৎ'!

'জী মালেকান!'

'সর্দার খাঁকে খবর দে—আমার জন্যে যেন একটা ঘোড়া তৈরী রাখে। ভাল ঘোড়া। পেশোয়া রওনা হবার এক-ঘড়ি বাদে আমিও রওনা দেব।'

'একা?'

'না, সর্দারও সঙ্গে যাবে।'

'আমি না গেলে তোমার অসুবিধে হবে মালেকান!'

'তুই ঘোড়ায় চড়তে পারবি?'

'পারব—অভ্যাস আছে, তবে মরদের পোশাকে।

'আমিও মরদের পোশাকে যাব। বেশ, তাই বলে দে।'

'কী কী সঙ্গে নেব মালেকান?'

'একটা করে আওরতের পোশাক—আর টাকা। আর কিছু দরকার নেই। আর শোন্, একটা খত আছে, আজিমুল্লা খাঁকে পাঠাতে হবে। এই নে।'

জামার ভেতর থেকে একখানা চিঠি বের করে দিল হুসেনী।

॥ ১৮ ॥

নানা ধুন্ধুপন্থ নানা জায়গা ঘুরে যখন লক্ষ্নৌ পেঁছিলেন, তখন সেখানকার হাওয়া রীতিমত গরম হয়ে উঠেছে। পর পর কদিনে অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে। কিছুদিন পূর্বে আউটরাম বিদায় নিলে সরকার অযোধ্যায় চিফ কমিশনার রূপে পাঠিয়েছিলেন কভারলি জ্যাকসনকে। জ্যাকসন কড়া মেজাজের লোক—রূঢ় ব্যবহারের জন্যই বিখ্যাত। অযোধ্যা, বিশেষ করে লক্ষ্মৌ, তখনও ওয়াজেদ আলি শাকে নবাবী থেকে চ্যুত করার কথাটা ভুলতে পারে নি। ওয়াজেদ আলি শার যতই চারিত্রিক দোষ থাক, শাসন-ব্যাপারে যতই তাঁর শৈথিল্য থাক, তিনিই অযোধ্যার সিংহাসনের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। তাঁর নবাবী কেড়ে নেওয়াতে হিন্দু-মুসলমান কোন ভূম্যধিকারীই সুখী হন নি। তাঁদের নিজেদের ভয়ও বোধ করি ছিল কিছু কিছু—কে জানে আংরেজ সরকারের মতিগতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পেঁছিবে। তাঁদের জমিজায়গা-গুলো টিকলে হয়!

ফলে অসন্তোষের আগুন শুধু সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে নয়—তাঁদের ছোঁয়াচে ও প্রভাবে তা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। একে মা মনসা—তায় ধুনোর গন্ধ। এলেন জ্যাকসন। তিনি ইংরেজী সুশাসনের বড়ি দেশবাসীকে একরকম জোর করেই গেলাতে শুরু করলেন। তাঁর সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছিলেন ফাইনান্সিয়াল কমিশনার গাবিন্স্। উভয়ে পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষির ফলে সুশাসনের তাণ্ডবনৃত্য জুড়ে দিলেন। বহু জমিদারের খাজনা বাড়ল। চাষীদের হয়তো কিছু সুবিধা হল, কিন্তু তা বোঝবার মত অবস্থা তাদের নয়। নূতন সেটেলমেণ্টে কাগজপত্র না দেখাতে পারায় বহু জমিদারের খাস জমি বাজেয়াপ্তও হল। নবাব-পরিবারের অনেকের পেনশন বন্ধ হল। নবাব অপসারিত হলে তাঁর বিরাটসংখ্যক মোসাহেব ও পারিষদের দলও বেকার হয়ে পড়েছিল; তাঁর সিপাহীদের চাকরি গিয়েছিল; তাঁর অমিতব্যয়িতার প্রধান সহায় ছিল যেসব ব্যবসায়ীরা, তাদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। ফলে পথেঘাটে অসন্তোষের বীজ ছড়াবার লোকের অভাব ছিল না। তাদেরই সহায়তায় মৌলবী অত সহজে এখানে গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে পেরেছিলেন।

এ ছাড়া জ্যাকসন তাঁর উম্বত নিবুদ্ধিতায় আরও কতকগুলি হঠকারিতা করে ফেলেছিলেন, হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই কতকগুলি দেবোত্তর সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিলেন—পুরাতন প্রাসাদ কেড়ে নিয়ে তাতে সরকারী দফতর বা দাওয়াখানা খুলেছিলেন—ভগ্ন সমাধি-মন্দির ধূলিসাৎ করে বাগান বসিয়েছিলেন।

এর ফলে অযোধ্যার অবস্থা যে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল তা বলাই বাহুল্য। অবশেষে ক্যানিং-এরও টনক নড়ল। তিনি জ্যাকসনের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে হেনরী লরেন্সকে এনে বসালেন। কিন্তু অযোধ্যা প্রদেশের অবস্থা তখন বোধ করি চিকিৎসার বাইরে চলে গেছে। লরেন্স এসে যথাসাধ্য করেছেন। অনেকের পেনশন আবার মঞ্জুর করেছেন, অনেকের জমি ফিরিয়ে দিয়েছেন। প্রতিপত্তিশালী লোকদের সঙ্গে দেখা করে মিষ্টবাক্যে তাদের প্রসন্ন করবার চেষ্টা করেছেন—কিন্তু তবু অসন্তোষ মেটে নি। একদিন তো প্রকাশ্যেই—লক্ষ্ণৌ শহরের রাজপথে একটা লোক খোদ লরেন্সের মুখেই কাদা ছুঁড়ে মারল। অপর কোন কমিশনার হলে আগুন জ্বলে যেত, কিন্তু লরেন্স অসীম ধৈর্যে সব সহ্য করলেন। তিনি বৃহত্তর আগুনের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন—বুঝেছিলেন সামান্য ব্যক্তিগত অপমানকে প্রাধান্য দেবার সময় সেটা নয়।

এ সব খবরই নানাসাহেব পেয়েছেন।

আরও একটি জোর খবর পেয়েছেন। মিলিটারী সার্জন ডাঃ ওয়েলস্ ইতিমধ্যে এক কাণ্ড করে বসেছেন। শরীর অসুস্থ হওয়ায় একদিন হাসপাতালে ঢুকে তৈরী মিকসচারের বোতল মুখে লাগিয়ে তা পান করেছেন। এদেশের হালচাল তিনি জানেন না—এই সামান্য ব্যাপারের সুদূরপ্রসারী ফলাফল অনুমান করার মত অভিজ্ঞতা বা বিদ্যাবুদ্ধিও কিছু তাঁর নেই। কিন্তু এই খবরটি যথাস্থানে প্রচার করবার মত লোকের অভাব ছিল না। মৌলবী বন্দী হয়েছেন, কিন্তু আমিনা বেগম ও আজিমুল্লার বেতনভুক্ লোকের সংখ্যা খুব কমে নি। দেখতে দেখতে সংবাদটা ব্যারাকে ব্যারাকে ছড়িয়ে পড়ল। বিধর্মী ম্লেচ্ছ রাজশক্তি নানা ফন্দিতে তাদের ক্রেস্তান করতে চায়। ক্রেস্তানের উচ্ছিষ্ট ওষুধ খাইয়ে ক্রেস্তান করবার প্রয়াস তাদের পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনারই একটা কার্যক্রম মাত্র। সিপাহীরা আগুন হয়ে উঠল। ওয়েলস শুধু গোরুখোর নয়—শুয়োর-খোরও। সুতরাং তাঁর উচ্ছিষ্ট হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছেই সমান অশুদ্ধ।

সিপাইদের অসন্তোষের সংবাদ যথাসময়ে লরেন্সের কাছে পৌঁছল। তিনি তখনই নিজে হাসপাতালে গিয়ে ওষুধের বোতলটি কয়েক জন সিপাহীর সামনে আছাড় মেরে ভাঙলেন, ওয়েলস্‌কে সর্বজনসমক্ষে তিরস্কার করলেন, তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করবারও ভয় দেখালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এটাকেও লোকে অভিনয়ের অঙ্গ বলে ধরে নিল। অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হয়েই রইল। অবশেষে সে বহ্নির বহিঃপ্রকাশ হল দিন-তিনেক পরে—সে আগুনে ডাঃ ওয়েলসের বাংলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

সেই দিনই নানাসাহেব লক্ষ্ণৌ পৌঁচেছেন।

নিশীথ রাত্রের সেই বহ্ন্যুৎসব তিনি নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করলেন।

অন্ধকারে দূরে প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে নানাসাহেব একদৃষ্টে সেই আগুনের দিকেই চেয়েছিলেন। অত দূরে থেকেও তার রক্তাভা তাঁর ভ্রূকুটিবদ্ধ মুখকে আরক্ত করে তুলেছিল। তিনি স্থির হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন। আগুন কোথায় আর কেন লেগেছে সে সংবাদ আনতে তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন। সে লোক ফিরে এসে খবরও দিয়েছে। তার পর থেকে কোন উদ্বেগ বা কৌতূহল তাঁর মুখে প্রকাশ পায় নি—আশ্চর্য রকমের স্থির হয়ে গেছেন।

আগুনি অনেকক্ষণ ধরেই জ্বলল। সাহেবের বাংলো—কাঠ-কাঠরা আসবাব-পত্রের অভাব নেই। এবং যতক্ষণ তার রক্তাভা সেই তামসী রাত্রির অন্ধ আকাশের এক প্রান্ত আলোকিত করে জ্বলতে লাগল, ততক্ষণ নানাসাহেব কোথাও নড়লেন না। বরং সেই অগ্নিকাণ্ডকে উপলক্ষ্য করে যে পৈশাচিক উল্লাস-কোলাহল উঠেছিল, দূরোত্থিত সেই কোলাহলের দিকে যেন একাগ্রচিত্তে কান পেতে ছিলেন। ক্রমে ক্রমে কোলাহল ও আলো দুই-ই মিলিয়ে এল। এবার নানাসাহেব তাঁর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করলেন—কখন দীর্ঘকায় একটি লোক নিঃশব্দে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু চমকেই উঠলেন, কারণ রাজদরবারের সমস্ত আবহাওয়াই হল সন্দেহ ও সংশয়ের ; ষড়যন্ত্র, হত্যা—এসব নানাসাহেব যে পরিবারে ও যে যুগে মানুষ হয়েছেন, সে যুগে ও সে পরিবারের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার মতই সহজ ঘটনা। সুতরাং ভয়ও পেলেন—চকিতের মধ্যে হাতটা তাঁর কোমরে চলে গেল। সেখানে একটি পিস্তল গোঁজা।

অন্ধকার হলেও তাঁর কোন ভঙ্গি আগন্তুকের চোখ এড়ায় নি। তিনি নিজের হাত দুটি স্থির রেখে ঈষৎ অভিবাদনের ভঙ্গিতে ঘাড় হেলিয়ে বললেন, 'বন্দেগী পেশোয়াজী, আমি আপনার বান্দা—মহম্মদ আলি খাঁ।'

'ও, খাঁ সাহেব! আসুন, আসুন, ঘরে চলুন!'

স্পষ্ট স্বস্তির আভাস তাঁর কণ্ঠস্বরে।

মহম্মদ আলি খাঁ বললেন, 'এখানেই ভাল—ফাঁকা ও নির্জন। ঘরে কথা কইলেই আড়ি পাতবার ভয় থাকে। বসুন না এখানে—চৌকি তো আছেই।'

তিনি পেশোয়ার দিকে একটা চৌকি এগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ধুপ্‌ধুপ্‌ নিজে বসে মহম্মদ আলি খাঁকেও বসতে ইঙ্গিত করলেন।

'তার পর?' প্রশ্নটা প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই নানার মুখ দিয়ে বের হয়ে এল।

'কেমন দেখছেন আর শুনছেন বলুন! আপনি নিজে যে সরেজমিনে খোঁজ করতে বেরিয়েছেন এ আমাদের কাছে বড় ভরসার কথা পেশোয়াজী। উপযুক্ত সেনাপতির যোগ্য কাজ। কিন্তু সে যাই হোক, আপনার মোটামুটি ধারণা কী হল, সেইটেই শোনবার জন্য কৌতূহল হচ্ছে।'

'ধারণা?' কথাটা উচ্চারণ করে নানা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

'ধারণা তো ভালই। সবই তো লক্ষণ দেখছি আমাদের অনুকূলে। সত্য কথা বলতে কি, কাজটা যে এতটা এগিয়েছে, তা আমি এতদিন ভাবতেই পারি নি। অবশ্য এর সবটাই যে আজিমুল্লা বা আপনাদের দ্বারা হয়েছে—এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। কতকটা আপনিই হয়েছে। তাই মনে হচ্ছে খাঁ সাহেব, এ যেন ভগবানেরই নির্দেশ। ইংরেজদের পাপ সহ্য করতে না পেরে স্বয়ং গণপতি ভগবানই যেন এই আগুন জ্বালিয়েছেন। না খাঁ সাহেব, এতদিন যেটুকু দ্বিধা

আমার ছিল, আজ এইমাত্র তা চলে গিয়েছে। এবার থেকে আমি মনে-প্রাণে আপনাদেরই দিকে।'

মহম্মদ আলি খাঁ নিঃশব্দে হাসলেন। অন্ধকারে তাঁর ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রু ভেদ করে সে হাসির ঝিলিক দেখা গেল না। অত ছাড়া মুখের হাসি কণ্ঠেও ধরা পড়ল না। বেশ গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন, 'কিন্তু পেশোয়াজী, উন্মত্ততা যুদ্ধ নয়। হঠাৎ আচমকা মারপিট করে কখনও একটা শক্তিকে হারানো যায় না। মুষ্টিমেয় আংরেজ এত বড় দেশটা দখল করেছে—তাদের শক্তিকে ছোট করে ভাবাও উচিত নয় কোনমতে।...আমি দু-দু বার ইউরোপ ঘুরে এসেছি পেশোয়াজী—এদের আমি চিনি। অবজ্ঞা বা অবহেলা করবার মত শত্রু এরা নয়।'

কথাটা বোধ করি পেশোয়ার ভাল লাগল না। তিনি ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবেই বললেন, 'আপনি কী বলতে চান?'

মহম্মদ আলি খাঁ তাঁর বিরক্তি লক্ষ্য করলেন বলে বোধ হল না। তিনি বরং আরও একটু গলায় জোর দিয়ে বললেন, 'প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হতে হবে—এই ভাবেই কাজে নামবেন। আগে থাকতে ভেবেচিন্তে কাজের ছক কেটে নিতে হবে আমাদের। কোথায় কোথায় আমরা ঘাঁটি করব সেটা ভেবে নেওয়া দরকার। ওদের একত্র হতে দিলে চলবে না। যেমন ছড়ানো আছে তেমনি ভাবেই শেষ করতে হবে। সেটা অবশ্য সহজ। কিন্তু কাজ তো ঐখানেই মিটবে না পেশোয়াজী। এত বড় সাম্রাজ্য ওরা এক কথায় ছেড়ে দেবে না। সেজন্য প্রস্তুত হতে হবে। কোথায় কী ভাবে ঘাঁটি করবেন, কে কোন্ দিক আগলাবে—এসব আগে থাকতেই ঠিক হওয়া দরকার। তা না হলে এত আয়োজন এত রক্তপাত সব পণ্ড হবে।'

নানাসাহেবের বিরক্তি ঢাকা থাকে না। তিনি বললেন, 'আপনি বড় বেশী দূর চিন্তা করেন খাঁ সাহেব। এত ভবিষ্যৎ ভাবলে কোন কাজই চলে না। মুষ্টিমেয় ইংরেজ এদেশ দখল করেছে ঠিকই, কিন্তু সে কাদের জোরে? তেলেঙ্গী সিপাইরা না থাকলে ক্লাইভ কিছুই করতে পারত না। যা করেছে দেশী সিপাইরাই। আমরা উজবুকের মত হাতে করে দেশটা ওদের হাতে তুলে দিয়েছি। আপসে ঝগড়া করে বাইরের শত্রু ডেকে এনেছি। যদি সত্যিই আমরা এক হয়ে নিজের ক্ষমতা বুঝে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি তো ওরা আর এদেশের মাটিতে নামতে সাহস করবে না। এই কটা ইংরেজ মরলেই যথেষ্ট শিক্ষা হবে ওদের। ওদের দেশ শুনেছি এতটুকু একরত্তি—হিন্দুস্তানের সব লোক রুখে দাঁড়ালে তাদের নজরেই ওরা ভয়ে কুঁকড়ে যাবে। হাতী নিজের দেহটা সব দেখতে পায় না—এই তো আফসোস।'

মহম্মদ আলি খাঁ বেশ একটু বিদ্রূপের সুরেই জবাব দেন, 'সে-ও যেমন আফসোস, কুয়ার ব্যাঙ তার কুয়াটাকেই জগৎ ভাবে—সেও তেমনি।'

নানাসাহেব এই রূঢ় বাক্যে যেন আঘাত খেয়ে সোজা হয়ে বসলেন, মহম্মদ তা লক্ষ্যও করলেন না। তিনি বলে চললেন, 'ইংরেজদের দেশ এতটুকু তা ঠিকই, কিন্তু ঐটুকু দেশেরই ক-জন লোক শুধু হিন্দুস্তানে নয়—তামাম দুনিয়ার সব জায়গাতেই আজ তাদের রাজত্ব ফেঁদে বসেছে। ওরা ভীরু নয়, ওরা বোকা নয়—এ দুটোই মস্ত বড় কথা পেশোয়াজী। যদি আমরা এক হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি, তা হলে অনেক কিছুই করতে পারব তা আমিও

মানি। কিন্তু এ "যদি"টা অনেকখানি "যদি" পেশোয়াজী। এ দেশের মানুষ এক হয়ে দাঁড়াবে—এ আপনি আশা করেন? মানুষগুলো কি রাতারাতি পাল্‌টে যায়? সিন্ধিয়া, হোলকার, গায়কোয়াড়—সহজে আপনার কর্তৃত্ব মানবে? আপনি মানবেন বাহাদুর শাহের বাদশাহী? সবাই চাইবে এই সুযোগে নিজের নিজের দিন কিনে নিতে।...নিজেকে বড় শত্রুকে ছোট দেখবেন না পেশোয়াজী—তা হলে নিজের সর্বনাশকে নিজে ডেকে আনা হবে।...আপনি বলছেন, সবাই যদি এক হয়ে দাঁড়ায়—কারা কারা এক হবে তা খবর নিয়েছেন? বাঙালী, তেলেঙ্গী, রাজপুত, শিখ—এদের খবর রাখেন কী?'

বোধ করি, মহম্মদ আলি খাঁর যুক্তিতে যত না হোক, তাঁর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় খানিকটা নরম হয়ে এলেন ধুন্ধুপন্থ। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তা আপনি কী করতে বলেন?'

'আপনারা—যাঁরা এর নেতা, তাঁরা বসে এসব কথা আলোচনা করুন, যদি প্রতি-আক্রমণ আসে তো কোথা দিয়ে কেমন করে আপনারা আত্মরক্ষা করবেন চিন্তা করুন। চারিদিকে ছড়িয়ে থাকলে সামলানো শক্ত হবে। দিল্লী থেকে শুরু করে আরা, ওধারে ঝান্সি পর্যন্ত—এই তো দেখছি আমাদের মূল ঘাঁটি। এর ভেতরই আমাদের সমস্ত শক্তি সংহত করা উচিত। সাবধানে হিসাব করে সমস্ত কার্যক্রমের ছক কেটে ফেলুন। ইংরেজ খুব সহজ শত্রু নয়—আর এক বার সে কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি পেশোয়া।'

নানাসাহেব আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ইংরেজ সহজ নয় তা আমিও খানিকটা জানি বৈকি খাঁ সাহেব। তাই তো আমার এত সতর্কতা। আমি এখনও ওদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করি নি—একটি আঙুলও তুলি নি। আসলে আমি এখনও সহকর্মীদের ঠিক বুঝতে পারছি না। বাজিটা খুব লোভনীয় বটে—মুক্তি আর রাজগী, কিন্তু আর একদিকে সর্বনাশ, তাও ভুললে চলবে না। যথাসর্বস্ব পণ করতে হবে এই জুয়াখেলায়।'

মহম্মদ আলি খাঁ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি কি তামাম হিন্দুস্তানের তখ্‌ত চান পেশোয়া?'

নানাসাহেব অলক্ষ্যেও শিউরে উঠলেন। অন্ধকারেই, দূর আকাশের নির্বাপিতপ্রায় অগ্নিশিখার আভাসে মহম্মদ খাঁর মুখখানা লক্ষ্য করবার চেষ্টা করে বললেন, 'না, না—তেমন কোন লোভ আমার নেই। বাহাদুর শাহ বাদশা—তখ্‌ত তাঁর। তবে মহারাষ্ট্রের আমি ন্যায্য অধিকারী—নয় কি? আপনি কী বলেন?'

মহম্মদ আলি খাঁ হাসলেন। এবার আর সে হাসি চাপা রইল না। শুভ্র দন্তপংক্তি গুম্ফ-শ্মশ্রু ভেদ করে বিকশিত হয়ে উঠল। তবে সে হাসিতে শব্দ ছিল না—বিদ্রূপের হাসিও ঠিক নয়। সে যেন নানাসাহেবের ছেলেমানুষির প্রতি এক চরম ধিক্কার।

তিনি বললেন, 'সকলেই একটা জিনিসের ওপর লোভ করবেন না পেশোয়া—ভাগ করে নিতে শিখুন। অতি লোভেই আমরা বার বার সব হারিয়েছি।' মহম্মদ আলি খাঁ উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনি চললেন কোথায়? কথাবার্তা তো কিছুই শেষ হল না?'

একটু যেন ব্যস্ত হয়েই ওঠেন নানাসাহেব।

'কথার তো কিছুই নেই। আমি নিজের ইমান ও ইস্‌লামের নামে শপথ

করে আপনাদের দিকে এসেছি। ইংরেজ আমার দুশমন—কত বড় দুশমন তা আপনি জানেন না। তাদের আমি ঘৃণা করি। যেমন করে হোক তাদের সর্বনাশই আমার লক্ষ্য। আমার কথার নড়চড় হবে না। যখন আগুন জ্বলবে, তখন বান্দাকে ঠিকই পাশে হাজির দেখবেন। রাজগীতে আমার লোভ নেই। কাজেই ওসব চিন্তা আপনারা করুন—সলাপরামর্শ যা করবার তাও আপনারাই করবেন। কাজের সময় আমি ঠিক থাকব—সেই সময়েই আমার দরকার। তবে যা বুঝেছি, আপনাদের ভালর জন্যই তা খোলাখুলি বলেছি—যদি ধৃষ্টতা হয়ে থাকে তো মাপ করবেন।'

'বসুন, বসুন—আর একটু বসুন।' নানাসাহেব একরকম তাঁর হাত ধরেই টেনে বসান, 'আচ্ছা, ইংরেজদের সঙ্গে আপনার এত দুশমনির কারণ কি; অনেক দিনই জিজ্ঞাসা করব ভাবি—'

'দুশমন!' দূরে আকাশের দিকে চেয়ে কতকটা অন্যমনস্কভাবেই বললেন মহম্মদ আলি খাঁ, 'দুশমন! হ্যাঁ পেশোয়া—ইংরেজ আমার দুশমন! সেই জন্যেই আপনাদের দিকে এসেছি। নইলে আপনাদের ওপর শ্রদ্ধা আমার এতটুকু নেই। আমি জানি আপনাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ, বুদ্ধি সংকীর্ণতর। ক্ষুদ্র স্বার্থ-বুদ্ধিতে আপনাদের চিন্তাশক্তি আচ্ছন্ন। হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা, শান্তি, সমৃদ্ধি—কোনটাই আপনাদের লক্ষ্য নয়। আপনারা যা চান সেটা আপনাদেরই সুবিধা। তবু, আমি আজ আপনাদের তাঁবেদারি করছি—শুধু ঐ এক কারণে। ইংরেজ আমার দুশমন। যদি ওদের রাজগী নষ্ট করতে না পারি, যদি ওদের জাতের সর্বনাশ করতে না পারি—অন্তত কয়েকজন ইংরেজকেও তো ঘায়েল করতে পারব। তবু খানিকটা জ্বালা মিটবে। এই এক লক্ষ্য আমার।'

বলতে বলতেই মহম্মদ আলি খাঁর দৃষ্টি হিংস্র হয়ে ওঠে। সমস্ত মুখখানা কেমন একপ্রকার পৈশাচিক প্রতিহিংসায় বিকৃত দেখায়।

'কিন্তু—', নানা পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'এ দুশমনির কারণটা তো জানতে পারলাম না খাঁ সাহেব!'

কতকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত নানাসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রাণপণ চেষ্টায় যেন বাস্তবে নেমে আসেন মহম্মদ আলি খাঁ, 'কারণ—হ্যাঁ, কারণ আছে বৈকি।...সব কথা হয়তো আজ বলতে পারব না, কিন্তু যা পারব, তাও যথেষ্ট। আমি ইংরেজের হাতে-গড়া জিনিস নানাসাহেব, ছেলেবেলায় মিশনারীদের হাতে মানুষ হয়েছি, বেরিলী কলেজে সাহেবের কাছেই ইংরেজী পড়েছি। ওখানকার পড়া শেষ করে রুড়কিতে গিয়েছি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। প্রথম হয়ে বেরিয়েছি সেখান থেকে। বিদ্যাবুদ্ধিতে কোন ইংরেজের চেয়েই আমি কম নই।...কিন্তু পাস করে বেরিয়ে কোম্পানির চাকরি নিয়ে কী দেখলুম?...দেখলুম সেখানে আমি জমাদার মাত্র এবং একেবারে মূর্খ এক ইংরেজ সার্জেণ্ট আমার অফিসার। সে তার দেশে বোধ হয় মজুরের কাজ করত, ইঞ্জিনিয়ারিং তো কিছুই জানে না, তার মাতৃভাষাতেও কিছুমাত্র লেখাপড়া করে নি। অথচ ঐ মূর্খ লোকটা আমাদের সঙ্গে ঠিক কুকুর-বেড়ালের মত ব্যবহার করত, যেহেতু সে ইংরেজ, রাজার জাত—আর আমরা কালা আদমী। আমার টাকার অভাব নেই তা আপনিও জানেন। আমি চাকরি করতে গিয়েছিলুম—টাকার লোভে নয়। কাজ শিখেছি ভাল করে, ভাল কাজ দেখাব—এই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেখলুম একদল মজুর নিয়ে পথে পথে মাটি কাটা ছাড়া কোন কাজের ভারই আমার উপর দেওয়া

হল না। লেখালেখি করলাম, কোন ফল হল না। বরং ঐ লোকটা চটে গিয়ে আরও দুর্ব্যবহার করতে লাগল। বিশ্বস্ত সেবার পুরস্কার পেলাম অপমান আর লাঞ্ছনা।…অগত্যা কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করলাম—ইংরেজের কাছেই যে বিদ্যা শিখেছি তা একদিন ইংরেজের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে বুঝিয়ে দেব তার মূল্য। আমাকে অবহেলা করার দাম কড়াক্রান্তিতে বুঝে নেব!'

বলতে বলতেই আবার মহম্মদ আলি খাঁর মুখ-চোখের চেহারা উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে উঠল। চোখের চাউনিতে তেমনি উদগ্র হয়ে ফুটে উঠল ঘৃণা। তিনি অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'মাপ করবেন পেশোয়া, এসব কথা এখন থাক, এসব কথা ভাবলে আমার জ্ঞান থাকে না। আমি এখন যাই।'

'এখন কোথায় যাবেন আপনি?'

'আমার বিবি আছে, দুটো বাচ্চাও আছে। তাদের আমিই এ দুনিয়াতে এনেছি। তাদের ওপর আমার কর্তব্য আছে একটা। জানি না কী আগুন জ্বলবে—কতদূর ছড়াবে তার শিখা! আমরা জিতলেও হয়তো আমি পড়তে পারি ওদের হাতে—হয়তো মারা যেতেও পারি। সেক্ষেত্রে আমার বাড়ি খুঁজে বার করা দুশমনের পক্ষে কঠিন হবে না।…তাই ওদের দূর দেহাতে কোথাও সরিয়ে রেখে আসতে যাচ্ছি, যেখানে ইংরেজের গোয়েন্দা তাদের খুঁজে বার করতে পারবে না—আর আমি যদি কোন দিনই না ফিরি তো যেখানে তারা দুখানা রুটির অভাবে শুকিয়ে মরবে না।'

'আবার কবে আপনার দেখা পাব?'

'লড়াই যখন সত্যি-সত্যিই বেধে উঠবে, তখন আমি নিজেই ছুটে আসব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন পেশোয়া, আজিমুল্লাকে আমি জবান দিয়েছি।…এখন চলি—বন্দেগী।'

নানাসাহেব তাঁর সঙ্গে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এলেন। প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনি কেন এসেছিলেন তা বললেন না!'

মহম্মদ আলি ফিরে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে বিচিত্র এক হাসি। সে হাসি এক শ বাতির ঝাড়ের আলোতে নানাসাহেবের চোখে না পড়বার কোন কারণ নেই। তিনি এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে নানাসাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসেছিলুম দুটি কারণে। তার মধ্যে মুখ্য কারণ হল আপনাদের কাছে ছুটি নেওয়া!'

'আর গৌণ কারণটা?' হাসি-হাসি মুখেই নানাসাহেব প্রশ্ন করলেন।

'গৌণ কারণটা হল—' মহম্মদ আলি খাঁর মুখের হাসি ও চোখের দৃষ্টি বিচিত্রতর হয়ে ওঠে, 'আপনাদের চোখেই আপনাদের ললাট-লিপিটা পড়তে চেয়েছিলাম।'

'কী পড়লেন?' যেন সাগ্রহে প্রশ্ন করেন নানাসাহেব। তাঁর মুখের হাসি তখন মিলিয়ে আসছে।

বাইরের তামসী প্রকৃতির দিকে আঙুল দেখিয়ে মহম্মদ আলি খাঁ বললেন, 'অন্ধকার! ঐ অমনি জমাট-বাঁধা অন্ধকার।…আপনি এখন আগুনটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন না পেশোয়া? ঐখানেই ভবিষ্যৎলিপি পাঠ করে নিতে পারতেন। হঠাৎ আগুন জ্বলল—লাল হয়ে উঠল আকাশ। কিন্তু তার পর? যে তিমির সেই তিমির। অনেক পাপ আপনাদের সঞ্চিত আছে পেশোয়া—যুগ যুগ ধরে

সেই পাপ জমছে। আপনারা দেশবাসীর বুকের রক্ত শোষণ করে এনে মা ভবানীর চরণে পুজো দিয়েছেন। আমরাও কম যাই নি। বিধাতার শাস্তি আজ মাথা পেতে নিতে হবে বৈকি! কোথাও কোন আশা নেই—কোথাও কোন আশা নেই!'

তার পর স্তম্ভিত নানাসাহেবকে উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়েই মহম্মদ আলি দ্রুতগতিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন।

॥ ১৯ ॥

মহম্মদ আলি খাঁ রাস্তায় পড়ে বেশ দ্রুতপদেই হাঁটছিলেন। তাঁর গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে চকের মধ্যে দিয়ে পথটাই সোজা হয়। পাড়াটা ভাল নয়, "রেণ্ডিমহল্লা" বলে মহম্মদ আলি খাঁর বরং ঘৃণাই ছিল, কিন্তু আজ একটু তাড়া আছে। তাই খানিকটা ইতস্তত করে তিনি সেই পথই ধরলেন।

শহরের সর্বত্রই আজ উত্তেজনা। সে উত্তেজনার ঢেউ এ পাড়ায়ও এসে পৌঁছেছে। দোকানপাট অন্যদিন এ সময় বন্ধ হয়ে যায়—আজ এত রাত্রেও সবগুলিই প্রায় খোলা আছে। বাজারের মাঝে-মাঝেই জটলা। সংকীর্ণ গলিপথে সবটুকু জুড়েই সে জটলা চলছে। ভিড় ঠেলে যাওয়াই শক্ত। 'ইংরেজ-রাজ' শেষ হয়ে এল, দরাজ-দিল নবাব ওয়াজিদ আলি শা আবার ফিরে আসছেন—অধিকাংশ জটলারই আলোচ্য বিষয় এই। এই সব আলোচনায় মহম্মদ আলি খাঁর কান ছিল না। তিনি অন্যমনস্ক ভাবেই পথ হাঁটছিলেন। পথের ভিড়ে বার বার গতি ব্যাহত হওয়াতে একটু অসহিষ্ণু হয়েও উঠেছিলেন। মাঝে মাঝে বেশ রূঢ়ভাবেই লোকজন সরিয়ে পথ করতে হচ্ছিল। গুজববাজদের এতে চটবার কথা, কেউ কেউ রোষ-কষায়িত নেত্রে তাকাচ্ছিলেনও, কিন্তু সেই গুজবচক্রে ব্যাঘাতকারীর দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, উগ্র ভ্রূকুটিবদ্ধ দৃষ্টি এবং কটিবন্ধে তরবারির দিকে তাকিয়ে কেউই শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস করল না। তিনি কিছু বিলম্ব হলেও নির্বিবাদেই পল্লীর শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন।

কিন্তু এই অবধি এসেই সহসা বাধা পেলেন তিনি।

চকবাজারের শেষপ্রান্ত থেকে যে রাস্তাটা বের হয়ে মচ্ছিভবনের অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তাতে মিশেছে, সেই মোড়টায় পৌঁছে মহম্মদ আলি খাঁ লক্ষ্য করলেন, দুটি ঘোড়সওয়ার একরকম পথ জোড়া করেই দাঁড়িয়ে আছে। কিছু দূরে আরও এক জন। শেষ ব্যক্তিটির হাতে একটা ছোট মশাল। সেই আলোতে তার মুখখানা দেখা যাচ্ছে। এমন বীভৎস ও কদাকার মুখ মহম্মদ আলি খাঁ আর আগে কখনও দেখেন নি। তবু—মুখখানা যেন সম্পূর্ণ অপরিচিতও নয়।

পথটা এখানে একেবারেই নির্জন। কাছাকাছি পল্লীও বিশেষ নেই। বেশির ভাগই মাঠ ও সবজিবাগান। যা দু-একটা বাড়ি এদিকে আছে, তার অধিবাসীরা নিশ্চয়ই সকলে শহরে গিয়েছে তামাশা দেখতে ও উত্তেজনার মাধবী সুরা পান করতে। এই জনহীন পথে এমন ভয়াবহ দানবাকৃতি লোককে নিঃশব্দে স্থিরভাবে অপেক্ষা করতে দেখে যেমন ধারণা হয়—মহম্মদ আলির সেই রকমই হল। তিনি কোমরের তলোয়ারে হাত দিলেন।

আলোটা পিছনে—সুতরাং সামনে যে দু জন ছিল তাদের মুখে সে আলোর ছায়াই পড়েছিল—ফলে এতক্ষণ সে মুখ দুটি একেবারেই দেখা যায়

নি। তারা এ পর্যন্ত কথাও বলে নি একটিও। নিঃশব্দে যতদূর সম্ভব স্থির হয়েই দাঁড়িয়েছিল। এবার এক জন কথা বলল, 'ভয় নেই মহম্মদ আলি খাঁ, আমরা আপনার দুশমন নই। আপনি নির্ভয়ে এগিয়ে আসুন। তলোয়ার খোলার দরকার হবে না।'

নারীকণ্ঠ! পরিচিত—হ্যাঁ, পরিচিত বৈকি!

শুধু তাই নয়—এই বিশেষ বিদ্রূপের ভঙ্গিটিও যেন বহু বছরের বহু বিস্মৃতি পার হয়ে স্মৃতির দুয়ারে এসে একটা আচমকা ঘা দিল। সে আঘাতে মহম্মদ আলি যেন চাবুক খাওয়ার মতই চমকে উঠলেন। নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'আমিনা।'

ততক্ষণে অশ্বারোহিণীও ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। একটু এগিয়ে বিমূঢ় মহম্মদ আলি খাঁর সামনে এসে ঈষৎ অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে সে বলল, 'আমি আপনারই অপেক্ষা করছিলাম খাঁ সাহেব।'

এবার আর বিদ্রূপের সুর নেই কণ্ঠে—বরং কেমন যেন একটা কুণ্ঠাই প্রকাশ পাচ্ছে।

মহম্মদ আলি খাঁও ততক্ষণে আঘাতটা সামলে নিয়েছেন। বরং সামান্য একটা ভ্রূকুটির আভাসও তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে। তিনি শান্তভাবে প্রশ্ন করলেন, 'আমাকে আপনার কী দরকার বেগমসাহেবা?'

আমিনা তখনই জবাব দিতে পারল না। 'বেগমসাহেবা' শব্দটা তাকেও চাবুকের মত আঘাত করেছে। সেটা পরিপাক করতে সময় লাগল। তার পর বিনম্র নতমুখে জবাব দিল, 'একটা সাহায্য চাইবার ইচ্ছা ছিল—তাই।'

'কী সাহায্য বলুন? নিস্পৃহ নিরাসক্ত কণ্ঠে মহম্মদ আলি খাঁ উত্তর দেন।

'লক্ষ্ণৌএর হাওয়া যথেষ্ট গরম হয়ে উঠেছে। সামান্য চেষ্টা করলেই এখন মৌলবী সাহেবকে উদ্ধার করা যায়। এ সময় তাঁকে বড় দরকার। তিনি এখানকার কয়েদখানাতেই আছেন।'

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে মহম্মদ আলি খাঁ উত্তর দিলেন, 'বেগমসাহেবা, আমাদের লক্ষ্য এক—পথও হয়তো অনেকটা এক। কিন্তু আপনার প্রত্যক্ষ কোন কাজে আমি আসতে পারব না—মাফ করবেন।...প্রতিহিংসা পুরুষের কাজ, সে ভার আমিই স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিলুম। তার জন্য আপনাদের এত নীচে, এত পাঁকে না নামলেও চলত। যা দেখলুম তা দেখবার জন্য বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল না। এ দেখতে হবে জানলে বহুদিন আগেই এ দুনিয়া ছেড়ে খুদার দরবারে গিয়ে দাঁড়াতাম।...না বেগমসাহেবা, আপনার পথ আর আমার পথ এক হলেও একরকম নয়। মাফ করবেন। আমার ভরসায় আপনি এ পথে নামেন নি। আমিও আপনার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবার ভরসা রাখি না।...যা পারেন আপনিই করুন।'

মশালের আলোটা তখনও পিছনে। সুতরাং হুসেনী বেগমের মুখখানা ছায়াতেই রইল আগাগোড়া। মহম্মদ আলি খাঁর কথাগুলো সেখানে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল তা বোঝা গেল না। শুধু পাষাণ-প্রতিমার মত খানিক দাঁড়িয়ে থেকে কেমন একপ্রকার স্খলিত ভগ্নকণ্ঠে সে বলল, 'আপনার মত ধৈর্য আমার নেই মহম্মদ আলি খাঁ। তা ছাড়া আপনি কবে কী করবেন তার জন্যে অপেক্ষা করবারও কোন উৎসাহ পাই নি। আপনি বিয়ে করলেন,

আপনার ছেলে-মেয়ে হল—নিশ্চিন্ত নিরাপদ সম্মানের জীবন আপনার। আমাদের আর কোন্ পথ খোলা ছিল—তাও জানি না। যদি দিশেহারা হয়ে এই পথেই নেমে থাকি তো আমাদের দু বোনের কারুরই লজ্জিত হবার কোন কারণ আছে বলে মনে করি না। জ্বালা আমাদেরই বেশি—নয় কি ?…তা ছাড়া আজ তিরস্কার করছেন, কিন্তু আপনার মধুময় দাম্পত্যজীবনের কোনও এক অবসরে আমাদের খবর নেওয়ার কথা মনে এসেছিল কি আপনার ?'

মহম্মদ আলি খাঁর মুখ এতক্ষণ উত্তেজনায় আরক্ত ছিল। এবার বিবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি কিছুক্ষণ যেন কোন কথাই খুঁজে পেলেন না। তার পর ঈষৎ মাথা হেলিয়ে স্বীকার করলেন, 'হয়তো অপরাধ আমারই বেগমসাহেবা, কিন্তু তবু আপনার পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে আর পারব না। সারা জীবনই উৎসর্গ করেছি এই কাজে। বাঁচবার আশা বা ইচ্ছা কোনটাই রাখি না, কিন্তু দূরে থেকেই আপনার সেবা করব।…মৌলবী সাহেবের মুক্তি আপনার পক্ষে ছেলেখেলা, তাও আমি জানি। আমাকে আপনার দরকার হবে না। আচ্ছা আদাব।'

তার পর—এ পক্ষ থেকে আর কোন উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই ঘোড়াগুলোকে পাশ কাটিয়ে তিনি নিজের পথে এগিয়ে গেলেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই, সেই অন্ধকার দূর পথে তাঁর সাদা মূর্তিটা বিন্দুর মত দেখাতে দেখাতে এক সময় মিলিয়ে গেল।

আমিনা অনেকক্ষণ সেখানেই পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার এসে ঘোড়াতে উঠল। মুসম্মৎ কোন প্রশ্ন করল না, কারণ সে এদের কথোপকথন শুনতে না পেলেও এখন মশালের আলোতে মালেকানের বিবর্ণ মুখে ক্ষণে ক্ষণে রক্তোচ্ছ্বাস দেখে বুঝেছিল যে, এখানকার এই সাক্ষাৎকার মালেকানের পক্ষে প্রীতিকর হয় নি। তাই হুসেনী বেগম ঘোড়া ফেরাতে বিনাবাক্যে সে তার পিছু নিল। সর্দার খাঁও তেমনি ব্যবধান বজায় রেখে পেছনে পেছনে চলতে লাগল।

একটু পরেই দলটি চকবাজার ছাড়িয়ে আমিনাবাদের পথে এসে পড়ল। পথে পথে জটলা ও আলোচনার শেষ নেই—পথ চলাই দায়। আমিনার অবশ্য সেদিকে লক্ষ্যও ছিল না। সম্পূর্ণ অন্যমনস্কের মতই পথ চলছিল। ভিড় সরিয়ে মানুষ বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছিল বটে, কিন্তু সব কাজই করছিল কতকটা যন্ত্রের মত—তাতে মন ছিল না। হয়তো বা সে নিজের বিচিত্র অদৃষ্টের কথা চিন্তা করছিল, অথবা কিছুক্ষণ আগেকার পরোক্ষ তিরস্কারের অপমানটাই সম্পূর্ণ পরিপাক করতে পারে নি।…মনটা একটা রুদ্ধ আক্রোশে দুর্ভাগ্যের দুয়ারে মাথা খুঁড়ে মরছিল, আর তারই ব্যর্থতা অসহায় চিত্ত-বিক্ষোভে মানসিক নিষ্ক্রিয়তা এনে দিয়েছিল বলে বাইরের কোন কিছুতেই মন দিতে পারছিল না।

কিন্তু সে যাই হোক, অকস্মাৎ তার মন অতীতের রোমন্থন ও চিত্তক্ষোভ থেকে একেবারে বাস্তবে ও বর্তমানে চলে এল। সামনেই যে জটলা তা ঠিক সাধারণ লোকের নয়—উত্তেজনাটাও যেন একটু অন্য ধরনের।

মনটাকে সম্পূর্ণভাবে পারিপার্শ্বিকে নিয়ে আসতে কয়েক মুহূর্ত দেরি লাগল। পুরোপুরিভাবে সচেতন হতে, দেখল কয়েকটি সিপাই একটি নিতান্ত

নিরীহ লোককে ঘিরে দাঁড়িয়েছে এবং অত্যন্ত কটু ভাষায় গালিগালাজ করছে।

'শালা বে-শরুম কাঁহিকা—মার শালাকো!'

'বাংগালী এইসান বেইমান হ্যায়! ইংরেজ কা কুত্তা!'

চোখের পলকে আমিনা ভিড়ের মধ্যে ঘোড়া চালিয়ে দিল। সিপাইএর দল এই উপদ্রবে বিরক্ত ও রুষ্ট হলেও পথ না ছেড়ে দিয়ে তাদের উপায় রইল না। আমিনা কাছে এসে দেখল তার অনুমানই ঠিক, এদের গালাগালি ও ভীতি-প্রদর্শনের লক্ষ্যটি আর কেউ নয়—হীরালাল। এতগুলি সশস্ত্র সিপাইএর মাঝখানে অত্যন্ত বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'কী ব্যাপার বাবুজী?' আমিনা বেশ একটু কর্তৃত্বের সুরেই প্রশ্ন করল।

হীরালাল এতক্ষণ পুরুষবেশী আমিনাকে চিনতে পারে নি। পথের আলোও এমন প্রখর নয় যে দেখা যাবে, কারণ ততক্ষণে দোকানপাট বন্ধ হয়ে এসেছে। তা ছাড়া এখানে এমন অবস্থায় সে তাকে দেখতে পাবে—এটা সুদূর কল্পনারও অতীত। যা হোক, কণ্ঠস্বরেই সে তার জীবনদাত্রীকে নিঃসংশয়ে চিনতে পারল এবং ইনি যে তার শুভাকাঙ্ক্ষিণী কোন দেবীই মূর্তিমতী মাতৃ-আশীর্বাদের মত সর্বদা সঙ্গে রয়েছেন সে বিষয়েও আর সন্দেহ মাত্র রইল না। সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সকৃতজ্ঞ আবেগে এক নিশ্বাসে সবটা বলে গেল—মীরাটের জেনারেল সাহেবের কাছ থেকে এক গোপনীয় ও জরুরী 'খৎ' নিয়ে সে লক্ষ্ণৌ এসেছিল। যথাস্থানে অর্থাৎ লরেন্স সাহেবের কাছে সে চিঠি পৌঁছে দিয়ে একটু শহর দেখতে বেরিয়েছিল। তার পর এখানের হট্টগোল ও উত্তেজনা দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেছে, বিশেষত অগ্নিকাণ্ডটা দেখে সে একটু ভীত ও উদ্ভ্রান্তও হয়ে পড়েছিল—এতটা যে দেরি হয়েছে বুঝতে পারে নি। এখন পথ চিনতে না পেরে সিপাইগুলোকে দেখে পথ জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে এই বিপদে পড়েছে। সিপাইরা জানতে চাচ্ছে—সে খতের মধ্যে কী লেখা ছিল। তারা কেমন করে যেন চিঠির খবর আগেই পেয়েছে।

'অথচ', বিপন্ন ব্যাকুল কণ্ঠে হীরালাল বলল, 'মা-কালীর দিব্যি, আমি সত্যিই জানি না সে খতে কী লেখা ছিল—বিশ্বাস করুন। কিন্তু এরা তা মানতে চাইছে না। মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখাচ্ছে।'

'তোমার কোন ভয় নেই বাবুজী, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

হুসেনীর বিচিত্র ছদ্মবেশ (কারণ এখন তাকে স্ত্রীলোক বলে চিনতে কারও অসুবিধা ছিল না) এবং মর্যাদাব্যঞ্জক ভাবভঙ্গিতে অনেকেই বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। তবু ওরই মধ্যে এক জন সাহসে ভর করে কী বলতে গেল, 'লেকিন—'

আমিনা সামান্য ভ্রূভঙ্গি করে তার দিকে তাকাল। ততক্ষণে সে নিজের কোমর থেকে হাতীর-দাঁতের-কাজ-করা পিস্তলটাও বের করেছে। সর্দারও বাঁ-হাতে মশাল ও ডান হাতে অস্বাভাবিক লম্বা একটা খোলা-তলোয়ার হাতে বড় বেশী কাছে এসে পড়েছে। প্রশ্নকারীর মুখের প্রশ্ন মুখেই মিলিয়ে গেল।

আমিনা বললে, 'যে এর গায়ে হাত দেবে সে যেন জানের মায়া না রেখে দেয়।...নানাসাহেবের নাম শুনেছ? পেশোয়া ধুন্ধুপন্থ? তিনি লক্ষ্ণৌ এসেছেন তা জান? আমি একে তাঁর কাছেই নিয়ে যাচ্ছি—যা জিজ্ঞাসা করবার তিনিই করবেন। এসো বাবুজী।'

আমিনা একটা হাত বাড়িয়ে দিল, তার পর রেকাবে আটকানো নিজের পা-টা দেখিয়ে বলল, 'উঠে পড় শীগগির, তুমি নিশ্চয়ই এতদিনে ঘোড়ায় চড়তে শিখেছ!'

হীরালাল ঘাড় নেড়ে জানাল যে, আমিনার অনুমান ভুল নয়। কিন্তু তাই বলে সে আমিনার পায়ের ওপর পা দিতে পারল না, এমনিই এক লাফে অবলীলাক্রমে আমিনার পেছন দিকে উঠে বসল। আমিনার পায়ের ঈষৎ চাপ পেয়ে শিক্ষিত ঘোড়া চোখের নিমেষে ভিড়ের মধ্যে থেকে পিছু হটে বার হয়ে এল।...

তার পর এ-গলি সে-গলি ঘুরে আবার জনহীন পথ। আমিনার পিঠটা হীরালালের একেবারে বুকের সঙ্গে লেগে আছে। ওর বুকের স্পন্দন নিজের বুক দিয়ে অনুভব করছে সে। এ এক অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এ পথ আর পথ-চলা যদি জীবনে না ফুরোয় তা হলেও বোধ করি আপত্তি নেই।

'উঃ!' পিরানেরই এক প্রান্তে হীরালাল মুখের ঘাম মুছে বলল, 'আপনি এসে না পড়লে কী বিপদেই পড়তুম! আজ আর বোধ হয় জান নিয়ে ফিরতে হত না। আবারও আপনি আমার প্রাণ বাঁচালেন—বার বার তিন বার!'

'এ সব গোলমালের সময়, হাতিয়ার নিয়ে বেরোও না কেন বাবুজী? এত বড় একটা কাজে আসছ, চারিদিকে এত গণ্ডগোল—একটা পিস্তল চেয়ে আনতে পার নি?'

অপরাধীর মত মাথা চুলকে হীরালাল বলল, 'সাহেব দিতে চেয়েছিলেন, আমিই ওসব হাঙ্গামা দেখে নিই নি।'

'কাজটা ভাল কর নি বাবুজী।'

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ চলার পর হীরালাল দেখল তার এ একটা বিশ্রী রকমের অনুভূতি হচ্ছে। ঘাম যেন বেড়ে গেছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে—বুকের মধ্যেও কেমন যেন করছে! ভয় হচ্ছে ওর ঘামে ভেজা পিরানটা থেকে হুসেনী বেগমের জামাটাও ভিজে উঠছে বোধ হয়। কী মনে করছেন না জানি উনি!

সে জোর করে কথা বলল, 'কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি এখন বলুন তো?'

'নানাসাহেবের কাছেই। আমি যাব না, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তাও তাঁকে ব'ল না···আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব। তার পর—তোমাকে ছাউনিতে পেঁৗছে দেবার ব্যবস্থাও করব। ভয় নেই।'

'ভয়?' হীরালাল হঠাৎ বলে ফেলল, 'আপনার যখন দেখা পেয়েছি, তখন আর আমার কাউকেই কিছুতেই ভয় নেই।'

'তাই নাকি!' আমিনা হাসল। বিদ্রূপের সুর তার কণ্ঠে।

অন্ধকারেই হীরালাল বেচারী লাল হয়ে উঠল।

॥ ২০ ॥

হীরালাল শেষ পর্যন্ত যখন নানাসাহেবের প্রাসাদে পেঁৗছল, তখন রাত শেষ হবার খুব বেশী দেরি নেই। কিন্তু নানাসাহেব সেদিন তখনও জেগে আছেন—বরং বলা চলে বেশ সজাগই আছেন।

দোতলার কোণের একটি বড় ঘর—খুবই বড়, এত বড় ঘর সাধারণত এসব দিকে দেখা যায় না—তারই মাঝামাঝি একটা চৌকি, তার ওপর দামী ফরাস

বিছানো। সেই চৌকির ওপরই খুব কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি বসে জনতিনেক লোক নিম্নস্বরে আলাপ করছিলেন। তাঁদের একজন নানাসাহেব। বাকি দু জনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ—হয়তো খুবই বৃদ্ধ বলা যেত, যদি না তাঁর তেজোব্যঞ্জক দেহ এখনও সোজা হয়ে থাকত। তাঁর চুল-দাড়ি-ভুরু যদিও সব পাকা—কপালে যদিও কুঞ্চনের অভাব নেই, তবুও তাঁর চোখের চাউনিতে গ্রীবার ভঙ্গিতে এবং মেরুদণ্ডের ঋজুতায় কী একটা ছিল—যাতে তাঁকে আদৌ বৃদ্ধ বা স্থবির বলে বোধ হয় না। অবশিষ্ট জন অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তিটি আমাদের পূর্বপরিচিত—তাত্যা টোপী।

হীরালাল যখন হুসেনীর অনুচর এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে প্রাসাদদ্বারে এসে পেঁছেছে, তখন এখানে ঘরের মধ্যে সেই প্রবীণ ব্যক্তিটিই কথা বলছিলেন, 'নানাসাহেব, আংরেজের শক্তিকে ছোট করে দেখবার কোন কারণ নেই। কে মহম্মদ আলি খাঁ আমি চিনি না, কিন্তু তিনি সত্যি কথাই বলেছেন। আপনারা অনেকখানি লোভে এগোচ্ছেন, সেই সঙ্গে অনেকখানি বিপদের ঝুঁকিও ঘাড়ে নিচ্ছেন—এটা ভুলে যাবেন না।'

তাত্যা টোপী মুচকি হেসে বললেন, 'আপনি কি লড়াই শুরু হবার আগেই ভয় পাচ্ছেন সিংজী?'

প্রবীণ ব্যক্তিটির তীক্ষ্ম চোখ দুটিতে যেন বারেক বিদ্যুৎ খেলে গেল। কিন্তু তিনি রাগ করলেন না, হাসলেন মাত্র। বললেন—'কুঁয়ার সিং-এর ভয়! এ কথাটা কোন রাজপুত বললে আর পার পেয়ে যেত না টোপীজী। এমন কি কোন শিখ বা ফৌজী লোক বললেও তার রক্ষা থাকত না। কিন্তু মারাঠীরা সম্মুখযুদ্ধের ধার ধারে না—শৌর্যের চেয়ে কৌশলই তাদের বড় অস্ত্র। বীর বা সাহসীর মর্ম তারা বুঝবে এটা আমি আশা করি না। তাই আপনাকে ক্ষমা করলুম।'

এই বলে কুঁয়ার সিং একবার যেন নড়ে চড়ে বসলেন, তার পর তাত্যা টোপীর দিকে একবার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে নানাসাহেবের দিকে ফিরে বললেন, 'আংরেজ বেইমান, কিন্তু ওরাও সাহসী এবং বীর। ওদের আমি সত্যিই শ্রদ্ধা করি। সত্যি বলতে কি, আমার মত ভক্ত ওদের কেউ ছিল না। বিহারে ওদের এতদিনে শান্তিতে রাজত্ব করতে হত না—যদি না জগদীশপুরের কুঁয়ার সিং ওদের দিকে থাকত।...রেভিনিউ বোর্ডের ঐ কুকুরগুলো আমার পেছনে অকারণে লাগল বলেই না—। আর ঐ বেইমানের বাচ্চা বেইমান হ্যালিডে সাহেব—ওরা যদি আমাকে মিছিমিছি অপমান না করত তো কুঁয়ার সিং কিছুতেই আর ওদের বিরুদ্ধে যেত না।...না নানাসাহেব, আমি আপনাদের দিকে আসব জবান দিয়েছি, তবু বলছি যে ওদের আমি আজও শ্রদ্ধা করি। আমার বন্ধু টেলার সাহেবের মত সাচ্চা লোক তামাম হিন্দুস্তানে একটাও নেই।'

তাত্যা টোপী অসহিষ্ণুভাবে কী বলতে যাচ্ছিলেন, নানাসাহেব ইঙ্গিতে তাঁকে নিরস্ত করলেন। তিনি ধীর ভাবেই কুঁয়ার সিংকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি তা হলে কী শর্তে আমাদের দিকে যোগ দিচ্ছেন? আরার পুরুব থেকে সবটা আপনি চান—এই তো?'

কুঁয়ার সিং-এর মুখে আবারও সেই হাসি ফুটে উঠল। সে হাসি ঔদ্ধত্যের নয়, অবজ্ঞারও নয়—অপরিসীম আত্মপ্রত্যয়ের। তিনি বললেন,

'ঐটুকু আমি নেব বলেছি, চাইনি কারুর কাছে। আংরেজকে যদি তাড়াতে পারি তো বাহুবলে ওটুকু আমি নিজের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পারব নানা ধুন্ধুপন্থ। তবে আপনাদের মত বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা আমার নয়। ওর বেশি আমি চাই না।'

তাত্যা টোপী আগের অপমানের জ্বালা এখনও ভুলতে পারেন নি বোধ করি। তিনি আর থাকতে না পেরে বললেন, 'এখন চাইছেন না বলে পরেও চাইবেন না—এমন কোন কথা নেই।'

'হয়তো মারাঠীর নেই তাত্যা টোপী—রাজপুতের আছে। রাজপুত—বিশেষ করে যে হাতিয়ার ধরতে শিখেছে, তার কথার কখনও নড়চড় হয় না। তার জবান একটাই। আমি বেশির ভাগ রাজপুতের কথাই বলছি—দু-একটা বেইমান হয়তো আছে, তারা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।'

তাত্যা টোপী এবার একেবারেই জ্বলে উঠলেন, 'আপনি বার বার আমাদের জাত তুলে কথা কইছেন কুঁয়ার সিং—হুঁশিয়ার!'

'সাবাস!' দাড়িতে মোচড় দিয়ে কুঁয়ার সিং আবারও বললেন, 'সাবাস! …তবু এখনও এটুকু আত্মসম্মান-জ্ঞান যে আছে এটা দেখে সত্যিই খুশী হলুম। তাত্যা টোপী, গত দু বছরের ইতিহাসে নিজের জাতের কথাটা যদি একটু পড়ে দেখেন তো দেখবেন, জবান বলে কোন জিনিস আপনাদের কোন কালে ছিল না—বার বারই তা সুযোগ-সুবিধা মত বদলেছেন। কিন্তু রাজপুতের দু হাজার বছরের ইতিহাস পড়ে দেখবেন—দু-একটার বেশী বেইমানির কথা খুঁজে পাবেন না সেখানে। তাও আছে কিনা সন্দেহ।… শুনেছি ছত্রপতি শিবাজী আমাদেরই জ্ঞাতি ছিলেন। সেটা সত্যি হলে আরও লজ্জার কথা!'*

তাত্যা টোপী বিষম উত্তেজিত ভাবে আর একটা কি কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কুঁয়ার সিং কথাটা পাড়তেই দিলেন না। ইঙ্গিতে নিরস্ত করে বললেন, 'আমাকে ভয় দেখাবেন না টোপীজী। আমাকে এটুকু আশা করি আপনিও চেনেন। এই যে লড়াইতে নামছি, এ কিছুর লোভে নয়—প্রতিহিংসার জন্যই।…তাত্যা টোপী, নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখুন দিকি, পেশোয়া ধুন্ধুপন্থের জন্যেই কি আপনার এত মাথাব্যথা? সিংহের উচ্ছিষ্ট শৃগাল কতটা পাবে, অথবা সিংহই বা বলছি কাকে—শৃগালকে ঠকিয়ে মর্কট কতটা নিতে পারবে—এইটেই তো আপনাদের চিন্তা? আপনাদের আমি চিনি।'

অপমানে নানাসাহেবেরও মুখ কালো হয়ে উঠল, কিন্তু তিনি তাতলেন না। বরং ভ্রূকুটি করে তাত্যার দিকে চেয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা করলেন, 'উঁহু-উঁহু, এসব ঝগড়া আর নয়। এই জাত তুলে ঝগড়া আর পরস্পরকে গালাগালি—এতেই আমরা গেছি।…আর আপনাকে কে না জানে কুঁয়ার সিং। যাক, আপনার জবান পেয়ে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। টিকা সিং অবশ্য বলেছিল, তবু…কিন্তু আপনি লক্ষ্মৌতে কেন এসেছিলেন তা তো জানা হল না!'

---

* টডের মতে আলাউদ্দীনের আক্রমণকালে মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহের এক পুত্র সজ্জন সিং দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। তাঁরই কয়েক পুরুষ পরে এই বংশেই শিবাজীর আবির্ভাব হয়।

'নিতান্তই বিষয়কার্যে পেশোয়া। টাকা চাই তো। এখানে আমার কিছু জায়গীর ছিল, সেগুলো বেচে দিয়ে গেলাম।'

এই সময় দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে একটি রক্ষী ঘরে প্রবেশ করল। তিন জনেই আত্মসংবরণ করে স্থির হয়ে বসলেন। রক্ষী ঈষৎ মাথা নত করে নানাসাহেবের সামনে নিজের হাতটা মেলে ধরল। সে হাতে একটি আংটি—চারকোণা লাল পাথরের আংটি।

নানাসাহেব আংটিটি দেখেই চিনলেন। একবার একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আপনি একটু বসুন কুঁয়ার সিংজী, খুব জরুরী খবর আছে—আসছি আমি।'

তার পর তাড়াতাড়ি রক্ষীর সঙ্গেই বের হয়ে এলেন।

দ্বিতলেরই একটি ঘরে বসতে বলা হয়েছিল হীরালালকে। সে একটা কাঠের টুলের ওপর চুপ করে বসে অপেক্ষা করছিল। নানাসাহেব ঘরে ঢুকতেই সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

নানাসাহেব তাকে বসতে বলে নিজেও একটা চৌকিতে বসলেন। তার পর অভ্যস্ত মধুর হাসি হেসে বললেন, 'তার পর ?'

হীরালাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিল। বলল, 'আপনি ?'

'আমিই নানাসাহেব। নির্ভয়ে বল।"

'কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।

বিরক্তিতে নানাসাহেবের ললাটে কুঞ্চন দেখা দিল। পরক্ষণেই তাঁর কথাটা মনে পড়ে গেল। তিনি ডান হাতের মধ্যমাঙ্গুলিটি মেলে ধরলেন। লাল চারকোণা পাথরের একটি আংটি—যেমন আংটি হীরালাল এনেছিল ঠিক তারই জোড়া। একেবারে একরকম দেখতে।

হীরালাল হাত তুলে একটি নমস্কার করে বলল, 'মাপ করবেন, আমি আপনাকে সত্যিই চিনতাম না—'

'ঠিক আছে। এখন বল—'

'আপনিই বলুন, কী জানতে চান! তবে ইংরেজের ক্ষতি হয় এমন কথা কিছু বলতে পারব না!'

এবার নানাসাহেব আর বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না। একটু রূঢ়স্বরেই প্রশ্ন করেন, 'তা হলে মিছিমিছি এখানে এসেছ কেন, কী করতেই বা পাঠিয়েছে তোমাকে ?...শুধু তোমার সুরত দেখতে আমি সময় নষ্ট করছি ?'

তাঁর কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক রূঢ়তায় হীরালাল একটু ভয় পেলেও সে বিনীত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'যিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তিনিও জানেন যে সিপাইদের মতামত ছাড়া আমি কিছুই বলতে পারব না। আমি যাঁদের নিমক খাই তাঁদের অনিষ্ট হবে এমন কাজ করব না।'

'সিপাইদের মতামত জানালে অনিষ্ট হবে না ?'

'সেটা তাঁরা আমায় জানান নি বিশ্বাস করে।...তা ছাড়া সেটুকু আমি না বললেও ক্ষতি যা হবার তা হবেই।'

নানাসাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'সিপাইদের মত কী ?'

'তারা কেউ আর ইংরেজ-রাজ চায় না—অন্তত বেশির ভাগই। তারা ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত—শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষা করছে।'

'তারা আমাকে চায়—আমাকে রাজা বলে মানতে চাইবে ?'

'কেউ কেউ চায় বৈকি !...সকলে ঠিক হয়তো আপনার নাম জানে না—তারা বাহাদুর শার কথা বলছে।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ করি আর একটা নির্দেশ—হীরালালের কাছে অলঙ্ঘনীয় আদেশ, মনে পড়ে গেল। সে নিমেষে যেন আরও ঘেমে উঠল, কথাটা ঢেকে নিতে অগত্যা সে একটা মিথ্যারই আশ্রয় নিল। বলল, 'কিন্তু আমি এটা বলেছি প্রধানত মীরাটের কথা। এখানে এরা অনেকটা আপনার মুখ চেয়েই আছে।'

নানাসাহেবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, 'কেমন করে তুমি জানলে তা ? তুমি তো এখানকার ছাউনির লোক নও ?'

'আজ্ঞে, আমাকে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতে হয়। এই তো আজই সারারাত প্রায় এখানে পথে পথে ঘুরেছি—সিপাইদের হল্লা শুনেছি। কদিন আগেও কানপুর ছাউনিতে এসেছিলুম।'

'তুমি যা বলছ তা আমি বিশ্বাস করতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই পারেন। যাঁর নির্দেশে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে—তাঁর কাছে আমি মিছে কথা বলব না কিছুতেই। আর মিছে কথা বললে তো আমি আপনাকে অনেক ঝুটা খবরও দিতে পারতুম।'

নানাসাহেব কিছুক্ষণ স্থির নিষ্পলক নেত্রে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর বললেন, 'তোমাকে কে এখানে পাঠিয়েছেন—হুসেনী বেগম ?'

'হ্যাঁ—তাঁরই লোক। তাঁর হুকুমেই আমি এসেছি।'

মিথ্যা কথা এখনও হীরালালের মুখে সত্যিই আটকে যায়।

আরও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে চেয়ে রইলেন নানাসাহেব। হীরালাল আগে থেকেই ঘামছিল। এখন সেই বিচিত্র দৃষ্টির সামনে বসে আরও ঘামতে লাগল। তার পিরানটা গায়ের সঙ্গে একেবারে লেপটে গিয়েছিল।

নানাসাহেব খুব মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি তাঁকে খুব ভালবাস—না ?'

হীরালালের মুখ আরক্ত ছিলই—এখন প্রায় রক্তবর্ণ ধারণ করল। সে দু হাত মাথায় ঠেকিয়ে বলল, 'কে না তাঁকে ভালবাসে ? তিনি দেবী ! আমি প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠে আগেই তাঁকে প্রণাম জানাই মনে মনে।'

'কেন, হঠাৎ এত ভক্তি তোমার ? তুমি তো হিন্দু—হয়তো ব্রাহ্মণ। তিনি তো মুসলমানী।'

'তিনি দেবী। তিনি বার বার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। যখনই বিপদে পড়ি তখনই তিনি যেন মা দুর্গার মত আবির্ভূত হয়ে আমাকে রক্ষা করেন।'

'সে করেন—তিনিও তোমাকে ভালবাসেন বলে। তোমার এই কাঁচা বয়স, খুবসুরত চেহারা—ভাল তো বাসতেই পারেন !'

ইঙ্গিতটা পুরো না বুঝলেও কথাগুলো হীরালালের তত ভাল লাগল না। সে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় যেদিন হয়, সেদিনই তিনি আমার জীবন দান করেন। তখনও তিনি আমাকে ভাল করে

দেখেন নি।'

'কি রকম ? কি রকম ?' নানাসাহেব সাগ্রহে প্রশ্ন করেন।

'আমি গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছিলাম—উনি নৌকো থেকে দেখতে পেয়ে আমাকে টেনে তোলেন। নিজের প্রাণের মায়া না করেই উনি ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলেছিলেন।'

বলতে বলতে হীরালাল উত্তপ্ত হয়ে উঠল যেন, 'উনি মানবী নন—সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। সকলেই ওঁর আশ্রিত। সকলের ওপরই ওঁর মায়া। বিশেষ কোন কারণে আমার ওপর দয়া করেছেন তা নয়। দয়া না করে উনি থাকতে পারেন না।'

নানাসাহেব তখনও সেই বিচিত্র দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে ছিলেন, বললেন, 'হুঁ !...তা তোমাদের দেখা হয় কখন ?...তুমি তো মীরাটে থাক !'

'দেখা হয় মানে ? আজ পর্যন্ত তিন-চার দিনই মাত্র দেখা হয়েছে।'

'আজ ?' সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে নানাসাহেবের কৌতূহল, 'আজ কোথায় দেখা হল ?'

হীরালাল পিরানের প্রান্তে ললাটের ঘাম মুছে বলল, 'আজ দেখা হয়েছে আমি এমন কথা তো বলি নি আপনাকে! এখন আমি যাই। ভোর হয়েছে, ছাউনিতে পৌঁছতে হবে এখন। এসব ব্যক্তিগত কথা বলার জন্যে আমি আসিও নি।'

সে ঘাড় হেঁট করে আবারও একটা নমস্কার করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

হীরালাল চলে যাওয়ার বহুক্ষণ পর পর্যন্ত নানাসাহেব স্থির হয়ে বসে রইলেন। বিরাট এক বিপর্যয় আসন্ন। তাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে। একদিকে হয়তো সর্বনাশ—মৃত্যু ! আর একদিকে মহারাষ্ট্রের—হয়তো বা সারা ভারতের সিংহাসন! অনেকখানি ঝুঁকি—অনেকখানি লোভ। কিন্তু এই মুহূর্তে কি তিনি ঠিক সেই কথাই ভাবছিলেন ? হয়তো তা নয়। কোন এক বিচিত্র কারণে তাঁর মন চলে গিয়েছে—এসব জটিল এবং গুরুতর কথার বাইরে—নিতান্তই তুচ্ছ এক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে। সেখান থেকে মনটাকে ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না। কে জানে কেন—এই বালককে দেখে তিনি মনে মনে একটা ঈর্ষাই অনুভব করছেন।...এমন কি ওকে দেখবার আগেও, আজ সারা সন্ধ্যা ধরেই কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর মনে নিজের ভবিষ্যৎ অপেক্ষাও যে প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠেছে, সেটা হচ্ছে এই—হুসেনী কি সত্যিই তাঁকে ভালবাসে, তাঁর জন্যই এত কাণ্ড করেছে ? না কি অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে—তাঁকে সে ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করছে মাত্র ?

নানা ধুন্ধুপন্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই ঠকবার ভয়টা বড় বেশি। কারও দ্বারা প্রবঞ্চিত হবার সম্ভাবনা আছে—একথা মনে হলেই অস্বস্তিতে মন ভরে ওঠে তাঁর। আর তিনি নির্বোধ নন বলেই হুসেনীর এই অযাচিত-গভীর প্রণয় নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করতে পারেন না। মনে হয় হুসেনী তো তাঁর বহু রক্ষিতার মধ্যে একজন মাত্র। তার এত নিঃস্বার্থ ভালবাসার কারণ কি ? অথবা সত্যি-সত্যিই তাঁকে বাদশা করে সেই বাদশার প্রিয়তমা বলে গণ্য হবার সম্ভাবনাতেই সে খুশী ?

নানাসাহেবের ললাটে আবারও ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল। তিনি অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের কপাট খুলে ভেতরে প্রবেশ করল আর একটি স্ত্রীলোক।

নানা চমকে উঠলেন।

'আদালা !'

'জী ! আপনার বাঁদী।'

'তুমি এখানে ? তুমি এখানে কেন ? আমি লক্ষ্নৌ আছি কে বললে তোমাকে ?'

'বলেছে আমার দুর্ভাগ্যই। আপনি চলে এলেন—আমাকে বলে এলেন না। আসবার আগের দিন একবার আমাকে দেখা পর্যন্ত দিলেন না।...ঐ সর্বনাশী আপনার সর্বনাশ করার জন্য চারিদিকে জাল পাতছে, আর আপনি বোকার মত —পতঙ্গের মত সেই জালে জড়িয়ে পড়ছেন !'

'বোকার মত' কথাটা ভাল লাগার কথা নয়—নানাসাহেবেরও লাগল না। তিনি বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'কত বার বলব আদালা, তুমি এসবের মধ্যে নাক গলাতে এস না। তোমার স্থান আমার শয্যায়—তার বেশি নয়। হুসেনী আমার উপযুক্ত সহচরী, তার বিদ্যাবুদ্ধির কণামাত্রও তোমার নেই—তুমি চাও তাকে হিংসে করতে।...তোমাকে পছন্দ করি আদালা তুমি বেশী সুন্দরী বলে—কিন্তু দরকার আমার হুসেনীকে বেশি !'

'ঐ রাক্ষুসী আপনাকে জাদু করেছে পেশোয়া। তাই আপনি ওর কোন দোষ দেখতে পান না। কিন্তু আমাকে যতটা বোকা ভাবেন আমি ততটা নই। আমি সব জানি। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করা আপনাদের কাজ নয়, সে কথা হুসেনীও জানে। ওর নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে—তাই জেনে-শুনে আপনাকে এই সর্বনাশের মধ্যে টেনে আনছে।'

আরও বিরক্ত হয়ে নানাসাহেব বললেন, 'তুমি যা জান না আদালা, তা নিয়ে বোকার মত কথা বলতে এস না। তোমার এখানে আসা ঠিক হয় নি। কার হুকুমে তুমি বিঠুর ছেড়ে এখানে এসেছ ?'

'হুসেনী কার হুকুমে এসেছে পেশোয়া ?'

'হুসেনী !' বিরক্তি ছাপিয়ে নানাসাহেবের কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠে।

'হ্যাঁ, আপনার পেয়ারের হুসেনী। আপনি বিঠুর ছাড়বার এক দণ্ডের মধ্যেই সে বেরিয়ে পড়েছে তা জানেন কি ?'

'সে তো মাঝে মাঝেই বাইরে যায়। সে কাজেই যায়।' নানাসাহেব কণ্ঠস্বরে অকারণ জোর দিলেও তাঁর সংশয় চাপা পড়ে না।

'হ্যাঁ, কিন্তু সে ছায়ার মত আপনার পিছু-পিছুই ঘুরছে। সে আর তার সেই পেয়ারের কসাই—দানোর মত দেখতে। হুসেনী বেগমের রুচি কিন্তু বেশ !'

নানা একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলেন, 'ও ওর বাপের আমলের চাকর। একা ঘোরাঘুরি করবার সময় পাছে কোন বিপদ হয় তাই ওকে সঙ্গে নেয়। আমার অনুমতি নিয়েই ওকে সঙ্গে নেয় সে।...আর পেয়ারের লোক হবার মত সুরত ওর নয় !'

'তা তো নয় !' আদালার কণ্ঠস্বর থেকে যেন মধু ঝরে পড়ে, 'কিন্তু এই যে খুবসুরত ছোকরা একটু আগে বেরিয়ে গেল এ ঘর থেকে, তার চেহারা কেমন পেশোয়া ?...যদি বলি যে, মাত্র কয়েক দণ্ড আগেই আপনার প্রিয়তমা হুসেনীকে আর এই ছোকরাকে এক ঘোড়ায় গায়ে গা লাগিয়ে বেড়াতে দেখেছি লক্ষ্নৌএর

রাস্তায়, যদি বলি যে এই ছোকরার বুকে আপনার প্রিয়তমা এলিয়ে পড়েছিলেন—তবে ?'

'ঝুট্ । আদালা, তুমি বড় বেইমান ! তোমার ঐ জিভ কুকুর দিয়ে খাওয়াব আমি তোমার সামনে ।'

নানাসাহেবের কণ্ঠস্বর ভয়ংকর হয়ে ওঠে ।

'খোদা কসম !' আদালাও সদম্ভে জবাব দেয়, 'বেশ আমার জিভই জামিন রইল । আপনি নিজে খোঁজ করুন । যদি আমার কথা মিছে হয় তো আমি নিজে হাতে এই জিভ কেটে দেব ।'

নানাসাহেবের মুখের চেহারাটা যে পৈশাচিক রকমের ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, তা বোধ হয় তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন । তাই প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে ডাকলেন, 'গণপৎ !'

কিছুক্ষণ আগে যে রক্ষীটি তাঁর কাছে এসেছিল, সে-ই প্রণাম করে এসে দাঁড়াল ।

'একটু আগে যে ছোকরা এসেছিল এখানে, তাকে তোমার মনে আছে ?'

'আছে পেশোয়া ।'

'তুমি আর একজন কেউ—এখনই দুটো ঘোড়া নিয়ে যাও । সে ছোকরা ছাউনির দিকে গেছে । পায়ে হেঁটেই যাবে সম্ভবত । এতক্ষণ বেশী দূরে যেতে পারে নি, তাকে ধরে নিয়ে এস । ব'ল যে খুব জরুরী একটা কথা আছে । সহজে না হয়, জোর করে এনো—দরকার হয় বেঁধে এনো ।'

গণপৎ আবারও প্রণাম করে নিরুত্তরেই বার হয়ে গেল ।

নানাসাহেব নিজের মুখভাবকে আরও কিছুটা সহজ হবার সময় দিয়ে বললেন, 'আদালা, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর ।'

তার পর ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় পড়লেন । তাত্যা টোপী ও কুঁয়ার সিং বসে আছেন । কিন্তু তা হোক, এখনই গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা কইবার মত ঠিক মানসিক অবস্থা তাঁর নয় । তিনি ঊর্ধ্বে জ্যোতির্ময় আকাশের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ।

ততক্ষণে ভোর হয়ে গেছে । চারিদিকে পাখী-পাখালির ডাক শুরু হয়েছে । বৈশাখের শেষ-রাত্রি । বাতাস্ রীতিমত ঠাণ্ডা । কিন্তু সেই হু-হু ঠাণ্ডা বাতাস এবং মধুর প্রাকৃতিক পরিবেশও নানাসাহেবের আতপ্ত ললাটকে কিছুমাত্র শীতল করতে পারল না ।

॥ ২১ ॥

যে রক্ষীটি পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সে-ই আবার হীরালালকে প্রাসাদদ্বার পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে গেল । বোধ করি অজ্ঞাত কোন নির্দেশেই সে এতখানি ভদ্রতা করে থাকবে । কিন্তু যেখানে হুসেনী বেগম আছেন, সেখানে ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হবে না—এটা কেমন করে যেন হীরালালের বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল । কাজেই সে রাজবাড়ির প্রহরী বা রক্ষীর এতটা ভদ্রতাতেও বিস্মিত হল না । তবে প্রাসাদের বাইরে এসে সে একটু বিব্রত বোধ করল । রক্ষীটি ততক্ষণে তার কর্তব্য শেষ হতেই, কাটা ফটক বন্ধ করে সরে পড়েছে । বাইরের গলিপথটা তখনও যেন অন্ধকার এবং জনমানবশূন্য । কাকে পথ জিজ্ঞাসা

করবে বুঝতে না পেরে সে বোকার মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। হয়তো বা কিছু নিরাশও হল।

কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র। দেখা গেল হুসেনীর ওপর থেকে তার বিশ্বাস টলবার মত কোন কারণ ঘটে নি। কোথা থেকে, পাশাপাশি অট্টালিকাগুলির জমাট বাঁধা ছায়ান্ধকার ভেদ করে নিশীথচারী দৈত্যের মত বের হয়ে এল সর্দার খাঁ।

তবে আজ আর তাকে দেখে হীরালাল ভয় পেল না। বরং সাগ্রহে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, 'বেগমসাহেবা আপনাকে পাঠিয়েছেন বুঝি? তিনি কোথায়? বাড়ি গেছেন?'

এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজনই বোধ করল না সর্দার খাঁ, সে সংক্ষেপে শুধু বলল, 'আমার সঙ্গে চলুন।' এবং হীরালাল আসছে কিনা না দেখেই লম্বা লম্বা পা ফেলে সে নিজে চলতে শুরু করে দিল।

তার সঙ্গে তাল রেখে চলা কষ্টকর। তবু হীরালাল অনেক চেষ্টায় কতকটা তার পাশাপাশিই চলতে লাগল। কিন্তু দেখা গেল সর্দার খাঁ নির্বিকার। সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে—হীরালালের দিকে চেয়েও দেখছে না।

খানিক পরে হীরালালই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল; ডাকল, 'খাঁ সাহেব!'

উত্তর নেই।

'খাঁ সাহেব, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথা আছে!'

এবার সর্দার খাঁ তাকাল। উদ্ধত বিরক্ত দৃষ্টি। আরও, এই রূপবান তরুণ সম্বন্ধে ঈর্ষিত হবার কোন কারণ ঘটেছে কিনা কে জানে!

সে বলল, 'কথার কোন দরকার নেই। পথ চল।'

হীরালাল হঠাৎ মরীয়া হয়ে উঠল, সে একটু চেষ্টা করে ঘুরে সর্দারের সামনের দিকে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল, 'আমার কথাটা তোমাকে শুনতেই হবে খাঁ সাহেব। বহুৎ জরুরী কথা। বেগমসাহেবার কথা।'

সর্দার খাঁর লোহিতাভ দৃষ্টি রক্তবর্ণ ধারণ করল। সে রূঢ়ভাবে তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ব্যস! কোন কথা নয়, পথ চল।'

হীরালাল কিন্তু ভয় পেল না। সে প্রাণপণ শক্তিতে তার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'কিন্তু আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে খাঁ সাহেব। আমি জানি তুমিও বেগমসাহেবাকে ভক্তি কর—ভালবাস। বেগমসাহেবার বড় বিপদ! তুমি একথা না শুনলে আর কাকে বলব?'

নিমেষে দানব যেন বালকে পরিণত হল। সেই বীভৎস ভয়াবহ মুখে একই সঙ্গে উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং আকুলতা ফুটে উঠে তাকে আশ্চর্যরকম কোমল করে তুলল। সে শুধু বলল, 'বিপদ! বেগমসাহেবার বিপদ?'

হ্যাঁ বিপদ, খুব বিপদ।...আমি জানি খাঁ সাহেব; তোমার চেয়ে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নেই। তাই তোমার সঙ্গেই পরামর্শ করতে চাই।'

'কী বিপদ বাবুজী?' যেন নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাসে বলে সর্দার খাঁ।

'তুমি জান নিশ্চয় যে, একদল লোক সিপাইদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। তারা চায় ওদের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াই বাধুক। আর হয়তো তা বাধবেও শীগগির। কিন্তু ইংরেজদের হারাতে এরা পারবে না।...আমি জানি পারবে না। এদের ভেতর বড় দলাদলি, সবাই চায় নিজেদের সুবিধে করে নিতে—তাতে কখনও কোন বড় কাজ হয় না। তা ছাড়া আমি গণককেও জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি

বলেছেন, ইংরেজ আরও প্রায় এক শ বছর এদেশে রাজত্ব করবে।...সে যাক গে, কিন্তু বেগমসাহেবা এইতে জড়িয়ে পড়ছেন। সবাই তাঁকে বুঝবে না। আর এরা বড় স্বার্থপর খাঁ সাহেব—এদের সঙ্গে বেগমসাহেবার মত দেবী কখনও পেরে উঠবেন না। ওঁকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তারা অনায়াসে নিজেদের বাঁচিয়ে নেবে।...আমি সেদিন খুব বড় এক গণৎকারের কাছে গিয়েছিলুম। তিনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু হাত দেখে সব বলে দিলেন। তিনি বেগমসাহেবার কথাও বললেন—'

'কী বললেন?' ভোরাই ঠাণ্ডা হাওয়াতেও সর্দারের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। মুখে তার শিশুর মতই উৎকণ্ঠা প্রকট।

হীরালাল গলা নামিয়ে বলল, 'বললেন, বেগমসাহেবা এই লড়াইতে খুব বিপদে পড়বেন।...হয়তো ওঁর প্রাণসংশয় ঘটবে।...হয়তো ওঁর অপঘাতে মৃত্যু ঘটবে—'

আতঙ্কে উদ্বেগে হীরালালের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

সর্দার খাঁ অনেকক্ষণ পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার অত বড় দেহখানা থেকে সমস্ত শক্তি কে যেন নিঃশেষে হরণ করে নিয়েছে।

বহুক্ষণ পরে সে কেমন একরকম অসহায়, ভগ্ন, স্খলিত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমি কী করতে পারি বাবুজী? উনি কি আমার কথা শুনবেন? ইংরেজকে উনি বড় ঘেন্না করেন, ওদের সর্বনাশের জন্যেই জীবন পণ করেছেন। ভয় দেখিয়ে এ লড়াই থেকে ওঁকে ফেরানো যাবে না।...'

হীরালাল আবারও সর্দারের হাতটা চেপে ধরল, 'সে আমি জানি খাঁ সাহেব। এটুকু ওঁকে আমি চিনেছি। সেই জন্যেই তোমাকে বলা। আমি তো কাছে থাকতে পারব না। তুমি ওঁর কাছে থাকবার সুযোগ পাও। তুমি ওঁকে একটু দেখো। যদি সত্যিই লড়াই বাধে, ওঁকে তুমি নজর-ছাড়া ক'র না।... আমি জানি তুমি কাছে থাকতে আর তোমার জান থাকতে ওঁর কোন ভয় নেই।'

সর্দার খাঁ হাসল। সে হাসিতে তার ঐ ভয়াবহ মুখও কেমন একপ্রকার স্বর্গীয় দ্যুতিতে যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে বলল, 'এটুকু আমি তোমাকে অনায়াসে জবান দিতে পারব বাবুজী। আমার সামনে আমার জান থাকতে ওঁকে কেউ বিপদে ফেলতে পারবে না। আর আমি এবার থেকে আরও বেশী হুঁশিয়ার থাকব।'

'ব্যস, আমি এখন অনেক নিশ্চিন্ত।' সত্যিই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে হীরালাল।

সর্দার খাঁ সস্নেহে হীরালালের কাঁধে একটা হাত রাখল। কোমল কণ্ঠে বলল, 'তুমি বড় আচ্ছা আদমী বাবুজী, বড় সাচ্চা আদমী।'

সর্দারের কথা তখনও শেষ হয় নি, দূরে নির্জনপথে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ উঠল। সর্দার ভ্রূকুটি করে চেয়ে দেখল—হীরালালও একটু বিস্মিত হয়ে তাকাল। ঘোড়াই বটে। দু জন ঘোড়সওয়ার বেশ জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকে আসছে।

ঘোড়সওয়ার এসব পথে এমন কোন আশ্চর্য দৃশ্য নয়। সুতরাং সর্দার ও হীরালাল সেদিকে মন না দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু খানিক পরে ঘোড়সওয়ার দুজন আর একটু কাছে এসে হাঁকল—'এই, রোক যাও।...একদম

ঠাহর যাও !'

হীরালাল একটু ভয় পেল। সে রক্ষী দুজনকেই চিনেছে এতক্ষণে। একজন গণপৎ আর একজন তেওয়ারী। এই তেওয়ারীই মাত্র দু দণ্ড আগে তাকে প্রাসাদের দ্বার পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে গেছে। সে সর্দার খাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'নানাসাহেবের পাইক !'

সর্দার খাঁর কোমরে তলোয়ার গোঁজা ছিল, কিন্তু সে তাতে হাত দিল না। ঈষৎ ভ্রূকুটি করে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

একটু পরেই ঘোড়সওয়াররা কাছে এসে পড়ল। তেওয়ারী ঘোড়া থেকে নেমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ফিরে চল জল্‌দি—পেশোয়ার হুকুম !'

হীরালাল আগেই একটু ভয় পেয়েছিল। এখন তেওয়ারীর রুক্ষ ভঙ্গিতে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। ঢোঁক গিলে বলল, 'কিন্তু আমার যে এখন ছাউনিতে ফিরতে হবে ভাই সিপাইজী। ছটায় হাজরে নেওয়া হয়, তখন ছাউনিতে না থাকলে চলবে না।'

ততক্ষণে গণপৎ নেমে পড়েছে। সে এখন হঠাৎ এসে হীরালালের একটা হাত ধরল। বেশ একটু রূঢ় কণ্ঠেই বলল, 'সে সব আমি বুঝি না। পেশোয়ার হুকুম—এখনই না গেলে জোর করে নিয়ে যেতে হবে।'

এবার সর্দার খাঁ কথা বলল। বেশ সহজ শান্ত কণ্ঠেই বলল, 'কিন্তু এ বাবু তোমার পেশোয়ার নোকর নয় গণপৎ—কোম্পানির চাকর। এর ওপর হুকুম চালানোর এক্তিয়ার পেশোয়ার নেই।'

'কিন্তু আমাদের ওপর তো আছে! আমাদের ওপর হুকুম—যেমন করে হোক, ওকে ধরে নিয়ে যেতে হবে। এই, চল—'

সে বেশ জোরেই হীরালালের ডান কনুইএর কাছটা ধরে একটা হেঁচকা টান মারল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই হাতীর থাবার মত সর্দারের প্রকাণ্ড হাতখানা এসে পড়ল তার ঘাড়ে। নিমেষের মধ্যে হীরালালের হাতের ওপর থেকে গণপতের মুষ্টিটা শিথিল হয়ে গেল। তার পর বেড়ালে যেমন করে ইঁদুরের টুঁটি ধরে দূরে আছাড় মারে তেমনি করেই গণপৎকে ধরে সে অবলীলাক্রমে বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তেওয়ারী এই দৃশ্যে বোধ করি মুহূর্তকালের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল—এখন এরা আবার রওনা হবার উপক্রম করছে দেখে এগিয়ে এল। কিন্তু সে নির্বোধ নয়—সে তার তলোয়ারখানা খুলেই অগ্রসর হল।

'এই বাংগালী বদ্‌বখ্‌ৎ, ঠাহ্‌রো !'

এবার সর্দার প্রায় ভেল্কি দেখাল। সে চকিতের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে এক আশ্চর্য কৌশলে তেওয়ারীর তলোয়ারের ডগাটা দু আঙুলে চেপে ধরে এমন একটা ঝাঁকানি দিল যে, শিশুর হাতের খেলনার মতই তেওয়ারীর হাত থেকে তা খসে এল। তার পর সেটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে চোখের পলকে তার বাঁটটা লুফে নিয়ে একেবারে তেওয়ারীর গলায় ডগাটা ঠেকিয়ে বলল, 'যাও, ভাগো, নেহি তো—'

'নেহি তো' কী হবে—তা আর তেওয়ারীকে বিশদ বোঝাতে হল না। দূরে তখনও গণপৎ কাঠ হয়ে পড়ে আছে—হয়তো বা মরেই গেছে। এ দৈত্যটার পক্ষে সবই সম্ভব। মিছিমিছি নানাসাহেবের একটা খেয়ালের জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করার মত নির্বোধ সে নয়। সে শুষ্ক মুখে দু পা

পিছিয়ে গিয়ে নিজের ঘোড়াটা ধরল, তার পর যত দ্রুত সম্ভব তাতে সওয়ার হয়ে প্রাসাদের দিকে ফিরল।

ভোরাই ঠাণ্ডা বাতাসেও হীরালাল ঘেমে উঠেছিল। সে পিরানের প্রান্তে মুখ মুছে কতকটা ভয়ে ভয়ে বলল, 'কাজটা হয়তো ভাল হল না খাঁ সাহেব, পেশোয়ার হুকুম—'

ততক্ষণে সর্দার খাঁ আবার চলতে শুরু করেছে। বেশ সহজ নিরুদ্বিগ্ন গতি। সে চলতে চলতেই শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'তা জানি না বাবুজী, আমার কাছে যার হুকুম হাজার পেশোয়ার হুকুমের চেয়েও বড়—তিনি হুকুম দিয়েছেন যেমন করেই হোক তোমাকে ভোরবেলার মধ্যে ছাউনিতে পৌঁছে দিতে হবে। আমার যতক্ষণ জান থাকবে সে হুকুম আমি তামিল করব।'

হাজার পেশোয়ার চেয়েও বড় এ ব্যক্তিটি কে—অনাবশ্যক বোধে হীরালাল সে প্রশ্ন করল না।

তেওয়ারী যখন ভগ্নদূতের মত এসে সংবাদটা দিল তখনও নানাসাহেব অস্থিরভাবে ঘরে পায়চারি করছেন, আর আদালা মুখে ঈষৎ বিদ্রূপের ভঙ্গি করে স্থিরভাবে বসে আছে।

'দেখলেন তো পেশোয়া, আপনার পেয়ারের হুসেনী বেগমের পেয়ারের লোক সর্দার খাঁর কত দূর আস্পর্ধা!...আর বেগমসাহেবা যে লক্ষ্ণৌতে আছেন সে প্রমাণও তো পেলেন! ধোঁয়া দেখলেই আগুনের খবর মেলে!'

তার পর ঈষৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে একটা সেলাম করে বলল, 'আমার জিভ কিন্তু এখনও আপনার খিদমতে হাজির আছে পেশোয়াজী!'

সে কথায় কর্ণপাত না করে নানাসাহেব ভীষণ ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, 'তোরা দু-দু জন লোক হাতিয়ার হাতে একটা বাচ্চাকে ধরে আনতে পারলি না! বেইমান কুকুরের দল! কুকুরই বা বলছি কেন—যার খায় কুকুর প্রাণপণে তার হুকুম তামিল করে। তোদের পয়সা দিয়ে পোষা আমার একেবারেই পয়সা নষ্ট করা।'

তেওয়ারীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে ততক্ষণে। নানাসাহেবের এই রুদ্র চেহারার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। সে কোনমতে ঢোক গিলে বলল, 'গণপৎ তো বোধ হয় মরেই গেছে। আমি একা—ওরা দু জন—সর্দার খাঁর হাতেও তলোয়ার ছিল—'

'চুপ!' প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন নানাসাহেব। তার পর হাঁকলেন, 'কৌন হ্যায় দরওয়াজামে?'

সঙ্গে সঙ্গে একজন রক্ষী এসে দাঁড়াল।

'মংগরকর, এই বেইমানকে হাতে কড়া পায়ে বেড়ি দিয়ে এখনই বিঠুরে পাঠিয়ে দাও। সেখানে ঠাণ্ডি গারদে থাকবে এক মাস।...আর শোন, দশ জন সওয়ার পাঠাও ছাউনির পথে। সর্দার খাঁ ঐদিকে গেছে, পথেই খুঁজে পাবে। তাকে ধরে শেকলে বেঁধে নিয়ে আসবে। যদি সে পালিয়ে যায়, কি তাকে ধরে আনতে না পারো তো এই দশজন লোককে আমি কোতল করাব—বলে দিও। যত সব অপদার্থ ভেড়ীর বাচ্চাকে আমি পুষছি রুটি খাইয়ে—এই আমার কপাল!'

নানাসাহেব যতক্ষণ কথা বলছিলেন, ততক্ষণ আর এক জন যে কে

নিঃশব্দে ঘরে এসে মংগরুকরের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল, তা কেউ টের পায় নি—এমন কি আদালাও না। যে এসেছিল সে এবার মুখ খুলল—অত্যন্ত মধুর এবং ঈষৎ বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'অত কাণ্ড করতে হবে না পেশোয়া, সর্দার খাঁ না হোক, তার মনিব এখানে হাজির আছে। তাকেই তো আপনার বেশী দরকার!'

তার পর আর একটু সামনে এসে রক্ষীদের দিকে ফিরে বলল, 'মংগরুকর, তুমি দরওয়াজায় ফিরে যাও। তেওয়ারী, তোমাকে পেশোয়া এবারকার মত মাফ করছেন—তুমিও কাজে যাও। আর কখনও এমন গাফিলতি ক'র না।'

তারা বেরিয়ে গেলে হতভম্ব স্তম্ভিত ধুন্ধুপন্থের সামনে আভূমিনত একটা সেলাম করে হুসেনী বলল, 'তার পর মহামান্য পেশোয়া, বাঁদীর ওপর কী হুকুম হয়—কুকুর দিয়ে খাওয়ানো, না ঠাণ্ডা-গারদ?'

এতক্ষণের প্রচণ্ড দিক্‌দাহকারী রোষ এখনও রুদ্ধ আক্রোশে মনের মধ্যে মাথা খুঁড়ছে সত্য কথা, তবু অপরাধিনীর এই আকস্মিক আবির্ভাবে এবং সহজ ও সপ্রতিভ প্রগল্‌ভতায় নানাসাহেব এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, তার আচরণে বাধা দেবার চেষ্টা তো দূরে থাক, যথেষ্ট উষ্মা-প্রকাশও করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ তাঁর মুখে কথাই সরল না—পাথরের মত স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর যখন কথা ফুটল, তখনও কণ্ঠস্বরটা ঠিক বাঁদীর প্রতি শাসক মনিবের মত শোনাল না। কঠিন হবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল, 'তুমি—তুমি এখানে কেন?'

'কেন? এখানে আসতে বাধা কী?'

প্রশ্নের উত্তরে এই সহজ প্রশ্নটার জন্য নানাসাহেব এতটুকুও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আরও থতমত খেয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে—কই—আমাকে বল নি তো?'

'সব সময়ে কি আপনাকে বলে কোথাও যাই? আমাকে তো আপনি সে স্বাধীনতা দিয়েই রেখেছেন—'

'কিন্তু তাই বলে···তুমি নাকি সেইদিনই বেরিয়েছ, আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ পেশোয়া।' সহজ শান্ত স্বর হুসেনীর কণ্ঠে।

'তা হলে আমাকে জানাও নি কেন? হুকুম একটা নিতে পারতে

'আমার যা কাজ পেশোয়া—সেটা ঠিক আদালা বেগমের পুতুলের বিয়ে দেওয়ার মত জরুরী কাজ নয় যে, আগে থাকতে ভেবে হুকুম নিয়ে করতে হবে। আমি এই এক মাস আপনার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছায়ার মতই ঘুরছি।··· আপনি জানেন না পেশোয়া, কত শত্রু আপনার চারিদিকে। আপনার নিজস্ব অনুচরদের মধ্যে জীবন সব সময়ে নিরাপদ নয়। আপনার ওপর নজর রাখবার জন্যই আমার এত কষ্ট করা। আর জানেন তো পেশোয়া, আমার সব গতিবিধি লোককে সব সময়ে জানানো সম্ভব নয়।···তা ছাড়া ঘরে পাহারা দিয়ে রাখবার মত এ দেহটার এত মূল্য এখনও আছে তা জানতুম না পেশোয়া! আমি ভেবেছিলুম যে, রূপযৌবন আপনার পিয়ারী আদালারই একচেটে!'

আদালা বোধ করি আমিনার সাহসে ও স্পর্ধায় একেবারেই বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিল। তাই সে এত বড় খোঁটারও তখনই কোন জবাব দিতে পারল না—নির্বাক বিস্ময়ে, কতকটা ভয়ে ভয়েই চেয়ে রইল।

নানাসাহেব ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কোমল হয়ে এসেছেন, তবু আসল জ্বালাটা একেবারে ভোলেন নি, বললেন, 'ওই বাঙালী ছোঁড়াটার সঙ্গে এক ঘোড়ায় চেপে সারারাত বিহার করা—সেটাও কি তোমার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য ছিল হুসেনী ?'

'ছিঃ পেশোয়া, ছিঃ !...সে আমাকে দেবীর মত দেখে—সন্তানের বয়সী সে !'

তার পর গম্ভীর এবং ঈষৎ কঠোর কণ্ঠেই সে বলল, 'যে এ খবরটা আপনাকে দিয়েছে, সে আর একটা খবর দিতে পারে নি যে, একদল সিপাহীর হাতে যখন তার প্রাণটা যেতে বসেছিল, তখনই না তাকে আমি উদ্ধার করে এনে সোজা এই প্রাসাদের দোরে পেঁাছে দিয়েছি !'

'তবে সে আমাকে মিছে কথা বলল কেন ?'

'আমিই তাকে নিষেধ করেছিলুম আমার কথা জানাতে। কিন্তু পেশোয়া এই সব ব্যক্তিগত একান্ত বাজে আলোচনার সময় আর নেই। আমি তো স্বৈরিণী—আমার মত দাসী আপনার কত আছে, কত সহস্র জুটবে আরও। আমার চিন্তাতে আপনি কাজ ভুলে বসে আছেন ? ধিক !...আমারই যে লজ্জা করছে আমার জন্যে !...যান, ওঁরা এখনও আপনার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। আপনি দেখা করুন গে। আজই বিঠুর রওনা হতে হবে। আপনার হুকুম না নিয়েই আমি বলে দিয়েছি সবাইকে সেইমত ব্যবস্থা করতে। স্নান-পুজা সেরেই রওনা হবেন আপনি।'

'কেন, কেন হুসেনী—এত জরুরী ?'

'আগুন জ্বলেছে পেশোয়া—আগুন জ্বলেছে। এবার কাজের সময়। আব বৃথা সময় নষ্ট করলে চলবে না। আপনি ফিরে যান বিঠুরে।'

কথাটা আদেশের মতই শোনাল। কিন্তু নানাসাহেব এ ধৃষ্টতা গায়ে মাখলেন না। শুধু বললেন, 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে তো হুসেনী ?'

'না, আমি যেমন এসেছি তেমনি ফিরব। দু দিন পরে। আমার কাজ আছে। মৌলবীকে জেলখানা থেকে বের করতে হবে আগে।'

তার পর স্তম্ভিত অপমানিত আদালার দিকে ফিরে একটা সেলামের ভঙ্গী করে হুসেনী বলল, 'জিতটা তা হলে আপাতত মুখেই রয়ে গেল আমাদের—কি বলুন বেগমসাহেবা ? দুঃখ হচ্ছে—না ?'

॥ ২২ ॥

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশের পশ্চিম বিভাগে—বারাকপুরের মাটিতেই কি করে যেন দাবানলের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু তখনও তাকে দাবানল বলে চেনা যায় নি। মনে হয়েছিল একটা গাছেই বুঝি আগুন লেগেছে। সেনাপতি প্যাজেট সে বৃক্ষ নির্মূল করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তিনি এবং আর সকলেই মনে করেছিলেন—ঐখানেই বুঝি ঐ বহ্নিলীলার পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, মহীরুহের শাখাপ্রশাখাগুলিই কাটা হয়েছিল শুধু—মূল কাণ্ডটি যথাস্থানেই রয়ে গেছে এবং বহ্নির অস্তিত্বও লোপ পায় নি। ভস্মাচ্ছাদিত হলেও সেই কাণ্ডেরই কোন কোটরে তা এখনও ধূমায়িত হচ্ছে। একেবারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এক চাটগেঁয়ে

লস্কর এসে সেই ভস্মস্তূপে ফুঁ দিতেই সেই ধূমায়মান আগুনের খবর পাওয়া গেল। ২৯শে মার্চ মঙ্গল পাণ্ডে সে আগুন নিজের মস্তিষ্কের ঘৃতে বেশ জমকে তুলল।

দেখতে দেখতে তা ছড়িয়ে পড়ল বহুদূরে। দাবানল জ্বললে যেমন সে আগুন শনৈঃ শনৈঃ বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে—বন থেকে বনান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনিই এই বহ্নিবন্যা ভারতের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। মঙ্গল পাণ্ডের আত্মাহুতিরই যেন অপেক্ষায় ছিল সকলে। কারা এর ইন্ধন যুগিয়েছে, কারা সংগ্রহ করেছে এর উপকরণ—আজও পরিষ্কার কেউ জানে না। কোথা থেকে কারা চাপাটি বা রুটি বিলি করতে শুরু করল, কারা শুরু করল পদ্মচিহ্ন প্রচার করতে, কেউই সেদিন খবর নেয় নি। একই উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল না সকলের—একই স্বার্থসিদ্ধির জন্য এত বড় আগুন জ্বলে নি। আসলে ইংরেজের প্রতিই সেদিন বুঝি বিধি ছিলেন প্রতিকূল, তাই বিভিন্ন স্বার্থে সংঘাত বাধে নি—স্বার্থের উপনদীগুলি মিলে মহানদীতে পরিণত হয়েছিল মাত্র। বহু শিবা ও গৃধ্র শুধু গলিত শবের লোভেও এসে জুটেছিল বৈকি।

ইংরেজ সেদিন ছিল এক আশ্চর্য সুপ্তিমগ্ন। নিজের ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল। ভুলে গিয়েছিল—সিপাহীদের হাতে তারাই অস্ত্র তুলে দিয়েছে; যুদ্ধবিদ্যায় নিজেরাই শিক্ষিত করে তুলেছে! এ কথাটাও মনে পড়ে নি যে বাড়তি খরচের অজুহাতে ইউরোপীয় সেনাদের এদেশে আনানো বহুকাল কমিয়ে দেওয়া হয়েছে! এখানে এখন তারা আছে কতকটা এই দেশী সিপাইদেরই ভরসায়।* সিপাহীদের অসন্তোষের কারণগুলি যেমন তাদের অনুসন্ধান করা উচিত ছিল—তেমন উচিত ছিল তাদের স্পর্ধা বাড়তে না দেওয়া। কিন্তু সে সব কিছুই করা হয় নি। এমন কি ঘুমন্ত মানুষ যেমন মশারিতে আগুন ধরবার আগে ঘর পোড়বার খবর পায় না—সেদিনকার ইংরেজ অফিসাররাও নিজের নিজের ছাউনিতে বিদ্রোহ শুরু হবার আগে একান্ত কাছে যে সব সিপাহীরা ছিল, তাদের মনোভাবের কোন খবরই পান নি—এমনও হয়েছে। অথচ এত বড় একটা বিপ্লব—তার আগে নিশ্চয়ই দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল! এত বড় আগুনের ইন্ধন অবশ্যই বহুদিন থেকে জমা হয়েছে!

প্রথম প্রকাশ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল লক্ষ্ণৌতে। স্ফুলিঙ্গই বা বলি কেন, রীতিমত আগুনই সেদিন জ্বলে উঠল।

সেটা ১৮৫৭ সালের ১লা মে।

'সাত নম্বর আউধ ইরেগুলার ইনফ্যান্ট্রি'র রংরুটরা বেঁকে দাঁড়াল। তারা ঐ চর্বি দেওয়া কার্তুজ নেবে না। ওতে তারা হাতও দেবে না। তারা শুনেছে, বেশ ভাল লোকের মুখ থেকেই শুনেছে যে, গরু ও শুয়োরের চর্বি আছে ঐ কার্তুজে। অফিসাররা প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এটা সে নতুন কার্তুজ নয়—ওরা আগে যা ব্যবহার করছিল এ সেই পুরাতন ও পরিচিত

* ডালহৌসীর অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়—তখন কোম্পানির তাঁবে দু লক্ষ তেত্রিশ হাজার দেশী সিপাহী এবং প'য়তাল্লিশ হাজার তিন শ বাইশ জন ইংরেজ (প্রাইভেট ও অফিসার মিলিয়ে) কাজ করত।

কার্তুজ। কিন্তু তার ফল হ'ল এই যে, শুধু রংরুটরা নয়—পরের দিন গোটা রেজিমেণ্টের সিপাহীরাও বেঁকে দাঁড়াল।

সার হেনরি লরেন্স—অযোধ্যা প্রদেশের নূতন শাসনকর্তা প্রমাদ গনলেন, কিন্তু বিচলিত হলেন না। ব্রিগেডিয়ারকে আদেশ করলেন প্যারেডের ব্যবস্থা করতে। প্যারেডের মাঠে ব্রিগেডিয়ার একটি মিষ্ট বক্তৃতাও করলেন—ফল সেই একই। দু-এক জন পাণ্ডা গোছের সিপাহী বাকী সকলের মনোভাব জানিয়ে দিল—'তামাম হিন্দুস্তানে কোন সিপাইই আজ আর তোমাদের ও কার্তুজ নিতে রাজী নয় সাহেব—আমরা কী করব?'

এই হ'ল সূত্রপাত! লক্ষ্ণৌএর পর মীরাট।

মীরাটের বহ্নি প্রধূমিত হচ্ছিল বহুকাল থেকেই। রীতিমত রক্তাভ হয়ে উঠল এপ্রিলের শেষের দিকে। একেবারে শিখা দেখা দিল ১০ই মে রবিবার। ইংরেজ অফিসার ও তাঁদের পরিবারের সকলে যখন সান্ধ্য উপাসনার জন্য গির্জায় জড়ো হয়েছেন, তখনই দূর সিপাহী-ব্যারাকে প্রথম গুলির শব্দ পাওয়া গেল। গির্জা থেকেই দেখা গেল—কোন কোন বাংলোয় আগুন ধরেছে, তার শিখায় শেষ-বৈশাখের সান্ধ্য আকাশ রক্তিমতর হয়ে উঠেছে।

মীরাটের ব্যাপারটা প্রথম দিনই গুরুতর আকার ধারণ করল। সিপাহীরা আগেই জেলখানা ভেঙে কয়েদীদের দলে টেনে নিল। দেশী পুলিস নিঃশব্দে চোখ মেলে রইল মাত্র—বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করল না! শুরু হ'ল উন্মত্তের মত লুটপাট ও হত্যা। অন্য সমস্ত ছাউনির চেয়ে মীরাটেই বেশী সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য ও অফিসার ছিল, কিন্তু 'আপৎকালে বিপরীত বুদ্ধি'—একটির পর একটি ভুলের জন্য তারা না পারল স্থানীয় অসহায় সাহেবদের রক্ষা করতে—না পারল বিদ্রোহীদের দমন করতে—আর না পারল দিল্লীকে বাঁচাতে। মাটির পুতুলের মতই হাতিয়ার হাতে বসে রইল শুধু।

মীরাটের পরই দিল্লী। ১১ই মে শুরু হয়ে গেল দিল্লীতে।

সকালবেলা অফিসাররা 'ব্রেকফাস্টে' বসেছেন—খবর এল মীরাটের দিক থেকে এক দল সওয়ার এদিকে আসছে। ম্যাজিস্ট্রেট তখনই ব্রিগেডিয়ারকে খবর দিলেন। খবর গেল লেফটেনাণ্ট উইলোবির কাছে। তাঁর জিম্মায় ম্যাগাজিন—শত শত মণ বারুদ সেখানে ঠাসা। গোলাগুলিরও অভাব নেই। ম্যাগাজিন শত্রুর হাতে পড়া মানেই মৃত্যুবাণ হাতে পড়া।...ইতিমধ্যে সওয়াররা দিল্লীর নগর-প্রাচীর পার হয়েছে। জেলখানা ভেঙে কয়েদীদের বার করা প্রথম কাজ—তার পর সোজা এসে হাজির হ'ল তারা লালকিল্লার ফটকে। তখনও ইংরেজদের হাতে ফটকের চাবি। কিন্তু তাতে খুব বেশী সুবিধা হবে বলে মনে হ'ল না। গোলমাল বেড়েই যেতে লাগল। 'গোরা সিপাহী'দের হুকুম আর কেউ গ্রাহ্য করে না। আগন্তুকরা প্রকাশ্যেই চেঁচাতে লাগল—'মীরাটে একটিও সাহেব রেখে আসি নি—তোমাদেরও শেষ করতে দেরি হবে না।'

তবু হয়তো কিল্লায় ঢোকা তখনই সম্ভব হ'ত না, যদি না শেষ পর্যন্ত ভেতরে কয়েকজন মুসলমান অধিবাসী গিয়ে চুপি চুপি যমুনার দিকের একটা দরজা খুলে দিত। সিপাহীর দল ও উন্মত্ত জনতা হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল। তার পর কোথায় কী হ'ল, কোন্ কোন্ ইংরেজের বাসা লুট হ'ল, কে কার

হাতে মরল তা বলা কঠিন। সে প্রচণ্ড অগ্রগতির প্রতিরোধ করা অল্প কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের কাজ নয়। তাঁরা পিছু হটতে লাগলেন। একজন পরিখায় পড়ে জখম হলেন। আর একজনও সেই পথে বাইরে পৌঁছে কোনমতে জনতাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর তাদের কানে পৌঁছবার আগেই তাদের হাত তাঁর কণ্ঠে পৌঁছল এবং তা চিরতরেই নীরব হ'ল। তার পর অল্প কয়েকজন ইংরেজ নরনারীকে খতম করতে আর কতক্ষণ?

এর ভেতর মীরাট থেকে আরও কয়েকজন এসে পৌঁছে গেছে। তারা শহরের অপর জায়গায় সাহেবপাড়ায় তাণ্ডব জুড়ে দিল। এমন কি দরিয়াগঞ্জের দেশী খ্রীষ্টান ও ফিরিঙ্গীপাড়াও বাদ গেল না। অপরাহ্নের দিকে তোপখানা বা ম্যাগাজিন রক্ষা অসম্ভব দেখে উইলোবি বারুদের স্তূপে আগুন লাগাতে হুকুম দিলেন। স্কালী নামে এক অফিসার, যিনি আগুন লাগিয়েছিলেন, তিনি সেখানেই পুড়ে মরলেন—বাকি রক্ষকদের কয়েকজন কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। উইলোবি সে অগ্নিক্ষেত্র থেকে উদ্ধার পেলেও পথে আততায়ীর হাতে নিহত হলেন।

ব্রিগেডিয়ার সাহেব কিল্লার একাংশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হ'ল। অগত্যা তিনি 'পিছু হটবার' হুকুম দিলেন। তখনও অবধি ছাউনির সিপাহীরা কতক কতক শান্ত ছিল, তারা এবার স্পষ্টই জানিয়ে দিল যে, সাহেবদের জানের জন্য আর তারা দায়ী থাকতে রাজী নয়। তাঁদের এখন পথ দেখাই ভাল।

অগত্যা। অবশিষ্ট অফিসার আর তাঁদের স্ত্রী-পুত্ররা পথই দেখলেন। পলায়নের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর চেয়েও কষ্টকর হয়ে উঠল। অনেকেই পথে প্রাণ হারাল। কেউ বা আততায়ীদের হাতে প্রাণ দিল—বাকি যাঁরা শেষ অবধি নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে পারল, তাদের বহু দিন সময় লাগল সেরে উঠতে। 'লু' লেগে তাদের গায়ে ফোস্কা পড়েছিল। সে ফোস্কা ঘায়ে পরিণত হয়েছে—বস্ত্র ছিন্নভিন্ন, কোনমতে তাতে লজ্জা নিবারণ হওয়াই কঠিন। গায়ের রং জ্যৈষ্ঠের রোদে পুড়ে প্রায় মসীবর্ণ ধারণ করেছে। তাও সিপাহীদের হাতে না পড়ে যারা কোনমতে সাধারণ হিন্দু গ্রামবাসীর আশ্রয়ে এসে পড়তে পেরেছে—তারাই বেঁচেছে। যারা মরেছে তাদের মৃত্যুর কারণ ও ধরন এক নয়—সুতরাং সে আলোচনা থেকে বিরত থাকাই ভাল।

সুতরাং বহ্নিস্রোত প্রবাহিত হবার বিশেষ আর কোন বাধা রইল না। সমগ্র আগ্রা প্রদেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে তা ছড়িয়ে পড়ল। বুলন্দসর, এটোয়া, মৈনপুরী, মুজঃফরনগর, সাহারানপুর, বেরিলী, আগ্রা, ফরক্কাবাদ—আরও কতকগুলো নাম শুনে কী হবে, মোট কথা, মে মাসের শেষে কানপুরের উত্তর-পশ্চিমের কোন শহরেই আগুন লাগতে বাকী রইল না।

॥ ২৩ ॥

আগুন না পৌঁছাক—এই বিপুল বহ্নিবার্তা কি কানপুরের নিস্তরঙ্গ বায়ু-সমুদ্রে কোন কম্পন জাগায় নি?

হয়তো জাগিয়েছিল, কিন্তু ঈষৎবধির অশীতিপর বৃদ্ধ সেনাপতি সার হিউ হুইলার সে কম্পন অনুভব করেন নি।

ঝড়ের বেগে দূর দিকচক্রবালে যে বনস্পতি আন্দোলিত হচ্ছিল, তাও তিনি দেখতে পান নি। তাঁর সব চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা—তিনি নানাসাহেবের উপর ভরসা করেছিলেন। হিউএর অনেক বয়স হয়েছিল—অর্ধ শতাব্দীরও বেশি তিনি এই দেশে চাকরি করেছিলেন, দেশী সিপাহীদের বিশ্বাস করতে ও ভালবাসতেই তিনি অভ্যস্ত। তাঁর অধীনে যে সব সিপাহীরা আছে, তারা কোন দিন বিদ্রোহ করবে—এ-কথা তিনি ভাবতেই পারেন নি। তিনি ১৮ই মে তারিখেও বড়লাট লর্ড ক্যানিংকে চিঠি লিখেছেন, "কানপুরের সব কুশল। কিছু কিছু উত্তেজনা থাকলেও অবস্থা মোটের উপর শান্ত। আমরা শীঘ্রই দিল্লীর দিকে রওনা হতে পারব। বিদ্রোহীদের সংখ্যা তিন হাজারের বেশি না।...ওদের একজনকেও পালাতে দেওয়া ঠিক হবে না।...যাক্—ব্যাধির বিস্তৃতি বন্ধ হয়েছে এই রক্ষা।"

যত সহজে সার হিউএর চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, তত সহজে কিন্তু অপরকে দেওয়া যায় নি। কমিশনার গাবিন্স এবং হেনরি লরেন্স দুজনেই নানাসাহেবের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন অনেক দিনই—এবার অমন আকস্মিকভাবে লক্ষ্ণৌ থেকে চলে আসায় তাঁদের সে সন্দেহ আরও বেড়ে গিয়েছিল। তাঁরা হুইলারকে কর্তব্য-বোধে সচেতনও করে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হুইলারের চেতনা হ'ল না। বহুদিনের পরিশ্রমে স্নায়ুগুলিও বুঝি তাঁর শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, কোন বার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছে দেওয়া আর তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।...তিনি সার হেনরির চিঠির উত্তরে বরং একটু বিদ্রূপ করেই লিখলেন, "বিঠুরের মহারাজ আজই আমাদের নিরাপত্তার জন্য তিন শ সিপাহী এবং দুটি কামান পাঠিয়েছেন!"

চিঠির তারিখ—২২শে মে।

নির্বুদ্ধিতার এইখানেই শেষ নয়। নানাসাহেব হুইলারকে নানারূপ আশ্বাস দিয়েছিলেন। ভরসা দিয়েছিলেন যে প্রয়োজন হলে জান দিয়েও তিনি ইংরেজদের রক্ষা করবেন। তার প্রমাণস্বরূপ তিনি বিঠুরের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে নবাবগঞ্জের কাছে সিভিলিয়ান পাড়ায় এসে বাসা বাঁধলেন। হুইলারকে বুঝিয়ে দিলেন, 'আমি যতক্ষণ এখানে থাকব, ততক্ষণ তো কেউ চড়াও হতে সাহস করবে না! তা ছাড়া আমার মনে কোন পাপ থাকলে আমি চারিদিকে ইংরেজদের মধ্যে এসে বাস করতে পারতুম কি? আমি তো আপনাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই রইলুম।'

হুইলারের মনে বিশেষ কোন সংশয় কোন কালেই ছিল না। যেটুকু আভাস মাত্র থাকতে পারত তাও এতে কেটে গেল। তিনি নিশ্চিন্ত মনে ট্রেজারির ভারও তুলে দিলেন নানাসাহেবের হাতে। নানাও 'জান-কবুল' দিয়ে কোম্পানির পনেরো লক্ষ টাকা পাহারা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।...হুইলারের এতখানি বিশ্বাসের বদলে তিনি আর একটি প্রস্তাব করলেন—এখনও যদি সাহেবদের কোন ভয় থাকে, তাঁরা স্বচ্ছন্দে তাঁদের স্ত্রী-পুত্রকে বিঠুর প্রাসাদে রেখে আসতে পারেন। সেখানে তারা নিরাপদেই থাকবে। তাঁর নিজস্ব সিপাহী-সান্ত্রী তো আছেই। তারা কিছু কোম্পানীর 'নোকর' নয়, বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

হুইলারের উপর সমস্যাটা নির্ভর করলে তিনি হয়তো তখনই এই ব্যবস্থায় সম্মত হতেন। কিন্তু দেখা গেল যে, বাকী সকলে সার হিউএর মত অতটা নির্ভরশীল নন। তাঁরা বেঁকে দাঁড়ালেন। যে লোকটির ইংরেজদের ওপর খুশি থাকবার কোন কারণ নেই, তার হাতেই নিজেদের মান-ইজ্জৎ সঁপে দিতে

তাঁরা রাজী নন। শুধু তাই নয়, আপৎকালীন একটা ব্যবস্থা করার জন্যেও তাঁরা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তাঁদেরই পীড়াপীড়িতে অবশেষে একটা 'আশ্রয়' ঠিক করবার হুকুম দেওয়া হ'ল। কোষাগার এবং অস্ত্রাগার থেকে বহুদূরে, গঙ্গাতীর বা পলায়নের সকল সম্ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন, একটি পুরাতন ছোট হাসপাতাল-বাড়িকে ঘিরে একটি হাত-আড়াই উঁচু কাদার পাঁচিল দেওয়া হ'ল। হুইলার জানতেন এসব অনাবশ্যক—তিনি এদিকে কোন নজরই দিলেন না। হিন্দুস্থানী ঠিকাদার যতটা সম্ভব ফাঁকি দিল। একজনকে পঁচিশ দিনের মত খাদ্য-খাবার জমা করবার ঠিকা দেওয়া হয়েছিল। সে ব্যক্তি কয়েক বস্তা ময়দা ও কিছু মটরকড়াই মাত্র মজুত করেই মোটা টাকার 'বিল' নিয়ে চলে গেল। সাহেব-সুবোরা কেউ কেউ দু-চার বোতল মদ পাঠিয়ে দিলেন—কতকটা নিজেদের গরজেই। আর কোন ব্যবস্থা হ'ল না। কুয়াটা পড়ল খোলা জায়গায়—সে কথাটাও কেউ ভাবল না। ওধারে যখন হিন্দুস্থানের সমস্ত উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে প্রলয়ের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে—মুহুর্মুহু চলেছে বিদ্যুৎস্ফুরণ, অসংখ্য ইংরেজ নরনারীব জান-মান লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হচ্ছে, এদেশে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই একটা বিরাট রকমের সংশয় দেখা দিয়েছে—এখানে তখন এইভাবে পনেরোটা বহুমূল্য দিন একপ্রকার হাস্যকর ছেলেমানুষিতে কেটে গেল।

॥ ২৪ ॥

পুরাতন কানপুর বা সাহেবদের ভাষায় 'নেটিভ' পাড়ার একটি কুখ্যাত পল্লীতে আজিজন বিবির বাস। সংকীর্ণ গলির দুপাশে পাথরের নীচু রেলিং দেওয়া বারান্দায় চিক-ঝোলানো বাড়ি। একই রকমের প্রায় সবগুলি। কেবল আজিজনের বাড়িটিই তার ব্যতিক্রম। এই বাড়িটির বাইরের চেহারা অপর বাড়ির মত হলেও সাজসজ্জায় কিছু তফাৎ ছিল। তার জানালায় বহুমূল্য বিলিতী লেসের পরদা, দরজায় সিঁড়ির মুখে বিপুলকায় দারোয়ান। তার ঘরে ঝাড়ের আলো, দরজায় ভেলভেট—বাইরের বারান্দায় হরেকরকম পাখীর খাঁচা ও দাঁড়। এক কথায় ঐশ্বর্য ও বিলাসের চিহ্ন বাইরে থেকেই একরকম সুস্পষ্ট।

পাড়াটার কু-খ্যাতির জন্যই হুসেনী বেগম কোনদিন ওখানে আসতে সাহস করে না—প্রয়োজন থাকলে খবর দিয়ে আজিজনকে ডেকে পাঠায়। আজ কে জানে কেন, সর্দার খাঁকে দিয়ে আগেই খবর পাঠিয়েছে, সন্ধ্যার সময় সে আসবে, আজিজন যেন আজ বাড়ি থেকে সব 'জঞ্জাল' সাফ করে রাখে।

খৎ-খানা পেয়ে অবধি আজিজনের বিস্ময়ের সীমা নেই। আমিনা এখানে আসবে কেন? এমন কি জরুরী দরকার পড়ল?

যা হোক, ব্যবস্থার ত্রুটি হ'ল না। দারোয়ানকে ডেকে সে বলেছিল, যে-কোন রকম 'সান্ধ্য অতিথি'ই আসুক, আজ আর কাউকেই যেন ঢুকতে দেওয়া না হয়। 'বিবির ভীষণ মাথা ধরেছে'—এই কথা বলেই যেন সকলকে বিদায় দেওয়া হয়।

তার পর থেকে সে একটা রেশমী ওড়না জড়িয়ে, বলতে গেলে সারাক্ষণই, বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। কৌতূহল তাকে স্থির থাকতে দিল না।

আমিনা এল একেবারে সন্ধ্যের মুখে। ভেলভেটের ঘেরাটোপ দেওয়া ডুলি, নামলও কালো বোরখায় সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে, কিন্তু আজিজনের চিনতে ভুল হ'ল না।. দ্রুত নেমে গিয়ে একেবারে আমিনার হাত ধরে সোজা ছাদে নিয়ে গেল। ছাদে তখনই জল ছিটিয়ে খাটিয়া পাতা হয়েছে। বড় চওড়া খাটিয়া—তাতে রাত্রে আজিজনের বিছানা পড়বে। খাটিয়ার পাশে একটা উঁচু চৌকিতে মাটির ঝাঁঝোরায় জল এবং একটি থালায় কিছু চামেলি ফুল।

আজিজনের ইঙ্গিতে একজন দাসী নিঃশব্দে এসে খাটিয়ার ওপর একটা নরম গালিচা বিছিয়ে দিয়ে গেল। আজিজন এতক্ষণে কথা বলল, 'ব'স—আরাম করে। ছাদেই সুবিধে, আড়ি পাতবার ভয় থাকে না। তার পর, কী ব্যাপার—এমন হঠাৎ?'

আমিনা খাটিয়াতে বসে মুখের ওপর থেকে বোরখাটা সরাল, কিন্তু তখনই কোন কথা বলল না। আজিজন লক্ষ্য করল, তার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট, চোখের কোলে কালি—অর্থাৎ অনিদ্রার চিহ্ন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবেই আজিজন পুনশ্চ প্রশ্ন করল, 'খবর কী?'

আমিনা ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, 'খবরটাই যে কী তাই তো বুঝতে পারছি না।'

'এখানে এলে যে?'

'কী করি! ওই বাড়িটায় জায়গা বড় কম। সকলেই সকলের চোখের ওপর আছি। ডেকে নিয়ে গিয়ে আড়ালে দুটো কথা কইব—সে জায়গা নেই। এক গঙ্গার ধারটায়, কিন্তু এখন চারদিকেই লোক—আর সকলেই সন্দিগ্ধ।'

'নানাসাহেবও?'

'নানাসাহেবকেই তো ঠিক বুঝতে পারছি না। সন্দিগ্ধ তো বটেই। যতই যা করি, আদালা মাথাটি খেয়ে দিয়েছে। একটু সন্দেহ কিছুতেই যাচ্ছে না। এ আবার এক নতুন বিপদ হয়েছে আজিজন—এখন শুধু আমি কী করছি তা নিয়েই মাথাব্যথা নয়, আমি কী ভাবছি তা নিয়েও!...এখন যেন মনে হয় আমাকে ভালবাসতেও চায় সে!'

'সেটা কি খুবই আশ্চর্য একটা কিছু?' আজিজন আমিনার মুখখানা তুলে ধরে একটু কৌতুকের হাসি হাসল।

লাল হয়ে ওঠে আমিনা নিমেষে। সেটা কতটা লজ্জায় আর কতটা অপমানে বলা কঠিন।

'ভালবাসার সাধ নেই আজিজন। সে সম্ভাবনা আছে জানলে নানার কাছে আসব কেন? বেচা-কেনার সম্পর্ক জেনেই তো লম্পটের উপপত্নী হতে এসেছি!'

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

শেষে আজিজন বলে, 'এধারে কতদূর?'

'সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। নানাকে নিয়েই হয়েছে বড় মুশকিল। ও ইংরেজদেরও স্তোক দিচ্ছে—আমাদেরও। আসলে নিজে এখনও মনস্থির করতে পারে নি। আমাদের বোঝাচ্ছে যে, সে ওদেরই ঠকাচ্ছে—কিন্তু আমি জানি তা নয়। এখনও দেখছে, বুঝছে।'

'কিন্তু সিপাইরা?'

'সেই তো হয়েছে আরও বিপদ। নানা এখানকার বড় মুরুব্বি, ওর

ভাবটা বুঝতে পারছে না বলে তারা এখনও ইতস্তত করছে। লক্ষ্মৌ, মীরাট, দিল্লীর খবর আমরা যতটা পারছি ফলাও করে প্রচার করছি। কিন্তু তবু কারুর গা তাতছে না। আজিমুল্লা, টোপী, টীকা সিং—এরা তো প্রাণপণে চেষ্টা করছে নানাকে টেনে নামাবার, কিন্তু নানাকে আমি চিনি আজিজন। সিপাইরা না এগোলে ওকে নামানো যাবে না। ইংরেজদের ও ভয় করে এখনও, আর খুব নির্বোধও নয়।...আবার ওর ভাব না বুঝলে সিপাইরাও এগোবে না।'

তার পর একটু থেমে আমিনা বলল, 'তুই তো সিপাইদের ভার নিয়েছিলি আজিজন!'

'হ্যাঁ, তা নিয়েছিলুম। সে ভার এখনও বইছি বৈকি। প্রাণপণেই বইছি। কত নেমেছি তা তুমি জান না বহিন্‌—কত পাঁকে নেমেছি! এ দেহ তুষানলে না পুড়লে আমি বোধ হয় খোদার দরবারে গিয়ে কোনদিন দাঁড়াতে পারব না!'

'জানি না, কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝি এ স্ত্রীলোকের কাজ নয়।...হয়তো আমাদের উচিত হয় নি এ কাজে আসা!'

একটু হতাশার সুরেই বলে আমিনা।

'না মা—অত ভেঙে পড়বার মত কিছু হয় নি। এ আমরা সফল করবই। নরকে না নামলে নরকের আগুন জাঁকানো যায় না।...আচ্ছা, আমি দেখছি।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আমিনা উঠে পড়ল।

'কী বলতে এসেছিলে তা তো বললে না?'

'না, বিশেষ কিছুই না। শুধু একা একা আর পারছি না। ওরা সর্দারকে পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখে।...কার সঙ্গে দুটো কথা কই বল্ তো... অপর যারা আছে, তারা সবাই নিজের স্বার্থের চক্রে ঘুরছে! আর যেন পারছি না আজিজন। এক এক সময় মনে হয়—দিল্লী চলে যাই। সেখানে নিজের হাতে কটাকে সাবাড় করে রক্ত মেখে হিন্দুদের যোগিনী সাজি!... রক্তের তৃষ্ণায় পাগল হয়ে উঠেছি আজিজন।'

'জানি বহিন্, কিন্তু ধৈর্য ধর। আগুন যে এখনও ভাল করে জ্বলে নি। ফুঁ দিয়ে জাঁকিয়ে তুলি এসো। তার পর সেই আগুনে না হয় নিজেরাও পুড়ব!'

আমিনা নিঃশব্দে সিঁড়ির মুখের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। কতকটা যেন চুপি চুপি বলল, 'কালও তাকে দেখেছি—এমনি সন্ধ্যায়—বাড়ির ছাদ থেকে গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখতে পেলাম, জাহাজে পা-তুলে সে আসছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকেই। তার হাতে একটা বন্দুক— আর তার পাশে—সেও! সেই পাপিষ্ঠটাও!'

আজিজন কথা বলল না। দূরে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের রক্তাভা তখনও একেবারে মিলিয়ে যায় নি—তারই ওপর ফুটে উঠেছে 'হিমকুন্দমৃণালাভ' শুকতারা। সেইদিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমিনা আবার বোরখায় মুখ ঢেকে নীচে নেমে গেল।

॥ ২৫ ॥

আজিজন সন্ধ্যের অনেক পরে ছাদ থেকে নামল। অলস ক্লান্ত পদে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। পাড়ার বাকী বাড়িগুলিতে দেহ-বিলাসিনীর দল অনেকেই সেজেগুজে দাঁড়িয়েছে। মুখের কাছে একটা করে চেরাগ জ্বলছে প্রায় প্রত্যেকেরই। পথিকের দলও তাই ঊর্ধ্বমুখ। দেশের আবহাওয়াতে যতই আসন্ন বিপর্যয়ের আভাস থাকুক, চারিদিকের আকাশে যতই মেঘ ঘনিয়ে আসুক—এ পথের পথিকদের চোখে লোভাতুর কামনার দৃষ্টি দেখে তা অনুমান পর্যন্ত করবার উপায় নেই। এখানে বোধ করি ঘৃণায় কালও প্রবেশ করে না, তাই এখানকার জীবন সেই আদিমকালেই থমকে থেমে আছে।

আজিজনের বারান্দায় আজ ঝাড় জ্বলে নি। ঘরেও একটিমাত্র শেজ্-এর আলো। তাতে আজিজনকে দেখা যায় না। সে পর্দার আড়ালে নিশ্চিন্ত হয়েই দাঁড়াল।

মোটা মোটা বানিয়ার দল এল—চলে গেল। একটি ফৌজী দল হল্লা করতে করতে এসে কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে দরদস্তুর রসিকতা জুড়ে দিল। তার পর একে একে তারা ঐ প্রায়ান্ধকার বাড়িগুলোর রহস্যময় কোণে কোণে মিলিয়ে গেল।...কুলফিওয়ালা-ফুলওয়ালার দল হেঁকে যাচ্ছে।...ওপাশের দু-তিনটে বাড়ি থেকে মদমত্ত কোলাহল উঠছে। চির-পরিচিত আবহাওয়া—প্রত্যহের নরক।

কিন্তু আজিজনের কোন দিকে খেয়াল ছিল না। পথের দিকে তাকিয়ে ছিল সে—কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করছিল না। শ্রান্ত চোখ দুটি পথের দিকে মেলে ছিল হয়তো—দৃষ্টি ছিল বহু দূরে, হয়তো বা বহুদূর অতীতে।

অকস্মাৎ নীচের পাথর-বাঁধানো পথে এক সিপাহীর নাগরা বেজে উঠতেই যেন আজিজনের চমক ভাঙল। লোকটির দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল—সেও সতৃষ্ণ উৎসুক নয়নে ওপরের দিকে তাকাচ্ছে। পাশের বড় পানওয়ালার দোকানের 'ডিবিয়া' থেকে তার মুখে আলো এসে পড়াতে চেনবারও কোন অসুবিধা হ'ল না। পর্দা সরিয়ে ঈষৎ কোমল কণ্ঠেই আজিজন ডাকল, 'খাঁ মহম্মদ!'

'আপকা বান্দা বিবিসাব!' আভূমিনত সেলাম করল খাঁ মহম্মদ।

'এসো, এসো। ওপরে এসো। একটু গল্প করি। অনেকদিন দেখি নি!'

খাঁ মহম্মদের চোখ দুটি জ্বলে উঠল। কিন্তু একবার নীচের দরজার দিকে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে বলল, 'দারোয়ান ঢুকতে দেবে কি?'

'দেবে, দেবে। দিলওয়ার খাঁ, ছেড়ে দাও তো সিপাইজীকে!'

মুখটা বাড়িয়ে আজিজন নির্দেশ দিল দারোয়ানকে।

খাঁ মহম্মদ জুতো বাইরে রেখে পাপোশে পা মুছে সসংকোচে ভেতরে এল। আজিজন ইঙ্গিতে তাকে ফরাসের বিছানা দেখিয়ে দিয়ে নিজেও একটি তাকিয়া টেনে নিয়ে হেলান দিয়ে বসে বলল, 'তার পর খাঁ সাহেব, খবর কী? পান খাও একটা।...খবর সব ভাল তো? জরু-ছাওয়াল সবাই ভাল? কটা নিকেয় বসলে আর?'

'আর কেন তামাশা করেন বিবি, পেটে খেতে পাই না—তার নিকে! দুটো ছিল—একটা মরেছে, আপদ গেছে। আর পেরে উঠছি না বিবি। কি-ই বা মাইনে—দেনায় দেনায় মারা গেলাম।'...

পানের ডিবা থেকে পান ও খানিকটা কিমাম নিয়ে সে মুখের ভেতর ফেলে দিল।

'দুঃখ ক'র না খাঁ মহম্মদ। এবার আর কোন ভাবনা থাকবে না।...বরং এক কাজ কর, এই সামনের হপ্তার মধ্যেই যে-কটা পার নিকা করে নাও। ফুর্তিটা তো লোটো—দায়-ধাক্কা আর বেশীদিন সামলাতে হবে না।'

'কেন, কেন?' রূপসী ও সর্বজনবন্দিতা বারনারীর সামনে বসতে পেয়ে যেন খাঁ মহম্মদের মাথা খুলে গেছে। তামাশার সুরে বলল, 'আসমান থেকে মোহর পড়বে?'

'আসমান থেকেই পড়বে বটে, তবে মোহর নয়—গুলি!'

'সে কি!'

'আর কি! যা বলছি তাই শোন। জান তো আমার কাছে হরেক খবর আসে। আমি ঝুটা বাত বলছি না, তোমাদের জান নিয়ে আর বেশীদিন এখানে থাকতে হবে না।'

'সে কি! কেন, কেন—কী ব্যাপার?' মুখ শুকিয়ে উঠল খাঁ মহম্মদের। সে পিকদানিতে পানটা নামিয়ে মুখ হালকা করে নিল তাড়াতাড়ি।

'আর কী ব্যাপার! তোমরা আরও ঘুমোও না! মীরাটের সিপাইরা অমন একটা কাণ্ড করলে, তা তোমরা একটা সাড়াও দিলে না। একসঙ্গে সবাই জাগলে জানোয়ারগুলো হাওয়ায় উড়ে যেত। তোমরা তামাশা দেখছ—ওধারে ইংরেজ তৈরী হয়ে গিয়েছে। তেলেঙ্গী মুলুক থেকে গোরা ফৌজ আসছে—তারা দিল্লী যাবে। আর তোমাদের কী করা হবে জান? এই সামনের মাসে কোন এক তারিখে তোমাদের কুচকাওয়াজে ডাকা হবে। তার পর হাতিয়ার পরখ করার নাম করে বন্দুকগুলো হাতিয়ে নিয়ে তোমাদের সকলকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেবে—যাতে আর তোমরা না ওদের পেছনে লাগতে পার।...বুঝেছ হাঁদারাম?'

'সাচ্?'

'সাচ্। তুমহারা কসম।'

খাঁ মহম্মদের মুখে কিছুক্ষণ কথা সরল না। তার পর শুষ্ককণ্ঠে বলল, 'কিন্তু মীরাটের ওরাই তো সব গড়বড় করে দিল। কথা ছিল—ঈদের পর সামনের একত্রিশ তারিখে সবাই একসঙ্গে রুখে দাঁড়াবে। ওরা হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার করলে—!...কে কী করবে—করছে, পুরো খবর তো আমরা পাচ্ছি না। নানাসাহেবের মতলবও যেন কেমন-কেমন—আমরা হুট্ করে কী করব বলুন তো! একটু শোচে সমঝে না দেখলে—'

'বেশ, ভাল করে শোচে সমঝে দেখ—তাড়া কি? তবে মাথাটা কাঁধের ওপর থাকতে থাকতে যত পার ভেবে নাও। বেশীদিন আর ভাবতে হবে না।'

খাঁ মহম্মদ বোকার মত খানিকটা আজিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বার-দুই জিভ বুলিয়ে শুষ্ক ওষ্ঠ দুটিকে সরস করবার চেষ্টা করল। তার পর অকস্মাৎ একসময় উঠে বিনা সম্ভাষণেই একরকম ছুটে নীচে নেমে গেল। বাইরের পাথর-বাঁধানো পথে নাল-বাঁধা নাগরার দ্রুত শব্দ আবর্তনে বোঝা গেল দৌড়োবার মত করেই হাঁটছে।

অনেকক্ষণ পরে—হয়তো বা অনেকদিন পরেই—আজিজনের মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল।

আজিজনের অনুমান ভুল হয় নি। খাঁ মহম্মদ তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিল এবং অপরকেও বিশ্বাস করাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখে নি। সে সারারাত ঘুরে ঘুরে ব্যারাকের সিপাহীমহলে, এমন কি ক্যাভালরি লাইনেও আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত করে তুলল। 'খাঁ মহম্মদ কসম খেয়ে বলেছে—কথাটা একেবারে ঝুটু হতে পারে না।' সকলের মুখেই এই কথা। ক্রমশ ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল।

এতই ঘোরালো হ'ল যে, কথাটা কানপুর থেকে একসময় লক্ষ্নৌ পেঁছিল। সার হেনরী বেশ একটু চিন্তিত হলেন। তাঁর অবস্থাও খুব ভাল নয়—তবু তিনি অনেক ভেবে শ-দুয়েক গোরা সিপাহী তখনই পাঠালেন কানপুরে—ওখানকার গ্যারিসনকে সাহায্য করবার জন্য।

তারা এসে পেঁছিতে সার হিউ হুইলার হেসে খুন হবার দাখিল। তিনি তখনই এক খৎ লিখে তাদের লক্ষ্নৌতে ফেরত পাঠালেন। লিখলেন—'এখানে এমন কোন গোলমালের ভয় নেই। তা ছাড়া নানাসাহেব আছেন, অনেকটা ভরসা। আপনাদের প্রয়োজন বেশী সুতরাং এদের ফেরত পাঠালুম। আশা করি মনে কিছু করবেন না। ধন্যবাদ।'

খবরটাও যথাসময়ে আমিনার কাছে পেঁছিল বৈকি। সে নবাবগঞ্জের বড় পীরের আস্তানায় সিন্নি পাঠাল।

॥ ২৬ ॥

মুনশী কালকাপ্রসাদের মত বিপদে বোধ হয় আর কেউই পড়েন নি।

গোলমালের খবরটা শহরেও বেশ ফলাও ভাবে ছড়িয়েছিল। যদিচ মুনশীজী জরু-গরু সবই প্রায় দেহাতে পাঠিয়েছেন, তবু নিজের প্রাণটাও তো আছে। আর নিজের প্রাণ কিছু ফেলনা নয়। ভেবে দেখতে গেলে সর্বাগ্রে তাঁর এই দুগ্ধঘৃতপুষ্ট দেহটাকেই সুদূর দেহাতে কোথাও পাঠানো উচিত ছিল—যেখানে না ইংরেজ আর না এই বেইমান সিপাহীরা—কেউ কোন কালে পদার্পণ করবে না, শহরের খবর যেখানে পেঁছিতে এক মাস সময় লাগবে। কারণ, কালকাপ্রসাদ যথেষ্ট ভেবে দেখেছেন, কিছুদিন যাবৎ দিনরাতই ভাবছেন বলতে গেলে—জানটা বাঁচলে জয়ু-গরু দুই-ই হবে। তিনি তো মাত্র চারটি বিবাহ করেছেন,—তার ভেতর রামশঙ্করের মেয়েটা এখনও ঘর করতেই আসে নি, সুতরাং তিনটিই ধরা উচিত। তাঁর অবস্থার লোকে আটটা বিবাহ করতে চাইলেও কখনও পাত্রীর অভাব ঘটবে না।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, এই দেহটাকেই আপাতত কোনক্রমে কানপুর থেকে সরানো যাচ্ছে না। তাঁর মনিব গ্রীনওয়ে সাহেব কারও কোন কথাতে কর্ণপাত করবার লোক নন। দু-একবার যে সে চেষ্টা কালকাপ্রসাদ করেন নি তা নয়, তবে সে নিতান্তই অরণ্যে রোদন! লোকটার বৈষয়িক বুদ্ধি খুব —তা কালকাপ্রসাদও স্বীকার করতে বাধ্য। ব্যবসায়-সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেকবার দেখা গিয়েছে সাহেব 'এক-বগ্‌গা ঘোড়া'র মত কারও কোন কথায় কর্ণপাত না করে নিজের দূরদৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়েছেন। যাকে ফুটো জাহাজ বলে ভাবা গিয়েছে, তাই কূলে পেঁছিয়ে, প্রমাণ করে দিয়েছেন—সপ্তডিঙা মধুকর। তবে সাংসারিক ব্যাপারে সাহেব যে শিশুর মতই অজ্ঞ

তাতে কাল্‌কাপ্রসাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আসন্ন ঝড়ের সংকেত সবাই পেয়েছে—কেবল সেটা সাহেবেরই চোখে পড়ছে না। মেমসাহেবদেরও রীতিমত মুখ শুকিয়ে উঠেছে, তা কাল্‌কাপ্রসাদও ভাল করেই লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু গ্রীনওয়ে সাহেব স্ত্রীলোকের কথায় কর্ণপাত করে সতর্ক হবেন, তেমন ভরসা নেই।

অথচ সাহেব না ছাড়লে তিনি যেতে পারছেন না। বিষম র‍্যাচটা মানুষ। দেহটা থাকলে জরু-গরু সব হবে—এটাও যেমন সত্য কথা, দেহটা রাখতে তেমনি কিঞ্চিৎ রজত-রসেরও দরকার। লোকে যতই যা ভাবুক (মন্দ লোকে মনে করে—কাল্‌কাপ্রসাদ বেশ দু পয়সা জমিয়েছেন।), চারটি স্ত্রী বহন করে লোকলৌকিকতা বজায় রেখে এই বাজারে কত পড়ে তা যে ভুক্তভোগী সে-ই জানে। 'তন্‌খা' তো মাত্র মাসিক ত্রিশটি টাকা—উপরি কিছু আছে তাই বড়মানুষি দেখিয়েও কোনমতে চলে যায়। জমবে কোথা থেকে?

আর তেমনি হয়েছে তাঁর 'কুন্‌কে-শত্রু' যুগলকিশোরটা। আজ যদি গ্রীনওয়ে সাহেবের অনুমতি না নিয়ে তিনি গা-ঢাকা দেন তো অমনি সে গিয়ে নানাভাবে পল্লবিত করে কথাটা লাগাবে এবং তাঁর চাকরিটা খেয়ে নিজে গিয়ে সেই আসনে বসবে। তার পর—তার পরের অবস্থাটা মুনশীজী ভাবতেও পারেন না!

অথচ এবারে হাওয়া ক্রমশই গরম হয়ে উঠছে।

খানিকটা ভরসা ছিল যতদিন বন্ধু কানহাইয়ালাল এখানে ছিলেন। রোজ প্রত্যূষে গিয়ে দুটো সুখ-দুঃখের গল্প করে খানিকটা ভরসা পাওয়া যেত। গত তিন দিন হ'ল—তিনিও নি-পাত্তা হয়েছেন। লোকটা কি অদ্ভুত—একবার বলে গেল না পর্যন্ত! আগের দিনও কত 'সাহুকারি' করেছে, কত ভরসার কথা শুনিয়েছে। অথচ সেদিন ভোরে গিয়ে দেখেন—একেবারে ভোঁ ভাঁ, দুয়োরে একটি ভারী গোছের দেশী তালা ঝুলছে।...এদিক-ওদিক কোথাও বেড়াতে গিয়েছে—এমন মনে করবার কোন কারণ নেই, কারণ তা হলে পায়াভাঙা চারপাইটা অন্তত পড়ে থাকত। সেটাও যখন নেই—

কাল্‌কাপ্রসাদ সেদিন থেকে আরও অসহায় অনুভব করেছেন নিজেকে। যতই হোক, একের বুদ্ধি—বুদ্ধিই নয়। কী যে করবেন—। গত দু দিন তো একদম ঘুমোতে পারেন নি। সামনেই বকর-ঈদ পরব—বাজারে গুজব, বখরার বদলে সেদিন সাহেবদেরই কোরবানি করা হবে। আর সেই সঙ্গে, দানের সঙ্গে দক্ষিণার মত, ওজনের সঙ্গে ফাউএর মত, তাদেরও—না, আর ভাবতেও পারেন না। ভাবতে গেলে মাথা ঝিম ঝিম করে।

এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ বোধ করি ভগবান মুখ তুলে চাইলেন।

ঈদের ঠিক আগের দিন সাহেব ডেকে বললেন, 'সরকারের কাছে অনেকগুলো টাকা পাওনা। কালেক্‌টার বিল পাস করেও দিয়েছেন। আজই গিয়ে টাকাটা নিয়ে এসো। দু দিন আবার পরবের ছুটি পড়ে যাবে নইলে।'

জয় মহাবীরজী, জয় বাবা বজরঙ্গজী!

এক-আধ পয়সা নয়—পাঁচ-পাঁচটি হাজার টাকা!

টাকা আদায় হলে দু-পাঁচ দিন মুনশীর হেপাজতেই থাকে। এই টাকাটা যদি কাল্‌কাপ্রসাদ বাড়িতেই রাখেন তো কেউ টের পাবে না। বকর ঈদের ঝগড়া কেটে গেলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই চলবে। তেমন হয় তো ঐ

টাকাটা নিয়েই তিনি গা-ঢাকা দেবেন। নদীর ওপারে এগারো ক্রোশ দূরে তাঁর মাসীর বাড়ি। সে কথাটা বিশেষ কেউ জানেও না।...সেখানেই গিয়ে উঠবেন। তার পর, জান বাঁচলে ঐ টাকাটা মূলধন করেই কোন কারবার শুরু করা যাবে। এছাড়া জমি-জমা তো রইলই। বিবিদের সঙ্গেও কিছু কিছু আছে। মায়ের কাছেও কিছু পাঠিয়েছেন। সব একত্র করলে একরকম চলেই যাবে।

অনেকদিন পরে কাল্কাপ্রসাদের মুখে হাসি ফুটল। স্নান শেষ করে একটু দুধ খেয়ে নিয়ে তিনি পুনশ্চ বজরঙ্গজীকে স্মরণ করে ট্রেজারির দিকে রওনা হলেন। বুড়ো চাকর রামদাস এখনও কোথাও যায় নি—তাঁকে ফেলে সে যাবেও না। তাকে ডেকে বলে গেলেন—আজ তাঁর ফিরতে দেরি হবে ; ফিরে আর রুটি পাকাতে বসতে পারবেন না। রামদাসই যেন খানকয়েক পুরী ও ভাজি বানিয়ে রাখে। 'পাকী' খাবারে দোষ নেই—সকলের হাতেই খাওয়া যায়।

ট্রেজারিতে পেঁছে কিন্তু আবার বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন। যে সব পাহারাদাররা ওখানে থাকে, যাদের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ 'জান-পহছানা' আছে, তাদের কারও টিকি নেই। এ যে সিপাহীর মেলা। চারদিকেই বন্দুকধারী ফৌজী সিপাহী। এর ভেতর নানাসাহেবের লোকও কিছু কিছু আছে। কিন্তু তাদের হাতেও আর আগের মত আসাশোটা নেই—সব বন্দুক। মেজাজটাও—অভিজ্ঞ লোক দূরে থেকে দেখেই বুঝলেন, একেবারে 'মিলিটারী'। কী করবেন, ঢুকবেন না ফিরে যাবেন—ফিরে গিয়েই বা সাহেবকে কী কৈফিয়ত দেবেন—পাংশু বিবর্ণ মুখে যখন এই সব চিন্তা করছেন, পেছন থেকে কার একটা ভারী হাত কাঁধে পড়ল। চমকে ফিরে দেখলেন—এমন কেউ নয়, বাবু নানকচাঁদ। তবু ভাল! আবার ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।

'কী দেখছ কাল্কাপ্রসাদ ? ঢুকবে—না ফিরে যাবে ?'

'কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না উকিলসাহেব! ব্যাপারটা কী ? "রাজ" পাল্টে গেল নাকি ?'

নানকচাঁদ মুচকি হেসে বললেন, 'কতকটা তাই বটে! তার পর ? এখনও আছ তা হলে, আমি বলি দেহাতে পালিয়েছ কোথাও!'

'কোথায় আর পালাব বল ? কাজ-কারবার ফেলে—'

'কাজ-কারবার আর কত কাল তোমার সাহেব চালাতে পারবে মনে কর ?'

'কেন বল তো নানকচাঁদ ভাই ? কী শুনেছ ?'

'শোনবার দরকার কী—চোখ মেলে দেখই না। সামনেই তো "তিরজুরি"। কালেক্টার সাহেবের পরোয়ানাতে আর কাজ হচ্ছে না। সুবাদার টীকা সিং হয়েছে মালিক। তাঁর হুকুম হলে টাকা মিলছে—নইলে মিলছে না। সিপাইদের দয়া না হলে তো কেউ ভেতরে ঢুকতেই পারছে না।'

তুমি গিয়েছিলে ?'

'না—এখনও যাই নি। লালা ভগৎরাম এসেছিলেন একটু আগে। তা তাঁরই যা দুর্দশা দেখলুম চোখের সামনে। মোটে যাব কিনা ভাবছি!'

'তোমার পাওনা আছে কিছু ?'

'সে সামান্যই। আসলে আমি হালচাল দেখতেই এসেছিলুম।...তুমি যাবে না ?'

'যাব ?'

'যাও না। ক্ষতি কী ? জানে মারবে না—ভয় নেই। হয়তো একটু

সন্দেহ অর্ধচন্দ্র দিতে পারে ! আবার টাকা পেয়েও যেতে পার । মিলিটারী মেজাজ—কখন কী ভাবে থাকে বলা যায় না তো !'

'সেই তো ভাবছি !...আচ্ছা, নানাসাহেবের সিপাইও তো দেখছি এখানে !... তা এরা এ-রকম করছে মানে কী ? নানাসাহেবও কি তা হলে সোজাসুজি ইংরেজদের দুশমনি করছে ?'

'না—নানাসাহেবই তো এখন রক্ষক । এরা তো পাহারাদার । ইংরেজদের হয়েই পাহারা দিচ্ছে ।' নানকচাঁদের কণ্ঠে সামান্য একটু ব্যঙ্গের সুর থাকলেও গম্ভীরভাবেই বলেন কথাগুলো ।

কালকাপ্রসাদ শুষ্ক ওষ্ঠে একবার জিভটা বুলিয়ে নিয়ে বলেন, 'তা চল না ভাই তুমিও একটু !'

'না ভাই, আমি বোধ হয় এখান থেকেই ফিরব । আমাকে অনেকেই চেনে ।...সেদিন লালুরাম মুৎসুদ্দির কী হয়েছিল জান ?'

'না তো—কী হয়েছিল ?'...

'ও আর ওর লোকজন কিছু টাকা নিয়ে যাচ্ছিল, নানার অনেকদিনের রাগ চিমনা আপ্পার ওপর—ওর ভাগ্নেকে মকদ্দমার খরচা যোগাচ্ছিল তো আপ্পা সাহেবই, তা মনিবকে ধরতে না পেরে চাকরকেই ধর্ । ব্যস, হঠাৎ পথের মাঝে গাড়ি ঘেরাও ! লালুরাম বুদ্ধিমান লোক । সে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে পড়েই পাশের ঝোপে গা-ঢাকা ! লোকজনও যারা ছুটে পালাতে পারলে পালাল, যারা পারলে না—মার খেলে । টাকা-কড়ি সমস্ত লুট করে নিলে নানার সিপাইরা ।'

'তাই নাকি ? তা হলে আমি ফিরি ।'

'আরে না, না । তোমার সাহেব কি তুমি তো আর নানার সঙ্গে কোন দুশমনি কি বেইমানি কর নি ! তোমার অত ভয় কি ?...কত টাকার হুণ্ডি তোমার ?'

'পাঁচ হাজার ।'

'অতগুলো টাকা ছেড়ে চলে যাবে ? দিনকাল ভাল নয় হে !...ঐ টাকাটা হাতে থাকলে—বুঝলে না, জান-বাঁচানোরও সুবিধা হবে । ওটা তো আর কিছু আদায় করেই সাহেবদের দফতরে জমা দিচ্ছ না ।' উচ্চাঙ্গের হাসি হাসেন নানকচাঁদজী ।

'না—মানে—ঠিক তা নয়—সাহেবের টাকা যখন—তবে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ "তবে"র কথাই বলছি !'

নানকচাঁদ একরকম তাঁকে ঠেলেই দেন সামনের দিকে ।

টাকা সত্যিই অনেকগুলো—বিশেষত সামনে এই আসন্ন দুর্যোগ—আসন্নই বা কেন, সমাগতও বলা চলে ।

গঙ্গামায়ী এবং সংকট-মোচনকে স্মরণ করে শুষ্কতালু কালকাপ্রসাদ এগিয়ে যান পায়ে পায়ে ।

ঢোকবার মুখেই এক সিপাহী মারমুখো হয়ে তাড়া দিল, 'কেয়া মাংতা ? কাঁহা যাতে হো ?'

'এই একটা—একটা হুণ্ডি ছিল—'

'ব্যস্ ঐখানে দাঁড়াও । হুণ্ডি দাও এখানে । সুবাদার সাহেব দেখবেন । যদি তিনি হুকুম দেন তো রুপেয়া মিলবে, নইলে নয়—সাফ কথা !'

'কেন, কালেক্‌টার সাহেব পাস করে দিয়েছেন। সই-সাবুদ সব আছে।'

'কে কালেক্টার সাহেব? ওসব আমরা বুঝি না। ওসব জমানা চলে গেছে। টাকা চাও তো এই কানুন! না হলে ভাগো।'

ওদিক থেকে একটি সিপাহী সামনে এসে সঙ্গীনটা সোজা কালকাপ্রসাদের বুকের সামনে খাড়া করে ধরল।

'ব্যস, আর একটা কথা নয়।...দিতে হয় দাও, তার পর ঐ পাশে দাঁড়িয়ে থাক। ডাক পড়ে ভেতরে যাবে—নইলে সোজা বাড়ির পথ ধরবে।'

হাত-পা হিম হয়ে আসছিল কালকাপ্রসাদের—সঙ্গীনের চেহারাটা দেখেই। নেহাত চুপ করে থাকলে সঙ্গীন আর খাড়া থাকবে না, বুকে এসে বিঁধবে—এই ভয়েই কাঁপতে কাঁপতে বিলখানা বের করে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন।

প্রায় দু দণ্ড কাল সেইভাবে বলির পাঁঠার মত দাঁড়িয়ে কাঁপলেন কালকাপ্রসাদ—গ্রীনওয়ে সাহেবের দোর্দণ্ড-প্রতাপ মুনশী।

তার পর ভেতর থেকে সুবাদার সাহেবের হুকুম এল, 'মঞ্জুর।'

সঙ্গীন দিয়েই ভেতরটা দেখিয়ে দেওয়া হ'ল, 'যাও, সোজা খাজাঞ্চীখানায়।'

কালকাপ্রসাদ একবার ঢোক গিললেন। ভেতরে গেলে কোপ বসাবে না তো? মতলব কি?

নেহাত এখন ছুটে পালাতে গেলেও বোধ হয় গুলি ছুঁড়বে, নচেৎ তিনি পাঁচ হাজার টাকার মায়া করতেন না। জানটাই যদি না রইল—পাঁচ হাজার পাঁচ লাখ হলেই বা লাভ কি?

ভেতরে যেতে অবশ্য যথারীতি টাকা গুনে দেওয়া হল। পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা বড় কম নয়—গিনিতে-টাকাতে মিলিয়েও অনেক। অন্য সময় হলে এখানকার রক্ষীরাই গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসে, সেলাম করে দু আনা পয়সা বকশিশ নেয়। এখন সিপাহীদের কিছু বলতে সাহস হ'ল না। টাকার থলির ভারে প্রায় বেঁকে কালকাপ্রসাদ কাঁপতে কাঁপতে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এলেন।

কিন্তু দেউড়িতে পড়তেই পেছন থেকে হুকুম হ'ল, 'রোকো!'

আবার কী রে বাবা! এমনিতেই কপাল থেকে ঘাম পড়ে কালকাপ্রসাদের চোখ লবণাক্ত ও ঝাপসা হয়ে গেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। তার ওপর জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্র আকাশে বেশ চড়েছে—একটু পরেই হয়তো 'লু' চলবে। কোনমতে গাড়িটা পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে যে হয়! যদিচ সাহেবের গাড়ি, তবু সোজা নিজের বাড়িতেই নিয়ে যাওয়া যাবে—এমন হামেশাই হয়, গাড়োয়ান সন্দেহমাত্র করবে না। তার পর...রাত্রের আঁধারে রামদাসকে নিয়ে নৌকোয় চড়তে কতক্ষণ?

এতক্ষণ কোন আশাই ছিল না—সে একরকম। কিন্তু টাকাটা গুণে দিতে দেখে কিছুটা যেন ভরসা পেয়েছিলেন, কল্পনা ও চিন্তাও তাদের স্বাভাবিক গতিপথ ধরে চলেছিল। তাই কিছু কিছু আশা-ভরসার কথাই ভাবতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এ আবার কী হ'ল?

এক জমাদার সাহেব এগিয়ে এলেন, 'আমাদের পাওনাটা জমা করে দিয়ে যাও—'

'কিসের পাওনা?...বকশিশ?' কথাটা হঠাৎ কালকাপ্রসাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই নিজের আহাম্মকি বুঝলেন, কিন্তু তখন আর উপায় কি? হাতের পাশা ও মুখের কথা বেরিয়ে গেলে আর ফেরে না!

'বকশিশ !' জমাদার সাহেবের মুখ কালবৈশাখীর আকাশের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, 'বকশিশ কে চায় তোমার মত সাহেবের পা-চাটা কুকুরের কাছ থেকে? আমরা কি ভিখ্-মাঙ্গা? আমরা চাইছি আমাদের পাওনা—আমাদের তহবিলের টাকাটা দিয়ে যাও।'

'তহবিল ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—তহবিল। আমাদের এখন ঢের টাকার দরকার। এখানে কানুন করা হয়েছে যা টাকা লোকে আদায় করে নিয়ে যাবে, তার সিকি এখানে জমা দিতে হবে। ঐ আমাদের খাজাঞ্চী বসে আছে—ঐখানে জমা করে দাও !'

পাশেই আর একজন সিপাহী দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'ছোড় দাও না জমাদার সাহেব—সাহেবের গদিতেই জমা হতে দাও, সবই তো আমরা পাব।'

'সে তখনকার কথা তখন হবে। এখন যা-কিছু আইন-মোতাবেক হওয়া চাই।'

এই বলে জমাদার সাহেব কালুকাপ্রসাদকে একটা ঠেলা মারলেন, 'যাও, ওখানে টাকাটা বুঝিয়ে দিয়ে এস। রসিদ চাও—রসিদও মিলবে। চোরা-কারবার নেই আমাদের এখানে।'

জমাদার সাহেব নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন।

শেষের ঘটনাটা একেবারে ফটকের কাছেই ঘটল বলে, কয়েক গজ দূরে শিরীষ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকলেও নানকচাঁদের চোখে ও কানে সবই গিয়েছিল। তিনি যেন এইটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আর দাঁড়ালেন না—দ্রুত সেখান থেকে সরে এসে একেবারে সরকারী সড়কে পড়লেন।

তাঁর নিজস্ব এক্কা সেখানেই অপেক্ষা করছিল, তিনি ইঙ্গিতে চালককে পেছনে সরিয়ে দিয়ে নিজেই লাগাম হাতে নিলেন এবং যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে উকিলপাড়ার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন।

বাড়ি ফাঁকা। সেই পূর্ব-বর্ণিত অর্ধবধির বৃদ্ধা দাসী ছাড়া কেউই ছিল না। স্ত্রী-পুত্রকন্যাকে বহু পূর্বেই সরিয়ে দিয়েছেন। দপ্তরের কাগজপত্র বাক্সে বন্ধ করে দেহাতে চালান করেছেন—কেরানীদেরও দু মাসের ছুটি দিয়েছেন। কেবল নিজেই এখনও মায়া কাটাতে পারেন নি। কিন্তু এবার আর দেরি করা সম্ভব নয়।

গাড়ি থেকে নেমে নানকচাঁদ বললেন, 'ইয়ার আলি, তুমি এখন ঘোড়া খুলে দাও। তুমিও খানাপিনা কর গে। একেবারে সন্ধ্যার সময় আসবে—আমাদের ফেরিঘাটে পৌঁছে দেবে। তার পর তোমারও ছুটি। ঘোড়া নিয়ে তুমি তোমার বাড়ি চলে যেও—খবর পাঠালে আবার আসবে।'

নানকচাঁদ দরজায় আঘাত করতেই বুড়ী রামলখিয়া দরজা খুলে দিল। নানকচাঁদ ভেতরে প্রবেশ করতে সংক্ষেপে শুধু বলল, 'লোক আছে ওপরে।'

'লোক ! এ সময়ে আবার কে লোক ?'

বুকটা ধড়াস করে উঠল নানকচাঁদের। এক পা পেছিয়েও গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'সর্দার খাঁ !'

তবু ভাল। আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েই রইল তাঁর। আর নয়—ওদের জন্যে ঢের করেছেন তিনি।

ওপরে উঠতে দেখা গেল সর্দার খাঁ অসহিষ্ণুভাবে তাঁর দপ্তরখানার শূন্য ঘরে

পায়চারি করছে। এই লোকটিকে দেখলে নানকচাঁদের শরীরের মধ্যে কেমন করে। এই দৈত্যের মত ভয়ঙ্কর লোকটা ভিন্ন কি আর আমিনা বেগম দূত খুঁজে পায় না।

'কী খবর সর্দার খাঁ?' কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম করেই প্রশ্ন করেন নানকচাঁদ।

ভূমিকা করা সর্দার খাঁর অভ্যাস নয়। সে সোজাসুজি উত্তর দিল, 'মালেকান আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন—সন্ধ্যার সময়। ঐ দরজায় বুড়ীকে রাখবেন।'

'তাঁকে কষ্ট করতে বারণ ক'র—এখন কিছুদিন আর আমার দেখা পাবেন না।'

'জরুরী দরকার তাঁর।'

'তা হোক, আমার দরকার আমার কাছে সব চেয়ে জরুরী।'

'তা হলে কাল?'

'আর কোন দিনই নয়। তুমি মহাভারত পড় নি—নইলে বলতুম, আজ থেকে আমার অজ্ঞাত-পর্ব শুরু!'

'মানে?'

'মানে আমি আজই এখান থেকে পালাচ্ছি। হাঙ্গামা না মিটলে আর ফিরব না।'

'কোথায় যাবেন?'

'ঐটি বলতে পারব না বাপু, মাপ কর।'

'মালেকান আন্দাজ করেছেন যে, আপনি এবার ভয় পাবেন। সেই জন্যেই তিনি আসছিলেন। আপনার কোন ভয় নেই—আপনার ওপর তাঁর নজর থাকবে।'

'ওরে বাবা, তাঁর নিজের ওপর নজর রাখতে ব'ল। ঝড় উঠলে তিনিই বা কোথায় থাকবেন, আর তুমিই বা কোথায় থাকবে—কেউ কি বলতে পারে? না, সে ভরসা আমার নেই!'

'আপনি নানাসাহেবের মুনশীর কাজ করবেন—তা হলে সকল দিক রক্ষা হয়।'

'না, আমি শুধু কটা মাস এখন চুপ করে বসে আরাম করব আর তামাক খাব।...বুঝেছ?...বেগমসাহেবাকে ব'ল, তাঁর যখন দরকার পড়বে, আমি নিজেই গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াব—কোন ভয় নেই।'

'মালেকান বলে দিয়েছেন যে, যদি কোনমতেই আপনি এখানে থাকতে রাজী না হন তো আপনার কোন একটা ঠিকানা দিয়ে রাখতে—যেখানে অন্তত খৎ পাঠালে আপনি পাবেন। সে ঠিকানা আমি আর তিনি ছাড়া কেউ কোন দিন জানবে না—খোদা কসম।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

গলাটা অকারণে নামিয়ে নানকচাঁদ বললেন, 'গঙ্গার ওপারে বদরুকা বলে একটা গ্রাম আছে। সেখানে কায়েত ধর্মদাসের বাড়িতে খৎ পাঠালে সে আমাকে সেই দিনই পাঠাতে পারবে। বুঝেছ?'

'জী। আদাব।'

সর্দার খাঁ সেলাম করে চলে গেল। অতবড় দেহ, কিন্তু লোকটা চলে যেন নিঃশব্দে—কতকটা বেড়ালের মত।...

নানকচাঁদ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে অপসৃয়মাণ ওর মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইলেন। একটু পরে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠেই ডাকলেন, 'রামলখিয়া!'

বুড়ী নীচের দরজা বন্ধ করে সামনে এসে দাঁড়াল।

'আমরা আজই এখান থেকে চলে যাব। তোমার যা দামী জিনিস গুছিয়ে নাও। মাল বেশি নেওয়া চলবে না।'

'কোথায় যাবে বাবুজী?'

'আপাতত বদরুকা। তেমন বুঝলে আরও দূরে দেহাতে কোথাও।'

'বদরুকা? সেখানে কে আছে?'

'কায়েত ধর্মদাসকে মনে আছে? তোমার নানীর কে হয়!'

'ও—হ্যাঁ। এই গত মাসেও তো টাকা ধার করতে এসেছিল।'

'হ্যাঁ, এখন দরকার হবে বুঝেই তাকে টাকা ধার দিয়েছিলুম। নইলে তার কী আছে—কী দেখে অতগুলো টাকা ধার দেব?...ওর বাড়িতে থাকাই সুবিধে। দেহাতকে দেহাত—অথচ মনে করলেই এখানে আসা যাবে।...ওর যথাসর্বস্ব তমসুক করা—তা না হলে আমাকে রাখতে রাজী হ'ত না।'

'কিন্তু লোকটা বিপদে পড়বে না তো?'

'বোধ হয় না। সে রকম বুঝলে সরে পড়ব।'

রামলখিয়ার স্তিমিত দৃষ্টিতে প্রশংসার জ্যোতি ফুটে উঠল। সে যেদিন প্রথম এ-বাড়ি এসেছে, তখন এই বর্তমান মনিবের বয়স মাত্র আট বছর। সেদিন থেকে আজও সে ওর বুদ্ধির তল পায় না। কত আগে থেকে ভেবে কাজ করে—আশ্চর্য!...

নানকচাঁদ নিজের ঘরে গিয়ে লেখবার বাক্স থেকে গোটা-দুই খেরোবাঁধানো খাতা বের করে সযত্নে একটা কাপড়ে মুড়ে নিলেন। লেখাপড়া করেই খেতে হবে যখন, তখন এগুলো ফেলে গেলে চলবে না।

আরও কিছু কাগজপত্র গোছগাছ করে একটা ভারী পুঁটুলি বাঁধা হ'ল। তার পর কাজ শেষ করে নানকচাঁদ একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বাইরে তখন বাতাসে অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। ঝাঁ-ঝাঁ করছে জ্যৈষ্ঠের দ্বিপ্রহর। তারই মধ্যে যেন দূরে কোথায় একটা হল্লা চলছে। সেদিকে কান পেতে থাকতে থাকতে নানকচাঁদ অস্ফুট কণ্ঠে নিজেকে প্রশ্ন করলেন, "সত্যিই কি আংরেজশাহি যাবে? নানাই মালিক হবে? হিন্দু না মুসলমান? বাহাদুর শাহ? আবার সেই ঝগড়া? কে জানে!"

॥ ২৭ ॥

সেদিন যে সন্ধ্যার পর থেকে শ্মশানঘাটের পাশে একটি একটি করে তিন-চারটি বজরা নৌকো এসে পরস্পরের সঙ্গে ভিড়েছিল, সে ঘটনাটাতে বিশেষ কোন অর্থ কেউ আরোপ করে নি। কারণ গরমের সময় অনেকেই সন্ধ্যার দিকে নৌকো করে হাওয়া খেতে বের হয়। তার পর বন্ধু-বান্ধবদের নৌকো এক জায়গায় জড়ো করে গান-বাজনা তো বটেই, এমন কি তার কোন একটায় উঠে খোশ-গল্প করাও নতুন নয়। সুতরাং বিস্মিত হবার কোন কারণ ছিল না—অনুসন্ধিৎসু হওয়ারও না।

এই নৌকোগুলোর মাঝের বড় বজরাটিতে একটা বড় ফরাশ পড়েছে—শরবত

এবং পান তামাকেরও আয়োজন প্রস্তুত। তবে নাচ-গানের কোন আয়োজন নেই। সেটা পাশের একটা মাঝারি বজরার ছাদে ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা বেসুরো সারেঙ্-তার সঙ্গে ঢপঢপে তবলা—গাইয়েও জরাজীর্ণ একটি বৃদ্ধ, সম্ভবত এই তিন জন ছাড়া ওদের শ্রোতাও কেউ নেই। বস্তুত আয়োজনটা গান-বাজনা শোনবার জন্যও নয়। ওটা নিতান্তই আসল উদ্দেশ্যটাকে চাপা দেওয়ার একটা ছদ্মাবরণ মাত্র।

মাঝের নৌকোটাতে যাঁরা জড়ো হয়েছিলেন তাঁদের বৈঠক তখনও শুরু হয় নি, তাঁরা নিশ্চয়ই অপর কারও জন্য অপেক্ষা করছিলেন। প্রায় নির্বাক হয়েই বসেছিলেন তাঁরা ; সম্ভবত পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার আর প্রয়োজনও ছিল না তাঁদের—নিজেদের মধ্যে আলোচনা শেষ হয়ে গেছে, এখন অপর পক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার।

এঁরা সকলে সমবেত হবার বেশ কয়েকদণ্ড পরে প্রায় নিঃশব্দে তিনটি ডুলি এসে নামল ঘাটের ধারে। নিঃশব্দে হলেও বজরার ছাদে যে মাঝিটি বসে ঘাটের দিকে চেয়ে ছিল—তার দৃষ্টি এড়ায় নি। সে ঘরের ভেতর মুখ বাড়িয়ে অনুচ্চকণ্ঠে শুধু বলল, 'এসে গিয়েছেন ওঁরা।' তারপর একটা ডিঙ্গি খুলে শুধু মাত্র 'লগি'র সাহায্যে পারে এসে পেঁছিল।

পার থেকে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন হল, 'কে ?'

'বাবা বিশ্বনাথের সেবক !'

নিশ্চিন্ত হয়ে তিনজনেই ডিঙ্গিতে উঠলেন। ডিঙ্গি আবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাঁধা বজরাগুলির সঙ্গে এসে লাগল। আগন্তুকরা নামলেন, সেই ডিঙ্গিতেই মাঝিমাল্লারা পার হয়ে গেল। সম্ভবত সেই রকমই হুকুম ছিল, আলোচনার সময় অপর কারও থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কেবল সেই মাঝারি বজরাটার ছাদে বসে বৃদ্ধ গায়কটি শ্লেষ্মাধরা গলায় প্রাণপণে গেয়েই যেতে লাগল। তাদের কানে কোন কথা পেঁছিনো সম্ভব নয়—তারা নিজেদের শব্দেই পরিপূর্ণ। অনেক মাথা ঘামিয়ে এদের সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গরমের দিনে রাত্রিবেলা ভাল গান-বাজনার আভাস পেলে এর গায়ে অবাঞ্ছিত অপর নৌকোর এসে ভেড়াও আশ্চর্য নয় যে।

নৌকো থেকে বজরায় এসে নামলেন তিনজন,—নানাসাহেব, নানার ভাই বালাসাহেব এবং আজিমুল্লা। নানার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হয় তিনি খুব স্বেচ্ছাসুখে আসেন নি—কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করছেন। তিনি ভেতরে এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। সবই পরিচিত মুখ—বিশেষ পরিচিত—সুবাদার টীকা সিং, নানার নিজস্ব মোসাহেব জোয়ালাপ্রসাদ, ঘোড়াওয়ালা মদদ আলি—এককালে নানারই কর্মচারী ছিল, এখন স্বাধীন ব্যবসা করে, জমাদার শামসুদ্দীন খাঁ—এরা প্রায় সকলেই অন্তরঙ্গ শ্রেণীতে পড়ে, তবু অস্বস্তি ঘোচে কৈ ?

নানা ভেতরে ঢুকতেই সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। নানাসাহেব নিজে বসে ইঙ্গিতে সকলকে বসতে বললেন। তার পর মুখে একটা কৃত্রিম প্রসন্নতা টেনে এনে বললেন, 'তার পর টীকা সিং, কী খবর বল ? আজকের এ জরুরী তলব কেন ?'

টীকা সিং জিভ কেটে বলল, 'ছিঃ পেশোয়াজী। আপনাকে আমরা তলব করতে পারি ! আমরা হলুম আপনার বান্দার বান্দা।...বিশেষ প্রয়োজনেই—'

'সেই প্রয়োজনটাই তো শুনতে চাইছি।'

'পেশোয়াজী, ভারতের সিংহাসন আপনার দোরে এসে ফিরে যাচ্ছে। সৌভাগ্য বরাবর আসে না মানুষের কাছে—মনে রাখবেন।'

নানাসাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'কেন—কেন? আমি কী করলাম? তোমাদের সময় হলেই—'

'আপনি ইংরেজদের অভয় দিয়েছেন, আপনার সিপাইরা তোশাখানা পাহারা দিচ্ছে—এর দ্বারা কি বোঝায় বলুন!—সিপাইরা আপনার মনের ভাব বুঝতে পারছে না ঠিক।'

নানা আরও ব্যস্ত হলেন। বললেন, 'কিন্তু সে কি তোমাদেরই কাজ এগিয়ে রাখছি না?'

'কেমন করে বুঝব বলুন? আপনি তাদের কাছে তাদের মত বলছেন—আমাদের কাছে আমাদের মত বলছেন। কোনটা আপনার মনের কথা আমরা কেউই বুঝছি না। মাফ করবেন পেশোয়াজী, আমরা জঙ্গী লোক, রেখে-ঢেকে মিষ্টি করে কথা বলতে শিখি নি। সিপাইরা আপনার সম্বন্ধে রীতিমত সন্দিগ্ধ। তারা বলছে—আমরা এগিয়ে যাব, পেশোয়াজী যদি ভরা-তরী ডোবান।'

'তারা কী প্রমাণ চায়?'

'আপনি একটা খৎ লিখে সই করে দিন যে, আপনি সিপাইদের নেতা হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করবেন!'

'নেতা তো বাদশা! বাহাদুর শাহ আজও জীবিত।'

'তা হলে আমরা তাঁর কাছেই যাব কি পেশোয়া? এই আপনার শেষ জবাব? আপনার পূর্বপুরুষের তখ্‌ত্ আপনি ফিরিয়ে দিচ্ছেন?'

'কেন—কেন, তাতে কি এই বোঝায়?'

'হ্যাঁ, তা বোঝায় বৈকি পেশোয়া। বিনাশ্রমে আপনি পুরো সুবিধেটা করবেন—তা হবে না।'

ধুন্ধুপন্থ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। খানিক পরে বললেন, 'বিহার এখনও চুপচাপ। কুঁয়ার সিং তার মকদ্দমার ফলাফল জানবার জন্য অপেক্ষা করছেন—এখনও তাঁর টেলার সাহেবের ওপর ভরসা। এ অবস্থায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়া কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে?'

'বিহারও আমাদের কথা বলছে। আমরাও যদি তাই বলি, তা হলে, কোন দিনই কোন কাজ হবে না। মীরাটে দিল্লীতে শুরু হয়ে গেছে—এখন আর বসে থাকবার উপায় নেই পেশোয়া ধুন্ধুপন্থ। সিংহকে খোঁচা দিয়ে তার সামনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যায় না। তাকে না মারলে সে-ই আপনাকে মারবে।...না, সময় আর নেই। চারদিকে গোলমাল বেধেছে—খবর সব পাচ্ছে ওরা। সতর্ক হতেও শুরু করেছে। প্রস্তুত হতে সময় পাবার আগেই ওদের শেষ করতে হবে। চারিদিকে ছড়িয়ে থাকতে থাকতেই বিষ-দাঁত ভেঙে দিতে হবে—জড়ো হতে দিলে চলবে না। আমরা আপনার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারব না।'

আবারও একটা স্তব্ধতা নেমে এল। নানাসাহেব হাতের মুক্তোর আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন। চোখের সামনে ভেসে ওঠে পেশোয়ার সিংহাসন—পেশোয়ার রাজসভা—দেশ-বিদেশ থেকে দূত আসত সে সভায়, পেশোয়াদের ভ্রূকুটিতে সারা ভারত—এমন কি ইরাক, ইরান, তুর্কীস্থান অবধি কাঁপত

একদিন। খুব বেশী দিনের কথা নয়—পৌরাণিক যুগের কথা তো নয়ই। হয়তো আজও সে দিন ফিরিয়ে আনা যায়—

এতক্ষণ টীকা সিং এবং নানাসাহেবই কথা বলছিলেন। এবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন স্বয়ং আজিমুল্লা। বললেন, 'অপেক্ষা করতে পারবেন না তো কী করবেন?' •

কণ্ঠে যেন একটু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গেরই সুর।

নানাসাহেবের দিবাস্বপ্ন ছুটে গেল। তিনি উৎসুকভাবে তাকালেন টীকা সিংএর দিকে।

টীকা সিং প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'তা হলে আমাদের শত্রু বলেই গণ্য হবেন নানাসাহেব। কারণ উনি আমাদের আনুকূল্যে যখন করলেন না, তখন ওঁর পক্ষে একটা দিকই খোলা রইল—ইংরেজের সহায়তা করা। সে দিকটা অন্তত আমাদের বন্ধ করতে হবে বৈকি।'

উৎকণ্ঠিতভাবে নানাসাহেব বললেন, 'কি মুস্কিল, এসব কথা উঠছে কেন! সিপাইদের আমি জবান দিয়েছি আমি তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করব। সে জবানের দাম নেই? এইমাত্র টীকা সিং আমাকে পেশোয়া বলেই সম্বোধন করছিলে না? তা হলে আর অবিশ্বাস করছ কেন? আমি রাজা তায় ব্রাহ্মণ।'

টীকা সিং নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠছে না। কিন্তু সিপাহীরা আপনার দস্তখত ছাড়া মানতে চাইছে না।'

'বেশ দাও, কোথায় কি সই করতে হবে—করে দিচ্ছি।'

টীকা সিং ইঙ্গিত করতেই শামসুদ্দীন খাঁ জেব-এর ভেতর থেকে একটি কাগজ বার করে দিল। নানাসাহেব কাগজখানা হাতে নিয়ে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতেই হেঁট হয়ে পড়লেন। উর্দুতে লেখা একটা ইস্তাহারের মত। তাতে পেশোয়া নানা ধুন্ধুপন্থ বেইমান ইংরেজদের তাড়িয়ে দেশকে আবার স্বাধীন করবার জন্য সিপাহীদের আহ্বান জানাচ্ছেন। সহজ ও সরল, অনাড়ম্বর ভাষা—কিন্তু নানাকে চিরকালের মত জড়িয়ে ফেলবার পক্ষে যথেষ্ট।

পড়া শেষ হয়ে গেলেও নানা বহুক্ষণ সেই দিকে চোখ মেলে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন। ভাবছেন, অত্যন্ত দ্রুত ভাবছেন তিনি। কারণ, সময় নেই। হ্যাঁ কি না—এক মুহূর্তের মধ্যে ঠিক করতে হবে।...ইংরেজদের তিনি এই গত কয়েক বছরে ভাল করেই চিনেছেন। শত্রু হিসেবে ওরা উপেক্ষণীয় নয় আদৌ।...শেষে কি সর্ব যাবে? ওদের প্রতিহিংসাও যে সাংঘাতিক।

অথচ স্বর্ণ-নির্মিত মণি-মাণিক্যখচিত পিতৃপিতামহের সিংহাসন।

আজিমুল্লা একটি মস্যাধার এবং কলমদান এগিয়ে দিলেন হাতের কাছে—যেন নানাসাহেবেরই ইঙ্গিতে।

নানা ধুন্ধুপন্থ একবার অসহায়ভাবে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাইলেন। স্থির পাষাণের মতই অবিচল সেসব মুখ—কঠিন, নির্মম। কারও কাছ থেকে এতটুকু দয়ামায়া পাবার সম্ভাবনা নেই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধুন্ধুপন্থ কলম টেনে দোয়াতে ডোবালেন এবং দস্তখত করে দিলেন। দস্তখত করতে করতে তাঁর সারা দেহ যে একবার শিউরে উঠল, তা আর কেউ না দেখুক আজিমুল্লা ঠিকই লক্ষ্য করলেন। তিনি টীকা সিংএর মুখের দিকে তাকালেন। টীকা সিংএর অধরোষ্ঠে অতি ক্ষীণ একটা হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

নানা সই-করা কাগজখানা টীকা সিংএর দিকে বাড়িয়ে ধরে কতকটা বাহাদুরির সুরেই বললেন, 'নাও, এবার হল তো? আর অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই আশা করি?'

টীকা সিং কাগজখানা দু'হাতে গ্রহণ করে মাথায় ঠেকাল। বলল, 'বান্দার অপরাধ নেবেন না। আমি নিরুপায়।'

নানাসাহেব একেবারে উঠে দাঁড়ালেন।

'তা হলে আমার ছুটি? চল আজিমুল্লা!'

একসঙ্গে ডুলিতে উঠলেও তিনজনে একসঙ্গে ফিরলেন না। আজিমুল্লার ডুলি অন্য নানাপথ ঘুরে একসময় বড় পীরের দরগায় এসে থামল। ডুলিগুলোর বিভিন্ন পথেই আসবার কথা—কারণ একত্রে গেলে লোকে সন্দেহ করবে। সতর্কতার কারণেই ডুলিরও ব্যবস্থা—নইলে গাড়ি-ঘোড়া তো ছিলই।

দরগা তখন একেবারেই জনশূন্য। পরবের দিন নয়, ঈদের পরব বহুকাল মিটে গেছে—এ সময় কারুর থাকবার কথাও নয়। তবু, হয়তো অন্য কোন ইঙ্গিতেই, এমন কি ভৃত্যদেরও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাতিগুলোরও অধিকাংশই নিভোনো।

আজিমুল্লা দরগার প্রাঙ্গণে উঠে কিন্তু সেদিকে গেলেন না। একবার মাত্র হাতটা টুপিতে ঠেকিয়ে পীর সাহেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে নিয়েই সেই আবছা আলোতে পথ দেখে দেখে চললেন উঠোনের ওদিকে—পরবের দিনে যাত্রীদের থাকবার যেসব ঘর আছে সেই দিকে।

একটি ঘরের বাইরে অন্ধকারে ঘনীভূত আঁধারের মতই দাঁড়িয়ে ছিল সর্দার খাঁ। আজও, এতদিন ধরে দেখতে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও, আজিমুল্লা একটু চমকে উঠলেন। সর্দার খাঁ অন্ধকারে সে চমক লক্ষ্য করল না—করলেও বিস্মিত বা ক্রুদ্ধ হ'ত কিনা সন্দেহ। সে যেমন নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি নিঃশব্দে ঘরের ভেতর দিকটা দেখিয়ে দিল।

আজিমুল্লা ভেতরে ঢুকে দেখলেন—আমিনা পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহীর মতই অস্থিরভাবে সেই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে পায়চারি করছে। সামান্য চেরাগের আলো—কিন্তু তাতেই তার মুখের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ধরা পড়ে।

আজিমুল্লার পায়ের শব্দে থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'খবর?'

'ভাল। সই করেছে।'

'সে কাগজ কোথায়?'

'টীকা সিংএর কাছে।'...

'নানা বোঝে নি কিছু?'

'কিছু না। অভিনয় নিখুঁত! আমি টুঁ শব্দটি করি নি। যা বলেছে, টীকা সিংই বলেছে। অবশ্য সে আপনারই শেখানো কথা—মোদ্দা বলেছে ভাল।'

আমিনার মুখের ভ্রূকুটি অনেকটা সরল হ'ল। সে একটা ছোট্ট নিশ্বাস—বোধ করি স্বস্তিরই—ফেলে বলল, 'কবে নাগাদ শুরু করতে পারবেন আপনারা?'

'ঠিক বলা যাচ্ছে না। সিপাইদের মনোভাব বোঝা কঠিন। ক্ষেপে উঠল তো ক্ষেপেই উঠল—নইলে নয়। তবে তিন-চার দিনের মধ্যে আরম্ভ না করলে মুশকিল হবে। এখন যারা তেতেছে—তারা হয়তো আবার জুড়িয়ে যাবে।'

'তিন-চার দিন !', কতকটা উদ্বিগ্ন ভাবেই বলে আমিনা, 'সে যে বহুত দেরি ! এখনও নানার ওপর কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই…ও'কে চিনি তো, আবার যে কী করবেন—'

'একটু নজর রাখুন—উপায় কি ?'

'মুস্কিল হয়েছে যে সেখানেই ! নানাসাহেব আমার ওপর নজর রাখতে শুরু করেছেন।…আচ্ছা দেখি—যাই এখন।'

আমিনা দুয়ারের দিকে দু'পা অগ্রসর হ'ল।

মনে হ'ল আজিমুল্লা আরও কিছু বলবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বললেন না—একটা অভিবাদনের ভঙ্গি করে পথ ছেড়ে দিলেন। আমিনা বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার পর নিজেও গিয়ে ডুলিতে উঠলেন।

তাড়া তাঁর নিজেরও বড় কম নেই—এ কথাটা হুসেনী বেগম কবে বুঝবে !

॥ ২৮ ॥

নানাসাহেব প্রাসাদে ফিরে সোজা নিজের ঘরে চলে গেলেন। এই মুহূর্তে তাঁর একটু নির্জনে থাকা দরকার। কারও সঙ্গ আর তাঁর ভাল লাগছে না।

'হাতের পাশা আর মুখের কথা' একবার বার হয়ে গেলে আর ফেরে না—এ সত্য তিনি ভাল রকমই জানেন। তাই পাশাটা অত তাড়াতাড়ি ফেলবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু—না, সব গোলমাল হয়ে গেল।

নানাসাহেব স্থির হয়ে বসতেও পারলেন না।

তিনি নির্বোধ নন। সারা ভারতের খবর সংগ্রহের জন্য তিনি মুঠো মুঠো টাকা খরচ করছেন। আজিমুল্লা ও তাত্যা ভাবে যে, কেবলমাত্র তাদের বুদ্ধির ওপর ভর দিয়েই নানা চলেন। কিন্তু তা আদৌ সত্য নয়। এমন কি, তাদের ওপর খুব বেশী নির্ভর করবার কারণ আছে বলেও তিনি মনে করেন না। তবে সে সব পরের কথা—এখন তাদেরও খানিকটা দরকার বৈকি।

দিল্লী, মীরাট, আম্বালা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, ফতেপুর—হয়তো বা কাশী, এলাহাবাদ, কিন্তু এইটুকু জায়গাই তামাম হিন্দুস্তান নয়। বাংলা দেশ একেবারে ঠাণ্ডা। বিহার এখনও অনিশ্চিত। শিখ বা রাজপুতদের ওপর কোন ভরসাই নেই। এক তাঁর নামে মারাঠীরা ছুটে আসবে—তাও কি সকলে আসবে ? হোলকার, গায়কোয়াড়, সিন্ধিয়া—তাঁর বংশের পুরাতন শত্রুরা ?

কে জানে ? কেমন যেন মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে !

বড় সাংঘাতিক শত্রু ইংরেজরা। বড় সর্বনেশে শত্রু !

দীর্ঘদিন ইংরেজদের সংস্পর্শে থেকে ওদের উনি ভাল করেই চিনেছেন। ওরা একটু ভুল করেছে—ভারতীয়দের মানুষ বলেই গণ্য করে নি। সেই ভুলের মূল্যস্বরূপ প্রথমটায় হয়তো একটু অসুবিধায় পড়বে।…কিন্তু শেষ পর্যন্ত ?

শেষের কথাটাই ভাবছেন নানাসাহেব।…শেষরক্ষা হবে কি ?

নানা অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁকে এই দুঃসময়ে ঠিক সৎ পরামর্শ দিতে পারে, এমন একজনও নেই। তাঁর যারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তারা শুধু উত্তেজিতই করছে।—নানার নিজেরও উত্তেজনার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। হৃদয় তো অহোরাত্রই বলছে—ঝাঁপিয়ে পড়।—কিন্তু বুদ্ধি বলছে—আর একটু ভেবে দেখ, এখনও সময় আছে।…

অবশেষে একসময় নানা মন স্থির করলেন।

কার্পেট-মোড়া ঘরের মেঝে—তবু সাবধানে পা টিপে টিপে, দরজার কাছে গেলেন। কপাটটা নিজের হাতে বন্ধ করে দিলেন ভেতর থেকে। তার পর তাঁর জন্যেই বিলেত-থেকে-নিয়ে-আসা সেক্রেটেরিয়ার টেবিলটার সামনে এসে বসলেন। কাগজ ও কলম বাইরেই ছিল, টেনে নিয়ে খস খস করে এক দীর্ঘ চিঠি লিখলেন।

চিঠি লিখলেন তিনি হুইলার সাহেবকে।

সে চিঠির মর্মার্থ এই :

জেনারেল হুইলার অবশ্যই অবগত আছেন—এতদিনে এ বিষয়ে তাঁর অবহিত হওয়াও উচিত যে, দেশের চারিদিকেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। এদেশী সিপাহীরা বহুদিন ধরেই কোম্পানির ব্যবহারে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিল—এখন তাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। এই সিপাহীদের সংখ্যা নগণ্য নয়—তাও জেনারেল সাহেবের জানা উচিত। সিপাহীরা একা নয়, তাদের পেছনে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন রাজশক্তিও আছেন। কারণ এদেশী রাজন্য-বর্গেরও কোম্পানির ওপর প্রসন্ন থাকবার কোন কারণ নেই। এখন সে বিদ্রোহের ঢেউ কানপুরেও পৌঁচেছে। সিপাহীরা তাদের নেতৃত্ব করবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই মহামান্য পেশোয়ার শরণাপন্ন হয়েছে। নানাসাহেবের সে নেতৃত্ব করার অর্থ সমগ্র মারাঠা জাতির এই বিদ্রোহে যোগ দেওয়া। এক কথায় হিমাচল থেকে মহারাষ্ট্র—এমন কি সুদূর মহীশূর পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে একযোগে মাথা তুলবে। সে শক্তির সামনে হুইলার সাহেবের মুষ্টিমেয় স্বদেশবাসী কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবেন—তা তাঁর মত প্রবীণ ও বিচক্ষণ সেনাপতির অনুমান করা কঠিন নয়। নানা ধুন্ধুপন্থের প্রতি কোম্পানি চরম অবিচার করেছেন—ধর্মত এবং ন্যায়ত যেটা তাঁর প্রাপ্য, সেটা থেকে বঞ্চিত করেছেন। সেক্ষেত্রে নানাসাহেবের আগেই এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। নানাসাহেব একে বিদ্রোহ বলে স্বীকার করতে রাজী নন, হিন্দুস্থানের মুঘল বাদশার এবং পেশোয়াদের বিরুদ্ধেই কোম্পানি বরং বার বার বিদ্রোহাচরণ করেছেন। এই সাম্রাজ্য গ্রহণ ও পরিচালনায় তাঁদের কোন ন্যায়সঙ্গত দাবি নেই। যাই হোক, জেনারেল সাহেব ও কমিশনার সাহেবের ব্যক্তিগত সখ্য এবং ভদ্র ব্যবহারের কথা স্মরণ করেই এখনও তিনি ইতস্তত করছেন। এবং সেই পুরাতন বন্ধুত্বের খাতিরেই তিনি সাহেবদের তথা কোম্পানিকে একটি শেষ সুযোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। নানাসাহেব নিজের সিংহাসনও চান না। পৈতৃক সামান্য পেনশনের ওপর তাঁর ন্যায্য দাবি যদি কোম্পানি মেনে নিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে নানাসাহেব যে কেবল এই যুদ্ধে সিপাহীদের দিকে যোগ দেবেন না তা নয়—সর্বপ্রযত্নে তিনি কোম্পানির সহায়তা করবেন এবং সমগ্র মারাঠাশক্তি সংহত করে ইংরেজদের এই ঘোর বিপদে রক্ষা করবারও দায়িত্ব নেবেন। এই চিঠি হুইলার সাহেবের হস্তগত হবার পর চারপ্রহরকাল তিনি উত্তরের অপেক্ষা করে নিজের কর্তব্য স্থির করবেন এবং কোন উত্তর না পেলে বা তাঁর প্রস্তাবের প্রতিকূল উত্তর পেলে তাঁদের নিরাপত্তার জন্যও দায়ী থাকবেন না।...

দীর্ঘ চিঠি—কিন্তু লিখতে বেশীক্ষণ সময় লাগল না। লেখা শেষ করে এক বার আদ্যোপান্ত চিঠিখানা পড়ে নিলেন—তারপর তা সযত্নে ভাঁজ করে সাবধানে সীলমোহর লাগালেন।

রাত্রি গভীর হয়েছে। প্রাসাদের ভেতর কোন শব্দ নেই। দূরে আস্তাবল থেকে মধ্যে মধ্যে শুধু ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ এবং হ্রেষা শোনা যাচ্ছে। সেই সামান্য শব্দই চারিদিকের শান্ত নিস্তব্ধতায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ভয়াবহ শোনাচ্ছে।

তবু নানাসাহেব সন্তর্পণেই দরজা খুলে ঘরের বাইরে দালানে এসে দাঁড়ালেন। গরমের দিন—সকলেই সম্ভবত ছাদে বা খোলা জায়গায় খাটিয়া বিছিয়েছে, কিন্তু শুয়ে পড়লেও এত গরমে সহজে ঘুম আসে না। অনেক সময় লোকে চুপ করে পড়ে থাকে মাত্র।

নানাসাহেব জুতো খুলে ফেললেন। নগ্নপদেই দালান অতিক্রম করে একেবারে একপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র জানালার কাছে এসে চাপা গলায় ডাকলেন, 'মংগরকর!'

তেমনি চাপা গলায় জবাব এল, 'জী।'

মংগরকরও একেবারে নিঃশব্দে, এক অপূর্ব কৌশলে সেই গবাক্ষপথেই ভেতরে এসে প্রণাম করে দাঁড়াল।

নানাসাহেব আংরাখার মধ্যে থেকে লেফাফাখানি বার করে তার হাতে দিলেন এবং বললেন, 'এখনই এটা হুইলার সাহেবের বাংলোতে গিয়ে তাঁর হাতে দিয়ে এস। যদি ঘুমিয়ে থাকেন, তাঁর আর্দালীকে ব'ল যে খুব জরুরী চিঠি—এখনই এটা তাঁর পাওয়া দরকার। যাই হোক, সাহেবের নিজের হাতে ছাড়া কাউকে দিও না। দরকার হয় তো ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা ক'র। কিন্তু খুব সাবধান, এ চিঠি আর কারুর হাতে না পড়ে—বা কেউ না জানতে পারে। যদি তা হয়, তা হলে তোমার গর্দান যাবে। আর যদি চুপি চুপি কাজ হাসিল করে আসতে পার তো মোটা বকশিশ পাবে। যাও। তোমাকে কানপুর শহরে খানিকটা জমি দিয়ে দেব—বুঝলে?'

মংগরকর নিঃশব্দে শুধু মাথা হেলিয়ে জানিয়ে দিল যে, কথাটা তার বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় নি। তার পর আবারও যুক্তকরে প্রণাম করে তেমনিই আশ্চর্য কৌশলে সেই গবাক্ষপথে বাইরের অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

এবার নানাসাহেব কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন। পকেট থেকে উপহার-পাওয়া একখানা বিলিতী রুমাল বার করে কপাল ও গলার ঘাম মুছে ঘরে ফিরে এলেন।

নানা ধুন্ধুপন্থ সাধারণত বাইরে ঘুমোন না। ঠিক সাহস করেন না হয়তো। তা ছাড়া অধিকাংশ দিনই কাটে তাঁর কোন-না-কোন উপপত্নীর ঘরে। সেখানে টানাপাখার আয়োজন আছে—বিশেষ অসুবিধা হয় না।

কিন্তু আজ এত রাত্রে আদালা বা হুসেনী বা আর কারও ঘরেই যেতে ইচ্ছে হ'ল না। সকলেই রাজনীতি আলোচনা করতে বসবে। এখন তাঁর মনের ভাবটা ঠিক আলোচনা করবার মত নয়।

নানা নিজেই ঘরের কপাটে খিল লাগালেন। তার পর নদীর দিকের শিক লাগানো জানালাটা ভাল করে খুলে দিয়ে 'শিবশঙ্কর' ও 'গণপতি মহারাজ'কে স্মরণ করতে করতে এ ঘরেই বহুদিনের অব্যবহৃত বিছানাটাতে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে সহজে তাঁর চোখে ঘুম এল না। দূরে কম্পমান দীপশিখাটার দিকে অতন্দ্রনেত্রে চেয়ে চেয়ে প্রায় শেষ রাত্রি পর্যন্ত আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

॥ ২৯ ॥

মংগরকর দারুণ চমকে উঠল। সে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এসেছে—বিড়ালের মতই শব্দহীন পায়ে, কিন্তু তার চেয়েও নিঃশব্দে এবং মার্জার-গতিতে আর একজন কেউ তাকে অনুসরণ করছে। সে কিছুই বুঝতে পারে নি এতক্ষণ—এখনও হয়তো পারত না, যদি না এইমাত্র যে সংকীর্ণতর বাঁকটা পার হয়ে এল, সেটা পার হবার সময় অনুসরণকারীর গায়ের জামাটা দেওয়ালে ঘষে যেত। সম্ভবত সে লোকটা বেশী বলিষ্ঠ—তাই অত সুঁড়ি পথে দু দিকের দেওয়াল বাঁচিয়ে আসতে পারে না। সামান্যই একটু শব্দ হয়েছে, কিন্তু হুঁশিয়ার মারাঠীর পক্ষে তাই যথেষ্ট।

সে কিছুক্ষণ প্রায় নিঃশ্বাস রোধ করে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

লোকটা একেবারে কাছে এসে পড়েছে—নিঃশ্বাসের শব্দ, যত মৃদুই হোক, শোনা যাচ্ছে বৈকি! তবে সেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

ভয়ে মংগরকরের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

সে পেছনে—সে দিব্যি মংগরকরকে লক্ষ্য করছে—মংগরকরের সে উপায় নেই। হয়তো কোন হাতিয়ার আছে ওর কাছে। হয়তো কেন—নিশ্চয়ই আছে।...মতলব কী ওর?...

অতি ধীরে ধীরে মংগরকর পেছনের দিকে ঘাড়টা ঘোরাল। নীরন্ধ্র অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হয় না। দু দিকে নিরেট দেওয়াল—পেছন দিক থেকেও কোন আলো আসবার সম্ভাবনা নেই, কারণ এইমাত্র একটা বাঁকের মুখ ঘুরেছে—সামনে আর একটা বাঁক।

মরীয়া হয়ে পড়লে অনেক সময় মানুষের বুদ্ধিও খোলে। মংগরকরের মনে পড়ল—সামনের বাঁকটা ঘুরতে পারলেই সামনে খোলা জায়গা পড়বে। আর কোন আলো না থাক, নক্ষত্রের আলো তো আছেই। এত অন্ধকারের পর সেটুকু পেলেও অনেকখানি দেখা যাবে—

যেমন ভাবা প্রায় তেমনি কাজ। এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার পর অকস্মাৎ বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হল মংগরকর, কিন্তু যে লোকটা পেছনে আসছিল বোধ করি তাব গতিই শুধু বেড়ালের মত নয়—দৃষ্টিও। সে এতক্ষণ ধরে স্পষ্টই দেখেছে অগ্রবর্তীকে, কেন না বাঁকের মোড়টা ঘোরবার সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে লোহার মত কঠিন ও হাতীর থাবার মত ভারী একখানা হাত কাঁধের ওপর এসে পড়ল এবং আর একটা হাত বজ্রমুষ্টিতে তার মুখখানা চেপে ধরল। না রইল মংগরকরের শব্দ করবার কোন উপায়—আর না রইল তার পালাবার বা এমন কি নড়বারও কোন সুযোগ। শুধু ভয়েই নয়, অবস্থাগতিকেও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

তবে সুখের বিষয়, মংগরকরকে সে অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকতে হল না। যে লোকটা বাঘে ছাগল ধরার মত তাকে ধরেছিল, সে অনায়াসে সেই ভাবেই, যেন শূন্যে উঠিয়ে, তাকে নিয়ে পাশের একটা কামরাতে ঢুকে পড়ল এবং দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ঘরটা অন্ধকার নয়, ভেতরের কোন কুলুঙ্গিতে একটা চেরাগ জ্বলছিল। অল্প কয়েক মুহূর্ত পরে—আলোটা চোখে সয়ে যেতে মংগরকর লক্ষ্য করল, যে লোকটি তাকে ধরে এনেছে সে স্বয়ং সর্দার খাঁ। যখন তাকে অবলীলাক্রমে

শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছিল, তখন এই লোকটির কথাই তার মনে পড়েছিল, আর সেই কারণেই, এখন চিনতে পারা সত্ত্বেও, ভয় কিছুমাত্র কমল না। এ লোকটার দানবসুলভ দৈহিক শক্তির কথা তার জানা আছে। হাতিয়ারের প্রয়োজন নেই—এমনিই তার ধড় থেকে মুণ্ডটা ছিঁড়ে নিতে পারে ও অনায়াসে।

সর্দার খাঁ অবশ্য তাকে বেশীক্ষণ এসব কথা চিন্তা করবার অবকাশও দিল না। বিনা ভূমিকায় একেবারেই কাজের কথা পাড়ল, 'কৈ চিঠিটা দেখি!'

মংগরকর চুপ করে রইল—কাঠের মত।

'কৈ দাও চিঠিখানা?'

'না।'

'দেরি করে লাভ নেই। চিঠি আমার চাই-ই।'

'জীবন থাকতে দেব না।'

'তা হলে জীবনটাই যাবে।'

'তা যাক, মনিবের কাজ করতে গিয়ে মরতে হয় মরব। বিশ্বাসঘাতক—এ অপবাদ তো কেউ দেবে না।'

ভয় মংগরকরের কারও চেয়ে কম নয়। কিন্তু এখন যেন কেমন একরকমের অদ্ভুত সাহস তাকে পেয়ে বসল। জিদ চেপে গেল বলা যেতে পারে।

সর্দার খাঁ আবারও তার টুঁটি চেপে ধরল। বলল, 'তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে বেশী সময় লাগবে না আমার, কিন্তু জোর করে নিতে হলে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না। সেটা তো বুঝতেই পারছ!'

মংগরকর চুপ করে রইল।

মুখে আস্ফালন করা এক জিনিস, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো আর এক।

যে লোহার মত মুঠিটা তার গলায় চেপে বসেছে, সেটা একটু হেললেই ফরসা—মট্ করে ঘাড়টি ভাঙবে! মংগরকর শুষ্ক জিভটা একবার শুষ্কতর ওষ্ঠে বুলিয়ে সেটাকে সরস করবার বৃথা চেষ্টা করল—মুখে তার কোন উত্তর যোগাল না!

কুলুঙ্গির মধ্যে চেরাগ জ্বলছিল বলে ঘরের একটা দিকে আদৌ আলো যায় নি। সুতরাং সেখানে যে তৃতীয় ব্যক্তি একজন ছিল, তা মংগরকরের লক্ষ্য করবার কথা নয়। এখন সেইদিক থেকেই অত্যন্ত পরিচিত এবং মিষ্ট একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ওকে ছেড়ে দাও সর্দার খাঁ। আমি দেখছি—'

হুসেনী বেগম!

ঠিকই তো। ধোঁয়া দেখলেই আগুন বুঝতে হবে। সর্দার খাঁ যখন ধরেছে, তখন আর কার প্রয়োজন?

স্ত্রীলোক জাতটাই এমনি—পুরুষের প্রতিপদে গোয়েন্দাগিরি করাই তার স্বভাব। মংগরকরের নিজের জীবনের বহু অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা মনে পড়ে এই মুহূর্তে সে নানাসাহেবের প্রতি কেমন একপ্রকার অনুকম্পাই বোধ করতে লাগল।

আমিনা অন্ধকার কোণ থেকে খানিকটা সামনের দিকে এসেছে ততক্ষণে। সর্দার খাঁ মংগরকরকে ছেড়ে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল।

সর্দার খাঁর কাছে একটা খুন ছেলেখেলা মাত্র, কিন্তু মংগরকরকে বাঁচিয়ে রাখা চাই—তা আমিনা ভাল করেই জানে। তাই সে কাজটা নিজের হাতেই তুলে নিল।

'মংগরকর, মানুষ ভয় পেয়ে অনেক বোকামি করে বসে। তার যারা হিতাকাঙ্ক্ষী তাদের কাজ সেটা শোধরানো। ও চিঠি নানাসাহেব হুইলারকে লিখেছেন একথা জানাজানি হলে তাঁর রক্ষা থাকবে না। সেই জন্যই ও চিঠিটা আটকাতে চাই। ওটা তুমি আমাকে দাও, আমি তোমাকে শপথ করে বলছি, একথা আর কেউ জানতে পারবে না—এই আমরা দু জন ছাড়া। তুমি কাল ভোরে পেশোয়াজীকে ব'ল যে, তুমি সাহেবকে চিঠি দিয়ে এসেছ—তা হলেই হবে। নইলে পেশোয়ার বিপদের শেষ থাকবে না। আর পেশোয়া বিপদে পড়লে আমরাই বা থাকব কোথায় ?'

মংগরকর আড়ে একবার সর্দার খাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু—'

'কিন্তু কী ? বকশিশ তো ? পাবে বৈকি। নানাসাহেব যা বলেছেন তা তো পাবেই, তা ছাড়া শহরে খানিকটা জমি আমিও দেব তোমাকে।'

'মাফ করবেন বেগমসাহেবা, ওটা তো কাজ করবার বকশিশ—বিশ্বাস-ঘাতকতার বকশিশ আলাদা।'

'বেশ, কী চাও বল। যা চাইবে—সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয় দেব।'

মংগরকর এবার চোখ তুলে আমিনার চোখের দিকে তাকাল। কেমন এক-প্রকার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'যা চাইব দেবেন তো—সাধ্যে কুলোলে ?'

আমিনার দৃষ্টিও মংগরকরের দৃষ্টিতে স্থির রইল—একটি চোখের পাতাও বোধ করি কাঁপল না। কিছুমাত্র ইতস্তত না করে বলল, 'দেব।'

'যখন চাইব ?'

'কথা দিয়েছি যখন—দেবই।'

মংগরকর জামার ভেতর থেকে মোহর-করা চিঠিখানা বের করে দিল।

চেরাগের ক্ষীণ আলোতেও ঠিকানাটা পড়তে বা হস্তাক্ষর চিনতে কোন অসুবিধা হল না। আমিনা লেফাফাটা সযত্নে নিজের কামিজের জেবে রেখে দিল। মংগরকর আর অপেক্ষা করল না। নিঃশব্দে কপাট খুলে পূর্বের মতই মার্জারগতিতে বাইরের সূচীভেদ্য অন্ধকারে মিশে গেল।...

সর্দার খাঁ কপাটটা আবার বন্ধ করে দিয়ে ক্রুদ্ধ সাপের মতই হিস্ হিস্ করে উঠল, 'ওর মুণ্ডুটা কিন্তু আমি সত্যিই নিজে হাতে ছিঁড়ে ফেলব মালেকান—এ আমাকে একদিন করতেই হবে।'

আমিনা হাসল—মধুর কৌতুকের হাসি। বলল, 'তোরও তাহলে মনের ভাব মুখে বেরিয়ে আসে সর্দার ?'

তারপর কাছে এসে একটা হাত সর্দারের কাঁধে রেখে কেমন একপ্রকার এলিয়ে পড়বার ভঙ্গিতে তার বিশাল বুকে ঠেস দিয়ে বলল, 'এখনই এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, আগে বকশিশটা দাবি করুক!'

আজও আমিনার এই সামান্যতম প্রশ্রয়ে সর্দার খাঁর উগ্র পৈশাচিক মুখখানা নিমেষে কেমন একরকম মাধুর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেও হাসল। অপ্রতিভের হাসি হেসে বলল, 'না, লোকটার বড় স্পর্ধা!'

আমিনা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জেব-এর চিঠিখানা দেখিয়ে বলল, 'ওরে, এটা যে আমার কত বড় ব্রহ্মাস্ত্র রইল তা জানিস না। এর জন্যে সত্যিই—আমি না করতে পারি এমন কাজ নেই, না দিতে পারি এমন কোন মূল্য নেই। যেদিন এ অস্ত্র ছাড়ব সেদিন বুঝবি!'

সে ফুঁ দিয়ে আলোটা নিভিয়ে সর্দার খাঁর হাত ধরে বাইরে এল এবং সেই

গাঢ় অন্ধকারেই কয়েকটা গলি-পথ ও কয়েকটি সিঁড়ি পার হয়ে অনায়াসেই নিজের মহলে গিয়ে পৌঁছল।

সর্দার খাঁও পেছনে পেছনে ছিল বৈকি।

কখনও কোন কারণে সে মালেকানকে চোখ-ছাড়া করে না। মালেকান নিরাপদে মহলে পৌঁছনো পর্যন্ত আজও সে নিঃশব্দে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখেই অনুসরণ করেছিল। আজও যথানিয়মে মহলের দরজা তার মুখের সামনে বন্ধ হয়ে গেল। প্রয়োজন ছাড়া সর্দার খাঁর কথা ভাবার অবসর মালেকানের নেই—সে কথা সেও জানে। তাই প্রতিদিনের অভ্যাসমত, আর কোন প্রয়োজন মালেকানের স্মরণ হয় কিনা, সেই অবসরটুকু দিয়ে, আজও সে খানিকটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আবার অন্ধকারেই যখন সে নিজের বাসার দিকে রওনা হল, তখন তার একটা ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল না। হয়তো ঐ পাথরের মত বুকখানায় তার নিঃশ্বাস পড়েও না।

॥ ৩০ ॥

নানা পরের দিন সকালে প্রায় দু প্রহর বেলা অবধি হুইলারের কাছ থেকে উত্তরের অপেক্ষা করলেন। মংগরকরকে তিনি বার বার জিজ্ঞাসা করে জেনেছেন—সে হুইলার সাহেবের হাতেই চিঠি দিয়ে এসেছে। সুতরাং উত্তর একটা এতক্ষণে আসা উচিত। 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'—সোজাসুজি একটা উত্তর। সাহেব-জাতের ভদ্রতায় এতটুকু বিশ্বাস তাঁর এখনও আছে—চিঠির উত্তর একটা দেবেই।

কিন্তু একের পর এক প্রহর বৃথাই কেটে গেল তাঁর উৎকণ্ঠিত অপেক্ষায়—কোন উত্তর এল না।

একবার মনে হল আর কাকেও পাঠিয়ে খোঁজ করেন, কিন্তু পরক্ষণেই আত্ম-ধিক্কার জাগল—ছিঃ, সাহেব মনে করবে গরজটা তাঁরই বেশি!

এধারে মুহূর্তে মুহূর্তে নানান্ খবর আসছে।

সাহেব-পাড়ায় ঘরবাড়ি জ্বলছে। চোরা-গোপ্তা খুনজখম তো চলছেই।

ওরা যে বিষম ভয় পেয়েছে, তা মুখচোখের চেহারাতেই টের পাওয়া যাচ্ছে। কিছু স্ত্রীলোক ও অসুস্থ লোক ইতিমধ্যেই সেই মাটির কিল্লায় রাত্রে শুতে শুরু করছে। আজিমুল্লা সে কিল্লার নাম দিয়েছে—"নাচারগড়"। বাকি যারা অস্ত্র ধরতে পারে, তারা সারারাত সশস্ত্র বসে পাহারা দিচ্ছে। দিনেরাতে ঘুম নেই কারও।

তবু তাঁর চিঠির উত্তর পর্যন্ত দিল না ওরা।

আশ্চর্য স্পর্ধা তো!

পিঞ্জরাবন্ধ বাঘের মতই রুদ্ধ আক্রোশে ছটফট করে বেড়াতে লাগলেন নানা ধুন্ধুপন্থ। ইচ্ছে হয় প্রত্যেক ইংরেজটাকে তিনি ধরে নিজ হাতে একটু একটু করে যন্ত্রণা দিয়ে মারেন। শুধু কেবল—। বড় ভয়ংকর ওরা, বড় ভয়ংকর।

খবর এদিকে সবই শুভ। গত দু-তিন দিনের মধ্যে বেরিলী, বদাউন, মোরাদাবাদ সর্বত্র বিদ্রোহীদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোথাও ইংরেজরা বাধা দিতে পারে নি। বন্যার মত এই প্রচণ্ড শক্তি একে একে সারা হিন্দুস্থান ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার পর? বন্যার জলের মতই যদি ক্ষণস্থায়ী হয় সে শক্তি?

চার দিক থেকে 'টেলিগরাফে' সংবাদ আসছে। গতকালকার দুটি সংবাদই —পূর্ব এবং পশ্চিমের—পৌঁছেছে আজ সকালে।

মোরাদাবাদে জর্জ উইলসন বহুদিন অবধি বন্যাকে নিজের ব্যক্তিত্বের বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু গতকাল তিনিও হার মেনেছেন। সরকারী খাজাঞ্চীখানা সিপাহীদের হাতে পড়েছে। সাহেবদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও কেউ কিছু নিয়ে যেতে পারে নি, তারা কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে মাত্র।

তবে কি ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য? তাঁর কল্যাণের জন্যই হুইলার উত্তর দেয় নি? সৌভাগ্যসূর্য কি ওদের সত্যই অস্ত গিয়েছে? এখন— ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করলে তাঁকেও কি তাদের সঙ্গে চরম দুর্ভাগ্য, অপমান ও মৃত্যু বরণ করতে হত?

যদি সেই কথাটাই বিশ্বাস করতে পারতেন!

আজ আরও একটা সংবাদ তিনি পেয়েছেন। পূবে জেনারেল নীল এগিয়ে আসছেন। কাশীর কাছাকাছি এসে পড়েছেন।

প্রথম আঘাতের প্রচণ্ডতা ও আকস্মিকতায় ইংরেজ জাতির রণ-দুর্মদতা হয়তো খানিকটা স্তম্ভিত হয়েছে মাত্র—সময় পেলেই প্রচণ্ডতর বেগে সে আবার প্রত্যাঘাত করবে।

এক ভরসা—যদি বিহার ওদিকটা সামলে নেয়। কিন্তু পারবে কি?

সংশয়, আশঙ্কা ও দ্বিধায় নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত হতে হতে নানাসাহেব অসহায়ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুনতে লাগলেন। কিছুই করা হল না।

সেদিন নানা ধুন্ধুপন্থ নিজেকে নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত ছিলেন যে, হুসেনী বেগমের খবর নেবার অবসর পর্যন্ত তাঁর মেলে নি। নইলে জানতে পারতেন যে বেগমসাহেবা তার মহলে নেই—প্রাসাদ থেকে বহুদূরে আজিজনের বাড়ি গিয়ে সকাল থেকে বসে আছে।

নীলের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ আমিনাও পেয়েছে। বিহার এখনও চুপচাপ। কুঁয়ার সিং এখনও টেলার সাহেবের ভরসা ছাড়তে পারেন নি। অপর সকলেও দোলাচল-চিত্ত।

যদি বিহার না ইংরেজদের ওদিকে ব্যস্ত রাখতে পারে তা হলে—

তা হলে এধারে কিছুই হবে না। নানাসাহেব যে এখনও ইতস্তত করছেন তা আর কেউ না জানুক আমিনা জানে।

ইংরেজের কোথাও কোন পাল্টা জয়লাভ হয়েছে—এই ধরনের একটাও সংবাদ আসবার আগে এখানে আগুন জ্বালতে হবে। দাবানল জ্বললেই ঝড় ওঠে—সেই ঝড়ের ঝাপটায় নানাসাহেবকেও উড়িয়ে এনে ফেলবে, আগুনের আবর্তে এসে পড়বেন।

নানাসাহেবের জন্য এতটুকু চিন্তিত নয় আমিনা—তার নিজের জন্যই সে ব্যস্ত।

তার মারণযজ্ঞে যে এখনও পূর্ণাহুতি পড়ে নি। তার প্রতিহিংসা যে এখনও চরিতার্থ হয় নি।

শামসুদ্দীন খাঁ যাতায়াত করছে টীকা সিংএর কাছে। তারই আগমন-প্রতীক্ষায় দু বোন উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছে।

বেচারী শামসুদ্দীন!

কাল কি কুক্ষণেই যে আজিজনের ঘরে মাথা গলিয়েছিল !

আজিমুল্লার কাছ থেকে পূর্বাহ্নেই একটি মোহর বকশিশ পেয়েছিল সে—নৌকোর নাটকটা অভিনয় করার বায়না হিসেবে। তখন থেকেই তার সংকল্প স্থির ছিল। নৌকোর ফেরত সোজা এসে মোহরটি আজিজনের হাতে দিয়ে বলেছিল, 'নাও বিবি, এবার খুশী তো ?'

আজিজন সুর্মা-টানা চোখে বিদ্যুৎ হেনে বলেছিল, 'তোমাকে দেখেই খুশী খাঁ সাহেব। মোহর কি আমি চেয়েছি !'

'না, তা চাও নি, সত্যি কথা। তোমার বহুত মেহেরবানি আমার ওপর—পেয়ার বলতে সাহস হয় না, কিন্তু কি জান বিবি সাহেব, তোমার ও সোনার হাতে সোনার মোহর ছাড়া মানায় না যে !'

তার পর আরও দুটো টাকা জেব থেকে বার করে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, 'তোমার নোকররা সব গেল কোথায়, কিছু মাল-টাল আনাও !'

'ব্যাপার কি খাঁ সাহেব—টাকায় ভাসছ যে আজ ! কোথা থেকে এল এত ?'

'আসবার এখনই কী হয়েছে ! র'স, আর দু-পাঁচটা দিন সবুর কর ! শাহি তো আমাদের হাতেই আসছে। আংরেজ আর ক-দিন ! যত টাকা জমিয়েছে ঐ হারামখোরগুলো, আগে সব হাতে পাই, তোমার এই ঘরের কড়িকাঠ অবধি মোহরে ঠেসে দেব, ভয় কি ! নাও, চালাও ফুর্তি !'

স্ফূর্তিটা কাল খুব জমেছিল ঠিকই।...

কিন্তু ভোর না হতেই তাকে ঠেলে তুলে এই যে বিবিসাহেব সুতোর টানার মত একবার ব্যারাক আর একবার বিবির বাড়ি—নাকে দড়ি দিয়ে ছোটাচ্ছে, এইটেই যেন কেমন কেমন ! অথচ ঐ খুবসুরত বিবি যদি গলা জড়িয়ে গালে গাল রেখে কোন অনুরোধ করে তো সে অনুরোধ ঠেলাই বা যায় কেমন করে।

তার ওপর আজিজন তার কথা দিয়েই তাকে জব্দ করেছে। বলেছে, 'একটু খোঁজখবর নিয়ে এসো দিকি। আর কতদিন সবুর করব ? আজ ছ মাস থেকেই তো শুনছি যে—শাহিটা তোমরা নিয়ে নেবে।...কৈ ? হালচাল তো সে রকম দেখছি না। ভালমানুষের মত রোজই তো তোমরা ইংরেজগুলোর হুকুম মাফিক কুচকাওয়াজ করছ—নড়ছ ফিরছ ঘুরছ !...তোমাদের যা মর্দানি তা আমার জানা আছে, মুখেই যা কিছু লম্ফঝম্প—তাও আমার মত মেয়েমানুষের কাছে !'

শামসুদ্দীনের মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। বলে, 'আজই, আজই শুরু হয়ে যাচ্ছে বাঘের খেল, দেখই না !'

'তা হলে তুমি ছাউনি থেকে ঘুরে আমাকে পাকা খবরটা দিয়ে যাও খাঁ সাহেব !'

'তোমার এত তাড়া কেন বল তো ?'

'বাঃ, আংরেজের খাজাঞ্চীখানা তোমাদের হাতে পড়লে মোহর দিয়ে আমার ঘর ভরিয়ে দেবে—সে কথা কি ভুলে গেলে ?...এরই মধ্যে যদি ভুলে যাও তো টাকা হাতে পেলে কী করবে ?'

কাল প্রথম রাত্রির প্রতিজ্ঞা ও আজ প্রভাতের মধ্যে বহু বোতল মদ বয়ে গেছে—তবু ক্ষীণভাবে কথাটা মনে পড়ে বৈকি।

'ঘাবড়াচ্ছ কেন বিবি,—ঠিক পাবে তোমার মোহর।'

'মোদ্দা খবরটা দিয়ে যেও।'

'দেব। এখন প্যারেড আছে—সেরেই দিয়ে যাব।'

'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

শামসুদ্দীন তার কথা রেখেছিল।

সে এসে খবর দিয়েছিল যে, সে কিছুমাত্র বাজে কথা বলে নি, আজই বাঘের খেলা শুরু হবে। স্বয়ং টীকা সিংএর মুখ থেকে সে খবর নিয়ে এসেছে।

কিন্তু তবু অব্যাহতি পায় নি।

আজিজন অনুরোধ করেছে—সুমধুর অনুরোধ আদেশেরও বাড়া—ঠিক কখন থেকে শুরু হবে, সব কটি রেজিমেণ্ট যোগ দেবে কিনা, অথবা কোনটির সম্বন্ধে এখনও কিছু সংশয় আছে সব কিছু পাকা খবর দিয়ে যেতে।

সে খবরও শামসুদ্দীন দিয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবারের বিকেলের দিকটায় বুঝি দিন ভাল থাকে না—টীকা সিংএর যত কুসংস্কার—তা ছাড়া চক্ষুলজ্জার ব্যাপারও একটা আছে—সুতরাং রাত্রেই সুবিধে। কোনমতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবিজান যেন ধৈর্য ধরে, আর কিছু ভাবতে হবে না।

তাতেও রেহাই মিলল না।

আজিজন তার জন্য শরবৎ ফরমাশ করবার নাম করে ভেতর থেকে ঘুরে এসে বলল, 'খাঁ সাহেব, তুমি আমার জন্য অনেক মেহনত করলে, একথা আমি কখনও ভুলব না। কিন্তু আরও একটা কথা বলব, সেটাও রাখতে হবে—আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি।'

আবার কী? আমাদের এখন কত কাজ সেটা বুঝছ না বিবিসাহেব!'

'ওঃ, কাজটাই বুঝি বড় হল—আমার চেয়ে? বেশ যাও, কিছু করতে হবে না!' সুন্দর অধর অভিমানে স্ফুরিত হয়। সেদিকে চেয়ে পুরুষের মাথা ঠিক রাখা শক্ত।

'বল, বল, বলে ফেল—কী ফরমাশ!'

'ঠিক কখন থেকে তোমরা কাজ শুরু করবে—আমি জানতে চাই। কিছু একটা নিশানী ঠিক করে জানিয়ে দিয়ে যেও। ব্যস, আর কিছু নয়—এই-ই আখেরী।'

'অনেক ফরমাশ খাটলুম বিবি, বকশিশ কী মিলবে তা এখনও কিছু শুনি নি।' শামসুদ্দীন দাঁত বার করে বলে।

'মিলবে কি—মিলে যাচ্ছে তো হাতে হাতে!'

'কী রকম—কী রকম?'

'এই যে যত বার আসছ, আমাকে দেখতে পাচ্ছ, আমার কথা শুনছ—সেটা লাভ নয়?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবু বান্দা কিছু উপরি বকশিশ আশা করে!'

'এইটুকু করেদাও, আজিজন বিবি বান্দার বাঁদী হয়ে থাকবে চিরকালের মত!'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

শামসুদ্দীন খুশী হয়ে প্রায় নাচতে নাচতে চলে গিয়েছে এবং খানিক পরে টীকা সিংএর অনেক তোষামোদ করে খবরটি জেনে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

'তিনটি পিস্তলের আওয়াজ হবে পর পর। তা হতে জানতে পারবে—আমরা আমাদের কাজ শুরু করলুম। হল এবার? খুশী?'

।'

'তা হলে আমার বকশিশটা ?' নাটকীয় ভঙ্গিতে সেলাম করে দাঁড়ায় শামসুদ্দীন।

আজিজন জবাবটা মুখে দেয় না—কৃতজ্ঞতা কাজেই জানায়।

এক হাতে শামসুদ্দীনের গলা জড়িয়ে, আর এক হাতে নিজের খোঁপার মধ্যে থেকে আতরের তুলিটা বের করে তার দাড়িতে ও গালে আতর লাগিয়ে দিয়ে আদর করে গাল টিপে বলে, 'অত ঘন ঘন বকশিশের লোভ ভাল নয়—বুঝলে খাঁ সাহেব!'

॥ ৩১ ॥

আমিনা আর অপেক্ষা করে নি। সে এতক্ষণ আজিজনের বাড়ি ছিল—কতকটা একা একা এই অনিশ্চয়তা সইতে পারছিল না বলেই। নানা নিজের চিন্তায় মগ্ন, আজিমুল্লা ছাউনির দিকেই কোথাও আছে এবং সে যে আজ বিষম ব্যস্ত, তা কেউ বলে না দিলেও অনুমান করতে আটকায় না। আর তা না থাকলেও, সব সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়। নানা যতক্ষণ নিজের খাস কামরায় থাকেন, ততক্ষণ তাঁর কাছে কোন স্ত্রীলোকের যাওয়া নিষেধ—এমন কি স্বয়ং মহিষীদেরও। আমিনার তো প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া এখন আর তার নানার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে না। যাওয়া মানেই তো অভিনয় করা।

সুতরাং আমিনা সম্পূর্ণই একা আজ। এই একাকিত্ব সে আর সইতে পারছে না। সম্ভব হলে সে পুরুষ-বেশে নিজেই ছাউনিতে যেত, ঐ ক্লীব সিপাহীগুলোকে দেখে নিত সে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তার এই অসামান্য রূপ পুরুষের ছদ্মবেশে ঢাকা পড়বে না তা সে জানে।

নানা কদিন থেকে নবাবগঞ্জের প্রাসাদও ছেড়ে দিয়েছেন। হুইলারকে আশ্বস্ত করতে তাঁদের কাছাকাছি একেবারে ছাউনির ধারে একটা বড় বাড়িতে এসে উঠেছেন। এটা আজিজনের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। আমিনা বোরখাটা গলিয়ে পদব্রজেই কতকগুলি গলিপথ ঘুরে সেই প্রাসাদে এসে পৌঁছল।

গরমের দিন—সন্ধ্যা হয়েও হতে চায় না।

আমিনা নিজের মহলে পৌঁছে স্নান করল। একপাত্র বলকারক বনফসার শরবত পান করল, এক চিলম্ তামাকু পোড়াল, তবুও অন্ধকার হয় না। অবশেষে একটু আবছা হতেই সে উঠে গিয়ে ছাদে দাঁড়াল। ভাগ্যে নানা-সাহেবের সঙ্গে তাঁর জেনানা-মহল উঠে আসে নি বিঠুর থেকে। তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে ছাদেও ওঠা যেত না। এমন কি আজ আদালাও নেই—প্রাসাদে ফিরেই মুসম্মতের মুখে খবর পেয়েছে—নানাসাহেব আদালাকে বিঠুরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। নানাসাহেব বাজীরাওএর মহিষীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন নি—অবশ্য এটাও ঠিক যে তাঁরাও করেন নি। স্বামীর পোষ্যপুত্রের হাত থেকে যতটা ব্যক্তিগত টাকা-কড়ি-জহরৎ বাঁচানো যায় সেই চেষ্টা করেছেন, অপর-বিষয়-আশয় নিয়েও নিরন্তর বিব্রত ও বিপন্ন করেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত নানা তাঁর জননীদের একরকম নজরবন্দী করে রাখতেই বাধ্য হয়েছেন। এমন কি ভগ্নীদের বিয়ের ব্যাপারেও তাঁদের কথা শোনেন নি। পৈতৃক পেনশনে বঞ্চিত নানাসাহেবের এই সব সম্পত্তি ও টাকাকড়িই ভরসা—এর কোন অংশ নিজের হাতের বাইরে যেতে দেবার ইচ্ছে ছিল না শুধু নয়, উপায়ও ছিল না।

কিন্তু মহিষীরা সে কথা ভোলেন নি। চারিদিকে গোলমালের আভাস, নানাসাহেবও এই গোলমালে জড়িয়ে পড়ছেন—একথা তাঁদের কানেও পেঁৗছেছিল। কাজেই তাঁরা যে অন্তিম সময়ে যতটা সম্ভব নিজেদের 'ভবিষ্যৎ' ভাববেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। নানার অনুপস্থিতিতে প্রাসাদে বহুরকমের ষড়যন্ত্র পেকে উঠেছে—এই সংবাদ কদিন ধরেই নানা পাচ্ছেন। কথাটা আমিনার সামনেই আলোচিত হয়েছে। নানা তার ব্যবস্থাও করেছেন, কিন্তু শুধু বাইরে থেকে ব্যবস্থা করেও সবটা সামলানো যায় না বলে ভেতর থেকে নজর রাখতে আজই আদালা বেগমকে বিঠুরে চালান করেছেন। নিজের বিবাহিতা স্ত্রীদেরও নানা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না। বাজীরাওএর মহিষীদের পক্ষে বধূদের 'হাত করা' খুব কঠিন কাজ হবে না।

সে যাক, আদালাও এখানে নেই বলে আমিনা বেঁচে গেল। অসময়ে পুরুষরা ছাদে ওঠে না—উঠলেও হুসেনী বেগম আছেন শুনলে কেউ উঠবে না।···আমিনা চোখে দূরবীন লাগিয়ে একদৃষ্টে ছাউনির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল আমিনাকে।

দীর্ঘ, মন্থর কয়েকটা ঘণ্টা—কালের দীর্ঘতর অনুচ্ছেদ কয়েকটি।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা—আলোর আভাস কিছুতেই মুছতে চায় না আকাশের প্রান্ত থেকে। 'যাই-যাই' করেও একটা ধূসর-রক্তিম আলো লেগে থাকে পশ্চিম দিকটাতে।

অবশেষে এক সময় অন্ধকার ঘনিয়ে এল। প্রাসাদের পেটাঘড়িতে আটটা বাজল, নটা, তার পর এক সময়ে দশটাও বেজে গেল।

মুসম্মৎ এসে বলল, 'সারা দিনই তো কিছু খেলেন না! খানা নিয়ে আসব এখানে?'

'না, এখন ভাল লাগছে না কিছুই।'

'কিন্তু কিছু না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বেন যে! হয়তো আজও সারারাত জাগতে হবে—শরীরে তাকত না থাকলে যুঝবেন কী করে?'

'আজ শরীর ঠিক থাকবে। তুই বকিস নি। বরং আর একটু শরবত নিয়ে আয়। আর দেখ, সর্দার এলে তাকে নীচে অপেক্ষা করতে বলিস।'

কথা বললেও আমিনা এক মুহূর্তের জন্যও দূরবীন থেকে চোখ সরায় নি। তার একটা কানও পড়ে ছিল ঐ দিকে।···

অন্ধকারের ভেতরেও ছাউনির দিকে একটা কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করছিল। বহুলোক উত্তেজিত হয়ে ঘোরাফেরা করছে—স্থানে স্থানে জটলা।···

শহরের দিকেও চঞ্চলতা কম নেই। এত দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন সেখানে একটা হাট বসেছে।···অনেকেই কদিন ধরে কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে, অধিকাংশ লোকই উত্তেজিত,—গৃহস্থ ও ব্যবসায়ীরা শঙ্কিত। গোলমাল হাঙ্গামার অর্থ তারা জানে। কিন্তু মনোভাব যাই হোক, ঘুম নেই কারও চোখেই। চারিদিকেই জটলা, চারিদিকেই একটা কষ্টকর প্রতীক্ষা। যে আগুন চারিদিকে জ্বলছে, সে আগুন এখানেও জ্বলবে। যে ঝড় সমস্ত উত্তরপশ্চিম ভারতের উপর দিয়ে বইছে, তা এখানে পেঁৗছল বলে।

আজ অথবা কাল—কদিন ধরেই এমনি আসন্ন হয়ে আছে ব্যাপারটা।

সকলেই জানে, সকলেই অপেক্ষা করছে, কেবল ঐ ইংরেজগুলো অমন বাহ্য-নিরুদ্বেগ বজায় রাখে কেমন করে? সত্য বটে মেয়েছেলেদের ওরা ঐ মাটির পাঁচিল-ঘেরা জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছে, নিজেরাও সারারাত সশস্ত্র বসে থাকে, তবু বাইরের প্রশান্তি কারও তো এতটুকু নষ্ট হয় নি। নিত্যকার কাজ নিয়মিত ভাবেই করে যাচ্ছে,—যেন ভয় পাবার, সতর্ক হবার মতো কোন কারণই কোথাও ঘটে নি।

এত নির্বোধ ওরা!

পরিষ্কার অদৃষ্টলিপিও পড়তে পারে না?

অথবা নিয়তি যখন ঘনিয়ে আসে তখন এমনই হয়।

ভগবান বহুদিন থেকেই ওদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন। সাহেবপাড়ায় আগুন লাগা তো প্রায় নিত্যকার ঘটনা হয়ে উঠেছে। এই সেদিনই এক জোড়া সাহেবমেমকে কে বা কারা খুন করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল—সকলে স্বচক্ষে দেখেছে। তবে এত কিসের সাহস ওদের? অথবা নির্বুদ্ধিতাই?

এতদিন পালাবার উপায় ছিল। সে চেষ্টা দূরে থাক, যুদ্ধের সময় সবচেয়ে প্রয়োজন যে দুটি জিনিসের—টাকা এবং হাতিয়ার—সেই দুটিই শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে সবচেয়ে প্রকাশ্য স্থানে এসে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করল। এ নিতান্তই ভগবানের মার।

যেটুকু দ্বিধা বা সংকোচ এখনও হয়তো ছিল আমিনার, সেটুকুও চলে গেল। ঈশ্বরই তাকে দিয়ে এই মারণযজ্ঞের আয়োজন করাচ্ছেন, সে নিমিত্ত মাত্র।

ফট্-ফট্-ফট্!

তিনটে পিস্তলের শব্দ না?

শব্দটা এল কোথা থেকে? ছাউনির দিক থেকেই তো? আমিনার বুকের রক্ত যেন সেই তিনটি শব্দে তিনবার চলকে উঠল।

কিন্তু ওদিকে আবার কী? উত্তর দিকে আকাশে অত আলো কিসের?

আমিনা ছুটে এদিকে এল।

আলো নয়—আগুন। সাহেবপাড়ার কোন বাংলোতে আগুন লাগানো হয়েছে। তারই রক্তিম আভা। দেখতে দেখতে বহু স্থান জুড়ে অন্ধকার আকাশ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। একটা নয়—বহু বাংলোয় আগুন লেগেছে। ওদিকে বোধ হয় এক দল লোক এই সংকেতটারই অপেক্ষা করছিল।

অকারণ অগ্নিকাণ্ডে আমিনার রুচি নেই। সে আবার দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ ছাউনির দিকে এসে দাঁড়াল।

একটু আগে ওদিক থেকে চাপা আলোচনার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, তা এতক্ষণে কোলাহলে পরিণত হয়েছে। জনরোল দূরশ্রুত সমুদ্রকল্লোলের মতই শোনাচ্ছে।

কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

আমিনার এতদিনের সাধনা ও স্বপ্ন তা হলে সফল হতে চলেছে!

এ সময়ে এভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

কানে গেল নীচের দিক থেকে অনেকগুলি লোকের কথা বলার আওয়াজ। হেঁট হয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল—স্বয়ং নানাসাহেব ছাদে আসছেন। তিনিও বোধ করি স্বচক্ষে দেখতে চান ব্যাপারটা।

আমিনা আর দাঁড়াল না।

নানাসাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়া এখন আদৌ অভিপ্রেত নয়। এখন তার কিছুটা স্বাধীনতা প্রয়োজন।

বড় সিঁড়ি দিয়ে নানাসাহেব উঠছেন, সেও পাশের আর একটা সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নীচে নেমে এল।

কিন্তু ঘরে এসেও স্থির থাকতে পারল না।

মুসম্মৎকে ডেকে প্রশ্ন করল, 'সর্দার এসেছে?'

'অনেকক্ষণ। ওদিকে দরজার বাইরে বসে আছে সে।'

আমিনা কাশ্মীরী কাঠের দেরাজটা খুলে তার সেই ছোট পিস্তলটা বার করে অভ্যাসমত কোমরের কাছে গুঁজল। তারপর ঠিক বোরখা নয়—একটা গাঢ় খয়েরী রঙের রেশমী চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকতে ঢাকতে বলল, 'কেউ যদি খোঁজ করে তো বলিস্ তার ভীষণ মাথা ধরেছে, নয়তো বলিস নবাবগঞ্জের বড় দরগায় সিন্নি দিতে গেছে—কি…যা হয় বলিস্। আমি চল্লুম।'

মুসম্মৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'কোথায় যাবেন এমন সময়ে মালেকান? ওদিকে বিষম গোলমাল হচ্ছে—শুনতে পাচ্ছেন না?'

'সেই জন্যেই তো যাচ্ছি। ছাউনির দিকে যাচ্ছি। এতদিন ধরে এত আয়োজন করলুম—এত ঘুরলুম, আর আজই ঘরে বসে থাকব? কাঠ কুড়িয়ে মলুম—এখন আগুন জ্বালাটা নিজের চোখে দেখব না?'

ভয়ে উৎকণ্ঠায় বিবর্ণ হয়ে মুসম্মৎ আরও কী একটা বলতে গেল, কিন্তু সে অবসর মিলল না, কারণ আমিনা ততক্ষণে ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছে।

ঘর থেকে দালান, সেখান থেকে সেকালের অন্দরমহলের অসংখ্য সরু সিঁড়ি-পথ—সেগুলো পার হয়ে সিঁড়ি ও উঠোন—কোথাও আমিনা তার গতি বিন্দুমাত্র মন্থর করল না। একরকম সে ছুটেই চলেছে। এমন কি সর্দার খাঁ সঙ্গে ঠিক আসছে কিনা সে খোঁজটাও করল না। সর্দারের সামনে দিয়ে এসেছে—তাই যথেষ্ট। সে নিশ্চয়ই পিছু নিয়েছে। কাকেও গোপন করে আসবার প্রয়োজন নেই—নানাসাহেব ছাদে, তা ছাড়া আজ সকলেই উত্তেজিত, উদ্‌ভ্রান্ত। কে কোথায় যাচ্ছে সে খবর নেবার কারুর অবসর নেই।

ঝোঁকের মাথায় প্রাসাদ থেকে বহুদূরে চলে আসবার পর আমিনা নিজের ভুলটা বুঝতে পারল। 'তার-ঘর' বা টেলিগ্রাফ অফিসের কাছ থেকেই ভিড় দুর্ভেদ্য হয়ে উঠল। দর্শকরা তো আছেই—মজা দেখবার জন্য বহু লোক এসে খালের এপারে জড়ো হয়েছে। কাজে-অকাজে বহু লোক ছাউনিতে আসে, তার ওপর আজ আর কড়াক্কড়ি করবার লোক নেই—যারা কোন কালে ছাউনির ধারে-কাছে ঘেঁষতে সাহস করে না, তারাও আজ বুক ঠুকে সামনে এসে ভিড় জমিয়েছে। তারই মধ্যে দিয়ে সিপাহীরাও ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে এবং তাদের অধিকাংশই ঘোড়সওয়ার। এক-একবার তারা যেমন বেপরোয়া ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে, অমনি প্রাণের দায়ে ভিড়টা ছত্রভঙ্গ হয়ে আকস্মিকভাবে পিছনের লোকদের ওপর এসে পড়ছে—সে আরও বিপদ।

আমিনা বলল, 'বড্ড ভুল হয়ে গেল রে, সর্দার, ঘোড়া নিয়ে বেরোনো উচিত ছিল।'

সর্দার বলল, 'নিয়ে আসব?'

'যাবি ?···আমি একলা থাকব একেবারে ? কোথায় ছিটকে পড়ব হয়তো —এসে যদি দেখা না পাস ?'

একটা আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছিল। সেখানেই হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সর্দার খাঁ, 'আমার কাঁধে পা দিয়ে গাছের ওপর উঠে যান মালেকান, ওখানে নিরাপদে থাকবেন। আমি ঘোড়া আর খবর দুই-ই নিয়ে আসছি।'

তার বিপুল দেহ সত্ত্বেও সে আশ্চর্য ক্ষিপ্রগতিতে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

একটু পরেই সর্দার ফিরল। কোথা থেকে দুটো ঘোড়াও সংগ্রহ করে এনেছে—আর এনেছে স্বয়ং আজিমুল্লা খাঁকে।

আজিমুল্লাও একটা ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছেন। তিনি কাছে এসে সযত্নে আমিনাকে নামালেন গাছের ডাল থেকে। তাঁর কয়েকটি আঙুলে মাত্র ভর দিয়ে আমিনা আশ্চর্য লঘুগতিতে একেবারে ঘোড়ার পিঠে এসে বসল।

'আপনার এই ভিড়ের মধ্যে এভাবে আসা ঠিক হয় নি বেগমসাহেবা—সর্দারকে পাঠালেই পারতেন। না-হয় আমি গিয়ে খবর নিয়ে আসতুম।···আজ বহু বদলোক এখানে জড়ো হয়েছে।' মৃদু অনুযোগ করেন আজিমুল্লা।

কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে আমিনা আজিমুল্লার সামনে মেলে ধরল। অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'হাতিয়ার ছাড়া আমি বেরুই না। আমি ঠিক আছি। এখন খবর বলুন !'

'খবর খুব ভাল। টীকা সিং অসাধ্যসাধন করেছে। কাল সারারাত ধরে সিপাই লাইনের মেয়েছেলে আর টাকাকড়ি দেহাতে সরিয়ে দিয়েছে—সাহেবরা সন্দেহও করে নি। আজ ওরই পিকেট-ডিউটি ছিল—সুবিধেই হয়ে গেছে। সময় বুঝে ওরই সওয়াররা আগে বেরিয়ে এসেছে। ঐ দেখুন ঘোড়সাহেবের * বাংলো জ্বলছে। খুব নির্বিবাদে কাজ মিটে গেছে। ওরা মালখানা থেকে টাকা আর নিশান দখল করবার সময় এক সুবেদার মেজর বাধা দিতে গিয়েছিল—বেচারী প্রাণ দিয়ে নিজের স্পর্ধার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। টীকা সিং-এর ঘোড়-সওয়ারেরা বেরিয়ে এসে এক নম্বর ইনফ্যাণ্ট্রিকে ডাক দিতেই তারাও বেরিয়ে এসেছে। ওরা সোজা চলে গেছে নবাবগঞ্জের দিকে, জেলখানা, ট্রেজারি আর ম্যাগাজিন—এগুলো দখল করতে।'

'এ তো দুটিমাত্র রেজিমেণ্টের কথা বললেন। বাকি ? ছাপ্পান্ন আর তিপ্পান্ন ?'

'একটু মুস্কিল বেধে গিয়েছে। ওরা এখনও ইতস্তত করছে—ওদের মনের ভাবটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বেগমসাহেবা !'

'সে কি ! এখনও বোঝা যাচ্ছে না ? এতকাল কী করলেন তবে ?'

আমিনার কণ্ঠে হতাশা ও বিরক্তির সুর।

সে ঘোড়ার মুখ ফেরাল।

'কোথায় চললেন ?' আজিমুল্লা বিব্রত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আবার ওর মধ্যে অনর্থক—'

'চলে আয় সর্দার খাঁ !' আমিনা যেন আজিমুল্লার উপস্থিতি ও আশঙ্কা একই সঙ্গে উড়িয়ে দিতে চায়।···

ভিড় ঠেলে আরও খানিকটা যেতেই খোদ টীকা সিং-এর দেখা পাওয়া গেল।

* R ding Master

'কী খবর টীকা সিং?' আমিনা স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে নিজেই সাগ্রহে প্রশ্ন করে।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরে প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেও সঙ্গে আজিমুল্লাকে দেখে টীকা সিং আশ্বস্ত হল। তখন পরিচয় জানবার সময় নেই। সে উত্তরটা আজিমুল্লাকেই দিল, 'কাম ফতে খাঁ সাহেব। ট্রেজারি আর ম্যাগাজিন দুই-ই আমাদের হাতে এখন। সবাই চলে এসেছে, কেবল এই দুটো দলই বড় বেগ দিচ্ছে—তিপ্পান্ন আর ছাপ্পান্ন।'

আমিনা ঘোড়া চালিয়ে সোজা টীকা সিং-এর সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'শুনুন, টাকার লোভ দেখান। বলুন, এখন যদি না আসে তো ওদের বাদ দিয়েই লুটের টাকা ভাগ করা হবে—এর পর আর ওদের কোন দাবি থাকবে না।'

'লুটের টাকা?' টীকা সিং খানিকটা হতভম্ব ভাবেই প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—ট্রেজারির টাকা! বলুন যে ট্রেজারির টাকা ভাগ করা হচ্ছে, না এলে ভাগ পাবে না। যা খুশি বলুন গিয়ে—মোদ্দা তাড়াতাড়ি করুন। লোহা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর পিটোনো যায় না—ইংরেজিতে একটা কথা আছে। এখন যদি বেরিয়ে না আসে তো সকালবেলা ঐ ইংরেজগুলোই বেশী লোভ দেখিয়ে নিজেদের দলে টেনে নেবে। যান—দেরি করবেন না।'

নেতৃত্ব করবার জন্মগত অধিকার নিয়ে কোন কোন মানুষ জন্মায়। আমিনাও সেই শ্রেণীর মানুষ। তার কথা বলবার ভঙ্গিতেই এমন এক অলংঘ্য নির্দেশ ছিল যে, টীকা সিং সে নির্দেশ কোথা থেকে, কার কাছ থেকে আসছে, তা জানবার জন্যও থামল না। সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে ভিড়ের মধ্যে চলে গেল তখনই।

অধৈর্য আমিনাও আর পেছনে অপেক্ষা করতে পারল না। যতটা সম্ভব ভিড় সরিয়ে একেবারে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। যারা ঘোড়ার চাপে সরতে বাধ্য হয়, তারা দু-এক জন যে রোষকষায়িত নেত্রে না তাকাল তা নয়, কিন্তু সশস্ত্র সর্দার খাঁ ও আজিমুল্লা খাঁকে দেখে আর কোন কথা বলতে সাহস করল না। মহিলার অগ্রাধিকার অগত্যা মেনে নিল।

যখন আর কিছুতেই আগে যাওয়া গেল না, তখন আমিনা এক অসমসাহসিক কাণ্ড করল। নিজের ঘোড়া সর্দার খাঁর ঘোড়ার পাশে নিয়ে গিয়ে তার কাঁধে ভর দিয়ে সোজা ঘোড়ার ওপরই উঠে দাঁড়াল।

॥ ৩২ ॥

টীকা সিং আমিনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। গলার আওয়াজ চড়া—এমন দেখে দুজন সওয়ারকে সে পাঠাল ছাপ্পান্ন নম্বর ও তিপ্পান্ন নম্বরের লাইনে। তারা চারদিকের সব কোলাহল ডুবিয়ে নিজেদের বক্তব্য অধিকাংশের কানে পৌঁছে দিল—আমিনারই শেখানো কথা—'ভাই সব, মন দিয়ে শোন। ট্রেজারির টাকা আমরা হাতে পেয়েছি। এখানকার সিপাহীদের মধ্যেই তা ভাগ হবে। কিন্তু যারা এর মধ্যে আমাদের দলে আসবে না বা আজ রাতে ট্রেজারিতে উপস্থিত হবে না, তারা সে টাকার কোন ভাগ পাবে না। সূর্যোদয়ের পর আর কারুর কোন দাবি গ্রাহ্য হবে না।'

ছাপ্পান্ন নম্বরের মধ্যে অনেকেই উসখুস করে উঠল—শুরু হল সলাপরামর্শ। একটু পরে গুঞ্জন—তার পর একে-একে দুয়ে-দুয়ে বন্দুক কাঁধে করে এসে উঠল

এধারের সড়কে, যেখানে টীকা সিং-এর অনুগামীরা দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে তাদের 'দোস্ত্' আর 'ভাইয়া'দের প্রতীক্ষা করছে। দেখতে দেখতে ছাপ্পান্ন নম্বরের ব্যারাক প্রায় খালি হয়ে গেল।

বিদ্রোহীদের কোলাহল ও জয়ধ্বনি বহু দূরে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

আমিনা আরও খানিকটা অপেক্ষা করে আজিমুল্লাকে পাঠাল তিপ্পান্ন নম্বরের খবর সংগ্রহ করতে। সে নিজে সেখান থেকে নড়ল না—ফিরতে তো রাজী হলই না। আজিমুল্লা অনেক অনুরোধ করলেন—প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি নিজে প্রাসাদে গিয়ে খবর পৌঁছে দেবেন, কিন্তু আমিনা কোন কথাই কানে তুলল না। বলল, 'এর শেষ না দেখে আমি নড়ব না খাঁ সাহেব—আপনি মিছেই সময় নষ্ট করছেন।'

অগত্যা আজিমুল্লাকেই হার মানতে হল।

অনেকক্ষণ পরে শেষ-রাত্রের দিকে তিনি ফিরে এসে দুঃসংবাদ দিলেন, 'তিপ্পান্ন নম্বরের হাওয়া ভাল নয় বেগমসাহেবা, ওরা বোধ হয় ইংরেজদের ছাড়বে না। ওদের মধ্যে সাত-আট জন চলে গিয়েছে, কিন্তু বাকি কারুর ইচ্ছে নেই।'

অসহিষ্ণু বিরক্তিতে আমিনা নিজেরই ঠোঁট কামড়ে ধরে রক্তাক্ত করে ফেলল।

এদিকে আজিমুল্লার কথা শেষ হবার আগেই প্যারেডের বিউগ্‌ল বেজে উঠল। শেষ-রাত্রেই প্যারেড ডাকা হয়েছে—কতকটা অবশিষ্ট সৈন্যদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করার জন্যই। আমিনা উদ্‌গ্রীব হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। তিপ্পান্ন নম্বর এবং ছাপ্পান্ন নম্বরেরও কয়েক জন যথারীতি এসে মাঠে সারি দিচ্ছে।

আমিনার চোখ দুটো সেই আবছা অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলতে লাগল। অকস্মাৎ সে দাঁতে দাঁত চেপে আজিমুল্লাকে বলল, 'আর এক ঘণ্টার মধ্যেই তিপ্পান্ন নম্বরও আপনাদের সঙ্গে মিলবে খাঁ সাহেব—আমি ব্যবস্থা করছি!'

সে আর দাঁড়াল না—কিছু খুলে বললও না। প্রাণপণে—বলতে গেলে উর্ধ্বশ্বাসে, ঘোড়া ছুটিয়ে প্রাসাদের দিকে রওনা হল। এমন কি, যাওয়ার আগে একটা বিদায়-সম্ভাষণ পর্যন্ত জানিয়ে গেল না আজিমুল্লা খাঁকে।

* * *

আরও আধঘণ্টাখানেক পরে উদ্বিগ্ন, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হুইলার সাহেবের আর্দালী এসে সাহেবের হাতে লেফাফায় আঁটা এক চিঠি দিল—চিঠির ওপর পরিচ্ছন্ন ইংরেজিতে হুইলার সাহেবের নাম লেখা। আর্দালী জানাল—কে এক বোরখা-পরিহিত স্ত্রীলোক এসে তার হাতে এই চিঠিখানা দিয়েই চলে গেছে।

হুইলার সাহেব তখন একা তাঁর টেবিলে এক পেয়ালা ঠাণ্ডা কফি সামনে নিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন। সংবাদটা তাঁর মাথায় ঢুকতেই কিছু বিলম্ব হল। তিনি বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে আর্দালীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার নামে চিঠি এনেছে? মেয়েছেলে? বোরখা-পরা স্ত্রীলোক? কী লিখেছে সে চিঠিতে?'

আর্দালী মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'আজ্ঞে, তা বলতে পারব না।

খামে-আঁটা চিঠি। এই যে—'

সে চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরল।

হুইলার সাহেব চিঠিটা হাতে করে আরও বিস্মিত হলেন। পরিচ্ছন্ন ইংরেজিতে খামের ওপর নাম লেখা। মুক্তার মত হরফ—তবু বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, কোন স্ত্রীলোকেরই লেখা।

ইংরেজি-জানা আর কে এমন স্ত্রীলোক এখনও শহরে আছে? আর কীই বা সে চায় তাঁর কাছে?

খামখানা খুললেই সন্দেহভঞ্জন হয়—তবু হুইলার সাহেব কয়েক মুহূর্ত সেটা হাতে করেই বসে লেখিকার নাম অনুমান করবার চেষ্টা করেন। মিসেস গ্রীনওয়ে? মিসেস টেলর? আর কে হতে পারে?

অবশেষে খামখানা ছিঁড়তেই হল।

তেমনি মুক্তার মত হস্তাক্ষরে পরিচ্ছন্ন চিঠি। নির্ভুল ইংরেজিতে লেখা। ছোট্ট চিঠি, কয়েক ছত্র মাত্র—

"প্রিয় জেনারেল হুইলার, বিদ্রোহীদের মধ্যে বন্দোবস্ত হয়েছে—এক দল সৈন্য বিশ্বস্ত থাকবার ভান করে আপনাদের অবরোধের মধ্যে থাকবে। তার পর কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে ভেতর থেকে আপনাদের আকস্মিক আক্রমণে বিপর্যস্ত করবে। সতর্ক থাকবেন।—জনৈক বন্ধু।"

চিঠিখানা পড়ে হুইলার অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তার পর আর্দালীকে পাঠিয়ে লেফটেনাণ্ট য়্যাশেকে ডেকে আনালেন।

য়্যাশে আসতে নীরবে চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলেন হুইলার। য়্যাশের পড়া শেষ হলে প্রশ্ন করলেন, 'কী বুঝলে?'

'কে লিখল চিঠিখানা, আর কী মতলব—তাই ভাবছি।'

'আমার মনে হয়, নানাসাহেবের যে কে এক ইংরেজি-জানা বেগম আছে শুনেছি—এ চিঠি তারই লেখা!'

'হতে পারে। কিন্তু তা হলে এ চিঠি কি খুব নির্ভরযোগ্য মনে হয় আপনার?'

'কেন নয়? শুনেছি কনভেণ্টে পড়েছে, ইংরেজদের সে ভালবাসে—তার পক্ষে একটু সময় থাকতে আমাদের হুঁশিয়ার করে দেওয়াটাই তো স্বাভাবিক!'

য়্যাশে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তা হলে কী করবেন ভাবছেন?'

'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। বেশির ভাগই তো গেছে—ও-কটাকেও তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাক!...এমনিই হয়তো যাবে—আজ না হয় কাল, মিছিমিছি এ অনিশ্চয়তা আর সহ্য হচ্ছে না—সব যাক!'

'তা বলে আমরা স্বেচ্ছায় ওদের ঠেলে দেব ঐ বিশ্বাসঘাতকগুলোর মধ্যে? যদি সত্যই ওরা বিশ্বস্ত হয়?'

'যদি না হয়? যদি এই চিঠিই সত্যি হয়? ঘরের মধ্যে শত্রু পুষে রাখা কি ভাল? বরং যে কজন আছি, নিজেরা নিজেদের জোর বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে আত্মরক্ষা করাই ভাল!'

য়্যাশে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তা এখন আমাকে কী করতে বলেন?'

হুইলার হঠাৎ যেন বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'আমাকেই সব বলতে হবে? কনে

তোমরা কি কেউ কোন ঝুঁকি নিতে পার না ? বেশ, আমি বলছি, যাও, ওদের ওপর গোলা চালাও—সোজা।'

য়্যাশে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

'ওদের ওপর গোলা চালাব ? কামান থেকে ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—কানে কম শুনেছ নাকি ?'

নিজের ঠোঁট দুটোয় একবার জিভ বুলিয়ে নিয়ে একবার ঢোঁক গিলে য়্যাশে তবু বললেন, 'বেচারীরা হয়তো এখন নিশ্চিন্ত মনে রসুই পাকাতে বসেছে, এ সময় সেটা কি ভাল হবে ?'

'ওঃ, বড় যে দয়া দেখছি ! আমরা যখন নিশ্চিন্ত মনে খেতে বসব, ওরা যদি সে সময় আমাদের ওপর গুলি চালায় সেইটেই বড় ভাল হবে—না? শয়তান বেইমানের জাত ওরা—সব সমান। যাও, যা বলছি তাই কর গে।'

য়্যাশে নীরবে অভিবাদন জানিয়ে বের হয়ে গেলেন।

তিপ্পান্ন নম্বর রেজিমেণ্টের তখন সত্যিই রসুই চড়েছিল। কেউ বা উর্দি খুলে তেল মাখতে বসেছে—কেউ বা উর্দি পরেই বসে তামাক টানছে।

এমন সময় কে একজন খবর দিল ছাপ্পান্ন নম্বরের যারা কাল চলে গিয়েছিল, তাদেরই কয়েক জন এসে তোশাখানা থেকে সিন্দুক বার করে ভাঙছে এবং নিশানগুলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। একজন সার্জেণ্ট বাধা দিতে গিয়েছিল—তাকে কেটে ফেলেছে।

একজন হাবিলদার সবে গুড়গুড়ি মুখে তুলেছিল, সে সেটা নামিয়ে রেখে কোমরে বেল্ট আঁটতে আঁটতে ছুটল—'আডজুটাণ্ট' সাহেবকে খবর দিতে। এমন সময় অকস্মাৎ একসঙ্গে তিনটি কামান তাদের দিকে মুখ করেই অগ্ন্যুদ্গার করে উঠল।

গুম্—গুম্—গুম্ !

সকলে স্তম্ভিত—হতচকিত !

তাদেরই কামান তাদেরই ওপর ছোঁড়া হচ্ছে !

তারা ভুল দেখছে না তো ?

তাদের এই সংশয়ের জবাব দিতেই বোধহয় কামানগুলি আবারও গর্জন করে উঠল।

গুম্—গুম্—গুম্ !

তার পর আরও এক বার। আর সংশয়ের অবকাশ রইল না।

যে যেদিকে পারল ছুটল। যেমন অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই। যারা শুধু কপ্‌নি পরে তেল মাখছিল, তারা জামা-উর্দি পরবারও অবসর পেল না। কোনমতে এক হাতে সেগুলো আর এক হাতে বন্দুকটা আঁকড়ে ধরে সেই হাস্যকর অবস্থাতেই দৌড়ল।

দেখতে দেখতে ব্যারাক খালি হয়ে গেল। তবে একেবারে নয়। তবু রয়ে গেল কয়েক জন। যাদের কাছে জানের চেয়ে নিমকের মূল্য বেশি, তারা কিছুতেই ব্যারাক ছেড়ে নড়ল না। য়্যাশে ইঙ্গিতে গোলন্দাজদের নিরস্ত করলেন—আর নয়।

সেদিক থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছতে মুছতে য়্যাশে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী টমসনকে বললেন, 'অনেক নির্বুদ্ধিতার পরিচয়

দিলাম আমরা এই ক'দিনে—একের পর এক। কিন্তু আজকের এইটেই বোধ হয় চরম। ইতিহাসে এর দ্বারাই আমরা সবচেয়ে বড় বেকুবদের মধ্যে স্থান করে নিতে পারব।'

॥ ৩৩ ॥

নানা ধুন্ধুপন্থও সেদিন সারা রাত ছাদের ওপর থেকে নামলেন না। প্রায় সমস্তক্ষণই একটা দূরবীন চোখে দিয়ে ছাউনির দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিলেন। অনুচরদেরই প্রাণান্ত—বেচারী মংগরকর আর তেওয়ারীকে মুহুর্মুহু ছুটতে হচ্ছে ছাউনিতে- সর্বশেষ এবং নির্ভুল সংবাদের জন্য, আবার তেতলা ভেঙে সে সংবাদটা নানাকে পেঁছে দিতে হচ্ছে।

আরও মুশকিল এই যে, যাদের ওপর নানার বেশী ভরসা, যারা ওঁকে অবিরত উৎসাহ দিয়ে তাতিয়ে রাখে—আজ তাদের কারও পাত্তা পাচ্ছেন না। অবশ্য তাদের এমন দিনে প্রাসাদে পাবেন—এরকম আশাও করেন নি। এত দূর থেকে দূরবীন দিয়েও দেখা শক্ত—বিশেষত এই অন্ধকারে, তবু যেন নানার ধারণা, ঘোড়সাহেবের ঘর যখন পুড়ছিল, আগুনের আভায় তাত্যা ও আজিমুল্লা দুজনকেই তিনি দেখেছিলেন। বোধ হয় টীকা সিং-এর সঙ্গে দাঁড়িয়ে মন্ত্রণা করছিলেন দুজনে।

আমিনার খোঁজেও একবার লোক পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু খবর এল যে, বেগমসাহেবার মাথা ধরেছে। খবরটা শুনে নানা হেসেছিলেন। এ মাথা ধরার অর্থ নানাসাহেব বোঝেন। এমন দিনে হুসেনী ঘরের কোণে বসে থাকতে পাববে না—তা তিনি ভাল করেই জানেন।

কিন্তু শেষরাত্রে যখন এক সময় তেওয়ারী এসে খবর দিল যে, হুসেনী বেগমসাহেবা ও আজিমুল্লা খাঁকে সে ছাউনির ভেতর এক জায়গায় পাশাপাশি ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, তখন নানার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ আগেকার সে সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভাবটা আর একদম রইল না। খানিকটা গুম খেয়ে থেকে আর একটা লোককে ডেকে হুকুম করলেন, হুসেনী বেগমের ঘরের সামনে মোতায়েন থাকতে এবং বেগমসাহেবাকে ফিরতে দেখলেই সংবাদ দিতে।

এর পর থেকে ঘণ্টাখানেক কাল নানাসাহেব আরও অস্থির হয়ে রইলেন। ওধারের খবরও খুব ভাল নয় এখনও। সত্য বটে, এক তিপ্পান্ন নম্বর ছাড়া আর সব রেজিমেন্টই বেরিয়ে এসেছে এবং প্রথম করণীয় হিসেবে যা কিছু করা দরকার সবই করেছে—জেলখানা খুলে দেওয়া, ট্রেজারি লুট করা, মহল্লায় আগুন লাগানো—কোনটাই বাদ যায় নি, তবু তিপ্পান্ন নম্বর ওদিকে থেকে গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কই? একে তো মুষ্টিমেয় সাহেবই যথেষ্ট, তার ওপর যদি একটা পুরো রেজিমেণ্ট তাদের সঙ্গে থাকে তো রীতিমত বেগ দেবে—তাতে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আরও একটা সংশয় নানাসাহেবকে প্রথম থেকেই সুস্থির থাকতে দিচ্ছে না। তাঁর স্বদেশীয় সেনাদের মোটামুটি তিনি চেনেন—লুটপাট এবং অরাজকতার স্বাদ পেলে আবার কি তাদের সহজে শৃঙ্খলার মধ্যে আনা যাবে? শেষ অবধি তাঁর কোন সুবিধা হবে কি? কতকগুলো লুটেরার দুষ্কৃতির সাক্ষী হয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। লক্ষ্ণৌতে সেই প্রথম দিন

রাত্রে মহম্মদ আলি খাঁর কথাগুলি তিনি ভোলেন নি। যুদ্ধ আর অরাজকতা এক নয়। লুটতরাজ ও বিদ্রোহে অনেক তফাত। পিতার কাছে নানাসাহেব ভারত-ইতিহাসের অনেক কথাই শুনেছেন। বাদশা নবাব বা রাজা—যিনিই সৈন্যদের যথাসময়ে বেতন দিতে না পেরে বা অন্য কোন কারণে তাদের খুশী করবার উদ্দেশ্যে লুটের পথ দেখিয়েছেন, তিনিই বিপন্ন হয়েছেন। সে কথা জানার পরও—তাঁরাও আবার সেই ভুল করে বসছেন না তো?

আর এই হুসেনী বেগম?

আশ্চর্য! এই এক প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সামনে দাঁড়িয়েও তিনি পুরোপুরি সেই ঝড়ের কথাটা ভাবতে পারেন না কেন? এখন, এই চরম সংকটকালে তুচ্ছ হুসেনী বেগমের অন্তরের কথাটাই এত বড় হয়ে দাঁড়ায় কেন?

হুসেনী বেগম ও আজিমুল্লা?

না, এটা নিতান্তই সহকর্মীর ঘনিষ্ঠতা। নানাসাহেব মনকে এত ছোট হতে দেবেন না। আর হুসেনীর মত সেবিকার অভাবই বা কি?

ললাটের ঘাম মুছতে মুছতে নানাসাহেব মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেন।...

তবু চিন্তাটা কাঁটার মত খচ খচ করতেই থাকে। তিনি নিজে ত্যাগ করেন সে কথা আলাদা। কিন্তু তাঁরই দুজন বেতনভোগী নরনারী তাঁকে বোকা বানাবে এ চিন্তাও যে অসহ্য।...

ওদিকে জনরোল ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছিল। নানা কান পেতে শোনেন—"দীন! দীন!" "আল্লা হো আকবর!" "হর হর মহাদেও!" এবং "বাদশা বাহাদুর শাহ্ কী জয়!" এই শব্দের সঙ্গে যেন একবার "পেশোয়া নানা ধুন্ধুপন্থ কী জয়"-ও শোনা গেল না?

এই প্রথম!

আনন্দে নানাসাহেবের চোখে জল এসে গেল।

তিনি ওপরের দিকে দু হাত তুলে ইষ্টদেবকে প্রণাম জানালেন।

উদ্বেলিত চিত্তে নানাসাহেব নিজেই নীচে আসবার উদ্যোগ করছেন, গণপৎ এসে সংবাদ দিল—হুসেনী বেগম মহলে ফিরে এসেছেন। নানাসাহেবের বুকটায় আবারও খচ করে একটা বিঁধল কি? বিঁধলেও তা অনুভব করবার জন্য তিনি থামলেন না—জোর করে প্রশ্নটা মন থেকে দূর করে দিয়ে প্রধানত খবরটা শোনবার কৌতূহলেই প্রথম বয়সের মত একসঙ্গে দু-তিনটা ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করে দ্রুতবেগে নেমে এলেন এবং বাকি পথটুকু প্রায় ছুটেই পার হয়ে আমিনার ঘরে পেঁছিলেন।

আমিনা তখনও তার গায়ের চাদর খোলে নি—সেখানা তখনও তেমনি সর্বাঙ্গে জড়ানো। বহুলোকের পদক্ষেপে ও অশ্বক্ষুরে ছাউনির কাছটা কুয়াশার মতই ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়েছিল। সে ধুলো তার সুন্দর মুখে, বঙ্কিম ভ্রূতে এবং ঘনকৃষ্ণ কেশদামের ওপর পুরু হয়ে জমেছে। দ্রুত আসার ফলে ললাট ও কণ্ঠ স্বেদাক্ত হয়ে উঠেছে। সে ঘাম ধুলোর সঙ্গে মিশে কাদার মতই দেখাচ্ছে। কিন্তু আমিনার সে সব কোন দিকে লক্ষ্য নেই, মুখটা মোছবার কথাও তার মনে পড়ে নি। সে যেমন এসেছে, তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাউকে বোধ হয় একটা চিঠি লিখছে। চেয়ার টেবিল আছে, কিন্তু দেরাজ থেকে কাগজ বার করে টেবিলে বসে লেখার যেটুকু বাড়তি সময় তাও সে নষ্ট করতে রাজী নয়। দেরাজের

ওপরই কাগজটা রেখে খস্‌খস্‌ করে অত্যন্ত দ্রুতবেগে লিখছে।

নানাসাহেব হাসিহাসি মুখে ঘরে ঢুকে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'হুসেনী, আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে খুঁজছি!'

হুসেনী এদিকে না চেয়ে বা কলম না থামিয়েই শুধু বাঁ হাতের তর্জনী তুলে ছোট্ট শিশুর মতই তাঁকে নিরস্ত করল, 'চুপ!' '

নানাসাহেব স্তম্ভিত!

চিঠি অবশ্য প্রায় তখনই শেষ হয়ে গেল। একটা খামে মুড়ে সেইভাবেই দাঁড়িয়ে হুসেনী প্রাপকের নাম লিখল।—তার কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নানাসাহেব নামটা পড়লেন—সার হিউ হুইলার!

সর্বনাশ!

নানা আরও বিস্মিত হয়ে বলতে গেলেন, 'হুসেনী, এ কি ব্যাপার! এ চিঠি—'

'চুপ! চুপ করুন!'

আমিনা এইবার সেই রেশমী চাদরটা গা থেকে খুলে ফেলল। তার পর ছুটে আলনার সামনে গিয়ে দু-তিনটে জামা-পাজামা ছুঁড়ে সরিয়ে একটা সাধারণ বোরখা বার করল এবং সেটা মাথায় গলাতে গলাতেই ছুটল দরজার দিকে।

কিন্তু নানাসাহেব তার পেঁছবার আগেই ক্ষিপ্রতর গতিতে গিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়ালেন, 'কোথায় যাচ্ছ হুসেনী—তোমাকে যে আমার দরকার।'

হুসেনী অসহিষ্ণু কঠিন কণ্ঠে বলল, 'পথ ছাড়ুন! আমি এখনই ফিরে আসছি।'

'তুমি যাচ্ছ কোথায়—তাই আগে শুনি!'

'হুইলার সাহেবকে এই চিঠিটা পেঁছে দিতে।'

'হুইলার সাহেবকে? তুমি চিঠি পেঁছে দেবে?'

'আঃ পেশোয়া, সরুন, ছেলেমানুষি করবেন না! আর আধঘণ্টার মধ্যে তিপ্পান্ন নম্বরকে ওদের কাছ থেকে বার করতে না পারলে সর্বনাশ হবে। এ কাজের ভার আর কাউকে দিয়ে আমি স্বস্তি পাব না। আর কেউ হয়তো সাহস করে যেতেও চাইবে না।'

'হুসেনী, তোমার আচরণ এবং ভাষা দুই-ই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে!' বিদ্বেষ আর নানাসাহেবের কণ্ঠে চাপা থাকে না, 'কাল সারারাত কোথায় কিভাবে কাটিয়েছ, আমি তার কৈফিয়ত চাই। আমার বিনা হুকুমে তুমি গিছলে কোথায়? আমি একেবারে শিশু নই—খবর আমার কানেও পেঁছয়! আজিমুল্লার সঙ্গে অত কিসের গলাগলি তোমার? হাজার হোক সে আমার চাকর—তার সঙ্গে তোমার অত ঘনিষ্ঠতা শোভা পায় না, বুঝেছ?'

'বাঃ, চমৎকার পেশোয়া! এই তো আপনার উপযুক্ত কথা! আমরা আপনাকে সিংহাসনে বসাবার জন্য প্রাণান্ত করছি, আর আপনি কোন কাজ তো করছেনই না—ঈশ্বর সে শক্তিও বোধ করি দেন নি আপনাকে—এই সব তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন!...আজিমুল্লা আপনার চাকর ঠিকই, কিন্তু সেই চাকরের অর্ধেক বুদ্ধি এবং কর্মশক্তি যদি আপনার থাকত পেশোয়া তো আপনার সিংহাসনটা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতুম! মহারাজ, যখন এক লহমার মূল্য একটা রাজ্যখণ্ড, তখন আপনি এই হাস্যকর তুচ্ছতায় সময় নষ্ট করছেন—

একথা শুনলে আপনার চাকর-বাকররা তো বটেই, আপনার পোষা কুকুর-বেড়ালগুলো পর্যন্ত বোধ হয় হাসাহাসি করবে!...আপনি চুপ করুন, সরে দাঁড়ান, আর কোন কাজ না থাকে তো বরং আদালার ঘরে যান। সে-ই আপনার যোগ্য সহচরী, পাশে বসে আপনার কাছে নতুন নতুন অলঙ্কারের ফর্দ পেশ করবে, আর আপনি শুয়ে শুয়ে সেগুলোর মূল্য হিসেব করবেন মনে মনে—তবু একটা কাজ পাবেন।'

সে একরকম নানাসাহেবকে ঠেলেই সরিয়ে বার হয়ে গেল।

প্রথমটা নিজেরই রক্ষিতা উপপত্নীর এই ঔদ্ধত্যে ও অসহ স্পর্ধায় নানা-সাহেবের চোখমুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল, কী একটা কঠিন আদেশ দেবার জন্য বোধ হয় একবার মুখও খুলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে উদ্যত রসনা আপনিই স্তব্ধ হয়ে গেল। হুসেনীর সমস্ত আচরণে এবং বাক্যে যে দৃঢ়তা, আত্মপ্রত্যয় এবং নানার স্বার্থ সম্বন্ধে সত্যকার নিষ্ঠা প্রকাশ পেল—তাতে সত্যি সত্যিই নিজেকে তার কাছে বড় ক্ষুদ্র বোধ হতে লাগল। কিল খেয়ে যেমন সময় সময় মানুষ সে কিল চুরি করে—তেমনি ভাবেই বহুক্ষণ নীরবে নতমস্তকে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে নানা নিজেকে সামলে নিলেন। তার পর ধীরে ধীরে মাথা নীচু করেই এক সময় সে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

নানাসাহেব ওখান থেকে এসে স্নান সেরে পুজোয় বসলেন। আজ তাঁর জীবনে এক নতুন দিন শুরু হতে চলল—ইষ্টপুজো না করে সেদিন শুরু করা তাঁর উচিত মনে হল না।

কিন্তু পুজোয় বসলেও পুজোয় মন দিতে পারলেন না। নিজের মানসিক উত্তেজনা তো আছেই ; গতকাল সারা রাত ধরে যে দৃশ্য দেখেছেন - তা তাঁর কাছে এক অভূতপূর্ব ঘটনা, কল্পনাতীত ব্যাপার, সমস্ত অভিজ্ঞতার বাইরে। তিনি জ্ঞান হওয়া অবধি দেখেছেন ইংরেজ এদেশে প্রভু, সর্বশক্তিমান—সকলেরই ভীতি ও সম্ভ্রমের পাত্র। সেই ইংরেজ-শক্তির মূলে এমন ভাবে নাড়া দেওয়া যায়, এ কথা বিশ্বাস করবার মত কোন কারণই জানা ছিল না এতকাল। তাই যে উচ্চাশা মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হতে গিয়ে সংশয় ও ভয়ের আওতায় এতকাল কোনমতে মাথা তুলতে পারে নি, আজ তাই যেন আকাশের দিকে সহস্র বাহু বিস্তার করেছে।

অন্যমনস্কতার কারণ কিন্তু বাইরেও যথেষ্ট।

কোলাহল ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। সে জন-কোলাহল যেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রতরঙ্গের গর্জন বলে বোধ হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে যে সে সমুদ্রের ঢেউ এদিকেই আসছে।

এরই মধ্যে এক সময় পর পর তিন বার কামানের শব্দ তাঁর কানে এল।

বিষম চমকে উঠলেন নানাসাহেব।

এ তো ম্যাগাজিনের কামান নয়। সিপাহীরা নিশ্চয় এরই মধ্যে সেগুলো এখানে এনে ফেলতে পারে নি। তা ছাড়া শব্দ শুনে মনে হচ্ছে এ ছোট ছোট কামানের গোলা—সম্ভবত 'নাইন পাউণ্ডার'। ছাউনির ভেতরের কামান এগুলো।

তবে কি এর মধ্যেই ইংরেজরা প্রস্তুত হয়ে গেল ?

ঐ মুষ্টিমেয় ইংরেজ—প্রায় নিরস্ত্রই বলা চলে, তাঁদের আক্রমণ করতে সাহস করল ?

বিবর্ণ হয়ে উঠল নানাসাহেবের মুখ। বিশ্বাস নেই—ওরা সব পারে!

ছুটে বাইরে যেতে গিয়েও আত্মসংবরণ করলেন নানা। ইষ্টপুজা অসমাপ্ত রেখে ওঠা উচিত হবে না।

ইংরেজের চেয়ে ভগবান কম শক্তিশালী নন।

নানা আবার চোখ বুজে ধ্যানে মন দিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই বালাসাহেব দরজার বাইরে থেকে খবরটা দিয়ে গেল—কণ্ঠে তার উল্লাস ও বিজয়গর্ব কোনমতেই চাপা থাকছে না, 'দাদা, শুনেছ, মরণকালে নাকি বিপরীত বুদ্ধি হয়—তাই হয়েছে ঐ শুয়োরের বাচ্চাগুলোর! তিপ্পান্ন নম্বর রেজিমেণ্ট—না এদের ভয় দেখানোতে, আর না লোভ দেখানোতে—কিছুতেই টলে নি, এতক্ষণ অবধি নিমক বজায় রেখেছিল—তাদের ওপরই কিনা কামান চালাল ব্যাটারা!...আমি তো প্রথমটা নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না!'

জয় গণপতি ভগবান!

নানাসাহেব মাথা নুইয়ে একটা অতিরিক্ত প্রণাম জানালেন। তার পর কথা না বলার চেষ্টায় একটা 'হু'-উ'-উ'' শব্দ করলেন—অর্থাৎ প্রশ্ন করতে চাইলেন, 'তার পর কী হল?'

সে প্রশ্ন বালাসাহেব বুঝল।

সে বলল, 'হবে আর কী? ওরা হুড়মুড় করে পালাচ্ছে। বেশ হয়েছে—উচিত শিক্ষা হয়েছে। দেশের লোক হল না ওঁদের আপন, ওঁরা বেশী বেশী নিমকহালালি দেখাতে গিয়েছিলেন—উপযুক্ত পুরস্কারই পেয়েছেন!'

বালাসাহেব আবারও ছুটে ওপরে চলে গেল দেখতে।

অকস্মাৎ নানাসাহেবের মনে পড়ে গেল হুসেনীর কথাটা—'আর সময় নেই, আধঘণ্টার মধ্যে ওদের বার করতে না পারলে—'

তা হলে কি এই আপাত উন্মত্ত আচরণের মূলে হুসেনীই আছে? ঐ চিঠিটার ফলেই কি হুইলার সাহেব এমন কাজ করে বসলেন কী ছিল সে চিঠিতে কে জানে!

নিশ্চয়ই তাই। সে রকম আত্মপ্রত্যয় না থাকলে হুসেনী তাঁর সঙ্গে অমন-ভাবে কথা বলতে পারত না। বাহবা হুসেনী! বহুত বহুত বাহবা!

আজও সখেদে মনে হল, হুসেনী যদি মুসলমানী না হত, মহিষী হবার উপযুক্ত মেয়ে! তামাম হিন্দুস্থানের তখ্‌তে বসবার মত।

ওধারে গর্জন বেড়েই চলেছে।

সিপাহীরা বোধ করি দল বেঁধে এদিকেই আসছে।

নানাসাহেব ব্যস্ত হয়ে পুজোর আসন থেকে উঠে পড়লেন। পট্টবস্ত্র ছেড়ে তাড়াতাড়ি নিজের অভ্যস্ত পোশাক পরে নিতে হবে। ওরা বোধ হয় প্রাসাদে এসে পড়েছে—এখনই হয়তো তাঁর দেখা চাইবে!...

আর ঘটলও তাই। তাত্যা টোপী প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে তাঁর সেই ভেতরের ঘরেই ঢুকে পড়লেন।

'পেশোয়া, পেশোয়া, ওরা এখনই একবার আপনার দেখা চাইছে, কোন কথা শুনতে চাইছে না। ঐ শুনুন ওরা কী বলছে।'

'ওরা মানে—সিপাইরা?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কারা! কান পেতে শুনুন!'

ভাল করেই শোনবার চেষ্টা করলেন পেশোয়া। কিন্তু মেঘগর্জনের মত বহু লোকের কোলাহল—কিছুই পরিষ্কার বোঝা গেল না। শুধু নিজের নামটা বারকতক কানে গেল—

'নানাসাহেব !'

'পেশোয়া নানাসাহেব !'

'নানা ধুন্ধুপন্থ পেশোয়া !'

নানাসাহেব প্রসন্ন গম্ভীর মুখে বললেন, 'তুমি যাও, বল গে ওদের—আমি এখনই যাচ্ছি।'

কোনমতে তাড়াতাড়ি পোশাকটা পরে নিলেন নানাসাহেব। তার পর মাথায় উষ্ণীষ এঁটে, কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে একেবারে নরপতির উপযুক্ত সাজে নেমে এলেন।...

বাইরে আসতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে চোখ জুড়িয়ে গেল তাঁর। সামনের খালি জায়গাটা, তার পরও বহু দূর পর্যন্ত, এমন কি সড়কটা পার হয়ে সাহেবদের থিয়েটার-ভবন অবধি সিপাহীতে ভরে গিয়েছে—সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত, সশস্ত্র সিপাহী। যে-কোন রাজার যে-কোন সরকারের গর্ব করবার মত। যে-কোন যুদ্ধে যে-কোন শত্রুর সম্মুখীন হতে পারে এরা। দু রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী, দু রেজিমেণ্ট পদাতিক—তার সঙ্গে তার একদল গোলন্দাজ।... সেদিকে চেয়ে নানাসাহেবের ধমনীর প্রায়-শীতল রক্তও চঞ্চল হয়ে উঠল। তাঁর নিজেরও অভিজ্ঞতা নেই সত্য কথা, কিন্তু তাঁর পূর্ব-পুরুষরা কিছুদিন আগেও যুদ্ধযাত্রা করেছেন। তাঁর রক্তকণা থেকে পিতৃপিতামহের শৌর্যের সে স্মৃতি আজও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। সেই ঐতিহ্যই আজ বোধ করি তাঁর রক্তে নতুন নেশা ধরাল। এই বাহিনীর নেতৃত্ব করবার আগ্রহে তিনি উন্মুখ ও অধীর হয়ে উঠলেন।

কে এক জন—সম্ভবত বালাসাহেবই ইতিমধ্যে ঠিক প্রাসাদ-দ্বারের সামনে একটা চৌকি পেতে তার ওপর সিংহাসনের মত একখানা ভেলভেট-মোড়া কুর্সি সাজিয়ে রেখেছিল। নানা ধীর মর্যাদাব্যঞ্জক পদক্ষেপে সেই চৌকির ওপর উঠে অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ সেনানায়কের মতই দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন।

ইতিমধ্যে সিপাহীদের সেই সারি থেকে নেতৃস্থানীয় কয়েক জন সামনের দিকে এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে একেবারে পুরোভাগে যারা তাদের তিনি চেনেন—সুবাদার টীকা সিং, জমাদার দুলগঞ্জন সিং এবং সুবাদার গঙ্গাদীন। এদের পেছনে পেছনে যে সব সওয়ার এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে শামসুদ্দীন খাঁর চেহারাটাও যেন তাঁর নজরে পড়ল।

ওরা নানার বেদীর সামনে এসে সামরিক কায়দাতেই অভিবাদন করে দাঁড়াল।

সুবাদার গঙ্গাদীন একটা হাত তুলে পেছনের কোলাহল বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'মহারাজ, আমরা আপনাকে আমাদের নেতৃত্ব করবার আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। এই বিজয়ী সৈন্যবাহিনী আপনারই আদেশের ও নির্দেশের অপেক্ষা করছে। মহামান্য পেশোয়া, এক বিশাল রাজ্যখণ্ড এবং শক্তিশালী সিংহাসন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে জানবেন—যদি আপনি আমাদের আনুকূল্য করেন। আর যদি আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন বা প্রতিকূলতা করেন তো আপনাকে অপসারিত করেই আমাদের জয়যাত্রা শুরু করতে বাধ্য হব আমরা।'

বক্তব্য শেষ করে আবারও সামরিক কায়দায় সে অভিবাদন করল।

পেছন থেকে সেই অগণিত সিপাহীদের দল গঙ্গাদীনের জয়ধ্বনি করে উঠল।

গঙ্গাদীনের শেষের কথাটায় নানাসাহেব একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করেছিলেন, কিন্তু সে নিমেষের জন্য, কেউই তা লক্ষ্য করে নি।

এখন তিনি মুখভাব যতটা সম্ভব প্রশান্ত রেখে হাত তুলে সকলকে স্থির থাকবার ইঙ্গিত করে বললেন, 'তোমরা আমার দেশবাসী, আমার আত্মীয়— আমি তোমাদেরই নেতা, তোমাদেরই সেবক। ইংরেজ আমার দুশমন—তাদের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ?'

আবারও এক বিপুল কোলাহল উঠল। উঠল নানাসাহেবের জয়ধ্বনি।

এবার টীকা সিং কথা বলল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'শপথ করুন পেশোয়া যে এর অন্যথা হবে না !'

এই নূতন অভূতপূর্ব পরিস্থিতির নাটকীয়তা নানাসাহেবকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তিনি অঙ্গুলিসংকেতে তাদের কাছে আসতে বললেন। তার পর তারা ঘোড়া থেকে নেমে নতমস্তকে আশীর্বাদ প্রার্থনার ভঙ্গিতে কাছে এসে দাঁড়ালে তিনিও সেইভাবেই সামনের দু জনের মাথায় হাত রেখে ঈষৎ উর্ধ্ব-দৃষ্টিতে প্রায় গদ্-গদ্ কণ্ঠে বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, রাজা। তোমাদের মধ্যেও নারায়ণ আছেন—এই তোমাদের মস্তক স্পর্শ করে শপথ করছি, যত দিন দেহে প্রাণ থাকবে, অথবা যত দিন না শেষ ইংরেজ এদেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করবে তত দিন অবিরাম লড়াই করব। আমি তোমাদেরই, চির দিন তোমাদের মধ্যে তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে সেই লড়াই চালিয়ে যাব—যতক্ষণ ভারত এই বিধর্মী ইংরেজদের অধীনতা থেকে মুক্তি না পায় ! প্রয়োজন হয় তো দেশমাতার এই কলঙ্ক নিজের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দেব। আজ থেকে তোমাদের ব্রত আর আমার ব্রত এক।'

আবারও নানাসাহেবের জয়ধ্বনি উঠল।

একসঙ্গে সহস্রকণ্ঠের সে জয়ধ্বনিতে এবার নানাসাহেবের ভাই, আত্মীয় এবং পরিজনরাও যোগ দিলেন নিঃসংকোচে।

তিন বার পর পর গগনভেদী জয়ধ্বনি উঠল।

তার পর আনন্দ-কোলাহল ঈষৎ শান্ত হতে টীকা সিং বলল, 'মহারাজ, আজই তা হলে যাত্রা শুরু করতে হয় !'

'যাত্রা ?' নানাসাহেব যেন স্বপ্নরাজ্য থেকে হঠাৎ বাস্তবে এসে পড়েন, 'কোথায় যাত্রা করবে ?'

'দিল্লী ! দিল্লীতে গিয়ে সমস্ত সৈন্য একসঙ্গে মিশবে—সেইটেই তো দরকার। শাহী তখ্তে আবার মুঘল বাদশা বসেছেন, লাল-কিল্লায় উড়ছে তাঁর পতাকা—সেখানে ছাড়া কোথায় যাব বলুন ! আবার শাহেনশাহের বিপুল ফৌজে হিন্দুস্থানের মাটি কাঁপবে—তার সামনে দাঁড়াতেও ভয় পাবে দুশমন ! দিল্লীই এখন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।'

সহস্র কণ্ঠে টীকা সিং-এর প্রস্তাব সমর্থিত হল।

'দিল্লী চল ! চল দিল্লী।'

'বেশ, তাই চল। আমি তোমাদের খিদ্‌মতে সদাই প্রস্তুত জানবে। কখন যাবে বল ?' নানা উদারভাবে বলেন।

আবার জয়ধ্বনি ওঠে নানাসাহেবের।

টীকা সিং আর এক দফা অভিবাদন করে বলে, 'যদি আপনার অনুমতি হয় তো আমরা এ বেলার খাওয়াটা সেরে নিয়েই রওনা দিতে পারি। আর তা হলে সন্ধ্যার আগেই কল্যাণপুরে পেঁছিতে পারব। ওখানে রাতটার মত বিশ্রাম করার যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা মিলবে। তা ছাড়া ওখানে পেঁছিলে আমরা আর সব ঘাঁটির খবরও কিছু কিছু পাব।'

নানাসাহেব বললেন, 'বেশ, তাই যাও তোমরা। তোমরা রওনা হয়েছ খবর পাবার চারদণ্ডের মধ্যেই আমি রওনা হব। সন্ধ্যার আগেই আমি কল্যাণপুরে পেঁছিতে পারব!'

আবারও জয়ধ্বনি দেয় সকলে। এই তো সেনাপতির মত, রাজার মত কথা।

গঙ্গাদীন দুহাত জোড় করে বলল, 'তা হলে পেশোয়াজী, আমাদের অনুমতি দিন আর আশীর্বাদ করুন—'

নানাসাহেব বরাভয় দানের ভঙ্গিতে ডান হাত তুলে বললেন, 'গণপতি ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন!'

॥ ৩৪ ॥

আমিনা হুইলার সাহেবের আর্দালীর হাতে চিঠিটা পেঁছে দিয়ে তখনই ফিরে আসতে পারে নি। চিঠিখানার ফলাফল শেষ অবধি কী হয়—তা নিজের চোখে না দেখেই ফেরে কেমন করে? সে খানিকটা দূরে গিয়ে খুঁজে খুঁজে উঁচু-মত একটা জায়গা বেছে নিল এবং সেইখানেই একটা বড় নিমগাছে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াল। কাজটা খুব ভাল হচ্ছে না, তা সে-ও বুঝল; চারিদিকে উন্মত্ত এবং উচ্ছৃংখল জনতা—একে তো ফৌজী সিপাহীদের ভিড় চারদিকে, তা ছাড়াও, এই সব অরাজকতার সময় যত রাজ্যের বদমাইশ-গুণ্ডা লোকও ভিড়ের সঙ্গে মিশে যায়—একাকী যুবতী স্ত্রীলোকের পথে দাঁড়িয়ে থাকা আদৌ নিরাপদ নয়। সঙ্গে পিস্তল আছে সত্য কথা, কিন্তু এখানে বেশির ভাগ লোকের হাতেই বন্দুক—এইটুকু পিস্তল এখানে আত্মরক্ষার কোন কাজেই আসবে না, বড়জোর বেগতিক দেখলে বে-ইজ্জত হবার আগে আত্মহত্যা করা চলতে পারে।

এ সবই জানে আমিনা—তবু নড়তে পারল না।

ঐ একটা রেজিমেণ্টও ইংরেজের দিকে থাকতে সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। সে চারিদিকের কৌতূহলী জনতার বক্র চাউনি এবং বক্রোক্তিতে ভ্রূক্ষেপ না করে বোরখার অক্ষিগোলকের মধ্যে দিয়ে উৎকণ্ঠিত নির্নিমেষ নেত্রে দূরে ব্যারাকের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অবশ্য তার ধৈর্য পুরস্কৃত হতেও বেশি সময় লাগল না। একটু পরেই কামান ঘুরল, তিপ্পান্ন নম্বরের লাইনে গোলা বর্ষিত হল। হতভম্ব বিমূঢ় সিপাহীর দল সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় কোনমতে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে এল—এ সবই নিজের চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রাসাদের দিকে ফিরল আমিনা।

কিন্তু এবার আর পা চলে না। গত দিনরাত্রির উদ্বেগ, অনাহার ও অনিদ্রা, অশ্বপৃষ্ঠে সারারাত কাটাবার ক্লান্তি—সব মিলে যেন এবার পা দুটোকে ভারী ও দুর্বল করে দিল। শ্রান্তিতে তার সমস্ত স্নায়ু অবশ। কোনমতে শুধুমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তিতেই সে তার প্রায়-অপটু পা দুটোকে টেনে টেনে এক সময়

প্রাসাদে পেঁছিল এবং কতকটা মাতালের মতই টলতে টলতে নিজের ঘরে পেঁছে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

মূর্ছা কি নিদ্রা—মুসম্মৎ তা বুঝল না।

তবে অপরিসীম মানসিক এবং দৈহিক ক্লান্তির কারণ আছে, এটা সে জানে বলে টানাটানি করে মূর্ছা ভাঙাবার চেষ্টা করল না। কোনমতে বোরখাটা খুলে নিয়ে ভিজে গামছায় আমিনার চোখ মুখ মুছিয়ে দিয়ে বসে বসে বাতাস করতে লাগল।

আমিনার সংজ্ঞা যখন ফিরল, তখন তৃতীয় প্রহরও উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শরবত প্রস্তুতই ছিল, চোখ মেলে উঠে বসতেই মুসম্মৎ পাত্রটা মুখের কাছে ধরল। সত্যিই তৃষ্ণায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, সে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মুসম্মতের দিকে চেয়ে পাত্রটা হাত বাড়িয়ে নিল এবং এক নিশ্বাসে সবটা নিঃশেষ করল। তার পর 'আঃ' বলে একটা দীর্ঘ আরামসূচক শব্দ করে আবারও এলিয়ে পড়ল।

কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র।

তার পরই উঠে বসে প্রশ্ন করল, 'পেশোয়া—পেশোয়া কোথায় ?'

'ও মা, পেশোয়া যে বিঠুরে গিয়েছেন! ওখান থেকেই রওনা হয়ে যাবেন।'

'রওনা হবেন? সে আবার কোথায় ?'

'কেন, উনি দিল্লী যাচ্ছেন যে!'

'দিল্লী? সে কি! দিল্লী কেন ?'

মুসম্মৎ তার অজ্ঞতায় একটা সস্নেহ কৌতুক অনুভব করে হেসে বলল, 'কত কাণ্ড হয়ে গেল এখানে, তার কিছু খবর রাখেন ?'

সে আনুপূর্বিক সকালের সব ঘটনা বিবৃত করল। তার পর বলল, 'সিপাইরা চলে যাবার পর আর একটুও তো সময় পান নি—কাগজপত্র নিয়ে পড়েছিলেন। কতক ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, কতক বাক্সে বোঝাই করে তুলে রাখলেন—কতক বা সঙ্গে নিলেন। তার পর কোনমতে দুটি ভাত মুখে দিয়েই বিঠুরে চলে গেলেন—ঐখান থেকেই হাতীতে চেপে কল্যাণপুরে রওনা হবেন।'

আমিনার ঘুম ছুটে গেছে, তার দু চোখে আগুন—'মূর্খ, নির্বোধ!... আমাকে একবার বলে যাওয়ার কথাও মনে হল না তাঁর!'

মুসম্মৎ তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, ও-কথা বলবেন না। দু বার লোক পাঠিয়েছিলেন,—এক বার নিজেও এসেছিলেন—তা আপনার তো কোন সাড়া-শব্দই ছিল না।'

তিরস্কারের দৃষ্টিতে মুসম্মতের দিকে তাকিয়ে আমিনা বলল, 'বেশ হয়েছিল! তা তুমি আমাকে ডেকে দিতে পার নি ?'

'বাঃ! শুধু আমি কেন, খোদ পেশোয়াজীই তো কত টানাটানি করলেন, কাঁধ ধরে কত ঝাঁকানি দিলেন! আপনি যে একেবারে অজ্ঞানের মত ঘুমোচ্ছিলেন মালেকান!'

'ইস!' নীচের ঠোঁটটা চেপে মুহূর্ত-কয়েক স্থির হয়ে বসে রইল সে, তার পর বলল, 'আজিমুল্লা—আজিমুল্লা কোথায় ?'

'সে-ও এইখানেই তার ঘরে পড়ে ঘুমোচ্ছে।...পেশোয়া নাকি তাকে ডাকতে গিয়েছিলেন, সে সাফ্ বলে দিয়েছে, পেশোয়া যেন ওখান থেকে একাই রওনা

হয়ে যান, আজিমুল্লা সন্ধ্যায় বেরিয়ে পথের মধ্যেই ওঁদের ধরে ফেলবে।'

আমিনা উঠে দাঁড়িয়ে চটিটা পায়ে গলাল।

'ও কি, স্নান করবেন না—খাবেন না? চললেন কোথায়?'

'তুই জল তৈরী রাখ—আমি আসছি।'

সে কতকটা ছুটেই বের হয়ে গেল।

ক্ষোভে ও বিরক্তিতে আমিনা প্রায় দিগ্বিদিক্-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। এই নির্জন রৌদ্রদগ্ধ অপরাহ্নে একা নিঃসঙ্গ আজিমুল্লার শয়নগৃহে যাওয়া যে তার কোনমতেই শোভন নয়, এবং এমন একটা কাণ্ড করবার কোন প্রয়োজনও ছিল না—আজিমুল্লাকে লোক দিয়ে ডেকে পাঠালেই চলত—এসব কথা তাই তার একবারও মনে পড়ল না। এমন কি, বিগত রাত্রির ধুলো যে এখনও তার মুখে মাথায় জমে আছে, কেশ ও বেশ দুই-ই অসংবৃত—এসব কথাও তার মনে হল না। সে কোন দিকে না তাকিয়ে, কোন ভৃত্য মারফত এত্তেলা দেবারও অপেক্ষা না করে সোজা গিয়ে ঢুকল আজিমুল্লার ঘরে।

আজিমুল্লা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন।

আমিনা তাঁর কাঁধটা ধরে বেশ জোরে-জোরেই ঝাঁকানি দিতে লাগল।

'খাঁ সাহেব, ও খাঁ সাহেব! শুনছেন? খাঁ সাহেব!'

'অ্যাঁ!' রক্তপূর্ণ বিহ্বল চোখ মেলে আজিমুল্লা তাকালেন, 'কে—কী?'

তার পরই আমিনাকে ভাল করে নজরে পড়ল।

ধূলিধূসর দেহ আমিনার—কিন্তু তার যে কান্তি তা ধুলোয় ম্লান হয় না। বরং অসংবৃত বিস্রস্ত বেশবাস, নিদ্রারক্ত দুটি চোখের কোলে রাত্রি-জাগরণের ঈষৎ কালিমা, অবিন্যস্ত বিপুল কৃষ্ণকেশদাম, ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদরেখা—সবটা মিলিয়ে সেই মুহূর্তে এই রমণী তাঁর তখনও তন্দ্রাবিহ্বল দৃষ্টিতে পরম রমণীয় এবং একান্ত লোভনীয় বলেই বোধ হল। তাঁর চৈতন্য তখনও অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার মত যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ বা সচেতন হয় নি—ব্যাপারটা কি ভাল করে বোঝবারও পূর্বে হয়তো—আজিমুল্লার বুকের রক্ত দ্রুততর হয়ে উঠল, বহুদিনের নিরুদ্ধ বাসনা তার উদগ্র ক্ষুধায় দেহের প্রতি লোমকূপে আগুন ধরিয়ে দিল—তিনি অকস্মাৎ আমিনাকে আকর্ষণ করে বুকের ওপর এনে ফেললেন।

এক লহমা মাত্র—

বিস্মিত আমিনার ঘটনাটা বুঝতে যেটুকু দেরি—তার পরই সে এক প্রবল ঝট্‌কায় নিজেকে ওঁর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিয়ে আজিমুল্লাকে সজোরে এক চপেটাঘাত করল।

এবার আজিমুল্লার ঘুম ভাল করেই ভাঙল।

তিনি কয়েক মুহূর্ত পাথরের মত পড়ে থেকে বোধ করি শিথিল চৈতন্যকে সংহত হবার সময়টুকু মাত্র দিয়েই—এক লাফে উঠে বসলেন। কিন্তু কিছুতেই আমিনার দিকে ভাল করে তাকাতে পারলেন না। অপমানে তাঁর কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে—আত্মগ্লানিতে সমস্ত দেহে একটা জ্বালা অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু এ অপমান নিজের কাছেই—এ আঘাত নিজেই করেছেন নিজেকে। একটা প্রবল আত্মধিক্কারে তাঁর আকণ্ঠ পূর্ণ হয়ে উঠল।

আমিনাও ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে নিজের বস্ত্রাদি যথাসম্ভব সামলে নিতে নিতে কণ্ঠে তীব্র ব্যঙ্গ ঢেলে দিয়ে বলল, 'দুটো একসঙ্গে হয় না

আজিমুল্লা খাঁ সাহেব ! সৌভাগ্যলক্ষ্মী কখনও সতীন সহ্য করেন না। তাঁর সাধনা একাগ্র হয়ে করবার সাধনা !...আমাদের দুজনেরই লক্ষ্য এক—তাই পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছি। পরস্পরের দিকে তাকালে সামনের দিকে তাকানো যায় না খাঁ সাহেব—অগ্রগতি হয় ব্যাহত, মনে রাখবেন।'

আজিমুল্লা দূরের দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার অপরাধ হয়ে গেছে বেগমসাহেবা, মাফ করবেন।...কিন্তু কী জন্য আমাকে দরকার হয়েছিল, তা এখনও বলেন নি !'

'শুনুন, এধারে কী কাণ্ড হয়েছে শুনেছেন ?'

'কৈ না তো, কী কাণ্ড ?'

'নানাসাহেব সিপাইদের সঙ্গে দিল্লী রওনা হয়েছেন !'

'হাঁ, তা শুনেছি বৈকি।...আমারও তো যাবার কথা। আমি সন্ধ্যার পর রওনা হব।'

'হায়, হায় !' অসহিষ্ণুকণ্ঠে আমিনা বিলাপ করে ওঠে, 'এইজন্যে কি এত কাণ্ড করলুম আমরা ? তা হলে এত দিন ধরে এত কাঠখড় পোড়াবার কি দরকার ছিল ?'

এবার আজিমুল্লা বিস্মিত হয়ে আমিনার মুখের দিকে চাইলেন। আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন, 'কিন্তু—মানে, এইটেই কি স্বাভাবিক ও সঙ্গত নয় ?'

'আজিমুল্লা খাঁ সাহেব, আপনাকে বুদ্ধিমান বলে জানতুম !...কী করতে নানাসাহেব দিল্লী যাচ্ছেন বলতে পারেন ? সেখানে বাহাদুর শাহ্‌ বসে আছেন —তিনিই দিল্লীর শাহেনশাহ্‌। আরও বহু দেশ থেকে বহু সেনাপতি বহু রাজা গিয়ে মিলবেন—তাঁরা সকলেই মুঘল বাদশার কর্মচারী বলে গণ্য হবেন। নানাসাহেব গেলে তিনিও তাঁদের একজন বলে পরিচিত হবেন—তার বেশী কিছু নয়। যদি সত্যিই ইংরেজ-শক্তির অবসান হয় তো তখন মুঘল বাদশার নামেই সারা দেশের শাসন চলবে—বড়্‌জোর নানাসাহেব একটা মন্‌সবদারি পাবেন, কি একটা জায়গীর ! চিরকালের শত্রু মারাঠীকে স্বেচ্ছায় শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবেন না বাদশা ! আর তা হলে তখন আবার নতুন করে আমাদের পথ করতে হবে।'

বোধ করি দম নেবার জন্যই একটু থামল আমিনা। তার পর পুনশ্চ বলতে লাগল, 'শুধু তাই নয়, পেছনে হুইলার আর সব গোরা অফিসারদের রেখে যাওয়ার অর্থ কী জানেন ? এদের অক্ষত রেখে যাওয়া মানেই শীগগিরই ওরা আবার কানপুরের মালিক হয়ে বসবে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই, তা কি জানেন না আপনারা ? ওদিকে নীল এগোচ্ছে—হয়তো দু-চার দিনের মধ্যেই তারা কানপুরে এসে পড়বে, দু দল মিলিত হলে কি প্রচণ্ড শক্তিশালী দল গঠিত হবে—বুঝতে পারছেন ? এদের অস্ত্রবল, লোকবল তো অটুট থাকছেই।...তখন লক্ষ্ণৌ দখল করতে ওদের কতটুকু সময় লাগবে ? মাঝখান থেকে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন হয়ে যাবে !'

আজিমুল্লা লজ্জা-অপমান সব ভুলে প্রশংসামুগ্ধ চোখ তুলে তাকিয়ে রইলেন হুসেনীর দিকে। সে বলে চলল, 'অথচ এখানে থেকে এই গ্যারিসন ধ্বংস করতে পারলে এ এলাকায় নানাসাহেবই হবেন সর্বেশ্বর। নানাসাহেবের পতাকা আবার উড়ছে শুনলে বহু মারাঠী ছুটে আসবে। ঝাঁসীর রাণীর সাহায্যও হয়তো এখনই পেতে পারব। এদের শেষ করে এখানে আরও বহু সিপাই এনে

শক্তি প্রতিষ্ঠিত করলে, বাদশার সঙ্গে উনি মিলিত হতে পারবেন সমানে সমানে। বাদশা কেন সকলেই সমীহ করবে তখন—ভয়ও করবে। অবশ্য ওদের উপকারও হবে। কলকাতা থেকে যে দল আসবে আমরা তাদের আটকাতে পারব।…ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে লক্ষ্ণৌ এবং পাঞ্জাবের গোরাদের শেষ করতে পারবে। আর—', বিচিত্র তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আজিমুল্লার চোখের দিকে চেয়ে বলে চলল আমিনা, 'আর নানাসাহেব স্বাধীন সার্বভৌম শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেই আমাদের সুবিধে —মানে আপনার এবং আমার—তাই নয় কি আজিমুল্লা খাঁ সাহেব?'

আজিমুল্লা শেষের এই প্রশ্নটাতে শিউরে কেঁপে উঠলেন। হুসেনী কিন্তু তা লক্ষ্যও করল না। সে আরও তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাঁর চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি উঠুন, এখনই নানাসাহেবের কাছে যান। তিনি অসংখ্য পুরুষ বেষ্টিত হয়ে আছেন এখন—আমার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়, নইলে আমিই যেতুম।…তাঁকে বুঝিয়ে বলুন, মহারাষ্ট্রের পেশোয়া-বংশের সন্তানরা কখনও মুঘল বাদশার দাসত্ব করে নি—কুর্নিশ করে নি। তারা সম্রাটের রক্ষক হিসেবেই দিল্লীতে গিয়েছিল—কর্মচারী হিসেবে নয়। তিনি যেন আজ পিতৃ-পিতামহের মুখে কালি না দেন! গিয়ে বুঝিয়ে বলুন, এখানকার গ্যারিসনে এখনও দু শ সমর্থ পুরুষ-শত্রু পেছনে রেখে যাওয়ার পরিণাম কী হতে পারে এবং সেই শক্তি অক্ষত অটুট অবস্থায় নীলসাহেবের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলে কি ভয়ংকর শত্রু আমাদের পেছনে থাকবে সেটা ভাল করে ভেবে দেখতে। তাঁকে এই পাঁচ রেজিমেণ্ট সিপাই নিয়ে ফিরে এসে কালই ওদের ঐ মাটির কেল্লায় চড়াও হতে বলুন—নইলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার কল্পনা ত্যাগ করতে হবে তাঁকে, এইটে বুঝিয়ে দিন।'

আজিমুল্লা দ্বিরুক্তি না করে উঠে দাঁড়ালেন। তার পর আভূমিনত হয়ে অভিবাদন করে ঈষৎ আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'সত্যিই খোদা আপনাকে একটা সাম্রাজ্য-শাসনের যোগ্যতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমরা আপনার বান্দা হবারও উপযুক্ত নই বেগমসাহেবা।'

আমিনা মহিমময়ী সম্রাজ্ঞীর মতই গ্রীবা হেলিয়ে এই সরস ও নীরব অভিবাদন গ্রহণ করে বলল, 'আমার অনেক অপরাধ হয়ে গেল খাঁ সাহেব, মাফ করবেন।'

'অপরাধ আমারই।' আচকানের ওপর কোমরবন্ধ আঁটতে আঁটতে আজিমুল্লা খাঁ জবাব দিলেন।

॥ ৩৫ ॥

নানাসাহেব আজিমুল্লাকে দেখে শুধু যে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তাই নয়, বেশ একটু আশ্বস্তও বোধ করলেন। আসলে আজ সারাটা দিন তাঁর যে উত্তেজনা ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে কেটেছে, সেটা একটা নেশার ঘোর ছাড়া আর কিছু না। সমস্ত নেশারই প্রতিক্রিয়া আছে। সকাল থেকে যে মাদকতা তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, কল্যাণপুরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি তারও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। আজিমুল্লা যখন তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর ললাট আবারও রীতিমত মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

আজিমুল্লার বক্তব্য কিন্তু সে মেঘ কাটতে কোন সহায়তা করল না বরং তাঁকে

দেখে নানাসাহেবের যেটুকু উৎসাহ বোধ হয়েছিল, সেটুকুও নিভে গেল। এখনই ইংরেজদের সঙ্গে পুরোপুরি সংগ্রাম শুরু করতে মন একেবারেই সায় দেয় না। তিনি খানিকটা চুপ করে থেকে কেমন একরকম শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু এরা কি শুনবে ? এরা এখনও আমাকে পুরো বিশ্বাস করতে পারে নি। তার ওপর এখনই যদি কথা পালটে ফেলি তো ভাববে আমার মতলব ভাল নয় !'

আজিমুল্লা ঘাড় নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'ওদের শোনাতেই হবে পেশোয়া। শোনাতে জানলে সব কথাই শোনানো যায়। আর সব যুক্তি যদি হার মানে অকাট্য যুক্তি তো রইলই।'

'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ লোভের যুক্তি। মুরুব্বীদের ঘুষ খাওয়াতে হবে। সে ভার আমার। ওদের ডেকে তো পাঠান !'

নানাসাহেব তবুও কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিত মুখে চুপ করে বসে রইলেন। তার পর বললেন, 'কিন্তু কাজটা কতদূর যুক্তিযুক্ত হবে, এখনও ভেবে দেখ।...এক জায়গায় শক্তি সংহত করাই কি উচিত হত না ?'

'না মহারাজ। একতা শক্তি ঠিকই, কিন্তু অনেক সময় বাহ্য-একতাই সব নয়। আপনি কানপুরে থাকলে আসলে দিল্লী ফৌজেরই উপকার হবে সবচেয়ে বেশী।'

'দেখ, যা ভাল বোঝ কর।' নানা ছোট একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হাল ছেড়ে দেন।

'ওদের তা হলে এখনই ডেকে পাঠাই ? এখনও রাত হয় নি—দরকার হলে আমরা শেষ রাত্রেই ফিরতে পারব।'

আজিমুল্লা অনুমতি-প্রার্থনার ভঙ্গিতে কথাটা বললেও উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না। তখনই সেই মতো ব্যবস্থা করতে নিজেই বাইরে এলেন এবং তাঁবুর বাইরে প্রথম যে দুজনের সঙ্গে দেখা হল—গণপৎ ও তেওয়ারী—দু জনকেই নানাসাহেবের নামে হুকুমজারি করে দু দিকে পাঠিয়ে দিলেন—মুরুব্বীদের ডেকে পাঠাতে।

একটু পরেই উদ্বিগ্ন ও ত্রস্ত সেনানায়কের দল নানাসাহেবের তাঁবুতে এসে পেঁছিল। আমাদের পূর্ব-পরিচিত টীকা সিং, দুলগঞ্জন সিং, গঙ্গাদীন—এরা এবং আরও জন-এগারো লোক তাঁবুতে ঢুকে পেশোয়া ধুন্ধুপন্থকে অভিবাদন করে দাঁড়াল। নানাসাহেবকে তাদের সত্যিই বিশ্বাস নেই, সেজন্য এমন হঠাৎ তিনি জরুরী আহ্বান পাঠাতে সকলেই একটু উৎকণ্ঠা বোধ করবে এই-ই স্বাভাবিক।

নানাসাহেব কিন্তু ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। যা করতেই হবে —তা আত্মসম্মান বজায় রেখে করাই ভাল। তা ছাড়া আজিমুল্লা যা বলেছে তাতে যুক্তি আছে—এটা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। এখন কানপুরে পেঁছে ক্ষমতা হস্তগত করার অর্থ এখনই পেশোয়ারূপে সিংহাসনে বসা—অর্থাৎ অনেক দিনের স্বপ্ন অবিলম্বে সার্থক ও সফল হওয়া। সুদূর ভবিষ্যৎ আগামী কাল নয়, অনিশ্চিতের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

তিনি প্রশান্তমুখে বললেন, 'ব'স তোমরা। একটা যুক্তি করবার জন্যই তোমাদের ডেকেছি। আমি তোমাদের ওপর হুকুম চালাতে চাই না কোনদিনই —মিলেমিশে পরামর্শ করে কাজ করব—এই আমার ইচ্ছা।'

তিনি কথাগুলোর কী প্রভাব সৃষ্টি হয় তা দেখবার জন্যই বোধ করি একটু থামলেন।

বলা-বাহুল্য, শ্রোতারা এ ভূমিকাতে কেউই বিশেষ আশ্বস্ত হল না। তবু গঙ্গাদীন সবিনয়েই বলল, 'বলুন পেশোয়া।'

'আমরা অনেক বিবেচনা করে দেখলাম—আমাদের এখন দিল্লী যাওয়াটা বেশ একটু নির্বুদ্ধিতার কাজ হচ্ছে। আমার মনে হয়, আমাদের অবিলম্বে কানপুরে ফিরে যাওয়াই উচিত।'

'তার মানে?' টীকা সিং যেন একটু উদ্ধত সংশয়ের সঙ্গেই প্রশ্নটা করে।

নানাসাহেব আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, আজিমুল্লা সে সুযোগ দিলেন না, বললেন, 'মহামান্য পেশোয়া যা বলেছেন, তার মধ্যে যুক্তি আছে। কানপুর গ্যারিসনে দু শ সশস্ত্র ইংরেজকে রেখে আসার অর্থ—ইংরেজ-শক্তিকে কানপুরে শুধু অক্ষুণ্ণ রেখে আসা নয়—সুপ্রতিষ্ঠিত রেখে আসা। তাদের সঙ্গে ওধারের ইংরেজ-বাহিনীর মিলন হলে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হবে তা আপনারা ভেবে দেখেছেন? কী প্রচণ্ড শত্রু আমাদের পিছনে রেখে আমরা এগোচ্ছি। তা ছাড়া দিল্লীতে কেন যাচ্ছি আমরা? সেখানে মীরাটের যে সিপাইরা কিল্লা দখল করে বসে আছে—তাদের তাঁবেদারি করতে কি?···তারা এখন কি আপনাদের সমান মনে করবে ভেবেছেন? মোটেই না। তারা রীতিমত আপনাদের ওপর মুরুব্বীয়ানা চালাবে। তা ছাড়া, মহামান্য পেশোয়া ভারতের সর্ববাদীসম্মত রাজচক্রবর্তী হিন্দুরাজা। তিনি সিংহাসনে বসলে, যাদের সহায়তায় বসেছেন, তাদের কখনই ভুলবেন না। অর্থাৎ আপনারাও আপনাদের সেবা ও বিশ্বস্ততার পুরস্কার হাতে হাতে পাবেন। পেশোয়া দিল্লীতে গিয়ে বাহাদুর শার হাকিমের* তাঁবেদারি করবেন—এটা সঙ্গত নয়। পেশোয়া মহানুভব, তাঁর পক্ষে হয়তো তাও সম্ভব, কিন্তু আমরা—যারা তাঁর বিশ্বস্ত সেবক—তা হতে দেব না কোন-মতেই। তা ছাড়া আগেই বলেছি, কানপুর গ্যারিসন ধ্বংস করতে না পারলে আমরা পুরবী-ইংরেজদের ঠেকাতে পারব না কিছুতেই। সেদিক দিয়েও আমাদের একটা কর্তব্য আছে।'

আজিমুল্লা শুধু দৃঢ়তার সঙ্গেই নয়—বেশ একটু ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই যেন বললেন কথাগুলো। অর্থাৎ তিনি যেন তাঁর বলবার ভঙ্গিটুকুর মধ্যেই জানিয়ে দিতে চান যে কেবলমাত্র দলে ভারী বলেই সিপাইদের কথা তাঁরা নির্বিচারে মেনে নেবেন—সে পাত্র তাঁরা নন। বক্তব্য শেষ করে তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উপস্থিত সেনানায়কদের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

শ্রোতারা অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কেউই কারও দিকে চায় না, সকলেই যেন সকলের দৃষ্টি এড়াতে চায়—এমন একটা অবস্থা। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল গঙ্গাদীনই। বলল, 'খাঁ সাহেব যা বললেন তার মধ্যে যুক্তি আছে হয়তো, কিন্তু ব্যাপার কি জানেন এতখানি প্রবল উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে সিপাইরা যাচ্ছিল দিল্লীর দিকে, তারা বড়ই আশাভঙ্গ বোধ করবে। তারা রাজী হবে কি?···এখানে তাদের ব্যক্তিগত লাভের আশা কম।'

* বাহাদুর শার নিজস্ব চিকিৎসক হাকিম আহসানুল্লা খাঁ। বাহাদুর শা নাকি রাজনৈতিক ব্যাপারেও এঁর পরামর্শের উপরই নির্ভর করতেন।

আজিমুল্লা তাঁর স্থির দৃষ্টি গঙ্গাদীনের মুখের ওপর নিবদ্ধ করে বললেন, 'ব্যক্তিগত লাভের আশা বলতে কী বোঝাচ্ছেন? লুট?…সে কি মীরাটের সিপাইরা কিছু বাকি রেখেছে? তা ছাড়া আমরা যাচ্ছি লড়াই করতে, লুটেরা ডাকাতের মত সামান্য কিছু টাকাই একমাত্র লক্ষ্য নয় আমাদের। এখন থেকে সিপাইদের লুটের লোভ দেখালে তাদের সামলাতে পারবেন গঙ্গাদীন সাহেব?'

গঙ্গাদীন মাথা ঘামিয়ে বলল, 'বেশ, আপনাদের হুকুম আমরা এখনই সিপাইদের জানাচ্ছি। তাদের জবাবও আপনাদের জানিয়ে যাব।'

আজিমুল্লা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, 'জবাব! তাদের জবাব আবার কী? আপনারা সিপাইদের সেনাপতি—আপনাদের হুকুম তারা শুনবে না?'

গঙ্গাদীন অপ্রতিভ হয়ে কী একটা উত্তর দিতে গিয়েও যেন থেমে গেল। আরও অপ্রতিভভাবে মাথা চুলকোচ্ছে, এমন সময় আর এক কাণ্ড ঘটল। মংগরকর বোধ হয় বাইরেই কাছাকাছি কোথাও ছিল, সহসা সে নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে আজিমুল্লার হাতে কী একটা চিরকুট কাগজ দিয়েই আবার তেমনি নিঃশব্দে বার হয়ে গেল। ঘটনাটা ঘটল যেন এক লহমারও কম সময়ে।

তাঁবুর মাঝের বড় খুঁটিটাতে বাঁধা একটা বড় তেলের ডিব্বা জ্বলছিল। সেই আলোতে কাগজের টুকরাটা একবার মাত্র মেলে ধরেই আবার সেটা হাতের মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে নিলেন আজিমুল্লা। তার পর পুনশ্চ গঙ্গাদীনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কৈ উত্তর দিলেন না কিছু?'

তবুও গঙ্গাদীন যেন ঠিকমত জবাব দিতে পারে না।

আজিমুল্লা তাকে বেশীক্ষণ অবসরও দিলেন না। বললেন, 'থাক, জবাব দিতে হবে না, দেবারও কিছু নেই। আমি এই মুহূর্তে স্বাধীন পেশোয়া নানা ধুন্ধুপন্থের হয়ে একটা ঘোষণা করছি। আজ থেকেই তিনি স্বাধীনভাবে তাঁর রাজ্যভার নিজের হাতে গ্রহণ করলেন। সেই উপলক্ষ্যে এবং সেই সঙ্গেই আপনাদের কিছু কিছু পদোন্নতি হবে। জমাদার দুলগঞ্জন সিং, আজ থেকে আপনি ৫৩ নম্বর রেজিমেণ্টের কর্নেল হলেন। সুবাদার টীকা সিং, আপনি আজ থেকে জেনারেল—সমস্ত ঘোড়সওয়ারদের ভার আপনার হাতে। আর সুবাদার গঙ্গাদীন, আপনি হলেন ৫৬ নম্বরের কর্নেল। যান, এবার আপনাদের হুকুম সিপাইদের জানান। হুকুম শোনানো এখন আপনাদের দায়িত্ব।…তবে হ্যাঁ, আরও একটা কথা সিপাইদের বলতে পারেন। তাদের বলবেন, যেদিন পেশোয়া শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে যথারীতি সিংহাসনে আরোহণ করবেন, সেদিন তারাও কিছু কিছু উপহার পাবে। তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে একটি করে সোনার বালা।'

উপস্থিত সকলেরই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সদ্য উন্নীত জেনারেল ও কর্নেল তিন জন আভূমিনত হয়ে পেশোয়াকে অভিবাদন জানাল। পেছনে যারা ছিল, তারা ঈষৎ ক্ষীণকণ্ঠে পেশোয়ার জয়ধ্বনি করল। তাদের আশা অবশ্য একেবারে যায় নি—তবে নগদ পাওনাটা মিলল না!

পেশোয়ার মুখও যেন বেশ একটু বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু তিনি সহজ প্রসন্ন ভাবেই অভিবাদন গ্রহণ করলেন—হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন।

অভিবাদনান্তে জেনারেল টীকা সিং প্রশ্ন করল, 'তা হলে এই হুকুমই সিপাইদের জানাই গে পেশোয়া?'

'হ্যাঁ, শুনলেই তো।' নানাসাহেব ঢোক গিলে বললেন।

'প্রত্যেক সিপাইকে একটা করে সোনার বালা দিতে হলে—অনেক টাকা লাগবে খাঁ সাহেব!' গঙ্গাদীনের কণ্ঠে সংশয়ের সুর।

'কোন ভয় নেই কর্নেল সাহেব। পেশোয়া যা বলেছেন—ভেবেই বলেছেন। তাঁর ইজ্জতের কথা তিনি ভাববেন। আপনি নিশ্চিন্তমনে তাঁর এই প্রসাদের কথা সিপাইদের জানাতে পারেন।'

আবারও এক দফা অভিবাদন জানিয়ে পেশোয়ার জয়ধ্বনি করতে করতে সকলে বার হয়ে গেল। শেষ লোকটির পদধ্বনি ভাল করে মিলিয়ে যাবার আগেই কপালের ঘাম মুছে নানাসাহেব উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'এ কি করলে আজিমুল্লা?'

'না করে উপায় ছিল না পেশোয়া। আর অপেক্ষা করার সময় নেই। তা ছাড়া, সিপাইদের মতামতের ওপর আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে, এই অসহায় অবস্থাটা একবার তাদের জানতে দিলে আর রক্ষা থাকবে না। তাই—এখনই এমন একটা কিছু ঘোষণা করা দরকার ছিল, যার পরে আর আদেশ অমান্য করা বা সে সম্বন্ধে কোন সংশয় জাগবারও অবকাশ না থাকে। সেই জন্যেই আপনার মতামতের অপেক্ষা না করেই আপনার নামে হুকুম চালাতে হয়েছে। সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি পেশোয়া।'

'কিন্তু এতগুলো সিপাই—প্রত্যেককে একটা করে সোনার বালা—কোথা থেকে দেবে তুমি?'

নানাসাহেবের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে সংশয় ফুটে ওঠে।

আজিমুল্লা হাসলেন একটু। বললেন, 'ভয় নেই, আপনার বিঠুরের ধনভাণ্ডার অক্ষয় হয়ে থাক। আমি অন্য উপায়ে এ টাকা তুলব।'

'অর্থাৎ!'

'কাল কানপুরে পৌঁছেই নান্‌হে নবাবের বাড়ি লুট করাব। নিত্য নতুন রক্ষিতা যুগিয়ে স্বর্গত পেশোয়ার অনেক পয়সা খেয়েছে লোকটা, তা ছাড়া প্রজাদের ওপর বড় উৎপীড়ন করে। ওর পয়সা আমাদের কাজে লাগালে বরং কিছু সদ্ব্যয়েই যাবে।'

'নান্‌হে নবাবের বাড়ি লুট করাবে? না, না—ও কাজ করতে যেও না। সামান্য কেওকেটা নয় লোকটা—মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলবে শেষ পর্যন্ত!'

'আপনি নির্ভয়ে থাকুন পেশোয়া। তার আগেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারব। একদল হিন্দু সিপাই পাঠিয়ে ওর বাড়ি লুট করাব, ওকে বাঁধিয়ে আনাব—তারপর আপনি ব্যস্ত হয়ে মুক্ত করে দেবেন—মাফ চাইবেন। বরং সব দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন ওর সামনেই। আমি আবার সিপাইদের ঘাড়ে চাপাব। আমিও মাফ চাইব। ওকে আবার সসম্মানে ওর বাড়িতে ফিরিয়ে দেব। চাই কি, একটা বড় চাকরিও আপনি দিতে পারবেন। মোট কথা মিটিয়ে নেওয়া খুব একটা কঠিন হবে না।'

আজিমুল্লার মুখে এক প্রকারের ধূর্ত হাসি ফুটে ওঠে।

'কি জানি, কী যে তোমরা করছ কিছুই বুঝছি না।'

নানাসাহেব অস্থির ভাবে উঠে তাঁবুর মধ্যেই খানিকটা পায়চারি করলেন। তার পর সহসা একেবারে আজিমুল্লার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সোজা তাঁর চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ পরামর্শটাও কি হুসেনীর?'

আর যাই হোক, ঠিক এ প্রশ্নটার জন্য হয়তো আজিমুল্লা প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বেশ একটু চমকে উঠলেন এবং তাঁর সে বিব্রত ভাবটা ঢাকা রইল না।

কোনমতে আমতা আমতা করে প্রশ্ন করলেন, 'কোন্—কোন্‌টা পেশোয়া ?'

'এই নানহে নবাবের বাড়ি লুট করাটা ?'

আজিমুল্লা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ পেশোয়া, সোনার বালার বুদ্ধিটাও তাঁরই।...হুসেনী বেগমের মত অসাধারণ বুদ্ধিমতী মহিলাকে পাশে পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা। আপনি সত্যিই ভাগ্যবান।'

তার পর হাতের দলা-পাকানো কাগজটা যতটা সম্ভব খুলে নানাসাহেবের সামনে মেলে ধরে বললেন, 'এই যে দেখুন না—ঠিক যখন কী করব ভেবে না পেয়ে প্রমাদ গনছি, তখনই এই চিরকুটটুকু এল।'

নানা হাতের একটা ভঙ্গিতে, যেন কাগজখানা পড়বার প্রস্তাবটাকেই সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আজিমুল্লা, আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। তুমি কোথায় ওদের বুদ্ধি দেবে—না ওদের বুদ্ধিতেই চলছ।...কোথায় গিয়ে পড়ছ—একটু ভেবে দেখ।'

'কিন্তু আপনাদের দেবতা শিব তো শুনেছি তাঁর বিবির কাছে ভিখারী, এমন কি তাঁরই পায়ের তলায় পড়ে থাকেন। তাই নয় কি পেশোয়া ?'

নানাসাহেব সে কথার জবাব দিলেন না। ইতিমধ্যে আর একটা কথা তাঁর মনে পড়ে গেছে। তিনি ঈষৎ উদ্বিগ্নভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তার মানে সে-ও প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই এখানে এসেছে।...গেল কোথায় তা হলে ?'

এ প্রশ্নটা বহুক্ষণ থেকে আজিমুল্লাকেও পীড়া দিচ্ছিল বৈকি। আর একবার অভিনন্দন জানাতে—এবং চোখে দেখতেও বুঝি বা—সমস্ত অন্তরটা তাঁরও আকুল হয়ে উঠেছিল। শুধু সুযোগ বা অবসরের অভাবেই ছুটে বাইরে যেতে পারেন নি এতক্ষণ - ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিলেন। এবার সাগ্রহে বলে উঠলেন, 'বাইরে গিয়ে খোঁজ করব নাকি পেশোয়া ?'

'দেখ না একবার।...আবার এত রাত্রে, একাই না কানপুরে ফেরে।... অনর্থক বিপদ ডেকে আনা।...দরকারও তো নেই, কাল তো আমাদের সঙ্গেই ফিরতে পারে অনায়াসে।'

আজিমুল্লা আর কথা বললেন না। এক বার মাত্র হাতটা অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথার দিকে তুলেই দ্রুত বার হয়ে গেলেন।

আজিমুল্লা চলে গেলে নানাসাহেব আবার এসে তাঁর আসনে স্থির হয়ে বসলেন। বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছেন তিনি। জীবনে এত বিচলিত বোধ করি কখনই হন নি। আজ বিঠুর থেকে যাত্রা করে কল্যাণপুর আসবার পথে কেবলই নানা অমঙ্গল দেখেছেন—সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে, কানপুরে ফেরা হল, ভালই হল।

কিন্তু—

কানপুরে ফেরা মানে যুদ্ধটাকে একেবারে নিজের ঘাড়ে নিয়ে আসা। দায়িত্ব অনেকখানি। এইভাবে এত তাড়াতাড়ি একা শুধু নিজের দায়িত্বে

ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা করার কথাটা আদৌ খুব রুচিকর মনে হচ্ছে না—আজও।

হুইলার সেদিনকার চিঠিটার জবাব পর্যন্ত দিল না। যদি দিত—আজ এত কাণ্ডের প্রয়োজনই হত না। আজও তিনি ইংরেজদের বন্ধুই থাকতে পারতেন।

অথচ তিনি হুইলারকে আশ্বাস দিয়েছেন—এটাও ঠিক। তিনি ব্রাহ্মণ এবং রাজা। তাঁর আশ্বাসের এই মূল্য। যদিচ একথা সত্য যে তাঁর বিখ্যাত পূর্বপুরুষেরা আর যাই হোন—সত্যরক্ষার জন্য খুব বিখ্যাত ছিলেন না, তবু এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা করতে আজও যেন নানাসাহেবের কোথায় একটু সংকোচে বাধে।

নানা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁবুর ভেতরই তাঁর খাটিয়ার পাশে কাগজপত্রের বাক্সটি রাখা আছে। খাটিয়াতে বসে আঙরাখার জেব-এর মধ্যে থেকে বাক্সর চাবি বের করে একটু সন্তর্পণে এবং নিঃশব্দেই বাক্সটি খুললেন। তারপর ভেতর থেকে কাগজ-কলম বের করে হুইলারকে আর একটি চিঠি লিখতে বসলেন নানা ধুন্ধুপন্থ।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি।

লিখলেন ঃ "প্রিয় জেনারেল হুইলার, ঘটনা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। আজই হয়তো আমরা আপনাদের আক্রমণ করতে বাধ্য হব। আপনারা যতটা পারেন প্রস্তুত থাকবেন। ইতি—আপনার বিশ্বস্ত, নানা ধুন্ধুপন্থ, পেশোয়া।"

চিঠিটা মুড়ে মোম দিয়ে সীলমোহর করলেন। তারপর আবার বাক্সটি বন্ধ করে তাঁবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে খুব মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, 'গণপৎ!'

'জী হুজুর।' নিম্নকণ্ঠে সাড়া দিয়ে গণপৎ ভেতরে এল। বহু দিনের লোক সে—ডাকবার ভঙ্গি থেকেই সাড়া দেওয়া সম্বন্ধে সতর্ক হতে শিখেছে।

তার হাতে চিঠিটা দিয়ে প্রায় চুপিচুপি নানাসাহেব বললেন, 'কাল ভোরেই আমরা আবার কানপুর ফিরছি।...চিঠিটা তোমার কাছে রাখো। ওখানে পেঁছেই কোন এক ফাঁকে তুমি ইংরেজদের ছাউনিতে যাবে—আর হুইলার সাহেবের আর্দালীর হাতে, নয়তো কোন ইংরেজের হাতে চিঠিটা পেঁছে দেবে। কোনমতেই যেন এর অন্যথা না হয়, কিংবা কেউ জানতে না পারে—বুঝেছ? তা হলে তোমার গর্দান থাকবে না।'

গণপৎ নীরবে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল এবং চিঠিখানা বুকে গুঁজে বার হয়ে গেল।

নানা এবার যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন। এতক্ষণে তাঁর হুঁশ হল যে এবার একটু বিশ্রাম করা প্রয়োজন। তরবারি-সুদ্ধ ভারী কোমরবন্ধটা খুলে তাঁর সেই হাতবাক্সটার ওপর রেখে তিনি খাটিয়ায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। সেই মুহূর্তে এমনই ক্লান্তি বোধ করলেন যে পোশাকটা খুলতেও আর ইচ্ছা হল না।

বাইরে তখন সিপাহীদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা ও জটলা শুরু হয়ে গেছে। সেই দিকেই আলো ও কোলাহল। কারণ মশালগুলি বেশির ভাগই ঐ সব জটলার জায়গায় গিয়ে জড়ো হয়েছে। এক এক জায়গায় আলো বেশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। ফলে নানাসাহেবের তাঁবুর দিকটা তখনও পর্যন্ত শুধু যে নির্জন

ও নিস্তব্ধ তাই নয়—বড় বড় আমগাছের আড়ালে অনেকখানি অদৃশ্যও বটে। হয়তো কতকটা সেই জন্যই, গণপৎ বা আজিমুল্লা কারও নজরে পড়ে নি যে, তাঁবুতে প্রবেশ-পথের ঠিক পাশেই—আবছা অন্ধকারে গা ঢেকে আমিনা সমস্তক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। তাঁবুর একটা ফুটো দিয়ে সে নানার চিঠি লেখা ও চিঠির জিম্মাদারি দেওয়া—সবই দেখেছে, কিন্তু আজ আর তার সে সম্বন্ধে কোন উৎকণ্ঠা কি উদ্বেগ নেই—বরং কেমন একটা সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভাবই আছে। শিশুদের বৃথা আকুলতা দেখে অভিভাবকদের মুখে যে ধরনের হাসি ফুটে ওঠে, কতকটা সেই ধরনের হাসিই সে সময় ফুটে উঠেছিল আমিনার মুখে।

গণপৎ বাইরে এসে আবার পায়চারি শুরু করল বটে, কিন্তু ওদিকের কোলাহল ক্রমশই তাকে কৌতূহলী ও উৎসুক করে তুলল। সে দু-এক বার ইতস্তত করল, বারকতক পাগড়ির মধ্যে দিয়ে মাথা চুলকোল—তার পর খবরটা কী জানবার জন্য পা-পা করে সেদিকেই এগিয়ে গেল।

আমিনা যেন এই অবসরটুকুরই অপেক্ষা করছিল। সে প্রায় তস্করগতিতেই তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

কিন্তু যত নিঃশব্দেই সে আসুক, গরমের দিনে তৃণশূন্য কঠিন মাটিতে পায়ের একটু শব্দ বাজবেই। সেই সামান্য শব্দেই নানার তন্দ্রা ছুটে গেল—তিনি চমকে জেগে উঠে তরবারির দিকে হাত বাড়ালেন।

'ভয় নেই পেশোয়া, আমি,—আপনার বাঁদী!'

এবার ভাল করে চোখ মেলে চাইলেন নানা ধুন্ধুপন্থ। হুসেনীকে দেখে প্রসন্ন হাস্যে তাঁর মুখ রঞ্জিত হয়ে উঠল। সাগ্রহে ও সস্নেহে হাত বাড়িয়ে তার দুটি হাত ধরে টেনে পাশে বসালেন। প্রায় গদ্‌গদ কণ্ঠে বললেন, 'তুমি এসেছ!...পিয়ারী, তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না।'

আমিনার মুখে কেমন এক প্রকারের অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল, সে নানা-সাহেবের বুকে এলিয়ে পড়ে বলল, 'কে বললে পারবেন না মালিক, সময় এলে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেব আমার পাওনা। শুধু তখনও পর্যন্ত শোধ করবার ইচ্ছেটা আপনার থাকলে হয়!'

॥ ৩৬ ॥

কানপুরে পেঁছে নতুন জেনারেল টীকা সিং তাঁর লোকজন নিয়ে সোজা ম্যাগা-জিনের দিকে চলে গেলেন। টীকা সিং দীর্ঘকাল ইংরেজদের অধীনে সেনানায়কের কাজ করেছেন—কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি আজও অনেকটা সচেতন। কামানগুলি ইংরেজদের 'নাচারগড়'-এর দিকে পাঠানো, গোলাগুলি বারুদবন্দুক প্রভৃতি নিজের পাহারার মধ্যে আনা—অনেক কাজ তাঁর। এর আগেই ইংরেজরা এই সব মাল ত্রিশটি নৌকোয় চাপিয়ে এলাহাবাদ পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, কিন্তু নৌকো ছাড়বার অবসর বা লোক পাওয়া যায় নি। তোপখানার ঘাটে সেগুলি সেই অবস্থাতেই পড়েছিল। বদমাইশ বা বাজে লোকের হাতে এই সব মারাত্মক জিনিস পড়লে কি সাংঘাতিক অবস্থা হবে টীকা সিং তা অনায়াসেই অনুমান করতে পারেন। তাই তিনি প্রায় সারাদিন সেগুলিকে পুনরায় নিরাপদ স্থানে চাবি-তালা ও পাহারার মধ্যে রাখতে ব্যস্ত হয়ে রইলেন।

কিন্তু বাকি অপর সিপাহ্‌সলার বা সিপাহী—কেউই এতটা কর্তব্যপরায়ণ

নয়। শহরে পা দেবার পরই যেন তাদের সমস্ত শৃঙ্খলা ও কর্মধারা ভেঙে পড়ল। ইংরেজদের ধরবার নাম করে সারা শহর জুড়ে একটা প্রেতের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল।

কয়েক জন সাহেব—ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, বিচারক—এই শ্রেণীর ইউরোপীয়ান, যাঁরা তখনও দেওয়ালের গায়ে কালের লেখা পড়তে পারেন নি—তাঁরা তখনও অপ্রস্তুত ও অসতর্ক ছিলেন। তাঁরা অনেকেই প্রাণ দিলেন। কেউ কেউ পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়লেন। বলা বাহুল্য, তাঁদেরও প্রাণ রক্ষা হল না। কে বা কারা রটিয়ে দিল, ইংরেজ, ফরাসী—যে কোন জাতেরই সাহেব হোক, এমন কি ফিরিঙ্গী বা ক্রীশ্চানকেও যদি কেউ আশ্রয় দেয় তো সে এ-দেশী হিন্দু বা মুসলমান হলেও শাস্তি পাবে।

আসলে এটা হল নির্বিচার লুটতরাজের ভূমিকা। এই উপলক্ষ্য করে বহু নাগরিক-গৃহ ও পণ্য-বিপণি লুণ্ঠিত হল। বহু নিরীহ লোক প্রাণ দিল। চাঁদনি-চকের অধিকাংশ দোকানই গোলমালের ভয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—দরজা ভেঙে যথেচ্ছ লুট করা হল। রাজা, জমিদার ও নবাবের দলও রেহাই পেলেন না। একটি দোকান থেকেই চল্লিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, এই সব কষ্টার্জিত বা পুরুষ-পরম্পরায় সঞ্চিত অর্থ যাদের গেল তারা এক মুহূর্তে একেবারেই নিঃস্ব হল বটে, কিন্তু তার সবটাই সিপাহীদের ভোগে লাগল না। প্রত্যেক শহরেই চিরকাল এক শ্রেণীর গুণ্ডা-বদমায়েশ বেকার থাকে, সম্ভবত চিরদিনই থাকবে; যতই সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হোক, খেটে খেতে সকলে চায় না, পরিশ্রমে সকলের রুচি থাকবে তা আশা করাও অন্যায়—তারা এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল। বদ্রীনাথ নামে এক ঠিকাদার—লেডি হুইলার ও তাঁর কন্যাদ্বয়কে আশ্রয়দানের অপরাধে—কোনও প্রকার প্রমাণ বা বমাল না মিললেও, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সর্বস্বান্ত হলেন। বহুদিনের সঞ্চিত ধন, তাঁর যথাসর্বস্ব হারিয়ে পথে বসলেন। কোনমতে প্রাণটা বাঁচল এই রক্ষা।...

নানাসাহেব ঠিক এই ব্যাপারেরই আশঙ্কা করেছিলেন। তিনি বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে আজিমুল্লাকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু কোথায় আজিমুল্লা? চারদিকের এই অরাজকতার মধ্যে বুঝি সবই হারিয়ে গেল। নানা তাঁর খোঁজে দিকে দিকে লোক পাঠালেন, দলগঞ্জন সিংকেও বার বার তলব জানালেন, কিন্তু কারও টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না। আমিনাও এখানে পৌঁছেই কোথায় সরে পড়েছে। এক বালাসাহেব ছাড়া কেউ কাছে নেই। বালা অবশ্য বিভিন্ন পাড়ায় গিয়ে অবস্থাটাকে আয়ত্তে আনবার অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু কোন ফলই হল না। একটি সেনাকেও সে নাচারগড়ের দিকে নিয়ে যেতে পারলে না। অবশেষে একসময় ক্রুদ্ধ ও হতাশ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হল।

এক কথায় নানাসাহেব নিজেকে বড় অসহায় বোধ করতে লাগলেন।

আসলে আজিমুল্লাও কম বিচলিত হন নি। তিনি ঠিক এতটা বিশৃঙ্খলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হয়তো তিনি কানে বহু বার শুনলেও কার্যত এ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন নি যে, বাঁধ কেটে বন্যার জলকে পথ দেওয়া খুব সোজা, কিন্তু আবার তাকে বাঁধের মধ্যে আটকানো মোটেই অত সহজ নয়।

নানুহে নবাবের বাড়ি লুট করবার আদেশ তিনি নিজেই দিয়েছিলেন এটা

ঠিক, কিন্তু লুটতরাজের অবাধ বন্যা সেখানেই থামল না। নানুহে নবাবের বাড়ির বিপুল ঐশ্বর্যও সবটা তাঁদের করায়ত্ত হল না।—কোথা থেকে কারা এসে যে সেই সব বহুমূল্য আসবাব, চীনামাটির দামী বাসন, কাট্‌গ্লাসের সেট প্রভৃতি লুট করে নিয়ে গেল, তা তিনি বুঝতেও পারলেন না।

বরং এধারে আর-এক বিপত্তি দেখা দিল।

নানুহে নবাব প্রতিপত্তিশালী মুসলমান জায়গীরদার।—তাঁর এই অপমান ও লাঞ্ছনায় মুসলমানরা বিরূপ হয়ে উঠল। এমন কি সিপাহীদের মধ্যেও একটা দলে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিল। তারা স্পষ্টই বলে বেড়াতে লাগল, 'তা হলে ইংরেজ তাড়িয়ে আমাদের লাভ কী? আমরা কি হিন্দুদের কাছে রোজ সাত হাত মেপে নাকখৎ দেবার জন্যেই এত কাণ্ড করছি?'

সংবাদটা আমিনার কানে গিয়ে পেঁছিতে সে তাড়াতাড়ি এক খৎ লিখে পাঠাল আজিমুল্লাকে, 'করছেন কি খাঁ সাহেব, এখনও সামলান, নয় তো সিপাহীদের মধ্যেই দু জাতে দাঙ্গা বেধে যাবে! এমনও শুনছি যে, নানুহে নবাবকে কানপুরের নবাব বলে ঘোষণা করবে মুসলমানরা!'

অবশ্য ধূর্ত আজিমুল্লার সে তাল সামলাতে বেশী দেরি হল না। অপরাহ্নের দিকে নানুহে নবাবকে কায়দা করে সিপাহীরা যখন ডুলি-সুদ্ধ সাভাদা প্রাসাদে এনে নানাসাহেবের সামনে নামাল, তখন তিনিই ছুটে গিয়ে হাত ধরে তাঁকে নামিয়ে আনলেন এবং স-সম্মানে নিয়ে গিয়ে নানাসাহেবের পাশে বসিয়ে দিলেন। নানাসাহেবও অভিনয়ে কিছু কম গেলেন না—নানুহে নবাবের দুটি হাত ধরে সিপাহীদের এই দুষ্কৃতির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। নবাবের সাহায্য ব্যতিরেকে যে ইংরেজ-নিধন রূপ দুষ্কর কাজ সাধন করা সম্ভব হবে না —তাও জানালেন এবং ঐ বিধর্মী কুকুরগুলো দূরীভূত হলে নানাসাহেব যে নানুহে নবাবের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবেন এমন প্রতিশ্রুতিও দিলেন। নবাবের ক্রুদ্ধ ও আরক্ত মুখ এই সব তোষামোদ-বাক্য শুনতে শুনতে অপেক্ষাকৃত কোমল এবং প্রসন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু তাঁর নগদ টাকাকড়ি আসবাব রত্নালংকার সবই গিয়েছে—সে ক্ষোভ অত সহজে যে মেটবার নয়,—তা আজিমুল্লা জানেন। তিনি সুকৌশলে এমন একটা ইঙ্গিত দিলেন যাতে নবাবের মনে হয় যে, ইংরেজ বিতাড়িত হলে কে এ অঞ্চলের মালিক হবে সে প্রশ্নের চরম মীমাংসার এখনও সময় হয় নি এবং তখন মুসলমান মুসলমানের দিকই টানবে—তা বলা বাহুল্য।

আজিমুল্লা জানতেন—ভবিষ্যতের অনেকখানি লোভ ছাড়া বর্তমানের ক্ষতির ব্যথা মানুষ ভোলে না।

তিনি চমৎকার কথার প্যাঁচে আরও ইঙ্গিত দিলেন যে, লুটের বন্যায় যা বার হয়ে গেছে, তা আবার সেই পথেই ফিরে আসতে পারে।

নানুহে নবাব বুঝলেন। তাঁর মুখ প্রসন্নতর হল। তিনি বললেন, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে পেশোয়াজী, ওসব কথা এখন থাক্‌। আমি সর্বদাই আপনার খিদমতে হাজির আছি জানবেন।'

পেশোয়া ইঙ্গিতে নবাবের জন্যে বিলেতী সুরা আনতে আদেশ দিয়ে পুনশ্চ তাঁর হাত দুটো ধরলেন, 'উঁহু, অত সহজে এড়িয়ে যেতে পারবেন না নবাব সাহেব, আপনাকে কিছু একটা বড় কাজের ভার নিতে হবে। নইলে এ কি একার কাজ—আমি পারব কেন?'

'কী কাজ করতে হবে বলুন?' ঈষৎ উৎকণ্ঠিত ভাবেই প্রশ্ন করেন নবাব।

নানাসাহেবকে মুহূর্তকয়েক চুপ করে থাকতে হয়। আসলে কথাটা বলবার সময় অত কিছু ভেবে বলেন নি—অনেকটা ঝোঁকের মাথায়ই বলেছেন। প্রীতি বা উদারতা দেখাতে গিয়ে মানুষের একটা ঝোঁক চাপে—কেবল মাত্রা বাড়াতে শুরু করে। নানাসাহেবেরও কতকটা সেই অবস্থা।

এবারে আজিমুল্লাও আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ঠিক সামনে বসে নবাব সোজা তাঁর মুখের দিকেই চেয়ে আছেন—কোন প্রকার ইঙ্গিত করবারও উপায় নেই।

নানাসাহেবকেও কিছু একটা তখনই বলতে হবে। তিনি বলে বসলেন, 'আপনি আমার তোপখানার ভার নিন—তোপ আর গোলন্দাজ বাহিনী সবই আপনার হাতে থাকবে।'

সত্যই যথেষ্ট সম্মানের পদ। নানুহে নবাব এবার আন্তরিক খুশী হলেন। তিনিই এবার নানাসাহেবের ডান হাতখানা চেপে ধরে বললেন, 'আমার যথাসাধ্য করব পেশোয়াজী—আপনার সেবায় দরকার হলে জান দেব।'

নানুহে নবাব মহা সমাদর ও আপ্যায়নের মধ্যে বিদায় নিলে আজিমুল্লা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন, না, তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'করলেন কি পেশোয়া, ও কি জানে তোপের আর তোপখানার? জীবনে কখনও লড়াই করেছে? ওর বাপ সুদ খেয়ে আর মেয়েমানুষের কারবার করে কিছু জমিদারি আর খানকতক বাড়ি করে গিছল—ও এখন ভোগ করছে। ওকে দিলেন এত বড় একটা ভার!'

'আরে, টীকা সিং-ই তো রইল আসল সেনাপতি—এটা একটু বাহ্যিক খাতির, বুঝলে না?'

অপ্রতিভ পেশোয়া মাথা চুলকোতে চুলকোতে আজিমুল্লাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু এ দিকটা খানিক ঠাণ্ডা হলেও আসল কাজের কাজ কিছু হল না।

নানাসাহেব সন্ধ্যার পর আজিমুল্লাকে ডাকিয়ে এনে বললেন, 'এ কী হচ্ছে আজিমুল্লা? আমি তখনই বলেছিলুম তোমাকে যে এ পথ ভাল নয়, এখন সামলাও যেমন করে হোক! লড়াই তো মাথায় উঠল—ঐ কটা ইংরেজ যদি এসে আমাদের কয়েদ করে নিয়ে যায়, কি কেটে ফেলে তো বাঁচবার মত একটা সিপাইও নেই ধারে কাছে! ওরা যে সেটা করছে না, নেহাত সেটা আমার গুরুবল আর ওদের আহাম্মকি!'

আজিমুল্লা তিরস্কৃত হয়ে নীরবে মাথা নত করে বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে। অবস্থা শুধু তাঁর আয়ত্তের বাইরে নয়—যেন তাঁর বুদ্ধিরও বাইরে চলে গেছে। আর যেন কিছু ভাবতে পারছেন না।

বাইরে গিয়ে ঘোড়ায় চেপে গোটা শহরটা আরও একবার ঘুরে এলেন—ফল কিছুই হল না।

কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে আর একটা মতলব তাঁর মাথায় গেল। মনে পড়ল তাঁর পুরাতন হেড মাস্টার গঙ্গাদীনের একটা ছাপাখানা আছে। তিনি সোজা সেইখানে চলে গেলেন। তখনই বুড়োকে নিয়ে বসে গেলেন খানকতক ইস্তাহার রচনায়। নাগরী ও উর্দু দু হরফেই সে ইস্তাহার ছাপা হল। হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই—নাগরিকদের ধনসম্পত্তি ও প্রাণের দায়িত্ব সিপাহীদেরই—তাদের

আসল শত্রু ইংরেজরা, আসল লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা—এমনি নানা ভাল ভাল কথা লিখে কতক নানাসাহেবের নামে, কতক মৌলবী আমেদউল্লার নামে—ইস্তাহার প্রচারিত হল।

সারারাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইস্তাহারগুলি ছাপিয়ে ভোরের দিকে আজিমুল্লা সেগুলো লোক মারফৎ শহরের চারদিকে পাঠিয়ে দিলেন তখনই বিলি করতে। বিলি করাও হল, কিন্তু অবস্থা যথাপূর্বং—বিশেষ কোন ফলই হল না। হুইলারের নাচারগড়ের দিকে একটি সিপাহীকেও ফেরানো গেল না।

আমিনাও সারারাত ঘুমোয় নি। উৎকণ্ঠিত উদ্বেগে ঘটনার ধারা একটির পর একটি সবই লক্ষ্য করেছে—সংবাদও মুহুর্মুহু তার কাছে পেঁাচেছে। কিন্তু সেও কোন উপায় খুঁজে পায় নি। অবশেষে বেলা দুপরের দিকে সে সোজা আজিজনের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল।

'এত কাণ্ড সবই বুঝি বৃথা হয় বোন—তীরে এসেও বুঝি তরী ডোবে। এতক্ষণ যদি হুইলারের দল আত্মরক্ষার জন্য হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে আমাদের ওপর চড়াও হত তো আমরাই ওদের হাতে মরে জাহান্নমে যেতাম!...কী উপায় করা যায় বল্ তো! সবই কি বৃথা হবে?'

আজিজনের চোখে যেন নিমেষে আগ্নেয়গিরিরই ইঙ্গিত জাগে। কঠিন কণ্ঠে সে বলে, 'না—তা হতে দিলে চলবে না। আজ এই কটা লুটেরার জন্যে আমাদের এতদিনের এত কৃচ্ছ্রসাধনা বরবাদ হতে দিলে চলবে না!'

'কিন্তু কী-ই বা করবি? আমি তো কোন উপায় দেখি না!'

আমিনা সত্যিই যেন হতাশায় ভেঙে পড়ে।

'নিদানকালের চরম ব্যবস্থা—হেকিমরা কী একটা বলে না? তাই কিছু করতে হবে আর কি! আচ্ছা, আমিই দেখছি।'

সে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তুই যা। দেখি আমি কী করতে পারি! ...ঘোড়া আছে? একটা ঘোড়া পাঠিয়ে দিতে পারিস্ এখনই?'

'পারি বৈকি। একটা কেন, দশটা ঘোড়া আছে।'

আমিনা চলে গেল। খুব যে একটা কিছু আশা-ভরসা নিয়ে গেল তা নয়, তবু মজ্জমান ব্যক্তি খড়কুটাকেও আশ্রয় মনে করে, সেই ভাবেই কতকটা সে প্রাসাদে ফিরে একটা ভাল শান্ত গোছের ঘোড়া পাঠিয়ে দিল।...

দুপুরের একটু পরে আজিজন ঘোড়ায় চেপে পথে বেরিয়ে পড়ল। আজ তার বিশ্ববিজয়িনী মনোমোহিনীর বেশ। মুখে বিলিতী প্রসাধন—চোখে দিশী সুর্মা। সমস্ত বেশভূষায় একটিই মাত্র ইঙ্গিত—বহ্নিশিখার মত সে রূপে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান।

সে চকবাজার ও অপর স্থানে—যেখানে যেখানে সিপাহীদের জটলা বেশী, সেই সব স্থানে একেবারে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার সেই ভুবন-ভুলানো হাসিতে, চোখের মাদকতায়, দেহের ভঙ্গিতে সকলকে চঞ্চল লুব্ধ করে তুলল এক নিমেষে! কিন্তু সেই রূপোন্মত্ত সিপাহী বা সিপাহসলারের দল অগ্রসর হতে গেলেই আজিজনের হাতের চাবুক শূন্যে শব্দ করে ওঠে—সপাং!

'অত সস্তা আমি নই ভাই সাহেব! পাঁচ শ মোহর আমার দাম! পারবে দিতে? তবে হ্যাঁ, এক কথা—পাঁচ শ মোহরের বদলিও আছে—আংরেজের রক্ত! আমি যাচ্ছি এখন ঐ কুত্তাদের ছাউনির দিকে—যে আসতে চাও এস। যে আগে

একটা আংরেজ মারবে—আমি নিজে তার কাছে গিয়ে ধরা দেব। সাফ কথা আমার কাছে—এই কসম খেয়ে বলছি।'

এই অভূতপূর্ব ঘোষণার পর আজিজন আর কোথাও মুহূর্তকাল দাঁড়াল না—চোখের পলকে ঘোড়া ঘুরিয়ে রওনা দিল আবার নতুন ঘাঁটির উদ্দেশে।

কিন্তু এতেই ফল ফলল—আশ্চর্যরকম ভাবে!

এতক্ষণ অবধি সেনাপতিদের আদেশে যা হয় নি, নেতাদের পৌনঃপুনিক আবেদনে যা হয় নি, হাজার ইস্তাহারে যা হয় নি—রূপোপজীবিনীর চোখের ইঙ্গিতে ও মুখের প্রতিজ্ঞায় তাই হল। মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে ঢলবার আগেই উচ্ছৃংখল লুটেরারা আবার সিপাহীতে পরিণত হল। হুইলার সাহেবের মাটির কিল্লার চারিদিকে স্থায়ীভাবেই তারা অবরোধ রচনা করল।

কানপুরের বিখ্যাত অবরোধ শুরু হল—রাজা বা বাদশার আদেশে নয়—এক বারবিলাসিনীর অনুপ্রেরণায়।

॥ ৩৭ ॥

মীরাটে যেদিন গোলমাল বাধে, সেদিন হীরালালরা সেখানেই ছিল। আরও অনেকেই ছিল অবশ্য, তাঁরা রয়েও গেলেন। এই সব হাঙ্গামার ভেতর বাঙালীরা একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে টিকে ছিল। সিপাহীরা তাদের সাহেবের পা-চাটা ঘৃণ্য বলে এবং অবজ্ঞা করলেও, কতকটা অকর্মণ্য বলেই জানত—তাই তাদের কাছ থেকে কোন অনিষ্ট আশংকা করে নি। আর বাঙালীরাও, সিপাহীদের কাছে সিপাহীদের এবং সাহেবদের কাছে সাহেবদের হিতাকাংক্ষী সেজে কোন মতে আত্মরক্ষা করছিল। তবে যে মধ্যে মধ্যে একেবারে কাছে এসে পড়ে নি তা নয়—গর্দানটা যেতে যেতেও রয়ে গেছে অনেক বার। মাইনের টাকা তো পাওয়াই যায় নি ক'মাস, তবু অপঘাতে মরে নি—অন্তত এই উপদ্রবের কারণে নয়।

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী লোক। কতকগুলো গোঁয়ার ও মূর্খ সিপাহীর খেয়াল ও মর্জির ওপর ভরসা করে বসে থাকবার মানুষ তিনি নন। তা ছাড়া তাঁর জীবনের মূল্যও কিছু আছে। তিনি প্রায়ই বলেন, 'এতটা কাল তো দুঃখে-দুঃখেই কাটল। দেশভুঁই ছেড়ে তেপান্তর ডিঙিয়ে এখানে এই বেম্মডাঙায় পড়ে থেকে পয়সা রোজগার করেছি,—সে কি পাঁচ ভূতকে খাওয়ানোর জন্যে? নিজেই যদি ভোগ না করলুম তো এ পোড়ার দেশে এমন করে পড়ে থাকার দরকারটা কী বাপু? রামোঃ! এ কি একটা জায়গা! গরমকাল এল তো ভাজনাখোলায় পড়ে ছট্‌ফট কর, ঝলসে মর, আবার শীতকাল এল তো সেও একেবারে উৎপরীক্ষে শীত—ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষং!…সায়েবদের যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই…এইখেনে এল আপিস করতে!'

অর্থাৎ দু পয়সা তিনি করেছেন। সে জবাবও তাঁর মুখে মুখে, 'দেশভুঁই ছেড়ে এই মেড়ো-খোট্টার দেশে না খেয়ে-দেয়ে পড়ে আছি কী করতে বাপু—' দু পয়সা রোজগার করতেই তো? বামুনের ছেলে, হবিষ্যির এক মুঠো চাল আর একটা কাঁচকলা কি দেশে জুটত না? নাকি ইংরেজ আমার বাপের ঠাকুর যে তার উপকার করতে এখানে পড়ে আছি! পয়সা দুটো করেছি,

তা মানছি। আরও করতে পারতুম, তবে সেই সে-মাগীর জ্বালায় কি কিছু উপায় আছে? যা পাবে ছিপিট পাচার করবে নিজের বাপের বাড়ি! দেখ্ তোর—না দেখ মোর! এই তো অবস্থা! বিয়ে করা কি জান দাদা, ভাত-কাপড় দিয়ে ঘরেতে চোর পোষা!'

সুতরাং মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী মীরাট ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। চৌধুরী-প্রমুখ দু-এক জন তাঁকে বুঝিয়ে বলতে গেলেন যে, 'যা হয় সবারই হবে, ইংরেজদের সঙ্গে এরা আর কদিন যুঝতে পারবে ভাবছ? এস, একসঙ্গেই থাকি সকলে, দুর্গা নাম স্মরণ করে। যার মনে যা আছে তাই করবেন—কাটতে হয় কাটবেন, মারতে হয় মারবেন!'

মৃত্যুঞ্জয় ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন, 'উঁহু, আপনারা বুঝছেন না, আমার সংসারে আর কেউ নেই। আমি না থাকলে ছেলেপুলেগুলো পথে বসবে একেবারে। মাগীটা থান পরতে না পরতে শালারা এসে জেঁকে বসবে কর্তা হয়ে—যথাসর্বস্ব শুষে নিয়ে তবে ছাড়বে। বিধবার টাকা খাবার জন্যে বাপসুদ্ধ মুকিয়ে বসে থাকে তো ভাই! তার ওপর মাগীটার তো একরত্তি বুদ্ধি নেই—মনে করে ওর ভাই এরা সব এক-একটি ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! শেষে ছেলেমেয়েগুলোকে হয়তো ভিক্ষেই করতে হবে!...না চৌধুরীদা, মাপ করুন আমাকে। এখনও হয়তো পথ আছে—মানে মানে দেশে গিয়ে পেঁছিতে পারব।'

হীরালালকেও তিনি ছেড়ে যেতে রাজী হন নি। যে দিনকাল, তেমন একটা জোয়ান ছোকরা সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধা। অন্তত দু-চার জন লোকের মহড়া যে নিতে পারবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আজকাল ভাগ্নের হাতে একটা লাল পাথরের আংটি দেখা যাচ্ছে—কোথা থেকে কেমন করে এসেছে সে সম্বন্ধে ভাল রকম কোন জবাব না পেলেও লোকের মুখে তিনি শুনেছেন যে ওটা নানাসাহেবের আংটি—কে জানে, সেই মুসলমানীটারই বা হবে! কিন্তু যদি নানাসাহেবেরই হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে ও-মহলে শ্রীমানের রীতিমত দহরম-মহরম আছে। সেদিক দিয়েও অনেকটা ভরসা!

মুখে বলেছিলেন, 'না বাপু, বিধবার ছেলে তুমি, তোমার মা আমার হাতে সঁপে দিয়ে নিভ্‌ভরসায় আছে। তাকে গিয়ে কী জবাব দেব? আমাকে একলা ফিরতে দেখলে সে হয়তো কেঁদে-কেটে অনর্থ করবে। আমার কথা হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না, ভাববে আমি মিছে করে বলেছি—ছেলে তার ফৌত হয়ে গেছে!'

হীরালাল এতদিনে তার মামাকে হাড়ে হাড়ে চিনেছে। তবু অনেক ভেবেচিন্তে শেষ অবধি মামার প্রস্তাবেই রাজী হল। সিপাহীদের আকস্মিক অভ্যুত্থানের মধ্যেই তাকে বড় সাহেব চুপি চুপি বলে দিয়েছিলেন, 'তোমরা যে পার এখান থেকে পালাও, যেখানে যার সুবিধা চলে যাও, যে কোন ইংরেজ গ্যারিসনে গিয়ে রিপোর্ট করলেই কাজ পাবে। বিশ্বস্ত লোকের এখন খুবই দরকার। আর এ বিপদে যে আমাদের সঙ্গে বিশ্বস্ত ব্যবহার করবে, তাকে আমরা সুদিনে কখনই ভুলব না—এটুকু আশা করি তোমরা আমাদের চিনেছ।'

এখানকার বাঙালীদের সে প্রস্তাব তত ভাল লাগে নি। এই ডামাডোলের বাজারে দিনকতক ঘাপটি মেরে থাকাই ভাল। দেখা যাক না, কতদূরের জল

কতদূরে গড়ায় ! যদি শেষ পর্যন্ত অঘটনই ঘটে, সিপাহীদের জয়লাভ হয়—তখন ? কী দরকার অত ভালমানুষি দেখানোর ?

অথচ হীরালালের অল্পবয়সের রক্ত—যে-কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। কর্মহীন, উদ্যমহীন ভাবে প্রতিদিন বসে বসে গুজব শোনা এবং কোনমতে প্রাণটা বাঁচিয়ে চলা—এ তো মৃত্যুরও অধিক !

জীবনে বিপদেরও এক প্রকার মধুর আস্বাদ আছে।

বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যেই আছে পৌরুষের সার্থকতা !

তা ছাড়া বিপদের সামনাসামনি আগু বেড়ে গেলে ভয়টাও অনেক কমে যায়। 'পড়ল পড়ল বড় ভয়—পড়লেই সরে যায়'—এ প্রবাদ সে আবাল্য শুনে আসছে।

হীরালাল চায় কাজ করতে। সে চায় সাহেবদের এই বিপদে যথাসাধ্য সহায়তা করতে। যাদের নিমক সে খেয়েছে—বিপদের দিনে প্রাণ দিয়েও তাদের সাহায্য করা দরকার। বিধবা মায়ের কাছ থেকে ছেলেবেলায় অনেক ভাল ভাল কথা সে শুনেছে—সেগুলো যে এমনভাবে তার রক্তে মিশে গেছে, তা সে-ও এতদিন ধারণা করতে পারে নি। তার মা—সে সামান্য একটু লেখাপড়া শিখতে—তাকে দিয়েই মহাভারত রামায়ণ পড়িয়ে শুনেছেন, আজ সে-সব কথাও বার বার মনে পড়ে।

এক কথায় সে এইসব বহুদর্শী বিচক্ষণ হুঁশিয়ার অভিভাবকদের সংসর্গ এড়িয়ে স্বাধীনভাবে কোন কাজে লেগে পড়তে চায়—ভারতব্যাপী এই মহা-আহবে কোন-না-কোন দলে, কোন-না-কোন কাজে অংশগ্রহণ করতে চায়।

কিন্তু সে ইচ্ছাপূরণে বাধা অনেক। সকলেই তার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, গুরুজন-স্থানীয়। তারই কল্যাণ ভেবে তাঁরা নিষেধ করেন তাকে ঘরের বাইরে যেতে—মুখের ওপর সে আদেশ ও নির্দেশ লঙ্ঘন করতে বাধে।

সুতরাং 'কণ্টকেনৈব কণ্টকং'—আর এক গুরুজনকে দিয়েই সে বাধা লঙ্ঘন করা যেতে পারে !

মামা ছাড়বেন না—এর ওপর কথা কী ?

তার পর ? মামাকে এড়াতে সে পারবে।

না-হয় একসময় সুযোগ ও সু-স্থান বুঝে সরে পড়তে কতক্ষণ !

'মামা ছাড়ছেন না—উনিই তো আমার অভিভাবক, ওঁর কথা অমান্য করি কেমন করে ?' এই কথাই বলে সকলের কাছে বিনীতভাবে সে বিদায় প্রার্থনা করল এবং নিজের যৎসামান্য তল্পি-তল্পা গুছিয়ে মামার সঙ্গে রওনা দেবার জন্যে প্রস্তুত হল।

মৃত্যুঞ্জয় দিন-ক্ষণ তিথি-নক্ষত্র দেখে, সুযোগ-সুবিধা বুঝে যাত্রা করবেন।

কিন্তু এই সংকল্পে পৌঁছবার আগে শুধুই কি ইংরেজের নিমকের কথা তার মনে এসেছিল—আরও একজনের নিমকের কথা তার মনে পড়ে নি ? তার জীবনদাত্রীর কথাই কি সে ভুলতে পেরেছে ?

না, তা সে পারে নি। তাঁকে ভোলা হীরালালের পক্ষে সম্ভব নয়।

আর তা নয় বলেই সে চায় যতটা সম্ভব তাঁর কাছাকাছি থাকতে। বিপক্ষ পক্ষে থেকেও যদি সে কাছাকাছি থাকতে পারে তো অনেক লাভ। যদি কোনদিন কোন অবসরে—কোন এক বিপদের মুহূর্তে সে তাঁর পা থেকে একটি

কাঁটাও অপসারিত করতে পারে—তা হলেও নিজের জীবন সার্থক ধন্য মনে হবে।

তাই যেমন করেই হোক, কাছাকাছি থাকা দরকার।

আর সেজন্যে মীরাট থেকে বার হয়ে যেতে হবে—যত তাড়াতাড়ি হয়। এতকাল চাকরি ছিল—পরের আদেশে নির্দেশে ঘুরতে হত, গতিবিধির কোন স্বাধীনতাই ছিল না। সে বাধা যখন ঘুচেছে, কোথায় যেতে হবে সেরকম যখন কোন স্পষ্ট নির্দেশ উপরওয়ালার কাছ থেকে পায় নি, তখন সে যতটা সম্ভব সেই জীবনদায়িনী দেবীর কাছাকাছিই থাকবে।

কানপুর—নিতান্ত না হয় তো আশেপাশে কোথাও।...

প্রথম থেকেই তার লক্ষ্য ঠিক করা ছিল। তাই সে মামাকে কিছুতেই উত্তরের নিরাপদ অঞ্চল দিয়ে যেতে দিল না। নানারকমে ভয় দেখিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করল। তার মধ্যে ডাকাতের ভয়টাই বেশি। এখনও ওদিকে রীতিমত ঠ্যাঙাড়ের ভয় আছে। ফাঁসুড়েও দু-চার জন থাকা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া দল বেঁধে রাহাজানি—এ তো নিত্যকার ব্যাপার! এই তো সেদিনও—খবরটা নতুন টেলিগ্রাফ মারফত আগ্রা থেকে তার কাছেই আগে এসে পৌঁছেছিল—গরুর গাড়ি থামিয়ে মাত্র ষোলটি টাকার জন্য পাঁচজন রাহীকে খুন করেছে ডাকাতরা। তাদের কাছে শুধু বর্শা-বল্লম লাঠি-সড়কিই নয়, রীতিমত গাদাবন্দুকও ছিল। তা ছাড়া তরাই এলাকার সর্বনাশা জ্বরাতিসার, সাপ-বাঘ এসব তো আছেই। এ পথে বরং একটিই ভয়—সিপাহীদের। তা তাদের বললেই হবে আমরা কারবারী লোক, দেশে ফিরে যাচ্ছি; এসব ব্যাপারের কিছুই জানি না।

মৃত্যুঞ্জয় কথাটা বুঝলেন। তাঁর সঙ্গে মোটামুটি বেশ কিছু টাকা আছে। টাকাকে সোনায় গেঁথে নিয়েছেন। কোমরের গেঁজেটি মোহরে পূর্ণ। এ মোহর যদি বাড়ি অবধি না পৌঁছয় তো শুধু দেহটা পৌঁছেই বা লাভ কি?

তিনিও অনেক ভেবে শেষে অযোধ্যার পথই ধরলেন।

নানা বিপদ-আপদ (আসল বিপদের চেয়ে গুজবের চোটগুলোই বেশী মারাত্মক) কাটিয়ে, নানা আশঙ্কায় নিয়ত কণ্টকিত থেকে মামা ও ভাগ্নে একসময় লক্ষ্ণৌ-এর উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলেন। এবারের এ যাত্রা আগের বারের চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন। মৃত্যুঞ্জয় এবার অনেকটা নরম হয়ে আছেন—এই লড়াই-বিগ্রহের মধ্যে বলিষ্ঠ ভাগ্নেকে অনেকটা যেন আঁকড়েই ধরেছেন। সেজন্যে তাকে এই পথে একা ছেড়ে দিতে বেশ একটু মন-কেমনই করতে লাগল। তবু হীরালাল তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল। মামাকে আলমনগরের চটিতে রেখে খবরাখবর সুলুক-সন্ধান নেবার নাম করে বার হয়ে আসলে সে বেশী করে শহরেরই হালচাল সংগ্রহ করল এবং ফিরে এসে মামাকে জানাল যে, এখানে এখনও ইংরেজের শক্তি খানিকটা খাড়া আছে। এমন কি কিছু সিপাহীও তাদের দিকে আছে। ইংরেজরা যদিচ বেশির ভাগই রেসিডেন্সির বাগানে আশ্রয় নিয়েছে, তবু বাইরেও কিছু কিছু দপ্তর এখনও তাদের অধিকারে আছে। মচ্ছিভবনের সামনে খোলা মাঠে তারা এক ফাঁসি-গাছ খাড়া করেছে। বিদ্রোহী বলে সন্দেহ হওয়ামাত্র তারা প্রকাশ্যে সেখানে তাদের ধরে ফাঁসি দিচ্ছে। এমন কি তাতেও তাঁবেদার সিপাহীরা প্রকাশ্যে

কোন গোলমাল করে নি।

এই যখন অবস্থা, তখন কি তাঁদের উচিত নয় সাহেবদের সঙ্গে দেখা করে এখানেই যা হোক কাজ শুরু করা ?

মৃত্যুঞ্জয় ভাগ্নের প্রস্তাব শুনে কিছুক্ষণ হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। যা হোক দুটো ভাত-ডাল ফুটিয়ে তিনি এতক্ষণ ধরে হা-পিত্যেশে এই অপদার্থটার জন্য অপেক্ষা করছেন—সে কি এই উদ্ভট প্রস্তাব শোনবার জন্যে ? বেলা তৃতীয় প্রহর অবধি ঘুরে এই অঙ্গ-জল-করা খবর সে আনল !

অনেকক্ষণ পরে তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হল, 'তুমি কি পাগল হয়েছ বাপু ? না তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে ?…জেনেশুনে আবার এই ফাঁদে পা দেব আমি ? এখনও হয় নি—দু দিন পরেই শুরু হবে। সব জায়গাতেই যা হচ্ছে, এখানেও তাই হবে—এদেশই কি বাদ যাবে ভেবেছ ? বলি আসতে আসতে সীতাপুরের কাণ্ডটা শুনলে না নিজের কানে ?…এখন ভাল চাও তো মানে মানে সরে পড়।…আমার ঝকমারি হয়েছিল তোমার কথা শুনে এই পথে আসা। এখন ভালয়-ভালয় বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় কাশীটা পেরোতে পারলে বাঁচি।…চাকরি ! বলে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম !…ভাল চাও তো চল—দেশে গিয়ে এখন দিনকতক ঘাপটি মেরে পড়ে থাকবে। এসব দোলমালাই চুকুক, দেখ আগে কে রাজা হয় আর কে না হয়—তখন চাকরি করলেই চলবে ! চাকরি তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না বাবা, বলি যদ্দিন এই মেতনু গাঙ্গুলী আছে তদ্দিন চাকরির ভাবনা নেই।…নাও, এখন চাট্টি খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর। কাল ভোরেই দুর্গা বলে রওনা দিতে হবে—ওসব কোন কথাই নয়।'

তখনকার মত হীরালাল কোন প্রতিবাদ করল না। ভালমানুষের মতই মুখ-হাত ধুয়ে আহারে বসল এবং প্রতিদিনকার মতই আহারান্তে বাসনগুলি মেজেঘষে দোকানীকে বুঝিয়ে দিল। মামা নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন, ভাবলেন ছোঁড়াটার সুবুদ্ধি হয়েছে। পাগলামিটা অল্পে অল্পেই কেটেছে।

কিন্তু শেষ অবধি দেখা গেল যে তিনি তাঁর ভাগ্নেকে পুরো চিনতে পারেন নি এখনও। অথবা সেই চকিতে-একবার-মাত্র-দেখা এক মুসলমানীর কী পর্যন্ত প্রভাব তাঁর এই তরুণ ভাগ্নেটির ওপর পড়েছে—তার কোন খবরই রাখেন না !

আহারাদির পর মৃত্যুঞ্জয়ের সামান্য দিবানিদ্রার ফাঁকে হীরালাল আবারও কোথায় বার হয়ে পড়েছিল। সন্ধ্যের সময় ফিরল একেবারে দুটো লালমুখ আহেলা গোরা সিপাহী সঙ্গে করে।

তাদের দেখেই তো মৃত্যুঞ্জয়ের নাড়ী ছাড়বার উপক্রম। কোনমতে পৈতেটা আঙুলে জড়িয়ে দুর্গা-নাম জপ করবেন—তাও যেন হাত ওঠে না।

'এ—এসব কী বাপু ?' অতি কষ্টে কণ্ঠ ভেদ করে স্বর বার হয়।

মুখখানাকে যতদূর সম্ভব বিপন্ন করে হীরালাল উত্তর দিল, 'এই যে দেখুন না, এদের সঙ্গে হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেল। আর এরা ছাড়তে চাইছে না। আপনাকেও ধরে নিয়ে যেতে চায়। বলে কাজ বেশি—এখন তোমাদের পালিয়ে গেলে চলবে কেন ?…তা আমি অনেক কষ্টে বলে-কয়ে আপনার ছাড় মঞ্জুর করেছি, কিন্তু আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না। পাছে আমি সরে পড়ি বলে একেবারে সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।…এক্ষেত্রে আপনি একাই যান—আমি থেকে যাই। কী আর করবেন !'

'তা-তা-তাই না-হয় কর। এ কি বিপদ রে বাবা, এ আবার কী বিপদে ফেললেন মা সিদ্ধেশ্বরী! তা বাপু, আমাকে এই কাশীটা অবধি পেঁছে দিয়ে ফিরে এলে হত না?'

'সে তো ভালই হত, কিন্তু এরা যে ছাড়ছে না—দেখতেই তো পাচ্ছেন! ...আমি বরং আমার মোট-মাটারি নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়ি, এদের যা কাণ্ড, হয়তো আপনাকেও পাকড়াও করে ধরবে।...গোরার মেজাজ তো—মত বদলাতে কতক্ষণ!'

'না—না, তা হলে আর দেরি করে দরকার নেই। তুমি সরেই পড় দুর্গা শ্রীহরি বলে। বিপদে মধুসূদন গমনে বামনশ্চৈব—সর্বকার্যেষু মাধব। মাধব, মাধব।...যাও বাবা, আর দেরি ক'র না!'

হীরালাল চিরদিনই গুরুজনের বাধ্য—সে-ও আর কালবিলম্ব করল না। যত শীগগির সম্ভব নিজের বোঁচকাটা নিয়ে বার হয়ে এল।

হীরালাল চিরকালই মার কাছে শুনে এসেছে যে মিথ্যা কথা বলা পাপ। কথাটা তার চর্ম—এমন কি অস্থি ভেদ করে বোধ করি বা মজ্জাতেই মিশে গেছে—এত বারই শুনেছে সে। তাই মিথ্যাকে সে ঘৃণাই করে। তাকে যে কোন দিন, বিশেষত গুরুজনের সামনে মিথ্যা কথা বলতে হবে—এটা সে কল্পনাও করে নি। বলবার আগে মনের সঙ্গেও যথেষ্ট তোলাপাড়া করেছে, কিন্তু আর কোন উপায় দেখতে পায় নি। এক পথ ছিল—না বলে সরে পড়া, কিন্তু সে-ও এক রকমের মিথ্যাচরণ। সে হয়তো আরও হিতে বিপরীত হত। মামা চেঁচামেচি কান্নাকাটি করতেন—হয়তো তাকে বৃথা খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে তাঁর জীবন বিপন্ন হত। তার চেয়ে এ অনেক ভাল। মান-রক্ষার্থে মিথ্যা কথা বলার নির্দেশ তো আছেই শাস্ত্রে—আর এ মান-রক্ষা ছাড়া কী? যিনি বার বার তার জীবন দান করেছেন, কথঞ্চিৎ তাঁরই ঋণ শোধ করা—বা ঋণ শোধের চেষ্টা করা—একে যদি মান-রক্ষা না বলে তো সে বস্তুটি কী তা হীরালাল জানে না।

সৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যাচরণেও বাধা নেই। শঙ্করাচার্যের গল্প সে মার কাছেই শুনেছে। শঙ্কর তাঁর জননীর কাছ থেকে সন্ন্যাসের অনুমতি নিতে মায়া-কুম্ভীর সৃষ্টি করেছিলেন। চিৎকার করে মাকে বলেছিলেন, 'মা, কুমীরে আমাকে নিয়ে চলল, যদি সন্ন্যাসের অনুমতি দাও তো ছাড়তে পারে!' মা পুত্রের জীবননাশের ভয়ে সে অনুমতি দিয়েছিলেন। হয়তো কুমীর আদৌ ধরে নি তাঁকে—সবটাই মিথ্যা। শঙ্করের বেলায় যদি দোষ না হয়ে থাকে তো তার বেলাই বা হবে না কেন?

আসলে হীরালাল নানা পথ ঘুরে সোজা রেসিডেন্সিতে গিয়েছিল। সেখানে তার পূর্ব-পরিচিত মনিবস্থানীয় বহু 'সাহেব'ই আছেন। সুতরাং তার সততায় সন্দেহ করবার কোন প্রশ্নই ওঠে নি। সে যে এই বিপদের মধ্যে পালাবার সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধে সত্ত্বেও সে সুযোগ গ্রহণ না করে কর্তব্যবোধে স্বেচ্ছায় বিপদকেই বরণ করে নিতে প্রস্তুত হয়েছে—এতে তাঁরা সকলেই খুব খুশী হয়েছেন, যথেষ্ট বাহবা এবং সাধুবাদও দিয়েছেন।

হীরালাল তাঁদের মামার কথাটা খুলেই বলেছিল। সব শুনে সাহেবদের একজন মামাকে ঈষৎ ভয় দেখিয়ে তাঁর কবল থেকে মুক্তিলাভের এই সহজ উপায়

বাতলেছিলেন এবং তিনিই হীরালালের সম্মতির অপেক্ষা না করে গোরা সিপাহী দুজনকে শিখিয়ে পড়িয়ে সঙ্গে দিয়েছিলেন।

অবশ্য তখনও হীরালাল ঠিক মনস্থির করতে পারে নি। যুক্তিগুলো ক্রমশ আসছে। প্রথমটা সে চমকেই উঠেছিল। মামার কাছে শুধু মিছে কথা বলা নয়—একটা মিথ্যা অভিনয়ও করতে হবে।…অথচ অন্য উপায়ই বা আছে কী? শেষ পর্যন্ত সে কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেই—যেন অভিভূতের মতো—গোরা দুটোকে পথ দেখিয়ে চটিতে নিয়ে এসেছে এবং সমস্তক্ষণ মনকে প্রবোধ দিতে দিতে এসেছে যে—এতে দোষ নেই, এ এমন কিছু অপরাধ নয়। তৎসত্ত্বেও সেই চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে, এই সমস্ত সময়টা অন্য কিছু উপায়ের জন্যও মনের কাছে যথেষ্ট মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করেছে, কিন্তু এ সময় আর কোনও সহজ পন্থাও তার মনে আসে নি। আপৎকালে মানুষের সহজবুদ্ধি ও সহজাত চিন্তাশক্তি কোন কাজেই লাগে না—হীরালাল নিজেকে দিয়েই যেন এই কথাটার প্রমাণ পেল।

যা হোক, মামার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে মামার জন্য যথেষ্ট মন-কেমন এবং এই বোধহয়-বা অকারণ মিথ্যাচরণের জন্য যথেষ্ট গ্লানিবোধ করলেও—একটা মুক্তির আস্বাদও পেল। সবচেয়ে বড় কথা, নিষ্ক্রিয়তা থেকে মুক্তি পেয়ে সে যেন বাঁচল।

হীরালাল সোজা আবার রেসিডেন্সিতেই ফিরে এল। শেষের দিকে রাজা ও নবাবরা যখন অনেকটা কোম্পানির আশ্রিত হয়ে এসেছিলেন, সেই সময়ই নিয়ম হয়—দেশীয় নৃপতিদের রাজধানীতে এক জন করে 'রেসিডেণ্ট' বা ঐখানে খুঁটি-গেড়ে-বসে থাকা এক জন বড় কর্মচারী থাকবেন। তিনি কড়া নজর রাখবেন ঐসব রাজা-মহারাজারা বেচাল ধরছেন কিনা, অর্থাৎ কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করছেন কিনা। লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সিও সেই রেসিডেণ্ট সাহেবের প্রাসাদ, সেখানেই আজ এখানকার জঙ্গী ও বে-সামরিক সমস্ত ইংরেজ মায় স্ত্রী-শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ছড়িয়ে থাকলে একেবারেই অসহায়, সৈন্যদের সঙ্গে একত্র বাস করায় তবু বাঁচবার একটা আশা আছে।

ফলে কমিশনার সাহেবের অফিস বলুন, সামরিক দপ্তর বলুন, আর কমিসারিয়েট হেড-কোয়ার্টার বলুন—সবই এখন এই রেসিডেন্সি।

কিন্তু হীরালালের মনিবরা রেসিডেন্সিতে তাকে আশ্রয় দিতে রাজী হলেন না। প্রথম কারণ স্থানাভাব। তাঁরা এখনও মচ্ছিভবন দখল করে আছেন বটে, কিন্তু অচির-ভবিষ্যতে হয়তো ছেড়ে দিতে হবে। তখন একেবারেই জায়গা হবে না। তা ছাড়া হীরালাল ইংরেজ নয়, সিপাহীও নয়—সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে বেশভূষায় তার কোন তফাত নেই। তার পক্ষে শহরে কোথাও বাস করে থাকবার অসুবিধে নেই। এখনও তাঁরা ঠিক অবরোধে পড়েন নি, কিন্তু সে সম্ভাবনা খুব সুদূরও নয়। তেমন দিনে সেই অবরোধের বাইরে এক জন বন্ধু বা বিশ্বস্ত কর্মচারী থাকা খুব প্রয়োজন। এই সব ভেবেই তাঁরা হীরালালকে বললেন, শহরে কাছাকাছি কোথাও একটা বাসা দেখে নিতে। খরচার জন্য কয়েকটি টাকাও দিয়ে দিলেন। এখনও পর্যন্ত রেসিডেন্সিতে আসা-যাওয়ার বিশেষ কোন বাধা নেই—হীরালাল স্বচ্ছন্দে প্রত্যহ আসতে পারবে। এই ভাবেই সে উপকারে লাগবে বেশি।

হীরালাল প্রথমটা একটু ক্ষুণ্ণ হলেও কথাটা বুঝল। একেবারে কর্মকেন্দ্রে বাস করবার একটা প্রবল উত্তেজনা আছে। বিশেষত এইরকম সময়ে। সেটা থেকে বঞ্চিত হয়ে একা একা নির্বান্ধব অবস্থায় কোন একটা বাসায় পড়ে থাকা—কথাটা ভাবতে তেমন ভাল লাগে না। কিন্তু এদের কথাতেও যথেষ্ট যুক্তি আছে। সেটা মনে মনে অন্তত স্বীকার না করে পারে না।

সে আবার রেসিডেন্সি থেকে বার হয়ে শহরে এল এবং খানিকটা ঘোরাঘুরির পর এক দোকানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে মাসিক চার আনা ভাড়ায় তার দোকানের পেছনে একটা অন্ধকার ঘরে বাসা বাঁধল। পাক করে খাবার বাসনপত্র এবং আঙোটিও সে দেবে—এইরকম বন্দোবস্ত হল।

॥ ৩৮ ॥

মনে মনে সেই গোরা দুটি, তথা সমগ্র ইংরেজ জাতি, কাণ্ডজ্ঞানহীন সিপাহীগুলি (এই ঝঞ্ঝাটের জন্য তারাই তো মূলত দায়ী!) এবং সেই সঙ্গে নিজের অকালপক্ক ভাগ্নেটিরও মুণ্ডপাত করতে করতে (কী দরকার ছিল বাপু তোমার অত সাউখুড়ি করে শহরে খবর আনতে যাবার?), বাবা বিশ্বনাথ, বাবা বৈদ্যনাথ, বাবা গদাধর এবং দেশের মা সিদ্ধেশ্বরীকে স্মরণ করে মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে প্রণাম জানাতে জানাতে দুর্গা-শ্রীহরি বলে মৃত্যুঞ্জয় পরদিন প্রত্যুষেই আলমনগরের চটি থেকে যাত্রা করলেন।

কিন্তু হায়, কোন কারণে হয়তো ঐ সমগ্র তেত্রিশ কোটিই—অথবা কোন শক্তিশালী দেবদেবী কেউ তাঁর ওপর অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। কিছু দূর যেতে না যেতেই পথের মাঝে আর এক অঘটন ঘটল।

মৃত্যুঞ্জয় ওখান থেকে বার হয়ে প্রাণপণে হেঁটে মাত্র দু দিনেই অযোধ্যা পৌঁছলেন। অযোধ্যা তীর্থস্থান, তা ছাড়া ওখানে কোন ছাউনি বা সেন্যনিবাস নেই বলে অনেকটা নিরাপদ। সুতরাং ওখানে পৌঁছে তিনি অনেকটা হাঁফ ছাড়লেন। পুরাতন বংশগত পাণ্ডাও জুটে গেল এক জন—শহরে পা দিতে-না-দিতেই। তিনি স্থির করলেন, পাণ্ডার বাড়িতে পুরো একটা দিন বিশ্রাম করবেন। এই দুদিন অতিরিক্ত হাঁটায় হাঁটু দুটোতে অসম্ভব ব্যথা হয়েছে, তা ছাড়া এখান থেকে পথঘাটের খবরাখবর সংগ্রহ করাও দরকার: বেশ হিসেব করে নিরাপদ পথ ধরতে হবে। কাশীতে পৌঁছলে গাড়ি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার আগে অবধি বড়ই গোলমাল।

পাণ্ডাকে তিনি দক্ষিণাদি ভালই দিয়েছিলেন। সে-ই উৎসাহী হয়ে পথের খবর সংগ্রহ করে আনল। কিন্তু খবর যা পাওয়া গেল তা মোটেই সুবিধের নয়। কাশী ও এলাহাবাদের পথ ধরা এখন নাকি অত্যন্ত বিপজ্জনক। ইংরেজ ফৌজ ওদিকে যথেচ্ছাচার করে বেড়াচ্ছে—এদেশী লোক দেখলেই নাকি ধরে ফাঁসি দিচ্ছে, কাউকে কাউকে আরও যন্ত্রণা দিয়ে মারছে। যুবকদের তো কথাই নেই—বৃদ্ধরাও খুব নিরাপদ নয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ শুকিয়ে উঠল।

দুর্গা-দুর্গা, জয়-মা-সিদ্ধেশ্বরী, মা, কোনমতে কটা দিন চালিয়ে নাও মা!

অনুতাপ হতে লাগল, মেজর সাহেবকে ধরে একটা পরিচয়-পত্র লিখিয়ে নিলে হত, তা হলে গোরারা কোন জুলুম করত না। বড়জোর ধরে চাকরি

করিয়ে নিত। কিন্তু এ যে পৈতৃক প্রাণ নিয়েই টানাটানি!

পরক্ষণেই মনে হল যে, সে আরও বিপদ। যে কারণে তিনি কমিসারিয়েটের সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত কাগজপত্র নিশ্চিহ্ন করে পথে বের হয়েছেন, সে কারণ তো এখনও বিদ্যমান—অর্থাৎ সিপাহীদের হাতে পড়লে?

তিনি ঠিক করলেন—ও-পথে যাবেন না। পাকা সড়কের মায়াও ত্যাগ করলেন। গুণ্ডা-বদমায়েশ—ফাঁসুড়ে-ঠ্যাঙাড়ের দলও সাধারণত বড় সড়কের ধারেই ওৎ পেতে বসে থাকে। গ্রামাঞ্চল ধরে ক্ষেতের আলে আলে যদি চলা যায় তো অত বিপদের সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া গোরা আর সিপাহী এদের সঙ্গে মোলাকাৎ হবার সম্ভাবনাও কম।

আরও একটা সুবিধে হয়ে গেল। পাণ্ডার বাড়িতে আর একটি বৃদ্ধ বাঙালী যাত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি এসেছিলেন তীর্থ-দর্শন করতে। সঙ্গে বড় একটি দল ছিল। মথুরা থেকে বেরিয়ে আগ্রার কাছাকাছি পেঁছিতেই তাঁরা হাঙ্গামা পান। বড় রকম একদল সিপাহীর হাতে তাঁদের যথাসর্বস্ব যায়। সেই সঙ্গে দলছাড়া হয়েও পড়েন। বাকি সকলে যে কোন্ দিকে গিয়েছে তা তিনি আজও জানেন না। কোনমতে পথে ভিক্ষে করতে করতে এখানে এসে পেঁচেছেন। নেহাত পুরনো পাণ্ডা, তাই সে আশ্রয় দিয়েছে, দু-একটি টাকাও দিয়েছে। সেই ভরসাতেই তিনি এখন দেশে রওনা হচ্ছেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরে তাঁর বাড়ি—দেশে ঘর-বাড়ি জমিজিরাত সবই আছে। দেশে পেঁছিলে তাঁর টাকার অভাব থাকবে না।

লোকটিকে ভাল লাগল মৃত্যুঞ্জয়ের। তবে এভাবে ফাঁসুড়ে-ঠ্যাঙাড়েরাও অনেক সময় আলাপ জমাত—তা তিনি শুনেছেন। তাদের কেউ কেউ এখনও বেশ বহাল-তবিয়তে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে—এও শোনা যাচ্ছে। এই ব্যক্তি সেই উদ্দেশ্যেই "জমাচ্ছে" কিনা কে জানে! অনেক করে তাই বাজিয়ে দেখলেন মৃত্যুঞ্জয়। শেষ অবধি সন্দেহ অনেকটা দূর হল—মনে হল লোকটা সত্যি কথাই বলছে। এতটা বয়স হল তাঁর—দেখলেন শুনলেনও ঢের, মানুষ কতকটা চিনতে পারেন বৈকি? তা ছাড়া পাণ্ডা আশ্বাস দিল—পরিচিত যজমান, যাওয়ার পথেও তীর্থকৃত্য করে গেছে।

মৃত্যুঞ্জয় কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে (লোকটির নাম যজ্ঞেশ্বর মজুমদার) পরামর্শ করতে বসলেন। ঠিক হল যে বেশভূষা যতদূর সম্ভব নগণ্য করে, প্রায় ভিখারীর বেশে তাঁরা গ্রামপথে রওনা হবেন—যজ্ঞেশ্বরের গল্পটাই দু জনে চালাবেন, অর্থাৎ তাঁরা দু জনেই যেন দলছাড়া হয়ে পড়েছেন এবং দাম দিয়ে খাদ্য বা আশ্রয় না খুঁজে সোজাসুজি গ্রামবাসীদেরই সাহায্য প্রার্থনা করবেন। তা হলে আর যাই হোক, ফাঁসুড়ে-ঠ্যাঙাড়েরা পিছু নেবে না, পথে ডাকাতেও ধরবে না।

সেই ভাবেই রওনা দিলেন দু জনে। বিছানাপত্র মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে যা ছিল তা পাণ্ডার বাড়িতেই রয়ে গেল। স্থির রইল ভালয়-ভালয় যদি তিনি কোন দিন মীরাটে ফিরতে পারেন তো যাওয়ার পথে নিয়ে যাবেন। তাঁদের এখন তরুতলবাসই বিধেয়—বিছানাপত্রে আর কাজ নেই। বলতে গেলে এক বস্ত্রেই তাঁরা রওনা দিলেন। পরনের ধুতি ও পিরান—এই কদিনেই যথেষ্ট ময়লা হয়ে উঠেছিল, তা আর পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলেন না। ফলে এমনিতেই যথেষ্ট দীন দেখাতে লাগল।

তিন-চার দিন বেশ চললেন তাঁরা।

যেখানেই যান, গ্রামবাসীরা সাদরে আশ্রয় দেয়। বিশেষত মৃত্যুঞ্জয় ব্রাহ্মণ—এই পরিচয় পেয়ে আরও খাতির করে। আহা, গোলমালে এমন কত লোকই না পথে বসেছে! সাহায্য করা প্রয়োজন বৈকি। এ তো গৃহস্থেরই ধর্ম। হোক 'মছলীখোর বাংগালী'—তবু 'বাহ্মন' তো! এমন কি খাটিয়া বা শয্যাদিরও অভাব হল না। দু-চারটে 'খটমল' অদৃষ্টে জুটল—তা আর কি করা যাবে। সব সুখ কি আর হয়।

মৃত্যুঞ্জয় নিজেই বার বার নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলেন। শুধু যে নিরাপদে যাচ্ছেন তা নয়—এক পয়সা খরচও হচ্ছে না। এটা কী কম লাভ!

কিন্তু হঠাৎ গাজীপুর ছাড়িয়ে এসে এক বিপত্তি বাধল।

সন্ধ্যা হয়-হয়। গ্রীষ্মের অপরাহ্নও ম্লান হয়ে এসেছে। পাখীরা ইতিমধ্যেই গাছপালায় রাত্রির আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত। হাওয়া একেবারে ঠাণ্ডা না হলেও তার সেই প্রচণ্ড দাহ খানিকটা কমে গেছে—এখন হাঁটা অনেক সহজ। মৃত্যুঞ্জয় ও যজ্ঞেশ্বর দুপুরের পরেই এক গাঁ থেকে রওনা দিয়েছেন আকাশের সেই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যেই—গ্রামবাসীদের হিসেব সত্য হলে এক প্রহরের মধ্যেই একটা বড় গণ্ডগ্রামে পৌঁছবার কথা। কিন্তু গ্রামের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। তাঁরা দুজনেই যথাসাধ্য দ্রুত হাঁটছেন—অনেকক্ষণ ধরেই এইভাবে চলছেন, যে-কোন পথেই যে-কোন একটা গ্রাম পাওয়ার কথা। কে জানে, হয়তো বা পথ ভুলে তাঁরা একই পথে ঘুরছেন—নইলে এমন হবে কেন?

আসলে একটা বড় জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছেন তাঁরা—এখানে পথ নির্ণয় করা শক্ত। মাঝে মাঝে এক-আধটু ফাঁকা যে না পাচ্ছেন তা নয়, কিন্তু সে সবই অনাবাদী জমি—মানব-বসতির স্বাক্ষর তার বুকে নেই। তবে ভরসার মধ্যে পায়ে হাঁটা পথ একটা বরাবরই পাচ্ছেন—অর্থাৎ এ পথে লোক যাতায়াত করে। কিন্তু তা হোক, রাত্রের অন্ধকারে এ জঙ্গলের পথে যাওয়া ঠিক নয়। বাঘ-ভালুক তো আছেই—বেশি যেটা ভয় সেটা সাপকে। এই গরমের দিনে এদেশের জঙ্গলে সব রকম বিষাক্ত সাপেরই সাক্ষাৎ মিলতে পারে। সিপাহীর হাত থেকে বাঁচতে এত কাণ্ড করে শেষে কি সাপের কামড়ে প্রাণ দেবেন নাকি?

গ্রাম কোথায়? কত দূরে? কোন্ পথে?

দুজনেই দুজনকে অবিরত প্রশ্ন করছেন। দুজনেই যৎপরোনাস্তি শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন এবং পরস্পরের প্রতি বিরক্তও। দুজনেই দুজনকে দোষারোপ করছেন—'তোমার জন্যই এই কাণ্ডটা হল! তুমিই তো এই পথে নিয়ে এলে!...আমি তখনই বলেছিলুম!' ইত্যাদি।

এই যখন অবস্থা, দুজনেই যখন প্রাণ বাঁচাতে প্রাণপণে ছুটে চলেছেন, হঠাৎ মনে হল পাশের সেই নিবিড় জঙ্গলের ছায়ার মধ্যে থেকে অশরীরী কোন কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ কণ্ঠে যেন ফিস ফিস করে ডাকল, 'বাবু!'

বলা বাহুল্য, দুজনেই প্রচণ্ড বিস্ময়ে ও শঙ্কায় পাথর হয়ে গেলেন। না বার হল কণ্ঠ থেকে কোন শব্দ—আর না চলল পা।

ভূত?

ভূত তো বটেই! তবে—কী ভূত?

আবারও সেই শব্দ হল, 'বাবু! বাবু! এই যে এদিকে! দয়া করে

দাঁড়াও—প্লীজ !'

বিস্ময়ের প্রথম মূঢ়তা ও জড়তা কাটতে দু জনেই প্রচণ্ড একটা দৌড়ের জন্য উদ্যত হয়েছিলেন—এখন এতগুলি কথার পর সামান্য একটু ভরসা হল। দুজনেই ভয়ে ভয়ে নিজেদের বাঁ পাশের ছায়াঘন গাছগুলির দিকে চাইলেন।

জঙ্গলের মধ্যে থেকে এবার বিচিত্র এক মূর্তি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে এল।

এ যদি প্রেত না হয় তো প্রেত কে ?

গায়ত্রী তো দূরের কথা—রাম-নামটাও বুঝি মনে পড়ে না।

'বাবু, ভয় পেও না। আমি ইংরেজ।'

আগের মত ভাঙা হিন্দীতে সেই প্রেতটা বলে ওঠে কথাগুলো।

এবার ভাল করে তাকান দুজনে।

সত্যিই তো—গায়ের রংটা এককালে সাদাই ছিল—তার কিছু চিহ্ন আজও আছে। পোশাকটা শতচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, কিন্তু তবু তা যে সাহেবী পোশাক তাতেও সন্দেহ নেই। তবে কঙ্কালসার মূর্তি, চক্ষু কোটরগত—সবটা জড়িয়ে প্রেতেরই মত দেখাচ্ছে। এ মূর্তি স্পষ্ট দিনের আলোতে দেখলেও ভয় পাবার কথা।

লোকটা হামাগুড়ি দিয়েই আর কতকটা এসে কোনমতে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'বাবু, তোমরা তো বাঙালী—না ? তোমাদের নাঙ্গা শির আর হাঁটবার ধরন দেখেই ধরেছিলুম। আমি ইংরেজ। ফতেপুরে ছিলুম। মিলিটারির সঙ্গে সম্পর্ক নেই—নিতান্তই কারবারী লোক। আগে অতটা গোলমাল বুঝি নি, যখন বুঝলুম, তখন আর উপায় ছিল না। কোনমতে জানটা নিয়েই পালাতে পেরেছি। সঙ্গে মেম আছেন—ঐ দেখ, বনের মধ্যেই এলিয়ে পড়েছেন। আর এক পা চলবার সামর্থ্য নেই। কদিন ধরেই হাঁটছি—অবিরত হাঁটছি বনের মধ্যে দিয়ে। বুনো ফল খাচ্ছি, দু-একটা আমও পেয়েছি মাঝে মাঝে, কিন্তু বিশ্রাম পাই নি কোথাও। লোকালয়ে যাবার সাহস নেই—পাছে ধরা পড়ি।...এ দিকটা দেখেছি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা—হয়তো গ্রামে গিয়ে পড়লে একটা সুবিধে হতে পারে। কিন্তু বিপদ হয়েছে কি আরও—সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছুই নিয়ে আসতে পারি নি। খেতে বসেছিলুম, কোনমতে পেছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে বাগানের পাঁচিল টপকে পালিয়েছি। এক-কাপড়ে এসেছি—পয়সা পাব কোথায়। অথচ এখন আর একটুও চলতে পারছি না। টাকা থাকলে গ্রামে গিয়ে একটা বয়েল গাড়ির খোঁজ করতুম। কিন্তু সে উপায়ও নেই।'

সাহেব এক নিশ্বাসে হাঁপাতে হাঁপাতে কথাগুলি বলে শেষ করলেন।

যজ্ঞেশ্বর মজুমদার ভালমানুষ লোক, তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে মেমসাহেবের অবস্থা দেখতে গেলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের চোখটা প্রথম থেকেই ছিল সাহেবের আঙুলের দিকে। এখন তাঁর হাতের হীরার আংটিটার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'সাহেব, টাকা নেই বলছ, ওটা কি আসল পাথর নয় ?'

সাহেব এত দুঃখের মধ্যেও ম্লান একটু হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আসলই। শুধু পাথরটার দামই আড়াই শ টাকা। কিন্তু পাথর তো ভাঙানো যায় না—ও দিয়ে কী হবে ? এক মুঠো চানা কিনতে পারব—না বয়েল গাড়ির

ভাড়া দিতে পারব ?'

মৃত্যুঞ্জয় কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'ওটা বেচবে সাহেব ?'

'কিনবে তুমি ?' সাহেবের চোখে আশার আলো ঝলকে ওঠে। পরক্ষণেই ম্লান হাসেন আবার, 'এটা আমার বিয়ের আংটি, বেচার ইচ্ছে নেই একটুও—হাউএভার, এখন আর এসব ভাবতে গেলে চলবে না। নগদ টাকা কিছু পেলে বেঁচে যাই !'

লোভে মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তিনি বললেন, 'একটা মোহর আর তিনটে রুপোর টাকা দিতে পারি সাহেব—দেখ।'

'এত কম দাম !' সাহেব হতাশভাবে বললেন, 'এত কমে দেব এই দামী জিনিসটা ?' তারপর একটু সন্দিগ্ধভাবে তাকান মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে, 'তোমার কাছেই আছে টাকা ?'

'আছে বৈকি সাহেব। টাকা না পেলে তুমি মাল ছাড়বে কেন ?'

'সব রুপোর টাকা দিতে পার না ?'

'নেই। রুপোর টাকার ভার বেশি, সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া বিপদ—বোঝই তো সাহেব।'

সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে, দাও তুমি টাকা !'

মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি পিরানের জেবে হাত পুরে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া বের করলেন। তার এক প্রান্তে বাঁধা আছে তিনটে টাকা—আর এক প্রান্তে বোধ হয় কিছু খুচরো রেজ্‌গি। সম্ভবত এখান থেকে সুদূর বাংলা দেশ পর্যন্ত যাবার মোট রাহাখরচ হিসাবে ঐগুলিই বাইরে রেখেছিলেন। এখন ন্যাকড়ার প্রান্ত থেকে অতি সন্তর্পণে টাকা তিনটি বের করে বার বার গুনে সাহেবের হাতে দিলেন। তার পর আবার ন্যাকড়াটি সেই জেবেই পুরে রাখলেন। তার পর ধীরে-সুস্থে কোমর থেকে গেঁজেটি খুলে সবে হাতে করছেন—এমন সময় এই কাণ্ড !

একেবারে সম্পূর্ণ আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা। কল্পনারও অতীত।

যেন মাটি ফুঁড়ে সেই জঙ্গলের মধ্যে থেকে একেবারে সাত-আট জন লোক বেরিয়ে তাঁদের ঘিরে দাঁড়াল।

সম্পূর্ণ নিশব্দে অথচ বিদ্যুৎগতিতে তারা এসে পড়েছে—এত নিঃশব্দে এবং এত দ্রুত যে, উপস্থিত চার জনের এক জনও তাদের আগমন টের পায় নি।

যারা এসেছে তারা সকলেই এ দেশী পশ্চিমা—মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষায় 'খোট্টা'। ঠিক সিপাহী নয় তবে বরকন্দাজ জাতীয়—সকলেরই হাতে মোটা বাঁশের পাকানো লাঠি। কেবল এক জনের হাতে একটা বন্দুক।

ওঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে তারা যেন পৈশাচিক উল্লাসে একটা চীৎকার করে উঠল।

এই প্রথম শব্দ তাদের।

সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই ভয়াবহ উল্লাস-ধ্বনি জঙ্গলের ছায়াঘন বিভীষিকাকে আরও বাড়িয়ে চারদিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সে শব্দে সদ্য-নীড়ে-আসা পাখীগুলো ভয় পেয়ে গাছের আশ্রয় ছেড়ে ঝটাপট করে আবার আকাশে

উড়ে গেল। কোথায় একটা কী জানোয়ারও যেন সভয়ে ডেকে উঠল।

বিস্ময়ের প্রথম বিহ্বলতা কাটতেই মৃত্যুঞ্জয় তাড়াতাড়ি গেঁজেটা লুকোবার চেষ্টা করতে গেলেন, কিন্তু তার আগেই একটা লাঠিয়াল এসে বজ্রমুষ্টিতে তাঁর হাত চেপে ধরল।

'চোট্টা কাঁহাকা! সামহারকে!'

তার পর মহা সোরগোল করে ওরা চার জনকেই বেঁধে ফেলল এবং টানতে টানতে নিয়ে চলল। বেচারী মেমসাহেব সত্যিই অর্ধমৃতের মত পড়ে ছিলেন, অবিরত চলবার ফলে তাঁর রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দুটি পা ফুলে উঠেছে—এক পা-ও আর হাঁটবার সামর্থ্য নেই। তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সাহেব দু হাত জোড় করে বললেন, 'ওঁকে আমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি—ছেড়ে দাও আমার হাতে।'

কী ভেবে লোকগুলো আপত্তি করল না। সাহেব কোনমতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বহন করতে লাগলেন। সাহেবেরও অবস্থা ভাল নয়। সেদিকে তাকিয়ে যজ্ঞেশ্বর ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আমি ধরব আর এক দিকে?'

সাহেব কোন উত্তর দেবার আগেই বন্দুকধারী লোকটা ধমক দিয়ে উঠল, 'নেহি—নেহি, তুম আপনা চলো ঠিকসে। চুপচাপ!'

যজ্ঞেশ্বর ভয়ে চুপ করে গেলেন।

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের এসব কোনদিকে লক্ষ্য নেই। তাঁর মোহরপূর্ণ গেঁজেটি ওদের হস্তগত হয়েছে। বাধা দিতে যে চেষ্টা করেন নি তা নয়, কিন্তু তাতে শুধু হাতের ওপর লাঠির আঘাত খাওয়াই সার হয়েছে। এখনও হাতের গাঁটটা ঝন্‌ঝন্ করছে। তবে সেদিকেও তাঁর তত লক্ষ্য নেই, তিনি শুধু হায় হায় করে চলেছেন। আর কি ঐ গেঁজে তিনি ফিরে পাবেন? এতগুলি মোহর! এতদিনের সঞ্চয়! এত কষ্ট করে এত পথ বাঁচিয়ে এসে এ কী হল!—'হায়, হায়! হে ভগবান, এ কি করলে! হে মা সিদ্ধেশ্বরী, তোমার মনে কি এই ছিল মা?'

সেই অবিরাম চীৎকারে বিরক্ত হয়ে সর্দার গোছের লোকটা ধমক দিল, 'আরে এ বুড্‌ঢা! চুপচাপ চলো। চিল্লাও মৎ। নেহি তো—'

'নেহি তো' কী হবে তা অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় চুপ করতে পারেন কৈ?

'আরে বাবা, আমার গলাটা আগে কেটে ফেল তোরা। আর আমার বেঁচে দরকার কী? আমার জরু-ছাওয়ালই যদি না খেতে পায় তো আমি বেঁচে কী করব?'

সাহেব এবার ইংরেজিতে বললেন, 'চেঁচিয়ে তো লাভ নেই বাবু, মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব কী করা যায়। এখনও তো প্রাণটা আছে, সেটাও যেতে পারে—সেই কথাটা ভাব। বাঁচলে অনেক টাকা কামাতে পারবে।'

ইংরেজি বলতে না পারলেও কতক কতক বুঝতে পারেন মৃত্যুঞ্জয়। কথাটা বুঝলেন, হৃদয়ঙ্গমও হল। অপেক্ষাকৃত একটু শান্ত হয়ে, যে ব্যক্তি তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন।

সে লোকটা কতক উত্তর দিল—কতক উত্তর দিল না। তবু তারই মধ্যে থেকে যতটা বোঝা গেল—এরা স্থানীয় জায়গীরদার রামচরিত সিং-এর লোক। এই সাহেবটার খবর পেয়ে আজ দু দিন ওরা জঙ্গলে ঘুরছে কিন্তু ধরতে পারে

নি—সাহেব ও মেমসাহেব বার বার সুকৌশলে তাদের এড়িয়ে গিয়েছেন। এত পরিশ্রম এতক্ষণে সার্থক হয়েছে—আসলটা তো পেয়েছেন, ফাউটাও মিলেছে। অর্থাৎ এই বজ্জাত 'সাহাব-লোগ'দের সাহায্যকারী বেইমান 'পুরবীয়া' দুটোকেও পেয়েছে! আজ ভারী ইনাম মিলবে মনিবের কাছ থেকে!

মৃত্যুঞ্জয় সব শুনে কাতর কণ্ঠে আর একবার মা সিদ্ধেশ্বরীকে স্মরণ করলেন।

রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত হেঁটে অবশেষে এক সময় তারা রামচরিত সিং-এর প্রাসাদে পেঁছিলেন। ঘিঞ্জি গণ্ডগ্রামের মধ্যে মাটির উঁচু পাঁচিল-ঘেরা সে প্রাসাদ। তার বেশির ভাগই খাপরার চালা, মাটির ঘর—মধ্যে খানিকটা পাকা বাড়িও আছে; একদম জানালাহীন কতকগুলি ঘর—সম্ভবত মধ্যের একটা চতুষ্কোণ উঠান ঘিরে তৈরী হয়েছে। তার দরজা সব ভেতরের দিকে, শুধু নীরন্ধ্র নিরেট উঁচু দেওয়াল। জেলখানার পাঁচিলের মত দেখাচ্ছে। পাকাবাড়ির চালটাও খাপরার, তবে ঘরগুলো খুব উঁচু।

পাকাবাড়িটার সামনাসামনি বাইরের তৃণলতাশূন্য প্রাঙ্গণে কয়েকটা চারপাই পেতে কতকগুলো লোক বসে আড্ডা দিচ্ছিল। প্রায় সবটাই অন্ধকার, উঠোনের মধ্যে দু দিকে দুটো খুঁটিতে বাঁধা গোটাচারেক মশাল জ্বলছে বটে, কিন্তু তাতে আলো হয়েছে অতি সামান্য স্থানেই।

লাঠিয়ালগুলো ঢুকতে ঢুকতে একটা বিচিত্র উল্লাসধ্বনি করে উঠল—তাতে কোন কথা নেই, শুধুই শব্দ খানিকটা—ভেতর থেকেও জাগল তার প্রতিধ্বনি। মাঝের চারপাইতে যে একহারা লম্বা চেহারার লোকটা বসে হুঁকো টানছিল, তারই সামনে গিয়ে কয়েদীদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।

কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়ায় চারদিকের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সেই ধোঁয়া নাকে যেতে যজ্ঞেশ্বর ও সাহেব দু জনেই খক খক্ করে কাসতে শুরু করলেন। সর্দারটা আবারও প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপচাপ খাড়া রহো—বেকুফ কাঁহাকা!'

চারপাইতে উপবিষ্ট সেই লোকটিই সম্ভবত জায়গীরদার রামচরিত সিং। হুঁকো থেকে মুখ না সরিয়েই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাঙালী দুজনের দিকে তাকাল। তখন বন্দুকধারী সর্দারটা দু হাত জোড় করে যা নিবেদন করল তার মর্মার্থ এই যে—এই বাঙালী দুটোও নিশ্চয়ই ইংরেজ কুত্তাদের গুপ্তচর, কারণ ভিখিরীর মতো বেশভূষা হলেও এদের কাছে প্রচুর টাকা-মোহর আছে। এরা এই সাহেবটাকে টাকা দিতেই জঙ্গলে এসেছিল, নইলে ওখানে ওদের কী দরকার? আর এই বদমাশ চেহারার লোকটা গেঁজে খুলে সাহেবকে টাকা দিচ্ছিল—সেই সময়েই ওরা ধরে ফেলেছে। নিশ্চয়ই আগে থেকে ষড় ছিল, নচেৎ জঙ্গলে সাহেবটা আছে—ওরা কেমন করে জানল?

এবার হুঁকোটা মুখ থেকে সরল। ষড়যন্ত্রের চেয়ে স্বর্ণের মূল্য বেশি। রামচরিত প্রশ্ন করল, 'সে মোহর কোথা?'

'এই যে!' সর্দার গেঁজেটা খুলে মোহরগুলি রামচরিতের কোলের মধ্যে ঢেলে দিল। মৃত্যুঞ্জয় সব ভুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরও ঢের ছিল হুজুর, আরও ঢের ছিল!'

পিঠে একটা প্রচণ্ড গোঁত্তা খেয়ে তিনি চুপ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু

ব্যাপারটা বুঝতে রামচরিতের এতটুকুও দেরি হল না। সে বলল, 'কত ছিল ঠিক বল তো বাবু? তোমার কোন ভয় নেই—বল!'

মৃত্যুঞ্জয় ভয়ে ভয়ে পেছনের লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা প্রায় দেড় শ মোহর ছিল হুজুর!'

ছিল আরও বেশি। কিন্তু সামনে রাম, পেছনে রাবণ—রাবণকেও ভয় করবার কারণ যথেষ্ট।

রামচরিত একবার চোখ বুলিয়েই মোহরগুলি গুনে ফেলল। তার পর কঠিন স্থির দৃষ্টিতে সর্দারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বার কর বাকি মোহর এখনই নইলে এই সব কটাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব!'

সর্দার নতমস্তকে কোমরে জড়ানো কাপড়ের খাঁজ থেকে কয়েকটা মোহর বার করে দিল।

'আর?'

'আর নেই, গঙ্গাকসম।'

রামচরিতের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে এল। সে মোহরগুলি আবার গেঁজেতে পুরে সংক্ষেপে হুকুম করল, 'এদের দু দলকে দুটো ঘরে পুরে রাখ। কাল সকালে এদের বিচার হবে।'

অন্ধকার জানালাবিহীন ঘর। দিনের প্রচণ্ড অগ্নিদাহের পর সে ঘর সরা ঢাকা তপ্ত হাঁড়ির মতই হয়ে উঠেছে। সেই রকম একটা ঘরে পুরে রেখে ওরা চলে যাচ্ছিল—দূর থেকে এক জন কে বলে উঠল, 'আরে ভাই, একটু একটু জল দিয়ে রাখ ঘরে, নইলে লোকগুলো মরে যাবে যে!'

বোধ করি সেই কথামতই খানিক পরে সর্দার আবার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। তার এক হাতে এক ঝাঁঝোরা জল, আর এক হাতে একটা চিরাগ। জলের কলসী নামিয়ে সে বাইরে যাবে, হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় পৈতেটা হাতে জড়িয়ে দু হাতে সর্দারের পা জড়িয়ে ধরলেন, 'হুজুর, আমি ব্রাহ্মণ, আপনার পায়ে পড়ছি, আমার একটি উপকার করুন। দেখুন আমি এক কথায় আপনাকে অতগুলো মোহর পাইয়ে দিলুম।'

'এই, পা ছাড়। মোহর তো সব ফিরিয়ে দিলুম!'

মৃত্যুঞ্জয়ের দু চোখে অপরিসীম ধূর্ততা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'গোনাগাঁথা মোহর আমার। আমি জেনেশুনেই কমিয়ে বলেছি, হুজুর!'

'হুঁ। তা থেকে ভাগ দিতে হবে না?' বিরস কণ্ঠে বলে সর্দার।

'তা হোক। মোটামুটি তো আপনিই নেবেন হুজুর। এতগুলো টাকা! তার বদলে আমার একটা সামান্য উপকার করুন, আমি কাউকে কিছু বলব না। দেখুন ব্রাহ্মণ হয়ে আপনার পায়ে ধরছি!'

'ছেড়ে-টেড়ে দিতে পারব না আমি। তা হলে আমার গর্দান থাকবে না।'

'না, না, ছাড়তে হবে না। একটা খৎ পাঠাব আমি লক্ষ্ণৌতে। সেখানে আমার ভাগ্নে থাকে। কোনমতে সেটা তাকে শুধু পাঠিয়ে দিতে হবে। দোহাই হুজুর, এই উপকারটি করুন। একটু কাগজ-কলমের ব্যবস্থা করুন—আর কিছু নয়। দোহাই আপনার!'

সর্দারটি জাতে কুর্মী। ব্রাহ্মণ পায়ে ধরেছে—মনে মনে সে খুবই কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। সে বলল, 'আচ্ছা, আমি কাল খুব ভোরে কাগজ-কলম এনভেলাপ

সব এনে দেব। লিখে দিও।'

'ঠিক পাঠাবেন হুজুর ?'

'ঠিক পাঠাব। গঙ্গাকসম।'

'গঙ্গাকসমের এইমাত্র যা নমুনা পেলাম হুজুর, আপনি বরং আমার জেনেউ ছুঁয়ে বলে যান!'

একটু ইতস্তত করে সর্দার মৃত্যুঞ্জয়ের উপবীত স্পর্শ করেই শপথ করল, তার খৎ সে ঠিক পাঠিয়ে দেবে।...

সর্দার তার প্রতিশ্রুতি মতো খুব প্রত্যুষে, সূর্য অনুদয়েই যথাসম্ভব তস্কর-গতিতে কাগজ-কলম প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হল। মৃত্যুঞ্জয় সংক্ষেপে তাঁর বন্দীদশার সংবাদ দিয়ে হীরালালকে লিখলেন, 'সাহেবদের বলে যদি গোরা আনতে পার একদল, তবেই আমাদের প্রাণ রক্ষা হয়! সাহেব-মেমদের কথা ব'ল—তাঁরা রাজী হবেন। সময়ে এলে হয়তো টাকা কটাও উদ্ধার হতে পারে। কী আর বলব—তুমি আমার সন্তানের মত, তোমার হাতেই আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।'

সর্দার যেমন এসেছিল, চিঠি নিয়ে তেমনি নিঃশব্দে ও গোপনে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই স্বয়ং রামচরিত এসে আবার দোর খুলল। তখনও ভাল করে সকাল হয় নি। ভেতরে এসে কিছুক্ষণ চুপ করে ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমাদের আমি অনিষ্ট করতে চাই না। তোমাদের এখনই ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু সকাল হবার আগেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাও।'

মৃত্যুঞ্জয় প্রথমটা যেন কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

এতক্ষণ তিনি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মড়ার মত পড়ে ছিলেন। এখন একেবারে এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন, 'ভগবান আপনার কল্যাণ করবেন হুজুর, সত্যনারায়ণ আপনাকে দীর্ঘজীবী করবেন। কিন্তু হুজুর—'

'কী ?' কঠিন কণ্ঠে রামচরিত প্রশ্ন করে।

'আমার মোহরগুলো ? দু-চারটে ফেরত পাই না হুজুর ?'

'দুপুরবেলা পঞ্চায়েৎ বসবে। তোমাদের বিচার হবে। সেইখানেই তা হলে আর্জি জানিও!' ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তার মুখ-চোখের চেহারা।

নিমেষে নিজের কান নিজে মলে মৃত্যুঞ্জয় বললেন, 'ঘাট হয়ে গেছে হুজুর। মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম!...ভীমরতি হয়েছে আমার, কী বলতে কী বলে ফেলেছি! চল হে, যজ্ঞেশ্বর। দুর্গা-দুর্গা, মা-কালী আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন, ধনেপুত্রে লক্ষ্মী-লাভ হোক আপনার।'

যজ্ঞেশ্বরের একটা হাত ধরে টানতে টানতে মৃত্যুঞ্জয় প্রায় ছুট দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাঙ্গণ—সেখান থেকে গ্রামপথ—সেখান থেকে বাইরের মাঠ।

একেবারে অনেকটা দূরে এসে সাহস করে দম নিতে দাঁড়ালেন দু জনে।

কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'কিন্তু তোমার ভাগ্নের কাছে চিঠিটা চলে গেল—তাকে তো একটা খবর পাঠাতে হয়। মিছিমিছি তাকে এই হাঙ্গামের মধ্যে টেনে আনা—'

'তুমি ক্ষেপেছ মজুমদার!' মৃত্যুঞ্জয় কথাটা উড়িয়ে দেন, 'তাকে আবার খবর দেব কী করে? তা ছাড়া, দরকারই বা কী, যদি আসতে পারে তো আসুক

না একদল গোরা সিপাই নিয়ে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হয়!…হারামজাদা ব্যাটারা আমাকে সর্বস্বান্ত করে দিলে গা! সর্বনাশ হবে—সর্বনাশ হবে ব্যাটাদের, মুখে রক্ত উঠে মরবে সব কটা।…ভাতে হাত দিতে গুয়ে হাত দেবে, অন্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াবে—এই আমি বলে দিলুম। হে মা কালী, যদি সত্যি হও তো ওখানে থেকে কানে শুনো মা।'

যজ্ঞেশ্বর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'নাও এখন চল, ব্যাটারা আবার এসে পড়তে কতক্ষণ!'

'তা বটে। চল—চল। আবার দাঁড়ালে কেন?'

মৃত্যুঞ্জয়ই তাড়া দিয়ে ওঠেন।

॥ ৩৯ ॥

অতলান্ত সাগরের বুকের ওপর দিয়ে একখানি জাহাজ চলেছে। এখনকার আরামপ্রদ 'লাইনার' নয়—এক শ বছর আগেকার পালতোলা কাঠের জাহাজ। তখন সমুদ্রযাত্রার নাম হলে অতি বড় দুঃসাহসিকেরও মুখ শুকোত। ঝড়-ঝাপটা বিপদ-আপদের জন্য তত নয়—যত ভ্রমণকালীন অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য।

দীর্ঘ মন্থর যাত্রা। সাগরের বুকেই একটির পর একটি জ্যোতির্ময় প্রভাত দেখা দেয়—সে প্রভাত মন্থরতম গতিতে মধ্যাহ্নে অগ্রসর হয়, সে মধ্যাহ্ন আবার এক সময় অপরাহ্নে ঢলে পড়ে, অপরাহ্ন মিলিয়ে যায় নক্ষত্র-খচিত বা মেঘ-তিমিরান্ধ সন্ধ্যায়। শুরু হয় তখন একটানা রাত্রি। এইভাবেই দীর্ঘদিন চলেছে যাত্রীদল। বৈচিত্র্যহীন নিরানন্দময় যাত্রা।

পথ সুদূর। তবু পথের শেষ সম্বন্ধেও এদের না আছে আগ্রহ, না আছে ঔৎসুক্য। কারণ এরা জানে সে পথের প্রান্তে অনেকের জন্যই অপেক্ষা করে আছে ভয়ংকর বীভৎস মৃত্যু। অজানা দেশ, অপরিচিত মানুষ—যেটুকু জনশ্রুত পরিচয় আছে তা আগ্রহ বাড়াবার মত নয়। হলদে বেণীওয়ালা প্রাচ্য মানুষগুলোর নিষ্ঠুরতার অসংখ্য কাহিনীই তারা শুনেছে। তাদের আভিজাত্য বা আতিথেয়তার কোন বিবরণ ওদের কানে পৌঁছয় না। তা ছাড়া সেই মায়া-মমতাহীন নিষ্ঠুর মানুষগুলোর অতিথিরূপেও তারা যাচ্ছে না—যাচ্ছে তাদের শাসন করতে, শত্রুরূপে। সুতরাং সেখানে যে অভ্যর্থনা তাদের ভাগ্যে আছে সে সম্বন্ধে অন্তত একটা অস্পষ্ট ধারণা করতে পারে বৈকি।

তাই যাত্রাতেও যেমন আনন্দ নেই, যাত্রা শেষ করতেও তেমনি ব্যগ্র নয় এরা। যে দিনটি আসছে সেই দিনটিই তাদের লাভ। তার বাইরে আর কিছু জানতে চায় না। তারা পেশাদার সৈনিক—যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, বর্তমানের অতীত কোন ভবিষ্যতে তাদের আশা থাকতে নেই, তারা তা জানে। তাই যতটা সম্ভব হৈ-হল্লা এবং নানারকম পাশবিক আনন্দের মধ্যেই তারা এই দিনগুলি কাটাচ্ছে। এই দিনগুলি যে তাদের মাপ-করা পরমায়ুরই মূল্যবান অংশবিশেষ—এ দার্শনিক তথ্য নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই।

আমরা বলছি ৯৩নং হাইল্যাণ্ডার রেজিমেণ্টের কথা। চীনে বিদ্রোহ দমনে চলেছে এরা। ক্রিমিয়ার অভিজ্ঞ, পোড়-খাওয়া বীর যোদ্ধা সব—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ। কিন্তু বর্তমানের এই অর্ধ-পশুবৎ পানাসক্ত লোকগুলিকে দেখলে সেকথা কল্পনা করাও শক্ত। এই জাহাজেই তাদের সেনাপতি ও

সেনানায়করাও আছেন, কিন্তু তাঁরা এ হুল্লোড়ে বাধা দেন না—তাঁরা জানেন, এইটুকুই এ হতভাগ্যদের সান্ত্বনা। অকারণ বিধি-নিষেধের গণ্ডি টানতে গেলে সে গণ্ডি থাকে না। কাজের সময়টুকুতে রাশ টেনে ধরতে পারলেই যথেষ্ট। আর সে রাশ যথাসময়ে টানতেও তাঁরা জানেন—কাজেই বর্তমানের এ উচ্ছৃংখলতায় কোন উদ্বেগ নেই তাঁদের।

এই বীভৎস হৈ-হল্লার মধ্যে একটি মানুষ কিন্তু প্রথম থেকেই নির্লিপ্ত—এবং এদের মধ্যে থেকেও একটা ব্যবধান রেখে চলেছে—সে হল আমাদের পূর্বপরিচিত 'কোয়েকার' ওয়ালেস। এই দীর্ঘ দিনগুলির অধিকাংশ সময়ই সে দূরে দিকচক্ররেখার দিকে চেয়ে কাটায়—যেখানে সাগরের নীল গিয়ে মিশেছে আকাশের নীলে, একটি সূক্ষ্মরেখা সৃষ্টি করে—অথবা কোন একটা ছায়াচ্ছন্ন কোণ বেছে নিয়ে একমনে বসে বাইবেল পড়ে। মদ সে কোনদিনই স্পর্শ করে না। এমনি অশ্লীল গল্প বা নাচ-গান-হুল্লোড়েও কোনদিন যোগ দেয় না। অবশ্য তার সঙ্গীরাও ওকে দলে টানবার চেষ্টা করে না, কারণ এর আগে বহুবার সে চেষ্টা করে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছে। বরং এখন ওকে এড়াতেই চায়—কারণ ওয়ালেসের এমনই ব্যক্তিত্ব আছে যে, সে কাছে এসে বসলে কেমন যেন সুর কেটে যায় তাদের আমোদের। যে লোকটা অশ্লীল গল্প শুরু করেছে তার গলা শুকিয়ে আসে, যে গান ধরেছে তার তাল কেটে যায়। অথচ কোয়েকার নিজে সাত্ত্বিক ধরনের মানুষ হলেও কোনদিন সে এদের প্রকাশ্যে তিরস্কার করে নি—এমন কি কোন অনুযোগও করে নি। ঠিক যে চেষ্টা করে সে এড়াতে চায় এদের তাও নয়, কিন্তু সকলে আমোদ-আহ্লাদ করছে, তার মধ্যে একটা লোক যদি কাঠ হয়ে বসে থাকে—তাহলে বাকি সকলের আনন্দে কোথায় যেন বেসুর বাজে।

কিন্তু এই একান্ত নির্লিপ্ত উদাসীন মানুষটিকেও সহসা একদিন দারুণ বিচলিত ও উত্তেজিত হতে দেখা গেল। তার সে উত্তেজনা যারা লক্ষ্য করল—তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

জাহাজটি তখন সমস্ত আফ্রিকার পশ্চিম সীমা অতিক্রম করে একেবারে দক্ষিণে এসে পৌঁছেছে—সাইমনস্ উপসাগরে দু দিনের জন্য নোঙর ফেলেছে খাদ্য জল প্রভৃতি নেবার জন্য, কিন্তু জাহাজ থামার কিছুক্ষণ পরেই আর একটি জাহাজ এসে ভিড়ল এর সঙ্গে। তাতেই ছিলেন সেনাপতি—ঐ জাহাজটিই তখন হেড কোয়ার্টার্স। শোনা গেল, ওতে কী একটা জরুরী খবর পৌঁছেছে ; এবং তার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে জরুরী খবর রেজিমেণ্টের সব সৈনিকেরই কর্ণগোচর হল। ভারতে 'মিউটিনি' দেখা দিয়েছে—দেশী সিপাহীরা গোরা সেনাপতি, সৈনিক, এমন কি 'সিভিলিয়ান' সাহেবদের উপরও চড়াও হয়েছে। শুধু প্রাণ নয়—স্ত্রীলোকদের ইজ্জৎও বিপন্ন। স্ত্রী-শিশু-বৃদ্ধ কেউই নাকি তাদের হাতে অব্যাহতি পায় নি। অবশিষ্ট যে ইংরেজ এখনও আছেন তাঁদের অবস্থাও সংকটাপন্ন। অতএব এখনই সেখানে লোক পাঠানো প্রয়োজন। ৯৩নং হাইল্যাণ্ডারদের চীন-যাত্রা এখন স্থগিত রইল—এখনই তাদের কলকাতা রওনা হতে হবে।

খবরটা শুনে চারদিকেই একটা গুঞ্জন উঠল।

অত্যাচারের সংবাদে সকলেরই রক্ত গরম হয়ে উঠেছে।

নেটিভ সিপাহীগুলোর এত স্পর্ধা! এই স্পর্ধার এমন উত্তর দিতে হবে

যে, শতাব্দী পরেও মানুষ যেন তা না ভোলে। রক্তের বদলে রক্ত শুধু নয়—একটি ইংরেজের রক্তের বদলে দশটি নেটিভের রক্ত চাই—যাতে কোন প্রাচ্য দেশে কোন কালে আর কেউ না ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সাহস করে। ইত্যাদি—

গুঞ্জন ক্রমে কোলাহলের আকার ধারণ করল। সে কোলাহলে নির্লিপ্ততা রাখা সম্ভব নয়—একসময় কোয়েকার ওয়ালেসের কানেও তা পেঁছিল। কিন্তু যে ব্যক্তিকে কামানের গোলার সামনেও প্রশান্ত মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে —তার এতকালের প্রশান্তি সহসা এই সামান্য সংবাদে কে জানে কেন একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। সে আরক্ত মুখে ভিড়ের মধ্যে এসে যাকে যাকে সামনে পেল প্রত্যেককেই প্রশ্ন করতে লাগল, 'এসব কী শুনছি—এ কি সত্যিই? আমরা নাকি ইণ্ডিয়ায় যাচ্ছি?'

এক এক জন এক এক রকম উত্তর দিল। কেউ বলল, 'সত্যি বইকি!' কেউ বলল, 'তাই তো শুনছি।' কেউ বা বলল, 'হুকুম নাকি সেই রকমই এসেছে।'

অবশেষে এক জায়গায় ক্যাপ্টেন ডসনের দেখা পাওয়া গেল। তাঁকেও প্রশ্ন করল ওয়ালেস। ডসনের দু চোখেতে আগুন—বোঝা গেল তিনিও অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন; বললেন, 'আলবৎ যাচ্ছি, এই পথটা যদি উড়ে যেতে পারতাম তো ভাল হত!'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন, আমরা চীনে যাব বলে এই দলে নাম লিখিয়েছিলাম।'

ডসন এবার যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়ে তাকালেন, বললেন, 'তুমি বড় আশ্চর্য লোক তো দেখছি! তুমি কি ভারতে যেতে চাও না নাকি? তুমি কি শোন নি সেই dirty swineগুলো কী করছে সেখানে? আমাদের মেয়েদের বে-ইজ্জৎ করেছে—স্ত্রী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিচারে হত্যা করেছে, সাধু-সন্ত-পাদরী কেউই বাদ যায় নি? এর পরেও তুমি স্থির থাকতে পারছ?'

বিচিত্র ভ্রূকুটি করে ওয়ালেস উত্তর দিল, 'মাপ করবেন ক্যাপ্টেন, আমরা যা এতকাল করেছি সেখানে—তারই ফল ভোগ করছি মাত্র। এতে এত বিচলিত হবার মত কিছুই দেখছি না।'

ডসন কাঁধটায় এক প্রকার ঝাঁকানি দিয়ে শুধু বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! যাই হোক—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আমাদের হুকুম তামিল করা ছাড়া উপায় নেই।'

ওয়ালেস আর দ্বিরুক্তি না করে কোনমতে ভিড় ঠেলে পাশের জাহাজ 'মরিসাস'এ গিয়ে উঠল। সেখানে কর্নেলের কামরার সামনে বিরাট জটলা। কর্নেলও ব্যস্ত রয়েছেন নিশ্চয়ই, শোনা গেল, অপর সেনানায়কদের সঙ্গে কনফারেন্সএ বসেছেন। আর্দালী অফিসার যে ভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে আছেন, তাতে সেদিকে কিছু সুবিধে হবে বলে ভরসা হয় না। অগত্যা ওয়ালেস অধীর ভাবে সেইখানেই পায়চারি করতে লাগল। সে যে নিরতিশয় বিচলিত হয়েছে—তার মুখ দেখে সে বিষয়ে সংশয় মাত্র থাকে না। যে ক'জন পরিচিত সহকর্মী আশেপাশে ছিল, তারা বিস্মিত হলেও এই অস্থিরতার ভিন্ন অর্থ করল। তারা ভাবল, প্রতিশোধের জন্যই সে অধীর হয়ে উঠেছে।

সৌভাগ্যক্রমে কর্নেল আদ্রিয়ান হোপ কিছু পরেই সহসা বার হয়ে এলেন, চারদিকের জনতার দিকে চেয়ে এক প্রকার কঠিন হাস্যের সঙ্গে বললেন, 'বৎসগণ, তোমরা এতক্ষণে খবর নিশ্চয়ই শুনেছ। আমরা যত শীঘ্র সম্ভব জ্বালানি এবং

খাবার সংগ্রহ করেই রওনা দিচ্ছি। শুয়োরের বাচ্চারা মনে করেছে ঐ কটা অসহায় এবং অপ্রস্তুত ইংরেজকে নিয়েই আমাদের দেশটা, আর ঐটুকুই আমাদের শক্তি! তারা এখনও আমাদের চেনে নি একটুও, কিন্তু ভয় নাই—আমরা গিয়ে পড়ছি শীগগিরই। এ ঋণ যদি কড়ায়-ক্রান্তিতে সুদসুদ্ধ উসুল করতে না পারি তো বৃথাই আমাদের শৌর্যের খ্যাতি, বৃথাই হাইল্যান্ডার্স রেজিমেণ্টের এতদিনের গৌরব। তোমরা একটু ধৈর্য ধর—প্রতিটি বিন্দু ইংরেজ-রক্তের দাম আমরা আদায় করে নেব—অন্তত দশগুণে!'

চারদিক থেকে জয়ধ্বনি উঠল—উঠল কর্নেল এবং রেজিমেণ্টের জয়গান। তবে সে জয়ধ্বনিতে উল্লাসের নামগন্ধ ছিল না—একটা চাপা রোষ এবং প্রতিহিংসার দৃঢ় সংকল্পেরই আভাস ছিল তাতে।

আদ্রিয়ান হোপ ভিড় ঠেলে সিঁড়ির মুখের দিকে আসতেই ওয়ালেস সামনে এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

'মাপ করবেন কর্নেল, একটা কথা!'

প্রথমটা ভ্রূকুঞ্চিত করে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন কর্নেল। কিন্তু ওয়ালেসের মুখের চেহারাটা দেখার পর সে কুঞ্চন মিলিয়ে গেল। মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি ওয়ালেস, না? কোয়েকার ওয়ালেস! তোমার অধীরতা বুঝতে পারছি ওয়ালেস—আমিও কম অধীর হয়ে উঠি নি, কিন্তু কী করব, উড়ে যাওয়া তো সম্ভব নয়! তবে নিশ্চিন্ত থাক, মানুষের যতটা সাধ্য ততটাই তাড়াতাড়ি আমরা গিয়ে পেঁছিব। আর কটা দিন ধৈর্য ধরে থাক।'

ওয়ালেস একটু অসহিষ্ণুভাবেই হাতটা আবার কপালে ঠেকাল। বলল, 'মাপ করবেন, কিন্তু আমার অন্য একটা কথা আছে।...আমরা কি সত্যিই ইণ্ডিয়ায় যাচ্ছি?'

'নিশ্চয়ই!' হোপ নিরতিশয় বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চাইলেন, 'কেন, তুমি কি শোন নি, সেখানে নেটিভ সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং অকথ্য অত্যাচার করেছে—এখনও করছে?'

'কিন্তু কর্নেল', শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে ওয়ালেস বলল, 'আমরা চীনে যাব বলেই এই রেজিমেণ্টে নাম লিখিয়েছিলাম। অন্যত্র যাওয়ার কথা হলে হয়তো নাম লেখাতাম না। আর সত্যি কথা বলতে কি, ভারতে যেতে আমার প্রবল আপত্তি আছে।'

'আশ্চর্য! ওখানে কী রকম বর্বরতা হচ্ছে তা শোনবার পরও এই রকম মনোভাব তোমাদের কারও হতে পারে—এ নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস হচ্ছে না! জান, ওখানে তোমাদের মেয়েরা সুদ্ধ অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হচ্ছেন!'

'হয়তো অনেক পাপের সামান্য মূল্য শোধ হচ্ছে মাত্র—অবশ্য মাপ করবেন, এ সব কথা আমার মুখে ধৃষ্টতা, কিন্তু আমি এখনও আমার কথার জবাব পাই নি।'

আদ্রিয়ান হোপের ললাটে এবার একটা ভীষণ রোষ ঘনিয়ে এল। তাঁর তখনকার সে ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটির দিকে চাইলে অনেকেরই বুক কেঁপে উঠত। কিন্তু ওয়ালেস শান্তভাবেই উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগল, তাকে বিন্দুমাত্র ভীত বা সন্ত্রস্ত হতে দেখা গেল না।

হোপ কিছুক্ষণ নিঃশব্দ দহনে তাকে দগ্ধ করে কঠিন এবং রুক্ষ কণ্ঠে

বললেন, 'তোমরা জাতির কলঙ্ক ! তোমাদের মত লোক নিশ্চয়ই আরও দু-চারজন ওখানে আছে, তাই নেটিভগুলোর অত স্পর্ধা !...হাউএভার, তোমরা সৈনিক, তোমাদের সঙ্গে এই চুক্তিই আছে—যখন যেখানে যেতে বলা হবে সেখানেই যাবে।...একথা যে এতকাল পরে তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হল সেজন্য আমি দুঃখিত।'

তিনি আর কোন উত্তর-প্রত্যুত্তরের অবসর মাত্র না দিয়ে প্রত্যভিবাদনের একটা ভঙ্গি করেই দ্রুত পাশের 'বেল আইল' অর্থাৎ ওয়ালেসদের জাহাজ পরিদর্শনের কাজে চলে গেলেন।

ওয়ালেস বহুক্ষণ সেখানেই নতমুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দক্ষিণে অনন্ত ভারত-মহাসমুদ্রে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে—বাতাস স্তব্ধ, সমস্ত আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে রয়েছে।

পাশের জাহাজের উত্তেজনা হৈ-হল্লাও কমে আসছে ক্রমশ, একটু পরেই সন্ধ্যার খাবার দেওয়া হবে—সেজন্য প্রস্তুত হচ্ছে হয়তো সবাই।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে দূর সমুদ্রের দিকে চাইল ওয়ালেস। কী দেখল কে জানে? হয়তো বহুদিনের স্মৃতির গরল তার কণ্ঠে ফেনিয়ে উঠেছে—তাই কেমন এক রকমের রুদ্ধ অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক !'

॥ ৪০ ॥

এমন ভয়াবহ গোলযোগ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে চিঠিখানা যে সত্যই হীরালালের কাছে পেঁছিবে, স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ও পুরোপুরি এমন আশা করেন নি—কতকটা শেষ অবলম্বন হিসেবেই চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু, সম্ভবত তাঁর উপবীত স্পর্শ করে শপথ করানোর জন্যই, চিঠিটা একসময় সত্যি-সত্যিই হীরালালের হস্তগত হল।

চিঠি পেয়ে সে বিষম বিচলিত হয়ে পড়ল। মামা যা-ই হোন, আর যা-ই করুন—হাজার হোক, মামাই। তা ছাড়া সে তাঁর কাছে অনেক উপকৃত তাতেও সন্দেহ নেই। তিনি তাঁর কল্যাণার্থেই তাকে সঙ্গে এনেছিলেন—তিনি না আনলে এ চাকরি পাওয়াও সম্ভব হত না।

কিন্তু এখন করাই বা যায় কী ?

সাহেবের কাছে একথা মুখে আনা চলবে না। তাঁদের নিজেদেরই অবস্থা শোচনীয়—যাকে বলে, 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল' তাই ! নেটিভ কেরানী মৃত্যুঞ্জয়ের কথা তোলাই তো বাতুলতা—এমন কি ঐ সাহেব-মেম দুটির কথা শুনিয়েও কোন লাভ হবে না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। নিজেদেরই যেখানে নিত্য জীবন-সংশয়, সেখানে পরের কথা কে ভাবতে বসবে ?

অবশ্য হীরালালকে ভাবতে হল বৈকি।

সারাদিন ধরেই সে ভাবল এবং ছটফট করল। সব চেয়ে মুশকিল এই যে, এখানে এমন পরিচিত হিতাকাঙ্ক্ষী কেউ নেই, যার সঙ্গে সে পরামর্শ করতে পারে। অবশেষে সন্ধ্যার সময় একটা মতলব মাথায় এল। সে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে শরীর খারাপের অছিলায় দিন-তিনেকের ছুটি নিল। এখন এমনই বিপর্যয়ের সময় যে, কে কী ছুটি নিচ্ছে না নিচ্ছে সে কথা নিয়ে মাথা ঘামাবারও

অবসর নেই কারও। ছুটি সহজেই মিলে গেল। তার পর সে একটি সিপাহীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নগদ একটি টাকা ঘুষের সাহায্যে সরকারী ভাণ্ডার থেকে একটা সিপাহীর পোশাক সংগ্রহ করে বাসায় ফিরে এল।

সমস্ত দিন কিছুই খাওয়া হয় নি—শুধু পিপাসার সময় এক ডেলা গুড় গালে দিয়ে এক ঘটি জল খেয়েছিল মাত্র। ফলে এখন শরীর ঝিম ঝিম করছে। একে পশ্চিমে গরমের দিনে ক্ষুধা এমনিতেই প্রবল হয়, তার ওপর এত বড় বেলা গড়িয়ে গেল—পেটে কিছু পড়ে নি, শরীর ভেঙে আসবারই কথা। অথচ এখন আর আঙোটি ধরাতেও ইচ্ছে হল না। শেষ পর্যন্ত বাজার থেকে কিছু গরম পুরী সংগ্রহ করে এনে তাড়াতাড়ি আহারের পালা শেষ করল। তার পর সেই সিপাহীর পোশাকটা এঁটে দুর্গা প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম স্মরণ করতে করতে ঘরের চাবিটা বাড়িওয়ালা দোকানদারের জিম্মা করে দিয়ে দিকনির্দেশহীন অজানা সেই গ্রামের উদ্দেশে রওনা হল। ভাগ্যে মাত্র দিন কয়েক আগেই—কতকটা তার নিরাপত্তার কথা ভেবেই, তার যাতায়াতের জন্যে সাহেব একটা ক্ষীণজীবী গোছের খচ্চর দিয়ে রেখেছিলেন—তবু অনেকটা সুবিধা হল। কোথায় যেতে হবে স্পষ্ট জানা নেই। মামার চিঠিতে শুধু এইটুকুই ছিল যে 'গাজীপুর ছাড়িয়ে সোজা পূর্ব-দক্ষিণ মুখে হাঁটলে এক বন পাবে, সেই বনের সীমানায় একটা গ্রাম'—এই সামান্য নির্দেশ নিয়ে হাঁটাপথে সে-গ্রাম খুঁজে বের করতে করতে মামা টিকে থাকবেন কিনা সন্দেহ। এখন এই অশ্বতর-পুঙ্গব যদি শয্যাগ্রহণ না করে তো অনেক অল্প সময়ে ও স্বচ্ছন্দে সে সেখানে পৌঁছতে পারবে। পথ চলতে চলতে মামার ওপর রাগটা সে চাপতে পারল না। কী দরকার ছিল সকলের কথা অবহেলা করে এই গোঁয়ার্তুমি করতে যাওয়ার ?

॥ ৪১ ॥

কানপুরের সংবাদ আবছা অস্পষ্টভাবে লক্ষ্ণৌতেও পৌঁছল। সার হিউ ইতিপূর্বে লরেন্সের প্রেরিত দু শ সৈনিক ফেরত দিতে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন—কিন্তু সম্পূর্ণ হন নি। হুইলার যতই বলুন, সিপাহী ও স্থানীয় নেটিভদের ওপর এতটা নির্ভর করার মত আবহাওয়া চারদিকে কোথাও নেই—শুধু কানপুরে থাকবে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশেষত নানাসাহেব, যাঁর ইংরেজদের আচরণে ক্ষুণ্ণ হবার যথেষ্ট কারণ আছে, তিনি যে সত্যি-সত্যিই 'জান' দিয়ে ইংরেজদের রক্ষা করবেন তাও বিশ্বাস করা কঠিন। তাই লরেন্স একটা কান বরাবরই কানপুরের দিকে খোলা রেখেছিলেন।

এখন এই সব গোলমেলে সংবাদে তাঁর পূর্ব সংশয়ই সত্য বলে প্রমাণিত হতে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু এখন তাঁর অবস্থাও সংকটজনক, শেষ মুহূর্তে শেষরক্ষা হবে কিনা সন্দেহ। তিনি কেমন করে এখান থেকে লোক পাঠাবেন!

কিন্তু তাঁর উদ্বেগ তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। কানাঘুষা এদিকে-ওদিকেও ছড়িয়ে পড়ল। অপর ইংরেজ অফিসাররাও উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হয়ে উঠলেন। এইটুকু তো মাত্র পথ—তবু এতটুকু সাহায্য করতে অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে না, এর জন্যে ক্ষোভ ও আত্মবিলাপেরও শেষ রইল না। অথচ উপায়ও

কিছু নেই কোথাও।

অবশেষে আর কোনমতে স্থির থাকতে না পেরে বোলটন নামে এক তরুণ লেফটেনান্ট এসে জানাল—সে একাই একবার কানপুরে যেতে চায়। সেনাপতি কি অনুমতি দেবেন ?

সার হেনরী বহুক্ষণ বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর বললেন, 'কিন্তু তুমি একা গিয়ে তাদের কি উপকারে লাগবে ?'

'তা জানি না। হয়তো সত্যিই কিছু উপকার করতে পারব না। কিন্তু এমন ভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাও যে অসহ্য।...তা ছাড়া, একটা কথা ভেবে দেখুন সার, কোন-একজন বন্ধুও অন্তত বাইরে থেকে তাদের সাহায্যের জন্যে গিয়ে পড়ছে—এটা জানতে পারলে তাদের মনের বল কতখানি বাড়বে !'

'কিন্তু পারবে কি শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে ?'

নিঃশব্দ প্রশংসায় সার হেনরীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও, সংশয়ের সুর বাজল তাঁর কণ্ঠে।

'চেষ্টা করতে পারব অন্তত ! প্রাণপণেই চেষ্টা করব।'

'তাতে প্রাণটাই হয়তো যাবে, আর কোন কাজ হবে না !'

'মাপ করবেন, প্রাণ তো এখানেও যেতে পারে। হয়তো অচিরেই যেতে পারে।...এখানেই যে বেশী দিন আমরা নিরাপদে থাকতে পারব তারই বা ঠিক কি ?...নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে বসে মরার চেয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতে গিয়ে মরা কি অনেক ভাল নয় ?'

লরেন্স প্রায় সমস্তক্ষণই তার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। এখনও খানিকটা স্থির অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আত্মবিশ্বাস ও আত্মত্যাগের অদম্য বাসনায় দীপ্ত-উজ্জ্বল মুখ। রণবাদ্য শুনলে যুদ্ধাশ্বের যে চঞ্চলতা দেখা যায়, সেই চাঞ্চল্য তার সমস্ত স্নায়ুতে ও পেশীতে। একটা কোন কাজে লাগতে, বিপদকে আগু বাড়িয়ে যুদ্ধ দিতে অধীর উন্মুখ হয়ে উঠেছে সে।

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে লরেন্স বললেন, 'যাও, কিন্তু একেবারে একা যেও না !'

এবার বিস্মিত হবার পালা বোলটনের, 'বেশী লোকজন নিয়ে গেলে লোকের চোখ এড়িয়ে যাওয়া শক্ত হবে স্যার। বরং একা কোনমতে পৌঁছতে পারব হয়তো।'

'না, খুব বেশী লোক আমি দিতেও পারব না। তবে একেবারে একা যাওয়াও ঠিক নয়। এখনও কিছু বিশ্বাসী সিপাহী আছে আমাদের হাতে—তাদেরই মধ্যে থেকে জনা-কয়েককে বেছে নাও।'

বোলটনের এ প্রস্তাবটা ভাল লাগল না। তবে সে লরেন্সকেও চিনত। এটা অনুরোধ নয়—আদেশ। এ আদেশ অবহেলা করলে শেষ পর্যন্ত যাবারই অনুমতি পাবে না।

বোলটন অনেক যাচাই-বাছাই করে ছ জনকে সঙ্গী করল। ছ জনেই সওয়ার, তারা ঘোড়ায় চেপেই রওনা হল, নচেৎ অযথা বহু বিলম্ব হয়। স্থির রইল যে, কানপুরের উপকণ্ঠে পৌঁছে তারা ঘোড়াগুলো কোথাও লুকিয়ে রাখবে, তার পর পদব্রজেই শহরে ঢুকবে।

সারাদিন এক রকম ভাল ভাবেই কাটল। বোল্‌টন বড় সড়কের জনবহুল অংশ এড়িয়ে চলল। যেখানে যেখানে পথের ধারেই গাঁ বা বস্তি—সেখানে পথ থেকে মাঠে নেমে বনের মধ্যে দিয়ে অথবা বহু দূর চক্র দিয়ে ঘুরে চলতে লাগল।

কিন্তু বিপদ বাধল সন্ধ্যার মুখে।

সকালে রওনা হবার আগে কিছু পেটে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার পর এই জ্যৈষ্ঠের সুদীর্ঘ বেলা কেটেছে। শুধু এক জায়গায় মাঠের মধ্যে একটা কুয়া পেয়ে মানুষ ও পশু উভয়েই একবার পিপাসা মিটিয়ে নিয়েছিল মাত্র, তবে সে-ও অনেকক্ষণের কথা হয়ে গেল। এবার আহারাদির চেষ্টা না দেখলে নয়। নিজেদের কিছু খাওয়া দরকার, ঘোড়াগুলোকেও কিছু খাওয়ানো দরকার। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন জীবগুলির বিশ্রামের। আটা-ডাল সিপাহীদের সঙ্গে কিছু কিছু আছে, কিন্তু সেগুলি কাঁচা খাওয়া যায় না। পাক করবার মত একটা স্থান, আগুন এবং একটু জল চাই। ঘোড়াগুলোর ঘাস এই দগ্ধ তৃণশূন্য প্রান্তরে মিলবে না—সেজন্যেও লোকালয় চাই।

এই সব অকাট্য যুক্তির কাছে বোল্‌টনের সব সতর্কতা-বোধকে হার মানতে হল। অবশেষে সন্ধ্যার মুখে তারা একটি গ্রাম দেখতে পেয়ে সোজা সেই দিকেই ঘোড়া চালাল।

ছোট্ট গ্রাম। পথের ধারেই একটা কুয়া, তার সামনেই একটি চটি। কুয়াতলায় কয়েকটা লোক কুণ্ডলীপাকিয়ে বসে তামাক খাচ্ছিল, সহসা এতগুলো ঘোড়সওয়ারকে দেখে তারা প্রথমটা ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক সরে পড়ল। দোকানদারটিও ঝাঁপ বন্ধ করতে পারলে খুশী হত, কিন্তু সে চেষ্টা করবার আগেই ওরা এসে গেল।

বোল্‌টন তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে তার দোকানের চালার মধ্যে মাথা গলিয়ে দিয়ে বলল, 'ডরো মৎ, হাম লোক চীজ লেগা, কিম্মৎ দেগা। ডরো মৎ।'

ইতিমধ্যে যারা এদিক-ওদিক গা-ঢাকা দিয়েছিল, তারা ছ জন সিপাহীর মধ্যে এক জন গোরা দেখে আশ্বস্ত হল। এবার' তারা এসে ঘিরে দাঁড়াল। কেউ কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কুয়া থেকে 'পানি' উঠিয়ে দিতে লাগল।

একটা গাছতলায় খাটিয়া পাতা ছিল—বোল্‌টন নিশ্চিন্ত হয়ে তাতে শুয়ে পড়ল। নিজের জন্য আহার্য তৈরির তাড়া নেই—সিপাহীদের ডাল-রুটি তৈরি হলে সে-ও ভাগ পাবে। এতকাল এদেশে থেকে দেশী খাদ্য তার বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে।

সিপাহীরা বিশ্রাম এবং স্নানাদির পর আর একটা গাছতলায় চুলা কেটে ডাল চাপাল। চটিওয়ালাই রান্নার 'সামান' ইত্যাদি দিয়েছিল। ঘিউ-নিমক-মশলা প্রভৃতি বেশ চড়া দামে বেচতে পেরে সে বরং এদের ওপর একটু বন্ধুভাবাপন্নই হয়ে উঠল—সে নিজে থেকেই ঘোড়াগুলোর তদ্বির করতে লাগল। বোল্‌টন মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে আরও একটু পরে বেশ নিশ্চিন্তভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হল।

কিন্তু গোল বাধল এবারই।

গ্রামবাসীরা ছ জন সিপাহীর সঙ্গে এক জন গোরাকে দেখে আগে একটু উল্টোই বুঝেছিল। তারা ভেবেছিল সিপাহীরা গোরাটাকে কয়েদ করে নিয়ে যাচ্ছে। সে ভুলটা যখন ভাঙল তখনও খানিকটা চুপ করে রইল, তার পর

বোলটনের নিদ্রার অবসরে সিপাহীদের কাছে এসে নানারকম প্রশ্ন শুরু করল।
'তোমাদের ওখানে কি এখনও তোমরা আংরেজদের তাঁবেদারি করছ ? তবে যে শুনেছি চারিদিকেই সিপাহীদের রাজ হয়ে গেছে ?' ইত্যাদি বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন।

সিপাহীরা প্রথমটা বোঝাতে চেষ্টা করল যে,—যতটা শোনা যাচ্ছে ততটা ঠিক নয়। সকলে নিমকহারামি করে নি—করতে চায়ও না। তারা আংরেজের নিমক খেয়েছে—সে নিমকের মর্যাদা প্রাণপণে রাখবে।—কিন্তু চারিদিকে যে লোকগুলি ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা সহজে ছাড়বার লোক নয়। তারা বিদ্রূপ করতে লাগল 'আসল কথা তোমরা ভীতু—বিষম ভীতু। আর সাহেবের পা-চাটা। তামাম হিন্দুস্তানের সিপাইরা যা বুঝছে, তোমরা তার চেয়ে বেশি বোঝ ?···তোমার আপনার জাতের লোক, দেশের লোক আপন হল না—এরা বেশী আপন হল ? তোমরা পয়লা নম্বরের বেইমান। তোমরা কি মানুষ··· একটা গোরা তোমাদের মত ছ জন জঙ্গী জোয়ানকে হুকুম করছে, আর তোমরা তাই তামিল করছ ? ঐ তো—সবাই মিলেই কষ্ট করছ, অথচ সাহেব ঘুমোচ্ছে—তোমরা তার জন্যে রুটি পাকাচ্ছ! লজ্জাও করে না!···তোমাদের মত বেইমানদের জন্যেই আমরা ঐ ফ্রেস্তানগুলোর লাথি খাচ্ছি।'

সিপাহীরা চারিদিকের এই অসংখ্য বাক্যবাণে বিব্রত বোধ করতে লাগল। বোধ হয় একটু লজ্জাও পেল।

এক জন বলল, 'না, তা নয়। আসলে আমরা একটু বেয়ে-চেয়ে দেখছি, ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। আরে ও তো আমাদের হাতের মধ্যেই রয়েছে। যাবে আর কোথায়—যখন মনে করব, তখনই কায়দা করব!'

এ পক্ষ থেকে আর এক জন বিদ্রূপের সুরে বলল, 'সে সাহস তোমাদের হবে না। বরং তোমরাই মরবে। আমরা ছেড়ে দিলুম, কিন্তু এর পর যেখানে যাবে, কেউ কি ছেড়ে দেবে ভেবেছ ? এই সময়েও তোমরা সাহেবকে সাহায্য করছ দেখলে ওর সঙ্গে তোমাদেরও গর্দান নেবে—এটুকু জেনে রেখো।'

সঙ্গে সঙ্গে আর এক জন পোঁ ধরল, 'এই তো পরশুরই কথা, সীতাপুরে কী হয়েছে শোন নি ? এক বেটা বয়েলগাড়িওলা দুটো মেমকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পার করে দিচ্ছিল, ওখানে গাঁয়ের লোকের হাতে পড়তে তারা মেম দুটোকে ধরে নিয়ে গেল জায়গীরদারের বাড়ি, কিন্তু গাড়িবানকে সেখানেই মেরে গাছে ঝুলিয়ে দিলে।···ঠিকই করেছে, বেইমানের এই হালত্ হওয়াই উচিত।'

হাঁড়িতে ডালটা পুড়ে উঠছিল, এক জন সিপাহী তাড়াতাড়ি তাতে খানিকটা জল ঢেলে দিল; যে আটা মাখছিল, সে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে অনেকক্ষণ—তাকেও একটা তাড়া লাগাল। কিন্তু ক্রমশ এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, কোন একটা কারণে এদের আহারে রুচি একেবারেই চলে গেছে।

চটিওয়ালা এতক্ষণ উদাসীনভাবে এক পাশে বসে ছিল, সে এবার গলা-খাঁকারি দিয়ে বলল, 'আচ্ছা ভেইয়া রামলগন, আংরেজ কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে নানাসাহেবের জিম্মা করে দিলে মোটা টাকা ইনাম মিলছে—এ কথাটা কি ঠিক ?'

'আলবৎ ঠিক। এক-আধ টাকা নয়। এক আংরেজ-পিছু শও শও রুপেয়া ইনাম মিলছে। এই তো আমারই চাচেরা-ভাই একজন পেয়েছে, ছ জন ছিল ওরা—ওই হিসাবেই যোল রুপেয়ার বেশি পেয়েছে।'

সিপাহীদের ললাটে এবার ঘাম দেখা দিল।

ডালটা আবারও পুড়ে উঠছে—তা উঠুক। ডাল আর একবার চড়ালেই চলবে। এক জন হাঁড়িটা নামিয়ে রাখল।

আর একটু পরে, আরও দু-চারটি বহুমূল্য উপদেশ-বর্ষণ এবং ভীতি-প্রদর্শনের পরে এক জন সিপাহী ঐ রামলগনকেই জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই, দড়ি আছে তোমাদের এখানে ?'

'জরুর !' রামলগন উঠে দাঁড়াল, 'দড়ি খুব মজবুতই দিচ্ছি। কিন্তু যা করবে তোমরাই করবে। আমাদের এর ভিতরে টেনো না। একথা না ওঠে যে আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলে কাজ করেছি। তাতে তোমাদেরই ইনামের হিস্সা কমে যাবে !'

বোল্টনের স্বপ্নভঙ্গ হতে একটু বিলম্ব হল বৈকি।

অতি গভীর সুখনিদ্রা তার—হয়তো বা সুখ-স্বপ্নও।

অবশেষে ব্যাপারটা যখন সে বুঝল, তখন তার দুটি হাত এবং দুটি পায়ের কোনটাই আর স্ব-বশে নেই—পরকরতলগত হয়েছে। দেখতে দেখতে তাকে উঠিয়ে হাত-পায়ের সঙ্গে দেহটাকেও জড়িয়ে বেঁধে ফেলা হল—যাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বলে। তরুণ ইংরেজের এক্ষেত্রে যা করা উচিত, তা-ই করল সে। চীৎকার করে গালিগালাজ করল—প্রাণপণে হাত-পা খোলবার চেষ্টা করল, তার পর অনুনয়-বিনয় করল। সমবেত গ্রামবাসীরা উদাসীন দর্শকের মত দূরে দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদেরও অনেক করে বুঝিয়ে বলল, নানারকম লোভ দেখাল, কিন্তু তারা তেমনিই নিস্পৃহবৎ অটল হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইল—মনে হল তারা পাথরের মতই বধির।

অনেকক্ষণ পরে বোল্টনের মাথায় কথাটা গেল যে, রোদনটা তার নিতান্তই অরণ্যে করা হচ্ছে। এখানে কাউকেই ভেজাতে পারা যাবে না। তখন সে সহসাই একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল এবং মাথা উন্নত করে এদের প্রতি চরম উপেক্ষার দৃষ্টি হেনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

এবার আবার ডাল চাপল। সেই সঙ্গে মন্ত্রণাসভাও বসল একটা।

কয়েদীকে নিয়ে এখন কী করা যাবে ?

এক জন বলল, সোজাসুজি কেটে ফেলা হোক। দেশ ও জাতির শত্রুর নিপাত যাক একটা।

কিন্তু তার নির্বুদ্ধিতাকে বাকী সকলেই ধিক্কার দিয়ে উঠল। যেখানে জীবিত লোকটাকে হাজির করলে শও রুপেয়া তো বটেই, আরও বেশী ইনাম মিলতে পারে—সেখানে শুধু শুধু তাকে কেটে নিজেদের হাত কলুষিত করে লাভ কী ?

নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু তাতে অসুবিধা ঢের—ভয়ও একটু আছে। প্রথমত বাঁধা অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে বসানো যায় না। বসালে এক জনকে ধরে নিয়ে যেতে হয়—তাতে দ্রুত হাঁটা যায় না। হাঙ্গামাও বিস্তর। আবার এধারে পথে যদি সিপাহীদের কোন একটা বড় দল সামনে এসে পড়ে তারা হয়তো ছিনিয়ে নেবে—বাহাদুরিটা নিজে নেবার জন্য।

চটিওয়ালা উপদেশ দিল, 'আমার কাছেই রেখে যাও—বাঁধা আছে তো, তোমরা গিয়ে নানাসাহেবকে খবর দাও। বরং আজিমুল্লা খাঁর শুনেছি ঢের লোক

আছে, গাড়ি-ঘোড়াও আছে—তারাই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুক।'

উদাসীনভাবে কথাটা বলবার চেষ্টা করলেও ব্যগ্রতা বোধ হয় একটু বেশিই প্রকাশ পেয়েছিল।. সিপাহীদের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হতে একটুও বিলম্ব হল না। মতলবটা ভাল—'তোমরা রেখে যাও, আমি বাহাদুরিটা নেব।'

আলোচনা ও তর্কের শেষ নেই।

ক্রমে গ্রামবাসীদের মনোভাবও বেশ প্রকট হয়ে উঠছে। এত বড় শিকার হাতছাড়া করতে,তারা নারাজ। আংরেজটাকে কেড়ে নিতে তাদের হাত নিশপিশ করছে—শুধু এই ছটি বন্দুকের ভয়েই পারছে না। কিন্তু এতগুলি লোক যদি সত্যিই বেঁকে বসে তো বন্দুক ছটা শেষ পর্যন্ত কাজে লাগবে কিনা সন্দেহ!

বিপন্ন সিপাহীরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। শেষ অবধি এক জন প্রস্তাব করল—তার চেয়ে ওকে কেটে মুণ্ডটা নিয়ে এখনই রওনা হওয়া যাক, তা হলে কাল একপ্রহর বেলার মধ্যেই নানাসাহেবের কাছে পেঁাছে দেওয়া যাবে।

প্রস্তাবটা শুনে বাকী সিপাহী ক'জন শিউরে উঠল। গ্রামবাসীরা আর একটু ঘন হয়ে ঘিরে দাঁড়াল।

এ প্রস্তাবে যদি এরা ইতস্তত করে—তারা কাজে লাগবে না কেন?

শেষে বেগতিক দেখে আরও এক জন সিপাহী এই প্রস্তাব সমর্থন করল।

বাকী চার জন কিন্তু প্রথমটা খুব বেঁকে বসল। এক জন স্পষ্টই বলল, 'আমরা ওর মধ্যে যাই কেন? যা করবার নানাসাহেবই করুক না। হাজার হোক আমরাই ভরসা দিয়ে এনেছি ওকে—'

কিন্তু ক্রমে সকলেই বুঝল যে বেশী ইতস্তত করলে শিকার হাতছাড়া হবে। গ্রামের নামটি আগে তারা শোনে নি—এখন সেটাও কানে গেল। এ অঞ্চলে গ্রামটা বিখ্যাত—এক পয়সার জন্যও এরা না করতে পারে এমন কোন কাজ নেই। তাদের হাতে বন্দুক আছে সত্যি কথা, কিন্তু এতগুলি লোক—বেকায়দায় ফেলতে কতক্ষণ? আর কিছু না হোক, ঘোড়াগুলোকে জখম করে ফেললেই তো যথেষ্ট।

শেষ অবধি সর্বসম্মতিক্রমে সাহেবকে কেটে ফেলাই ঠিক হল। তাতেও চটিওয়ালা বাগড়া দিতে এসেছিল—এসব হাঙ্গামা তার বাড়িতে কেন? যা করবে দূরে গিয়ে কর না বাপু...গ্রামবাসীরাও সঙ্গে সঙ্গে উল্টো সুর ধরল। দু-এক জন এমন ভাবও দেখাল—প্রয়োজন হলে ওরা এই কাজে বাধা দেবে।

সিপাহীদের মেজাজ খারাপ হয়ে উঠল। এখন যেন একটা জেদ চেপে গেছে। সাহেবটাকে তারা মারবেই—অন্তত এদের উদ্দেশ্য তো তাতে পণ্ড হবে! চটিওয়ালাকে এক জন সঙ্গীনের এক খোঁচা দিয়ে চুপ করিয়ে দিল। আর দু জন সাহেবকে টেনে একটা নিমগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করাল। ওদের মধ্যে প্রধান যে, সে খাপ থেকে তলোয়ারটা খুলে এগিয়ে গেল। সঙ্গে টোটা বারুদ খুব বেশি নেই—অকারণে নষ্ট করা ঠিক হবে না। হয়তো অবিলম্বে আত্মরক্ষার কাজেই লাগতে পারে। তা ছাড়া মুণ্ডটা কেটে নিয়ে যাবার একটা চেষ্টা তো করতে হবে।

বোল্‌টন একবার অস্ফুট কণ্ঠে যীশুকে স্মরণ করল। দেশে মা আছেন—কিন্তু না, তাঁর কথা সে কিছুতেই ভাববে না। যদি চোখে জল এসে যায়!

সব ঠিক, যে তলোয়ার খুলেছিল সে বোধ করি পেশীর খিল ছাড়িয়ে নেবার জন্যই হাতটা তুলে বার দুই শূন্যে আস্ফালন করে নিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসল স্থানে অর্থাৎ বোল্টনের কাঁধে সেটা নেমে আসবার ঠিক আগেই সহসা দূরে প্রান্তরে যেন একটা অশ্বপদধ্বনি বেজে উঠল। প্রথমটা সকলেরই সন্দেহ হয়েছিল, বুঝি কানই ভুল শুনছে। কিন্তু একটু পরে আর কোন সংশয় রইল না।

নির্জন মাঠ, নিস্পন্দ গুমোট আবহাওয়া—বহু দূরে থেকে শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঘোড়সওয়ার আসছে—সে সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নেই। সকলেই উৎসুক হয়ে তাকাল। গ্রামবাসীরা আশান্বিত—আর কিছু না হোক, একটা ঝগড়া বাধলেও তারা বাঁচে। যদি আগন্তুক গোরা ফৌজের লোক হয় তো কথাই নেই, এখনই শপথ করে এই সিপাহীগুলোকে অভিযুক্ত করবে। প্রমাণ করে দেবে—তাদেরই জন্য সাহেব এখনও বেঁচে আছেন, নইলে এই সিপাহীরা এতক্ষণ কেটেই ফেলত। আর যদি সিপাহী হয় তো বেশ ভাল রকম বিবাদ বাধানো যাবে।

ঠিক এই একই কারণে সিপাহীগুলিরও প্রথমটা মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। যদি গোরার দলই কোথাও থেকে এসে পড়ে! সিপাহীদের দল এলে ইনামটা হাতছাড়া হবার ভয়, কিন্তু গোরা হলে জানটাই যাবে যে! তারা ঘোড়ার রেকাবে পা টান করে প্রস্তুত হয়ে বসল, তেমন দেখলে সোজা দৌড় দিতে পারবে।

কিন্তু আর একটু পরে বোঝা গেল—দল-টল কিছু নয়, আগন্তুক একা। একটি ছোটগোছের ঘোড়া বা বড়গোছের খচ্চর চেপে কেউ এক জন আসছে মাত্র। সকলেই নিশ্বাস ফেলে সহজ হল। এখন আর ভয় নেই—সে জায়গায় ঔৎসুক্য জন্মেছে।

আরও কাছে আসতে, তখনও আকাশের সর্ব-পশ্চিমপ্রান্তে লেগে থাকা গোধূলির আবছা আলোতে দেখা গেল—আগন্তুকও সিপাহী এক জন।

সিপাহীদের ভরসা বাড়ল, ভ্রূ কুঞ্চিত হল। একজন হেঁকে প্রশ্ন করল, 'কৌন হ্যায় ?'

যে আসছিল সে কোন উত্তর না দিয়ে সোজা তাদের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। তার পর এক লহমায় সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে অত্যন্ত সহজকণ্ঠে অথচ কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল, 'এ সব কী! কী হচ্ছে এখানে ?'

কণ্ঠস্বর পরিচিত। বোল্টেন চোখ তুলে তাকাল। চুলার কাঠগুলো তখনও জ্বলছে। তারই কম্পমান আলোটা আগন্তুকের মুখে পড়েছে—বোল্টনেরও।

একটা নিমেষ মাত্র। দু জনেরই চোখে পরিচয়ের ভাষা ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে গেল।

॥ ৪২ ॥

কর্তৃত্বের ভঙ্গিটা ঠিকমত প্রকাশ পেলে, অথবা আদেশের সুরটা পুরোপুরি কণ্ঠে ফুটে উঠলে সকলেই তার সামনে নত ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। কোন্ অধিকারে সে ব্যক্তি এই কর্তৃত্ব প্রকাশ করছে তা বিচারের অবকাশ পায় না—স্বাভাবিক ভাবেই আদেশ পালন করে, কর্তৃত্ব মেনে নেয়। হীরালাল এমনিতেই

অবশ্য নির্বিরোধ ভালমানুষ, তার ওপর এখানে এসে পর্যন্ত মামার ভয়ঙ্কর দাপটে ও নিয়ত বয়োজ্যেষ্ঠদের সাহচর্যে শান্ত ও বিনত হয়ে থাকাই তার অভ্যাস হয়ে গেছে। তবু বোধ করি, তার রক্তে কর্তৃত্বের বীজ কোথাও লুকোনো ছিল—আজ এই সিপাহীর পোশাকটা গায়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজই অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। সে নিজেও অবাক হয়ে লক্ষ্য করল—কেমন করে অনায়াসে তার কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গিতে সহজ কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্বের ভাবটা ফুটে উঠেছে। অবশ্য ওর সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহে পোশাকটা মানিয়েও ছিল বড় চমৎকার। সবটা জড়িয়ে উপস্থিত সিপাহী এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে সত্যি-সত্যিই একটা সম্ভ্রমের সৃষ্টি হল।

সিপাহীদের ঠিক এতটা তটস্থ হবার আর কোনও কারণ ছিল না। সাধারণ হাবিলদারের পোশাক হীরালালের। এ দলেও দু জন হাবিলদার ছিল। তবু একজন, যে সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, সে যেন কতকটা অভিভূতের মতই দু হাত জোড় করে বলল, 'সরকার, ইয়ে এক গোরা হ্যায় !'

'হ্যাঁ, তা তো দেখছি। বেঁধেছ ভাল করেছ, কিন্তু ঐ যে ওধারে কে দাঁড়িয়ে আছে—তোমার তলোয়ার খোলা কেন ? তোমরা নানাসাহেবের হুকুম শোন নি ?'

'না তো ! কী হুকুম সরকার ?'

সিপাহীরা আর-একটু কাছে ঘেঁষে এল, গ্রামবাসীরাও আতঙ্কমিশ্রিত সম্ভ্রমের দূরত্ব বজায় রেখে উৎসুকভাবে কান খাড়া করে রইল।

'নানা ধুন্ধুপন্থ পেশোয়া হুকুম দিয়েছেন যে, কোন গোরা আংরেজ পুরুষ বা মেয়েমানুষ কাউকে মারা চলবে না। যে যাকে পাবে, বেঁধে নিয়ে নানা-সাহেবের সরকারী ফাটকে জিম্মা করে দেবে। লড়াই শুরু হয়ে গেছে—এ পক্ষেও বন্দী হবে, ও পক্ষেও হবে। সাহেব গোটাকতক আমাদের হাতে আটক থাকলে, আমাদের দলের কোন লোককে মারতে কি কাটতে ওরা সাহস করবে না।'

কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত বোধ হল। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা মুখ দিয়ে বের করার জন্য হীরালাল মনে মনে মা-কালীকে ধন্যবাদ দিলে একবার।

গ্রামবাসীরা প্রায় সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা তো সেই থেকে এই কথাই ওদের বোঝাচ্ছি হুজুর, তা এই বেকুফ সিপাইগুলো কি কথা শোনে ! দেখলে, বলছিলুম তোমাদের যে একে সরাসরি নানাসাহেবের দরবারে নিয়ে যাও ! দেখলে তো এখন ?'

সিপাহীগুলো বড়ই দমে গিয়েছিল, তাই এই ধরনের অপমানও নীরবে হজম করল। মাতব্বর ধরনের যে লোকটি বোল্টনকে কাটতে গিয়েছিল, সে এখন পুনশ্চ হাত জোড় করে বলল, 'তা কী করব সরকার বলে দিন !'

হীরালাল ভ্রূকুটি করে একবার ঘোড়াগুলোর দিকে ও বোল্টনের দিকে চেয়ে নিয়ে ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'এর আর এত কি ভাববার আছে বুঝি না। ওর বন্দুকটা কেড়ে নাও, জেব-টেবগুলো দেখে নাও আর কোন হাতিয়ার আছে কিনা। তার পর ওর পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে ওর ঘোড়াতেই ওকে চাপিয়ে দাও।...এক জন শুধু ওর ঘোড়ার লাগামটা ধরে সঙ্গে সঙ্গে চল!—তোমাদের অসুবিধে হয় তো আমাকেই দাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি। বাকি তোমরা দু জন দু পাশে চল—দু জন আগে আর দু জন পিছে।

পালাবে কোথায় ?'

এ মতলবটা সিপাহীদের সকলকারই ভাল লাগল। লোকটা যখন তাদের চারদিকে নিয়েই যেতে চাইছে, তখন হয় তো খুব বদ মতলব কিছু নেই, অন্তত একা বাহাদুরি বা বকশিশটা চায় না। সেক্ষেত্রে এমন একটা লোক সঙ্গে থাকাই ভাল।

তারা খুশী হয়ে কাজে লেগে গেল। এক জন বোল্‌টনের ঘোড়াটাকে নিয়ে এল, আর এক জন তাড়াতাড়ি ওর পায়ের বাঁধনটা খুলে দিতে গেল।

হীরালাল যদিও এইমাত্র ওদেরই জেব-টেব পরীক্ষা করতে বলেছিল. তবু এখন অত্যন্ত সহজভাবে, যেন সিপাহীদের সাহায্য করতেই, নিজেই সে কাজে অগ্রসর হল। বোল্‌টনের শার্ট-এর পকেট, প্যান্টের পকেট সব দেখে, কাগজ-পত্র যা দু-একখানা পেয়েছিল তা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে পকেটেই আবার রেখে দিল। কেবল কোমরবন্ধ থেকে পিস্তলটা খুলে নিয়ে একবার নেড়েচেড়ে দেখে সেটা ওদেরই এক জনের হাতে দিয়ে বলল, 'এটা তোমাদের কাছেই থাক—কী বল ? পথে কাজে লাগতে পারে।'

'জী সরকার !' সকলেই সায় দিল, 'আপনিই রাখুন বরং, ওর সঙ্গেই যাবেন তো—হাতে তৈরী রাখা ভাল, কোন গোলমাল করলে সাবাড় করে দেবেন !'

হীরালাল একান্ত নিরাসক্ত ভাবে উত্তর দিল, 'তা মন্দ বল নি। তাই রাখি বরং।'

হীরালাল পকেট থেকে কাগজগুলো নেবার সময় সকলের অগোচরে বোল্‌টনকে অত্যন্ত নিম্নস্বরে ইংরেজিতে বলে নিয়েছিল, 'ভয় পেয়ো না। আমি বন্ধু। যা বলি শোন।' এখন প্রকাশ্যে বেশ কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম কী ? কী কর ? কোন্ কোম্পানীর ? ঠিক ঠিক জবাব দাও !'

হীরালাল আশ্বাস না দিলেও বোল্‌টনের বুঝতে চিনতে ভুল হত না। তলোয়ারটা যে এর জন্যই গলায় পড়তে পড়তে রয়ে গেল, তা বুঝে আগেই সে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ হয়েছিল। তবু সে-ও, অভিনয়ের অঙ্গ হিসেবেই, নিরুত্তরে অপরদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হীরালাল মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে কাঁধটা ধরে সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'কী হল ? উত্তর দাও।...তুমি আমাদের বন্দী। ভালয়-ভালয় আমাদের কথামত যদি না চল তো—'

বোল্‌টন উদ্ধতভাবে জবাব দিল, 'তোমরা বেইমান বিশ্বাসঘাতক, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। নানাসাহেবের কাছেই নিয়ে চল, উত্তর দিতে হয় সেখানেই দেব।'

এক জন সিপাহী তার এই ঔদ্ধত্যে রুষ্ট হয়ে এক ধমক দিয়ে উঠল 'এই, ঠিক ঠিক কথা বল। নইলে নানাসাহেবের কাছে পেঁছিতে হবে না—তার আগেই আমরা টিট করে দেব। যে জিভে আমাদের গাল দিচ্ছ, সে জিভ আর থাকবে না।'

হীরালালও ভ্রূকুটি করে বলল, 'হু', তোমার বিষদাঁত ভাঙে নি এখনও। ভয় নেই, নানাসাহেব জানেন—তোমাদের মত কুকুরকে কোন্ মুগুরে বশ করতে হয়।...ভাই সব, তৈরী ? চল এবার রওনা হওয়া যাক।'

সিপাহীরা ঘোড়ায় চড়ে তৈরী হয়েই ছিল। ডাল আবারও পুড়ে উঠেছে। আটার তাল তেমনিই মাখা পড়ে আছে। কিন্তু এখন আর সেদিকে নজর দিলে চলবে না। আজ অদৃষ্টে আহার নেই। তারা সে চেষ্টাও করল না। যদি গোরা ধরবার বকশিশই ঠিক ঠিক মেলে তো এ অনাহারের দুঃখও ঘুচবে। তারা সাবধানে বন্দীকে ঘিরে চলতে শুরু করল। মাঠে ঠিক সুবিধে না হলেও প্রশস্ত বড় সড়ক পড় হীরালালের নির্দেশানুযায়ী ব্যূহ রচনা করে চলতে কোন অসুবিধা হল না। বোলটনের ঘোড়ার লাগাম ও কোমরের দড়ি হীরালালের হাতেই রইল।

কিন্তু বেশীক্ষণ সেভাবে চলা সম্ভব হল না। পাশাপাশি ইংরেজ ও বাঙালীর চলতে যতটা না আপত্তি হোক—অশ্ব ও অশ্বতরে প্রবল আপত্তি দেখা দিল। খচ্চরের আরোহীর হাতে ঘোড়ার লাগাম থাকবে, ঘোড়ার পক্ষে এর চেয়ে অপমানকর বুঝি আর কিছুই নেই। সে বার বার প্রবল আপত্তি জানিয়ে সজোরে সবেগে আগে চলবার চেষ্টা করতে লাগল—বার বারই লাগামটার কথা স্মরণ করিয়ে তাকে পুনরায় সংযত করতে হল হীরালালকে। কিন্তু তবু দেখা গেল, এই টানা-হেঁচড়ার ফলে বোধ করি এক সময়ে হীরালাল ও বোলটন দু জনেই কিছু এগিয়ে গেছে। সিপাহীদের চোখের আড়ালে যায় নি বলেই হোক অথবা এতক্ষণে হীরালালের আচরণে তার ওপর আস্থা এসেছে বলেই হোক, তারা আর খুব বেশী তাগিদ করে ব্যূহ রক্ষা করবার চেষ্টাও করল না। তা ছাড়া ঘোড়া খানিকটা বিশ্রাম পেয়েছে সত্য কথা, কিন্তু সারাদিন চলবার ক্লান্তি ঐটুকু বিশ্রামে অপনোদিত হয় নি। এই অবস্থায় বেশী জোর করতে গেলে হয়তো হিতে বিপরীত হবে। সেজন্যও কতকটা তারা নিরস্ত রইল।

আর হীরালাল সেই সময় ঘোড়া শাসনের অছিলায় এক ফাঁকে নিজের হাত থেকে চার-কোণা লাল পাথরের একটা আংটি খুলে বোলটনের হাতে পরিয়ে দিল এবং আর একটা অমনি গোলমালের সুযোগে প্রায় অস্ফুটস্বরে বলে দিল, 'নানাসাহেবের কাছে পেঁছিবার পর যদি বিপদ বোঝ—কোনমতে তাঁর হুসেনী বেগমের কাছে এই আংটিটা পাঠিয়ে দিও। তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই বাঁচাবেন।'

॥ ৪৩ ॥

বোলটনের প্রাণটা আপাতত রক্ষা পেল—পরেও হয়ত পাবে, সেজন্য মামাকে ভুললে চলবে না। হীরালাল তা ভোলেও নি। শুধু অকারণ এমন একটা হত্যাকাণ্ড নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না বলেই সে এতখানি সময় নষ্ট করল। যে পথে এখন চলেছে সেটা তার পথ নয়—গাজীপুরের পথ এখান থেকে সোজা উত্তর-পূর্বে গিয়েছে। কাল সন্ধ্যায় দিক ঠিক করতে না পেরেই সে এই পথে এসে পড়েছিল—বোধ করি বোলটনের অদৃষ্টক্রমেই। এখন শেষরাত্রে দিকটা ঠিক পেতেই সে বিদায়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তখন ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াবার জন্য সকলে নেমে এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল। সেই অবসরেই হীরালাল বলল, 'ভাই সব, এবার কিন্তু আমাকে ছাড়তে হবে। তোমরাই সাহেবটাকে নিয়ে সাবধানে চলে যাও। কানপুর আর

বেশী দূরে নয়। বেলা এক প্রহর হবার আগেই তোমরা পেঁছে যাবে।'

'সে কি, আপনি যাবেন না? চলুন, চলুন!'

সকলেরই কণ্ঠে আগ্রহ ও মিনতি। তারা যেন একজন নেতা পেয়েছিল —চলে গেলে পুনরায় নেতাহীন হয়ে পড়বে। বোল্টনও নীরব মিনতির চোখে চেয়ে নিল একবার। কিন্তু হীরালালের দেরি করবার উপায় নেই।

সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'না ভাই সব, আমি খুব জরুরী কাজে যাচ্ছি। পেশোয়া ধুন্ধুপন্থেরই হুকুম, দেরি করলে ক্ষতি হবে।'

বোল্টনের দিকে চেয়ে সকলের অলক্ষ্যে শুধু একটি অভয়ের ভঙ্গি করল। অর্থাৎ নির্ভয়ে যাও—কোন ভয় নেই। কিন্তু বোল্টন তাতে বিশেষ আশ্বাস পেল না। সে এই বাঙালী ছোকরার নাম জানে না, তবে কমিসারিয়েটের এক বাবু—এটুকু সে কাল কম্পমান উনানের আলোতেই চিনেছিল। কিন্তু যাই হোক, এই ছোকরা কাল যে উপস্থিত-বুদ্ধির বলে তার জীবন রক্ষা করেছে তার তুলনা নেই। ঐ ঘটনার পর থেকেই মনে মনে একান্ত ভাবে সে এই বাঙালী তরুণটিকেই আঁকড়ে ধরেছে—এখন যেন ভেতরে ভেতরে হতাশায় ভেঙে পড়ল।

সিপাহীরা পেশোয়ার নাম শুনে চুপ করে গিয়েছিল। তাদের ঠিক মালিক কে—দিল্লীর বাহাদুর শা, কানপুরের নানাসাহেব, না লক্ষ্ণৌএর বেগম—তা তারা জানে না। তবে এটা জানে যে, পেশোয়া নামের আজও অসীম প্রভাব আছে হিন্দুস্তানের সর্বত্র—পদবীটার সঙ্গে আজও একটা অপরিসীম মোহ জড়ানো আছে। বাজীরাও, বালাজীরাও, মাধবরাওএর শৌর্যের কাহিনী আজও লোকের মুখে মুখে।···সুতরাং নানাসাহেবকে উপেক্ষা করা চলবে না। অগত্যা তারা চুপ করে গেল। সরকারী কাজ সকলের আগে—এতকাল সিপাহীগিরি করে এটুকু শিখেছে বৈকি।

হীরালাল চলে গেলে আবারও বোল্টনকে ঘোড়ায় চাপিয়ে তারা রওনা দিল। কানপুর সত্যি আর খুব বেশী দূরে ছিল না—বেলা প্রথম প্রহর পার হবার আগেই তারা শহরের সীমান্তে পেঁছে গেল।

কিন্তু কানপুরকে তখন জনারণ্য বললে কিছুই বলা হয় না। শহরের ঠিক তখন যা অবস্থা—উদ্বেল সাগরের সঙ্গেই মাত্র তুলনা হয়। চারিদিকেই কোলাহল, চারিদিকেই উত্তেজনা। আংরেজদের নাচারগড় ঘেরাও করা হয়েছে—ভেতরে জল নেই, খাবার নেই, ওষুধ নেই, তবু ঐ কটা আংরেজ লড়ে যাচ্ছে। তাজ্জব ব্যাপার! এই প্রসঙ্গই সকলের মুখে মুখে। এদিকে দু সহস্রাধিক সৈন্য—আরও আসছে। একদল মুসলমান সৈন্য এসে প্রচণ্ড আক্রমণ করেছিল, তবু কিছুই করা যায় নি। ওদিকে বৃদ্ধ-স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে মোট দুশ-র সামান্য কিছু বেশী হবে। তার মধ্যেও নিত্যই কয়েক জন করে মরছে—প্রতিদণ্ডেই মরছে বলতে গেলে, তথাপি ওদের এই প্রতিরোধশক্তি কোথা থেকে আসছে!

পথে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্রই এই আলোচনা। মনে মনে ইংরেজদের তারিফ করছে অনেকেই। তেমনি কেউ কেউ যেন সিপাহীদের এই ব্যর্থতা ব্যক্তিগত অপমান বলে মনে করে রুষ্ট হয়ে উঠছে। এত জেদ কিসের? এ জেদ ভাঙতে হবে!

সিপাহীদের সঙ্গে বোল্টনকে দেখে অনেকেই ওকে ছিনিয়ে নেবার জন্য

উৎসুক হয়ে উঠেছিল। কেউ চায় তখনই ওকে মেরে ফেলে নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করতে—কেউ কেউ আবার লোকপরম্পরায় শুনেছে ইংরেজ ধরে নিয়ে যেতে পারলে বকশিশ মেলে। সেটাও যদি বিনা পরিশ্রমে করায়ত্ত হয় তো মন্দ কি ?···তাদের এই ধরনের মনোভাব।

অতি কণ্টে সিপাহীরা এই সব লোলুপ-হস্ত বাঁচিয়ে চলল। তাদের আর শরীর বইছে না—কোথাও বসে একটুকু বিশ্রাম এবং অল্প কিছু খাদ্য না পেলে হয়তো এক সময় ঘোড়া থেকে পড়েই যাবে। ঘোড়াগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। অথচ এ আপদ ঘাড় থেকে না নামিয়েও বিশ্রাম করার কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। এখন শুধু মানের কান্না হয়ে উঠেছে। তার ওপর প্রতি মুহূর্তে এই সব অপ্রত্যাশিত আক্রমণ সামলানো। তাদের হাতে বন্দুক আছে, কিন্তু জনতার কাছে বন্দুক কতক্ষণ ? সুতরাং প্রত্যেককেই বলতে হল নানাসাহেবের হুকুমে এই 'আংরেজ'কে বন্দী করে আনা হয়েছে—তাঁর কাছে পেঁছে দিতে হবে! এই কথাতেই কতকটা জাদুমন্ত্রের মত কাজ হল—রুষ্ট মারমুখী জনতার উদ্যত হাত নিরস্ত হল।

কিন্তু তাতে আর এক বিপদ বাধল। এই সিপাহীগুলো লক্ষ্মৌএর ইংরেজ শিবিরে ছিল, কানপুরের কোথায় কী হচ্ছে এবং কে কোথায় আছে, তার কোন খবর জানে না। কোথায় নানাসাহেব আছেন, কেমন করে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে—সে কথাটা কাউকেও জিজ্ঞাসা করা দরকার। অথচ নানাসাহেবই যাদের পাঠিয়েছেন, তারা আবার কোন্ মুখে জিজ্ঞাসা করে যে নানাসাহেব কোথায় থাকেন বা তাঁর প্রাসাদটা কোন্ দিকে ?

সুতরাং কতকটা লক্ষ্যহীনের মতই তারা 'যেদিকে দু চক্ষু যায়' সেদিকে চলতে লাগল। অপেক্ষাকৃত নির্জন কোন মহল্লা পেলে, যেখানে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে লোককে বশ করা যাবে—নানাসাহেবের পাত্তাটা তারা জেনে নেবে, এই মতলবেই এইভাবে চলছিল। এক সময় কি আর একটা জনবিরল পাড়া পাওয়া যাবে না ?

কিন্তু পথ-ঘাট সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই না থাকায় তারা কখন যে সেরকম ঈপ্সিত স্থান পেত কে জানে। ইতিমধ্যেই ঘুরে ফিরে কয়েকবার জেনারেল-গঞ্জের চৌমাথার কাছে এসে পড়ল। একই লোক যদি এমনি ঘুরতে দেখে তো মিথ্যাভাষণটা ধরে ফেলতে কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। যা হোক, দৈবক্রমে হঠাৎ একটা উপায় হয়ে গেল। একটা পথের মোড়ে হঠাৎ সর্দার খাঁর মাংসের দোকানটার সামনে তারা এসে পড়ল।

আজকাল সর্দার খাঁ নিজে বড় একটা দোকান দেখতে ফুরসৎ পায় না। তার এক কর্মচারীই সেখানে বসে। কেবল আজই কি কারণে সে দোকানে এসে বসেছিল। তবে হাতে করে খাসি কাটার কাজটা আজও সেই লোকটা করছিল, সর্দার শুধু বসে পয়সাটা গুনে নিচ্ছিল—সুতরাং তার হাতে কাজ কম। সে এর মধ্যে এই দলটিকে আরও একবার এই পথে যেতে দেখেছে—এখন আবারও ঘুরে আসতে দেখে একেবারে দোকান থেকে নেমে পথরোধ করে দাঁড়াল। একটা ইংরেজ অফিসারকে হাত-পা বেঁধে এমন করে সিপাহী কজন পথে পথে ঘুরছে—তার অর্থ কী ? বিশেষত এদের সকলেরই ক্লান্ত ধূলিধূসর চেহারা ও উৎকণ্ঠিত মুখ—নিশ্চয় দূরের কোন পথ থেকে আসছে।

সে দু হাত প্রসারিত করে ঠিক পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল,

'তোমরা কে ? কোথায় যাবে ? এ আংরেজটাকে কোথায় পেলে ? কোথা থেকে আসছ ?'

প্রশ্নকর্তার এই সাক্ষাৎ দৈত্যের মত চেহারায় সিপাহীগুলোর বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। এমন ভয়ঙ্কর চেহারার মানুষ এর আগে আর কখনও চোখে পড়ে নি। তাদের এতক্ষণকার রুখে ওঠবার ভঙ্গিটা যেন আর তেমন খুললে না। এমন কি, কথাই যেন গলায় আটকে গেল। তবু একজন অনেক কষ্টে অভ্যস্ত মিথ্যাটাই বলল, 'নানাসাহেব পেশোয়ার হুকুমে আমরা একে ধরে নিয়ে আসছি।'

'ঝুট! ঝুটি বাত!' প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে উঠল সর্দার খাঁ, 'আমি পেশোয়ার নৌকর। আমার কাছে মিছে কথা বলে পার পাবে না।...তোমরা বিদেশ থেকে আসছ, তাই সর্বাঙ্গে এত ধুলো—আর পথঘাট চেন না বলে এক পথেই একশ বার ঘুরছ। সাফ সাফ কথা বল, নইলে আজ আর তোমাদের নিস্তার নেই। সত্যি-সত্যিই পেশোয়ার ফাটকে পুরব তোমাদের সুদ্ধ!'

এবার সিপাহীদের আর একেবারেই মুখে কথা যোগাল না। শেষ পর্যন্ত অতি কষ্টে এক জন মরীয়া হয়ে সত্যি কথাটাই বলে ফেলল, 'হুজুর, আমরা লক্ষ্ণৌএ থাকি। ওখানকার কমিশনার সাহেব এই সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন এখানে গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে। আমরা জানতে পেরে একে বেঁধে নিয়ে আসছি পেশোয়ার কাছে ধরিয়ে দেব বলে। আপনি ধরেছেন ঠিকই, আমরা এখানে একেবারে নতুন—পথঘাট চিনি না বলেই ঘুরছি।'

সর্দার খাঁ তার বর্তুলাকার চোখ দুটি মেলে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল লোকগুলো সত্যি কথাই বলছে। তাই অপেক্ষাকৃত মোলায়েম সুরে বলল, 'বেশ চল, পেশোয়ার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি। বকশিশ আদায় করতে পার ক'র। লক্ষ্ণৌএর খবর পেলে হয়তো তাঁর উপকার হবে—বকশিশ দিতেও পারেন। নইলে আংরেজ ধরার কোনো বকশিশ নেই—এ তো তোমাদেরই কর্তব্য।'

নানাসাহেব অবরোধের একেবারে কাছে থাকবেন বলে বড় একটা হোটেল-বাড়ি দখল করে রয়েছেন কদিন। সর্দার খাঁ পথ দেখিয়ে সেই নতুন আস্তানার দিকেই নিয়ে চলল।

॥ ৪৪ ॥

এ পথে ভিড় আরও বেশী। প্রাসাদের কাছাকাছি তো লোক ঠেলে চলাই দুষ্কর হয়ে উঠল—এত লোকের সমাগম! সিপাহী, প্রসাদপ্রার্থী, ব্যবসাদার, জমিদার, নবাব—কে না আছে সে জনতায়। এর মধ্যে শুধু সিপাহীরা এলে যে 'আংরেজ'টাকে নিয়ে নিরাপদে নানাসাহেবের দরবারে পৌঁছনো যেত না—এটা তারা পরিষ্কার বুঝতে পারল। কিন্তু সর্দার খাঁর দেখা গেল অসীম প্রতিপত্তি। তাকে দেখে সকলেই যেন আতঙ্কিত হয়ে পথ ছেড়ে দিতে লাগল। ফলে সিপাহীদেরও ঐ লোকটি সম্বন্ধে সম্ভ্রম বেড়ে গেল।

প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই সর্দার খাঁ নীচে যেখানে রবাহূতদের জন্যে রুটি তৈরী হচ্ছিল, সেখানে ওদের নিয়ে গেল। ঘোড়ার ব্যবস্থা আগেই হয়েছিল,

এবার ওদের ব্যবস্থা ! সর্দার খাঁ বলল, 'তোমরা এখানে বসে মুখে একটু জল দিয়ে নাও। এদের বলে দিলুম—খানা চাইলেই পাবে। এরও হাতটা খুলে দাও—মুখে একটু জল দিক্। চায় তো রুটিও দুখানা খেয়ে নিতে পারে। এত লোক আছে—পালাতে পারবে না। কোমরে দড়ি তো আছেই। আমি ততক্ষণ পেশোয়াকে এত্তেলা দেবার ব্যবস্থা করছি।'

চলে যেতে গিয়েও কী ভেবে সর্দার খাঁ বোল্‌টনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'জল খেতে চাও ? দুখানা রুটি ? তোমার অদৃষ্টে কী আছে জানি না—পেশোয়ার যা মর্জি, ইচ্ছে করলে কিছু খেয়ে নিতে পার।'

বোল্‌টন জীবনের আশা রাখে নি। হীরালাল চলে যাবার পর থেকেই সে আশা সে একেবারে ছেড়েছে। তার ওপর এখন এই ভয়ংকর দৈত্যটার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে, প্রায় প্রতি মুহূর্তেই যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু অকস্মাৎ দৈত্যটার এই সামান্য মনুষ্যত্বের ইঙ্গিতেই কোথায় একটা আশা আবার তার মনের মধ্যে মাথা তুলল। অল্প বয়স্ তার—এ বয়সে আশা বুঝি কিছুতেই মরে না! অকস্মাৎ তাই এই লোকটাকেই অবলম্বন করে তার মৃত আশা আবার মঞ্জরিত হয়ে উঠল! মরীয়া হয়ে—জুয়াখেলা হিসেবেই, সে এক ফাঁকে চুপি চুপি প্রশ্ন করল, 'হুসেনী বেগমকে চেন তুমি ? তাঁকে একটা খবর দেবে ?'

ভূত দেখছে মনে হলে লোক যেমন চমকে ওঠে, সর্দার খাঁ তেমনই চমকে উঠল। বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল তার সে বিস্ময়টাকে সামলে নিতে। তারপর খুব সহজ ভাবেই ঐ সিপাহীদের বলল, 'তোমরা বরং মুখ-হাত ধুয়ে নাও, আমিই এর হাত খুলে দিচ্ছি।...এই চল ওধারে, জল খেতে চাও তো ওখানে গিয়ে ব'স।'

তার পর বোল্‌টনের কোমরের দড়ি ধরে একরকম টানতে টানতেই একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি অথচ কঠোর কণ্ঠে বলল, 'কেন, হুসেনী বেগমকে তোমার কী দরকার ?'

বোল্‌টন কথা না বলে সদ্যোমুক্ত ডান হাতখানা উল্টো করে মেলে ধরল। অনামিকার পাশে—কনিষ্ঠায় একটি রুপো-বাঁধানো আংটি, তার চারকোণা লাল পাথরটা জ্বল জ্বল করছে!

আবারও চমকে উঠল সর্দার খাঁ, কিন্তু কোন কথা বলল না। আংটিটা এক টানে বোল্‌টনের হাত থেকে খুলে নিয়ে তার জন্যেও কয়েকখানা রুটির ব্যবস্থা করে সে ভেতরে চলে গেল। তবে নানাসাহেব যেদিকে ছিলেন সেদিকে নয়—সে গেল সোজা অন্তঃপুরের দিকে।

হুসেনী বেগম এই কদিনের উপর্যুপরি উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অথচ একটু বিশ্রাম নেবারও যেন শক্তি নেই তার। ফলে তার চক্ষু হয়ে উঠেছে আরক্ত, চুল রুক্ষ ও অবিন্যস্ত—বেশভূষায় কোন শৃংখলা বা পারিপাট্য নেই। চোখের কোলে গভীর কালি—এক কথায় উন্মাদের মত তার চেহারা হয়েছে। বিশ্রামের সময় আছে, এমন কিছু গুরুতর কাজ হাতে নেই, কিন্তু মনের যত-টুকু স্থৈর্য ফিরে এলে একটুখানি ঘুমও সম্ভব হত—সেটুকু স্থৈর্যেরও একান্ত অভাব। ঘুম দূরের কথা, স্নানাহার করার মতও সহজ অবস্থা সে মনে আনতে পারছে না—অবিরাম যেন কক্ষচ্যুত উল্কার মত এ-ঘর, ও-ঘর, পথ-ছাদ করে বেড়াচ্ছে। দাসী জোর করে মধ্যে মধ্যে শরবৎ বা দুধ খাওয়ায় বলে জীবনটা

আছে—চলাফেরার শক্তিটা লোপ পায় নি এখনও।

অনেকেই এই ব্যাপারে অনেক অনুযোগ করেছে, স্বয়ং নানাসাহেবও। কিন্তু তাঁকে সে এক কথায় ঠাণ্ডা করেছে, 'দাঁড়ান পেশোয়া, এ আমার জীবনমরণ পণ যে—আপনার শত্রুর নিপাত না হলে আমি স্থির হয়ে খেতে কি ঘুমোতে পারব না।'

নানাসাহেব বেশী পীড়াপীড়ি করতে পারেন নি। সামান্য আর একটু অনুযোগের পর মুসম্মৎকে ডেকে একটু-কিছু খাওয়াতে নির্দেশ দিয়েই কর্তব্য শেষ করেছেন।

মুসম্মৎ ও সর্দার খাঁ অবশ্য অনেক বকাবকি করেছে, তবে তাদের সঙ্গে ধমকের সম্পর্ক—ধমক দিয়েই তাদের থামিয়ে দিয়েছে হুসেনী। বলেছে, 'মিছে আমার মাথা আরও খারাপ করছিস সর্দার, এর একটা এস্‌পার-ওস্‌পার না হলে আমি কিছুতেই স্থির হতে পারব না।'

মুসম্মৎ অনুনয় করেছে, 'কিন্তু এমন করে আর কদিন থাকতে পারবে? মরে যাবে যে!'

'মরব! মরা অত সহজ নয়। তাছাড়া খাচ্ছি তো—দুধ খাওয়া কি খাওয়া নয়?'

'অন্তত একবার স্নানটাও কর! এই গরম—'

'এই গরমে ঐ সাহেব-মেমগুলো স্নান না করে যুঝছে তো! না মুসম্মৎ, স্নান না করলে মানুষ মরে না।...আগে ইংরেজদের রক্তে স্নান করব—তার পরে এমনি স্নান!'

এই অবস্থাই চলছে। তার সঙ্গে কথা কওয়াই প্রায় অসম্ভব, তবু সর্দার খাঁকে সেই চেষ্টাই করতে হল। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত আমিনা তখন একটা ঘরের মধ্যে একা পায়চারি করছিল, সহসা সর্দার খাঁকে দেখে যেন কতকটা আশার সঙ্গেই দু-এক পা এগিয়ে এল।

'কী খবর রে সর্দার—ওরা হার মানল?'

'না। আমি অন্য কথা বলতে এসেছি।'

'কী কথা?' ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল আমিনার।

সর্দার খাঁর অবশ্য কখনই ভূমিকা করা অভ্যাস নেই। এখনও সে বিনা ভূমিকাতেই বলল, 'ক'জন সিপাই একটা সাহেবকে ধরে এনেছে। নানাসাহেবের হাতে দিয়ে বকশিশ চায়। সাহেবটার হাতে এই আংটিটা ছিল; সে আপনার নামও করেছে আমার কাছে।'

আংটিটা মেলে ধরল আমিনার সামনে।

আমিনার মুখ ঠিক উজ্জ্বল হয়ে না উঠলেও যেন অনেকখানিই পূর্বের প্রশান্তি ফিরে পেল। চোখ দুটিও স্নেহে কোমল হয়ে এল।

'হীরালাল দিয়েছে নিশ্চয়ই। সে-ই আমার নাম করে দিয়েছে। সে ওকে বাঁচাতে চায়।...সাহেবটা এখন কোথায়?'

'সিপাহীদের সঙ্গে নীচে অপেক্ষা করছে। তাকে কিছু খাবার দিতে বলেছি।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কী চিন্তা করে নিল আমিনা। তার পর বলল, 'তুই লোক দিয়ে এখনই ওকে পেশোয়ার কাছে পাঠিয়ে দে।...এমনি ছেড়ে দিয়ে কোন লাভ নেই—আবার কার হাতে ধরা পড়বে! একেবারে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। আর সে কাজ নানাসাহেবের হুকুম ছাড়া হবে না।'

সর্দার খাঁ ঈষৎ বিস্মিত হয়ে তাকাল। প্রতিবাদ করা বা তর্ক করা তার অভ্যাস নয়। তবু একবার বলল, 'আংরেজকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবেন মালেকান?'

পিশাচী যেন মন্ত্রবলে মানবীতে পরিণত হয়েছে। আমিনার স্নিগ্ধ দুটি চোখের দৃষ্টি যেন বহুদূরে আবদ্ধ হল। অনেকদিন পরে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে সে কথা কইল। বলল, 'এ তুই বুঝবি না সর্দার খাঁ, যার অনুরোধে ওকে এ অনুগ্রহ করছি, এ দুনিয়ায় তার মত সম্মান আমায় কেউ দেয় নি। সে আমাকে শ্রদ্ধা করে—সে আমাকে দেবীর মত দেখে।...সে আমাকে ভালবাসে, কিন্তু কখনও কামনার দৃষ্টিতে দেখে নি। সে—সে...না সর্দার, তার অনুরোধ না শুনে উপায় নেই।'

সর্দার আর দ্বিরুক্তি না করে নিঃশব্দে বার হয়ে গেল।

আমিনা কিছুক্ষণ সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ যদিও খোলা দ্বারপথেই নিবদ্ধ, তবু সেদিকে চাইলেই বোঝা যায় যে, সে চোখের দৃষ্টি ঐ দ্বারপথ পার হয়ে, তার বাইরের অলিন্দ পার হয়ে, এমন কি এই জনপদও পার হয়ে বহু বহু দূরে চলে গেছে,—যেখানে একটি তরুণ ভক্ত তার অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির আরতি সাজিয়ে বসে আছে, যেখানে মনুষ্যত্বের আসন পাতা, যেখানে নব-জীবনারম্ভের সুযোগ ও ইঙ্গিত দুটি পূর্ণপাত্রে সজ্জিত। হয়তো এখনও সময় আছে—হয়তো এখনও নতুন করে এই ঈশ্বরের তৈরী পৃথিবীর রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ আস্বাদনের সুযোগ মিলতে পারে। এখনও জীবনের আনন্দ নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এখনও এর বর্ণ-সুষমাময় বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তার দু চক্ষু সজাগ ও সচেতন—জরা ও বয়স এখনও এই দেহ থেকে অনেক দূরে আছে, তাদের কর আদায়ের সময় এখনও আসে নি।

সে যাবে নাকি? এই ঘৃণ্য নারকীয় পরিবেশ ছেড়ে, প্রতিহিংসার 'তীব্রজ্বালা বহ্নি-ঢালা' সুরাপাত্র দূরে নিক্ষেপ করে ছুটে চলে যাবে—যেখানে এখনও কিছু শান্তি, কিছু আনন্দ আছে? হয়তো এখনও কোন অজ্ঞাত শান্ত গৃহকোণে কোন একটি মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালাতে পারে সে—আজও! তাই যাবে নাকি?

কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত দেহ শিউরে একটা প্রচণ্ড ধিক্কার তাকে সচেতন করে দিয়ে গেল।

এই দেহটা নিয়ে? এই জন্মেই আবার? ছিঃ ছিঃ!

না, আর সময় নেই। আকণ্ঠ পঙ্কে নেমেছে, এখন যেখানেই যাক না কেন, এই পঙ্কের মালিন্য ও দুর্গন্ধ তার সঙ্গে যাবে।

না। সে সম্ভব নয়। এ জীবনটা এমনি করেই জ্বলে ও জ্বালিয়ে কেটে যাক।

তার পর যেদিন এই অবসন্ন আত্মা তার স্বেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত অপরাধের বোঝা নিয়ে ঈশ্বরের দরবারে উপস্থিত হবে, কেবলমাত্র সেদিনই—যদি তাঁর করুণা হয় তো একটু শান্তি মিলতে পারে—তার আগে নয়।

একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আমিনা আত্মস্থ ও সক্রিয় হয়ে উঠল। কদিন পরে আবার আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চুলগুলো পাখীর বাসা হয়ে আছে, মুখে-চোখে কতদিন কোন প্রসাধনের প্রলেপ তো

দূরের কথা, একটু জলও পড়ে নি। তাড়াতাড়ি মুখে একটু জল দিয়ে শুকনো কাপড়ে ঘষে মুখটা মুছে ফেলল। চোখের কোলে বড় বেশী কালি পড়েছে—তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে একটু সুর্মাও লাগাল। তার পর কেশ ও বেশভূষাটাকে টেনে-টুনে যতটা সম্ভব ভদ্র করে নিয়ে নানাসাহেবের ঘরের উদ্দেশে যাত্রা করল।

আমিনা যখন পৌঁছল, তখন বোলটনকে জিজ্ঞাসাবাদ জেরা প্রভৃতি হয়ে গেছে। এখন আমিনাকে আসতে দেখে নানাসাহেব তাড়াতাড়ি মামলা চুকিয়ে ফেললেন। আপাতত গারদ-ঘরে রাখবার হুকুম দিয়ে ইঙ্গিতে কয়েদীকে সরিয়ে নিতে বললেন। আমিনা এমন সময়ে তাঁর কাছে এসেছে—নিশ্চয়ই কোন জরুরী কাজ আছে। তা ছাড়া কদিনের এই অশান্তি, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে অকস্মাৎ আমিনাকে দেখে তিনি একটু খুশীও হয়ে উঠেছেন; নিভৃতে একটু আলাপের সুযোগ পাওয়া দরকার।

রক্ষীরা বন্দীকে টেনে নিয়ে গেল। আমিনার মুখে পাতলা ওড়নার অবগুণ্ঠন ছিল, তবুও তার মুসলমানী সজ্জাতে বোলটন হুসেনী বেগম বলে অনুমান করতে পেরেছিল। যাওয়ার আগে শেষ আশা হিসেবে একবার করুণ নেত্রে তার দিকে চাইল, ঘোমটার মধ্যে অনুমান করে নিয়ে চোখে চোখ রাখবারও চেষ্টা করল, কিন্তু আমিনার তরফ থেকে এ অনুনয়ের এতটুকুও জবাব এল না। সে পাষাণ-পুত্তলীর মতই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সম্ভবত ঐ ওড়নার আড়ালে তার মুখখানাও অমনি ভাবলেশহীন ছিল।

বোলটন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বার হয়ে গেল।

ঘর থেকে সকলে চলে যেতেই নানাসাহেব দু বাহু প্রসারিত করে হুসেনীকে অভ্যর্থনা করলেন।

'এ যে অযাচিত অনুগ্রহ বেগমসাহেবা! কী হুকুম বল!'

হুসেনী সযত্নে ও আপাত-সস্নেহে নানাকে তাঁর আসনে বসিয়ে নিজে একেবারে পায়ের কাছে বসল। তার পর বলল, 'যদি আমার অপরাধ না নেন তো বলি—ঐ সাহেবটাকে ছেড়েই দিন!'

'ছেড়ে দেব? কেন বল তো? তুমি ওকে চেন নাকি? তুমি কি ওর কাছে কোন কারণে উপকৃত? তা যদি হয় তো—'

'না-না সেসব কিছু নয়। আমি ওকে এর আগে কখনও দেখি নি। নাম-ধাম পরিচয়ও জানি না।...কিন্তু তবু বলছি ছেড়ে দিন। শুধু তাই নয়—নিরাপদে ওকে ইংরেজদের ঐ গড়ে পৌঁছে দিন।'

'সে কি! কী বলছ? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?'

'না পেশোয়া, ঠিকই বলছি। আমি আপনার সব জেরা আর ওর জবাব বাইরে থেকে শুনেছি। ও আসছে লক্ষ্ণৌ থেকে। ওর বিশ্বাসী সিপাইরাই ওকে বেঁধে এনেছে। পথে এক গাঁয়ের লোক ওকে কেটে ফেলতে গিয়েছিল। এখানে এসেও দেখেছে কি ভয়ানক ইংরেজ-বিদ্বেষ চারদিকে। ও যদি এসব কথা গিয়ে ইংরেজ-শিবিরে জানায়, তা হলে এখনও যেটুকু বাইরের সাহায্যের প্রত্যাশা করছে হুইলার—সেটুকুও যাবে। তা হলে আত্মসমর্পণের কথাটা বেশী করে ভাববে। আমার তো অন্তত তাই মনে হয়। আর তা যদি নাও হয়, একটা ইংরেজ মেরেই বা আপনার লাভ কী হবে বলুন! তার চেয়ে একটু

পরখ করে দেখুনই না বাঁদীর কথাটা।'

নানাসাহেবের দৃষ্টিতে আজও মুগ্ধ প্রশংসা ফুটে উঠল। হুসেনী তার যে হাতটা নানার হাঁটুতে রেখে মুখ তুলে কথা বলছিল, সেই হাতটায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে নানা বললেন, 'সত্যি, তুমি একটা সাম্রাজ্য চালাবার মত বুদ্ধি রাখ হুসেনী।...তেমন সুযোগ পেলে নূরজাহাঁ বেগমের খ্যাতিও ম্লান করে দিতে পারতে। যদি কোন দিন সিংহাসনে বসতে পারি, তোমার ঋণ আমি ভুলব না পিয়ারী।'

'তা হলে হুকুম দিচ্ছেন তো?'

'এখনই। দেখ তো কে আছে বাইরে—'

সেইদিনই দ্বিপ্রহরে হুইলার সাহেবের 'মাটির কেল্লা'র অধিবাসীরা এক অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল। চারিদিক থেকে শত্রুসৈন্যের অবিশ্রাম অগ্নিবর্ষণ চলছে, আট-নটি কামান থেকে গোলা-বৃষ্টি হচ্ছে—এ পক্ষেরও যথাসাধ্য উত্তরদানে ত্রুটি নেই, তারই মধ্যে অকস্মাৎ দেখা গেল দূরে একটি অশ্বারোহী—সে অশ্বারোহী শ্বেতাঙ্গ।

একা একটি ইংরেজ এই অগণিত শত্রুর মধ্যে দিয়ে আসছে—কে এ? কোথা থেকে আসছে? কেমন করে এখনও বেঁচে আছে লোকটা? পাগল নাকি ও?

তারা বিস্ময়ে বুঝি কিমূঢ় এবং হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল, নইলে দেখতে পেত যে শত্রুপক্ষ এত গুলি-গোলা ছুঁড়ছে, কিন্তু ঠিক ঐ লোকটিকে কেউ বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করছে না। নইলে কিছুতেই একা ঐ লোকটার পক্ষে এতক্ষণ বেঁচে থাকা সম্ভব হত না। আর চারদিকেই অবরোধ—নিরন্ধ্র শত্রুব্যূহ—তার মধ্যে দিয়ে নিরাপদে আসছেই বা কেমন করে!'

কিন্তু তবু, গুলি-গোলা চারদিক থেকেই আসছে এটা ঠিক। দৈবাৎ বিঁধতেও পারে। বেঁধার সম্ভাবনাই বেশি। তবে বুঝি দৈবই সহায়—তাই এখনও সে অক্ষত আছে।

তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ও।

দেখতে দেখতে কাছে এসে পড়ল।

'থামাও থামাও, অন্তত আমাদের কামান থামাও!' সকলে প্রায় একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

দু হাত মাত্র মাটির দেওয়াল। ঘোড়া অনায়াসে সেটুকু পার হয়ে এল। পেছনে অবিরাম গোলা ঝরে পড়ছে। তবু অশ্ব এবং তার আরোহী দুই-ই অক্ষত আছে।

কিন্তু এতক্ষণের উদ্বেগ, পথশ্রম, অনাহার, আতঙ্ক—এতক্ষণের বিরতিহীন অগ্নিবাণবৃষ্টি—সবটা জড়িয়ে লোকটা একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। ঘোড়া যখন শেষ অবধি থামল, তখন আর তার নিজের নামবার ক্ষমতা নেই। অবশ্য ততক্ষণে চারদিক থেকেই ইংরেজ বন্ধুর দল ছুটে এসেছে। তাদেরই কয়েকজন ওর অবস্থা বুঝে ওকে নামিয়ে নিল।

ক্ষীণ একটু অপ্রতিভ হাসির সঙ্গে ক্ষীণতর কণ্ঠে 'লেফটেনান্ট বোলটন' এইটুকু মাত্র পরিচয় দিয়েই সে বন্ধুদের হাতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

বোল্‌টন এদের দুর্গতি অনেকখানিই আশঙ্কা করেছিল—কিছু লোকমুখে যে শোনে নি এমনও নয়, কিন্তু এখানে এসে যা প্রত্যক্ষ করল তা সে-সব আশঙ্কা ও জনশ্রুতির অনেক ঊর্ধ্বে। বস্তুত কোন কল্পনারই বুঝি সাধ্য নেই যে, এই বাস্তবের কাছে পৌঁছয়।

আগেই বলেছি, সার হিউ 'নাচারগড়'টা তৈরী করেছিলেন কতকটা অনিচ্ছার সঙ্গেই। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, এখানকার সিপাহীরা কোনদিনই বিদ্রোহ করবে না—আর যদিই বা করে তো তারা সোজাসুজি দিল্লীর দিকে রওনা হবে, এখানে কোন হামলা করবে না। বরং পাছে সিপাহীরা মনে করে যে, তিনি তাদের অবিশ্বাস করছেন—এই ভয়ে কোন রকম আত্মরক্ষার আয়োজনেও তাঁর ঘোর অনিচ্ছা ছিল।

দুটি মাত্র পাকা ব্যারাক—তারও একটি খড়ের ছাউনি। গোড়ার দিকেই গোলার আগুনে সেটি ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এই ব্যারাকটিতেই হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং যা-কিছু ওষুধপত্র তা ঐ সঙ্গেই পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। অতঃপর আহত বা অসুস্থ লোককে চিকিৎসা তো দূরের কথা—প্রাথমিক সাহায্য-টুকুও দেবার উপায় রইল না। যে আর্ত লোকগুলি সে ব্যারাকে ছিল, প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাদের সকলকে উদ্ধার করা যায় নি। গোলন্দাজ বাহিনীর দু জন লোক তো সকলের চোখের সামনেই পুড়ে মারা গেল।

এই দুর্ঘটনার পর অবশিষ্ট রইল একটি মাত্র ব্যারাক—তাও এমন কিছু বড় নয়। বহু মহিলাকে স্থানাভাবে খাদের মধ্যে এসে আশ্রয় নিতে হল। ভাগ্যে বর্ষার সময় এটা নয়—কারণ একেবারে মাটির ওপর শুয়ে থাকা ছাড়া সেখানে আর কোন আয়োজন ছিল না।

খাদ্য মাত্র পঁচিশ দিনের মতই দিতে বলা হয়েছিল ঠিকাদারকে। সে কি দিয়েছিল তাও কেউ দেখে নি। তার ওপর প্রথম প্রথম সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানও হয় নি কেউ। খাদ্য ও পানীয় (সুরা)° যদৃচ্ছ বিতরণ করা হয়েছে। পরে যখন হুঁশ হল, তখন সতর্ক হবার মত বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না। এক বেলা সামান্য একটু আটা ও আরও সামান্য ডাল—এই মাত্র বরাদ্দ হল। এক বেলার মতও পর্যাপ্ত নয় তা—তবু সে ভাণ্ডারও দ্রুত খালি হয়ে আসছে। এর মধ্যে রোগী আছে—সদ্য-প্রসূতী স্ত্রীলোক আছে। মাংস তো স্বপ্ন-কথা, দৈবাৎ দু-এক দিন দু-চার জনের ভাগ্যে জুটেছে। তারও যে বিচিত্র ইতিহাস বোল্‌টনের কানে গেল—তাতে ওর মত তরুণ সৈনিকের চোখও শুকনো রাখা অসম্ভব!

একদিন বিপক্ষ দলের একটি অশ্বারোহী কাছাকাছি এসে পড়েছিল। সিপাহীর সঙ্গে ঘোড়াটাকেও মারা হল এবং শত্রুপক্ষের নিরবচ্ছিন্ন গোলাগুলি বর্ষণের মধ্যেই কয়েকজন গিয়ে ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে এল। সে-ই যেন মহোৎসব পড়ে গেল। কিন্তু সেটুকু পশুমাংসের জন্যও একজন মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আর একদিন একটা দাগা ষাঁড় এদিকে এসে পড়েছিল। তাকে গুলি করে মারতে বেশী দেরি হয় নি। কিন্তু তার পর? জীবন বিপন্ন করে অবশেষে কয়েক জন গেলেন, আহতও হলেন কেউ কেউ—তার ফলে বহুদিন পরে পরিচিত মাংসের আস্বাদ মিলল। অবশ্য একটা ষাঁড়ের মাংস, তা সে যত বড় ষাঁড়ই হোক, আর তাকে যেমন ভাবেই ভাগ করা হোক—সকলের ভাগ্যে

যে জোটা সম্ভব নয়, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, ক্ষুধা যে মানুষকে কতখানি নীচে নামায়, তা একদিন আগে পর্যন্তও এদের কাছে অনুমান করা ছিল দুঃসাধ্য। একটা একেবারে 'নেড়ী কুত্তা', কেমন করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন গড়ের ধারে এসে পড়েছিল। এতগুলি লোকের ক্ষুধার্ত রসনা থেকে সে বেচারীও অব্যাহতি পায় নি। অখাদ্য অন্ত্যজ জীব হওয়া সত্ত্বেও না।

সব চেয়ে যেটা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল—সেটা পানীয় জলের অভাব। একটিই মাত্র কুয়া—তাও একেবারে বাইরে, পাঁচিলের ধারে। আর পাঁচিলও তো কত—কোমর-ভর মাটির দেয়াল, তার পেছনে অগভীর খাদ—আশ্রয় বলতে এইটুকু! তাও কুয়াটার পাশে যদি অতটুকু পাঁচিলও থাকত! দিনরাত অবিশ্রাম গুলি-বর্ষণ চলছে। কুয়ার কাছাকাছি কেউ গেলে সে বর্ষণের তীব্রতা আরও বেড়ে যায়। হাতের কাছে চোখের সামনে—কাজেই সেদিকে কেউ এগোবার চেষ্টা করলেই সব কটি বন্দুকের মুখ ঐদিক ঘুরে যায়। এক নিশীথ রাত্রির অন্ধকার ভরসা, কিন্তু অন্ধকারে নজর না চলুক, কপি-কলের সামান্য আওয়াজ, কিংবা জলের ওপর বালতি পড়বার একটু শব্দ তো হয়ই—আর তা হলেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটতে থাকে। অথচ কানপুর শহরে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের নির্মেঘ দিনগুলির অগ্ন্যুত্তাপ সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে—তাঁরাই বুঝবেন জলের কি পর্যন্ত প্রয়োজন হয় বা হওয়া উচিত। এমনিই তো বহু লোক—নরনারী-নির্বিশেষে সর্দিগর্মিতে মারা যেতে লাগল। ব্যারাক-বাড়িগুলির পাতলা সামান্য ইঁটের দেয়াল—তেতে আগুন হয়ে থাকে সদা-সর্বদা, রাত্রেও ঠাণ্ডা হয় না। ঘরের ভেতর ভাজনা-খোলা, বাইরেটা অগ্নিকুণ্ড। বন্দুকে দুপুরবেলা হাত দেয় কার সাধ্য! ছায়াতে থাকলেও তা এমন তেতে ওঠে যে হাত দিলে হাতে ফোস্কা পড়বার উপক্রম হয়! মধ্যে মধ্যে লোহার নলটা তেতে গুলি আপনিই ছুটে যায়। সে আর এক বিপদ।

এই গরমে জল নেই। ছোটরা তো দিনরাত 'জল' 'জল' করে চীৎকার করছে। এক এক সময় তারা পাগলের মত ক্যাম্বিশের জল-তোলা বালতির ছেঁড়া টুকরোগুলোই চিবোতে থাকে। বহুদিন সে-কাপড়ের সঙ্গে জলের সম্পর্ক নেই—তবু জলেরই তো বালতি!···এই অবস্থা দেখে দু-এক জন মরীয়া হয়ে, মৃত্যু অব্যর্থ জেনেই জল আহরণে ব্রতী হচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই চরম পুরস্কারই লাভ করছেন। একজন স্কচ সাহেব তবু অনেক কদিন ধরে যমরাজকে ফাঁকি দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি গুলি তাঁর অদৃষ্টেও জুটল। কোন কোন এদেশীয় চাকর ওরই মধ্যে জল তুলে এনে চড়া দামে বেচে বেশ দু পয়সা কামাতে লাগল। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। বিশেষত অর্থের আশা—শ্বাস ছাড়লেও দেহের পচা তন্তুগুলোকে আঁকড়ে থাকে।

হ্যাঁ, ভারতীয় সিপাহীরা না থাক্, ভারতীয় ভৃত্যরা ছিল বৈকি। বেশ কজনই ছিল। শেষ পর্যন্তও ছিল। তারাও মনিবের সঙ্গে সমানভাবে দুঃখ ভাগ করে নিয়েছে। বরং বেশী সয়েছে তারাই। প্রাণও দিয়েছে দলে দলে। শত্রুপক্ষের গোলা সাদা-কালো বাছে নি। লেফটেনাণ্ট ব্রিজেস-এর তিনটি চাকর এক কামানের গোলাতেই ফরসা হয়ে গিয়েছিল। এমন কি সতীচৌরা ঘাটের মৃত্যু-মহোৎসবের দিনেও এরা সাহেবদের ছাড়ে নি। প্রায় সকলেই প্রাণ দিয়েছে—তবু নিমকের মর্যাদা ভোলে নি।

কিন্তু সে পরের কথা।

দলে দলে মরছে,—সাদা-কালো, মানুষ ও পশু। অথচ তাদের সংকারের কোন ব্যবস্থা নেই। একটিই মাত্র কফিন ছিল—তা প্রথম দিনের প্রথম বলিটিকেই সমাহিত করতে খরচ হয়ে গেল। তার পর একটা গর্ত খুঁড়ে তাতেই পর পর শবগুলো ফেলা হতে লাগল। চিল-শকুনও অবিরাম গোলা-বর্ষণের ফলে নামতে সাহস পায় না। এই প্রচণ্ড সূর্যতাপে সে সব দেহ এক বেলাতেই পচে ওঠে—আর পচতেই থাকে। সে দুর্গন্ধই মানুষকে পাগল করবার পক্ষে যথেষ্ট। তবু তারই মধ্যে এতটুকু আহার্যের জন্য—এক ফোঁটা জলের জন্য অবশিষ্ট মানুষগুলোর কী ব্যাকুলতা! জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকার কী প্রবল প্রয়াস!

কিন্তু তবু এরা টি'কে আছে—এই ইংরেজরা। কী করে আছে সেই কথাটাই সিপাহীরা বা তাদের নেতারা কেউ ঠিক বুঝতে পারে না। মুষ্টিমেয় মাত্র লোক,—অন্তত সিপাহীদের সংখ্যানুপাতে,—চারিদিকে দিনরাত অতন্দ্র মৃত্যুদূতদের ঘিরে থাকতে দেখেও হতাশ হয় না—এ আবার কেমন কথা! সিপাহীদের চেষ্টার বিরাম নেই, বরং তাদের রোখ চড়েই গেছে, তারা সর্বদাই হুঁশিয়ার সতর্ক থাকে, হঠাৎ প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতেও ছাড়ে না, কিন্তু ফল সেই একই। মরে—তবু নত হয় না। ইতিমধ্যে মীর নবাব নামে এক ব্যক্তি হঠাৎ একদিন তাঁর দলবল নিয়ে এসে হাজির হলেন—অন্তত হাজারখানেক লোক তো বটেই। তিনি নাকি খুব দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গোরাও—নাদিরী ও আখ্‌তারী পল্টন—তেমনি ভয়ঙ্কর। খুব খ্যাতি তাদের। মীর নবাব তো হেসেই খুন! এই কটা ইংরেজ তাড়াতে এত কাণ্ড! এত সিপাহী! এত কামান! একেই বুঝি বলে 'মশা মারতে কামান দাগা'! তাঁর হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হোক, তিনি এক দিনেই ঢিট করে দেবেন।

নানাসাহেব ও আজিমুল্লা দু জনেই সাগ্রহে এ প্রস্তাবে রাজী হলেন। মীর নবাব নিজের মনোমত ব্যূহ রচনা করে সত্যি-সত্যিই প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন—সে তীব্র আঘাতের সামনে অবিচল থাকা একরকম অসম্ভবই। কিন্তু ইংরেজরা অসম্ভবকেও সম্ভব করল। আর এমনিভাবেই করল যে, ঐ দু হাত উঁচু মাটির দেওয়াল এবং তার ওপারে ছেলেখেলার মত গড়খাইটুকু পার হওয়া গেল না কিছুতেই।

মীর নবাব অপ্রস্তুত হলেন। সিপাহীরা হাসল।

তারা ইংরেজদের কাছে লড়াই শিখেছে—ও জাতটাকে কিছু কিছু চিনেছে বৈকি!

॥ ৪৬ ॥

সেই স্মরণীয় চৌঠা তারিখ রাত থেকে শুধু যে আমিনা ঘুমোয় নি তা নয়—আজিজনও ঘুমোয় নি। আমিনা তবু প্রাসাদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং দাসদাসীর সেবার মধ্যে ছিল—আজিজন সেদিন থেকে এই অবরোধের মধ্যেই কাটাচ্ছে। সে যেন পাগল হয়ে গেছে।—সাক্ষাৎ চামুণ্ডার মতই রুধির-লোলুপা সে—ইংরেজদের রক্ত ছাড়া তার পিপাসা মিটবে না আর কিছুতেই। সেই রক্তের অবিরাম বর্ষণ ভিন্ন বুকের আগুন নিভবে না।

সেই যে পুরুষ-বেশে সে ঘোড়ায় চড়েছে, সে পুরুষ-বেশ আর ছাড়ে নি। একটা ময়লা হলে আর একটা সিপাহীর পোশাকই সে সংগ্রহ করে নেয়; আর তাকে না দেবে কে—সকলেই তাকে প্রসন্ন করতে ব্যস্ত। সিপাহীর পোশাক, কোমর-বন্ধে তরবারি, কোমরের দু দিকে দুটি পিস্তল গোঁজা, বুকের কাছে খাপে-মোড়া একখানা বাঁকানো ছোরা বা কিরিচ। আর হাতে রাইফেল। আক্রমণের সময় সে নিজেও অবিরাম গুলি ছুঁড়ে চলে। ফলে এক-এক সময় তার সুগৌর শুভ্র মুখ বারুদের গুঁড়োয় মসীবর্ণ ধারণ করে। বন্দুকের টোটা ফুরিয়ে গেলে আরও সামনে এগিয়ে যায়—তখন চলে পিস্তল। ছোরা-খানা রেখেছে, যদি কখনও কোন ইংরেজকে সামনাসামনি পায় তো তখন সেটার ব্যবহারও চলবে।

আজিজন একেবারেই সিপাহীদের সঙ্গে মিশে গেছে। আমিনা বিশ্রাম করে না—আজিজন করে। তবে সে ঐ সিপাহীদের সঙ্গেই। এক-এক দল সিপাহী পালা করে পেছনের তাঁবুতে বা প্রাসাদে গিয়ে পূর্ণ বিশ্রাম নেয়—আজিজন তাও নেয় না। সে পরিখাতেই থাকে—এবং একেবারে সামনের পরিখা ছাড়া কোথাও থাকতে পারে না। ওধারে ইংরেজ-পক্ষের কেউ একজনও যদি কুয়ার ধারে আসে বা এমনিই নড়া-চড়া করে তো সে-ই সর্বাগ্রে শব্দ পায় এবং এক লাফে বন্দুক বা পিস্তল নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সেইজন্যই সে সামনের পরিখা ছাড়ে না। সর্বদাই প্রস্তুত থাকে সে। গা ঢেলে বিশ্রাম করাও যেমন সে ভুলে গেছে, তেমনি তন্দ্রাও যেন আর তার চোখে নামে না। আহার করে সে সেখানে বসেই। নিজের জন্য খাবার সংগ্রহ করার সময় নেই। অপর কোন সিপাহী গরজ করে এনে সেখানে ধরলে খায়। অথবা কেউ খাচ্ছে দেখলে এক খাবল তুলে নেয়। জলও ঐভাবেই অপরে মুখের কাছে এনে ধরলে তবে তৃষ্ণাবোধ জাগে। স্নান করা হয় না—এক এক দিন গভীর রাত্রে পোশাক বদলের সময় কোনমতে এক বালতি জল গায়ে ঢেলেই তার ওপর পোশাক এঁটে নেয়। প্রচণ্ড দাহ আকাশে-বাতাসে। গায়ের জল পোশাকে, পোশাকের জল হাওয়ায় মিশিয়ে যায় দেখতে দেখতে।

বস্তুত আজিজনই যেন অবরোধকারী সিপাহীদের প্রাণশক্তি। সে-ই যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সে-ই তাদের সর্বশেষ প্রেরণা। এপক্ষে যে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখা দেয় নি এখনও—আজিজনই তার পরম কারণ।

সে ঘোষণা করেছে—যে সিপাহী একজন ইংরেজ মারতে পারবে, আজিজন তারই ভোগ্যা হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পদবী-নির্বিশেষে এই পুরস্কার ঘোষণা করেছিল সে এবং সে সম্বন্ধে সত্যিই তার কোন বিচার বা সংস্কার ছিল না। দু জন সাক্ষী বা অপর কোন ভাল প্রমাণ দিতে পারলেই প্রার্থী পুরস্কার লাভ করছে—যে কেউ। অন্তত দশটি মোহরের কম যার বাড়ির চৌকাঠ মাড়ানো যেত না তাকে এত অনায়াসে লাভ করবার আশা যে-কোন প্রলোভনের চেয়ে বেশি তো বটেই! সে যতই পুরুষের বেশে যাতায়াত করুক, বারুদ ঘাম ও ধুলোয় যতই তার তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ম্লান দেখাক, এই নির্মেঘ রৌদ্রের অসহ্য খরতাপ ও পরিশ্রমে তার গোলাপের মত মসৃণ চর্ম যতই কেন না কর্কশ হয়ে উঠুক, আজও সে যথেষ্ট কাম্য ও লোভনীয় আছে। বিশেষত স্ত্রী-সংসর্গবর্জিত পরিখায় সেই অযাচিত পুরস্কার দৈব অনুগ্রহের চেয়ে কোন অংশেই কম মনে হয় না।

সেদিন সন্ধ্যার মুখে অকস্মাৎ পশ্চিম আকাশে একটুকরো মেঘের মত কী দেখা দিয়েছিল। 'পশ্চিমে অমোঘা মেঘাঃ' সেই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করে অনেকেই একটু আশান্বিত হয়ে উঠল। সিপাহীদের হাতের বন্দুক আপনিই শিথিল হয়ে এল, চোখ সকলকারই পৌঁছল আকাশে—দৃষ্টি হল উৎসুক ও লোভাতুর। সাহেবদেরও তাই—মৃত্যু আসন্ন জেনেও তারা কেউ কেউ বাইরের খোলা জায়গায় এসে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে, দুরাশার এই চকিতচমক কোনমতে উপভোগ করবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারল না। একটা সুবিধাও হয়েছিল—মেঘটা পশ্চিম দিকচক্ররেখায় দেখা দেবার ফলে ওখানকার দীর্ঘস্থায়ী গোধূলিও তাড়াতাড়ি ম্লান হয়ে এসেছে, চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে ছায়া—দৃষ্টি বহু দূর অবধি পৌঁছবার কোন উপায় নেই।

অবরোধে অনভ্যস্ত বোলটন এ সুযোগ ছাড়তে পারল না। দিন-দুই বিশ্রাম করেই সে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। এমন কি একবার মৃত্যু প্রায় স্পর্শ করতে করতে ছেড়ে দেওয়ায়, নিজের অজ্ঞাতেই কোথায় বুঝি একটা ভরসাও এসেছে যে—সে সহজে মরবে না। তাই বাইরে এসে সে বেশ খানিকক্ষণ মেঘের আশ্বাসভরা চেহারাটা উপভোগ করল তো বটেই, ভাল করে দেখবার জন্যে পায়ে পায়ে সকলের অলক্ষ্যে সে সেদিকের গড়খাই-এর কাছেও এগিয়ে গেল।

সেদিকটা তখন সম্পূর্ণ জনহীন-এপারেও যেমন কেউ নেই, ওপারেও তেমনি। বোধ হয় এক পক্ষে নেই বলেই অপর পক্ষ সেদিকে পাহারা দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। কিন্তু আর যে-ই অসতর্ক থাক, আজিজন ছিল না। সে আগাগোড়াই এখানে দাঁড়িয়ে আছে—একাকিনী পাহারায় আছে সে। আর কেউ না থাকতে চায় না থাকুক, সে একাই যথেষ্ট। এবং তার চোখও আকাশের দিকে নেই—শত্রুপক্ষের দিকেই আছে স্থিরনিবদ্ধ। কাব্য বা স্বাচ্ছন্দ্য—কোন দিকেই তার মন নেই। তার উদ্দেশ্য এক—লক্ষ্য এক,—ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা সবই এক।

ইংরেজ-নিধন তার সাধনা। ইংরেজ-নিধনে তার সিদ্ধি।

তাই বোলটন প্রথম বাইরে আসার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও তার লক্ষ্যের বাইরে যায় নি। আগাগোড়াই আজিজন তাকে দেখছে। বন্দুকটাও বাগিয়ে ধরে আছে—যে কোন মুহূর্তে ঘোড়াটা টেপবার ওয়াস্তা। কিন্তু শিকার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আছে বলেই বোধ করি তার কোন তাড়া নেই; সে শান্তভাবে অপেক্ষা করছে। বরং একেবারে কাছাকাছি এসে পড়ায় একটা নতুন চিন্তা তার মাথায় এসেছে। এই কদিন ইংরেজ সে যথেষ্ট মেরেছে বটে, কিন্তু সে সবই দূর থেকে—একেবারে সামনাসামনি তলোয়ার বা ছুরি বুকে বসিয়ে দেবার সুদুর্লভ আনন্দ সে এখনও লাভ করতে পারে নি। সেটাই বা বাকি থাকে কেন? নির্বোধ লোকটা হাতের কাছেই তো এসে পড়েছে, কাছাকাছি শত্রুপক্ষের অপর কেউ নেই, বেশ একটা ঝাপসা আবহাওয়া চারিদিকে—এই তো সেই ঈপ্সিত সুযোগ! কেউ জানতে পারবে না, কেউ বাধা দিতে পারবে না—কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাজ সেরে সে আবার নিরাপদে ফিরে আসতে পারবে। মন্দ কি?

আজিজন বন্দুকটা নামাল।

আস্তে আস্তে সেটা পায়ের কাছে রেখে দিল। কোমরের তরবারিটাও

লাফানো-ডিঙোনোর পক্ষে বড় অসুবিধা—সেটাও খুলে রাখল। বুকের কাছে ছোরাখানা আছে—এছাড়া পিস্তলও একটা আছে বাঁ দিকের কোমরে গোঁজা। এই-ই যথেষ্ট। ও লোকটা তো, যত দূর দেখা যায়, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

আজিজন মার্জারীর মতই নিঃশব্দ লঘু পায়ে ওদিকের পরিখা থেকে উঠে এল। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে তেমনিভাবেই মাঝখানের পাঁচিল ডিঙিয়ে নেমে পড়ল এদিকের পরিখায়।

কিন্তু সেইখানেই একটা বিপদ বাধল।

কাছেই একটা নিমগাছ আছে। তার পাকা ফল ও শুকনো পাতা এসে পরিখার ভেতরে জড়ো হয়েছিল। সে ফলও কবে শুকিয়ে গিয়েছে—শুধু আছে তার অতি শুষ্ক বীজ।...আজিজনের পায়ে জুতো ছিল না, তবু সেই বীজ ও পাতার ওপর পা পড়ে অতি সামান্য একটু শব্দ হল।

সে শব্দ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোল্টনের কানে পৌঁছেছে। কিন্তু এই বিষম বিপদের দিনে, মরণের সঙ্গে নিত্য মুখোমুখি জীবন নিয়ে টানাটানি করার ফলে —সকলেই অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠেছে। বোল্টন তাই তার এত কাছে অপর কোন প্রাণীর অস্তিত্ব অনুভব করলেও বিচলিত হল না, এমন কি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবারও চেষ্টা করল না। আজিজনকে একবারও বুঝতে দিল না যে, শব্দটা তার কানে গিয়েছে। শুধু সব কটা ইন্দ্রিয়কে সজাগ ও প্রস্তুত রেখে সমস্ত স্নায়ু টান করে নিথরভাবে অপেক্ষা করতে লাগল।

তার এই নিশ্চলতার ভুল অর্থ বুঝল আজিজন। সে মুহূর্তকয়েক স্থির থেকে নিশ্চিন্তভাবে আবার পরিখা থেকে উঠে এল এবং একেবারে পেছনে এসে বুকের কাছ থেকে কিরিচখানা টেনে বার করল।

যত দূর সম্ভব নিঃশব্দে সমস্ত ঘটনাটা ঘটলেও বোল্টনের কানে সেই প্রায়নিঃশব্দ গতিবিধির শব্দটুকুও এড়ায় নি। সে প্রস্তুত হয়েই ছিল—এখন চোখের পলক ফেলবারও আগে, বলতে গেলে যথার্থ বিদ্যুৎবেগেই ঘুরে দাঁড়িয়ে এক হাতে আজিজনের হাতটা চেপে ধরল এবং কড়া রকমের একটা মোচড় দিয়ে অপর হাতে অনায়াসে ওর মুঠোর মধ্যে থেকে ছোরাখানা বার করে নিল।...

কিন্তু তার পরও সে চেঁচামেচি করল না। শত্রুকে এমন বেকায়দায় ফেলবার বাহাদুরি নিতে লোক ডাকাডাকিও শুরু করল না—শুধু কয়েদীর হাতখানা পূর্ববৎ বজ্রমুষ্টিতে ধরে রেখেই ঈষৎ কাছে টেনে ভাল করে তাকিয়ে রইল।

আজিজন প্রথম মুহূর্তকয়েক নিজেকে মুক্ত করে নেবার একটা প্রাণপণ প্রয়াস করেছিল, কিন্তু তার পরই বুঝল সে চেষ্টা অনর্থক। তখন সে আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে গেল এবং কোনরকম কাতরতা প্রকাশ তো করলই না, বরং মাথা উঁচু করে সোজা বোল্টনের চোখে চোখে চেয়ে রইল।...মৃত্যু শিয়রে রেখেই তো একাজে নেমেছে—এখন যদি সে এসে নিজের প্রাপ্য মিটিয়ে নিতে চায় তো বলবার কিছু নেই। বহু লোকের প্রাণ ও নিয়েছে, তখন ইতস্তত করে নি, আজ যদি দেবার মুহূর্ত এসে থাকে তো এখনও দ্বিধা রাখবে না। বীরাঙ্গনার ভূমিকায় নেমেছে—শেষ পর্যন্ত সেটাই বজায় রেখে যাবে। মিছামিছি অকারণ অনুনয়-বিনয়ে মরণের বাড়া অপমান সইতে পারবে না।...

অল্প কিছুকাল তার দিকে চেয়ে থেকেই বোল্টনের উগ্র ও হিংস্র দৃষ্টির জায়গায় অপরিসীম বিস্ময় ফুটে উঠল। সে শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বলল,

'আওরত !'

এবার আজিজন জবাব দিল। বিশুদ্ধ ইংরেজীতে বলল, 'হ্যাঁ, আমি স্ত্রীলোক। কিন্তু তাতে এত অবাক হচ্ছ কেন? মেয়েছেলে' হলেও তোমার কাছে কোন বিশেষ অনুগ্রহ চাইব না—ভয় নেই। এ অবস্থায় পুরুষশত্রুকে হাতে পেয়েও যেমন আচরণ করতে, আমার সঙ্গেও সেইরকম করবে—এইটেই আশা করি।'

আরও বিস্মিত হল বোলটন।

ভারতীয় নারীর মুখে সেযুগে এমন বিশুদ্ধ ইংরেজি প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বোলটনেরও মনে হল যে, তার চোখ অথবা কান—একটা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। সে আবারও ভাল করে দেখল। না, এইদেশীয় নারী—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সে আবারও তেমনি অর্ধ-বিহ্বল ভাবে বলল, 'কিন্তু কেন—কেন তুমি এই হিংস্রতার আবর্তে এমন করে এসে পড়েছ? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার তো এ স্থান নয়!'

যেন কতকটা অসহিষ্ণুভাবেই আজিজন উত্তর দিল, 'বার বার একই কথা তুলে লাভ কি?...যা করবার কর। আমি স্ত্রীলোক সে কথাটা ভুলে যেতে পারছ না কেন? আমি তো ভুলেছি!...যখন থেকে পুরুষের পোশাক পরেছি, হাতে অস্ত্র ধারণ করেছি, তখন থেকেই ও পরিচয়ের কথাটা ভুলে গেছি। প্রাণ নিতে ও দিতে তৈরী হয়েই নেমেছি এ কাজে।'

'কিন্তু কেন—কেন? এই অকারণ হানাহানির মধ্যে তোমরা মেয়েরা জড়িয়ে পড়বে কেন?'

আজিজনের কণ্ঠ তীক্ষ্ন হয়ে উঠল, 'কেন? জাতির যখন এই রকম জীবনমরণের প্রশ্ন ওঠে, তখন মেয়েরা শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তোমাদের দেশ হলে তোমাদের মেয়েরা কী করত? এমন ঘৃণিত বিদেশী বিধর্মী শত্রু এসে যদি তোমাদের দু পায়ে এমনি করে মাড়াতে চাইত?'

'সেক্ষেত্রে মেয়েরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসত। কিন্তু তাদের কর্মক্ষেত্র অন্যত্র। তারা সেবা করবে, অন্যভাবে সহায়তা করবে। এমন করে নিজের হাতে মানুষ মারা—ছিঃ!'

আজিজন ওষ্ঠের ভঙ্গিতে চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলল, 'তোমার কাছে নীতি-উপদেশ শোনবার আমার ইচ্ছে নেই—যা করবার তুমি কর।'

কিন্তু বোলটনের যেন কী একটা ভূতে পেয়েছে তখন। সে আজিজনের কথা কানেই তুলল না। আগের প্রসঙ্গের জের টেনে আবারও প্রশ্ন করল, 'যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ মারা সৈন্যের কাজ, তার মধ্যে অকারণ হিংস্রতা নেই। তুমি এমন করে পেছন থেকে চোরের মত আমাকে মারতে এসেছিলে কেন? আমি তো ব্যক্তিগতভাবে তোমার কোন অনিষ্ট করি নি?'

'আমি তোমাদের ঘৃণা করি। সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করি। এমন ঘৃণা বোধ হয় কেউ কখনও করে নি একটা জাতকে। তোমাদের আমি খোদার সৃষ্ট জীব বলে মনে করি না—তোমরা শয়তানের সৃষ্ট জীব। মানুষ সম্বন্ধে মানুষের যে বিবেচনা—তোমাদের বেলা তা খাটে না।'

সত্যই তার দু চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা যেন উপচে পড়ছে। চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও এত কাছ থেকে সেটুকু লক্ষ্য করতে কোন অসুবিধা

হল না।

বোল্‌টন আরও কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এমন ঘৃণা ব্যক্তিগত কারণ না থাকলে হয় না। বুঝতে পারছি আমাদের জাতের কোন লোক তোমার কোন চরম অপমান বা অনিষ্ট করেছে।...কিন্তু একটা কথার জবাব দিতে পার? একের অপরাধে সমস্ত জাতটাকে চিহ্নিত করবার দুর্বুদ্ধি তোমার কেন এল? সব জাতেই সবরকম মানুষ আছে।... তার জন্য তোমাদের সহজাত কোমলতা দয়া মায়া সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এমনভাবে মৃত্যুদূতের মত ঘুরে বেড়াবার কি কোন সার্থকতা আছে?'

'যদি থাকে!'...সর্পিণীর মত হিস্‌-হিস্‌ করে উত্তর দেয় আজিজন, 'যদি এমন অনিষ্টই আমার কেউ করে থাকে, যাতে আমার সমস্ত জীবন, ইহকাল পরকাল সব কিছু নষ্ট হয়ে যায়! যদি চরম সর্বনাশই করে থাকে কেউ! তার পরও কি এক জনের প্রতিশোধ সমস্ত জাতির ওপর দিয়ে নেওয়া অন্যায় বলবে?'

'হ্যাঁ, তবুও বলব।'...

বোল্‌টন আজিজনের হাতটা ছেড়ে দিয়ে তার শিথিল, প্রায়-অবশ হাতের মধ্যে ছোরাখানা আবার গুঁজে দিল। তার পর অদ্ভুত একরকম ভাবে তার দিকে চেয়ে বলল, 'বেশ, আমাকে মারতে এসেছিলে তো!...আমি এই বুক পেতে দিচ্ছি—পিঠে নয়, বুকেই মেরে চলে যাও। কেউ দেখবে না, বাধা দেবে না। আমি কথা দিচ্ছি, আমিও একটি শব্দ করব না।...কিন্তু শুধু এইটুকু অনুরোধ করছি, তোমার এই পাশবিক প্রতিহিংসা যেন এইখানেই শেষ হয়ে যায়। তোমার মনে যত গ্লানিই থাক্‌, আজ আমার রক্তে শেষ করে দাও। এমন করে তোমার নারীত্বকে হত্যা করে জাতের সমস্ত নারীর মর্যাদাকে বিড়ম্বিত ক'র না।...ভেবে দেখ, তোমরাও যদি আমাদের এই নীচতা, ক্ষুদ্রতা, হানাহানি, হত্যাকাণ্ডের মধ্যে নেমে আস তো মানুষের আশ্বাস বলতে যে এ জীবনে কিছুই থাকে না। তুমি শিক্ষিত, কেমন করে এদেশে এত উচ্চ শিক্ষা পেলে তা জানি না—তবে পেয়েছ, আমার কথাটা তুমি বুঝবে, আমার এই অনুরোধটা তুমি রাখ।'

বোল্‌টন সত্যি-সত্যিই তার কামিজের বোতাম খুলে বুকটা নগ্ন করে দাঁড়াল।

আজিজন যেন বহুক্ষণ অবধি তার কথাটা বুঝতেই পারল না—শুধু বিহ্বল ভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর ছোরাখানা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'শত্রুকে হাতে পেয়ে এ তোমার কী অভিনয়? তুমি কি তামাশা করতে চাইছ? আমি তোমার বন্দী, আমাকে মেরে ফেল, নইলে ধরিয়ে দাও তোমার দলের সান্ত্রীদের ডেকে।'

বোল্‌টন হাসল। বলল, 'কিছুই করব না। তুমি চলে যাও।... তোমাদেরই একজন পুরুষ, আর একজন নারী—দু-দু বার আমার প্রাণ রক্ষা করেছে। সে মহিলা বলতে গেলে অযাচিত ভাবেই আমাকে প্রাণভিক্ষা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ব্যবস্থাতেই আমি নিরাপদে এখানে এসে পৌঁছতে পেরেছি। তোমাকে মেরে বা ধরিয়ে দিয়ে সে ঋণ আমি শোধ দিতে চাই না। তুমি চলে যাও।'

বোল্‌টন তার দিকে একেবারে পেছন ফিরে দাঁড়াল...

আজিজনের এতক্ষণের উদ্ধত মাথা এবার বুঝি অবনত হয়ে আসে। সে

আরও কিছুক্ষণ বিহ্বল দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করে ছোরাখানা কুড়িয়ে নিল। তার পর সেখানা আবার খাপে পুরে যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে পাঁচিল ডিঙিয়ে ওধারের পরিখায় নেমে পড়ল।

॥ ৪৭ ॥

আজিজনের যেটুকু শক্তি তখনও অবশিষ্ট ছিল, নিরাপদে এপারে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সেটুকুও যেন একেবারে লোপ পেল। সে কোনমতে অবসন্নভাবে সেখানেই বসে পড়ল এবং বসেই রইল বহুকাল পর্যন্ত।

এমন অবস্থা আজিজনের আর কখনও হয় নি। সে যেন কিছু ভাবতেও পারছে না। মাথার মধ্যে সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হাঁটু দুটোয় কোন জোর নেই। কিন্তু সে তো শুধু দৈহিক অবসন্নতা। পায়ের নীচে মাটিও যেন সরে গেছে, দাঁড়াবার স্থানও আর নেই। মানসিক এতখানি অবসাদ এমন আর কখনও অনুভব করে নি। এতদিন যে স্থির লক্ষ্যে সে চলেছিল কোনদিকে না চেয়ে—আজ সেই লক্ষ্যটাই বুঝি গেছে হারিয়ে, দৃষ্টি আর কিছুতে সেখানে স্থির রাখা যাচ্ছে না। তা ছাড়া, ঘৃণার একটা অদ্ভুত নেশা আছে—সে নেশাতে মানুষ করতে পারে না এমন কাজই নেই। সেই নেশা ছুটে যাওয়ার ফলে আজ নিজেকে এত দুর্বল এত অসহায় বোধ হচ্ছে। মনের জোর যে নিঃসন্দিগ্ধতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রবল এক সংশয় এসে সেই জোরের ভিত্তিমূলকে দিয়েছে নাড়িয়ে। তবে কি এতদিন যা ভেবে এসেছে সবই ভুল ?…তা হলে নিজের এতদিনকার এই নারকীয় আচরণের এবং ঘৃণিত জীবনযাত্রার কোন কৈফিয়তই থাকে না যে !

কিন্তু এতকাল যাদের একান্তভাবে ঘৃণা করে এসেছে, কিছুক্ষণ-আগে-শোনা তাদেরই একজনের কথাটাও যে কিছুতে ভুলতে পারছে না সে ! কোথায় একটা সত্যের দৃঢ়তা ছিল সে কণ্ঠস্বরে, ছিল একটা অখণ্ডনীয় যুক্তির স্বচ্ছতা—তাকে তো সে অবহেলা করে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারছে না !…তবে কি সত্যিই তার কোন অধিকার ছিল না একের অপরাধে সমগ্র জাতিকে বিচার করবার বা কলঙ্কচিহ্নিত করবার ?…

ক্ষীণ একটা চেষ্টা করে আজিজন নিজেকে বোঝাবার। ওরা বিদেশী, বিধর্মী—আমাদের ওপর শাসন করবার কোন অধিকারই নেই ওদের। অন্যায় করে বিশ্বাসঘাতকতা করে এ রাজ্য ওরা নিয়েছে। ওদের সম্বন্ধে কোন সদ্‌যুক্তি বা সুবিবেচনা খাটে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিবেক বলে, 'তুমি বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, দেশের জন্যই কি তুমি এই কাজে নেমেছ ? শুরু করেছ এই মারণ-যজ্ঞ ?'

আবার ভেঙে পড়ে মন, সমস্ত দেহও যেন সেই সঙ্গে অবসাদে এলিয়ে পড়ে।

বহুক্ষণ সে সেইভাবেই বসে রইল—অসহায়, অবসন্ন অব্যবস্থিত ভাবে। দু-একবার কাছাকাছি পদশব্দ শোনা গেলেও সৌভাগ্যক্রমে একেবারে কাছে কেউ এল না। ইতিমধ্যে মেঘও কেটে গেছে। জল তো দূরের কথা, একটা আঁধিও ওঠে নি। যে ক্ষণিক দুরাশার মোহ এদের হত্যা-পিপাসাকে প্রশমিত রেখেছিল, সে মোহ আর নেই, আবার শুরু হয়েছে উভয়পক্ষে গোলা ও গুলিবর্ষণ। অর্থাৎ দু দিকেই জীবনযাত্রা দৈনন্দিন খাতে বইতে শুরু করেছে।

কিন্তু তবু আজিজন কিছুতেই যেন আর পূর্বের স্বাভাবিক সহজ ভাবটা ফিরে পায় না। বার কয়েক উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারে না। পা দুটোতে কিছুতেই যেন আর জোর পাওয়া যাচ্ছে না। মনটা সীসের মত ভারী হয়ে আছে—সেই সঙ্গে দেহটাও হয়ে উঠেছে দশমণী পাথর।...

আরও বহুক্ষণ এমনিভাবে বসে থেকে অনেক রাত্রে একসময় সে উঠে দাঁড়াল। সে যেখানে বসেছিল তার দশহাতের মধ্যেই একটা গোলা ফেটেছে। পরিখার বাঁক থাকায় আজিজনের তাতে আঘাত লাগে নি, কিন্তু শব্দ ও তাপটা লেগেছে। সেই শব্দই তাকে কতকটা প্রকৃতিস্থ ও সক্রিয় করে তুলল। সে উঠে আবার খানিকটা পরিখার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তার পর দৈহিক শৈথিল্য দূর করতেই যেন, নিজের বেশবাস অকারণেই টানাটানি করে আর-একটু দৃঢ়বদ্ধ করে নিল। তার পর ধীর মন্থর গতিতে পরিখার ভেতর দিয়ে-দিয়েই অবরোধের পেছনদিকে যেতে লাগল।

পথে পরিচিত বহু লোকের সঙ্গে দেখা হল। এমন কি স্বয়ং দুলগুঞ্জন সিং-এর সামনে পড়ে গেল। আর সকলকেই এড়িয়ে চলছিল, কিন্তু দুলগুঞ্জন তাকে দেখেই একেবারে অন্তরঙ্গভাবে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কি বিবিজান, আমার বকশিশটা এবার দিতে হবে যে, সেই দুপুর থেকে পাওনা হয়ে আছে। কিন্তু কোথায় লুকিয়েছিলে এতক্ষণ? তামাম জায়গা তোমাকে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি!'

খুব প্রবল একটা বাধা না দিয়ে আজিজন সুকৌশলে নিজেকে সেই বাহু-বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'একটু আসছি সিংজী, তবিয়তটা বড়ই খারাপ লাগছে। কোথাও গিয়ে অন্তত ঘণ্টা-দুই বিশ্রাম না নিলে আর দাঁড়াতে পারছি না।'

দুলগুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গেই সহানুভূতি ও সহৃদয়তায় পূর্ণ হয়ে উঠল। আন্তরিক ভাবেই বলল, 'আহা তা তো হবেই, এক দণ্ডও বোধ হয় বিশ্রাম নাও নি।...যাও, যাও, একটু আরাম করে নাও গে।'

সে পথ ছেড়ে দিল।

আজিজন অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশ দিয়েই চলছিল, তবু লোকজন একেবারে থাকবে না তা তো হতে পারে না। সুতরাং এখন আর একটু জোরে পা চালিয়ে একেবারে অবরোধের বাইরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে।...

পা দুটো এখনও বিদ্রোহ করছে। একটা ঘোড়া পেলে ভাল হত। কিন্তু ঘোড়া সংগ্রহ করতে হলেই আস্তাবলে যেতে হবে—আর সেখানে গেলেই সেই পরিচিত লোক ও পুরাতন গা-ঘিন-ঘিন-করা রসিকতার ফাঁদে পড়তে হবে। তার চেয়ে এমনিই ভাল।...

শহরের পথে পড়তেই সামনে একটা এক্কা পড়েছিল। কিন্তু তাকে দাঁড় করাতে গিয়ে মনে পড়ল—সঙ্গে একটাও পয়সা নেই। এই নতুন পোশাকটা পরবার সময় আগের কুর্তার জেব থেকে টাকা-পয়সা বের করে নেয় নি। কদিন কোন প্রয়োজনও ছিল না, কারণ তাকে ঋণী করতে সকলেই সদাসর্বদা ব্যস্ত, তাকে সর্বস্ব দিতে পারলেও তারা কৃতার্থ বোধ করে। যখনই যা দরকার—সামনে পরিচিত-অপরিচিত সিপাহী সেনানায়ক যার জেব্-এ খুশি হাত ঢুকিয়ে বার করে নিলেই হল। কিন্তু অন্তত দুটি কথা না বলে পয়সা নেওয়া যায় না। এখন আর কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে হল না।

তা ছাড়া, তা হলে আবার ব্যারাকে ফিরে যেতে হয়, তাতে সে নারাজ। সুতরাং যানবাহনের আশা ছেড়ে দিয়ে সে স্খলিত মন্থরগতিতে প্রাসাদের দিকে হেঁটেই চলল।

•

আমিনা সেদিনও উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় ছাদে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না—মধ্যে মধ্যে গুলি-গোলার অগ্নিস্ফুরণ চোখে পড়ে মাত্র। তাতে অসহিষ্ণুতা বাড়েই শুধু।

কিছুই হচ্ছে না। তার আশা মিটছে না কিছুতেই। প্রতিদিনই প্রভাতে আশা জাগে—আজ শত্রুপক্ষ হার মানবে। অথবা এরাই বিজয়ী হয়ে ওখানে প্রবেশ করবে। কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মনটা আবার হতাশায় ভেঙে পড়ে।

তবে কি শেষ পর্যন্ত আশা মিটবে না কোনদিনই?

না না, তা হতে পারে না।

তার জীবন থাকতে আশা ছাড়বে না। একার চেষ্টায় এত বড় আগুন জ্বালতে পেরেছে সে যখন, তখন শেষ পর্যন্ত তার আশাও সফল হবে।

দ্বিধা ও উৎকণ্ঠায়, আশা ও হতাশায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে সে অবিরাম, অনুক্ষণ।...

দাসী এসে সংবাদ দিল—আজিজন বিবি এসেছে, ছাদেই আসছে।

সাগ্রহে-কৌতূহলে একরকম দৌড়েই ছাদের সিঁড়ির কাছে এগিয়ে আসে সে।

'কি রে আজিজন? ভাল খবর আছে কিছু?'

সে আজিজনকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে।

আজিজন নিঃশব্দে নিজেকে ওর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিয়ে অবসন্নভাবে ছাদের ওপরই বসে পড়ল—ধুলো ও বহুদিনের জড়ো-হওয়া শুকনো নিমপাতার ওপরই।

'কী হল রে। শরীর খারাপ লাগছে?'

উৎকণ্ঠিত হয়ে আমিনাও তার পাশে বসে।

'একটু জল!' সংক্ষেপে শুধু বলে আজিজন।

আমিনা ব্যস্ত হয়ে মুসম্মৎকে ডেকে শরবত আনায়। পূর্ণপাত্র শরবত পান করে আজিজন একটু সুস্থ হলে, আমিনা আবারও সাগ্রহে প্রশ্ন করে, 'কী ব্যাপার? খবর আছে কিছু? ওরা হার মেনেছে?'

আজিজন চোখ বুজেই বসেছিল। এবার চোখ খুলে একটু হাসল। শ্রান্ত অবসন্ন মুখের সে ম্লান হাসি মুখখানাকে যেন কথার চেয়েও বিকৃত করে তুলল।

তার পর ধীরে ধীরে সে বলল, 'ওরা হার মানে নি রে। বরং আমিই হার মেনেছি!'

'তার মানে?' তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে আমিনার কণ্ঠস্বর।

'সত্যিই আমি হার মেনেছি!...আমিনা, এ আমাদের কাজ নয়। আগাগোড়াই ভুল হয়েছে বোধ হয় আমাদের।'

'এ কি বলছিস তুই! কী হয়েছে? কোন চোট-টোট লেগেছে বুঝি? সেই চোটে মাথা খারাপ হয়ে গেছে না কি?'

আজিজনের দুটো কাধ ধরে সে সজোরে ঝাঁকানি দিতে লাগল।

'না রে। হ্যাঁ.—চোট লেগেছে, তবে সে মনে।...আজ এক ইংরেজের

কাছেই চোট খেয়েছি আবার।…

'কী রকম? কী রকম? তবু ছেড়ে দিলি তাকে, না শেষ করেছিস?'

পাগলের মত অসংলগ্ন ভাবে প্রশ্ন করে আমিনা। এতদিনের সমস্ত ধৈর্য ও প্রশান্তি যেন তার ফুরিয়ে গিয়েছে।

'না, পারি নি। সে বুক খুলে দিয়েই দাঁড়িয়েছিল, তবু পারি নি।'

'তার মানে? তার মানে কি? কী হয়েছিল আমাকে বল্‌!'

'না থাক্‌ বহিন। জীবনে এত বড় পরাজয় বোধ হয় আর কখনও হয় নি। সে অপমানের কথা মুখে না-ই বললাম। তবে আমি মন স্থির করে ফেলেছি। এর মধ্যে আর থাকব না। তোমাকেও সেই কথাই বলতে এসেছি। এ তোমার আমার কাজ নয়—এখনও এ থেকে সরে দাঁড়াও।'

'আমি একদিন খোয়াব দেখেছিলাম—তাতে তুই আমাকে তিরস্কার করেছিলি। আজ তোর মুখে এ সব কী কথা!…অতিরিক্ত উত্তেজনা ও পরিশ্রমেই তোর মাথা গোলমাল হয়ে গেছে। বরং দুটো দিন বিশ্রাম কর্‌ তুই—'

'হ্যাঁ, বিশ্রামই করব, কিন্তু এখানে নয়।' আজিজন একেবারে উঠে দাঁড়ায়, 'কোথায় যাব তা জানি না। দূরে বহু দূরে কোথাও। যদি এখনও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা সম্ভব হয় তবে তাই-ই করব। নির্জনে গিয়ে খোদার কাছে আরজি জানাব—তিনি যেন সেই পথই দেখিয়ে দেন। আর আজ তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাই, তুমিও যেন তোমার ভুল বুঝতে পার। আমাদের এ পথ নয় দিদি।'

আজিজন আমিনার মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ছাদ থেকে নেমে গেল। তার মুখে কী একটা ছিল—সুগভীর আত্মগ্লানি, অনুশোচনা অথবা দৃঢ় সংকল্প—আমিনা আর তাকে বাধা দিতে পারল না।

আজিজন সেই যে অন্ধকার রাত্রে নানার নতুন প্রাসাদ থেকে নেমে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, আর তার কোন সংবাদই এরা পেল না। যেন বাইরের অন্ধকার এবং বিপুল জনারণ্য তাকে গ্রাস করল।…

আমিনা ইহজীবনে আর তার দেখা পায় নি। তার এই অদ্ভুত পরিবর্তনের ইতিহাসটাও জানতে পারে নি।

॥ ৪৮ ॥

আজিজন চলে যাওয়ার পর আমিনা বহুক্ষণ পর্যন্ত সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরের এই অচঞ্চল অবস্থার ঠিক বিপরীত তার মনের ভেতরটা। সেখানে প্রলয়ংকর এক ঝড় উঠেছে। নতুন করে জ্বলেছে এক ভয়ঙ্কর রোষবহ্নি। তার দিক্‌দাহকারী জ্বালা আজ সারা জগৎ-সংসারটাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলতে চায়। আজিজনের এই পরাজয় ও ব্যর্থতা ইংরেজের বিরুদ্ধে আমিনার বিদ্বেষকেও যেন নতুন ইন্ধনে নবতর তেজে জ্বালিয়ে তুলেছে।

প্রায় একদণ্ডকাল সেইভাবে একেবারে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকে অস্ফুটকণ্ঠে আপন মনেই শুধু বলল, 'আচ্ছা, আমি একাই দেখছি।'

তার নিজের অন্তরের এই আশ্বাসটাই যেন নিমেষে তার সকল জড়তা কাটিয়ে তাকে শুধু সক্রিয় নয়—চঞ্চল ও অস্থির করে তুলল। সে প্রায় ছুটে নীচে নেমে এল এবং উদ্‌ভ্রান্তের মতই সামনে যাকে পেল ধরে প্রশ্ন করল, 'পেশোয়া—পেশোয়া কোথায় রে?'

সৌভাগ্যক্রমে সে লোকটি গণপৎ।' পেশোয়ারই কী একটা কাজে যাচ্ছিল। কাজেই তাঁর খবরটা ঠিকঠিকই জানা ছিল তার জবাব দিল, 'মহামান্য পেশোয়াজী তাঁর খাস কামরাতেই আছেন।'

'আর কেউ আছে সেখানে?'

'হ্যাঁ, পণ্ডিতজী।'

পণ্ডিতজী, অর্থাৎ তাত্যা টোপী।

'ঠিক আছে। তুমি যাও।'

আজকাল নানা ধুন্ধুপন্থ স্বাধীন নৃপতির চালচলনই অভ্যাস করছেন, সুতরাং বিনা এত্তেলায় খাস কামরায় প্রবেশ করা উচিত নয়। কথাটা আমিনারও জানা ছিল, কিন্তু তার তখন এসব ছেলেখেলাতে সময় নষ্ট করার মত মনের অবস্থা নয়। সে অসহিষ্ণুভাবে কপাটে সামান্য একটা টোকা দিয়েই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

নানা ও তাত্যা দু জনেই যৎপরোনাস্তি চিন্তাকুল ও উদ্বিগ্ন মুখে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ পেয়ে প্রথমটা দু জনেই ভ্রূকুটি করে তাকালেন। কিন্তু আমিনাকে দেখে দু জনেরই মুখভাব প্রসন্ন হয়ে উঠল। আমিনা যে সামান্য স্ত্রীলোক নয়, সে পরিচয় এতদিনে তাত্যাও পেয়েছেন। তিনিও এখন এই মহিলার বুদ্ধি নিতে অপমান বোধ করেন না।

নানা খুশি হয়ে বললেন, 'এসো এসো হুসেনী, ব'স। একটা পরামর্শ-টরামর্শ দাও—আর তো পারা যাচ্ছে না! এইখানে এই কটা লোকের জন্যে কত শক্তিক্ষয় আর অর্থনাশ করব তা তো বুঝছি না!'

আমিনা একটা চৌকি টেনে বসে পড়ল। কদিনের অনাহার ও অনিয়ম প্রকৃতির ও মানবশরীরের দুর্লঙ্ঘ্য আইনে তাকে অনেকখানিই দুর্বল করে ফেলেছে। তার ওপর গত এক ঘণ্টার মানসিক উত্তেজনাও কম নয়। ফলে এতখানি ছুটে এসে তার পা দুটো থর থর করে কাঁপছে। দাঁড়িয়ে থাকবার মত অবস্থা নয়।

কিন্তু তুচ্ছ দৈহিক অসুবিধার দিকে তাকাবার তার অবসর কৈ? সে বসে পড়ে বিনা ভূমিকাতেই বলল, 'গ্রীনওয়ে সাহেবের মেম আমাদের এখানে কয়েদ আছে না?'

'হ্যাঁ আছেন, কেন বল তো? তাঁকে তো তোমারই পরামর্শে বাঁচিয়ে রাখা হল!'

'ঠিকই হয়েছে। এখন তাকেই পাঠান আমাদের তরফ থেকে—হুইলারের কাছে। হুইলারকে বলে পাঠান যে, তারা যদি এখন এলাহাবাদে চলে যেতে চায় তো তাদের সমস্ত সুবিধা করে দেওয়া হবে—মায় মালপত্র যার যা আছে, তাও নিয়ে যেতে পারবে। কেবল অস্ত্রশস্ত্র আর টাকাকড়ি আমাদের দিয়ে যেতে হবে।'

দু জনেই কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল, কথাটার বাচ্যার্থই তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হয় নি। অবশেষে যেন কতকটা বিহ্বল-ভাবেই টোপী বললেন, 'মিসেস গ্রীনওয়ে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তার কথাই বলছি!' কতকটা অসহিষ্ণুভাবেই জবাব দেয় আমিনা।

'কিন্তু গ্রীনওয়ের মেম আমাদের হয়ে বলবেই বা কেন, আর হুইলারই বা

ওর কথা শুনবে কেন ?' নানা তখনও হতভম্বভাবে প্রশ্ন করেন।

আমিনা অধৈর্য দমন করতে নিজের ঠোঁট নিজেই কামড়ে ধরল। তার পর বয়স্থ অভিভাবক যেভাবে অবোধ বালকদের সঙ্গে কথা বলে, সেইভাবেই উত্তর দিল, 'গ্রীনওয়ের মেম যাবে এই জন্যে যে, এই কাজ ঠিকমত করতে পারলে তবেই সে মুক্তি পাবে—তা নইলে তার মৃত্যু অবধারিত। আর হুইলার যদি কারুর কথা শোনে তো তার পরিচিত স্বদেশীয় মানুষের কথাই শুনবে। ওরা এখন লড়ছে কতকটা মরীয়া হয়ে। না লড়লেও মরবে, কিন্তু সে মৃত্যুতে অপমান। এতে অপমান নেই। আর হয়তো শেষ পর্যন্ত দু-এক জন বাঁচতেও পারে—এ আশাও আছে, তাই লড়ছে। কিন্তু ওদের বুকের বল কমে এসেছে, কমতে বাধ্য। এখন যদি নিরাপদে চলে যেতে পায় তো এক মুহূর্তও ইতস্তত করবে না বলেই আমার বিশ্বাস।…মিসেস গ্রীনওয়েকে ডেকে পাঠান। তাকে বুঝিয়ে দিন যে, এ কাজ যদি সে করে তবেই তার বাঁচবার আশা থাকবে, নইলে ভয়ঙ্কর অপমানকর মৃত্যু আছে তার অদৃষ্টে।'

তবু কিন্তু নানা ও তাত্যা দু জনেই সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে বসে রইলেন। খানিকটা পরে তাত্যা ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'ওদের যদি নিরাপদে ফিরে যেতেই দেবেন বেগমসাহেবা, তা হলে এতদিন ধরে এত কাণ্ড করবার কী প্রয়োজন ছিল ?'

আমিনার মুখে এতক্ষণ পরে একটু হাসি দেখা দিল। অদ্ভুত বিচিত্র হাসি! বলল, 'এত কাণ্ড করা হয়েছে বলেই হয়তো এবার ওরা খুব সহজে কাশী কি এলাহাবাদে চলে যেতে রাজী হবে। এখন হয়তো কোনমতে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়াকেই সৌভাগ্য বলে মনে করবে। তা নইলে ঐ কটা লোকের জন্যে শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রাণ নিয়ে পালাতে হত। আর দুটো দিন সময় পেলেও ওরা ভারী কামান আর টাকাগুলো ছিনিয়ে নিতে পারত, আর তা হলে বুঝতেই পারছেন—ভাগ্যের চাকা কোন্ দিকে ঘুরত।'

তার পর চৌকি ছেড়ে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে যেন রাজেন্দ্রাণীর মত ভঙ্গিতে বলল, 'তার পর, ওরা ফিরে যাবে কিনা সেটা বিবেচনা করারও ঢের সময় আছে টোপীজী। আগে যা বললুম, তাই করুন। খবর তো আপনিও পেয়েছেন, জেনারেল নীল এলাহাবাদ পর্যন্ত এসে পৌঁছে গেছে। আজ হোক, কাল হোক—মুখোমুখি লড়াইএ নামতেই হবে। সেজন্যে যদি প্রস্তুত হতে হয়—এই সামান্য শত্রুকে নিয়ে ব্যস্ত কি বিব্রত থাকলে চলবে ?'

দরজায় টোকার শব্দ হল। সামান্য শব্দ নয়—বেশ জোরেই।

'কে ?' টোপী প্রশ্ন করলেন, 'কী চাই ?'

নিঃশব্দে কপাট ঠেলে ঘরে ঢুকল মুসম্মৎ। তার পর আমিনার দিকে ফিরে তার বক্তব্য জানাল, 'মৌলবীজী এইমাত্র এসে পৌঁচেছেন। তিনি আপনার সঙ্গে এখনই দেখা করতে চান।'

'চল্ আমি যাচ্ছি।' আমিনা নানার দিকে না ফিরে কোন প্রকার সম্ভাষণ-মাত্রও না জানিয়ে ব্যস্তভাবে বার হয়ে গেল।

'মৌলবীজী ?' নানা ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন করলেন।

'মৌলবী আমেদউল্লা—ফৈজাবাদের। কিন্তু—কিন্তু তাঁকে যে আমারও প্রয়োজন!'

তাত্যা টোপী উঠে দাঁড়ালেন।

'তা হলে হুসেনীর কথাটা তোমার কেমন মনে হচ্ছে?' নানা কতকটা ছেলেমানুষের মতই প্রশ্ন করেন।

'কথাটা শোনাই দরকার—আর এখনই শোনা দরকার। বেগমসাহেবা তো বাজে কথা বলেন না—তাঁর যুক্তিও অকাট্য।......আমাদের এ ঝখেড়া এখনই মিটিয়ে ফেলা প্রয়োজন পেশোয়া।'

'তা হলে তুমিই মিসেস গ্রীনওয়ের সঙ্গে দেখা কর। কাল সকালেই যদি ওঁকে পাঠাতে পার সেই চেষ্টা দেখ।'

'দেখছি।' সংক্ষেপে এইটুকু বলেই টোপী বের হয়ে যাচ্ছিলেন। নানা পেছন থেকে ডেকে বসলেন, 'মেম রাজী হয় কিনা আমাকে এখনই জানিয়ে যেও, বুঝলে?'

টোপী নীরবে মাত্র একবার মাথা হেলিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, মনিবের নির্দেশ তিনি বুঝতে পেরেছেন। তারপর একটা নমস্কারের ভঙ্গি করে তিনিও বার হয়ে গেলেন।

নানা একাই তেমনিভাবে বসে রইলেন। তাঁর মুখ দেখে তখন মনে হচ্ছিল যে পেশোয়াগিরির সাধ যেন ইতিমধ্যেই তাঁর অনেকটা কমে গিয়েছে। তিনি নিজেকে বড়ই অসহায় ও নিঃসঙ্গ বোধ করতে শুরু করেছেন।

বাইরে রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু প্রাসাদের বাইরে যতটা দৃষ্টি যায়, পথ-প্রান্তর আদৌ জনবিরল হয় নি। চারদিকেই উত্তেজনা—চারদিকেই কোলাহল।

কিন্তু এর ভেতর কর্মব্যস্ততা কৈ—যথার্থ কর্মব্যস্ততা?

নানাসাহেব উঠে এসে জানালার ধারে দাঁড়ালেন। দোকানগুলির আলোতে ও মশালে এত দূরে থেকে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু তাঁর মনে হল, বোধ করি এই প্রথম, এরা কেউই পেশোয়ার সিংহাসন রচনার জন্য ব্যস্ত নয়—দেশের জন্য এদের কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই, এমন কি ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষও এদের এত রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রেখেছে কিনা সন্দেহ! কৌতূহল তামাশা দেখবার আগ্রহ, আর সর্বোপরি ব্যক্তিগত লোভই এদের মুখচোখে প্রকট। এই গোলমালের সুযোগে সকলেই নিজেদের কিছু সুবিধা করে নেবার জন্য ব্যগ্র।

এইখানে—এদের মধ্যে তিনি রাজগীর স্বপ্ন দেখছেন!

দূরে মধ্যে মধ্যে কামানের শব্দ হচ্ছে—বন্দুক ছোঁড়ার শব্দের তো বিরাম নেই। কদিন আগে হলেও স্বচ্ছন্দে একেই যুদ্ধ বলে কল্পনা করতে পারতেন। কিন্তু আজ যেন সমস্তটাই অত্যন্ত অরুচিকর ও ছেলেখেলা বলে বোধ হল।

এ সময় আজিমুল্লাটাও যদি কাছে থাকত! কোথায় কোথায় যে সে ঘুরছে!

রুমালের অভাবে জামার হাতাতেই কপালের ঘাম মুছে নানা আবারও এসে বিছানায় বসে পড়লেন।

॥ ৪৯ ॥

অনেক দিন পরে পরিখার অপর পার থেকে এক জন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে আসতে দেখে নাচারগড়ের অধিবাসীরা প্রথমটা চোখকে বিশ্বাস করতে পারে নি। বিশেষত সে মহিলা আবার সন্ধির শ্বেত-পতাকা উড়িয়ে আসছেন—অর্থাৎ সিপাহীদের দলের লোক!

তবু শ্বেত-পতাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। যে দিক দিয়ে, যে পক্ষের

তরফ থেকেই আসুক—স্বদেশিনীর ওপর নির্বিচারে কেউ গুলি চালাত না এটা ঠিক। এখন সকলেই অস্ত্র নামিয়ে সাগ্রহে ভিড় করে এসে দাঁড়াল। স্বয়ং হুইলার সাহেবও বেরিয়ে এলেন তাঁর অফিসঘর থেকে।

বিস্ময় এমনি যতটাই হোক দূতী কাছে আসতেই তা আরও বাড়ল। মিসেস গ্রীনওয়ে! গ্রীনওয়ে সাহেব সিপাহীদের এতটা স্পর্ধা হবে তা শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করেন নি, আর শেষ পর্যন্ত সে নির্বুদ্ধিতার মূল্য দিয়েছেন নিহত হয়ে—এই কথাই শোনা ছিল সকলের। মিসেস গ্রীনওয়ে তা হলে বেঁচে আছেন! শুধু বেঁচে নেই, অপর পক্ষের হয়ে কাজ করছেন! হুইলারের ললাটে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল।

কিন্তু গ্রীনওয়ের মেম এপারে আসতে সকল সন্দেহ ঘুচে গেল। তাঁর সমস্ত পরিবারই সম্ভবত নিহত হয়েছে, কেবল জনাকয়েককে আগেই তিনি সরিয়ে নিয়েছিলেন, হয়তো তারা বেঁচে আছে, হয়তো বা নেই—তিনি অন্তত কোন খবরই রাখেন না। তিনিও নিহত হতেন, নানাসাহেবের অন্যতম রক্ষিতার পরামর্শে-ই নাকি তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েছে—আর সেই প্রাণরক্ষার খাতিরেই আজ তাঁকে ঘৃণিত শত্রুপক্ষের তরফ থেকে দূতীরূপে আসতে হয়েছে। অবশ্য প্রাণের আর এতটা মায়া তিনি করেন না এটাও ঠিক,—তিনি স্বচ্ছন্দেই মরতে পারতেন, কিন্তু তাঁর দেশবাসী যদি দু-এক জনও তাঁর দ্বারা রক্ষা পায় তো সে-ই জীবনের মত তাঁর শেষ সান্ত্বনা! সেই কারণেই তিনি ওদের প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন।

সার হিউ হুইলার মিসেস গ্রীনওয়ের বক্তব্যটা নিঃশব্দে ধীর ভাবে বসে শুনছিলেন—নানার প্রস্তাব ও মিসেস গ্রীনওয়ের নিজের স-রোদন কাহিনী—সমস্তই। সব বলা শেষ হলে আরও কিছুক্ষণ তেমনি স্থিরভাবে বসে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার কি মনে হয়—নানার এ প্রস্তাব আন্তরিক? শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো?'

মিসেস গ্রীনওয়ে দু কাঁধের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে বললেন, 'তা বলা শক্ত। ওদের আমি আর কোনদিনই বিশ্বাস করতে পারব না। তবে একটা জিনিস আমি জেনেছি যে, ওরাও এবার বিব্রত হয়ে পড়েছে আপনাদের নিয়ে। ওরা ভেবেছিল, খুব সহজেই আপনাদের শেষ করতে পারবে, তা নইলে বোধ হয় এ চেষ্টাও করত না। এখন ওদের হয়েছে কতকটা মানের কান্না। তা ছাড়া, শুনেছি ব্রিটিশ ফৌজ এলাহাবাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তা যদি হয় তো শীগগিরই আসল লড়াই শুরু হয়ে যাবে। তখন আপনাদের নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। হয়তো সেজন্যেও কথার ঠিক রাখতে পারে।'

হুইলার চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সহকর্মীদের দিকে তাকালেন।

'আপনারা কী বলেন?'

কর্নেল এওয়ার্ট ঘাড় নাড়লেন, 'না, এদের আমি একটুও আর বিশ্বাস করি না জেনারেল।...বেশির ভাগই তো গেছে—না হয় আমরাও যাব। লড়াই করতে করতে মরার গৌরব আছে সার হিউ।...যদি শেষ পর্যন্ত নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিরস্ত্র মরতে হয়, তার চেয়ে লজ্জার কথা বোধ হয় আর কিছু নেই!'

'আর তা ছাড়া', মেজর ভাইবার্ট বললেন, 'যদি সত্যিই ব্রিটিশ ফৌজ এলাহাবাদ পৌঁছে থাকে তো আমাদের মুক্তিরও তো বেশী দেরি নেই।—এমন

কি তারা এখানে পেঁছিবার আগেই হয়তো এরা আমাদের ছাড়তে বাধ্য হবে।'

'কিন্তু', স্যর হিউ কতকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে বললেন, 'কিন্তু এখানে থেকেই হয়তো দু-এক দিন পরে নিরন্ন মরতে হবে কর্নেল এওয়ার্ট!...আপনি তো জানেন, টোটা নিঃশেষ, কামানে দেবার মত বারুদ আর কয়েক পাউন্ড বোধ হয় অবশিষ্ট আছে, খাবার সিকির সিকি মাত্র রেশন করেছি, তা-ও অতিকষ্টে আর দুটি দিন মোটে চলবে। এক্ষেত্রে নানার প্রস্তাবে রাজী হলে একটা স্পোর্টিং-চান্স তবু থাকে সসম্মানে বাঁচবার। ওরা যেদিন দেখবে আমাদের দিকের কামান বন্দুক নীরব, সেই দিনই কি এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে না আমাদের ওপর ? আর সেদিন কি কুকুর-বেড়ালের মতই মরতে হবে না ?'

এওয়ার্ট অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'যাদের অবিশ্বাস করা উচিত ছিল তাদের আমরা বিশ্বাস করে ঠকেছি, যাদের বিশ্বাস করা চলতে পারত তাদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারি নি—ফলে তাদের চোখেই আমরা চিরকালের মত বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত হয়ে গেছি।...আমরা আগাগোড়াই নির্বোধের মত কাজ করে যাচ্ছি জেনারেল।...আর বোধ হয় ওসব চেষ্টা না করাই ভাল।...আর লড়াই চালিয়ে যেতে না পারি, বন্দুকের শেষ গুলি শেষ হবার আগে সেটা নিজেদের বুকেও তো চালাতে পারি আমরা!'

জেনারেল হুইলারের মুখ অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি দাঁতে দত চেপে বললেন, 'আগাগোড়াই যখন নির্বুদ্ধিতা করে যাচ্ছি, তখন শেষ পর্যন্তও না হয় তা-ই করলাম। আপনি ফিরে যান মিসেস গ্রীনওয়ে, বলুন তাঁদের প্রস্তাবে আমরা মোটামুটি রাজী আছি। তাঁদের শর্ত পাঠাতে বলুন, আর তাঁদের সততার কি জামিন থাকবে তাও জানাতে বলুন। আমাদের এলাহাবাদ রওনা হবার ব্যবস্থাও তাঁদের করে দিতে হবে।'

মিসেস গ্রীনওয়ে বললেন, 'হ্যাঁ তা তাঁরা ঠিক করে দেবেন, খাবার-দাবার কোন কিছুরই নাকি অসুবিধা হবে না।'

'ঠিক আছে। আমাদের আর কিছু বক্তব্য নেই।'

মিসেস গ্রীনওয়ে উঠে দাঁড়ালেন। যে কজন ইংরেজ অফিসার তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মুখের দিকে কেমন একরকম অসহায় ভাবে তাকালেন, যেন জেনারেলের এই সিদ্ধান্ত তিনি আশা করেন নি, তাঁর মনের মতও হয় নি—বরং অন্য উত্তর পেলেই তিনি সুখী হতেন। কিন্তু যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মুখ পাথরের মতই ভাবলেশহীন। সে মুখের দিকে চেয়ে অন্তরের ভাব বোঝবার উপায় মাত্র নেই। মিসেস গ্রীনওয়ের মনে পড়ল যে, এই লোকগুলির অধিকাংশই সৈনিক—উপরওয়ালার আদেশ নির্বিচারে পালন করাই অভ্যস্ত। প্রতিবাদ করা, এমন কি নিজেদের মতামত জানাতে যাওয়াও এদের এলাকার বাইরে।...ধীরে ধীরে বিহ্বল চোখ দুটি আবার হুইলারের মুখে ফিরিয়ে এনে মিসেস গ্রীনওয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা হলে চললাম আমি। সুপ্রভাত!'

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মূর। তিনি মিসেস গ্রীনওয়ের অনুগমন করতে করতে বললেন, 'আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, আতিথেয়তা করার মত কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এক কাপ চাও আপনাকে দিতে পারলাম না।'

মিসেস গ্রীনওয়ে মূরের মুখের দিকে চেয়ে কেমন একপ্রকার স্খলিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আতিথেয়তা! আপনারা আমাকে গুলি করে মারলেই খুশী

হতাম। আমি বড়ই কাপুরুষ, নিজের হাতে মরবার সাহস হল না কিছুতেই, নইলে তা-ই হয়তো উচিত ছিল।'

পরিখার অপর পারে মিসেস গ্রীনওয়ের ডুলি দাঁড়িয়ে ছিল। মনু সযত্নে হাত ধরে তাঁকে পাঁচিলটা পার করে দিলেন।

মিসেস গ্রীনওয়ে প্রাসাদে ফিরে আসতে তাঁকে সোজা পেশোয়ার দরবারগৃহে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সকলেই উপস্থিত ছিলেন—পেশোয়া স্বয়ং, তা ছাড়া আমিনা, আজিমুল্লা, তাত্যা, টীকা সিং—মায় নবাগত মৌলবী সাহেব পর্যন্ত। সকলে সাগ্রহে তাঁরই অপেক্ষা করছিলেন।

দূতী কী সংবাদ নিয়ে ফিরল তা শোনবার জন্য সকলেই যেন এতক্ষণ নিশ্বাস রোধ করে বসে ছিলেন। মিসেস গ্রীনওয়ের বক্তব্য শেষ হতে এবার তাঁরা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। নানাসাহেব খুশি চাপতে না পেরে একেবারে বলে বসলেন, 'যান মিসেস গ্রীনওয়ে, চুক্তির আপনার দিকটা আপনি ঠিক ঠিক পালন করেছেন, কাজ সফলও করেছেন—এবার আপনি মুক্ত।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আমিনা তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'কিন্তু মুক্তি নিয়ে উনি যাবেন কোথায়? শহরের পথে বেরুলে কি উনি এক মিনিটও বাঁচবেন?'

নানা উদার ভাবে বললেন, 'বেশ, উনিই বলুন কী ভাবে কোথায় ওঁকে পৌঁছে দিলে উনি খুশী হবেন—আমরা তাই দিচ্ছি।'

মিসেস গ্রীনওয়ের উত্তর দেবার আগেই আমিনা বলল, 'উনি বরং গ্যারিসনের লোকদের সঙ্গে এলাহাবাদেই চলে যান না।'

যেন কী একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে শিউরে উঠে মিসেস গ্রীনওয়ে বললেন, 'না, না!'

'তবে কোথায় আপনি যেতে চান?' নানা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'আমাকে বরং বিঠুরে পাঠিয়ে দিন—রানীমাদের কাছে। তার পর আমি সুযোগ বুঝে ওখান থেকে চলে যেতে পারব। শুধু এই হুকুম দিয়ে দিন।'

নানার ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিল। কিছু দিন ধরেই স্বর্গত বাজীরাওএর বিধবাদের সঙ্গে তাঁর মনান্তর চলছে। এই স্ত্রীলোক দুটির ষড়যন্ত্রে উত্যক্ত হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁদের একরকম নজরবন্দী করতেই বাধ্য হয়েছেন। তবু বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। মংগরকর, তুমি তো শুনলে সব, তুমি নিজে সঙ্গে করে ওঁকে বিঠুরে পৌঁছে দাও, আর আমাদের হুকুম জানিয়ে দাও যে,—যেদিন খুশি, যখন খুশি উনি চলে যেতে পারবেন।'

তার পর—অর্থাৎ মিসেস গ্রীনওয়েকে নিয়ে মংগরকর বেরিয়ে গেলে নানা-সাহেব উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তার পর?'

তাত্যাই যেন সকলের হয়ে জবাব দিলেন, 'তার পর আর কি! আজিমুল্লা চলে যান, ওদের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে ফেলুন গে—বলুন যে ওদের কামান বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্র আর টাকাকড়ি যা ওখানে আছে, সব আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে এখনই। যদি বিশ্বাস করতে না পারে তো আমরা বরং আমাদের মধ্যে থেকে দু জন বিশিষ্ট লোককে ওদের ওখানে জামিন রাখতে রাজী আছি। কিন্তু ওদের একেবারে নিরস্ত্র করতে না পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারব না। আজিমুল্লার সঙ্গে টীকা সিংও যান বরং, আমি ততক্ষণ নৌকো ভাড়া করার চেষ্টা করি। অনেকগুলোই লাগবে বোধ হয়।'

আমিনা এতক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে ছিল। সে যেন এই সব ছেলেমানুষি উল্লাসে এদের বুদ্ধি সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে—তার মুখভাবটা অন্তত সেই রকমই। সে এবার কথা বলল, 'আজিমুল্লা খাঁ চেষ্টা করুন, যাতে ওরা কালই যেতে রাজী হয়।···আপনিও পণ্ডিতজী সেইভাবেই নৌকোর ব্যবস্থা রাখুন। হ্যাঁ, ভাড়া করবেন না, একেবারে কিনে নিন।'

'কিনে নেব? কেন বলুন তো?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন তাত্যা টোপী, 'মিছিমিছি কতকগুলো টাকা বেশী খরচ করবার দরকার কি? এমনিই তো বজরা দরকার-মত সব পাওয়া যাবে না, ডিঙি নৌকো ছাইয়ে নিতে হবে। তাতেই অনেক বাড়তি খরচ হয়ে যাবে।'

আমিনা তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'নৌকোগুলো কি তা হলে শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই এলাহাবাদে পেঁছিবে—আপনারা কি সেই বন্দোবস্তই করছেন নাকি?'

অকস্মাৎ যেন ঘরের মধ্যেই বজ্রপাত হল।

কিছুক্ষণ সকলেই স্তম্ভিত এবং হতবাক হয়ে আমিনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে নানাসাহেব বললেন, 'তা—তার মানে?'

আমিনারও এবার বিস্মিত হবার পালা। সে বলল, 'আপনারা কি ওদের সত্যি-সত্যিই ছেড়ে দিতে চান নাকি? আমি তো বরাবরই জানি যে, এটা একটা ছল মাত্র—ওদের নিরস্ত্র করার এবং গড় থেকে বার করার জন্যে!'

আবার কিছুক্ষণ সকলে হতবাক! এমন কি স্বয়ং আজিমুল্লাও যেন এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। শেষে নানাই আবার বললেন, 'কিন্তু আমরা কথা দিয়েছি,—রাজার তরফ থেকে কথা দেওয়া হয়ে গেছে—যুদ্ধেরও একটা আইন আছে তো! দূত পাঠিয়ে কথা দেওয়া হয়েছে—এখন এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করলে লোকে বলবে কী?'

'যুদ্ধের আইন!' আমিনা যেন গর্জে উঠল, 'ওদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ কি? আর বিশ্বাসঘাতকতা? ওরাই বরং বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমাদের সঙ্গে চিরকাল—বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই এদেশের সাম্রাজ্য পেয়েছে ওরা। আমরা ওদেরই পদ্ধতি ওদের ফিরিয়ে দিচ্ছি মাত্র। আর যুদ্ধের আইন বলছিলেন না পেশোয়া? আজিমুল্লা খাঁ নিশ্চয়ই জানেন, ওদের দেশে প্রবাদ আছে—প্রেম ও যুদ্ধে কিছুতেই অন্যায় হয় না।'

তবুও সকলে চুপ করে থাকেন। এতখানি অন্যায়, এতখানি বিশ্বাস-ঘাতকথায় কারও মন যেন সায় দেয় না ঠিক।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবতী আমিনা ঘরের হাওয়া টের পায়। সে একটুখানি নীরব থেকেই পুনশ্চ বলে, 'কার সঙ্গে কী আচরণ করতে যাচ্ছেন পেশোয়া সেটাও বুঝে দেখুন। এদের জন্যে আমাদের কতগুলি প্রাণক্ষয় হয়েছে তা একবার হিসেব করে দেখেছেন? ওদেরও কম লোক মরে নি। এখন ওরা নাচার—একবার নিরাপদ হতে পারলে ওদেরও এই কষ্ট, এই সব অকালমৃত্যুর কি ভয়ঙ্কর শোধ তুলবে তা কি ভেবে দেখেছেন? এই তো মৌলবীসাহেব পূর্ব দিক থেকে কালই এসে পেঁছেছেন! জেনারেল নীল কাশী আর এলাহাবাদে কী কাণ্ড করেছেন—এঁর মুখ থেকেই শুনুন না!'

মৌলবী এতক্ষণ চুপ করে নতমুখে বসেছিলেন, তিনি এবার মুখ তুললেন, বললেন, 'কাশী থেকে শুরু করে এলাহাবাদ পর্যন্ত পথের দু দিকে কোন

জোয়ান লোক আর জীবিত নেই। তবে তাদের জন্য একটাও গুলি খরচ করে নি ওরা, দু দিকে যত গাছ আছে, আর সেসব গাছে যত ডাল আছে··· সবগুলিই আজ ফাঁসিকাঠ। ষোল থেকে ষাট বছর বয়সের কেউ সে পরিণাম থেকে অব্যাহতি পায় নি। স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম ও ইজ্জৎ তো আজ কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।···কিন্তু শুধু যদি তাই হত! মরবার আগেও এক-এক জন যে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছে···তা আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। ক্রোশের পর ক্রোশ রাস্তা বুকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, পথের কাঁকরে তাদের বুকের চামড়া ছিঁড়ে মাংস ক্ষয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে, পিঠ চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত—তার ওপর তাদের ধরে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়েছে। স্বামীর সামনে স্ত্রী, বাপের সামনে কন্যাদের বে-ইজ্জৎ করা হয়েছে। মায়ের কোল থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে তার চোখের সামনে তাদের বধ করা হয়েছে। এদের সঙ্গে আপনি ভদ্র ব্যবহার করতে চান পেশোয়া!'

পেশোয়া নতমুখে বসে থাকেন। তাত্যা টোপী বিব্রত বোধ করেন। অবরুদ্ধ-রোষে আজিমুল্লার কপালের শিরাগুলো ফুলে ফুলে ওঠে।

অবশেষে তাত্যা বলে, 'কিন্তু ওরা যত নীচে নেমেছে, আমাদেরও কি ততটা নামতে বলেন মৌলবীজী? তা ছাড়া যুদ্ধের ফলাফল আজও অনিশ্চিত। এই বিশ্বাসঘাতকতা, এই হত্যার খবর আবার ওদের কানে পৌঁছলে ওরা আরও কত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে তা ভেবে দেখেছেন? যদি ওদের হাতেই আবার দেশ ফিরে যায়?'

'কখনও না!' আমিনার দু চোখ থেকে আগুন বর্ষণ হতে থাকে, 'দেশ ফিরে গেলেও দেশবাসী যাবে না। তেমন দুর্দিন যদি সত্যিই আসে তো তার আগে আমরা রাজপুতদের মত জহরব্রত করব—কিন্তু ওদের ক্ষমা করব না পণ্ডিতজী। আপনারা যদি ভয় পান, আপনাদের যদি বুক কাঁপে তো আপনারা সরে দাঁড়ান। আমরাই এই ভার নিচ্ছি। শয়তানের ঝাড় ওরা—ছেলে-বুড়ো-স্ত্রীলোক কেউ কম নয়। এমন কাণ্ড করব, এমন শোধ তুলব এদের ওপর দিয়ে যে সমস্ত ইংরেজ জাত শিউরে উঠবে। ভয় পেয়ে ওরা এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের আশা ত্যাগ করবে। শত্রু নাশ করব, ইংরেজ ধ্বংস করব—এই আমাদের ব্রত। যেমন করে হোক যে পথে হোক। ক্ষমা নেই, সহিষ্ণুতা নেই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নেই।···আসুন আজিমুল্লা খাঁ, যা ব্যবস্থা করার আমরাই করি। মহামান্য পেশোয়া ও পণ্ডিতজীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে—ভীত স্ত্রীলোকের মত কাঁপছেন ওঁরা।···ওঁরা বরং কয়েকদিন বিশ্রাম করুন।'

॥ ৫০ ॥

অবরোধের ভেতরে-বাইরে কামান-বন্দুকের অবিশ্রাম শব্দ থেমেছে, নাচারগড়ের অধিবাসীদের মধ্যে নেমেছে একটা অদ্ভুত অবসাদ। পাহারা যায় নি, কিন্তু আগের মত নীরন্ধ্র নিরবসরও নেই। কুয়া থেকে যদৃচ্ছা জল তোলা যাচ্ছে, ধপ করে ডোলের শব্দ করতেও বাধা নেই—আগের মত সঙ্গে সঙ্গে যমদূতের পাখার হাওয়া লাগে না গায়ে। এক কথায় এতদিন পর এই প্রথম একটু অবসর মিলছে কিছুটা আত্মস্থ হওয়ার—বা আত্মচিন্তা করার।

তবে সে চিন্তাটা খুব সুখের নয়—আনন্দের তো নয়ই। অবসাদ দেহের চেয়ে মনে বেশি। এই যমপুরী থেকে যদি বা রক্ষা পাওয়া যায় সত্যি-সত্যিই,

অনেকেরই আপনজনকে এখানে রেখে যেতে হবে। যাদের আপনজন কেউ ছিল না—তাদেও বিরহ-বেদনা কম নয়। দুর্দিনের সঙ্গী কত থেকে গেল এখানে। বড় দুর্দিন—এমন দুর্দিন মানুষের জীবনে বুঝি আসে না। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী কিন্তু সাধারণ মরণ হলে এতটা লাগত না—কী শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কী মর্মান্তিক মৃত্যু! ওষুধ নেই, পথ্য নেই, এক বিন্দু জলও শেষ সময় হয়তো মৃত্যুপথযাত্রীর হিম শুষ্ক ওষ্ঠাধরে তুলে দিতে পারা যায় নি।…এমন কি শেষের দিকে ক্ষতস্থান বাঁধবার মত একটুকরো ন্যাকড়াও জোটে নি। সে কথা মনে পড়লে এ মুক্তির কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয় এমন মুক্তিতে প্রয়োজন নেই। এতগুলো লোকের যা হল আমাদেরও না হয় তাই হত, এ মুক্তির পাথায় চিরজীবনের মত যে স্মৃতির ভার চেপে রইল, তাতে বাকী জীবনটা কি চিরকালের মতই বিড়ম্বিত হয়ে গেল না? আনন্দের পূর্ণপাত্র এল বটে, কিন্তু পাত্রটা যেন নিমকাঠের, পান করতে গেলেই ওষ্ঠে ও রসনায় সেই তিক্ততা লাগবে প্রথম। জীবনের স্বাদ যেন চিরদিনের মতই বিষিয়ে গেল। এই একুশ দিনের স্মৃতি কি নিদ্রায় কি জাগরণে দুঃস্বপ্নের মত জগদ্দল বোঝা হয়ে বুকে চেপে থাকবে।

হুইলার সেদিন বাকী সময়টা বিন্দুমাত্র স্থির থাকতে পারলেন না। সারা রাত তাঁর চোখের পাতায় এতটুকু তন্দ্রা নামল না। কথাটা দিয়ে ফেলেছেন ঝোঁকের মাথায়। সেজন্য, মুখে প্রকাশ না করলেও, মনে মনে অনুতাপের শেষ নেই। একেবারে ছেলেমানুষের মতই এক-এক বার আশা করেছেন যে, নানাই হয়তো শেষ পর্যন্ত কথার খেলাপ করবে—আত্মসমর্পণের অগৌরব থেকে তাঁরা রক্ষা পাবেন। একটা অসম্ভব আশাও মনে জাগছে, হয়তো এমনি করে কথাবার্তা চালাচালি হতে হতেই দু তিনটে দিন কেটে যাবে—আর ইত্যবসরে কলকাতা থেকে সাহায্য এসে পৌঁছবে। ঈশ্বর কি এত কষ্টের পরও শেষ মুহূর্তে মুখ তুলে চাইবেন না?

কিন্তু কিছুই হল না। ২৬শে জুন ভোরবেলাই শ্বেত-পতাকা উড়িয়ে আজিমুল্লা ও জোয়ালাপ্রসাদ এসে উপস্থিত হলেন। মোটা কথাটা হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু আত্মসমর্পণের পদ্ধতি ও শর্তাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে সন্ধির একটা দলিল খাড়া করা দরকার। ক্লান্ত, রক্তচক্ষু হুইলার নিজে মুখভাবকে যত দূর সম্ভব সহজ করে এসে টেবিলে বসলেন। আজিমুল্লা প্রাথমিক সৌজন্য হিসেবে কুশল-প্রশ্নাদির পরই কাজের কথা পাড়লেন। অবরোধ আজই ছাড়তে হবে। ছোট বড় কামান, অপর হাতিয়ার এবং নগদ টাকাকড়ি যা আছে সবই নানাসাহেবের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সাহেবরা কেবল ব্যক্তিগত জামা কাপড়, এক-একটি বন্দুক এবং ষাটটি করে টোটা সঙ্গে নিতে পারবেন। স্ত্রীলোক, আহত এবং রুগ্ণদের জন্য নানাসাহেব এখান থেকে ঘাট পর্যন্ত যাবার যানবাহনাদির বন্দোবস্ত করে দেবেন। ঘাটে প্রয়োজনমত নৌকো থাকবে। খাদ্য-খাবার এখনই তাঁরা কিছু পাঠাবেন। নৌকোতেও চার-পাঁচ দিনের ব্যবস্থা থাকবে।

হুইলার স্থিরভাবে সব শুনলেন। তার পর তাঁর পেছনে ও দু পাশে যে সব অফিসাররা দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কী বলেন?'

প্রথমটা সকলেই চুপ করে রইলেন। গতকালকের তিক্ত অভিজ্ঞতা কেউই ভোলেন নি। তাঁদের যদি নীরবে হুকুম তামিল করতে হয় তো করবেন—সেটা মিলিটারী আইন, তাতে দোষ নেই, কিন্তু মতামত জানাতে গিয়ে মিছামিছি গাল বাড়িয়ে চড় খাবেন কেন?

একটু চুপ করে থেকে, বোধ করি বা সহকর্মীদের মনোভাব বুঝেই, হুইলার আবার কঠিন হয়ে উঠলেন। প্রশ্নের ধরন এবং ভাষা দুই-ই বদলে বললেন, 'মিঃ মুর কী বলেন? পারবেন আজই রওনা হতে?'

মুর দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আজ অসম্ভব। খুব তাড়াতাড়ি হলেও কাল সকালের আগে নয়।'

আজিমুল্লা যেন একটু জিদ করেই বললেন, 'কিন্তু আপনার তাতে অসুবিধা কি? আমরা যদি এধারে সব যোগাড় করে দিই?'

'সব অসুবিধা সকলকে বোঝানো যায় না খাঁ সাহেব!' মুর নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলেন।...

অগত্যা আজিমুল্লা ও জোয়ালাপ্রসাদকে তখনকার মত বিদায় নিতে হল। কিন্তু অর্ধপ্রহর অতীত হবার আগেই এল আর-এক জন দূত—নানা আজকের দিনটাও সময় দিতে রাজী হয়েছেন, তবে কামান, বন্দুক, বাড়তি গোলাগুলি এবং টাকাকড়ি যা আছে, আজ সূর্যাস্তের আগেই বুঝিয়ে দিতে হবে।

আবারও হুইলার বিপন্ন বোধ করলেন।

একমাত্র পুত্রকে ডাইনের হাতে সমর্পণ করবার মতই শোনাল না কি কথাটা?

এবার একটু ইতস্তত করে সার হিউ খোলাখুলিভাবেই সহকর্মীদের মত চাইলেন।

মুর, ডিলাফোস, টমসন—এঁরা কী বলেন!

মুর বললেন, 'আমরা অনেক দূর এগিয়েছি সার—বলতে গেলে নিজেদের বাঁধা দিয়ে বসে আছি। এখন আর নতুন করে ভেবে লাভ নেই।'

'তা ছাড়া', টমসন বললেন, 'আজ দিলেও দিতে হবে, কাল সকালে দিলেও তাই। তার পর তো সেই নিরস্ত্র অবস্থা! ওদের দয়ার ওপরই নির্ভর।... তার চেয়ে রাজী হওয়াই ভাল। বরং ওদের পক্ষ থেকে দু চার জন জামিনদার চান—যারা আমাদের মধ্যে এসে থাকবে আজকের রাতটা, কাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘাট পর্যন্ত যাবে। নৌকোয় চাপলে তাদের ছুটি!'

হুইলার সেই কথাই জানালেন দূতকে।

দূত সম্ভবত এই উত্তরের জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। সে বলল, 'বেশ তা হলে আপনাদের মধ্যে কেউ চলুন—মহামান্য পেশোয়া নানা ধুন্ধুপন্থজীর সঙ্গে ফয়সালা করে একটা চুক্তি করে ফেলবেন। একটা দলিল তৈরী করেই নিয়ে চলুন।'

নানা ধুন্ধুপন্থ! আবার নানাসাহেবের মুখ দেখতে হবে? ঐ লোকটার সঙ্গে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে হয়তো বা পেশোয়া বলেই অভিবাদন করতে হবে!

ঘৃণায় অনেকেরই মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। দু-এক জনের অন্তরে একটা আশঙ্কা ও সংশয়ও যে না জাগল তা নয়। অবশেষে টড নামে এক জন তরুণ অফিসার এগিয়ে এসে বলল, 'আমি রাজী আছি জেনারেল। এত দূরে এসে এই সামান্যটুকুর জন্যে পেছিয়ে যাওয়া চলবে না!...আমিই যাচ্ছি—যদি, যদি আর ফিরে না আসি, আমার মাকে দয়া করে খবরটা জানিয়ে দেবেন।'

সার হিউ উঠে টডের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তখনই একটা দলিলের খসড়া তৈরী হল। টড সেই দূতের সঙ্গে রওনা হয়ে গেল। অবশিষ্ট ইংরেজরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বসে তার প্রত্যাগমনের প্রহর গুনতে লাগলেন।

কিন্তু সকল আশঙ্কা ব্যর্থ করে টড় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এল। দলিল সই হয়ে গেছে। নানা বরং যেন একটু লজ্জার সঙ্গেই টডের সঙ্গে বেশ সদয় ও সসম্ভ্রম ব্যবহার করেছেন। কানে কানে এ কথাও একবার শুনিয়ে দিয়েছেন, 'আমি তো জেনারেল হুইলারকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম। ...আমার যতটা সাধ্য আমি করেছি। তবে লক্ষ লক্ষ লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আর কতটুকু ?'

সে যা হোক, নানা তাঁর দিক থেকে শর্তাদি ঠিক ঠিক পালন করেছেন। শুধু দলিলই আসে নি—টডের সঙ্গে প্রতিভূ-স্বরূপ জোয়ালাপ্রসাদ ও অপর দুজন সেনাপতি এসেছে। তারা এখানেই থাকবে কাল সকাল পর্যন্ত। এছাড়া তিন বয়েল-গাড়ি বোঝাই দিয়ে নানাসাহেব বহু খাদ্যও পাঠিয়েছেন—আটা, ডাল, মাংস, ঘি, এমন কি একঝুড়ি 'দশেরী' আমও। আর কিছু জ্বালানী কাঠ।

অনেকদিন পরে নাচারগড়ের উনুনে আগুনে পড়ল। গলিত নর-মাংসের দুর্গন্ধ ঢেকে সুখাদ্যের সুঘ্রাণ উঠল। কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে অবশিষ্ট অফিসার তাঁদের পরিবারবর্গ জিনিসপত্র গোছগাছ করতে বসলেন।

সন্ধ্যের কিছু আগে টীকা সিং এসে কামান ও বাড়তি বন্দুকগুলির দখল নিলেন। এপক্ষেও টার্নার, ডিলাফোস এবং গোড-কে কয়েক জন সিপাহী সঙ্গে দিয়ে ঘাটটা ঘুরিয়ে আনা হল। নৌকো অনেকগুলোই ঘাটে জড়ো হয়েছে বটে, তবে তার অধিকাংশই ডিঙি-নৌকো—মাথায় আচ্ছাদন নেই। সে অভাব খড় ও বাঁশের সাহায্যে পূরণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি নৌকো ছাওয়া শেষ হয়েছে, বাকিগুলোতেও কাজ চলছে। আজিমুল্লা অভয় দিলেন, রাত্রের মধ্যে ছই ঢাকা দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং রাত্রেই প্রতি নৌকোয় পানীয় জলের 'সুরাই', কিছু খাবার এবং ফল রাখবার ব্যবস্থাও করা হবে।

যেটুকু সংশয় এদের মনে এখনও ছিল, নৌকোগুলো দেখে সেটুকুও চলে গেল। অফিসার তিনজন হাসি-হাসি মুখেই ফিরে এলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর নাচারগড়ে আজ অনেকদিন পরে আলো জ্বলল। আজ্ আর আলো লক্ষ্য করে কামান দাগবার ভয় নেই। মেমসাহেব যে কজন আছেন, তাঁরা সামান্য যা জিনিসপত্র অবশিষ্ট আছে গুছোতে বসলেন। সাহেবরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছিয়ে তুলে বাকী বাজে কাগজ ও চিঠিপত্র ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন। কেউ কেউ স্বদেশে দীর্ঘ পত্রও লিখতে বসলেন.

এক কথায় যাত্রার তোড়াজোড় শুরু হয়ে গেল।

॥ ৫১ ॥

আমিনাও আজ অনেকদিন পরে ভাল করে স্নান করল। তারপর মুসম্মৎকে ডেকে এটা-ওটা চেয়ে নিয়ে বেশ একটু ঘটা করেই প্রসাধন করতে বসল। চুলে জট পাকিয়ে গেছে—ফুলেল তেল ও কাঁকুইএর সাহায্যে যত্ন করে সে জট ছাড়াতে লাগল। মুসম্মৎ তার ভাবগতিক দেখে বিস্ময় ও কৌতূহল চাপতে পারল না, প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ যে এ মতিগতি ?'

'এমনি। এত বড় একটা জয়লাভ হল পেশোয়ার—তাই।'

বলে একটু মুখ টিপে হাসল।

প্রসাধন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, মুসম্মৎ এসে সংবাদ দিল, আজিমুল্লা খাঁ সাহেব দর্শনপ্রার্থী।

বেনারসী রেশমের হালকা ওড়নাটা মাথায়-গায়ে টেনে দিয়ে আমিনা বলল, 'আসতে বল—এখানেই।'

বোধ করি বেগমসাহেবার প্রসাধনের জন্যই আয়নার দু পাশের গাছ-বাতিদানের সব কটি বাতি জ্বালা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, মাথার ওপরে কাটগ্লাসের বহুমূল্য ঝাড়টাও পূর্ণ গৌরবে প্রজ্বলিত—ফলে ঘরে প্রায় দিবালোকের মতই আলো। বাইরের অন্ধকার থেকে সহসা এতটা আলোর মধ্যে এসে পড়ায় আজিমুল্লার চোখ দুটো যেন ধেঁধে গেল।

কিন্তু সে কি শুধু মাত্র এই মানুষের সৃষ্ট আলোতেই?

চোখের সামনে বিধাতার সৃষ্ট যে আলো আজ আবার পূর্বগৌরবে জ্বলে উঠেছে—চোখ ধাঁধানোর কি সে-ও একটা কারণ নয়? এমনিতেই তো যে কোন বেশে, যে কোন প্রসাধনেই এই নারী তাঁর কাম্য, তাঁর উপাস্য। এমন কি গত কদিন যে সে রুক্ষ কেশে বিস্রস্ত বেশে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়িয়েছে তাতেও তো অন্তরের পিপাসা কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নি, বরং ঐ ভস্মের অন্তরালে যে বহ্নি আছে, তার দিকেই তাঁর অন্তর-পতঙ্গ দু পাখা মেলে ছুটে যেতে চেয়েছে। সুতরাং আজ প্রজ্বলন্ত শিখার মত এই রূপ যে সে পতঙ্গকে আরও চঞ্চল, আরও বিহ্বল, আরও উন্মত্ত করে তুলবে—তাতে আর সন্দেহ কি?

আজিমুল্লা কী বলতে এসেছিলেন ভুলে গেলেন। যেন প্রচণ্ড আলো থেকে আড়াল করবার ভঙ্গীতে ডান হাতটা চোখের কাছাকাছি তুলে মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

আমিনার ভ্রূ দুটো ঈষৎ কুঞ্চিত হতে গিয়েও প্রাণপণ চেষ্টায় প্রসন্ন হাসির ভঙ্গিতে বিস্তারিত হল।

আমিনা বলল, 'কী হল সাহেব—এমন করে চেয়ে আছেন যে?'

'চেয়ে আর থাকতে পারছি কৈ বেগমসাহেবা—চোখ ঝলসে গেল যে!' হালকাভাবে বলতে চেষ্টা করলেও আজিমুল্লার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক গাঢ় ও বিকৃত শোনায়।

'তাই নাকি?' বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে আমিনার কণ্ঠে, 'দেখবেন, চোখ ঝলসানো তবু ভাল, তাতে প্রাণটা থাকে। নিজে শুদ্ধ পুড়ে মরবেন না!'

'পুড়ে মরতেই যে সাধ যাচ্ছে হুসেনী বেগম! পতঙ্গ না জেনে আগুনে ঝাঁপিয়ে পুড়ে মরে, আমার যে জেনেশুনেই মরতে ইচ্ছে করছে!'

অকস্মাৎ আমিনার দুচোখ জ্বলে ওঠে, সাপের মতই হিস্‌ হিস্‌ করে ওঠে কণ্ঠস্বর, 'কিন্তু এ বড় সাংঘাতিক আগুন খাঁ সাহেব। একটা সামান্য পতঙ্গকে পোড়াবার জন্যে খোদা এ আগুন জ্বালেন নি—বহু জীব, সমগ্র একটা জাতি, একটা দেশ পোড়াবার জন্য জেবলেছেন। তোমারই মত কোন পতঙ্গ—না তোমার চেয়ে ঢের ছোট, ঢের ঘৃণ্য এক পতঙ্গ পাখার হাওয়ায় এ আগুন জেবলেছিল—খেলাচ্ছলে, সেই থেকে জ্বলছেই। জ্বলছে ও জ্বালাচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে দিকে দিকে, বহু পতঙ্গকে না পুড়িয়ে নিভবে না। সামান্য অপমানের অসামান্য শোধ!'

বলতে বলতেই হুসেনীর দেহ যেন কী এক নিরুদ্ধ আবেগে থরথর করে কেঁপে ওঠে—ললাট স্বেদবিন্দুতে ভরে যায়, চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিটা ক্রমশ হয়ে ওঠে ভয়াবহ। সে দৃষ্টির সামনে বোধ করি আজিমুল্লাও ভীত হয়ে ওঠেন। তিনি এক লাফে সামনে এসে ওকে ধরে ফেলে জোর করে একটা চৌকিতে বসিয়ে দেন।

'বেগমসাহেবা, বেগমসাহেবা, স্থির হও!'

আমিনা সেই স্পর্শে যেমন সংকুচিতও হয়, তেমনি তা তাকে প্রকৃতিস্থ হতেও সাহায্য করে। প্রাণপণ চেষ্টাতে সে একটু হাসিও টেনে আনে মুখে।

'বড্ড বেশী নাটকীয় হয়ে পড়ল দৃশ্যটা—না খাঁ সাহেব?'

'নাটকীয়? তা হয়তো হবে। কিন্তু সব ভঙ্গিতে সব অবস্থাতেই তোমাকে ভাল দেখায় বেগমসাহেবা! কাজেই স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক, সহজ কি নাটকীয়, তা লক্ষ্য করবারও সময় পাই না।'

'এবার আপনিই নাটকীয় হয়ে উঠছেন আজিমুল্লা খাঁ।...কী যেন বলতে এসেছিলেন? নিশ্চয়ই শুধু আমার রূপের প্রশংসা করতে আসেন নি! ও-কাজটা বহুবার সারা হয়ে গেছে।'

'বলছি, কিন্তু বেগমসাহেবা তোমার পূর্ব ইতিহাসের একটা চমক মাত্র দিয়েই থেমে গেলে—কৌতূহল হচ্ছে যে। কে সেই পতঙ্গটি, যার পাখার হাওয়ায় এত বড় আগুন জ্বলল?...সে কি—ঐ—ঐ ধুন্ধুপন্থ?'

'সে একান্তই আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস খাঁ সাহেব। নগণ্য এক নারীর সামান্য বৃত্তান্ত। সে সব আলোচনার সময় এ নয়।...কাজ শেষ হলে এত দিনের সাধনার পুরস্কার যখন ভাগাভাগি করে ভোগ করব, তখনকার নিভৃত অবসরের জন্যই তোলা থাক না কথাগুলো।'

মুচকি হাসির সঙ্গে কটাক্ষ। আজিমুল্লার সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে, আমিনার কথার তুলিতে ভবিষ্যতের যে ছবি ফুটে ওঠে সে ছবি মানসনেত্রে দেখতে দেখতে বাইরের দৃষ্টিটাও লোভাতুর হয়।

আমিনা কিন্তু বেশীক্ষণ সে দিবাস্বপ্নের অবসর দেয় না। সামনের আর একটা চৌকি দেখিয়ে দিয়ে বলে, 'বসুন। বলুন তো কী খবর?'

তার এই একেবারে বাস্তব প্রশ্নে ও ব্যবহারিক কণ্ঠস্বরে আজিমুল্লাও যেন স্বপ্নজগৎ থেকে রূঢ় বাস্তবে নেমে এলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, বললেন, 'বেগমসাহেবা, এদিকে খুব বিপদ! আপনার হুকুম তামিল করা কঠিন হয়ে উঠছে।'

'কেন, কী বিপদ?' নিমেষে সোজা হয়ে বসে আমিনা।

'টীকা সিং আপনার নির্দেশমত সতীচোরা ঘাটের ঝোপের মধ্যে কামান সাজাতে হুকুম দিয়েছিল—আর সেই সঙ্গে সিপাইরা কোথায় কোথায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে সে নির্দেশও ছিল। কিন্তু সিপাইরা একেবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছে। তারা বলছে যে, তারা যুদ্ধ করতেই শিখেছে—খুন করতে নয়। নানাসাহেব ইংরেজদের জবান দিয়েছেন—নিরাপদে এলাহাবাদ পর্যন্ত যেতে দেবেন, এখন এভাবে আড়াল থেকে নিরস্ত্র ও নিশ্চিন্ত লোকের ওপর গুলি চালানো শুধু খুন করা নয়—চরম বিশ্বাসঘাতকতাও। তাতে তারা রাজী নয়।'

রোষে আমিনার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠে ক্রমশ একেবারে শ্বেতবর্ণ ধারণ করল। সে বলল, 'ইস্! এত নীতিবোধ তাদের এল কোথা থেকে? গত দেড় মাসে

তারা কি নিরস্ত্র ইংরেজ একটাও মারে নি—নাকি লুটতরাজই করে নি ?'

'হ্যাঁ, সে কথাও বলতে গিয়েছিলাম। তারা বললে, হ্যাঁ, যখন যুদ্ধ চলেছে তখন নিরস্ত্র শত্রু সামনে পড়লেও মারব বৈকি, কিন্তু কথা দিয়ে, শত্রু যখন সরল বিশ্বাসে আমার হাত ধরে আমাকেই আশ্রয় করেছে, তখন তাকে মারা আলাদা কথা। আরও কী হয়েছে জানেন? তাত্যা টোপী আমাদের এ কাজ সমর্থন করছেন না। সম্ভবত তিনিই এই নীতিবোধটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন ওদের মাথায়। টোপী ব্রাহ্মণ—সিপাইদের মধ্যে ওঁর খাতির বেশি !'

অসহায় রোষে নিজের ঠোঁট নিজেই কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল আমিনা। সেই মুহূর্তে তাত্যা টোপীকে সামনে পেলে হয়তো সে তাঁর মুণ্ডুটা নিজের হাতেই ধড় থেকে ছিঁড়ে নিত।

কিছুক্ষণ পরে আজিমুল্লার মুখের দিকে চেয়ে অসহায় ভাবেই সে প্রশ্ন করল, 'এখন উপায় ?'

'উপায় তো কিছু দেখছি না।...মুসলমান সিপাইরা আছে বটে, কিন্তু তারা যে আলাদা করে কিছু করতে রাজী হবে, তা মনে হয় না।'

আমিনা আজিমুল্লার মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। তাতে কিছুমাত্র তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল কিনা ঈশ্বর জানেন, কিন্তু আজিমুল্লা একেবারে এতটুকু হয়ে গেলেন। এই নারীর অদমনীয় ইচ্ছা ও কর্মশক্তির সামনে নিজেকে যেন বড় অপদার্থ বলে বোধ হতে লাগল।

সামনের আয়নায় প্রতিফলিত নিজের প্রতিবিম্বের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমিনার আয়ত চোখে আবার আগুন জ্বলল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক হয়েছে, পায়ে কাঁটা ফুটলে কাঁটা দিয়ে তা তুলতে হয়। ব্রাহ্মণের বিষ ব্রাহ্মণকে দিয়েই উঠবে। নানা ধুন্ধুপন্থও ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ এবং রাজা। আপনি একটা ইস্তাহার লিখে নিয়ে যান—পেশোয়ার নামেই লিখে নিয়ে যান—যেন পেশোয়াই লিখে পাঠিয়েছেন। পেশোয়া সেই ইস্তাহারে সিপাইদের কাছে জানাবেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ এবং রাজা। তিনি যা হুকুম দিচ্ছেন—তা বুঝেই দিচ্ছেন। কোন পাপ হবে না ওতে। ওদেরই শাস্ত্রে লেখা আছে যে, বিধর্মী শত্রুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতায় কোন অন্যায় হয় না। স্বয়ং রামচন্দ্র নিজের কাজ উদ্ধার করতে একরকম বিশ্বাসঘাতকতারই আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর যদিই কোন পাপ হয় তো তা স্বয়ং পেশোয়া তাদের হয়ে বহন করবেন। তিনি হুকুম করছেন—দায়িত্ব তাঁরই। যান, এখনই ভাল করে লিখে নিয়ে সিপাইদের পড়ে শোনান। রাত গভীর হয়ে আসছে—আর সময় নেই।'

'ঐ যে কী বললেন, রামচন্দ্র না কী—ওটা ইস্তাহারে লেখা কি ঠিক হবে ? যদি কোন ভুলটুল হয় তো ওরা ক্ষেপে উঠবে আরও।'

'কিছু ভুল হয় নি। হিন্দু পুরাণ আমি ভাল করেই পড়েছি। ওটা যদি গুছিয়ে লিখে দিতে পারেন তো ভাল ফলই হবে বরং। শত্রু বধ করতে তিনি যা করেছিলেন তা অন্যায় নয় নিশ্চয়।'

আজিমুল্লা কিন্তু তবু ইতস্তত করতে থাকেন।

'কিন্তু, কিন্তু বেগমসাহেবা, স্বয়ং পেশোয়ার নামে ইস্তাহার চালাব—সে তো জাল। যদি এর পর পেশোয়া অস্বীকার করেন ? তা হলে সিপাইরা আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। পেশোয়া নিজেও শাস্তি দিতে

পারেন—তাঁর নাম জাল করার অপরাধে।...তাঁর কানে উঠতেও তো দেরি হবে না। তাত্যা টোপী যখন শুনবেন, তখনই তিনি ছুটে যাবেন পেশোয়ার কাছে।'

'তারও আগে আমিই শোনাব পেশোয়াকে। তাঁর নাম জাল করার দায়িত্ব আমিই নেব আমার মাথায়। তাঁকে বলব, তাঁর নাম করে যে ইস্তাহার আমি দিয়েছি আপনার হাতে। শাস্তি পেতে হয় আমিই পাব—আপনাকে জড়াব না খাঁ সাহেব।'

এ কথায় একটু অপ্রতিভ বোধ করেন আজিমুল্লা, তাড়াতাড়ি বলেন, 'কিন্তু আপনার যদি কোন অনিষ্ট হয়, সেটা কি নিজের শাস্তি পাওয়ার চেয়ে কিছু কম বাজবে আমাকে?'

আমিনা হাসল, বলল, 'ভয় নেই, সে আঘাত আপনাকে পেতে হবে না। আমি আপনার পেশোয়াকে চিনি। নিজের ক্ষমতাও জানি। অত সহজে আমার ভুল হয় না খাঁ সাহেব। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে যান, আমি এখনই পেশোয়ার কাছে যাচ্ছি।'

সে হাসি, সে চাহনি, সে কটাক্ষের জন্যে মানুষ স্বচ্ছন্দে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে—অন্তত আজিমুল্লার সেই মুহূর্তে তাই মনে হ'ল। সামান্য বিপদের সম্ভাবনা তো তুচ্ছ।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আর একবার ঐ বহ্নিশিখাকে স্পর্শ করবার, ঐ দুখানি দেবদুর্লভ হাত অন্তত একবার নিজের হাতের মধ্যে ধরবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রাণপণে দমন করতে হ'ল। আমিনাকে এতদিনে তিনি চিনেছেন—সে চেষ্টা করতে গেলে আর একবার অপমানিতই হতে হবে শুধু। একটা নিশ্বাস ফেলে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে বললেন, 'আপনার হুকুম এখনই তামিল হবে বেগমসাহেবা।'

তার পর একটা অভিবাদন করে বার হয়ে গেলেন।

তাঁর সেই অপসৃয়মাণ মূর্তির দিকে চেয়ে মুহূর্ত-কয়েক স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল আমিনা। ক্রমশ শুধু তাচ্ছিল্য নয়, যেন নিদারুণ একটা ঘৃণাই ফুটে উঠল মুখেচোখে। কিন্তু আর অবসর নেই, সেটা মনে পড়ে কতকটা জোর করেই নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে নিল সে। আবার আয়নার সামনে এসে বসল। প্রসাধনের সামান্য দু-একটা কাজ তখনও বাকি ছিল, সযত্নে ও সন্তর্পণে সেটুকু সেরে, সুডৌল চারু ললাটের উপর কেশের রেখাটি ঠিক আছে কিনা হাত দিয়ে পরীক্ষা করে, অক্ষিপল্লবে সুর্মার কাঠিটি আর একবার গভীরভাবে টেনে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।...

এই সযত্ন চেষ্টার পরে আয়নায় যে চেহারাটা প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল, তার দিকে চেয়ে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল আমিনার মুখে। বিচিত্র ও দুর্জ্ঞেয়—কিন্তু বিজয়িনীর হাসি তা নয়, বরং তার মনে হ'ল অসংখ্য বাতির উজ্জ্বল আলোতে সে হাসির আড়ালে কোথায় যেন একটা পরাজয়ের ছায়াই উঁকি মারছে। সে শিউরে উঠে মুখের ওপর ওড়নাটা টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল।

হার মানলে চলবে না তার। কিছুতেই হার মানবে না সে।

প্রয়োজন হয় তো বিশ্বের সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সে লড়াই করবে।

॥ ৫২ ॥

মুনশী কালীকাপ্রসাদ বেশী দিন কানপুরের বাইরে থাকতে পারেন নি। কারণ প্রাণভয় যতই বড় হোক, এ শহর তাঁর কাছে আরও বড়। পুরুষমানুষের পক্ষে উপার্জনের ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকার অর্থ—জীবন্মৃত হয়ে থাকা। আর যদি মরেই থাকতে হয় তো এ দেহ থাকলেই বা কী—গেলেই বা কী। খাটতে খাটতে সকলেরই মনে হয়, দূরে কোথাও গিয়ে কদিন আরাম করবে। প্রথম দু-এক দিন সে আরাম ভালও লাগে, কিন্তু তার পরই নিষ্ক্রিয়তাটা বিছের মত কামড়াতে থাকে। সুখশয্যা কণ্টকশয্যা হয়ে ওঠে। বিশ্রামের অভাবে আগে মনে হয় অবসর পেলে ঘুমিয়ে বাঁচব, কিন্তু বিশ্রাম নিতে গেলে ঘুম আসে না চোখে একবিন্দুও।

কালীকাপ্রসাদও এমনি একটা সংকল্প নিয়ে দেহাতে গিয়েছিলেন। প্রাণরক্ষাকে প্রাণরক্ষাও হবে, অথচ দায়ে পড়ে একটা পূর্ণ বিশ্রামলাভও ঘটবে। কিন্তু দুটো-তিনটে দিন যেতে-না-যেতেই হাঁপিয়ে উঠলেন। আরে ছোঃ, এমন সব দেশে মানুষ থাকে! উত্তেজনা নেই, চাঞ্চল্য নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুই নেই, নগদ টাকার ঝনঝনানি শোনা যায় না—এমন কি বাইরের একটা খবরও এখানে এসে পৌঁছয় না। এ যেন কবরের মধ্যে বাস করা।

সবচেয়ে কানপুরের খবরের জন্যেই মনটা তাঁর ছটফট করত। এই শহর তাঁর কর্মজীবনের সঙ্গে পাকে পাকে জড়ানো—গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বাঁধা। সেই কানপুরে কত কী কাণ্ড ঘটছে, কত ইতিহাস রচিত হচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে, আর তিনি এই—বলতে গেলে রামচন্দ্রজীর অভিশপ্ত, ভুলে যাওয়া একটা জায়গায় বসে বসে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তামাকু পোড়াচ্ছেন। তাও সঙ্গে যেটুকু শহরের ভাল তামাক এনেছেন তা তো ফুরলো বলে। এখন হয়তো এখানকার কড়া দা-কাটা খেয়ে জীবনধারণ করতে হবে। এমন জীবনে প্রয়োজন কী!

সুতরাং সাত-আটটা দিন যেতে না যেতেই তিনি আবার শহরে ফিরে এসেছিলেন। তবে নিজের বাড়ি—এমন কি নিজের মহল্লার দিকেও যেতে সাহস করেন নি। পরিচিত বহু লোকেই তাঁকে ঈর্ষা করে, সে তথ্য তাঁর অবিদিত নেই। দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিঙ্গীর 'নৌকর' ও গোয়েন্দা বলে ধরিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। সেজন্যে তিনি একেবারে বিপরীত দিকের একটা ঘিঞ্জি মহল্লাতে পরিচিত এক দোকানীর বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। প্রচণ্ড গরম, রোদের মধ্যে বার হওয়া আদৌ উচিত নয়—এই অজুহাতে সারা দিনটাই দোকানের পেছন দিকের আলো-বাতাসহীন ঘরে পড়ে ছটফট করতেন এবং সন্ধ্যের অন্ধকার হওয়া মাত্র টুপির বদলে একটা মোটা কাপড়ের পাগড়িতে মাথার অনেকখানি—মায় চোখের খানিকটা পর্যন্ত—ঢেকে বার হতেন শহরের সংবাদ সংগ্রহ করতে।

ক্রমে ক্রমে, অর্থাৎ কয়েকদিন বেশ নিরাপদে কাটাবার পর, অনেকখানি ভরসা বেড়ে গেলে, তিনি একেবারে সিপাহীদের লাইনেও আসতে শুরু করেছিলেন এবং 'দু পয়সা' কামাবার অভ্যাসটা দীর্ঘকালে স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলে, শেষের কদিন ঐ পরিচিত দোকানীটিকে সামনে শিখণ্ডী খাড়া করে ফৌজী ব্যারাকে সবজি, ফল, ঘি, তেল প্রভৃতি সরবরাহ শুরু করেছিলেন। নগদ কারবারে যা হয়, ধার-বাকি ছাড়বেন না—এই ছিল তাঁর সংকল্প, তাই বেশী দামের জিনিসে ঘেঁষতেন না। পাঁচ টাকার সবজি

অনায়াসে পনেরো টাকায় বিক্রি হবে, না হয় তো কিছু পচবে—তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা সামান্যই। আর ঘি তেল? না বিক্রি হয়, পড়ে থাক। নিজেরা খেয়ে শেষ করতে পারবেন—চাই কি ধীরে সুস্থে দোকানেও বেচা চলবে।

ফলে নাচারগড়ের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে করে—এ কদিনে সব খবরই মোটামুটি সংগ্রহ করেছিলেন মুনশী কাল্‌কাপ্রসাদ। হঠাৎ গুলিগোলার শব্দটা কেন থেমে গেল, সে কারণটাও তাঁর অবিদিত ছিল না। আর—সন্ধি হয়েছে এবং সাহেবরা কাল সকালবেলাই নৌকোয় চেপে এলাহাবাদ রওনা হবেন—এ খবরটা জানা পর্যন্ত তিনি ছটফট করে বেড়াচ্ছেন। ২৬শে তারিখ সারারাত ঘুম হয় নি।

কারণ?

তখনকার দিনের কি কারবারী, কি সাধারণ লোক—সকলকারই ধারণা ছিল সাহেবরা এক-একটি টাকার গাছ। রোজগার ওরা যত করে, বেশির ভাগ সাহেবই তার চেয়ে ঢের বেশী খরচ করে; অধিকাংশ সাহেবই ঋণগ্রস্ত। খুব বেশী উপরি রোজগার করার পথ যাদের আছে, অথবা ব্যবসায়ী সাহেব ছাড়া কেউই বড় একটা কিছু জমাতে পারে না। যে মাসিক আয় ভারতীয়দের হলে তারা জমিদারি কিনতে পারত, সেই আয়ই শেষ করে সাহেবদের ঋণ করতে হয়। তবে এই 'নবাবি'র অধিকাংশই ব্যয় হয় ভারতীয়দের মধ্যেই—বকশিশে ও চুরিতে। ওদের বেয়ারা-বয়-বাবুর্চি-খিদমৎগার-আবদার-চোপদার-ফরাশ প্রভৃতিরা এক-একটি টাকার কুমীর হয়ে ওঠে অবিলম্বে। বাজারের টাকায়-চোদ্দ-ছটাক ঘি মাত্র কয়েক গজ এসে যে সের-করা চোদ্দসিকে দরে পরিণত হয়, এবং সেই চোদ্দসিকের অধিকাংশ অঙ্ক যে এই কুমীরদের পেটেই পেঁছয় তা কে না জানে? আর এই টাকাই বাবুর্চি বেয়ারাদের জেব-এ জমে এক সময় কল্পিত মহাজনের নামে আবার ঋণস্বরূপ সাহেবদের জেব-এ চলে আসে এবং এই যাতায়াতের ফলে শনৈঃ শনৈঃ অঙ্কটা বর্ধিত-কলেবর হয়, সে কথাও কাল্‌কাপ্রসাদের মত সাহেব-ঘেঁষা মানুষের কাছে অবিদিত নয়।

সুতরাং সাহেব-সান্নিধ্য মানেই টাকা।

টাকা ওদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হয়।

সেই তাগিদেই সমস্ত রাত ব্যারাকের ধারে বিনিদ্র কাটিয়ে ভোরবেলা সাহেবদের মালপত্র চালান শুরু হতেই কাল্‌কাপ্রসাদ এক ফাঁকে ঢুকে পড়লেন নাচারগড়ের মধ্যে। কী পাবেন, কী আশায় যাচ্ছেন, তা তিনিও স্পষ্ট জানেন না। শুধু একটা অকারণ অনিশ্চিত লোভই দুর্বার আকর্ষণে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু সেখানে ঢুকে যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। কাল্‌কাপ্রসাদ রীতিমত দমে গেলেন।

খালি ঘরগুলোতে শুধুই ছেঁড়া কাগজপত্রের স্তূপ। কেউ কেউ চিঠিপত্র পুড়িয়ে দেবারও চেষ্টা করেছেন—ফলে এ-কোণে ও-কোণে আধপোড়া কাগজের গাদা। মালপত্র নেই বললেই হয়। ছেঁড়া জামা এক-আধটা, কাঁচ ও কাঁচকড়ার দু-একটা বাসন, খালি টিন—এমনিই দু-চারটে বাজে জিনিস এখানে-ওখানে পড়ে আছে। তা তার জন্যেও লুব্ধ ভিখারীর দল জুটে গেছে ইতিমধ্যেই। সিপাহীরাও কেউ কেউ উঁকি মারতে শুরু করেছে। পুরোনো

চোপদার আবদার চাপরাসী বেয়ারা-বাবুর্চি—যারা প্রাণভয়ে কাজকর্ম ছেড়ে শহরে আত্মগোপন করে ছিল, অথবা ভিড়ে মিশে সাহেব ধরিয়ে দিয়ে দু পয়সা রোজগারের ফিকিরে ছিল এতদিন, তারা রাত্রের মধ্যেই এসে পড়েছে। কেউ কেউ পুরোনো মনিবের সঙ্গে গল্প জমিয়ে তুলেছে, কেউ বা তাঁদের মালপত্র গুছিয়ে বাঁধতে লেগে গেছে। দু-একজন সিপাহীও তাদের পুরাতন মেজর বা ক্যাপ্টেনের সাহায্যে যে এগিয়ে আসে নি তা নয়। তারা কেউ মালপত্রের জন্য প্রেরিত বয়েল-গাড়িতে 'গরিব পরোবর' ও 'হুজুর'দের মালপত্র গুছিয়ে তুলে দিচ্ছে, কেউ বা নিজেরাই কাঁধে করে ঘাট পর্যন্ত পোঁছে দেবে বলে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কালকাপ্রসাদ ঈর্ষার সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, ছিটেফোঁটা প্রসাদ এবং বকশিশ-আদি যা মেলবার, এঁদেরই—অর্থাৎ পুরাতন সেবক ও সিপাহীদেরই মিলছে। টাকাটা-সিকিটা তো বটেই—দু-একজন দামী ঘড়ি এমন কি মূল্যবান শালও এক-আধখানা পেয়ে গেল।

মজা মন্দ নয়। স-ক্ষোভে এবং কতকটা স-বিদ্বেষেও কালকাপ্রসাদও মনে মনে উক্তি করলেন, যারা অনিষ্ট করল, ভাই-বেরাদারদের খুন-জখম করল, তাদের বেলাই ওঁদের বদান্যতার সমুদ্র উথলে উঠল, আর তাঁদের মত যে বিশ্বস্ত সেবকরা শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত রইল এবং সাহেবদের শৌর্য ও ভাগ্যে বিশ্বাস হারাল না, তাদের বেলায় অবশিষ্ট রইল কিছু ছেঁড়া কাগজ ও ছাইয়ের গাদা।

একেই বুঝি বলে ভগবানের সুবিচার! দূর ছাই, এই শ্মশানপুরীতে আসাটাই মিথ্যে হ'ল!

যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ মুখে কালকাপ্রসাদ একটা কোণে দাঁড়িয়ে একবার শেষবারের মত চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছেন, আর কোথাও কোন লাভের আশা এখনও আছে কিনা, হঠাৎ কার একখানা ভারী হাত কাঁধের ওপর পড়ল।

হাতখানা একেবারে অপরিচিত নয়।

নানকচাঁদ।

সঙ্গে সঙ্গে খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কালকাপ্রসাদের মুখ। তিনি তাহলে একা ঠকেন নি, নানকচাঁদের মত বুদ্ধিমান লোকও তাঁরই মত বৃথা লোভে ছুটে এসেছে! আঃ বাঁচা গেল, অন্তত একা বেকুব বনবার দুঃখটা আর রইল না।

'কেয়া উকিলবাবুজী, রাম রাম!' কালকাপ্রসাদ প্রায় জড়িয়ে ধরতে গেলেন নানকচাঁদকে, 'কি, খুব আশায় এসেছিলে, না? ভেবেছিলে যে সাহেবরা চলে যাচ্ছে—দু-চার পাঁচ টাকা কি আর এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে থাকবে না? হুঁ হুঁ, অতি বড় বুদ্ধিমানেরও এমনি দুর্দশা হয়। সে গুড়ে বালি। কী ছিল যে থাকবে? অন্টরম্ভা! পড়ে আছে ঐ কতকগুলো ছাই তাই চাট্টি কুড়িয়ে নিয়ে যাও, আর কি!'

ডান হাত মুঠো করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি একটি বিশেষ ভঙ্গিতে তুলে ধরে খুব হাসতে লাগলেন কালকাপ্রসাদ। নিরতিশয় তৃপ্তির হাসি।

তাঁর এই বাক্যস্রোত যতক্ষণ রইল, নানকচাঁদ নীরবে ধীরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাধা দেবার চেষ্টা করলেন না, কোন রকম অসহিষ্ণুতাও প্রকাশ

করলেন না। শুধু তাঁর সারা মুখে ও চোখে একটা অপরিসীম করুণার ভাব ফুটে উঠল—কাল্‌কাপ্রসাদের কথায় ও কথা বলার ভঙ্গিতে।

তার পর কাল্‌কাপ্রসাদ থামলে তার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে নানকচাঁদ অদ্ভুত একরকমের শান্তকণ্ঠে বললেন, 'তুমি টাকা চাও, না? টাকার ওপর খুব লোভ তোমার?'

এতক্ষণে কাল্‌কাপ্রসাদের মনে হ'ল যে, কোথায় আরও একটা কি বড় রকমের বেকুবি হয়ে গেছে। কেমন করে যেন এই ধীর শান্ত লোকটার কাছে বড় ছোট হয়ে গেছেন তিনি।

বড় বেশী লোভ তিনি প্রকাশ করে ফেলেছেন খুশির আতিশয্যে। তাই লোকটা তাঁর ওপর এক হাত নেবার সুযোগ পেয়েছে। ওকে আগে কথা বলতে দিলেই ভাল হ'ত।

'কেন, কেন,—একথা বলছ কেন?'

ঈষৎ উদ্বিগ্ন ভাবেই প্রশ্ন করেন কাল্‌কাপ্রসাদ।

সে কথায় উত্তর না দিয়ে নানকচাঁদ নিজের মুখখানা একেবারে কাল্‌কা-প্রসাদের মুখের কাছে নিয়ে এলেন। তাঁর চোখের দিকে একরকম বিচিত্র স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে, কেমন একরকমের অদ্ভুত গলায় বললেন, 'মূর্খ, টাকা চাও তো ভিখিরীর মত খালি বাড়ি ঝাঁট দিতে এসেছ কেন? এখানে কী পাবে? এত সামান্য আশা তোমার? তোমার তো অভাব নেই, তবে এত নীচে নাম কেন? যাও, সাহেবদের পিছু পিছু যাও; এদের বিপদ কেটেছে বলে আমি মনে করি না। এদের সঙ্গে থাক গে, তেমন সময় ও সুযোগ এলে যে কটা সাহেবকে পার বাঁচাও গে।'

বেকুবের মতই বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাল্‌কাপ্রসাদ বললেন, 'তার মানে?'

'মানে, নানাসাহেব যতই কথা দিন, এই সাহেবরা নিরাপদে প্রাণ নিয়ে শেষ পর্যন্ত এলাহাবাদে পৌঁছতে পারবে বলে আমি মনে করি না।...আর এও মনে করি না যে, আংরেজ-রাজ শেষ হয়ে গেল হিন্দুস্থানে। এ বড় অদ্ভুত জাত—এই আংরেজরা। ঐ স্থবির বাহাদুর শা, নির্বোধ নানাসাহেব, আর এই কটা লুটেরা সিপাইএর সাধ্য নেই যে, আংরেজদের কাছ থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেয়। এরাই জিতবে শেষ পর্যন্ত। কাজেই যতটা পার, যেভাবে পার এদের বাঁচাবার চেষ্টা কর গে, আখেরে কাজ দেবে। তখন পাবে টাকা—যত খুশি। যাও।'

একরকম তাঁকে বাইরের পথের দিকে ঠেলে দিলেন নানকচাঁদ, তার পর নিজেও নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

॥ ৫৩ ॥

২৭শে জুন, ১৮৫৭।

এই তারিখটি ইংরেজের জাতীয় ইতিহাসে চিরকাল একটি ভয়াবহ দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ভয়, তার সঙ্গে বিদ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা—এক কথায় মানবমনের অনেকগুলি কু-বৃত্তির সঙ্গে চিরদিন বিজড়িত থাকবে এই দিনটি। এর পর এক শতাব্দীরও ওপর কেটে গিয়েছে, তবু ঐ দিনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা ইংরেজ জাতির স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে যায় নি।

সিপাহী-বিদ্রোহে মোট নরহত্যা বড় কম হয় নি। ইংরেজ গোড়ায় মরেছে —পরে মেরেছে। নিষ্ঠুর হত্যা, পৈশাচিক হত্যা, অকারণ হত্যা।—ইংরেজ মেরেছে প্রতিশোধ নিতে, বৈর-নির্বাতন হিসেবে। হিন্দুস্থানী মেরেছে প্রচণ্ড রোষে—হয়তো তাকেও বৈর-নির্যাতন বলা চলে। বহুদিনের বহু অসন্তোষ পুঞ্জীভূত ছিল তাদের মনে।

কিন্তু সে যতই হোক, কানপুরের হত্যাকাণ্ড সব স্মৃতিকেই ম্লান করে দিয়েছে—অন্তত ইংরেজদের ইতিহাসে। সতীচোরা ঘাট ও বিবিঘর—এই দুটি ঘটনার বুঝি জুড়ি নেই! সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাসে Massacre of Cawnpore অন্যতম প্রধান ঘটনা হিসেবেই চিরদিন পরিচিত আছে। কেউ কেউ বা সেদিনের সেই বীভৎস হত্যাকাণ্ডকে শুধু The Massacre এই আখ্যায় একেবারে সর্বপ্রধান স্থানটিই দিয়ে গিয়েছেন।

২৭শে জুন, ১৮৫৭।

ইতিহাসে এই দিনটি বিশেষ দিন হিসেবে চিহ্নিত আছে বটে, কিন্তু সেদিনের বিশেষ ইতিহাস কি কোথাও পাওয়া যায়?

সেদিক ঠিক যে কী ঘটেছিল তা পুরোপুরি কেউই জানে না। কোন্ পক্ষের কতটা দায়িত্ব তাও কেউ জানে না—জানবার উপায়ও নেই।

নানাসাহেবও জানতেন না।

আমিনা আজিমুল্লাকে মিথ্যে কথা বলেছিল। রাত্রে সে নানাসাহেবের ঘরে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে শুধু নৈশ-রহস্যের রমণীয় জালে তাঁকে বিভ্রান্ত ও অভিভূত করতে, নর্ম-লীলার উন্মত্ত উৎসবে তাঁকে মাতিয়ে অচেতন করে একান্ত অন্যমনস্ক রাখতে, এক কথায় বাইরের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ ঘটনা-সমুদ্রের গর্জন যাতে তাঁর কানে না পৌঁছয়, সেজন্য নানাসাহেব ও বাইরের জগতের মধ্যে নিজের বহুজন-ঈপ্সিত লোভনীয় ভঙ্গুর নারী-দেহটি দিয়ে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করতে।

সেদিন যেন নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করেছিল আমিনা। তার রূপ-যৌবনের অলৌকিক কুহকে নতুন করে যেন মোহিনী মায়ার প্রলেপ লেপন করেছিল। তার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা, সমস্ত ছলা-কলা-নৈপুণ্য প্রয়োগ করে সে সেই বিশেষ রাত্রে নিজেকে এমনিই এক দুর্নিবার বহ্নিশিখারূপে জ্বালিয়ে তুলেছিল যে, সে শিখায় পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া নানাসাহেবের উপায় ছিল না।...বহুদিন তার সঙ্গে কাটিয়েছেন নানাসাহেব—বহু প্রমোদলীলার, বহু বিলাস-বিহারের স্মৃতিই জাগ্রত আছে তাঁর মনে—এই রমণীকে কেন্দ্র করে, তবু যেন সেই পুরাতন লীলাসঙ্গিনীটিকেই একেবারে নতুন করে আবিষ্কার করলেন তিনি সেদিন। এ যেন সেই পূর্বপরিচিত হুসেনী নয়, যাকে এতকাল অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে রূপ-যৌবন-লাস্য প্রভৃতিতে আদালার অনেক নীচে স্থান দিয়ে এসেছেন। এ যেন আর কেউ, এ যেন সম্পূর্ণ নতুন! এর মোহিনী মায়ায় নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে, এর ঐ রক্তোৎপল-তুল্য পায়ে নিজেকে সঁপে দিয়েই জীবন ধন্য মনে হয়।

সেদিনের রাত্রি যেন চোখের পলক না ফেলতে কেটে গেল। নানাসাহেবের মনে হ'ল জীবনে সুখের রাত বড় ছোট, আনন্দের অবসর বড় কম। আরও মনে হ'ল হুসেনী যে এতই অপরূপ এতই কাম্য তা এর আগে অনুভব করেন নি কেন।...

রাত ছোট মনে হলে মানুষ দু হাত দিয়ে তাকে ধরে রাখতে চায়—দিনের প্রান্তে এসেও। নানাসাহেবও আজ তাই করলেন। হুসেনীর তরফ থেকেও কোন আপত্তি নেই। তার আচরণ দেখলে সন্দেহ হতে পারত—চিরজীবনের দয়িতকে সে এই বুঝি প্রথম কাছে পেয়েছে।...সুতরাং সেদিন নানাসাহেবের প্রভাত হ'ল যখন, তখন প্রভাতের চার দণ্ড উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তার পর ক্লান্ত সম্ভোগ-বিবশ দেহটাকে টেনে তুলে স্নান-প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে পুজোয় বসতে বসতে বেলা প্রথম প্রহরও উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

ইংরেজরা চলে যাবে আজ, পরাজিত আত্মসমর্পিত শত্রু তাঁরই অনুগ্রহে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাবে—আজ তাঁর গৌরবের দিন, উৎসবের দিন। সে কথাটা পুজো করতে করতে মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদের জন্য কৌতূহলী ও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন নানাসাহেব। টোপী ও আজিমুল্লা এত বেলা পর্যন্ত একটা সংবাদ-বিবরণ না পাঠানোর জন্যে প্রথমটা একটু বিরক্তিও বোধ করলেন। তার পরই মনে পড়ল, তিনি আজ এখনও পর্যন্ত অন্তঃপুরের গন্ডির মধ্যেই আবদ্ধ আছেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মনটা পূর্ব রাত্রির স্মৃতি-রোমন্থনে প্রসন্ন হয়ে উঠল। সেই প্রসন্নতা তাঁর কল্পনাতেও সঞ্চারিত হ'ল। সব ঠিক সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে কল্পনা করে নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু ভগবান গণপতির চরণে শেষ অর্ঘ্য দিয়ে ওঠবার আগেই অনেকগুলি গুলিগোলা-কামানের শব্দ কানে এল তাঁর। কোনমতে প্রণামটা সেরে বাইরে আসতেই দেখলেন মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে আছেন তাত্যা টোপী।

'কী ব্যাপার তাত্যা—এ সব কী?' উদ্বিগ্ন নানা প্রায় রুদ্ধশ্বাসেই প্রশ্ন করেন।

'আপনিই হুকুম দিয়েছেন পেশোয়া, আপনিই জানেন এসব কী!'

বিরক্তি শুধু নয়, টোপীর কণ্ঠে বিরোধিতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'আমি! আমি কী হুকুম দিয়েছি?' বিহ্বলকণ্ঠে প্রশ্ন করেন নানা।

'বিশ্বাসঘাতকতা করে নিরস্ত্র ইংরেজদের ওপর গুলি চালাতে!'

'সে কি! আমি তো কিছু জানি না!'

বলেন বটে, কিন্তু যুগপৎ নানা ও টোপীর কণ্ঠে একই সন্দেহ আবছায়ারূপ পরিগ্রহ করে।

'সিপাইরা এ বিশ্বাসঘাতকতা করতে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু আজিমুল্লা তাদের আপনার নাম করে হুকুম জানিয়েছে। বলেছে যে, আপনি রাজা এবং ব্রাহ্মণ, এ কাজে যদি কোন পাপ হয় তো সে পাপ আপনিই গ্রহণ করবেন।'

'সে কি! আমাকে না জানিয়ে আমার নাম করে হুকুম চালিয়েছে... আজিমুল্লার এত দুঃসাহস! তাকে ডেকে পাঠাও তো!'...একই সঙ্গে উত্তেজিত ও বিচলিত হয়ে ওঠেন নানা।

কিন্তু টোপীকে কোথাও যেতে হ'ল না। হুসেনী বোধ করি কাছেই কোথাও ছিল, সে এইবার নিঃশব্দে সামনে এসে দাঁড়াল।

'আজিমুল্লার কোন দোষ নেই পেশোয়াজী। আমি তাকে আপনার নাম করে ঐ আদেশ জানাতে বলেছিলাম, আমার দায়িত্বে।'

'সে কি—তুমি! তুমি কেন এ কাজ করতে গেলে হুসেনী?'

কেমন একরকম অসহায়ভাবে প্রশ্ন করেন নানা।

'আপনি যত সহজে আপনার শত্রুদের ক্ষমা করতে পারেন পেশোয়াজী, আমি পারি না। ওরা আপনার যে অনিষ্ট করেছে, আপনার কেন—সারা হিন্দুস্তানেরই দুশমন ওরা, আমাদের সকলেরই সর্বনাশ করতে চেষ্টা করেছে—ওদের এভাবে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারে না।...এই কটা ইংরেজ, ভেবে দেখুন, আপনার কত সৈন্যের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। যাদের একান্ত নগণ্য ও অসহায় ভেবেছেন, তাদের জন্যেই কী পরিমাণ বিব্রত হতে হয়েছে আপনাকে! তার ওপর ওরা যদি ওদের বড় দলের সঙ্গে মিলতে পারে, তা হলে কি আর রক্ষা থাকবে? না আপনি সহজে ওদের হারাতে পারবেন?...আপনার মুখ চেয়েই এ ধৃষ্টতা করেছি পেশোয়া—দণ্ড দিতে হয় দিন। হাসিমুখেই সে দণ্ড নেব।'

হুসেনীকে দণ্ড দেওয়া!

কাল রাত্রের আগেও হয়তো সে-কথা ভাবা চলত, কিন্তু এখন আর ভাবা যায় না।

বিমূঢ়ভাবে একবার তার মুখের দিকে চেয়ে মাথা নামিয়ে নিলেন পেশোয়া।

তার পর তাত্যার দিকে না চেয়েই কতকটা স্খলিত কণ্ঠে বললেন, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে, অন্তত মেয়েছেলে আর বাচ্ছাগুলোকে বাঁচাও তাত্যা—ছুটে যাও। দোহাই তোমার, আমার ওপর অভিমান করে থেকে সর্বনাশ আর বাড়িয়ো না।'

তাত্যা প্রায় ছুটেই চলে গেলেন।

তার গতিপথের দিকে চেয়ে আরও কিছুক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে নানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, 'কেন এ কাজ করলে হুসেনী, আমি যে ওদের কথা দিয়েছিলাম।'

'কথা দিয়ে তার খেলাপ করাটা মারাঠীদের পক্ষে খুব নতুন নয় পেশোয়া। পেশোয়া-বংশ কি এ কাজ এই প্রথম করলেন?'

কণ্ঠে তীক্ষ্ন বিদ্রূপ আমিনার।

পুজোর পরে দুগ্ধ পান করা পেশোয়ার নিত্য অভ্যাস। চাকর যথারীতি গরম দুধের 'কটোরা' নিয়ে এল। পেশোয়া ইঙ্গিতে তাকে চলে যেতে বলে সেই পট্টবস্ত্র-পরিহিত অবস্থাতেই এসে একটা চৌকিতে বসে পড়লেন।...বাইরে গিয়ে অবস্থাটা ভাল করে দেখা বা কোন নতুন আদেশ দেওয়া—কিছুতেই আর যেন কোন উৎসাহ রইল না তাঁর।

আমিনা এসে পাশে দাঁড়াল, কিন্তু স্পর্শ করতে সাহস করল না। পুজোর কাপড় এখনও ছাড়া হয় নি, তা ছাড়া মুখে এখনও একটু জল পড়ে নি। আমিনাকে ছুঁলে আবার স্নান না করা পর্যন্ত মুখে কিছু দিতে পারবেন না—একথাও সে জানে। সুতরাং স্পর্শের অভাবটা কণ্ঠের মাধুর্যেই সারতে হ'ল।...যত দূর সম্ভব মধুরকণ্ঠে অপরাধিনীর দ্বিধা এনে সে প্রশ্ন করল, 'আমার ওপর রাগ করলেন পেশোয়া? কিন্তু এবার একটা কথা বলি, কথার খেলাপ আপনার ঠিক হয় নি, গুলি ইংরেজই আগে চালিয়েছে নিরস্ত্র মাঝি-মাল্লাদের ওপর—সিপাইরা শুধু জবাব দিয়েছে মাত্র। আমার সেই নির্দেশই ছিল—আর তার অন্যথাও হয় নি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি

খাঁটি খবরই বলছি। বলুন এবার আমাকে ক্ষমা করবেন।'

নানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার দিকে চাইলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি কোমল হয়ে এল তাঁর। ম্লান হেসে বললেন, 'ক্ষমা? রাগ? না আমিনা, রাগ নয়। ভয় হচ্ছে—কোথায় চলেছি কে জানে। হয়তো এ কাজের এ-ই দস্তুর। মনে দ্বিধা রেখে এসব কাজ হয় না।...হয়তো তুমিই ঠিক করেছ—কে জানে!'

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নানা ধুন্ধুপন্থ।

॥ ৫৪ ॥

আমিনা নানাসাহেবকে বলেছিল, ইংরেজরাই প্রথম মাঝি-মাল্লাদের ওপর গুলি চালিয়েছে। কথাটা হয়তো একেবারে মিথ্যেও নয়। পূর্বেই বলেছি যে, সেদিনের সঠিক ঘটনা সম্পূর্ণ জানবার কোন উপায় নেই। হাজার হাজার লোক নিয়ে যেখানে কাজ, যেখানে অসংখ্য কর্তা, ঘটনার স্থান যেখানে এত বিস্তৃত—সেখানে কেউই সমগ্রভাবে খবর রাখতে পারে না।

সেদিনের ইতিহাস রচনা হয়েছে কয়েকটি লোকের জবানবন্দির ওপর। তারা কেউ ছিল ঘাটের ধারে অসংখ্য লোকের জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে, কেউ বা ছিল নিরাপদ দূরত্বে সরে—জনশ্রুতিতে সব শুনেছে। কালুকাপ্রসাদ শেষোক্ত শ্রেণীরই একজন। যদিচ কালুকাপ্রসাদের সাক্ষ্যের ওপরও অনেক ঐতিহাসিক জোর দিয়েছেন।

সেদিন যে ইংরেজ কজন এলাহাবাদের উদ্দেশে নৌকোয় চেপেছিল, তাদের মধ্যে মাত্র চারজন লোক শেষ অবধি প্রাণে বাঁচতে পেরেছিল। টমসন ও ডিলাফোস্ তাদের মধ্যে দুজন। এঁরাও লিখিত ইতিহাস রেখে গেছেন। বিশ্বাস করতে হলে এঁদের কথাই বিশ্বাস করা উচিত। বর্তমান কালের ঐতিহাসিকরাও এঁদের কথার ওপরই বেশী জোর দিয়েছেন।

২৭শে জুন সকালবেলাই পূর্ব-প্রতিশ্রুতিমত আজিমুল্লা কতকগুলি ডুলি, 'বয়েলগাড়ি',—এমন কি ষোলটি হাতীও পাঠিয়েছিলেন—মানুষ ও মাল নদীর ঘাটে পৌঁছে দেবার জন্যে। বলা বাহুল্য যে, সব লোক সে ডুলি ও হাতীতে ধরে নি। মালগুলি গো-গাড়িতে চাপিয়ে স্ত্রীলোক, রুগ্ণ ও শিশুদের ডুলি এবং হাতীতে ভাগাভাগি করে তুলে দিয়ে সমর্থ পুরুষরা সকলেই হেঁটে সতীচৌরা ঘাট পর্যন্ত গিয়েছিলেন। অনেকে বলেন সব শেষে পড়েছিলেন কর্নেল এওয়ার্ট। তাঁকে ও তাঁর বিবিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে কেটে ফেলা হয়। হুইলার সাহেবও নাকি ডুলি থেকে নামবার সময় সিপাহীদের তরবারিতে প্রাণ হারান।

কিন্তু হুইলার সাহেব আদৌ ডুলিতে চড়েন নি, তাঁর স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে গোটা পথটাই হেঁটে এসেছিলেন—এর একাধিক বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। তাঁর বেয়ারা নাকি তাঁকে একটা নৌকোয় চড়তেও দেখেছিল। এবং 'নাচারগড়' সব শেষে ছেড়েছিলেন মেজর ভাইবার্ট—এওয়ার্ট নয়। ভাইবার্ট নিরাপদে ঘাট অবধি এসে নৌকোতে চড়েছিলেন—তারও বহু প্রমাণ আছে।

যে চারজন* শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন, তাদের অভিজ্ঞতাও অবশ্য ঐসব ঐতিহাসিকদের সঙ্গে মেলে না। নিজেদের সঙ্গেও মেলে না।

* মব্রে টমসন, ডিলাফোস, সলিভান ও মারফি।

কেবল তাঁদের বিবরণ থেকে এইটুকুই বোঝা যায় যে, সাহেব-মেমরা নৌকোয় ওঠবার আগে পর্যন্ত সিপাহীরা সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত আচরণই করেছে। অনেকেই পুরাতন অধিনায়কদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে, তাঁদের মালপত্র বেঁধে-ছেঁদে গো-গাড়িতে বোঝাই দিয়েছে—কুশলপ্রশ্ন-বিনিময় প্রভৃতি হৃদ্যতারও অভাব হয় নি। এমন কি টমসন ঘাটে যেতে যেতে তাঁর পূর্বপরিচিত এক সিপাহীকে প্রশ্ন করেছিলেন, এলাহাবাদ পর্যন্ত সত্যিই তাঁরা নিরাপদে যেতে পারবেন কিনা, তার উত্তরে সে নাকি আন্তরিকভাবেই তাঁকে আশ্বস্ত করেছিল।

প্রথম বিশ্বাসঘাতকতার চিহ্ন পান টমসন—সর্বশেষ ইংরেজ মেজর ভাইবার্ট নৌকোয় ওঠবার পর। তখন সকাল ঠিক নটা। সকলের ওঠা হয়ে গেলেই নাকি মাঝি ও মাল্লারা সব ঝুপঝাপ করে জলে লাফিয়ে পড়ে তীরবেগে পাড়ের দিকে ছুটতে শুরু করে। ভীত-সন্দিগ্ধ সাহেবদের তখন ঘরপোড়া গোরুর অবস্থা—তারা সঙ্গে সঙ্গেই ঐ মাঝিদের লক্ষ্য করে এক ঝাঁক গুলি ছোড়েন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর আসে পাড়ে-প্রতীক্ষমাণ সিপাহীদের কাছ থেকে—বন্দুক ও কামান একসঙ্গেই গর্জে ওঠে। সাহেবদের গুলি-ছোড়াকে তারা ভুল বুঝতেও পারে—বলা যায় না। নদীতে পৌঁছে নিরাপদে নৌকোয় চেপে প্রতিহিংসার ইচ্ছা তাঁদের প্রবল হয়ে উঠেছে—এমন মনে করাও আশ্চর্য নয়।

কিন্তু টমসন বলেন যে, মাঝিরা নৌকা ত্যাগ করবার আগে গোপনে খড়ের ছাউনিগুলোতে আগুন ধরাবার ব্যবস্থা করে গিয়েছিল। হয়তো বা জ্বলন্ত টিকা কি কাঠকয়লা বহু আগে থেকেই খড়ের মধ্যে লুকোনো ছিল। কিন্তু খররৌদ্রে শুকনো খড় বারুদের গাদার মতই দাহ্য—সামান্য স্ফুলিঙ্গেই জ্বলে ওঠে। সুতরাং তীরভূমির বন্দুকের গুলিতে আগুন ধরাও বিচিত্র নয়। আবার অনেকের মতে মাঝিরা নৌকা থেকে নেমে পড়তেই সিপাহীরাও নাকি পাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে ইংরেজ বধ করতে থাকে।

এর পর কী হল তা টমসন বা ডিলাফোসেরও ভাল করে মনে পড়বার কথা নয়। সম্ভবত সবটা বুঝতেও পারেন নি। নৌকোগুলো জ্বলছে—তার সঙ্গে চলেছে তীর থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণ। তাড়াতাড়ি পালাবারও উপায় নেই। চড়বার সুবিধা হবে বলে নৌকোগুলোকে যতটা সম্ভব পাড়ের কাছে এনে রাখা হয়েছিল। ফলে গ্রীষ্মের স্তিমিত গঙ্গার পাঁকে ও কাদায় বেশির ভাগ নৌকোই গিয়েছিল আটকে। মাঝি-মাল্লার ঠেলায় হয়তো তা সহজেই জলে ভাসত, কিন্তু অনভ্যস্ত ইংরেজ সৈনিকদের কাছে সেটুকু কাজও সময়-সাধ্য। অনেকেই জলে নেমে টানাটানি করে নৌকো ভাসাতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ দিলেন।

কেবল মেজর ভাইবার্ট যে নৌকোয় ছিলেন, সেই নৌকোটি সৌভাগ্যক্রমে জলেই ভাসছিল, তাকে দূরে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন হল না। তাতে আগুনও লাগে নি। আরও একটি নৌকো তাঁদের পিছু পিছু আসছিল, কিন্তু কামানের গোলা লেগে সেটি ডুবে গেল। ওর আরোহীদের কাউকে কাউকে অগ্রবর্তী নৌকোয় টেনে তোলা হল। টমসন কোন নৌকো পান নি—তিনি সাঁতার কেটে এসে শেষ পর্যন্ত ঐ নৌকোতেই ওঠেন।

তখন ফিরে তাকাবার অবকাশ ছিল না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অতি বড় নির্ভীকও আত্মীয়-স্বজন স্ত্রীপুত্রের কথা ভাবে না। টমসনরাও ভাবেন নি। বাকি সকলের কী হল তাঁরা জানেন না। যেসব মহিলা ও শিশু তীরের

অচল এবং প্রজ্বলন্ত নৌকোয় পড়ে রইল, তাদের অনিশ্চিত পরিণাম এবং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিজেদের প্রাণ নিয়ে প্রায় প্রতি মুহূর্তে যমের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ভেসে চললেন। নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় ছিল না। কারণ শত্রুর গোলা ও গুলি সঙ্গে সঙ্গেই চলল। মাঝ-গঙ্গায় পড়ার পর কামানের গোলা থেকে রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু বন্দুকের গুলি ঠেকাবে কে? এ ছাড়া জ্বলন্ত তীর এসে পড়তে লাগল আশেপাশে অজস্রধারায়। কতকগুলি নৌকোতে আগুন লাগিয়ে নৌকোগুলি স্রোতে ছেড়ে দেওয়া হল—ভাসতে ভাসতে পলাতক নৌকোর কাছে এসে পড়লে ও নৌকোর আগুনের ফুলকি থেকে এ নৌকোর খড়ের চালে আগুন লাগতে আর কতক্ষণ!

তবু জীবনের মায়ায় ঐ হতভাগ্যের দল প্রাণপণে মরণের সঙ্গে লড়েই চলল। যারা মরল তারা মরল—তাদের পানে ফিরে তাকাবার অবসর রইল না। দল ক্রমশই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল। দাঁড় বেশি নেই—নদী থেকে টুকরো কাঠ ও বাঁশ কুড়িয়ে নিয়ে জল কাটাবার চেষ্টা চলতে লাগল।

দুপুর রাতের পর থেকে সকালের দিকটা পর্যন্ত একটু বিশ্রাম পাওয়া গেল। কিন্তু নজফগড়ের কাছাকাছি আসতে একটি স্নানার্থীর মুখে শোনা গেল যে, সেখানকার জমিদার বিপুল এক দল নিয়ে পাড়ে অপেক্ষা করছেন। সেই স্নানার্থী লোকটিকে মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে হাতে কিছু টাকা দিয়ে গ্রামে পাঠানো হল কিছু আটা কিনতে—বলা বাহুল্য, সে আর ফিরল না। বেলা দুটো নাগাদ নৌকো নজফগড়ের কাছে এসে পড়ল। সত্যিই তীরে বিপুল এক দল লোক দাঁড়িয়ে। তাদের সঙ্গে বন্দুক তো আছেই, একটা কামানও কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে। ঠিক সেই সময়েই এদের নৌকোটা গেল চড়ায় বেধে। তবে এরা মরীয়া হয়ে লড়ছে বলেই বোধ হয় হিন্দুস্থানীরা সুবিধা করতে পারল না। কামান যে ছুঁড়বে সে-ই মরে গেল। কোনমতে ওদিকটা সামলে টানাটানি করে নৌকো ভাসানো হল তো দেখা গেল কানপুর থেকে এক নৌকো সিপাহী এসে পড়েছে। তবে পলাতকদের ভাগ্যক্রমে সে নৌকোও চড়ায় বেধে গেল।

সন্ধ্যার মুখে ভাইবার্টদের নৌকো আর এক চড়ায় লেগেছিল, কিন্তু সে যাত্রায় বাঁচিয়ে দিল ঝড়। ঝড়ের দমকা বাতাসে নৌকো আবার আপনা থেকেই জলে ভাসল।

আরও একটি রাত কাটল।

কিন্তু প্রভাতের আলোয় আশা জাগল না হতভাগ্যদের প্রাণে—সে জায়গায় দেখা দিল আরও হতাশা।

অন্ধকারে পথ ভুল করে মূল নদী ছেড়ে পাশের একটা খাঁড়িতে ঢুকে পড়েছে তারা—এখানে নৌকো চালানোর চেষ্টা করাও বুঝি বাতুলতা।...

পিছু হটবার বা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করার আগেই শত্রুরা এসে পড়ল। তখন নৌকো ছেড়ে সকলে নীচে নামল। মরতে হয় তো লড়াই করেই মরবে। আত্মরক্ষার উন্মত্ত প্রচেষ্টায় সেই জন-বারো ইংরেজের বাহুতে সহস্র সৈনিকের শক্তি জাগল। সে প্রচণ্ড বিক্রমের কাছে দাঁড়াতে পারল না সিপাহী ও পল্লীবাসীর মিলিত দল। অবশেষে এক সময় প্রাণ নিয়ে পালাল তারা।

দুশমন তো গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে নৌকোটিও যে অন্তর্হিত!

নৌকোয় লোকও ছিল কেউ কেউ। সম্ভবত তাদেরও নিয়ে গেছে কানপুরের দল—নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে।

শ্রান্ত ও ক্লান্ত ইংরেজদের ক্ষুদ্র দলটি গত্যন্তর না পেয়ে নদীতীরের এক মন্দিরে আশ্রয় নিল। দুদিনের অনাহার, অনিদ্রা ও পরিশ্রম—খিদেয় পেটে মোচড় দিচ্ছে, তৃষ্ণায় বুক পর্যন্ত গেছে শুকিয়ে। মন্দিরে না আছে খাদ্য—না আছে জল! তার ওপর গোটা মন্দিরটাই এক সময় বেড়া-আগুনে পুড়িয়ে দেবার সংকল্প টের পাওয়া গেল। অবশেষে হতভাগ্যের দল আবার নদীতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্ষুধার অন্ন না থাক, জাহ্নবীর জলে তৃষ্ণা তো মিটবে। আর, এখনও হয়তো সামান্য শক্তি অবশিষ্ট আছে—সাঁতার কেটে কোথাও একটা যাওয়া চলতে পারে, পরে হয়তো সে উপায়ও থাকবে না।

তখন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র সাতে।

সাঁতার কাটতে কাটতে গুলি খেয়ে তার মধ্যে দু জন মারা গেল। এক জন আর সাঁতার দিতে না পেরে অবসন্নভাবে একটা চড়ায় এসে ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভাল করে জল থেকে ওঠবার আগেই এক লাঠি এসে মাথায় পড়ল। অব্যর্থ আঘাত—ফলে সব ঝঞ্ঝাট চুকে গেল। বেচারীর আর প্রাণ রাখতে এই প্রাণান্তকর চেষ্টার প্রয়োজন রইল না।

বাকি চার জন তখনও সাঁতার কাটছে। তবে আর যে বেশিক্ষণ পারবে না—তা তারাও জানে।

কিন্তু এবার বোধ হয় ভগবান মুখ তুলে চাইলেন—সম্ভবত ক্লান্ত হয়েই পেছনের দল পিছিয়ে গেল। অথবা মাত্র চার জনের জন্যে মজুরি পোষায় না বলেই ছেড়ে দিল!

অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাশে বা পিছনে শস্ত্রধারীর দল না দেখে এই চার জন এবার বিশ্রামের চেষ্টা দেখল। একেবারে তীরে আসতে তখনও ভরসা নেই। যতটা সম্ভব নিঃশব্দে পাড়ের দিকে এসে প্রায় কোমরজলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসল। অর্থাৎ তেমন সম্ভাবনা দেখলে আবারও নদীতে ভাসা চলবে।

তখন অনাহার-অনিদ্রায় তৃতীয় দিনও প্রায় শেষ হতে চলেছে। ২৭শে জুনের সূর্য পূর্বাকাশে থাকতেই তারা নৌকোয় চড়েছিল, এখন ২৯শে জুনের সূর্য অপরাহ্নে ঢলে পড়ছেন।

॥ ৫৫ ॥

এই পর্যন্ত গেল ইতিহাসের কথা। এবার কাহিনীতে ফিরে আসা যাক।...

মোহ যত বড়ই হোক, এক সময় তা কেটে যায়।

অকস্মাৎ দূরে—এই প্রাসাদের মধ্যেই কোথায় কোন্ শিশুর কান্না কানে যেতে, নানাসাহেবের মোহভঙ্গ ঘটল। তিনি যেন চমকে জেগে উঠলেন।

'কিন্তু মেয়েরা—?'

বিমূঢ় মুখে হুসেনীর দিকে চেয়ে আবারও প্রশ্ন করেন নানাসাহেব, 'মেয়েছেলে আর শিশুগুলোকে অন্তত বাঁচাও হুসেনী। আমাকে একেবারে চরম নরকে ডুবিও না।...আমি বরং এখন এক বার ঘাটে যাই...এই পোশাকেই যাব?...না-না, আমার পোশাকটা কাউকে আনতে বল—'

ছেলেমানুষের মত অসংলগ্ন কথা বলতে থাকেন নানা ধুন্ধুপন্থ পেশোয়া।

আমিনাও যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কণ্ঠে যথেষ্ট ব্যাকুলতা এনে বলে, 'দোহাই আপনার পেশোয়া, আপনি উঠবেন না। আমিই দেখছি। আপনি অসুস্থ...একটুখানি অন্তত বিশ্রাম নিন। পারেন তো একটু দুধ খান।...আপনি কিসের জন্যে ছুটোছুটি করবেন—আপনি রাজা, মালিক, আপনার ইচ্ছের ওপর কার কথা? পণ্ডিতজী তো গেছেনই। উনি ছাড়া না হয়, আজিমুল্লাকে ডেকে এখনই আপনার আদেশ জানিয়ে দিচ্ছি আমি, তার জন্য আপনি ছুটে যাবেন কেন?'

'তুমি কথা দিচ্ছ হুসেনী?'

'কথা দিচ্ছি পেশোয়া।'

হুসেনী সত্যিই ছুটে বার হয়ে গেল।

কিন্তু অন্দরের শেষপ্রান্তে এসে পেঁছিতেই প্রথম যার সঙ্গে তার দেখা হল সে আজিমুল্লা।

তাঁর ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা—চোখের দৃষ্টিতে ক্লান্তি।

'কী খবর আজিমুল্লা?'

উদ্বেগে ও ব্যাকুলতায় আজিমুল্লাকে সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন করার কথাটা তার মনে পড়ে না।

'খবর কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। তোমার আদেশ পুরো তামিল করা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না বেগমসাহেবা। সিপাহীরা মেয়েদের উপর গুলি চালাতে রাজী হচ্ছে না। বলছে যে কসাইরাও পাঁঠী কাটতে চায় না—আমরা তো সিপাই! মেয়েছেলে আর বাচ্ছাদের ওপর গুলি চালাতে আমরা হাতিয়ার ধরি নি।'

'হুঁ...যাক্, আপাতত ওরা বাঁচুক! এদিকে নানাসাহেবও একেবারে ক্ষেপে উঠেছে—মেয়েছেলে আর ছেলেমেয়েগুলোকে অন্তত বাঁচাতে হবে। বুড়ী মেয়েদের মতই কাঁপছে সে। এতক্ষণে হয়তো কেঁদেও ফেলেছে। এ যাত্রা থাক্, তার পর আমি আছি। দরকার হয় এ হাতেও বন্দুক কিংবা তলোয়ার ধরতে পারব!'

'কোথায় রাখা যায় ওদের? আপাতত প্রাসাদেই আনতে বলেছি। এখানে থাকবে, না বিঠুরে পাঠিয়ে দেব?'

'উঁহু, উঁহু, বেকুবি ক'র না আজিমুল্লা। রাক্ষসীর জাত ওরা—ওদের বাঁচতে দেওয়া চলবে না।...প্রাসাদে তাত্যা আছে, স্বয়ং নানা আছেন, ওঁদের দয়ার শরীর, দয়া উথলে উঠবে একেবারে। আর বিঠুরে আছেন বাজীরাও-এর বিধবারা—তাঁরা আমাদের কুকুর-বেড়ালের মত ঘৃণা করেন।'

'কিন্তু তাঁরা তো প্রায় বন্দী!'

'হ্যাঁ বন্দী, কিন্তু প্রাসাদেই বন্দী। প্রাসাদের রক্ষীদের কাছে এখনও তাঁরাই বাঈসাহেবা।...না, না—অন্য কোথাও রাখতে হবে।'

'কোথায় রাখব বলে দাও বেগমসাহেবা, আর সময় নেই।' ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠেই প্রশ্ন করেন আজিমুল্লা। সম্ভবত এই দানবীয় রক্তপিপাসা তাঁর কাছেও অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

'আরও তো কিছু মেমকে আটক করে রাখা হয়েছে খাঁ সাহেব, তারা কোথায় আছে?'

'তারা? ওখানে একটা ছোট্ট ব্যারাক মত আছে, উঁচু দেওয়াল ঘেরা, কার

বাড়ি তা জানি না, সেইটাই খালি করে নেওয়া হয়েছে। বিবিরা আছে বলে সিপাইরা নাম দিয়েছে বিবিঘর।'

'ঠিক আছে, সেইখানেই ওদের নিয়ে গিয়ে তোল।'

আজিমুল্লা সঙ্গে সঙ্গেই চলে যেতে উদ্যত হলেন।

পেছন থেকে আমিনা তাঁর একটা হাত ধরল।

'দাঁড়াও। হুইলারের কী হয়েছে জান?'

'ঠিক বলতে পারব না। একজন বললে যে সিপাইরা তাকে কেটে ফেলেছে, নৌকোয় ওঠবার আগেই।...আরও তিন চার জনকে জিজ্ঞাসা করেছি, তারা কিন্তু সকলেই বলেছে যে হুইলারকে তারা নৌকোয় উঠতে দেখেছে। তার পরের খবর অবশ্য কেউই বলতে পারে না।'

'সে যাক্ গে, তার খবরের জন্যে আমি খুব উদ্বিগ্নও নই। বরং সে বেঁচে থেকে তার নির্বুদ্ধিতার ফলাফল দেখে গেলেই আমি খুশী হই।...আমার প্রয়োজন তাঁর মেয়েকে। তাঁর মেয়েকে ওদের সঙ্গে রাখা চলবে না। তাকে আমার চাই। সাবধানে কড়া পাহারায় তাকে এখানে নিয়ে আসবে। পেছনে বাগানের দোর দিয়ে সোজা নিয়ে যাবে আমার ঘরে। আমি তার জন্য অপেক্ষা করব।...মুসম্মৎ থাকবে অন্দরমহলের পথে, কোন অসুবিধা হবে না। নিজে না আসতে পার, কোন বিশ্বাসী লোক দিয়ে পাঠাবে। যাও।'

অত ব্যস্ততার মধ্যেও কৌতূহল অসংবরণীয় হয়ে ওঠে। ভ্রূ কুঞ্চিত করে আজিমুল্লা প্রশ্ন করেন, 'তাকে তোমার এত কি দরকার পড়ল বেগমসাহেবা? যদি—যদি তার কোন পাত্তা পাওয়া না যায়? কিংবা এর মধ্যেই ছুটকো গুলিতে যদি মরে গিয়ে থাকে?'

'না, না, তাকে আমার চাই-ই।...যদি মরে গিয়ে থাকে, মৃতদেহটাও নিয়ে আসবে। মৃত বলে শোধ তুলতে আমি ছাড়ব না। খুঁজে বার করতেই হবে। যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে তো বুঝব, তুমি—তোমরা একেবারে অপদার্থ। সিপাই লাগিয়ে গোয়েন্দা লাগিয়ে যেমন করে হোক খুঁজে ধরে নিয়ে আসবে। উল্লাস সিংকে বলবে তার যেখানে যত পুলিশ আছে সব লাগাতে, নইলে তাকেই নিজের হাতে টুকরো টুকরো করে ফেলব আমি।...যাও, হুইলারের বেটাকে আমার চাই-ই। তাকে আনতে না পারলে তুমিও মুখ দেখিও না!'

কৌতূহল কিছুমাত্র মিটল না, বরং বেড়েই গেল। তবু আর প্রশ্ন করতে সাহস হল না আজিমুল্লার। সেই মুহূর্তে ক্রোধে, ক্ষোভে, জিঘাংসায় আমিনার মুখখানা বোধ করি সত্যকার দানবীর মতই পৈশাচিক হয়ে উঠেছিল। ভয় হল বুঝি এখনই তার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে নখে-দন্তে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলবে। তিনি সভয়ে বেশ একটু দ্রুতপদেই বেরিয়ে গেলেন।

হোক দানবী, তবু লোভনীয় বৈকি!

বাসনার নিবৃত্তি হয় নি যে এখনও!

বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল আমিনাকে।

দ্বিপ্রহর অপরাহ্নে এসে পৌঁছল—তবু আজিমুল্লার পাত্তা নেই। শারীরিক ক্লান্তি আমিনারও বড় কম নয়, কিন্তু বিশ্রামের কথা তার মনে পড়ল না। আহারের তো কথাই ওঠে না—মুসম্মৎ জোর করে বার-দুই শরবত খাইয়েছে, নিতান্ত অসহ্য গরমে মুহুর্মুহু পিপাসা পায় বলেই সেটুকু

প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি। তবে শুধুই সেইটুকুই—অর্থাৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেটুকু হয়। আজিমুল্লাকে বিদায় দিয়ে একবার মাত্র সে নানাসাহেবের ঘরে গিয়েছিল সংবাদটা দিতে যে, সে কথার ঠিক রেখেছে, পেশোয়ার আদেশ সে আজিমুল্লাকে জানিয়ে দিয়েছে ; তার পরই নিজের ঘরে ফিরে এসেছে সে। এসেই স্নান করে নিয়েছে—বোধ করি দৈহিক অশুচিতার সঙ্গে মানসিক গ্লানিও ধৌত করবার অক্লান্ত আগ্রহে ও আকুলতায়। তার পরেই শুরু হয়েছে এই অধীর প্রতীক্ষা—পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহীর মতই অবিরাম পদচারণা। খবরও যেন আর কিছু নেই—পাবার উপায়ও নেই।

তবে বাইরের উত্তেজনা কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। সেটা এখান থেকেই বোঝা যায়। প্রভাতের সে উন্মত্ত কোলাহল অনেক কমে এসেছে—হয়তো বা দৈহিক ক্লান্তিতেই, কিংবা ঘটনাটার নতুনত্ব ফুরিয়ে গেছে বলেই। মনে হয় শহরের জীবনযাত্রা আবার প্রাত্যহিক খাতে বইতে শুরু করেছে। এধারে দ্বিপ্রহরের শেষ দিকেই তাত্যা তোপী, উল্লাস সিং, নানুহে নবাব, বালা সাহেব সকলে মিলে দরবার গৃহের দরজা বন্ধ করে নানার সঙ্গে মন্ত্রণায় বসেছেন। এখনও সে দরজা খোলে নি বা কেউ বাইরেও আসেন নি। বরং আরো দুজন পরে এসে সে মন্ত্রণায় যোগ দিয়েছে—টীকা সিং ও দুলগঞ্জন সিং। সম্ভবত নানাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

এর ভেতর আমিনার খবর কেউ নেয় নি। মন্ত্রণাগৃহে আজ তার ডাক পড়বে না তা তো জানা কথাই। সেখানকার আলোচনাটা কোন্ খাতে বইছে তা সে অনায়াসেই অনুমান করতে পারে। তার বিরুদ্ধেই অধিকাংশ রসনা বিষোদ্গারে ব্যস্ত। কথাটা মনে পড়তেই অবজ্ঞায় আমিনার সুরবাঞ্ছিত ওষ্ঠ দুটি বারেক কুঞ্চিত ও বিকৃত হয়ে উঠল। ভেড়ার দল সব! ওদের বিষই বা কতটুকু যে তাকে ভয় করতে হবে! বেচারা নানা! অন্তরের অপরিসীম ঘৃণা পাত্র উপচে উঠলেও সহজাত মমতায় কথাটা মনে না পড়ে পারল না—সকাল থেকে বেচারীর কিছু খাওয়া হয় নি। এমন কি বোধ হয় দুধটুকুও না। রাজা হবার শখ হয়েছিল, কিন্তু তার কোন স্বাভাবিক যোগ্যতা তো নে-ই, কোন শিক্ষাও পায় নি। সামান্য মাত্র আঘাতেই অস্থির হয়ে পড়েছে!

কিন্তু আজিমুল্লা কৈ?

সত্যিই কি সে শয়তানের বাচ্চা মেয়েটা হাতের মধ্যে থেকে পালিয়ে গেল নাকি?

কথাটা মনে পড়া মাত্রই অসহ ক্রোধে ও রুদ্ধ বিদ্বেষে মুখ আরক্ত হয়ে উঠতে লাগল আমিনার। ললাটের দু পাশের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। হাত দুটো নিরুপায় আক্রোশে শুধু মুষ্টিবদ্ধ করতে করতে নখগুলো করতলের নরম মাংসে কেটে বসল।

বারকয়েক পর পর—অকারণে জেনেও, মুসম্মৎকে বাইরে পাঠাল। তাতেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে দু-তিনটি সিপাহীকে প্রচুর বকশিশের লোভ দেখিয়ে পাঠাল মেয়েটার খোঁজে। কিন্তু শুধু অকারণ ছুটোছুটি করলেই তো খবর মেলে না। মুসম্মৎ আর ফিরলই না। অবশেষে ধৈর্য শেষ সীমায় উপস্থিত হতে যখন আর বেশী দেরি নেই, তখন সহসা আজিমুল্লাই এসে হাজির হলেন সঙ্গে রক্ষী-বেষ্টিতা এক তরুণী ইংরেজ-দুহিতা। আলি খাঁ নামে এক তরুণ সিপাহী নাকি ওকে নিয়ে পালিয়েছিল, অতি কষ্টে খুঁজে বার করে এনেছেন

আজিমল্লা।

আতঙ্কে, অনশনে, কদিনের অনিয়মে—সর্বোপরি ধুলোয়-রৌদ্রে-পরিশ্রমে পূর্বের চেহারার সাদৃশ্য মিলিয়ে পাওয়া শক্ত, তবু আমিনা ভাল করে চেয়েই চিনতে পারল—হুইলারের দুহিতাই বটে, কোন ভুল নেই।

যে অবস্থা দেখলে স্বাভাবিক যে-কোন মানুষের চোখে জল আসবার কথা, সেই দৃশ্যই আমিনার দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে তুলল। এতক্ষণে যেন সে কিছুটা তৃপ্ত হয়েছে, তার এতদিনের আয়োজন সার্থক হ'তে চলেছে!

রক্ষীদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে আমিনা একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল মেয়েটি টলছে। ইঙ্গিতে একটা চৌকি দেখিয়ে দিয়ে ইংরেজিতে বলল, 'ব'স!'

তার পর কিছু পূর্বে তারই জন্য মুসম্মত যে শরবৎ রেখে গেছে, শরবতের পাত্রটা এনে তার সামনে ধরে বলল, 'খাও!'

মেয়েটি এক মুহূর্ত ইতস্তত করল—হয়তো বা শত্রুর দেওয়া পানীয়ে মৃত্যু লুক্কায়িত আছে কিনা সেই কথাটাই ভেবে নিল, কিন্তু এখন আর প্রত্যাখ্যান করার মত অবস্থাও নয় তার। হোক বিষ—পানীয় তো! শারীরিক শক্তি তার এমনিতেই নিঃশেষ হতে বসেছে। সে সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে শরবতটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে শেষ করল। পাত্রটি ধরে থাকার সামর্থ্যও আর বুঝি নেই। হাতটা থরথর করে কাঁপছে দেখে আমিনা তাড়াতাড়ি শূন্য পাত্রটা নিজেই নিয়ে নামিয়ে রাখল।

এবার গলাটা একটু নামিয়ে বলল, 'শোন, তোমাকে এখানে কেন এনেছি জান? তোমার প্রাণ রক্ষা করতে!'

মেয়েটি কী বলতে গেল, বলতে পারল না। ঠোঁট দুটি বৃথা কাঁপল মাত্র। আমিনা অসহিষ্ণুভাবে তাকে নিবৃত্ত করে বলল, 'জানি বলবে যে সবাই যখন গেল, আমারই বা বাঁচবার দরকার কি?…কিন্তু সবাই গেলেও মানুষ বাঁচতে চায়। জীবন বড় প্রিয়। ঐ যাদের বিবিঘরে পাঠানো হল, তাদেরও কেউ বাঁচবে না। মহামান্য পেশোয়া তাঁর বহু অপমান, বহু প্রবঞ্চনার কথা ভোলেন নি—শোধ তিনি তুলবেনই। কিন্তু তোমার বাবাকে আমি জানি, তাঁর মত প্রবীণ বীরের যদি সামান্য উপকারও করতে পারি—সে-ই আমার চেষ্টা। তা ছাড়া তিনি আমাদের বিশ্বাস করেছিলেন—বিশ্বাস করে ঠকেছিলেন। তাঁর কাছে আমাদের লজ্জার ঋণ আছে। সেই কারণেই তোমাকে বাঁচাতে চাই। কিন্তু এখন বর্তমান অবস্থায় কোন ইংরেজ-রমণীর এদেশে প্রাণ বাঁচানো শক্ত এটা তুমি বুঝতে পার অবশ্যই। সব সময় তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখাও সম্ভব নয়। আর তা রাখলেও, উন্মত্ত জনতার জিঘাংসার সামনে কটা রক্ষীর কী সাধ্য! তাই স্থির করেছি, তোমাকে আমার বোনের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।'

এক মুহূর্ত থামল আমিনা, বোধ করি প্রস্তাবটা করতে তখনও সংকোচে বাধছিল। তার পর বিস্মিত আজিমল্লার বিস্ফারিত চোখের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিন্তু একটা কথা—সেটা, মানে সে পাড়াটাই কসবীদের মহল্লা। আমার বোনও তাই ছিল তা তুমি জান নিশ্চয়।…সেখানে সেইভাবেই থাকতে হবে।'

মেয়েটির প্রথমটা বুঝতে দেরি হল, তার পরই শিউরে উঠে বলল, 'না-না—

না—সে আমি পারব না !'

'পারতেই হবে বোন। নইলে বাঁচবার উপায় নেই। সে মহল্লা—আর শুধু সে মহল্লা কেন, অন্য কোথাও তুমি বাঁচতে পারবে এমনি ? তা ছাড়া মৃত্যুতেই কি তুমি ইজ্জৎটা বাঁচাতে পারবে শেষ পর্যন্ত ? হয়তো দুটোই যাবে। তার চেয়ে একটাই থাক। আর চাই কি, কোন মুসলমান রইসের নজরে পড়ে গেলে তার ঘরণী হয়ে সম্ভ্রান্তভাবেই জীবনটা শেষ করতে পারবে। আমাদের ধর্মে সে উদারতা আছে। যাও ভাই—আর ইতস্তত করে সব নষ্ট ক'র না !'

আদেশমত রক্ষীরা এসে আবার তাকে বেষ্টন করল। নীচে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকি আছে, তাইতে করে নিয়ে যেতে হবে, নইলে বাঁচানো কঠিন। মেয়েটিকে শুনিয়েই আমিনা নির্দেশ দিল।

কী শুনল আর কী শুনল না মেয়েটি, কে জানে—যেমন এসেছিল, আচ্ছন্ন অভিভূতের মত রক্ষীদের সঙ্গে তেমনিই বের হয়ে গেল—অজ্ঞাত, অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে।...

ওদের পদধ্বনি মিলিয়ে যেতেই আজিমুল্লা ক্ষুব্ধভাবে বললেন, 'কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ির কি সত্যই দরকার ছিল বেগমসাহেবা ?'

'সব প্রয়োজন সবাইকে বোঝানো যায় না খাঁ সাহেব। যে জ্বালা এ বুকে জ্বলছে তা সহজে নিভবে না, এ তৃষ্ণা মিটবে না সহজে ! তবে এক জনকেই বেছে নিয়েছি মাত্র—এদের মধ্যে যে সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত তাকেই। বাকিদের সম্বন্ধে নিশ্চিত থাক আজিমুল্লা খাঁ—তারা মরবে, কিন্তু ইজ্জৎ নিয়ে মরবে। যাও, কাজে যাও। আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে আজ, অনেক দিনের অনেক ঘুম বাকি আছে।'

॥ ৫৬ ॥

কালুকাপ্রসাদজী উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছেন। তাঁর বিপদ অনেক। ভিড় এড়াতে হবে, নইলে কে কোথায় চিনে ফেলবে তার ঠিক নেই। অথচ ভিড়ের মধ্যে না গেলে ঠিক জলের মধ্যে কী ঘটছে তাই বা দেখা যায় কেমন করে ? কোনমতে অস্ত্রধারীদের পাশ কাটিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে যতটুকু দেখা যায় আর দৈবাৎ কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখের ভিড় পেলে সন্তর্পণে পুরো তামাশাটার বিবরণ জিজ্ঞাসা করা—এতেই যতটা হয়। কখন কোন পরিচিত লোকের সামনে পড়ে যাবেন, সে তখনই হয়তো চেঁচিয়ে উঠবে—'এই লোকটা সাহেবদের নোকর, দাও ওকেও সাবাড় করে'—আর সঙ্গে সঙ্গে কাছেই যে শস্ত্রধারী আছে সে অমনি দফা নিকেশ করে দেবে একগুলিতে !

না, বেঁচে থাকলে ঢের পয়সা রোজগার হবে। পৈতৃক প্রাণটা বেঘোরে খুইয়ে লাভ নেই।

কিন্তু মনে মনে যতই এবংবিধ শুভ সংকল্প করুন, শেষ পর্যন্ত ঘাট ছেড়ে যেতেও পারলেন না। কে যেন চৌম্বক আকর্ষণে তাঁকে ধরে রাখল।

অবশ্য থেকেও যে বিশেষ সুবিধা হল তা নয়, নানকচাঁদর উপদেশ কোন কাজেই লাগল না। চোখের সামনেই গণ্ডায় গণ্ডায় সাহেব মরল, নৌকোয় আগুন লাগল, মেমসাহেব ও বাচ্চা যারা মরতে পারল মরে বাঁচল, যারা পারল না তারা খোঁয়াড়ে আবদ্ধ পশুর মত জড়ো হয়ে কাঁপতে লাগল।

এক্ষেত্রে নিরুপায় নিস্পৃহ দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। সিপাহীদের মনোভাব তো দেখাই যাচ্ছে—দর্শকদের মনোভাবও অনিশ্চিত। কেউ কেউ স্পষ্টই উল্লাস প্রকাশ করছে, তবে সে সংখ্যায় খুব বেশী নয়। অধিকাংশই শুধু দেখে যাচ্ছে। তাদের ঠিক মনের ভাব কী তা কে বলবে? সহানুভূতি আছে কিনা বুঝতে যাওয়া তো বিপদ! শেষে যদি হিতে বিপরীত হয়? দু-এক জায়গায় উল্টো কথা পেড়ে দেখতে গেলেন, তাতে ফল হল না। কারণ ওঁর মতলব বুঝতে না পেরে তারা সন্দিগ্ধভাবে মৌনী হয়ে রইল। রাষ্ট্র-বিপ্লবের দিনে সকলেই সাবধানে থাকতে চায়।

অবশেষে অনেক সুলুক সন্ধানের পর মন্দিরের পেছনের পাঁচিল থেকে নজরে পড়ল, দুটি নৌকো কতকগুলো সাহেব নিয়ে মাঝগঙ্গায় ভেসে চলেছে, আর তাদের পেছনে সিপাহীদের নৌকো থেকে এবং পাড় থেকেও অসংখ্য অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। খানিকক্ষণ—রুদ্ধনিশ্বাসে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে দেখলেন কালীপ্রসাদ। গুলি ও গোলায় সাহেবরা দু-এক জন করে মরতে লাগল বটে, কিন্তু নৌকো দুটি থামল না—অপটু হাতের দাঁড় ও স্রোতের ওপর নির্ভর করে ভেসেই চলল।

কালীপ্রসাদ আর দাঁড়ালেন না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলেন। অনেকেই ছুটছে, তাদের সঙ্গে ছোটা এমন কোন সন্দেহজনক ব্যাপার নয়। ক্রমে যখন সেই 'অনেকে' ক্লান্ত হয়ে ছোটা বন্ধ করল, তখন আর সন্দেহের ভয়ও রইল না। কালীপ্রসাদ নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটতে লাগলেন। কিন্তু কতক্ষণই বা ছুটবেন, ঈশ্বরেচ্ছায় (সাহেবদের অনুগ্রহেও বটে) প্রচুর 'দুধ-দধি-মালাই' খেয়ে দেহটা কিঞ্চিৎ ভারীই হয়েছে! মনের অদম্য আগ্রহ কতক্ষণ আর সে দেহ ছুটিয়ে নিতে পারে? পা দুটি ক্রমশ পাথরের মত হয়ে উঠল, হাপরের মত শব্দ করে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। তাও যেন পড়তে চায় না। বুকটা ফেটে যাবার মত হল। অবশেষে এক সময় বসেই পড়লেন।

তা ছাড়াও বিপদ আছে। সব জায়গায় নদীর পাড় অধিগম্য নয়। কাঁটাঝোপ জঙ্গল-বস্তি এসব ঘুরে যেতে যেতে নৌকো দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। তা ছাড়া স্থানে স্থানে স্থানীয় উৎসাহী লোকদের হল্লা তো আছেই। এক জায়গায় তো দেখা গেল রীতিমত কামান-বন্দুকের আয়োজন। সেখানে দর্শক হিসেবেও কাছে যেতে ভরসা হয় না।

হাল ছেড়ে দেওয়াই উচিত, কিন্তু কালীপ্রসাদ তবু হাল ছাড়তে পারলেন না। নানকচাঁদের সেই বিদ্রূপকুটিল দৃষ্টি এবং হিস-হিস কণ্ঠস্বর যেন দৈববাণীর মতই প্রাণে লেগেছে।

অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে এক উপায় ঠাওর করলেন। পাশের একটা গ্রামে ঢুকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক এক্কাওয়ালাকে বার করলেন এবং তাকে অনেক বুঝিয়ে দৈনিক এক টাকা হিসেবে ভাড়া কবুল করে নগদ দশটি টাকা জমা রেখে তারই সেই ক্ষীণকায় অশ্বতরটিতে সওয়ার হয়ে বসলেন। দড়ির রাশ—তা হোক, খচ্চর-পুঙ্গবের আর এমন শক্তি অবশিষ্ট নেই যে বেশী গোলমাল করবে। সেই গ্রাম থেকেই খানিকটা দুধ খেয়ে নিয়ে গামছার প্রান্তে খানিকটা 'মাওয়া' বা খোয়াক্ষীর সংগ্রহ করে আবার রওনা দিলেন।

কিন্তু আর একটু পরেই অন্ধকার হয়ে এল। এদিকে কোথায় বা নৌকো আর কোথায় বা সাহেব! এখন রাতটা কোথাও কাটানো দরকার—সকালে তখন

না হয় খোঁজা যাবে। আশ্রয় মেলা কঠিন কথা নয়। তবে হঠাৎ কোন অপরিচিত জায়গায় আশ্রয় নিতেও ভরসা হয় না। সঙ্গে কিঞ্চিৎ টাকাও আছে, খুব বেশি নয় অবশ্য, তবু এই সব হাঙ্গামার দিনে টাকার লোভ বেড়েই যায় মানুষের। তা ছাড়া প্রাণটা থাকতে টাকার অঙ্ক জানার উপায় নেই। আশায় ও লোভেই জানটা কেড়ে নেবে হয়তো! সুতরাং কোথাও যাওয়ার কথা ভেবে পেলেন না। নদীর ধারে জঙ্গলে থাকতেও ভরসা হল না—সেখানে ছোটখাটো এক-আধটা বাঘ থাকা বিচিত্র নয়। অবশেষে ঘোড়াটাকে একটা ঝোপের পাশে বেঁধে নিজে অতি কষ্টে একটা গাছে চড়ে বসলেন। দুর্দান্ত মশা, স্থির হয়ে বসা যায় না, অথচ বেশী সাড়া-শব্দ করতেও ভরসা হয় না, কেউ কোথা থেকে এসে দেখলে চোর-ডাকাত ভেবে মেরে ফেলতে পারে। শেষে পাগড়ি খুলে আপাদমস্তক মুড়ি দিলেন।

যা হোক কোনমতে রাতটা কাটল। ঢুলতে ঢুলতে দু-এক বার পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, নইলে আর কোন বিপদ ঘটে নি।

জনবিরল নদীতীরে 'ওঁয়াদের' ভয় যে কিছু ছিল না এমন নয়, তবে গাছের ডালে সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে তিনিও সেই 'ওঁয়াদের' দলেই মিশে গেছেন—মনে মনে এই একটা ক্ষীণ সান্ত্বনা ছিল।

রাত্রি প্রভাত হলে আবার সেই কষ্টকর যাত্রা।

নৌকো ততক্ষণ বহুদূর চলে গেছে। একেবারে দ্বিপ্রহর পার হয়ে আবার হদিস মিলল, কিন্তু তখনও পেছনের লোক হাল ছাড়ে নি, কালকাপ্রসাদ দূরে থেকে সেই নীরব দর্শক হয়েই রইলেন।

সেদিনও যথাসময়ে সন্ধ্যা হল। কিন্তু সেদিন আর কালকাপ্রসাদ আশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত হলেন না। ঘোড়াটা একেই ক্ষীণজীবী, তাতে সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত। সেটাকে এক একাওয়ালার কাছে গছিয়ে খরচ বাবদ দুটি টাকা দিয়ে তার ঘোড়াটিকে সংগ্রহ করলেন। (কবে কি লাভ হবে তার ঠিক নেই, মাঝখান থেকে এতগুলি কষ্টার্জিত অর্থ খতম!) এটাও তেমন জোরালো নয়, তবে সারাদিনে পরিশ্রম বিশেষ হয় নি, অনেকটা তাজা আছে—তেমনি তেজী হলে অবশ্য তাঁরও সামলানো ভার হত—কালকাপ্রসাদ সীতারাম ও মহাবীর স্মরণ করে ওতেই সওয়ার হলেন এবং এদিকের একটা সহজ পথ ধরে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যেই মুরার-মাউ গ্রামে তাঁর বন্ধু জমিদার দিগ্বিজয় সিং-এর বাড়ি উপস্থিত হলেন।

রাস্তাটা সোজা এসেছে, নদী গেছে মস্ত বড় বাঁক বেড়ে অনেকটা দূরে ঘুরে। ওরা যত তাড়াতাড়িই আসুক, কাল সকালের আগে পৌঁছতে পারবে না।

দিগ্বিজয় সিং কালকাপ্রসাদকে দেখে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলেন। তবে আদর-যত্নের ত্রুটি হল না। তাঁর ইংরেজ-বিদ্বেষ এত ভয়ঙ্কর নয় যে, শুধুমাত্র ইংরেজের নোকর এই অপরাধে বন্ধুকে যত্ন করবেন না। সত্যি কথা বলতে কি, দিগ্বিজয় সিং ঠিক ইংরেজরাজের অবসানটাও চাইছিলেন না, কারণ ওদের অনুগ্রহেই তাঁর পিতামহ তালুকদার হয়ে বসেছিলেন। কে অযোধ্যার নবাব গেল, আর কোথাকার পেশোয়া মরল, তার জন্য তাঁর মাথাব্যথা নেই। বরং বাহাদুর শা বাদশা হলে আবার তাঁকে পুরোপুরি অরাজকতার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, পুরো এক দল লেঠেল পুষতে হবে—সেই ভাবনাটাই ছিল।

সুতরাং তিনি আন্তরিকভাবেই বন্ধুকে আলিঙ্গন করলেন। গুড়ের শরবত

এল, 'মহারাজিন' বা পাচিকাকে ডেকে পুরীর ফরমাশ হল, একটি ভৃত্য গ্রামে ছুটল কোন গোয়ালার বাড়ি কিছু মালাই আছে কিনা খোঁজ করতে।

আতিথেয়তার পালা চুকলে, দিগ্বিজয় প্রথম প্রশ্ন করলেন, 'তার পর কালুকাপ্রসাদ, হঠাৎ এত রাত্রে কী মনে করে বল দিকি? শুধুই বন্ধুপ্রীতি তা তো মনে হয় না!'

এই সরল প্রশ্নে মুনশীজী একটু বিব্রত বোধ করলেন। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'বরাত ফেরাতে চাও দিগ্বিজয় সিং?'

'কার বরাত—তোমার না আমার?'

'ধর দু জনেরই!'

'আমার বরাত ফেরাতে কোন আপত্তি তো নেই-ই, এমন কি নিজের ক্ষতি না করে যদি তোমার বরাত ফেরাতে পারি, তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

তখন সংক্ষেপে সতীচোরা ঘাটের বিবরণ দিয়ে কালুকাপ্রসাদ বললেন, 'একটা নৌকোয় ঠেকেছে, তবু সাত-আট জন তো হবেই কমসে কম। এদের বাঁচাও, বহুত ইনাম মিলবে—বরাত ফিরে যাবে।'

দিগ্বিজয় সিং ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'ওদের বাঁচিয়ে বরাত ফিরবে—না ওদের ধরিয়ে দিয়ে?'

'ছোঃ! তুমি কি ভাবছ সত্যি-সত্যিই আংরেজশাহি চলে গেল! কিছু না কিছু না, প্রথমটা ওরা প্রস্তুত ছিল না, তাই। ওধারে শোন নি নীল সাহেব কাশী এলাহাবাদে কী কাণ্ডটা করেছে? তাকে ঠেকাবে কে? তোমার ঐ নানা ধুন্ধুপন্থ, না ভীমরতি-ধরা বুড়ো বাহাদুর শা? না বন্ধু, যত পার আংরেজ বাঁচাও, আখেরে কাজে আসবে!'

'হুঁ!' দিগ্বিজয় সিং অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু তুমিই শেষ পর্যন্ত আমাকে ফাঁসাবে না তো? আমি আংরেজ বাঁচাই আর তুমি সেই খবরটি সেখানে পেঁাছে দিয়ে হাতে হাতে ইনামটা বুঝে নাও—এমনটা হবে না তো?'

কালুকাপ্রসাদ রীতিমত মর্মাহত হয়ে উত্তর দিলেন, 'আমার দেখছি এ কথা তোলাটাই ভুল হয়েছে। এত দিনের বন্ধুত্বের যদি এই পরিণাম হয়, যদি এই বিশ্বাসই জন্মে থাকে আমার ওপর, তা হলে বিদায় নেওয়াই ভাল, মানে-মানে আমি উঠি—'

'আহা-হা, চটছ কেন? বাজিয়ে দেখছি একটু তোমাকে। দিনকাল কী পড়েছে তা তো দেখছই। দোস্তি-ইমান এসব কথার কোন মূল্য আছে কি? সাহেবদের নিমক খায় নি কারা বল তো! যারা যত বেশি খেয়েছে, তারাই আজ তত উৎসাহী—সাহেব মারতে!'

কালুকাপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত শান্ত হলেন। বললেন, 'তা বটে, তবে এক্ষেত্রে আমিও তো সঙ্গে জড়িয়ে রইলুম!'

'হ্যাঁ, আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলুম, সাহেবদের ঠাঁই দিতে পারি, মোদ্দা তারা যত দিন থাকবে, তোমাকে এখানে থাকতে হবে—এই সাফ কথা আমার। দেখ, রাজী আছ?'

কালুকাপ্রসাদের মুখটা ঈষৎ গম্ভীর হল। মনের অবচেতনে ওদিকের পথটা খোলা রাখবার কথাটাও যে মাথাতে ছিল না তা নয়। যদি তেমন অঘটনই ঘটে,

যদি শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের বিদায় নিতেই হয় তো তখন নিজের ইংরেজ-সেবার কলঙ্ক ক্ষালনের এই একটা সহজ পথ ছিল বৈকি। কিন্তু এখন আর ফেরাও সম্ভব নয়। তিনি বললেন, 'বেশ, আমাকেও না হয় ঐ সঙ্গে নজরবন্দী করে রেখো!'

এবার দিগ্বিজয় একটু অপ্রতিভ হলেন। বললেন, 'না-না, নজরবন্দী রাখার কথা বলছ কেন! দুই বন্ধু আমরা—বাঁচি একসঙ্গে বাঁচব, মরি একসঙ্গে মরব। ইনামটাতেও না ফাঁকে পড় সেটাও তো তোমার নজর রাখা দরকার!'...

পরের দিন ভোরবেলাই দিগ্বিজয় গঙ্গার ধারে লোক পাঠালেন। নৌকোর কোন চিহ্ন নেই। একটু বেলায় নিজেরা গেলেন, কিন্তু ফল সেই একই। দিগ্বিজয়ের কাছে ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে নতুন সংগৃহীত একচোঙা একটা দূরবীন ছিল, সেটা চোখে লাগালেন, কিন্তু তাতেও কোন ইংরেজ কি নৌকো দৃষ্টিগোচর হল না। শেষ পর্যন্ত নদীর পাড়ে একটা লোক মোতায়েন করে তাঁরা ফিরে এলেন।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর আবারও দুই বন্ধু মাথায় আর মুখে ভিজে গামছা জড়িয়ে ঘাটে গেলেন।

তখনও কোন পাত্তা নেই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দু জনে ফিরে আসবার উপক্রম করছেন, দূরে দু-তিনটে গুলির শব্দ হল। কালুকাপ্রসাদ উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'ঐ!'

কিন্তু 'ঐ' ঐ পর্যন্তই রইল। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলেন ওঁরা। নৌকো দু-একটা আসা-যাওয়া যে না করছে তা নয়, তবে তার অধিকাংশই খোলা ডিঙি-নৌকো—তাতে সাহেবের কোন চিহ্ন নেই।

দিগ্বিজয় হেসে বললেন, 'ও সবই একে একে শেষ হয়েছে, বুঝলে? তোমার বাঁচাবার ভরসায় আর কতক্ষণ যোঝে বল!'

কালুকাপ্রসাদও কাষ্ঠহাসি হাসলেন।

মিছিমিছি অনেকগুলি পয়সা খরচ হয়ে গেল!...

অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগে একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—জন চার-পাঁচ লোক ঘাটের ধারে চুপ করে সন্দেহজনকভাবে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে বসে আছে। তাদের মাথাটা মাত্র জেগে আছে, তাতে বোঝা যায় চুলগুলো কটা, গায়ের রংটাও অনেকটা পরিষ্কার—ঠিক ওদের মত নয়।

তখনই দু বন্ধু ঘাটে ছুটলেন। যারা জলে ডুবে বসে আছে তারা সাহেবই বটে। কালুকাপ্রসাদের মুখে হাসি ফুটল। তিনি জামা কাপড় সুদ্ধ জলে নেমে গেলেন।...প্রথমটা টমসনের দল ওঁদেরও শত্রু ভেবেছিলেন, সহজে জল ছেড়ে উঠতে চান নি, তারপর ওঁদের কারও হাতে কোন হাতিয়ার নেই দেখে এবং পৌনঃপুনিক আশ্বাসবাক্যে কতকটা আধা-বিশ্বাস করলেন। কালুকাপ্রসাদকে সলিভান চিনতেন,—'আমি হুজুর কালুকাপ্রসাদ, গ্রীনওয়েল সাহেবের মুনশী, চিনতে পারছেন না?' বলাতে মুখখানা ঝাপসা ঝাপসা মনেও পড়ল। তা ছাড়া এমনিতেই বা বাঁচবার পথ কৈ, জলে থাকলেও দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই মরতে হবে। অগত্যা ওঁরা উঠে এলেন। ওঠার ক্ষমতাও নেই—টেনে ওঠাতে হল।

কারও গায়ে বিশেষ বস্ত্র ছিল না। জামাটা থাকলেও হয়তো পাজামা নেই। দিগ্বিজয়ের ইঙ্গিতে ধুতি এল, কম্বল এল। সেই সব জড়িয়ে কোনমতে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হল ওঁদের। সেখানে গরম দুধের ব্যবস্থা ছিল—খানিকটা করে

মুখে খাবার পর মনে হল এ যাত্রা হয়তো বা তাঁরা বেঁচে গেলেন।

কালকাপ্রসাদ দিগ্বিজয়ের ক্ষণিক অনুপস্থিতিতে সালিভানের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, ‘আমি, সাহেব, আমিই পয়সা খরচ করে ছুটে এসে খবর দিয়েছিলুম। তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলেন। আমিই বাঁচালুম।’

সালিভান চোখ মেলে তাকালেন মাত্র। কিন্তু কথাগুলোর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করবার মত তখন তাঁর অবস্থা নয়।

॥ ৫৭ ॥

কানপুরে ইংরেজ নির্মূল হয়েছে, তাদের শক্তি, তাদের প্রতাপ, এখন বিগত দিনের জনশ্রুতিতে পর্যবসিত, পেশোয়া এখানে একেশ্বর, তবু নানাসাহেবের মনে সুখ নেই। সত্য বটে, এদিকে নীল ও হ্যাভলকের অমোঘ অগ্রগতির সংবাদ প্রত্যহই শুনছেন, তাঁদের নিষ্ঠুর বৈর-নির্যাতনের, নির্মম প্রতিহিংসার বীভৎস বিবরণ লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হয়েই তাঁর কানে আসছে—তেমনি ওদিকে লক্ষ্ণৌ-এর ইংরেজ-শক্তিও পতনোন্মুখ, এ খবরও তো তিনি পাচ্ছেন নিয়মিত ভাবেই। সেখানে এখনও তারা নামেমাত্র টিকে আছে, কিন্তু শীঘ্রই তাদের অবস্থাও যে কানপুরের ইংরেজদের মতই হবে—এ তো একরকম সুনিশ্চিত।

আর লক্ষ্ণৌএর পতন হলেই, এদিককার ইংরেজ-প্রতিরোধ একেবারে শেষ হয়ে যাবে, তখন কি সম্মিলিত হিন্দুস্থানী শক্তির সামনে নীল সাহেবই দাঁড়াতে পারবে?

মোটের ওপর, সবটা জড়িয়ে নানাসাহেবের উল্লসিত হবারই কথা—অন্তত ভয় পাবার কথা নয়।

তবে? তবে তাঁর ললাটে সদাসর্বদা এমন চিন্তার ভ্রুকুটি ঘনিয়ে থাকে কেন? সর্বদাই তাঁর আচরণে এমন একটা অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও অন্যমনস্কতা প্রকাশ পায় কেন?

ভয়? ভয় তো বটেই, কিন্তু ভয় কাকে? সে কি ইংরেজ-শক্তিকেই?

প্রশ্নটার যথার্থ উত্তর দেওয়া হয়তো নানাসাহেবের পক্ষেও সহজ নয়। তবে একটা ভয়—নামহীন, আকারহীন, অকারণ আতঙ্ক যে তিনি অনুভব করছেন এটা অস্বীকার করারও উপায় নেই। তিনি অন্তরে অন্তরে চারিদিকের এই বিজয়োল্লাসের মধ্যেও কেমন করে অনুভব করছেন যে তিনি এবার ভীমবেগে তাঁর জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন। পরিণতি বটে—নিয়তিও বটে। শীঘ্রই তাঁকে ভাগ্যের সঙ্গে চরম বোঝাপড়া একটা করতে হবে, আর সেজন্য তিনি প্রস্তুত নন।

আসলে একটু একটু করে তাঁর মানসচক্ষুর সামনে থেকে মোহের পর্দাটা সরে গেছে—কেমন করে তিনি এ সিপাহী-অভ্যুত্থানের সত্য চিত্রটা যেন দেখতে পেয়েছেন। একটু একটু করে তিনি যেন তাঁর অনুগামী ও সহকর্মীদেরও চিনতে আরম্ভ করেছেন। আর তাতেই এতখানি হতাশা তাঁর।

এধারে একটা যুদ্ধ আসন্ন তাতে সন্দেহ নেই। বালাসাহেব ও সেনাপতির দল জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। কিন্তু মুষ্টিমেয় ইংরেজকে অবরোধ করতে গিয়েই যে কৃতিত্ব ওরা দেখিয়েছে, তাতে নানা আর অতটা ভরসা পান না। তাত্যা পরামর্শ দিচ্ছেন দাক্ষিণাত্যে যেতে—সেখানে এখনও পেশোয়া নামের

জাদু সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নি, এখন নানাসাহেব গিয়ে উপস্থিত হলে হাজার হাজার মারাঠী তাঁর পতাকাতলে সমবেত হবে—অর্থেরও অভাব হবে না। কিন্তু নানা জানেন যে, হাজার হাজার অনুচর বা ভক্ত যেমন ছুটে আসবে, পেশোয়া-বংশের পুরাতন শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীরাও তেমনি বসে থাকবে না। তাদের পূর্ববৈরিতা ভুলে যাবার মত কোন কারণ ঘটে নি।

কেউ কেউ পরামর্শ দিচ্ছেন, এখানকার সিপাহীদের নিয়ে সোজা দিল্লী রওনা হতে—কারণ একতাই শক্তি। তাতেও পেশোয়া খুব রাজী নন। এই ক'দিনে স্বাধীনতার স্বাদ কিছুটা পেয়েছেন—এখন সেখানে গিয়ে সেই স্থবির ও হতবুদ্ধি বাহাদুর শার উদ্ধত পুত্র এবং নির্বোধ চিকিৎসক—ওদের আদেশ মত চলতে তিনি পারবেন না। তা ছাড়া একটা কথা আজিমুল্লা ঠিকই বলেছেন, দিল্লী পর্যন্ত ইংরেজ সৈনদের গতি অব্যাহত ও অবারিত রাখবার সুযোগ দেওয়া ঠিক নয়। জনসাধারণের মনোবল তাতে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। যে অত্যাচার এখন ইংরেজরা করছে, সে অত্যাচারের সুযোগ আর বেশি দিলে সারা উত্তর ভারত আতঙ্কগ্রস্ত ও ইংরেজদের পদানত হয়ে পড়বে। তা ছাড়া এখানকার স্থানীয় সহায়তা থেকেও বঞ্চিত হবেন তাঁরা।

অর্থাৎ নানাসাহেব শুধু পরিণাম-চিন্তাতেই অবসন্ন নন—আশু কর্তব্য সম্বন্ধেও তাঁর দ্বিধা অন্তর্দ্বন্দ্বের শেষ নেই।

আমিনা এ সব খবরই পাচ্ছিল ; খবর যেটার পাওয়া যায় না—মনের কথাটার—সেটা সে অনুমান করে নিচ্ছিল। নানাসাহেবকে সে ভাল করেই চেনে। তিনি খুব নির্বোধ নন। আর তা নন বলেই তাঁর মনে যে বিপুল তোলপাড় চলেছে, তা দূরে থেকেও আমিনা বুঝতে পারে।

সেদিনের পর থেকে আমিনা আর তাঁর কাছে যায় নি। নানাসাহেবও তাকে ডাকেন নি। কেমন করে তিনি বুঝেছিলেন যে, নিজের এই আকারহীন আতঙ্কের কথাটা আমিনার সামনে কিছুতেই চাপা থাকবে না, আর তা হলে বড়ই লজ্জায় পড়তে হবে। আমিনাই যে তাঁকে বেশি করে সর্বনাশা কাণ্ডে জড়িয়ে ফেলেছে—বোধ করি সে কথাটাও তাঁর মনে ছিল। আমিনা তা বুঝত, তাই সে-ও গায়ে পড়ে তাঁর কাছে যেতে চেষ্টা করে নি। দূর থেকে সব কিছু লক্ষ্য করেছে। নানাসাহেবের কাছে এখন যারা ঘন ঘন আসা-যাওয়া করে, তাদের কথাবার্তার টুকরো থেকেও অনেক খবর পেয়েছে সে।

এরই মধ্যে একদিন শুনল এখানকার চাটিবাটি গুটিয়ে নানাসাহেব বিঠুরে যাচ্ছেন। কাগজপত্র সব গোছগাছ করা হচ্ছে,—ইতিমধ্যে নাকি কিছু কিছু পুড়িয়ে ফেলাও হয়ে গেছে—মূল্যবান জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা চলছে।

আমিনা বুঝল আর নষ্ট করবার মত সময় নেই। সে সেই দিনই অপরাহ্নে মহামান্য পেশোয়ার বিশ্রাম করবার অবকাশে একেবারে তাঁর শয়নকক্ষে গিয়ে হাজির হল।

দ্বারে রক্ষী ছিল অবশ্যই, কিন্তু সে জানত যে বিশ্রামকক্ষে আর যারই যাওয়ার বাধা থাক, বিশ্রাম-সঙ্গিনীর থাকা উচিত নয়। সে বিনা ওজরে পথ ছেড়ে দিল। আমিনা ভেতরে ঢুকে সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করল, তার পর যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে কাছে গিয়ে তার পায়ে একটা হাত রাখল।

'কে ?' নানাসাহেব চমকে উঠে বসলেন।

'ভয় নেই, আপনার বাঁদী হুসেনী।'

'ও, হুসেনী। ব'স ব'স।'

ঘুমের ঘোরটা আর একটু কমতে নানাসাহেব ভাল করে চেয়ে দেখলেন। বলা বাহুল্য, সেখানে আসার আগে আমিনা প্রচ্ছন্ন নিপুণতার সঙ্গে প্রসাধন করে এসেছে। তার মুখের দিকে চেয়ে, হয়তো বা ক'দিন পূর্বের রভস-রজনীর স্মৃতি মনে পড়ায়, নানা প্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

'এসে ভালই করেছ, ব'স।'

সস্নেহে হাত ধরে পাশে বসালেন তাকে।

'তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি যে আমাকে ত্যাগ করলে একেবারে!'

'কৈ, আমাকে স্মরণ করেন নি তো? করলেই আসতুম। আমি আপনার তলবের দাসী, পেশোয়া।'

'না—হ্যাঁ, মানে ব্যস্ত ছিলুম তো, অনেক রকমের চিন্তা মাথায়।'

পেশোয়া অপ্রতিভ হয়ে পড়েন।

'ঠিক সেইজন্যই আমিও আপনাকে বিরক্ত করি নি। কিন্তু সে কথা থাক, আপনি নাকি বিঠুরে চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, তাই স্থির করেছি।...ও, তোমাকে বুঝি কেউ বলে নি তৈরী হয়ে নিতে?'

আমিনা সে প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেল না। স্থির অপলক দুটি চোখ পেশোয়ার চোখের ওপর রেখে বলল, 'এটা কি আপনার পলায়নের ভূমিকা পেশোয়া?'

নানাসাহেব গম্ভীর হয়ে উঠলেন, কিন্তু আমিনার হাতটা ছাড়লেন না। বরং সেই দুর্লভ কোমল হাতে একটু চাপ দিয়ে বললেন, 'না হুসেনী, পলায়নের ভূমিকা ঠিক নয়। তোমার কাছে গোপন করব না। ওধারের পথটা খোলা রাখতে চাইছি মাত্র। অন্তঃপুরের একটা ব্যবস্থা করতে হবে, টাকা-কড়ি কিছু সরানো দরকার—সবই তো এলোমেলো হয়ে রয়েছে।...শীগগিরই একবার শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে সেটা তো বুঝতেই পারছ, আর যুদ্ধে হারজিত আছেই।'

'কিন্তু একবারের হার বা একবারের জিতটাকেই কি আপনি চরম বলে মনে করবেন?'

'তা নয় হুসেনী, কিন্তু যুদ্ধে নেমে পড়লে আর তো স্বাধীনতা থাকবে না। তখন ভাগ্যের হাতে খেলার পুতুল হয়ে পড়ব। ভাগ্য-তাড়িত হয়ে কোথায় যেতে হবে—এগোতে বা পেছোতে হবে, তার ঠিক কি? সব রকম অবস্থার জন্যই প্রস্তুত থাকা উচিত নয় কি? অন্তত ঘরটা সামলে যাওয়া দরকার।'

আমিনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'তা হলে আমাদের কথা কি চিন্তা করেছেন?'

নানাসাহেব যেন চমকে উঠলেন। বললেন, 'তুমি বিঠুরে যাবে না?'

'বিঠুরে গিয়ে কি করব বলুন? আপনি যদি ভাগ্য-তাড়িত হয়ে পেছিয়েই যান, তখন কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন? আপনার মহিষীদের কোন ভয় নেই, এমন কি আপনার প্রেয়সী আদালারও না। তারা শুধু বন্দীই হবে, এই মাত্র। তা ছাড়া শেষ-মুহূর্তে হয়তো আপনি মহিষীদের সরাবার ব্যবস্থা একটা করতে পারবেন, কিন্তু আমাদের নিয়ে বিব্রত হতে নিশ্চয়ই চাইবেন

না। তখন? আমাকে হাতে পেলে ইংরেজরা কী করবে ভেবে দেখেছেন? আমি যে তাদের কি সাংঘাতিক শত্রু, তা তারা এ ক'দিনে ভাল করেই জেনেছে জনাব!'

এবার নানাসাহেবের চুপ করে থাকবার পালা। একটু পরে বললেন, 'তা হলে তুমি কী করতে চাও?'

'এত দিন যা করলুম তা-ই। আপনার শত্রুদের সঙ্গে অবিশ্রাম বৈরিতা। আমাকে ছেড়ে দিন পেশোয়া, আমার ব্যবস্থা আমি ঠিকই করে নিতে পারব। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে থাকলে আপনার বোঝা মাত্র হয়ে থাকব—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ইংরেজ আমার জাত-বৈরী। ঠিক আমার মত বিশ্বেষ আপনারও নেই তাদের ওপর—একথা নিশ্চিত জানবেন।'

'হ্যাঁ তা আমি জানি হুসেনী। তাত্যা টোপী, আজিমুল্লা এদের কথা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু তুমি বা মৌলবীসাহেব, তোমরা নিঃস্বার্থ ভাবেই ইংরেজের ধ্বংস চাও—সেটা আমি জানি; সেই সঙ্গে আমার উন্নতি—সেটা তোমাদের কাছে পরোক্ষ। আর একটি ছোকরার কথা শুনেছি—মহম্মদ আলি খাঁ, সেও নাকি এমনি শত্রু ইংরেজের। লক্ষ্ণৌতে সে অবিশ্রাম পরিশ্রম করছে সিপাইদের জন্য। সে নাকি এক পয়সাও চায় না—নিজের শরীরের দিকে তাকায় না। অদ্ভুত নিষ্ঠা তার। এদিকে লেখাপড়া জানা লোক, পাস-করা ইঞ্জিনিয়ার। তাকে যদি আমরা পাশে পেতুম!...আজিমুল্লা তাকে চেনে, তাকে এখানে আনবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু কে জানে কেন সে রাজী হয় নি!'

আমিনার মুখ অকস্মাৎ রক্তবর্ণ ধারণ করল। কিন্তু খস্‌খসের পর্দা ফেলা প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে নানাসাহেব তা টের পেলেন না। এমন কি, তাঁর মুষ্টির মধ্যে ওর হাতখানা যে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘামে ভেসে গেল তাও লক্ষ্য করলেন না।

আমিনাই হাতটা টেনে নিয়ে অপর হাতের রুমালে তা মুছে নিল। তার পর বলল, 'কিন্তু যেখানেই হোক, আপনার কাজ হচ্ছে তো?'

'তা বটে।' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নানা বললেন, 'তবু নিঃস্বার্থ লোকের এতই অভাব—নিজের পাশে এমন একটা লোক থাকলে বুকের বল বাড়ে। তুমিও থাকছ না—বড্ড অসহায় বোধ করব। চারদিকেই স্বার্থের চক্রান্ত, সত্যি সত্যি আমার মঙ্গল-চিন্তা করে এমন লোক কৈ?'

'পাশে না-ই বা রইলুম—আমরা আপনার মঙ্গল-চিন্তাই করব জনাব।'

নানাসাহেব হঠাৎ যেন নড়ে-চড়ে বসলেন। পুনশ্চ আমিনার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু আর যদি দেখা না হয়? দু জনে যদি দু দিকে গিয়ে পড়ি? কিংবা যদি—'

কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

আমিনা অসমাপ্ত প্রশ্নের জবাবে বলল, 'যেখানেই থাকি সব সময় আপনার কল্যাণই আমার লক্ষ্য থাকবে। আর মৃত্যুর কথা? আমি গেলে আপনার অসংখ্য সেবিকার এক জন যাবে মাত্র—সে অভাব আপনি টেরও পাবেন না। আর খোদা না করুন, যদি আপনিই যান, দেহে যত দিন একবিন্দু খুনও থাকবে আপনার শত্রুদের ক্ষতি করে যাব—এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

নানাসাহেব সস্নেহে আবারও তার হাতে একটা চাপ দিলেন।

'কিন্তু পেশোয়া, কথা তো অনেক হল, যদি প্রস্তুতই হচ্ছেন—আমারও তা হলে একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমাকেও তো প্রস্তুত হতে হয়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—নিশ্চয়। তোমার কী করতে চাও বল। টাকাকড়ি কি দরকার—অবশ্য বেশি কী দিতে পারব বুঝি না, এদিকেও তো খরচ হচ্ছে জলের মত। তবু যা দরকার বল। আরও যদি কিছু বন্দোবস্ত করে নিতে চাও—'

'টাকাকড়ি যা পারেন দেবেন পেশোয়া, টাকা তো চাই-ই। আমার নিজের ভবিষ্যতের জন্যে নয়, আপনার স্নেহের দান যে-সব অলঙ্কার আছে, তাতে একটা বাঁদীর জীবন কোন দূরে গাঁয়ে বাস করলে অনায়াসে কেটে যাবে, কিন্তু কাজ করতে গেলে টাকা চাই বৈকি। তবে তার চেয়েও বেশী চাই…আপনার একটা পরোয়ানা।'

'পরোয়ানা? কিসের পরোয়ানা?'

'এখানে থেকে যদি আমাকে কাজ করতে হয়, অনেক সময়ই আপনার সেনা বা সেনাপতিদের সাহায্য নিতে হবে। তখন যাতে তারা আমার কথা শোনে, তাই একটা ক্ষমতাপত্র চাই। মানে, যা করছি আপনারই কাজ এবং আপনারই অনুমোদন-সাপেক্ষে করছি—এমনি একটা পরোয়ানা দিন।…এখন আপনি আছেন, আমার কোন ভয় নেই, রাজশক্তি রয়েছে সঙ্গে; কিন্তু আপনি না থাকলে আমার শক্তি কতটুকু বলুন? আমার পরিচয়ই বা কী? প্রভু-পরিত্যক্তা সামান্য বাঁদী বৈ তো নয়!'

'ছিঃ ছিঃ, ও কথা বলছ কেন! আমি এমন পরোয়ানাই লিখে দেব যে আমার যতটুকু শক্তি—যদি কোন শক্তি থাকে, আর তা যদি রাজশক্তি হয়—সম্পূর্ণই তোমার সঙ্গে থাকবে। তুমি বরং মংগরকরকে ডেকে এখনই আমার মোহর, কাগজ আর কলমদান আনতে বল, ও কাজ সেরেই দিই। এর পর হয়তো আর অবসর থাকবে না।'

'আপনি কি আজই চলে যেতে চাইছেন?'

'অন্তত কাল ভোরেই যেতে চাই।'

নিমেষকাল নিস্তব্ধ থেকে আমিনা বলল, 'এখানকার বন্দীদের কী করবেন?'

'প্রাসাদের বন্দীদের তো বিঠুরে পাঠাবার হুকুম দিয়েছি। এখন সমস্যা বিবিঘর নিয়ে—'

কণ্ঠে যতদূর সম্ভব নিরাসক্তি টেনে এনে আমিনা বলল, 'কেন, ওদের কী করতে চান?'

'তাত্যা বলছে অবিলম্বে ওদের ছেড়ে দিতে। ও বোঝা রেখে শুধু শুধু খরচ; তাছাড়া অকারণ আরও বিদ্বেষ বাড়ানো। কিন্তু আজিমুল্লা বলছে যে ওরাই আমাদের বরং হাতের পাঁচ। যদি কখনও দুর্দিন আসে, ওদের বিনিময়ে আমরা শত্রুপক্ষের কাছ থেকে অনেক সুবিধা আদায় করতে পারব। তাই ভাবছি যে ওদেরও বিঠুরে পাঠিয়ে দেব কিনা।'

'আজিমুল্লাই বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছেন জনাব। তবে মিছিমিছি এখনই ওদের বিঠুরে নিয়ে গিয়ে ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি?…আমি তো রইলুমই, যদি তেমন বুঝি, তো ওদের বিঠুরে সরিয়ে দেব—চাই কি এমনও হতে পারে যে আরও দূরে নিরাপদ কোন স্থানে পাঠানো দরকার হবে। একবার যুদ্ধ হলেই যে ওদের ব্যবহার করতে পারবেন, তা হয়তো নাও হতে পারে।

নিজেদের নিরাপত্তার জন্য জামিন হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজন—আমার মনে হয় কিছুদিন পরেই হবে বরং। হয় নিজেদের জন্যে কোন অসুবিধা আদায় করতে কিংবা আমাদের কিছু বন্দী ছাড়িয়ে নিতে। সে প্রয়োজন তো এখনই হচ্ছে না!'

'তা বটে। কিন্তু সে রকম বুঝলে কোথায় পাঠাবে?'

'সে ঠিক ব্যবস্থা করব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'তা হলে ওদের ভারও তুমি নিলে?'

'আপনি দিলেই নেব।'

'আমি একেবারে লিখিত হুকুম দিয়ে যাচ্ছি। তোমার নির্দেশমতই ওদের রাখা বা সরানো হবে।'

'সে আপনার খুশি।' আমিনা নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের সঙ্গে বলে।

॥ ৫৮ ॥

আজিমুল্লা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন।

কথাটা স্পষ্টই শুনেছেন—আমিনার বাচনভঙ্গিতে বা কণ্ঠে কোন জড়তা ছিল না—তবু, তবু যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

সত্য বটে, অবিরাম এই মোহময়ী রমণীর খেয়ালখুশির রসদ যোগাতে যোগাতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন—এও সত্য যে ইদানীং একটা কুটিল সন্দেহ মনের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হচ্ছিল যে এই ছলনাময়ী নারীর সবটাই ছলনা, নিজের কার্যসিদ্ধির জন্যে সে কেবলই স্তোক বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত কোনদিনই হয়তো তাঁর কাছে ধরা দেবে না—তবু এটাও তো মিথ্যে নয় যে, এসব সত্ত্বেও এর মোহ আজও দুর্নিবার। আজও এর রূপের, এর মনীষার যাদু তাঁর ওপর একটা অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে, আর তা রেখেছে বলেই আজও তিনি সহস্র কাজের মধ্যে ছুটে এসেছেন এর আহ্বানে। মনে হয় আজও এর জন্যে অকরণীয়, একে অদেয় তাঁর কিছু নেই।

তবুও—এ প্রস্তাব, এ যে অবিশ্বাস্য—কল্পনাতীত!

তিনি ভুল শোনেন নি তো?

নাকি এ পরিহাস? তাঁকে একটু বাজিয়ে দেখতে চায় এই নারী?

কিন্তু না, এখনও তো সে সাগ্রহে উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাঁর মুখপানে।

'কি, কথা কইছেন না যে খাঁ সাহেব?'

'না, এ অসম্ভব—এ আমি পারব না!'

'পারবেন না? আমার জন্যেও পারবেন না?'

একই সঙ্গে যেন সে স্খলিত কণ্ঠস্বরে অভিমান, হতাশা, অনুনয় ঝরে পড়ে।

'না বেগমসাহেবা, মানুষের ক্ষমতার সীমা আছে। আপনার জন্যে অনেক কিছুই করেছি, কিন্তু তবু সে মনুষ্যত্বের সীমানার মধ্যে ছিল। এ পৈশাচিকতা। এ কাজ করলে আপনিই ঘৃণা করতেন আমাকে!'

'না, করব না। সত্যি বলছি খাঁ সাহেব, পুজো করব আপনাকে। এই

শেষ, আর কখনও কোন অনুরোধ করব না। বলেছিলাম, স্বাধীনতা পেয়ে দুজনে যখন সিংহাসন ভাগ করে নেব, তখনই ধরা দেব আপনাকে। সে কথা টেনে নিচ্ছি। এখনই, এই মুহূর্তে ধরা দিচ্ছি আপনার কাছে—দেখুন, এই মুহূর্তে!'

লোভ বড় বেশি। মায়াবিনীর দৃষ্টি যেন অমোঘ আকর্ষণে টানছে। কি অতল রহস্য, কি অনির্বচনীয় সুখের ইঙ্গিত সেখানে! এক সময় এ প্রস্তাব জীবনের দুর্লভতম সৌভাগ্য মনে হতে পারত। হয়তো আজও—

না।

মাথা নেড়ে আজিমুল্লা খাঁ বললেন, 'না, তা হয় না। এতটা আমি পারব না। সেদিনের ব্যাপারটাতেই লজ্জার সীমা নেই। আর এ তো কয়েক জন অসহায় রুগ্‌ণ স্ত্রীলোক, আর কতকগুলো শিশু—না সে সম্ভব নয়, আমাকে মাপ করবেন।'

অনুনয়ের ভঙ্গি নিমেষে মিলিয়ে গেল। সে জায়গায় ফুটে উঠল প্রবল আপাতভনিরুদ্ধ অভিমান। স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে সোহাগের সেই অভিমান বর্ষণ করে আমিনা বলল, 'বেশ। যে পারবে তার কাছেই যাচ্ছি!'

'শুনুন বেগমসাহেবা, এ পারা উচিত নয়। আপনি প্রকৃতিস্থ হ'ন। এ দানবীয় কাজ—পৈশাচিকতা। এ কথা শুনলে সমস্ত সভ্য জগৎ আমাদের অভিসম্পাত করবে।'

'তা জানি। তবুও আমরা চাই এ।' আমিনা ঘুরে দাঁড়াল।

'কিন্তু এতে কতটা ক্ষতি হবে ভেবে দেখেছেন? এরা হাতে থাকলে ভবিষ্যতে কতটা সুবিধা হতে পারে?'

'সব জানি খাঁ সাহেব, তবুও আমি চাই ওদের প্রাণ। আপনি জনেন না, বুক জ্বলে যাচ্ছে আমার, কী সে জ্বালা আপনি বুঝবেন না। ওদের রক্ত ছাড়া সে জ্বালার শান্তি হবে না। হিন্দুদের ডাকিনী-যোগিনীর মতই আমি আজ রুধির পিয়াসী!...যাক, আপনি আপনার কাজে যান। ছোট ছেলের মত ভয়ে কাঁপছেন আপনি, নিরাপদ-দূরত্বে সরে থাকুন। এ কাজ স্ত্রীলোক বা শিশুর নয় তা জানি। ভয় নেই—এ দায়িত্ব আমারই থাক। আপনাকে এর জবাবদিহি করতে হবে না।'

শিশু ও স্ত্রীলোকের ইঙ্গিতে আজিমুল্লার মুখ অঙ্গারবর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেন, 'কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে সরে থেকে অসহায় ভাবে চেয়ে দেখতেও আমি পারব না বেগমসাহেবা। আমি বাধা দেব। বিবিঘরের ভার আমার হাতে—আমার হুকুম ছাড়া কিছুই হবে না।'

'পেশোয়ার হুকুমেও হবে না?'

'পেশোয়ার হুকুম?'

'হ্যাঁ, পেশোয়ার হুকুম!'

আবারও স্তম্ভিত হবার পালা আজিমুল্লার।

'কখনও না, হতে পারে না। তাঁর সঙ্গে আমি কালই কথা বলেছি।'

'পেশোয়ার হুকুম!' শান্ত অচঞ্চলভাবে কথাগুলোর পুনরুক্তি করে আমিনা। তারপর যেন কতকটা বিজয়গর্বে ওড়নার মধ্যে থেকে কাগজ দুখানি বার করে আজিমুল্লার চোখের সামনে মেলে ধরে।

'এ পরোয়ানা জাল।' কতকটা অসহায় ভাবেই বলে আজিমুল্লা, মজ্জমান

ব্যক্তির তৃণাবলম্বনের মত।

'সে পেশোয়া বুঝবেন। আপাতত এতেই আমি কাজ উদ্ধার করব।'

'কিন্তু পেশোয়ার নামে চালালেও এই হুকুম কোন সিপাই-ই তামিল করবে না হুসেনীবিবি—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সেদিন সতীচৌরা ঘাটে বেশ সরল সোজা ভাষাতেই তারা এ কাজ করতে অস্বীকার করেছিল, সেটা ভুলে যাবেন না। তবু তখন চারদিকে হত্যার তাণ্ডব চলেছে—রক্তে সেদিন তাদের রক্তের নেশাই ছিল। তবুও তারা রাজী হয় নি।'

'আমি যে তাদের ভরসাতেই আছি এমন কথাই বা আপনাকে কে বললে? আমার ব্যবস্থা আমি করে নিতে পারব। এ পরোয়ানাতে আর যাই হোক বা না হোক, আমার কাজে তারা বাধা দিতে পারবে না—এটা তো ঠিক! ওখান থেকে তাদের সরিয়ে দিতে পারব।'

'আচ্ছা, আমিও দেখি এ পাগলামি বন্ধ করতে পারি কিনা। আমি পেশোয়ার কাছেই যাচ্ছি। এ পাপে আপনাকে আমি জড়িত হতে দেব না—আমার সাধ্য থাকতে নয়।'

আজিমুল্লা আর বাদানুবাদের অপেক্ষা করলেন না। এক রকম ছুটেই চলে গেলেন।

আমিনা বহুক্ষণ সেখানেই স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখের সে বিজয়গর্ব কোথায় চলে গেছে—সে জায়গায় ফুটে উঠেছে একটা হতাশা এবং দুশ্চিন্তা।

তবে কি তার সমস্ত জাদু এই কদিনেই চলে গেছে? তবে কি সে এর মধ্যেই শক্তিহীনা হয়ে পড়ল? আজিমুল্লাও তাকে উপেক্ষা ও অবহেলা করে চলে গেল অনায়াসে?

তবে কি সে এত কাণ্ডের পর, এত বার বিজয়িনী হয়ে শেষমুহূর্তে ব্যর্থ হবে?

পেশোয়ার ভয় সে করে না; পেশোয়ার মরণকাঠি তার হাতে। হুইলারকে লেখা চিঠিখানা আজও তার কাছে সযত্নে রাখা আছে। কিন্তু—

সত্যিই তো আর এ কাজ নিজের হাতে করা যায় না! তার যা কিছু বল রূপে-যৌবনে কটাক্ষে-বুদ্ধিতে—এ কথা তার চেয়ে বেশি কে জানে! কিন্তু এ কাজ যে পেশীর।

বহুক্ষণ অসহায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর সহসা তার ভ্রূকুটি মিলিয়ে গেল, নবীন আশায় চোখ দুটি উঠল জ্বলে।

আছে—এখনও তেমন সেবক আছে বৈকি! অন্তত সে এই দুর্দিনে আমিনাকে ত্যাগ করবে না!

আমিনা প্রায় ছুটে দোরের কাছে গিয়ে ডাকল, 'মুসম্মৎ, মুসম্মৎ!'

'জী গালেকান।' সম্ভবত কাছেই কোথাও ছিল—মনিবের জরুরী কণ্ঠস্বরে তখনই সামনে এসে দাঁড়াল মুসম্মৎ।

'এখনই একটা ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে দে কসাইটোলায়, সর্দার খাঁকে ডেকে নিয়ে আসুক এখনই। জল্‌দি। বলতে বলবি যে খুব জরুরী দরকার—যেমন অবস্থায় আছে যেন তেমনি অবস্থাতেই চলে আসে। এই নে; একটা টাকা নে, ঘোড়সওয়ারকে দিবি—আগাম বকশিশ। সর্দার খাঁকে এক ঘণ্টার

মধ্যে এনে হাজির করতে পারলে আরও এক টাকা পাবে—বলে দিস।'

সর্দার খাঁও কথাটা শুনে বহুক্ষণ স্থির অপলক নেত্রে প্রস্তাবকারিণীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার পর ধীরে ধীরে বলল, 'মালেকান, তোমার হুকুম হলে একা শুধু-হাতে এক শ দুশমনের সামনে দাঁড়াতে পারি—জানের মায়া তোমার হুকুমের কাছে তুচ্ছ। কিন্তু এ যে…এ যে অন্য কথা মালেকান! অসহায় নিরপরাধ কতকগুলো জেনানা আর বাচ্চাদের কোতল করা—তাও খাঁচার মধ্যে পুরে—! এ হুকুম তুমি ফিরিয়ে নাও। এ হুকুম আমাকে তুমি দিও না।'

শেষ পর্যন্ত সর্দার খাঁও!

চির বিশ্বস্ত, চির অনুগত সেবক সর্দার খাঁ!

অকস্মাৎ আমিনার মনে হল, তার পা দুটোতে যেন কোন জোর নেই—হাঁটুর কাছে ভেঙে পড়ছে। বুকের মধ্যটাও যেন নিমেষে খালি হয়ে গেছে—কোথাও কোন জীবনশক্তি আর অবশিষ্ট নেই। ঐ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই নিজের অবস্থায় সে বিস্মিত হল। এ তার কী হল? এমন একান্ত অসহায় এবং হতাশ বোধ করবার কোন কারণ এর আগে কিছুই ঘটে নি—অভিজ্ঞতাটা একেবারেই নতুন। বিস্ময় বোধ হয় সেই জন্যই।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

না—হার মানলে চলবে না—কিছুতেই না।

মুহূর্তে নিজের ধনুতে নতুন সায়ক যোজনা করল আমিনা—এক লহমায় কর্তব্য স্থির করে নিল। একেবারে সর্দার খাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে দু হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল, তার পর অভিমান-ক্ষুণ্ণ করুণ কণ্ঠে বলল, 'তুইও আমাকে ত্যাগ করবি সর্দার? তুইও আমার কথা শুনবি না? তা হলে আমি কার কাছে যাব বল?'

তবুও সর্দারের দৃষ্টি তার চোখে এসে মিলল না। তার মুখের বিপন্ন ভাবও দূর হল না। বরং তার অন্তরের প্রবল ঝড়টাই আরও বেশী করে মুখে ফুটে উঠল।

'তুই না পারিস্, তোর কসাইটোলার অন্য লোক ঠিক কর্। আমি টাকা দেব—প্রচুর টাকা। এক-এক জনকে হাজার করে টাকা দেব। জানেরও ভয় নেই—এই দেখ্ নানাসাহেবের পরোয়ানা। আমি যা বলব তাঁরই হুকুম মনে করতে হবে। তা ছাড়াও—তাঁর মরণকাঠি আছে আমার হাতে—কিছুই করতে পারবে না সে—সর্দার, সর্দার, এই শেষবারের মত আবদার করছি তোর কাছে, আর কখনও কিছু বলব না। সর্দার, আমি—আমি তোর মনিবের মেয়ে, তোর আদরের মালেকান—তোর কাছে ভিক্ষা চাইছি।'

সর্দার খাঁ সযত্নে—তার পক্ষে যতটা সযত্নে সম্ভব, আমিনার হাত দুটো নিজের গলা থেকে ছাড়িয়ে দিল। তার সেই বীভৎস দানবীয় মুখে সেই মুহূর্তে যে হতাশা, যে গ্লানি, যে যন্ত্রণা ফুটে উঠল, তা দেখলে করুণা বোধ করবারই কথা—হয়তো আমিনাও করল, কিন্তু গলল না, মুক্ত হাত দুটো জোড় করে দাঁড়াল সামনে—ভিখিরীর মত।

অতি কষ্টে, যেন গভীর বেদনার সঙ্গে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সর্দার খাঁ।

তার পর বলল, 'জানি না আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ মালেকান, পরলোকে গিয়ে খোদার কাছে কী জবাবদিহি করব—তাও জানি না। শুধু এই জানি যে তোমার হুকুম ঠেলবার শক্তি আমার নেই। যত বড় কঠিনই হোক, এ কাজ আমাকে করতে হবে—আমিও করব। কিন্তু এ না করলেই পারতে মালেকান—এ না করলেই পারতে!'

হয়তো শেষ মুহূর্তেও সর্দার খাঁর মনের মধ্যে তার মালেকানের মত পরিবর্তিত হবার একটা ক্ষীণ আশা ছিল, তাই সে চলে যেতে গিয়েও কয়েক লহমা উৎসুক ব্যাকুল নেত্রে, এক প্রকারের করুণ আশায় চেয়ে রইল আমিনার মুখের দিকে। কিন্তু দেখল সে মুখে এতটুকু দ্বিধা নেই, অনুকম্পা নেই, অনুশোচনার সম্ভাবনা মাত্র নেই।...

দীর্ঘশ্বাসও যেন আর ফেলতে পারল না সর্দার। নিঃশ্বাসটা বুকে চেপেই সে ধীরে ধীরে যন্ত্রচালিতের মত মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার অনিচ্ছুক ভারী পায়ের শব্দটা দূর অলিন্দে বাজতে বাজতে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এক সময় মিলিয়ে গেল।...

সর্দার যাওয়ার আগে অনুশোচনার পূর্বাভাস পায় নি সত্য কথা, কিন্তু এখন যদি সে আর এক বার ফিরে আসত তো তার বিস্ময়ের অন্ত থাকত না। দেখত যে তার মালেকানের সেই সুকঠিন দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, সেই আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটির কূল ছাপিয়ে অশ্রু নেমে এসেছে এবং এরই মধ্যে সে অশ্রু ঐ রাক্ষসীর পাষাণ-অবিচল কপোল ভাসিয়ে ধারায় ধারায় তার বুকের ওড়নার ওপর ঝরে পড়ছে।

এ কি সার্থকতার আনন্দাশ্রু ?

এ কি আত্মগ্লানি ? আত্ম-অনুকম্পা ? অথবা অনুশোচনাই ?

এ অশ্রু কিসের তা আমিনা নিজেও তখন বলতে পারত না।

॥ ৫৯ ॥

হীরালাল মামার দেখা পায় নি। পাবার কথাও নয়, কারণ সে পেঁছিতে পেঁছিতে মামা বহু দূরে চলে গিয়েছেন। মাঝখান থেকে তার নিজের জীবনটাই বিপন্ন হতে বসেছিল। তবু সে তো ঘাঁটিতে গিয়ে পড়ে নি, দূর থেকেই খোঁজখবর নিয়ে মামার অন্তর্ধানের কাহিনী শুনেছিল। একেবারে সেই বাঘের গুহায় গিয়ে পড়লে কী হত, তা না গিয়েও হীরালাল বেশ অনুমান করতে পারে। কারণ পথের মধ্যেই বহুবার বহু দলের হাতে পড়ে জানটা যেতে বসেছিল। সে 'বাংগালী', অতএব আংরেজের দলের লোক অথবা তাদের গোয়েন্দা—এই সন্দেহ প্রায় সকলেরই। হীরালাল যতটা সম্ভব রাজপথ এড়িয়েই চলেছিল—সিপাহীদের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে। গ্রামবাসীদের তবু নানা মিথ্যা বলে বোঝানো যায়—সিপাহীদের বোঝানো কঠিন।

কিন্তু গ্রামবাসীদের কাছেও জবাবদিহি বড় কম করতে হল না। এক-এক জায়গায় তারা রীতিমত নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল।

গোয়েন্দা সন্দেহটাই বেশি। 'বেইমান বেশরম বাংগালী লড়াই করতে জানে না—জানে গোয়েন্দাগিরি করতে, আর চুকলি খেতে!'—এই অভিযোগ সর্বত্র।

গ্রামবাসীদেরও বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। ওধারে 'পুরব'-থেকে-আসা-

ইংরেজদের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী,—কিছু কিছু হয়তো বা অতিরঞ্জিত হয়েই ছড়িয়েছে।* সেই অগ্রসরোন্মুখ দলেরই গোয়েন্দা সে,—এই সন্দেহটাই মারাত্মক। ভয় থেকে বিদ্বেষ। ও দলের একটা লোককে হাতে পেয়ে শোধ নেবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক।

হীরালাল কোন মতে, অবস্থা বুঝে কোথাও ভয় দেখিয়ে, কোথাও যুক্তিতে সন্দেহ ভঞ্জন করে, কোথাও বা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে—অথবা দিব্যি গেলে, অব্যাহতি পেল। দিব্যি গালতে তার বাধে নি, কারণ গোয়েন্দা সে নিশ্চয়ই নয়।

নাস্তানাবুদ যতই হোক, এদের সম্বন্ধে একটা সহানুভূতি বোধ না করেও পারল না। ইংরেজদের যে দল কলকাতা থেকে এগিয়ে আসছে, তাদের বর্বর অত্যাচারের যে সব কাহিনী তার কানে আসতে লাগল, তার অর্ধেক সত্যি হলেও ভয়াবহ। এখানকার গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে সে বুঝল, এদের বেশির ভাগই নিরীহ। সিপাহী-অভ্যুত্থানের সঙ্গে তারা বিন্দুমাত্র জড়িত নয়, এমন কি সহানুভূতিসম্পন্নও নয়। মুসলমানদের কেউ কেউ বরং স্থানীয় মোল্লা বা মৌলবীদের আদেশে 'গুনাহ্‌গারি'র ভয়ে কিছু কিছু বরং সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছে, কিংবা কেউ কেউ হয়তো মুসলমান বাদশাহির আশাও রাখে; হিন্দুরা কেউ প্রসন্ন নয়। তারা প্রায় সকলেই মনে-প্রাণে 'আংরেজ সরকার' কামনা করে। কারণ এ রাজত্বে তাদের ওপর থেকে মোল্লা-মৌলবীর অত্যাচার কমেছে—বর্গী-জাঠ-রোহিলা-ঠগীর অত্যাচার বন্ধ হয়েছে। মোটামুটি অনেক দিন পরে একটু শান্তির মুখ দেখেছে তারা। এমন কি জায়গীরদারের অত্যাচারও (যেটা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত বলেই মনে করে অনেকে—ভাগ্যদোষে বা কর্মফলে যখন তারা গরীবের ঘরে জন্মেছে, এটা তো সইতেই হবে।) যে কিছুটা সংযত হয়েছে তাতেও তো সন্দেহ নেই। লড়াই বেধে পর্যন্ত এরা ইংরেজের জয়ই চেয়েছে। অথচ এই একেবারে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও নির্দোষ মানুষগুলোকেই অপরের নির্বুদ্ধিতা ও অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। আর, কি কঠোর সে প্রায়শ্চিত্ত! বৈর-নির্যাতনের নিত্য নূতন পৈশাচিক উপায় উদ্ভাবনই নাকি তরুণ ইংরেজ অফিসারদের একটা কৃতিত্ব-প্রতিযোগিতার বিষয় হয়ে উঠেছে।

তবু, যতই সে লক্ষ্নৌএর দিকে অগ্রসর হয়, এধারের খবরেও মনটা দমে যায়। এদিকে সর্বত্রই ইংরেজের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে—কোথাও এতটুকু আশার সংবাদ নেই। যদি এধার থেকে সত্যিই ইংরেজ-শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নিশ্চিন্ত সিপাহীরা সত্যই সংঘবদ্ধ হতে পারে (মনে তো হয় না, তবু—), তা হলেও ও 'পুরবী' ইংরেজরা কি তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে শেষ পর্যন্ত?

হীরালালের বিলেত সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। ইংরেজের শক্তি কত তাও সে জানে না। সিপাহীদের মুখে কদিন ধরে অবিরত শুনছে যে সেটা নিতান্তই অতি ক্ষুদ্র দেশ, তাদের শক্তিও নগণ্য, সিপাহীরা আছে বলেই আংরেজ সরকার চলেছে। ফলে মামার সেই 'জাহাজ জাহাজ গোরা'র ওপর খুব ভরসা নেই তার। ইংরেজের সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেও সে একটু চিন্তাগ্রস্ত হল। চাকরি থাকবে না সেটাই বড় কথা নয়। শেষ পর্যন্ত সে বিশ্বস্তভাবে ইংরেজের নোকরি করেছে—এ কথাটা কিছুতেই চাপা থাকবে

না, ধরা পড়বেই। তখনকার কথাটা ভেবেই শিউরে উঠল সে। ইংরেজদের কাছে শেখা প্রতিহিংসার এই সব কৌশল কি তখন ইংরেজ ও তার নোকরদের ওপর দিয়েই পরখ করা হবে না? মৃত্যু তো বটেই—হয়তো ভয়াবহ শোচনীয় মৃত্যুই অদৃষ্টে আছে!

এক এক বার মনে হয়, মামার পথ অনুসরণ করে সে দেশের দিকেই পালায়। কিন্তু এতটা পথ একা নিঃসম্বল অবস্থায় যাওয়া কি সম্ভব? মামার সঙ্গে মোটা টাকা আছে—তার যে কিছুই নেই! তা ছাড়া বাংলাদেশে পেঁছিতে পারলে একরকম নিরাপদ বটে, কিন্তু তার আগে দীর্ঘ অরাজক পথ অতিক্রম করতে হবে। পাটনা, আরা সর্বত্র ইংরেজ-বিদ্বেষ মাথা তুলেছে—আবার ইংরেজের হাতে পড়লেই বা কী হবে কে জানে? শুনছে বলিষ্ঠ তরুণ 'নেটিভ'দের ওপরই ওদের আক্রোশ নাকি সবচেয়ে বেশি।

অর্থাৎ এক কথায় রামে মারলেও মারবে—রাবণে মারলেও মারবে।

তার চেয়ে যথাস্থানে ফিরে যাওয়াই ভাল। অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক। কর্তব্য পালনের চেষ্টা তো তবু করতে পারবে।

কিন্তু কাছাকাছি এসে আরও যেসব সংবাদ পেল, তাতে বুকটা আরও দমে গেল। লক্ষ্ণৌএর যা অবস্থা শুনছে—ইংরেজ-শিবিরে ঢোকা যাবে তো? সেই চেষ্টাতেই না প্রাণটা খোয়াতে হয়!

শহরে গিয়ে তার সেই দোকানঘরের পিছনের বাসাতে দিনকতক ঘাপটি মেরে থাকতে পারে, কিন্তু সে তো আর বিনা পয়সায় থাকতে দেবে না—খেতে তো দেবেই না। মামার ভাষায় 'রেস্ত' চাই। সে রেস্ত কোথায়? মাইনেপত্র তো সব পড়ে রইল। সঙ্গে যা ছিল, কদিনে পথেই শেষ হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত কানপুরেই যাবে নাকি?

সেখানে সিপাহীদের হাতে পড়লেও তার রক্ষাকারিণী দেবী আছেন. সর্দার খাঁ আছে। পরিত্রাণ পেতে পারে। কিন্তু সেখানে গিয়েই বা কী করবে? সিপাহীদের দলে সে থাকবে না কিছুতেই। এক উপায় হুসেনী বেগমের কাছ থেকে কিছু অর্থ নিয়ে লক্ষ্ণৌতে ফেরা এবং ঘটনাবলীর পরিণতির অপেক্ষা করা। কিন্তু—, কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল—যাঁকে তার সব কিছু উজাড় করে দেওয়া উচিত, তাঁর কাছে হাত পেতে ভিক্ষে করা? ছিঃ! বরং পথে-ঘাটে মজুর খেটে খাওয়াও ভাল!

কোন কিছুই ঠিক হল না। কিন্তু অবশেষে এমন একটা সময় এল যে মন আর স্থির না করলেই নয়। এই অবস্থায় কানপুর ও লক্ষ্ণৌএর মাঝামাঝি একটা জায়গায় পুরো একটা দিনই আলস্যে ও চিন্তায় কাটাতে হল। চটি-ওয়ালা দোকানী তার গতিবিধি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে জেরা করতে 'জ্বরভাব হয়েছে' এই অজুহাতে দিয়ে তখনকার মত অব্যাহতি পেল সত্য, কিন্তু পরের দিন কী অজুহাত দেবে, সে কথা ভেবে আরও চিন্তিত ও বিব্রত হয়ে পড়ল।

সম্ভবত মা-কালীকে সে মন দিয়েই ডেকেছিল। সেই ঐকান্তিক ডাকেই তিনি তার কর্তব্য স্থির করে দিলেন।

এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল সেদিনই।

সারা দিনটা গরমে এবং চিন্তায় দগ্ধ হয়ে সন্ধ্যার আগে প্রকৃতির রুদ্রতেজ প্রশমিত হলে সে স্নান করে চটির বাইরে একটা গাছতলায় এসে বসল। সবে বসেছে, নজরে পড়ল পশ্চিমদিকের রাস্তা ধরে একটি স্ত্রীলোক এদিকে আসছে। ঘটনাটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়, তবু সে কিছু বিস্মিতই হল। কারণ স্ত্রীলোকটির পরনে মুসলমানের বেশ, অথচ বোরখা নেই। তার ওপর ওর গতিটাও যেন কেমন কেমন—উদ্দেশ্যহীন, উদাসীন, ক্লান্ত, মন্থর। সাধারণত অপরিচিত স্ত্রীলোক আসতে দেখলে মাথা নামিয়ে নেওয়াই হীরালালের অভ্যাস, কিন্তু এর ভাবভঙ্গি এমনই যে চেয়ে না থেকে পারল না। আর চেয়ে থাকতে থাকতেই মনে হল—এই চলনটা তার একেবারে অপরিচিত নয়; আরও একটু পরে মনে পড়ল, ঐ দৈহিক গঠনটার সঙ্গেও তার কোন সূত্রে পরিচয় আছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে লাফিয়ে উঠল।

হুসেনী বেগম? তার রক্ষাকর্ত্রী দেবী? এই সংকটকালে কি তিনিই আবার দেখা দিলেন?

বোধ করি সে সারাদিন আমিনার কথাই ভাবছিল, অথবা এমন বার বার এই মহিলাই তাকে রক্ষা করেছেন যে হয়তো মনের অবচেতনে তাঁরই আবির্ভাব সে আশা করেছিল। তাই কথাটা মনে হবামাত্র কোন অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই সে ছুটে একেবারে তাঁর সেই গমনপথের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এ কথা এক বারও মনে হল না যে হুসেনী বেগমের পক্ষে এমন সামান্য বেশে পায়ে হেঁটে এভাবে আসা সম্ভবপর নয়।

কিন্তু সামনে গিয়েই অপ্রস্তুত হল।

অনেকটা সেই রকম, কিন্তু তবু সে নয়।

লজ্জার পরিসীমা রইল না। ইনিই বা কী মনে করছেন—অপর কেউ দেখলেই বা কী ভাববে। অসৎ উদ্দেশ্য আছে মনে করে মারধোর করাও তো বিচিত্র নয়। কোনমতে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে 'মাপ করবেন' বলে সে ফিরে আসছিল—শশকের মতই তখন মুখটা কোথাও লুকোতে পারলে যেন বেঁচে যায় এমন অবস্থা—সহসা সেই স্ত্রীলোকটিই পেছন থেকে ডাকল, 'শোন, তুমি বাঙালী?'

বিস্ময়ের বুঝি শেষ হবে না আজ। আরক্ত নতমুখে ফিরে দাঁড়াল হীরালাল—কোনক্রমে ঘাড় নাড়ল।

'তোমার নাম হীরালাল?'

আরও বিস্ময়! হীরালাল এবার ঘাড় না তুলে পারল না।

বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি?'

'আমাকে তুমি হুসেনী বেগম ভেবেছিলে, না?'

বিস্ময়ের মধ্যেও কোথায় যেন অস্পষ্টতা কেটে যাচ্ছে।

'হ্যাঁ!'

'আমি তারই বোন। তোমাকে দেখেই চিনেছি।'

এবার হীরালালও বুঝতে পারল।

আজিজন বিবি—এর কথা সে শুনেছে।

কিন্তু এভাবে কেন? এবার কথাটা মনে হল—যেটা বহু আগে মনে হওয়া উচিত ছিল। সে প্রশ্নটা করেও বসল।

ক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর এল, 'সে কথা থাক্‌।—তুমি আমিনাকে খুব ভালবাস, না? খুব ভক্তি কর? আমি তার মুখেই তোমার কথা সব শুনেছি। তুমি ভক্তি কর বলেই সে তোমাকে সমীহ করে—হয়তো তোমার কথা সে শুনবে। দেখ, তুমি একবার কানপুরে যাও। সে সর্বনাশের নেশায় মেতেছে, রক্তে হোলি খেলছে সে। অকারণ, অর্থহীন রক্তপাত। ভুল পথে যাচ্ছে। এপথে গেলে সে বাঁচবে না। যাও একবার, যদি তাকে ফেরাতে পার।'

'কিন্তু—' বিস্মিত হতচকিত হীরালাল আরও কী প্রশ্ন করতে গেল, ইঙ্গিতে নিরস্ত করে আজিজন বলল, 'আর বেশি বলতে পারব না, হয়তো সময়ও নেই, তবু বলছি তুমি যাও। যেতে যেতে পথেই শুনবে সব। পার তাকে নিরস্ত কর।'

আজিজন আর দাঁড়াল না। যেমন চলছিল তেমনি উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যহীন ভাবেই হাঁটতে লাগল।

হীরালাল তাকে বাধা দিতে পারল না, কথা বলারও আর অবসর পেল না, কতকটা স্তম্ভিতভাবে সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

মলিন রৌদ্রদগ্ধ মুখ, ধূলিধূসর বেশভূষা—

এরকম হবার তো কথা নয়।

পাগল হয়ে যায় নি তো?

কিন্তু তবু তার কর্তব্য স্থির করেই দিয়ে গেল আজিজন, একটা যা হোক পথ সে দেখতে পেয়েছে।

ওর কথা যদি সত্যি হয়?

হয়তো না-ও হতে পারে, হয়তো কথাটা উন্মাদের প্রলাপ, কিন্তু তবু হীরালাল সে 'হয়তো'র ওপর ভরসা করে থাকতে পারবে না।

আমিনা বিপন্ন—হীরালাল তার কাজে লাগতে পারে, তাকে বাঁচাতে পারে, এ সম্ভাবনাটাও তো কম নয়!

সুতরাং তার এখন এই একটিই মাত্র পথ—কানপুরের পথ।

॥ ৬০ ॥

কানপুরের উপান্তে পেঁছেই সাংঘাতিক সংবাদটি পেল হীরালাল। ইংরেজদের অবরোধ আর নেই, তাদের নিরাপদে এলাহাবাদে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নানাসাহেব সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন, সতীচৌরা ঘাটে নৌকায় ওঠবার পর নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করিয়েছেন। কিন্তু মেমসাহেব ও কয়েকটি শিশু বেঁচেছে—সে-ও সিপাহীরা তাদের মারতে অস্বীকার করেছিল বলে। তাদের বিবিঘর নামক একটি ছোট্ট বাড়িতে আটক রাখা হয়েছে—তারাই বা কদিন কে জানে!

যে দোকানে হীরালাল আশ্রয় নিয়েছিল সে দোকানীটি বেশ ওয়াকিফহাল। সে গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'অবিশ্যি শুনেছি নানাসাহেব একথা ঘুণাক্ষরেও জানতেন না, ওঁর সেই মারাঠী উজিরও না। এমন কি সিপাহীরা নাকি গোড়াতেই সাফ জবাব দিয়েছিল। করিয়েছে ঐ আজিমুল্লা খাঁ। ভারি ধড়িবাজ। এমনভাবেই নানাসাহেবকে জড়াতে চাইছে যাতে নানার না ফেরার পথ থাকে। এদের ডুবিয়ে উনি যে বেঁচে গিয়ে, আবার আংরেজের সঙ্গে

খাতির জমাবেন—সেটি হতে দিচ্ছে না এরা। শুনেছি—গলার স্বর আরও নামিয়ে দোকানীটি বলল, 'ঐ মেমসাহেবগুলোকেও ছেড়ে কথা কইবে না। তারই নাকি মতলব আঁটছে।—নানাসাহেব তো বিঠুরে চলে গেছেন। ওঁর যে সব বন্দী নিয়ে যাবার নিয়েই তো গেছেন সঙ্গে। এদের ছেড়ে গেলেন কেন? সবই ঐ খাঁ সাহেবটির বুদ্ধি।...দেখা যাক, আমাদের কী বল না ভাই, বসে বসে দেখা বৈ তো নয়। তবে যদি আংরেজ আসে আবার—এর দুনো শোধ তুলবে। কাউকে আর আস্ত রাখবে না শহরে।...আমি সেই ভয়ে ঘরওয়ালীদের সব দেহাতে পাঠিয়ে দিয়েছি—একা আছি, আমি আর এই বুদ্ধু চাকরটা। তেমন বুঝলে আমিও সরব।'

নিজের বুদ্ধির গর্বে দোকানীর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এতক্ষণে আজিজন বিবির বক্তব্য হীরালাল বুঝল।

'রক্তে হোলি খেলা' ও 'সর্বনাশের নেশা' কোনটাই বাহুল্য-উক্তি করে নি সে। আজিমুল্লা খাঁই সব করিয়েছেন, কিন্তু তাঁর পেছনে কোন্ শক্তি কাজ করছে না করছে তা দোকানী বুঝবে না। হীরালাল স্বচ্ছন্দে অনুমান করতে পারে।

সে আর বসল না। সামান্য তল্পী দোকানীর জিম্মা করে দিয়ে কুয়ার জলে মুখ-হাত ধুয়ে নিয়েই বার হয়ে পড়ল।

প্রথমেই গেল সে কসাইটোলা। একেবারে প্রাসাদে যেতে সাহস হল না। সিপাহীর বেশ সে কিছুদিন আগেই ফেলে দিয়েছে—পথে নানা জবাবদিহি করতে হত। এখন সাদাসিধে বাঙালীর পোশাক—ধুতি ও পিরান। এ অবস্থায় প্রাসাদে ঢুকতে পারবে কিনা ঠিক কি? হয়তো বাঙালী দেখেই আগে গ্রেপ্তার করবে।

কিন্তু সর্দার খাঁর দোকানে গিয়ে দেখল সর্দার নেই, তার সহকারী কসাইটিও নেই; একটা বাচ্চা চাকর অতি সামান্য মাংসের পণ্য নিয়ে বসে আছে। সে কিছু বলতে পারল না, শুধু বলল যে সকালের দিকেই প্রাসাদ থেকে কে এক জন সর্দার খাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। অল্পক্ষণ পরেই সর্দার ফিরে এসে তার সহকারী এবং আশপাশের দোকান থেকে অপর কয়েক জন কসাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে—এখনও ফেরে নি।

অতি সাধারণ খবর, হয়তো নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনার ইতিহাস—কিন্তু কে জানে কেন, হীরালাল বুকের মধ্যে একটা হিম শৈত্য অনুভব করল। নিজেকে বড় দুর্বলও মনে হল কিছুক্ষণের জন্যে।

কিন্তু দাঁড়ালে চলবে না। অপেক্ষা করার সময় নেই।

অথচ কোথায়ই বা যাবে সে? প্রাসাদে? হুসেনীকে আগে খুঁজে বের করাই তো উচিত।

ওদিকে সর্দার খাঁ অনেকক্ষণ বের হয়েছে, এখনও ফেরে নি। তার মনের মধ্যে কে যেন বলতে লাগল তার এই স-দলবল অভিযানের সঙ্গে বিবিঘরের ঐ বন্দিনীদের কোথায় একটা যোগাযোগ আছে।

সে মুহূর্তখানেক ভেবে স্থির করল, কিছু হোক বা না হোক, বিবিঘরে যাওয়াই ভাল। সেখানে সিপাই-সান্ত্রী এবং সর্দার খাঁর দলের মধ্যে গিয়ে হয়তো কিছু করতে পারবে না সত্য কথা, কিন্তু অনুনয়-বিনয় করে অল্প কিছুক্ষণ সময় তো অন্তত চেয়ে নিতে পারবে।...

কিন্তু বিবিঘর কোন্ দিকে ? কেউই তো জানে না।

দু-একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করল, তারা কেউ বলতে পারল না। এক জন বলল, নামটা সে কদিন শুনেছে বটে, তবে কোথায় কী বৃত্তান্ত তা সে জানে না।

অবশেষে এক মিঠাইওয়ালার কাছে হদিস মিলল। সে প্রথমে সন্দিগ্ধ ভাবে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কেন বল তো ? সেখানে তোমার কী দরকার ?' তার পর হীরালাল সেদিক দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা না দেখানোয় নিতান্ত বিরক্ত হয়েই একটা পথের নির্দেশ দিল।

হীরালাল যতদূর সম্ভব জোরে পা চালাল এবার।

কিন্তু পথের নির্দেশ অর্থে কতকটা শুধু দিকেরই নির্দেশ। কিছুদূর গিয়ে আবার পথ জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হল। এবার যাকে জিজ্ঞাসা করল, সে শুধু পথটা জানে না, দেখা গেল আরও অনেক কিছু জানে।

সে একেবারে হীরালালের হাত দুটো চেপে ধরল, বলল, 'ওঁহা ? মৎ যাইয়ে ভাই সাহাব, মৎ যাইয়ে। ওঁহা শয়তান কা এক আজব খেল চল্ রহা হ্যায় !'

হীরালাল বুঝল সে খুবই অভিভূত হয়ে পড়েছে, যে দুটো হাতে তার হাত ধরে আছে, তা থর থর করে কাঁপছে।

কিন্তু হীরালালের আর তখন অপেক্ষা করলে চলে না, সে উদ্বিগ্ন ব্যাকুল কণ্ঠে তাকে একটা ঝাঁকি দিয়ে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা করল।

'কী হয়েছে ভাইয়া, বল, বল, জলদি বল। কী চলছে সেখানে ?'

লোকটি অল্পবয়সী, বেশভূষায় মনে হয় শিক্ষিত ভদ্রঘরের ছেলে। সে সত্যিই ভয় পেয়েছে। এতক্ষণে হীরালাল ভাল করে চেয়ে দেখল তার মুখে-চোখে দারুণ আতঙ্ক।

সে কোনমতে, জড়িয়ে জড়িয়ে বহু অসংলগ্ন কথার সঙ্গে যা বলল তার অর্থ হচ্ছে এই যে, আজ দুপুরের দিকে বিবিঘর থেকে সিপাই-সান্ত্রী সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, ফটকের চাবি দেওয়া হয়েছে একদল কসাইএর হাতে—তারা ভেতরে ঢুকে নির্বিচারে কাটছে, এক জনও, এমন কি একটা শিশুও বোধ হয় তাদের সে রুধির-তৃষা থেকে অব্যাহিত পাবে না। কাটছে আর কুয়ায় ফেলছে—কুয়াটা বোধ হয় এতক্ষণে ভরে গেল !

কথাটা শুনেছিল অপরের মুখে, বিশ্বাস হয় নি, কৌতূহলী হয়ে দেখতে গিয়েছিল। ভেতরে ঢোকে নি, বাইরে থেকেই যা দেখেছে তাতেই তার কৌতূহল মিটে গেছে। সম্ভবত এখন কিছুকাল সে মুখে কোন খাদ্য তুলতে পারবে না—রাতের ঘুম তো গেলই !

হীরালালের পা দুটো ভারী পাথর হয়ে উঠল।

তবু তাকে যেতেই হবে—এখনও যদি একজনকে সে বাঁচাতে পারে, হুসেনীর পাপের বোঝা থেকে যদি এতটুকুও কমে !

সে ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, 'তবু আমাকে যেতেই হবে ভাইসাব। বল, কোন্ দিকে, কত দূরে ?'

কাঁধের ও হাতের একটা হতাশ ভঙ্গি করে কোনমতে পথটা দেখিয়ে দিয়ে ছেলেটি প্রায় টলতে টলতে চলে গেল। আর হীরালাল নির্দিষ্ট পথে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।…

কিন্তু বিবিঘর পর্যন্ত তার আর যাওয়ার প্রয়োজন হল না। কাছাকাছি আসতেই নজরে পড়ল, সর্দার খাঁ এই পথ ধরেই এদিকে আসছে। সর্দার খাঁ— কিন্তু এ কী মূর্তি তার!

ভয়ে হীরালালের বুক কেঁপে উঠল।

সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সহচরের মতই দেখাচ্ছে তাকে। দানবীয় মুখখানা আরও দানবীয়, আরও পৈশাচিক হয়ে উঠেছে। চোখদুটো জবাফুলের মতই লাল, আর তার সর্বাঙ্গে—দু হাতে, কাপড়ে-জামায়, মুখে-মাথায় রক্ত! তাজা রক্তে তার জামাটা ভিজে, বোধ করি পথে রক্ত ঝরতে ঝরতেই এসেছে। মনে হচ্ছে, সাক্ষাৎ রক্তবর্ণ একটা দানব হেঁটে আসছে!

হীরালালের হাত-পা অবশ অনড় হয়ে গিয়েছিল। ছুটে পালাবার ইচ্ছে হল একবার—পালাতে পারল না। পা দুটো টানবার শক্তি ছিল না। কিছু ভাবতেও পারল না। আপৎকালে কোন কিছুই যেন মনে পড়ল না। পাষাণের মত অচল হয়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে চেয়ে রইল শুধু।

সর্দারের হাতে তখনও একখানা তলোয়ার ধরা রয়েছে। সেটারও সবটা, মায় বাঁটের কাছ পর্যন্ত রক্তে রাঙা, এখনও তাতে কাঁচা রক্ত লেগে। হীরালাল বুঝল মাথায় খুন চড়েছে দানবটার, হত্যার নেশা পেয়ে বসেছে তাকে। ঐ তলোয়ার এখনই—সামনে পড়ে গেলে—হয়তো তারই গলায় পড়বে।

কিন্তু একেবারে তার সামনে এসে সর্দার থেমে গেল। থামতে হল, কারণ হীরালাল দাঁড়িয়ে আছে পথ জোড়া করেই। একটা ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করল সে, একবার অভ্যস্তমত তলোয়ারটাও তুলল, তার পরই যেন চিনতে পারল হীরালালকে। একবার তার দিকে একবার তলোয়ারের দিকে, আর একবার স্বপ্নাবিষ্টের মত চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। ধীরে ধীরে ভ্রূকুটি মিলিয়ে গেল ললাট থেকে—প্রায় চুপি চুপি বলল, 'ও, হীরালাল ভাইয়া!'

আর একবার নিজের পোশাকের দিকে ও হাতের দিকে চাইল, তার পর তলোয়ারখানা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের মত খানিকটা হেসে নিল। তেমনি চুপিচুপিই বলল, 'হীরালাল ভাইয়া, আমার একটা উপকার করবে? মালেকানের কাছে যাবে এক বার? তাঁকে ব'ল যে, তাঁর বান্দা সর্দার তাঁর হুকুম তামিল করছে—অক্ষরে অক্ষরে করেছে, কেউ বাকি নেই, বাল-বাচ্চা কেউ না···আমি, আমি আর এখন যেতে পারছি না। এই খবরটা শুধু পেঁছে দিও তাঁকে, কেমন।'

আরও খানিকটা হেসে নিয়ে সর্দার খাঁ চলে গেল।

হীরালাল আর দাঁড়াতে পারল না। সেখানেই পথের ধুলোর ওপর বসে পড়ল। তার হাতে-পায়ে কোন জোর নেই, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে, ভেতরে ভেতরে একটা কাঁপুনি লেগেছে—এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের অপরাহ্নে যার কোন বাহ্য কারণ বা যৌক্তিকতা নেই!

সৌভাগ্যক্রমে পথটা তখন নির্জন—খুবই নির্জন। একে এখানটায় এমনিই বসতি কম—আশেপাশে অধিকাংশ বাড়িই আবাস-গৃহ নয়, গোলদারী গুদাম। তার ওপর সিপাহীরা এদিকে আড্ডা করায় দু-একজন যারা ছিল, তারাও ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সিপাহীরাও আজ নেই, সুতরাং লোকজন এদিকে থাকবার বা আনাগোনা করবার কথা নয়।

হীরালাল অনেকক্ষণ বিহ্বল হয়ে বসে রইল। এত রক্ত সে জীবনে দেখে নি। পুজোর সময় মামার বাড়ি যেত প্রায়ই। মামার এক জ্ঞাতি কাকার বাড়িতে ঘটা করে দুর্গাপুজো হত, নবমীর দিন পাঁঠা ও মহিষ বলি হত অনেকগুলি। পাড়ার অনেকে 'মানত'-বলিও দিতে আসত ঐদিনে। খুব ছেলেবেলায় কী দেখেছে মনে নেই—একটু বড় হলে, সে একবার বলি দেখতে দেখতে অজ্ঞানের মত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য সে শুধুই রক্ত দেখে নয়, অবিরাম বলি দিতে দিতে শেষ অবধি কামারটার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল, সে কেবল নাচছিল এবং খড়্গ আস্ফালন করে হুঙ্কার দিচ্ছিল, 'লে আও, আভি লে আও!' তার সেই অবস্থা দেখে সকলে সন্ত্রস্ত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। অনেক চেষ্টায় অনেক কৌশলে তার কাছ থেকে খাঁড়াটা কেড়ে নেওয়া হয় এবং একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে তার মাথায় বালতি বালতি জল ঢেলে তবে তাকে শান্ত করা হয়। সেই কামারটার কাণ্ড দেখেই বালক হীরালাল নাকি 'ভিরমি' গিয়েছিল। সেই থেকে তার মা তাকে নবমীর দিন আর পুজোবাড়ি যেতে দিতেন না।

আজও তার সেই অবস্থা হল নাকি? তবু সর্দার খাঁকে বাহাদুরি দিতে হবে—এতগুলো নরবলি দিয়েও সে প্রকৃতিস্থ আছে।

আর সে? শুধু সেই লোকটাকে দেখেই এমন হয়ে গেল? সে না জোয়ান পুরুষ?

মাথাটায় ঝাঁকানি দিয়ে যেন নিজেকে কিছুটা সহজ করতে চাইল।

এখন তার কাজই বা কী? নির্বোধের মত প্রশ্ন করল নিজেকে।

হুসেনীর কাছে যাওয়া? আর কি প্রয়োজন? সর্দার খাঁ তাকে খবর দিতে বলেছে, কিন্তু খবর তো সে পাবেই।

তবু হয়তো এখনও ভয়ঙ্কর আরও কী মতলব আঁটছে সে—গিয়ে পড়লে এখনও হয়তো সেই সম্ভাব্য ভয়াবহ পাপ থেকে নিবৃত্ত করা যায়।

তা ছাড়া এই সমস্ত রকম অরুচিকর ইতিহাস এবং বীভৎস ঘটনার পরও, বোধ করি এই সকলের প্রাণকেন্দ্র সেই নারীকে দেখবার একটা ইচ্ছাও প্রবল হয়ে উঠল। তাই কর্তব্যের যুক্তিতে মনকে বুঝিয়ে আবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েই যেন একটা ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল সে।

এতক্ষণ অর্ধ-অচেতন হয়ে বসেছিল বলেই বোধ হয় দেখতে পায় নি—দূরে, এই পথেরই প্রান্তে, পাষাণ-প্রতিমার মত এক রমণী দাঁড়িয়ে আছে, সম্ভবত তারই দিকে চেয়ে। 'সম্ভবত' এইজন্য যে, তার আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা। ঠিক বোঝবার উপায় নেই।

দেখবার সঙ্গে সঙ্গে হীরালালের সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ খেলে গেল।

মুখ এবং সর্বাঙ্গ আবৃত থাকলেও তার বুঝতে দেরি হল না যে ঐ রমণীই আমিনা।

সে দাঁড়িয়ে গেল, আর তার থমকে দাঁড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতেই আমিনা বুঝতে পারল যে হীরালাল তাকে চিনেছে। হয়তো তার দেখা করবার ইচ্ছা ছিল না, হয়তো হীরালাল তাকে না দেখে চলে গেলে সে আর ডাকত না। কিন্তু এখন আর আত্মগোপনের প্রয়োজন রইল না—সে-ই হীরালালের দিকে এগিয়ে এল।

কাছে এসে মুখের ওপর থেকে বোরখা সরিয়ে একটা অস্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'তুমি এখানে কেন ? কী করছ ?'

তার চোখের দিকে চাইতে পারে নি হীরালাল, কাছে আসতেই মুখ নামিয়েছিল। তেমনি ভাবেই ধীরে ধীরে জবাব দিল, 'আমি—আমি আপনাকে এ কাজ থেকে, এই সর্বনাশ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য এসেছিলাম বেগমসাহেবা, কিন্তু আমার দেরি হয়ে গেছে। আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—একজনও আর ওখানে বেঁচে নেই; সর্দার খাঁ সব শেষ করেছে। সে নিজে আপনার কাছে আর যেতে পারে নি—আমাকে এই খবরটা দিতে বলে গেছে।'

বলতে বলতেই তার গলা ভেঙে এসেছিল, এবার সে হু-হু করে কেঁদে ফেলে বলল, 'কেন, কেন এ কাজ করলেন বেগমসাহেবা, কেন এমন সর্বনাশা বুদ্ধি আপনার মাথায় এল ? আমি যে আপনার সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাবতেই পারি না। আমি যে আপনাকে দেবী বলেই জানি ?'

আমিনার রূঢ় কণ্ঠ কোমল হয়ে এল। সে কাছে এসে হীরালালের কাঁধে একটা হাত রাখল, তার পর ঈষৎ ম্লান হেসে বলল, 'মিথ্যে একটা ধারণা নিয়ে কষ্ট পাচ্ছিলে বাবুজী, ভালই হল ভুল ভেঙে গেল। আমি দেবী নই, মানবীও নই—আমি পিশাচী, এ-ই আমার সত্য পরিচয়। যদি কখনও তোমার কাজে এসে থাকি, যদি কোন উপকার করে থাকি তো সে নিজের স্বার্থের জন্যেই করেছি।...তুমি আমাকে ভুলে যাও। নিতান্ত ভুলতে না পার, আমার স্বরূপ তো দেখে গেলে—পিশাচী বলে ঘৃণা ক'র। তা হলে আর অশান্তি ভোগ করবে না।—এ সব গোলমাল থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর হীরালাল—এখানে আর থেকো না। ইংরেজ আসছে—তার প্রতিহিংসার মুখে পড়লে তুমি বাঁচবে না। যাও, লক্ষ্ণৌতে ফিরে যাও, যেমন করেই হোক তোমার দপ্তরে গিয়ে যোগ দাও। ইংরেজের আশ্রয়ই তোমার সব চেয়ে নিরাপদ। দেশে ফিরে যেতেই বলতাম, কিন্তু এখন আর নিরাপদে তোমার দেশে ফেরবার উপায় নেই। তুমি আজই লক্ষ্ণৌ রওনা হও। আর—আর মনে রেখো—আমি পিশাচী, শয়তানী—আমাকে ঘৃণা ক'র।'

এবার হীরালাল মুখ তুলে চাইল, অশ্রুরুদ্ধ গাঢ়কণ্ঠে বলল, 'তুমি পিশাচী নও, তুমি দেবী। যখন তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, তখন স্বার্থের কথা ছিল না। এখনও আমার কল্যাণ-চিন্তাই করছ। তুমি যা করেছ—যা করছ, তার অর্থ তুমিই জান। আমার কাছে তুমি দেবী। তোমাকে আমি ভুলব না—তোমার বিচারও করব না। এ প্রাণ তোমারই দেওয়া, যতদিন প্রাণ থাকবে তোমারই মঙ্গল-চিন্তা করব—মনে মনে তোমাকে পুজো করব'।'

আমিনা আর কথা বলল না, ত্রস্তে বোরখাটা আবার মুখের ওপর ফেলে দিল—কে জানে উদ্গত অশ্রু গোপন করতেই কিনা,—তার পর দ্রুতবেগে সেই সংকীর্ণ ধূলিবহুল উত্তপ্ত পথ ধরে প্রাসাদের দিকে ফিরে চলল।

॥ ৬১ ॥

প্রাসাদে ফিরে আমিনা সোজা গোসলখানায় গিয়ে স্নান করতে বসল। পর পর কয়েক কলসী জল ঢেলেও যেন মাথা ঠাণ্ডা হয় না—অবশেষে জল ফুরিয়ে যেতে সে সেখানেই সেই ভিজে মাথায় ভিজে কাপড়ে চুপ করে বসে রইল।

আজিমুল্লা বহুক্ষণ বিঠুরে গিয়েছে—হয়তো এখনই ফিরবে। সঙ্গে আনবে নানার পরোয়ানা অথবা স্বয়ং নানাকেই—বিশ্রী একটা জবাবদিহিতে পড়তে হবে। তার উপর্যুপরি অসহ স্পর্ধায় বিরক্ত হয়ে নানা তাকে কয়েদও করাতে পারেন। সত্য বটে নানার নিজ হাতে লেখা সাংঘাতিক চিঠি তার কাছে আছে। কিন্তু অতর্কিতে কয়েদ করলে সে অস্ত্র প্রয়োগেরই হয়তো সময় মিলবে না। তবে এসব কোন চিন্তাই তার মনের মধ্যে বড় হয়ে ছিল না তখন। সে পরাজিত হয়েছে এবং লজ্জা পেয়েছে। তার পরাজয় ঘটেছে সব দিকেই।

সে জানত সর্দার খাঁ তার কাজ সুচারুপেই সমাধা করবে—তা সে যত গর্হিত এবং কঠিন কাজই হোক না কেন, সেজন্য সে নিজে এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে বোরখা চাড়িয়ে খবরদারি করতে যায় নি, সে গিয়েছিল প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ দেখে সেই 'দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা' পান করতে, নিজের বীভৎস কীর্তি সম্ভোগ করতে। কিন্তু পারে নি। বাড়িটার সামনা-সামনি গিয়ে তার পা দুটো যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল, কিসে যেন টেনে রেখেছিল তাকে। দূর থেকে শেষ দু-একটা আর্তনাদও কানে গিয়েছিল এবং সেটা ঠিক বিজয়ধ্বনির মত সুখদায়ক মনে হয় নি, বরং কানের মধ্যে দিয়ে মর্মে বিঁধেছে—কানটাও যেন জ্বলে গিয়েছে সে আওয়াজে।

এ আমিনার শোচনীয় ব্যর্থতা—নিজের অকল্পিত পরাজয়।

তার লজ্জার আরও কারণ আছে। আজ অকস্মাৎ সর্দার খাঁর কাছে নিজেকে বড় ছোট মনে হয়েছে। সর্দার খাঁ যখন রুধিরাক্ত দেহে রক্তস্নাত তরবারি নিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে বার হয়েছে বিবিঘর থেকে, তখন তার হয়তো ছুটে কাছে যাওয়া উচিত ছিল, ওকে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা করাও উচিত ছিল, কিন্তু সে পারে নি। তখন সে ব্যাকুলভাবে শুধু বার বার এই প্রার্থনাই করেছে খোদার কাছে যে, সর্দার যেন না তাকে দেখতে পায়।

সেই লজ্জা তার কতকটা হীরালালের কাছেও।

হীরালাল তাকে দেবী মনে করে, আজও সে তাকে পুজো করে মনে মনে। এটা কিছুদিন আগেও হাস্যকর ছিল হয়তো, অন্তত তার সুবৃহৎ হিংসাযজ্ঞের কাছে হীরালালের মত তরুণ বালকের শ্রদ্ধা এমন কিছু বিবেচনার যোগ্য বলে মনে হত না, কিন্তু আজ ওর ঐ শ্রদ্ধাটুকু তাকে নিজের কাছেই হেয় তুচ্ছ করে দিয়ে গেল।

কতকটা নিজের সেই লজ্জার জন্যই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল আমিনা, আর সেই ক্রোধই তার কণ্ঠস্বরকে অকারণে রূঢ় ও কর্কশ করে তুলেছিল।

তবে কি সে ভুলই করল?

তবে কি—তবে কি সে প্রতিহিংসার নামে শুধু দানবীয় হিংসাই এতদিন লালন করেছে মনে মনে?…

বাইরে থেকে মুসম্মৎ ডাকল, 'মালেকান!'

দেরি দেখে সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

আমিনার মনে পড়ল আজ মুসম্মৎও তার চোখের দিকে চাইছে না—সামনে পড়লেই মাথা হেঁট করছে।

আজ পৃথিবীর সকলেই বোধ হয় ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে তার দিক থেকে।

আবারও মুসম্মৎ ডাকল, 'মালেকান!'

না, না, এ কী ভাবছে সে, নিজের কাছে অন্তত সে খাঁটি আছে। সে-মাথা উঁচু করেই থাকবে। এখন এতটুকু মাথা হেঁট করলে আর পৃথিবীতে সে মাথা লুকোবার স্থান থাকবে না। নিজেই যদি ছোট মনে করতে থাকে নিজেকে, তা হলে অপরে যে একেবারে মাথায় পা তুলে দেবে।

সে যতদূর সম্ভব সহজকণ্ঠে সাড়া দিল, 'হ্যাঁ রে মুসম্মৎ, এই যে যাই!'

গা-মাথা মোছবার আর প্রয়োজন ছিল না, অগ্নিময় বাতাসে সে কাজটা আপনিই সারা হয়ে গেছে, এখন তাড়াতাড়ি একটা শুকনো পোশাক জড়িয়ে বার হয়ে এল গোসলখানা থেকে।

'কিরে? খাঁ সাহেব এসেছেন?'

'না।' কতকটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল মুসম্মৎ, 'খাঁ সাহেব আর পেশোয়া দুজনেই নাকি আসছিলেন, এক জন সান্ত্রী দেখেছে—কিন্তু তাঁরা এখনও প্রাসাদে আসেন নি। হয়তো—'

সে চুপ করে গেল।

হয়তো চরম সংবাদ পেয়ে অনর্থক বোধেই আর আসেন নি।

আমিনা মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ভয়? না, ভয় নয়—ভয় আর তার কাউকেই নেই, কিছুতেই নেই। প্রাণের ভয় সে কোনদিনই করে না—এখন আর কাজ অসম্পূর্ণ থাকবার ভয়ও নেই। কে জানে কেন, আজ জীবনধারণের উদ্দেশ্যটাও যেন গেছে ফুরিয়ে।

ভয় নয়—বিরক্তি। এখন এই ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে যে কতকগুলো কথা-কাটাকাটি করতে হল না, তাইতেই সে বেঁচে গেল।

মুসম্মতের দেওয়া শরবত পান করে আমিনা অনেকক্ষণ বিছানাতে পড়ে রইল মড়ার মত। ঘরের আবহাওয়া আগুন হয়ে উঠেছে, বাইরে একটু ঠাণ্ডায় কোথাও বসতে পারলে হত, কিন্তু সেটুকু উদ্যমেরও যেন আর শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। ঘামে জামা-বালিশ ভিজে উঠল ক্রমশ—তবে তাতে কোন অসুবিধা হল না। কিছুতেই আর তার কোন অসুবিধা নেই।

অনেকক্ষণ পরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবারও কয়েক দণ্ড পরে সে উঠে বসল। বোধ করি মুসম্মৎ কাছেই কোথাও ছিল, তার উঠে বসবার শব্দ পেতেই একটা আলো হাতে করে ঘরে ঢুকল।

'মুসম্মৎ, শোন্, কাছে আয়!' স্নেহমাখানো কোমল কণ্ঠে ডাক দিল আমিনা।

মুসম্মৎ কতকটা কাঠের মতই নিঃশব্দে কাছে এসে দাঁড়াল। আমিনা হাত বাড়িয়ে তার একটা হাত ধরে টেনে একেবারে পাশে বসাল। মুসম্মৎ দু হাতে মুখ ঢেকে বসল। না, কান্না নয়—বোধ করি তার নিজের মনোভাব মালেকানের কাছে ধরা পড়বার জন্যই লজ্জা।

গাঢ় কণ্ঠে আমিনা বলল, 'মুসম্মৎ, অনেকদিন তুই আমার সঙ্গে আছিস, সুখে-দুঃখে ছায়ার মত পাশে পাশে থাকিস, বোনের মত মায়ের মত সেবা করিস,

কিন্তু তোর দিকে কোনদিন তাকানো হয় নি। তুই অনেক সহ্য করেছিস, আমার মত ডাইনীর সঙ্গে থেকে বহু কষ্ট পেয়েছিস।—তোর কথা আমার অনেক আগে ভাবা উচিত ছিল।'

এই পর্যন্ত বলে আমিনা একটু থামল। তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'কিন্তু তা হয় নি—আজ হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবু শোন্, আমি আর কানপুরে থাকব না। ইংরেজ এসে পড়েছে। যুদ্ধের একটা অভিনয় হয়েছে—হয়তো আরও একবার হবে। তবে যা-ই হোক, এরা হারবে। হেরে কে কোথায় ছিটকে গিয়ে পড়বে। নানাও হয়তো তখন আমাকে সঙ্গে নিতে চাইবেন না, আমারও আর থাকবার প্রবৃত্তি নেই। ওঁকে দিয়ে আমার যা দরকার ছিল তা মিটে গেছে। আমি—আমি এবার লক্ষ্ণৌ যাব। গোপনে, আমার মত আমি যাব। পেশোয়ার বেগম হিসেবে নয়—'

বাধা দিয়ে মুসম্মৎ বলল, 'ওখানে মহম্মদ আলি খাঁ আছেন, না ?'

'হ্যাঁ আছে, কিন্তু তাকেও আমি বিব্রত করব না। সে তার কাজ করবে, আমি আমার কাজ করব। আমি হয়তো আরও ওদিকে—দিল্লীও যেতে পারি। তার সঙ্গে দেখা না হলেও চলবে। কিন্তু সে কথা থাক, এবার সামনে বিষম বিপদ, এবার চলেছি মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে। ইংরেজের মার খাওয়া এবার শেষ হয়ে এল—সে এবার ফিরে মারতে শুরু করেছে। শেষ কী হবে জানি না, কিন্তু ইংরেজের হাতে অনেকেই মরবে। আমার বিশ্বাস তাদেরই জয় হবে। ওদের বাদশাহী শেষ হবার সময় আসে নি এখনও। তবু আমি আমার কাজ করে যাব—সাধ্যমত ওদের প্রাণ নিতে থাকব, যতদিন না ওরা আমার প্রাণ নিতে পারে। এ বিপদে আর তোকে টানতে চাই না মুসম্মৎ—এখনও হয়তো সময় আছে কোনও দূর দেশে গিয়ে বাসা বাঁধবার, সুখী হবার। তুই আমায় ঘেন্না করতে শুরু করেছিস, শীগ্‌গিরই আমার সঙ্গও তোর অসহ্য বোধ হবে। তার চেয়ে তুই এখনই কোথাও চলে যা। নগদ টাকা যা আছে—অন্তত তোর জীবন সুখে কেটে যাবে। তুই বরং আজই ব্যবস্থা কর্—কোথায় যেতে চাস্। খুব দূরে কোথাও ঠিক কর্। আমি লোক দিচ্ছি সঙ্গে, নিরাপদে রেখে আসুক তোকে।'

মুসম্মৎ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর বলল, 'না, তা আর হয় না মালেকান, এখন তোমাকে একা ছেড়ে দিতে পারব না।'

আমিনা ঈষৎ ব্যাকুল কণ্ঠেই বলল, 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুই কিছুতেই আমার কাছে থাকতে পারবি না মুসম্মৎ! তখন বড় বিপদে পড়বি। ভুল করিস নি ?'

'যতক্ষণ পারব থাকব। যখন একেবারে অসম্ভব হবে আমার ব্যবস্থা আমি করে নেব। এতকাল তোমার সঙ্গে থেকে সেটুকু ভরসা কি আর হয় নি ?—আমার জন্যে ভেবো না।'

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কতকটা স্বগতোক্তির ভঙ্গিতেই আমিনা বলল, 'তোরা যদি আমাকে পুরোপুরি ঘেন্না করতে পারতিস, আমার পথ অনেকটা সহজ হত—অনেক সহজ হত !'

আরও কয়েক মুহূর্ত তেমনি অন্যমনস্কের মত বসে থাকবার পর হঠাৎ একসময় উঠে বাতিদানটা নিয়ে আয়নার পাশে রাখতে রাখতে বলল, 'তা হলে তুই সব গোছগাছ করে নে। যা নিতান্ত না নিলে নয়, তাই শুধু নিবি। হ্যাঁ, আর

শোন, আমার তো পিস্তল আছে—তুই একটা যা হোক হাতিয়ার নে।—কাল ভোরেই রওনা হয়ে যেতে চাই—সেই মত তৈরী থাকবি।'

তার পর চুল খুলে বেণী বাঁধতে বসল। প্রসাধনের পূর্বাভাস।

মুসম্মৎ বিস্মিত হয়ে বলল, 'এখন আবার কোথাও যাবে নাকি ?'

'হ্যাঁ।' মুহূর্তের মধ্যে অরুণ-রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ, কিন্তু সামান্য বাতির আলোয় মুসম্মৎ অত লক্ষ্য করল না।

'হ্যাঁ'—বলে গলাটা যেন একটু সাফ করে নিয়ে আমিনা বলল, 'এক জায়গায় কিছু দেনা আছে—সেইটে যাওয়ার আগে শোধ করে দিয়ে যাব।'

বেশ একটু যত্নের সঙ্গেই সে প্রসাধন করতে লাগল।

ঋণ শোধ করতে যাওয়ার সঙ্গে এমন প্রসাধন-পারিপাট্যের কি সম্পর্ক এবং আমিনার নিজেকেই বা যেতে হবে কেন—এমন সহস্র প্রশ্ন করা যেতে পারত, কিন্তু মুসম্মৎ কিছুই করল না। সে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বার হয়ে গেল।

সে এতকাল বৃথা আমিনার সঙ্গে ঘর করে নি।

বাচ্যার্থের পেছনে গূঢ়ার্থ থাকে তা সে জানে।

* * * *

মাংসের দোকানের উপরতলায় নিজের ছোট্ট ঘরটিতে চারপাইএর ওপরে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল সর্দার খাঁ। সে এখানে পৌঁছতে বাচ্চা চাকরটা ভয় পেয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গিয়েছিল—তাতেই তার সম্বিৎ ফিরে আসে, নিজের চেহারাটার কথা তার খেয়াল হয়। তার পর সে ওপরে এসে ভাল করে স্নান করেছে, রক্তমাখা পোশাকগুলো উনুনে দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে সবই কতকটা যন্ত্রচালিতের মত। হুঁশ তার পুরোপুরি না হোক, কিছুটা আছে। নীচে দোকানটা খোলা হা-হা করছে, টাকা পয়সার বাক্সও সম্ভবত সামনেই পড়ে—তা সে সবই জানে, কিন্তু আবার নীচে গিয়ে সব বন্ধ করা বা গুছিয়ে আসার আর প্রবৃত্তি নেই।

কিছুতেই যেন আর তার কোন স্পৃহা নেই। মাংসের দোকান সে আর দিতে পারবে না—সুতরাং ও যে পারে নিক। এ জায়গাটাও তাকে ছাড়তে হবে—কোথায় যাবে তা সে এখনও ঠিক করে নি। সেই কথাটাই বসে ভাববার চেষ্টা করছে। যেখানে হোক, যত দূরে হয় ততই ভাল।

ভাববার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছু যেন স্পষ্ট মাথাতে আসছে না। আসলে সে যেটা প্রাণপণে চেষ্টা করছে সেটা দুপুরের ঐ ঘটনাটা মনে না আনবার।

কিন্তু কিছুই হচ্ছে না—শুধু দেহ নয়, মনটাও যেন জড় হয়ে গেছে। হয়তো সে একদিক দিয়ে খোদার আশীর্বাদ, নইলে সে হয়তো পাগলই হয়ে যেত।

সহসা সিঁড়িতে কার পদশব্দ শোনা গেল। খুব হালকা কোন পায়ের আওয়াজ—নরম চটি ট ার শব্দ।

এত রাত্রে তার এখানে কে আসে ? সর্দার সোজা হয়ে বসল।

পরক্ষণেই তার দৃষ্টি কোমল হয়ে এল।

আমিনা।

আমিনাকে দেখলে তার দৃষ্টি আজও কোমল হয়ে আসে—আজও সে তার নয়নানন্দ।

আমিনা ঘরে ঢুকে সন্তর্পণে দোর ভেজিয়ে দিল।

বলল, 'সিঁড়ির দরজা অমন খোলা রেখেছিস কেন রে সর্দার ?'

সর্দার কেমন একটা বিহ্বল ভাবে বলল, 'খোলা ছিল!'

'হ্যাঁ, কিন্তু ব্যস্ত হতে হবে না, আমি বন্ধ করে দিয়ে এসেছি।'

ওড়নাটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমিনা কাছে এসে একেবারে পাশটিতে বসল। তার পর সর্দারের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে তার সেই স্থূলে কঠিন বাহুমূলে নিজের গালটা চেপে ধরে আস্তে আস্তে ডাকল, 'সর্দার!'

সে স্পর্শে ও সে ডাকে সর্দারের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল, কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না।

আমিনা হয়তো তার মনের অবস্থাটা বুঝল, তাই সে-ও আর কোন কথা বলল না। শুধু বাহুবন্ধনটা আরও নিবিড় করে, গলাটা তার বাহুতে আরও জোরে চেপে ধরে চুপ করে বসে রইল। দু জনেরই বুকের রক্ত উত্তাল—দু জনের দু কারণে সম্ভবত, তবু উভয়েই সেই ভৈরব উত্তাল বক্ষঃস্পন্দন নীরবে অনুভব করতে লাগল, কেউই কথা বলবার চেষ্টা মাত্র করল না।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে, সর্দারের মনে হল এক যুগ পরে, প্রায় অস্ফুট গাঢ়কণ্ঠে আমিনা বলল, 'সর্দার, আমার আর ক্ষমা চাইবার মুখও নেই—তুই কি আমায় ক্ষমা করতে পারবি ?'

এবার সর্দার কথা বলল। তার বুকের মধ্যে কী হচ্ছিল তা ঈশ্বর জানেন—হয়তো আমিনাও কিছু বুঝল, কিন্তু কণ্ঠে কোনরূপ আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল না। ধীরে ধীরে শুধু বলল, 'ও কথা থাক মালেকান। তোমার কোন কসুর কোনদিন আমার কাছে হতে পারে না।'

স্খলিত ভগ্নকণ্ঠে আমিনা বলল, 'কতটা যে করছি, কতটা জুলুম যে করা যায়, তা আগে বুঝি নি সর্দার, বিশ্বাস কর। তোর জীবনটা হয়তো নষ্টই করে দিলুম চিরকালের মত। তুই, তুই যদি অমন নির্বিচারে আমার সব খেয়াল না মেটাতিস, তুই যদি আমাকে বাধা দিতিস, তা হলে হয়তো এতটা বিবেচনা-হীন হতে পারতুম না!'

সর্দার তবুও কথা কইল না। প্রশ্নহীন বিচারহীন বিশ্বস্ত সেবার বদলে এই অনুযোগের পুরস্কারও সে নিঃশব্দে সহ্য করল। আজ সারাদিন বিভিন্ন অনুভূতি ও আবেগের যে তুফান উঠেছে তার মনে—তাতেই সে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছে। বোধ করি এসবে সে অভ্যস্ত নয় বলেই আরও বেশি অবসন্ন—আরও বেশি ক্লান্ত বোধ করছে নিজেকে।

'শোন্ সর্দার, কাল আমি চলে যাব।'

এবার সর্দার চমকে উঠল, 'কোথায় যাবে মালেকান ? বিঠুর ?'

'না, এবার নানাসাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল। কোথায় যাব, তা আর তোকে বলে যাব না। আর তোকে আমার জীবনের সঙ্গে জড়াব না। তুইও দূরে কোথাও পালিয়ে যা, ইংরেজদের বিদ্বেষ থেকে বহু দূরে কোথাও—সেখানে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু কর্। এবার, এবার তুই বিয়ে-থা করার চেষ্টা কর্ সর্দার!'

সর্দার তবু নীরবে রইল। আমিনা বুকটা আরও জোরে চেপে ধরেছে তার বাহুতে। একান্ত নিবিড়—একান্ত ঘনিষ্ঠ। বোধ করি সেই অভূতপূর্ব অকল্পিত অবস্থাটাই অনুভব করতে চেষ্টা করছে সে।

আমিনা একটু চুপ করে থেকে মাথাটা সরিয়ে সর্দারের বুকের ওপর নিয়ে এল। তার পর বলল, 'তোকে পুরস্কার দেবার বৃথা চেষ্টা করব না। কিন্তু তুই তো অন্য লোক নিয়েছিলি, তাদের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা কাল ভোরেই পাঠিয়ে দেব মুসম্মৎকে দিয়ে। তাদের দিয়ে দিস্। আর তোর—তোর যদি কোন দরকার থাকে তো বলিস্ আমাকে—কোন সংকোচ করিস্ নি।'

'আমার নিজের কোন দরকার নেই মালেকান!' এবার সর্দার উত্তর দিল, আগের মতই শান্ত ধীরভাবে।

'আমার কাছে কি তোর কিছুই চাইবার নেই সর্দার?'

বুকের কাছেই মাথাটা রেখে মুখটা তুলে ধরল আমিনা, তার উষ্ণ নিঃশ্বাস এসে পড়তে লাগল সর্দারের মুখে ও গালে। আমিনার দেহে ও কেশে প্রসাধনের সুগন্ধ। উত্তপ্ত তার স্পর্শ। রগের কাছে শিরা দুটো দপ্ দপ্ করছে সর্দার খাঁর। এমন অনুভূতি তো এর আগে কখনও হয় নি!

'ভেবে দ্যাখ! আর হয়তো জীবনে দেখাই হবে না আমাদের। যদি কিছু চাইবার থাকে—তা সে যা-ই-হোক, দ্বিধা করিস নি—নিঃসংকোচে বল্!'

প্রাণপণে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, পাছে এদিকে ফিরে কথা কইতে গেলে আমিনার মুখের মধ্যেই নিজের মুখের বাতাসটা লাগে—সর্দার বলল, 'তুমি খুশী হয়েছ মালেকান, এ-ই আমার যথেষ্ট পুরস্কার! তবে এখনও আর একটা সাধ আছে—'

একটু ইতস্তত করে যেন শেষের কথাগুলি বলল সে।

'বল্, বল্—কী সাধ?' উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করে আমিনা। এবার জোর করে নিজের কপালটা সর্দারের দাড়িতে চেপে ধরে।

'তুমি এসবের বাইরে নিরাপদে কোথাও চলে গেছ, তোমার কোন ভয় নেই আর—এইটে জানতে পারলেই আমি সুখী হতাম, নিশ্চিন্ত হতাম!'

অকস্মাৎ আমিনার দু চোখের কোণ উপ্‌চে তপ্ত অশ্রু উঠে পড়ল। দাঁতে দাঁত দিয়ে সেই অশ্রু সংবরণ করতে লাগল কিছুকাল ধরে। তার পর ধরা-ধরা গলায় বলল, 'তুই আমার কথা আর ভাবিস নি সর্দার, আমি এতখানি ভালবাসার উপযুক্ত নই!'

তার পর বাহুবন্ধন শিথিল করে সোজা হয়ে বসল। একটুখানি তেমনি ভাবে স্থির হয়ে থেকে বলল, 'আমার আর ফেরবার—দূরে যাবার কোন পথ নেই তা তো তুই জানিসই। যে আগুন জেলেছি সে আগুনেই মরতে হবে। শুধু যেন ওদের হাতে ধরা পড়ে ফাঁসিকাঠে না মরতে হয়, খোদার কাছে এই দোয়া জানা!'

সর্দার আবারও শিউরে উঠল—সম্ভবত আমিনার সম্ভাব্য অনিষ্ট আশঙ্কা করেই। স্পর্শ করে না থাকলেও আমিনার তা অনুভব করতে অসুবিধা হল না। আবারও দু চোখে অশ্রু অবাধ্য হয়ে উঠতে চায়। চকিতে কামিজের প্রান্তে তা মুছে নিল সে।

তার পর অনেক চেষ্টায় সহজ হয়ে একটু আলস্যের ভঙ্গি করে বলল, 'বড্ড ঘুম পেয়েছে সর্দার, এখানেই ঘুমোব।'

সর্দার চমকে উঠল। বিহ্বল ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে কথাটার সম্যক অর্থ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'এখানে ঘুমোবে! না-না, সে হয় না,—তুমি বাড়ি চল মালেকান, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।'

'কেন, এখানে ঘুমোলে দোষ'কী ? লোকে কী বলবে ? লোকের কথায় কি এখনও আমার এসে যায় কিছু ?'

'না, তা নয়, কিন্তু এখানে এই ময়লা বিছানায়—ছিঃ ছিঃ, সে হয় না মালেকান !'

'খুব হয় ।' আমিনা কামিজের বোতামটা আগেই খুলতে শুরু করেছিল, এবার জামাটা খুলতে খুলতে একটু হেসে বলল, 'জানিসই তো আমাকে, আমার খেয়াল চিরদিনই মেটাতে হয়েছে তোকে—আজও মেটা ! আজই তো শেষ !'

সর্দার উঠে দাঁড়াল । বিব্রতভাবে বলল, 'তা হলে তুমি ঘুমোও মালেকান, আমি এই বাইরে সিঁড়িতে রইলাম ।'

সে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল ।

আমিনা হাত বাড়িয়ে তার হাতটা ধরল ।

'তোর সঙ্গেই শোব সর্দার । একা শোবার জন্য আসি নি !'

সর্দারের অনিচ্ছুক চোখ তার দিকে না পড়ে পারল না । সেই দেব-দুর্লভ অপরূপ দেহ-লাবণ্যের দিকে চেয়ে তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল । সে কেমন বিহ্বল অবশভাবে আমিনার মৃদু আকর্ষণে আবার সেই শয্যার ওপরই এসে বসে পড়ল ।

আমিনা প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'তোকে আজ দেবার আমার কিছুই নেই সর্দার—নিজেকে ছাড়া । তাতেও তোর ঋণ শোধ হবে না আমি জানি, তবু কতকটা তৃপ্তি পাব । তুই দয়া করে আমাকে এটুকু দে—'

সে বিছানার ওপর এলিয়ে শুয়ে পড়ল ।

সর্দারের সর্বাঙ্গ কাঁপছে । এরকম অনুভূতি তার জীবনে কখনও হয় নি । মনে হল সমস্ত রক্ত মাথায় উঠেছে—বুকটাও বুঝি ফেটে যাবে এখনই !

তবু প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ বুজে নিজেকে সে সংবরণ করে নিল । আরও একটু ইতস্তত করল, তার পর হেঁট হয়ে আমিনার সেই রক্ত-কমলের মত রক্তাভ কোমল পা দুটিতে অতি সন্তর্পণে—যেন ভয়ে ভয়ে দুটি চুম্বন করল । তার পর, আবেগ অসংবরণীয় হওয়াতেই বোধ করি, সেই দুর্লভ এবং ঈপ্সিত চরণ দুটি নিজের বুকে সজোরে ও সবেগে চেপে ধরল একবার । এইভাবে কয়েক মুহূর্ত নিজের এই সৌভাগ্য—দীর্ঘকাল সেবার এই আশাতীত পুরস্কার অনুভব করার পর সহসা সে যেন কী এক মর্মান্তিক আঘাতে লাফিয়ে উঠল ।

বিকৃত গাঢ় কণ্ঠে শুধু বলল, 'তুমি তৈরি হয়ে নাও মালেকান, আমি নীচে রাস্তায় অপেক্ষা করছি ।' এবং ব্যাপারটা কী ঘটল আমিনা তা ভাল করে বোঝবার আগেই সে ঘর থেকে—বাড়ি থেকে ছুটে বার হয়ে গেল ।

॥ ৬২ ॥

কালকাপ্রসাদ কদিন যাবৎ নানকচাঁদকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়েছেন । লোকটা শহরে আছে বা আসা-যাওয়া করছে—এ খবরটা তিনি বহু লোকের কাছেই পেয়েছেন, কিন্তু আসল লোকটার টিকিও ধরতে পারছেন না । নিশ্চয়ই কোন একটা বড় রকমের 'তালে' ঘুরছে—সেজন্যেই আরও কালকাপ্রসাদ তার জন্যে ব্যাকুল । লোকটা চতুর, এবং টাকার গন্ধ পায়, (ঐ লোকটাই পায়—তিনি পান না কেন ? মহাবীরজীর এ রীতিমত একদেশদর্শিতা !) একথা

তিনি জানেন ; সে যখন এমন করে ঘুরছে তখন টাকাই কোথাও আছে আশেপাশে। একবার নাগাল ধরতে পারলে বোঝা যেত।

টাকা পাওয়া তো দূরে থাক, চারটে শুয়োর-খেগোকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর বেশ কিছু বরং খরচই হয়ে গেল। হয়তো আখেরের কাজ কিছু হয়ে রইল—শোনা যাচ্ছে 'আংরেজ' এসে পড়ল বলে, এলে এবং তারা জয়ী হলে তাঁর কিছু সুবিধে হবে সন্দেহ নেই—অন্তত ফাঁসিকাঠে প্রাণটা যাবে না, কিন্তু যদি শেষ অবধি আংরেজরা না জিততে পারে? যদি সত্যি সত্যিই নানা আর তাত্যা টোপীর দল জয়লাভ করে—তখন? তাঁর এই কুকীর্তির কথা কি আর চাপা থাকবে? হয়তো দিগ্বিজয় সিং-ই সব দোষটা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজের গলাটা বাঁচাবে।

তখন কি উপায় হবে—এটাই একবার নানকচাঁদের কাছ থেকে জেনে নিতে চান কালকাপ্রসাদ। ওর পরামর্শেই কাজটা করলেন, এখন যদি শেষরক্ষা না হয়? নানকচাঁদের তো বুদ্ধির বড় অহঙ্কার—এখন দিক বুদ্ধি একটা।

কিন্তু মানুষটাকেই কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না যে। গোটা শহরটাই তো প্রায় গরু-খোঁজা করে ফেললেন—লোকটা কৈ?

অবশেষে সেদিন উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন এবং প্রায়-অবসন্ন কালকাপ্রসাদ মহাবীরের কাছে লাড্ডু-ভোগ মানসিক করে ফেললেন। আর সেইদিনই (জয় বজরঙ্গজী মহারাজকি!) একটা হদিস মিলল উকিলসাহেবের।

হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে নবাবগঞ্জ বাজারের কাছে পুরাতন বন্ধু কানহাইয়ালালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এ লোকটিরও বুদ্ধি খুব, অনেকবার অনেক রকমে যাচিয়ে দেখেছেন কালকাপ্রসাদ—মনে মনে তারিফ না করে পারেন নি। কানহাইয়ালাল তাঁর অনেক আগেই দেহাতে গিয়ে বাস করতে শুরু করছেন—এখন আলাপ করে জানা গেল তিনিও বসে নেই, সেখানে বসেই 'দু পয়সা' বেশ কামাচ্ছেন। ওদিকে লক্ষ্ণৌতে, এদিকে কানপুরে——সিপাহীদের কাছে রসদ যোগাচ্ছেন এবং পোশাক থেকে শুরু করে জুতো মেরামত পর্যন্ত যাবতীয় ঠিকাদারি নিয়েছেন। নিজে বড় একটা এই সব হাঙ্গামের মধ্যে যান না—লোক রেখে চালান, এর দপ্তরটাও বাড়ির কাছাকাছি রাখেন নি—নিজের গাঁ থেকে বহু দূরে সদর ফতেপুরের কাছে একটা গাঁয়ে বসিয়েছেন। আবার ওদিকেও তলে তলে কিছু কাজ গুছিয়ে রেখেছেন বৈকি। দুটি মেমসাহেবকে প্রায় মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে কদিন ঘরে রেখে শেষ পর্যন্ত গোরুর গাড়িতে চড়িয়ে সীতাপুরের জঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।। আর কী করতে পারেন তিনি! তাঁর যা করবার তো করলেন—এখন তাদের বরাত! অবশ্য শোনা যাচ্ছে, তারা শেষ পর্যন্ত কজন সিপাহীর হাতে ধরা পড়েছে এবং সে অবস্থায় ফলাফল কী হয়েছে তাও অনুমান করা কঠিন নয়—তবে কানহাইয়ালালের তাতে কিছু এসে-যায় না। তিনি গোরুর গাড়িতে তোলবার আগে মেমসাহেবদের দিয়ে দুখানি 'সার্টিফিকট' লিখিয়ে নিয়েছেন—তাঁর ইংরেজভক্তি ও বিশ্বস্ততার উচ্চ প্রশংসা লিখে দিয়ে গিয়েছে তারা—সুতরাং ও-পক্ষই জয়ী হোক, আর এ-পক্ষই জয়ী হোক—তিনি নিশ্চিন্ত। যে-ই জয়ী হোক, সাময়িকভাবে অপর পক্ষের সঙ্গে কাজ-কারবারের চিহ্নগুলি রাতারাতি মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে কতক্ষণ!

কালকাপ্রসাদ মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। সকলেই বেশ গুছিয়ে নিল, কেবল

তিনিই আহাম্মক—কিছু করতে পারলেন না। অবশ্য তিনি প্রাক্তন (এবং সম্ভবত স্বর্গত) মনিবের কিছু পয়সা শেষের দিকে নিজের সিন্দুকে পুরেছেন ঠিকই এবং এই কদিন সব্জি যুগিয়েও দু-চার পয়সা করেছেন—তবে সে আর কতটুকু! সে কি এদের আয়ের সঙ্গে তুলনীয় ?

একই সঙ্গে অপরের বুদ্ধিতে তৃপ্তি এবং নিজের নির্বুদ্ধিতা ও দুর্ভাগ্যে দুঃখবোধ হওয়ায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কালকাপ্রসাদ বললেন, 'তা আজ এখানে কী করছ ? শহরের হাওয়া তো ভাল ঠেকছে না।'

'সেই জন্যই তো এসেছি রে ভাই প্রাণের দায়ে! অনেক টাকা পাওনা—লোক পাঠিয়ে সুবিধে হচ্ছে না, তাই নিজে ছুটে এসেছি। আংরেজ এসে পড়ল বলে, কাল-পরশুর মধ্যেই শহরে ঢুকে পড়বে—হয় এদের লড়াই দিতে হবে, নয় পালাতে হবে। এখন জিতুক বা হারুক, এদের কি আর কোন পাত্তা পাওয়া যাবে ? কে কার কড়ি ধারে—এই হয়ে দাঁড়াবে। তাই এসেছি হেস্তনেস্ত করে যেতে। তা কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে ; খাজাঞ্চির সঙ্গে আধাআধি রফা করতেই নগদ টাকা বেরিয়ে এল এক লহমায়।'

'আধাআধি ?'

'তাতে আমার লোকসান হয় নি।...আগে তো অনেক মুনাফা করেছি, এটায় না হয় না হল।' হাসতে লাগলেন কানহাইয়ালাল।

সঙ্গে সঙ্গে ওর মুনাফার একটা আনুমানিক অঙ্ক মনে মনে হিসেব করে নিয়ে কাল্কাপ্রসাদ ঘেমে উঠলেন।

'তা তুমি এখানে কী করছ মুনশী কালকাপ্রসাদ ?'

কালকাপ্রসাদ সব কথা না বলে সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'আমি নানকচাঁদকে খুঁজছি। তার সঙ্গে একটা জরুরী দরকার আছে।'

'ও, নানকচাঁদকে খুঁজছ ? তা এখানে কেন ? বিঠুরে যাও—দেখবে প্রাসাদের আনাচে-কানাচে সে ঘুরছে। আর, ওরা হল শকুনির জাত—ভাগাড়ে আর শ্মশানেই ওরা ঘোরে। বিঠুরের এখন হল শ্মশানপুরীর অবস্থা—বুড়ো শকুনি দেখ ঠিক সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে!'

'কেন, কেন, বিঠুরের অমন হাল বলছ কেন ?' সাগ্রহে প্রশ্ন করেন কাল্কাপ্রসাদ।

'আরে, নানাসাহেব তো ওখান থেকে চাটি-বাটি গুটিয়ে ভাগবার তালে আছে—শোন নি ? এধারে যে বহুৎ কাণ্ড হয়ে গেছে, ছিলে কোথায় ? আমি তো একদিনের জন্যে এসেই সব শুনে নিয়েছি। এর ভেতর একটা লড়াইএ সিপাইদের হার হয়েছে—ইংরেজ এগিয়ে আসছে। এবার যে শিয়রে শমন!... তার ওপর ঐ যে বিবিঘর না কোথায় এক পাল মেমসাহেব আর তাদের বাচ্চাকাচ্চা ছিল, তাদের নাকি নানারই এক বিবি আজ খুন করিয়েছে। অন্য নাম করে নানার কাছ থেকে পরোয়ানা নিয়েছিল—সেই পরোয়ানার জোরে কসাই দিয়ে কোতল করেছে। খবর পেয়ে নানাসাহেব ছুটে এসেছিল—শহরে পা দিয়েই শোনে কম্ম ফরসা! তখন ভেঙে পড়েছিল নানা—সিধে নাকি গঙ্গায় চলে গিয়েছিল ডুবে মরতে। আজিমুল্লা খাঁ অতিকষ্টে টেনে ফিরিয়েছে। তার মানে ইংরেজদের হাতে পড়লে ওর আর রক্ষে নেই।...এধারে ইংরেজ তো দোরে—কাজেই নানাসাহেব বিঠুর ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তৈরী হবে বৈকি।... যাওয়ার আগে দামী জিনিসপত্র, হীরে-জহরৎ, সোনার থালা-বাসনগুলোর

কোন একটা কিনারা করে রেখে যাবে নিশ্চয়—হয়তো মাটির নীচে পঁুতেই রেখে যাবে কোথাও। দ্যাখো গে যাও, তোমার নানকচাঁদ সেই তালে ঘুরছে। ওরা ধড়িবাজ—আমাদের মত খেটে খেতে তো শেখে নি, মেহেনতের মধ্যেও নেই, ওর হল মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার। নিশ্চয়ই ঐখানেই উঁকিঝুঁকি মারছে, গুপ্তধনের যদি সন্ধান পায় তো রাতারাতি মহারাজা—বুঝলে না !'

চোখ টিপে হাসলেন কানহাইয়ালাল।

'আচ্ছা চলি তা হলে। জয় রামজীকি। আবার এতটা পথ যেতে হবে। আজ অবশ্য রাতটা শহরের বাইরেই থাকব আমার এক জামাইএর বাড়ি। তবু দেরি করা ঠিক নয়—যা অরাজক দিনকাল যাচ্ছে। সঙ্গে আবার কাঁচামাল রয়েছে তো।'

তিনি রওনা দিলেন। কিন্তু কালকাপ্রসাদ অনেকক্ষণ নড়তে পারলেন না। যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত অবস্থা তাঁর।

টাকাকড়ি, হীরা-জহরৎ, সোনার বাসন—গুপ্তধন !

উঃ, নানকচাঁদটা কি সাংঘাতিক ধূর্ত ! ঠিক বলেছে কানহাইয়ালাল, বুড়ো শকুনি !

কানহাইয়ালালের কথা যে নির্জলা সত্য সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ মাত্র রইল না। আরও একবার কানহাইয়ালালের বুদ্ধির তারিফ করলেন। এসব কাহিনী তিনিও কিছু কিছু শুনেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে নানাসাহেবের টাকাকড়ি পুঁতে রাখার প্রয়োজন হবে—এমন কল্পনা তো তাঁর মাথাতে আসে নি কখনও। আর ঐ নানকচাঁদ, ঐ ধূর্ত শৃগালটার কথাও তিনি অমন করে ভাবতে পারেন নি তো !

অবশেষে যখন সম্বিৎ ফিরে পেলেন, তখন কালকাপ্রসাদ সেই রাত্রেই একটা এক্কা ডাকিয়ে বিঠুরের দিকে রওনা দিলেন। এক্কাওয়ালারা আবার এখন রাতবিরেতে ওদিকে যেতে চায় না—বিশেষত সিপাহীদের খাস এলাকা এটা—ওখানে পৌঁছে অনেকেই ভাড়া দেয় না। চেঁচামেচি করলে সিপাহীরা সঙ্গীন উঁচিয়ে তেড়ে আসে।...অনেকেই ঘাড় নেড়ে সরে পড়ল, শেষকালে—ঠিক বিঠুর অবধি না গেলেও চলবে, তিনি না হয় কিছু দূরেই নেমে পড়বেন, অবিশ্বাস হয় তো আগাম ভাড়া দিতেও রাজী আছেন—এই রকম অনেক বুঝিয়ে তবে রাজী করালেন একটাকে।

কী দিনকালই পড়ল, সামান্য এক্কাওয়ালারও খোশামোদ করতে হচ্ছে তাঁকে। হাত্তোর কপাল !

নানাসাহেবের হুকুমে কদিনই প্রাসাদের বাইরের দিককার সব আলো সন্ধ্যের পর নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নানকচাঁদ এ তথ্য সংগ্রহ করেছেন বাইরের পাহারাদারদের কাছ থেকে—আর সেই সূত্র ধরেই তিনি কদিন যাবৎ প্রায় সারারাতই বিঠুর প্রাসাদের পেছন দিক্‌কার বাগানে কাটাচ্ছেন। মশার উৎপাতে চাদর মুড়ি দিয়ে থাকতে হয়—সাদা চাদরের রং আবার বহু দূর থেকে অন্ধকারেও দেখা যায়, কালো রংও খুব সুবিধের নয়—পাতলা অন্ধকারে বোঝা যেতে পারে—সেজন্যে তিনি গাঢ় সবুজ রঙের বড় চাদর একটা সংগ্রহ করেছেন। প্রাসাদ থেকে বাগানের দিকে বের হবার যে দরজা—তারই কাছাকাছি ঝোপে গা-ঢাকা দিয়ে বসে থাকেন। আলো নিভোনোর আদেশ কেন ?

নিশ্চয়ই অন্ধকারে কোন কাজ করতে হবে। পাছে একদিন হঠাৎ আলো নিভোতে বললে অপর কোন ভৃত্য বা আত্মীয় সন্দেহ করে, তাই প্রত্যহই আলো নিভোবার হুকুম হয়েছে। শুধু যখন বাইরের জন্যেই এই হুকুম, তখন কাজটা বাইরেই সারা হবে। বাইরে কী এমন গোপন কাজ থাকতে পারে—ধনরত্ন পুঁতে রাখা ছাড়া ?

নানকচাঁদ এক আঁচড়ে লোকের মতলব বুঝতে পারেন—এটা পারা আর এমন শক্ত কি ? তিনি তাই প্রত্যহই সারারাত এখানে কাটাচ্ছেন এবং ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়িরই পেছনের দরজা খুলে ওপরে উঠে সারাদিন বিশ্রাম করছেন। সেই জন্যেই কালুকাপ্রসাদ তাঁর পাত্তা পায় নি—যে বাড়ি দীর্ঘকাল তালাবন্ধ পড়ে আছে, যে বাড়ি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে গেছে—মানুষ সেই বাড়িতেই এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে, এটা কল্পনা করা কালুকাপ্রসাদের সাধ্যের অতীত—বিশেষ যখন বাইরের সদর যেমন বন্ধ তেমনিই আছে। শুধু ভোরে ও সন্ধ্যার পর যাওয়া-আসার সময় দু-একজন পরিচিতের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেছে—তাদের মুখেই কালুকাপ্রসাদ খবর পেয়েছেন যে নানকচাঁদ শহরে আছেন বা আসা-যাওয়া করছেন।

সেদিনও যথারীতি নানকচাঁদ সন্ধ্যার পর আঁধারে গা ঢেকে পেছনের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে নিজের ঘাঁটিতে এসে বসেছেন।

পাঁচিলের একটা জায়গায় তিনি খানিকটা ইঁট খসিয়েছেন যাতায়াতের সুবিধার জন্য। যে সান্ত্রীর কাছ থেকে তিনি মাসিক একটি রজতমুদ্রার বিনিময়ে নিয়মিত প্রাসাদের সংবাদ সংগ্রহ করেন, সেই সান্ত্রীটিকেই আর একটি মুদ্রা কবুল করে এই কাজটি করিয়ে নিয়েছেন—তাঁর নিজের কোন মেহনৎ হয় নি। সে লোকটাও দীর্ঘকাল ধরে দেখছে নানকচাঁদকে—কখন কী মতলবে তিনি কী করেন, কতদিন আগে থেকে কোন্ ঘটনার জন্য কী ভাবে তৈরী হন—তা সে বহু বার বোঝবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। আজকাল আর প্রশ্নও করে না।

কদিনে বাগানের পথঘাট ঝোপঝাড় সব পরিচিত হয়ে গেছে। তাই নিঃশব্দে আনাগোনা করতে কোন অসুবিধে হয় না। দড়ির জুতোও এক জোড়া সংগ্রহ করে নিয়েছেন—খালি পায়েও যেটুকু শব্দ হয় এতে তাও হবে না। সাধারণ লোক হলে তিন-চার রাত এভাবে বৃথা কষ্ট করেই হতাশ হয়ে পড়ত। বিশেষত যখন সবটাই অনুমান মাত্র, ঠিক কিছু জানা যায় নি। কিন্তু নানকচাঁদ সাধারণ লোক নন। তিনি হাল ছাড়েন নি—নিজ বিশ্বাসে দৃঢ় আছেন। এজন্যে কদিন একাহার ধরেছেন। এখান থেকে ফেরবার পথেই 'দহি' সংগ্রহ করি নিয়ে যান। বাড়ি ফিরেই স্নান করে সেই দহি-সহযোগে ছাতু খেয়ে নেন খানিকটা। সন্ধ্যায় আর কিছু আহার করেন না—ভরা পেটে ঘুম পায় বলে।

অবশেষে এত কষ্টের 'কেষ্ট' মিলল।

হঠাৎ মধ্যরাত্রের পর খুট্ করে পেছনের দরজা খুলে গেল।

নিঃশব্দে বাড়ির মধ্য থেকে বের হল দু জন লোক। যতদূর সম্ভব বিনা শব্দেই দরজা খোলা হয়েছিল, কিন্তু তবু যে সামান্য আওয়াজটুকু হয়েছে নানকচাঁদের সদাজাগ্রত কানে সেটুকুও এড়ায় নি—তিনি তৎক্ষণাৎ সতর্ক ও সজাগ হয়ে উঠলেন।

অন্ধকারেই দুটো লোক বের হল। অন্ধকারেই সাবধানে চলল। দুজনেরই খালি পা। সেজন্য এক জনের খুবই কষ্ট হচ্ছে তা বেশ বোঝা যায়।

নানাসাহেব ও কোন বিশ্বস্ত চাকর। তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।

আর একটু ভাল করে চেয়ে দেখলেন—পেছনের লোকটির কাঁধে দুটো বস্তা।

ওরা খানিকটা পথ এগিয়ে গেলে নানকচাঁদ তাঁর ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এলেন। যারা এ বাগানের মালিক তাদের যতটা কষ্ট হচ্ছে, নানকচাঁদের সেটুকুও কষ্ট নেই। তিনি স্বচ্ছন্দে নিঃশব্দ সতর্কতার সঙ্গে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। পাতা ঝরার কাল বহুদিন অতীত হয়ে গিয়েছে তাই রক্ষা, বাগানও নিত্য ঝাঁট দেওয়া হয়—শুকনো পাতায় পা দিয়ে শব্দ তোলবার ভয় নেই।

অগ্রগামী লোক দুটো বহু পথ ঘুরে একেবারে বাগানের শেষ প্রান্তে একটা পরিত্যক্ত অব্যবহৃত কুয়ার সামনে এসে থামল।

বাঃ! নানাসাহেবের বুদ্ধির তারিফ করলেন মনে মনে নানকচাঁদ। মাটি খুঁড়তে গেলেই শব্দ হবে, তাছাড়া খুব গভীর করে মাটি কাটলে তার চিহ্ন ঢাকা শক্ত। আস্তে আস্তে কুয়ার মধ্যে নামিয়ে দিলে বাইরে থেকে কোন চিহ্নই থাকবে না। এ কুয়াটা এককালে মালীদের জন্যে কাটানো হয়েছিল বোধ হয়—এখন ওপাশে একটা বড় কুয়া থেকে বলদ দিয়ে জল ওঠে, তাই কষ্ট করে এখান থেকে আর কেউ জল তোলে না। বহুদিনের অব্যবহারে জলও খারাপ হয়ে গেছে—পাঁকও নিশ্চয় খুব বেশি জমেছে। সহসা কেউ জল তুলতে গেলেও গুপ্তরত্ন বার হয়ে পড়বার ভয় নেই।

কুয়ার কাছে পেঁ'ছে আগের লোকটি কাঁধের ওপর থেকে পাতলা দড়ির মত কী নামাল। গাঢ় অন্ধকার, কিন্তু সেটা চোখে সয়ে গেছে। এখন নক্ষত্রের আলোতেও স্পষ্ট দেখা যায়।

নানকচাঁদ ভরসা করে আর একটু কাছে গেলেন।

হ্যাঁ, দড়িই বটে। সম্ভবত রেশমের দড়ি—মিহি অথচ মজবুত।

নানা—কাছ থেকে দেখে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না—নানা একটা পুঁটলির সঙ্গে একগাছি দড়ি বাঁধলেন, তার পর চাকরটি সেই পুঁটলি ধীরে ধীরে নীচে নামিয়ে দিল—খুব সন্তর্পণে; তবু সামান্য একটা শব্দ উঠল ছলাৎ করে—আর একটু নামাল দড়ি, তার পর দড়িটাও ছেড়ে দিল। আর একবার নানকচাঁদ মনে মনে নানার বুদ্ধির প্রশংসা করলেন। ওপর থেকে ছাড়লে বিষম শব্দ হত, ঐ সামান্য দড়ি এখনই জলে ভিজে মিশে যাবে—একটু পরে কোন চিহ্নও পাওয়া যাবে না।

ঐ ভাবেই আর একটি পুঁটলি জলস্থ হলে চাকরটি একা ফিরে গেল নিঃশব্দে। নানা দাঁড়িয়ে রইলেন—আর তাঁর মাত্র ছ হাত দূরে নানকচাঁদ। নানা মশার তাড়নায় এদিক-ওদিক ফিরছিলেন, একবার সোজা নানকচাঁদের দিকেও তাকালেন—ভয়ে নানকচাঁদের বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল, কিন্তু নানা কিছুই লক্ষ্য করলেন না। সবুজ পাতাবাহারের ঝোপের সঙ্গে গাঢ় সবুজ রঙের চাদরটা মিশে গেছে। এবার নানকচাঁদ তারিফ করলেন নিজেকেই।

অপেক্ষা করার কারণটা বোঝা গেল একটু পরেই।

ভৃত্যটি আরও দুটি পুঁটলি আনতে গিয়েছিল। এসব কাজে বেশী লোককে বিশ্বাস করতে নেই—তা নানা জানেন।

নানকচাঁদ মনে মনে হিসেব করলেন—পুঁটুলিগুলো নিশ্চয় খুব ভারী,

নইলে একসঙ্গেই সবগুলি আসত।

পূর্বের ব্যবস্থানুযায়ীই এ পুঁটুলিগুলিও জলস্থ হল। নানাসাহেব হিসেব করেই দড়ি এনেছিলেন। কাজ শেষ হলে নানা ইঙ্গিতে লোকটিকে আরও কাছে ডাকলেন, তার পর নিজের পিরানের মধ্যে থেকে উপবীতটা বের করে তার হাতে ঠেকিয়ে প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, 'আমি তোর মনিব, রাজা, ব্রাহ্মণ—এই আমার জেনেউ ছুঁয়ে আছিস্, বল্, একথা তোর গলা কেটে ফেললেও কাউকে বলবি না! স্ত্রীকে না, ছেলেকে না, মাকে না—এমন কি আমার কোন আত্মীয়কেও না। বলবি না—নিজেও কোন দিন নেবার চেষ্টা করবি না, বল্—দিব্যি কর্।'

ভৃত্যটি ভীত কম্পিত কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'আমি আপনার জেনেউ ছুঁয়ে ভগবান গণপতির নামে, আপনার নামে দিব্যি গালছি পেশোয়া, একথা স্বয়ং ভগবান এসে জিজ্ঞাসা করলেও বলব না—মানুষ তো ছার!'

নানাসাহেব সন্তুষ্ট হলেন। পৈতেটা আবার জামার মধ্যে ঢুকিয়ে বললেন, 'আমার ঘরে যেখানে এইসব মাল ছিল, সেখানে আর একটা ছোট থলি আছে দেখেছিস তো? এবার চুপি চুপি গিয়ে সেটা নিয়ে চলে যা—ওতে দুশ মোহর আছে। যদি আমি জিতি, আমার রাজগী থাকে তো তোকে জায়গীর দেব—নইলে ঐটেই তোর বকশিশ। আর যদি কোনদিন নিশ্চিত জানিস যে, আমি মরে গেছি, তুই এগুলো নিতে পারিস্।'

ভৃত্যটি হেঁট হয়ে পেশোয়াকে প্রণাম করে প্রস্থান করল। নানাসাহেব আরও কিছুক্ষণ চুপ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্ভবত নিজের ইষ্টদেবতা শিব ও গণপতি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন—এই পৈতৃক ঐশ্বর্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে। তার পর তিনিও প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

এত রাত্রে বিশেষত ও-অঞ্চলে পথে-ঘাটে বার হওয়া নিরাপদ নয়, তাই নানকচাঁদ বাকি রাতটুকু সেই বাগানেই কাটালেন। অবশ্য এবার পাঁচিলের ধারে—অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গাতেই। তার পর উষার আভাসমাত্র দেখা দিতেই—শুধু ভোরাই বাতাসে এবং শুকতারার অবস্থানে সে আভাস পেয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে এলেন।

কিন্তু প্রাসাদের পেছন দিকটা ঘুরে এদিকের পথে এসে পড়তেই এক বিপত্তি। পাশের গভীর শুষ্ক নালায় কে একটা লোক ঘাপটি মেরে বসেছিল। এখন এক লাফে উঠে পড়ে একেবারে তাঁর সামনে পথরোধ করে দাঁড়াল।

চমকে উঠে সভয়ে তিন পা পেছিয়ে এলেন নানকচাঁদ। কী বিপদ, সঙ্গে একটা হাতিয়ার পর্যন্ত নেই! আর থাকলেই বা কী হত, আতঙ্কে তিনি এই মুহূর্তে ইষ্টনামই ভুলে গেলেন তো হাতিয়ার!

কিন্তু যে লোকটা পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল, সে হি হি করে হেসে উঠতেই চিনলেন—কাল্কাপ্রসাদ।

রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে উঠল নানকচাঁদের। কী ভয়টাই না দেখিয়ে দিয়েছিল আহাম্মকটা! তিনি ক্রুদ্ধ অথচ নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'তুমি এখানে কি করছ—এত রাত্রে, বোকার মত? স্বভাব-চরিত্র বিগড়োল নাকি?'

'আরে বাবু নানকচাঁদজী, গুস্সা মৎ করিয়ে। কান্হাইয়ালাল তা হলে ঠিকই বলেছিল—'

এক নিমেষে সজাগ হয়ে উঠলেন নানকচাঁদ, 'কান্‌হাইয়ালাল কি বলেছিল ?'

অন্ধকারেই জিভ কাটালেন মুনশী কাল্‌কাপ্রসাদ। কথাটা বলা আদৌ ঠিক হয় নি। বললেন, 'না, কান্‌হাইয়ালাল বলেছিল যে, এই শহরেই তুমি আছ।'

'ও, বলেছিল নাকি ? সে শহরে ফিরেছে ?'

'না, আসা-যাওয়া করছে।'

দুজনেই হাঁটুতে শুরু করলেন।

'হ্যাঁ, কী বলছিলে উকিলসাহেব, স্বভাব-চরিত্র বিগড়োল নাকি ? সে কথা তো তোমাকেও জিজ্ঞাসা করা যায়।...তুমিই বা এত রাত্রে এখানে কী করছিলে ? পাঁচিল ডিঙিয়ে নানার পেয়ারের আদলা বেগমের ঘরে গিছলে নাকি ?'

কথাটা ক্রমশই বিপজ্জনক এলাকায় গিয়ে পড়ছে। নানকচাঁদ সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বললেন, 'ওসব বাজে কথা থাক। তার পর, তুমি কী মনে করে এখানে বসেছিলে বল দিকি ?'

'তোমাকে খুঁজে হয়রান হয়ে যাচ্ছি কদিন। ওধারে তো সবই খোঁজা হয়েছে, ভাবলুম আজ একবার বিঠুরটা দেখে যাই। তাই এ ধারে—'

'তা আমার খোঁজে—সারা রাত—' সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন নানকচাঁদ। সেটা কাল্‌কাপ্রসাদও টের পান। তাড়াতাড়ি বলেন, 'না, মানে আসতেই রাত হয়ে গেল। এদিক-ওদিক খুঁজতে আরও রাত হয়ে পড়ল। ভাবলাম যে এখন পথে-ঘাটে একা চলা ঠিক নয়, তাই লুকিয়ে বসেছিলাম। তা মহাবীর ভগবান সদয় আছেন—এই পথেই তোমাকে আনিয়ে দিলেন।'...এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে ভালমানুষের মত পুনশ্চ বললেন, 'তা বিঠুরে কী করতে এলে নানকচাঁদজী—নানাসাহেবের সঙ্গে কোন কাজ-কারবার চলছে নাকি ? টাকা-পয়সা বেশ আমদানি হচ্ছে তা হলে ? তুমি তো পয়সা ছাড়া চল না এক পা-ও !'

'দূর মূর্খ, নানাসাহেবের সঙ্গে কাজ-কারবার চললে আর প্রাসাদের পেছনে আসব কেন ? এক আংরেজ সাহেবের সঙ্গে কাজ ছিল।' গম্ভীরভাবে বললেন নানকচাঁদ।

'আংরেজ !' সামনে সাপ দেখলে মানুষ যেমন লাফিয়ে ওঠে, তেমনিই লাফিয়ে উঠলেন কাল্‌কাপ্রসাদ।

'হ্যাঁ, বাবুজী, হ্যাঁ, আংরেজ। এসে পড়ল বলে। ওরা একেবারে চুপিচুপি এসে নানাসাহেবকে ধরতে চায়—লড়াইএর আগে। তাই পেছনদিকের পথ-ঘাট দেখতে এসেছিল। আমি দেখিয়ে দিলাম।'

'ও, তা সে সায়েব কোথায় ?'

'সে নদীর দিকে চলে গেল। ঐ পথেই এসেছে তো।'

'জয় বজরঙ্গবালী ! আংরেজই তা হলে জিতবে—কী বল উকিলসাহেব ?'

'তাতে সন্দেহ আছে নাকি ?'

'তা হলে আমি বেঁচে গেলাম। চাই কি, কপালও ফিরতে পারে।' কাল্‌কাপ্রসাদ সংক্ষেপে চার জন ইংরেজ বাঁচানোর ইতিহাস বিবৃত করলেন। যে সংশয়টা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল, যে কারণে তিনি এমন হন্যে হয়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন—তাও বললেন। শুধু বললেন না কান্‌হাইয়ালের সঙ্গে নিজের কথোপকথনটা। এখন থেকে বলে সতর্ক করে দেওয়াটাই কিছু নয়। ওদিকে কাল্‌কাপ্রসাদও নিজের মত করে একটু খোঁজখবর নিতে পারবেন বরং অবসরমত।

সব শুনে নানকচাঁদ 'ফুঃ' করে কথাটা উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'আংরেজদের জয় অনিবার্য, মুনশী, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।' এই বলে তিনি একটু কাব্যেরও আশ্রয় নিলেন। পূর্ব-দিগন্তের রক্তিমাভার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'রাতের পরে দিন আসে। ওদের রাত ওই আষাঢ়েরই রাত—কেটে গেছে। ওদের বরাতেই ঐ ভোর হচ্ছে। এখন মাসখানেক গিয়ে নিজের দেহাতে বসে থাক। কাল-পরশুই এখানে গণ্ডগোল লাগবে। আমিও চললুম, আজই আবার বদরুকা চলে যাব। আর টাকার কথা?—কালুকাপ্রসাদ, বড় সাদা খাতা যোগাড় করতে পার কয়েকটা? শহরে তো সব দোকান বন্ধ—পাওয়া যাচ্ছে না।' থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন নানকচাঁদ।

'সাদা খাতা!' কালুকাপ্রসাদও স্তম্ভিত।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাতা। আমি এখন বসে শুধু খাতা লিখব। ঐ খাতাতেই পয়সা। যদি বাঁচতে চাও, খাতা এনে দাও।'

'খাতা?' তবুও মূঢ়ের মত প্রশ্ন করেন কালুকাপ্রসাদ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পারছ না সাদা কথাটা?' অসহিষ্ণুভাবে নানকচাঁদ জবাব দেন, 'আমি যে কিতাব লিখছি। আরও লিখব, ঢের লিখব, যারা বাঁচতে চাইবে, তারা আমার ঐ রোজনামচায় নামটা ওঠাবার জন্যে রাশি রাশি টাকা ঢেলে দিয়ে যাবে আমার কাছে। ঐতেই লাখ টাকা কামাব।'

'কিভাবে লাখ লাখ টাকা কামাবে! কী কিতাব উকিলসাহেব? রামায়ণের মত বড় কোন পুঁথি নাকি?' কণ্ঠে একটু বিদ্রূপের আভাসও দেখা দেয় কালুকাপ্রসাদের।

'না ভাই, সামান্য এই নানকচাঁদ বাবুসাহেবের জীবনী, রোজকার জীবনী—যাকে রোজনামচা বলে।'

নানকচাঁদ আর অপেক্ষা করলেন না। পাড়া জাগতে শুরু করেছে। সহসা একটা চলতি এক্কায় লাফিয়ে চড়ে বসে মুখটা বাড়িয়ে বললেন, 'আচ্ছা আপাতত চলি ভাই কালুকাপ্রসাদ, রাম রাম।'

সত্যিই লোকটার তল পাওয়া যায় না। কখন যে কী তালে থাকে—কী যে বলে। দূর হোক, মরুক গে ছাই, ওর ও হেঁয়ালি বোঝা তার কর্ম নয়।

কালুকাপ্রসাদ হাল ছেড়ে দেন।

তাঁরও একটা এক্কা প্রয়োজন। এখনই শহর ছাড়তে হবে।

॥ ৬৩ ॥

আমিনা অন্তর্হিত হবার পরও বহুক্ষণ হীরালাল সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। পিছনের অভিশপ্ত বাড়িটা থেকে তখনও যেন দু-একটা অস্ফুট গোঙানি ভেসে আসছে, হয়তো এখনও গিয়ে পড়লে কাউকে কাউকে বাঁচানো যায়, অন্তত অন্তিমমুহূর্তে দু-এক জন মুমূর্ষুকে একটুকু স্বাচ্ছন্দ্য, একটু আশ্বাস দেওয়া যায়—কিন্তু হীরালাল সে চেষ্টাও করতে পারলে না। 'বিবিঘরের হত্যাকাণ্ড শেষ হয়েছে' এই খবর বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে—এরই মধ্যে এক জন দু জন করে কৌতূহলী দর্শক ভরসা বা সাহস সঞ্চয় করে এসে জমতে শুরু করেছে আশেপাশে—যদি কিছু করার থাকে ওরাই করবে। হীরালালের এত মনের বল নেই।

অনেকক্ষণ পরে একটা কথা ওর তখনকার সেই অর্ধ-বিকারাচ্ছন্ন মাথাতেও ঢুকল, উপস্থিত কৌতূহলী জনতার ঔৎসুক্য ওর সম্বন্ধেও কম নয়। তারা ওকেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে যেন বেশি করে। অর্থাৎ ওর সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কটা অনুমান করতে চায়।

চিন্তা বা ধারণাশক্তি যতই আচ্ছন্ন হোক—এই ধরনের কৌতূহলের পিছনে যে জবাবদিহি, এমন কি টানাটানি থাকে সাধারণত, সে কথাটাও ওর মাথায় যেতে দেরি হল না। সে একরকম জোর করেই অর্ধ-অবশ দেহটাকে টেনে নিয়ে সেখান থেকে সরে এল।

কিন্তু কোথায় যাবে, কোথায় গেলে একটু নির্জনতা, একটু শান্তি, সত্যকার একটু বিশ্রাম পাবে তা সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না। সকালে যে দোকানে আশ্রয় নিয়েছিল—সেখানে ফিরে গেলেই এই ঘটনার আলোচনা শুরু করবে দোকানী, সে কথা মনে হতেই একটা চরম বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে গেল। এখন এই প্রসঙ্গ আর একটুও সহ্য হবে না ওর। অথচ আজ এ শহরে কারও মুখে কি অন্য কোনও প্রসঙ্গ আছে!

অগত্যা অনেকক্ষণ পর্যন্ত পথে পথেই ঘুরে বেড়াল হীরালাল। আষাঢ়ে আকাশ, কিন্তু এতটুকু মেঘের চিহ্ন নেই কোথাও। অথচ বর্ষার গুমোটটা আছে ষোল আনা। এখানে এই প্রথম গ্রীষ্মকালের অভিজ্ঞতা হীরালালের—পশ্চিমের যে ভয়াবহ গরমের কথা সে ছেলেবেলা থেকে শুনেছিল সে গরম ওর এতদিন অসহ্য লাগে নি, তার কারণ এতদিন ঘাম হত না। উত্তপ্ত বাতাসে মুখ-চোখ ঝলসে যেত, কিন্তু ঘামের কষ্টটা টের পায় নি। এই কদিন শুরু হয়েছে সেটাও। তাপ কমে নি—বাতাস কমেছে। ফলে অবস্থা হয়েছে আরও শোচনীয়। ঘামে ওর পিরানটা গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে, তার ওপর রৌদ্রের তাপে যেন ও সিদ্ধ হচ্ছে ভেতরে ভেতরে। পিপাসায় বুক অবধি শুকিয়ে উঠেছে, ধুলো তেতে হাঁটু পর্যন্ত পা দুটো ঝলসে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত, অভিভূতের মত পথে পথে ঘোরবার পর একসময় নিজের এই অবস্থাটা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল হীরালাল। শরীরটা বহুক্ষণই ভারী পাথর হয়ে উঠেছিল—সে ভার পা দুটো আর বইতে পারছিল না। একটু একটু করে সচেতনতাটা ফিরে আসবার পর আর একেবারেই নড়বার অবস্থা রইল না। মনে হল আরও একবার হয়তো এখনই পথের ওপর বসে পড়তে হবে।

ঠিক সেই সময়েই চোখে পড়ল—সামনেই গঙ্গা। অন্যমনস্ক ভাবে ভূতগ্রস্তের মত পথ চললেও প্রকৃতি বুঝি নিজের কাজ ঠিক করে গেছেন—তৃষ্ণার্তকে জলের কাছেই টেনে এনেছেন।

সর্বসন্তাপহারিণী, সর্বদুঃখবিনাশিনী গঙ্গা।

হীরালালের আর জ্ঞান রইল না। সে কোন দিকে চাইল না, অগ্রপশ্চাৎ কিছু ভেবেও দেখল না। যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই—জামা-কাপড়-সুদ্ধ জলে গিয়ে নামল।

আঃ—! সব তাপ জুড়িয়ে গেল বুঝি। সব জ্বালা। শুধু দেহের নয়—মনেরও।

শীতল, মধুর জল। পশুর মত মুখ দিয়েই আকণ্ঠ পান করলে হীরালাল, বার বার ডুব দিলে। তার পর গলা অবধি ডুবিয়ে অনেকক্ষণ পড়ে

রইল জলে।...

আর কিছু চায় না সে। আর কিছু ভাববেও না। এই ভাল। এই ভাবেই যদি সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে তো আরও ভাল। এমনি আরাম, এমনি বিস্মৃতি-ভরা শীতল শান্তিতে।...

কিন্তু আষাঢ়ের বেলাও ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসে। গঙ্গার জলে, ওপারের বনরেখায় সন্ধ্যা নামে। হঠাৎ একসময় হীরালালের মনে হল ওর শীত করছে। বুকের মধ্যে গুর গুর করে উঠছে কাঁপুনি। সে তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে পড়ল।

এতক্ষণে তার খেয়াল হল যে, এই প্রচণ্ড রৌদ্র থেকে এসেই ঘর্মাক্ত দেহে ঠাণ্ডা জলে নামা তার ঠিক হয় নি। এরই মধ্যে সর্দি হয়ে উঠেছে—প্রবল সর্দি। অথচ এখনও—জল থেকে উঠেও—ভিজে জামা-কাপড় ছাড়ার কোন উপায় হল না। কিছুই সে খুলে রাখে নি পাড়ে, নামবার সময় অত বিবেচনা করার অবস্থাও ছিল না। যদি উড়নিটাও অন্তত খুলে রেখে নামত তো এখন সেটা পরা চলত।

কিন্তু তা যখন রাখেই নি—তখন নিজের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর করবার কিছু নেই। জামা-কাপড় যতটা সম্ভব নিংড়ে নিয়ে আবার সেইগুলোই পরে—জুতো জোড়াটা হাতে ঝুলিয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বাসার পথ ধরল হীরালাল—এবং সেই অবস্থাতেই বিস্তর ঘুরে বিস্তর খুঁজে যখন শেষ পর্যন্ত সেই দোকানটায় এসে পেঁছিল তখন তার সত্যিই আর দাঁড়াবার বা কথা কইবার শক্তি রইল না। প্রবল জ্বরে তখনই সে অভিভূত হয়ে পড়েছে। কোনমতে টলতে টলতে দোকানের পাশে অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটায় ঢুকে সেই আধ-শুকনো কাপড়-জামাসুদ্ধই খাটিয়াতে ঢলে পড়ল। এতক্ষণে তার পূর্ণ শান্তি অর্থাৎ পূর্ণ বিস্মৃতি মিলেছে।

দোকানী পড়ল মহা আতান্তরে। লোকটা সম্পূর্ণ অপরিচিত, বিদেশী। কোথায় কে আছে ওর তাও জানা যায় নি। নিষ্ফল জেনেও সে হীরালালকেই বার বার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করেছে—কিন্তু ওর তখন পূর্ণ বিকার। উত্তর দেবে কে? সঙ্গে এমন কোন কাগজপত্র নেই যাতে পরিচয় মেলে। টাকা-পয়সার অবস্থাও তথৈবচ। এ কী ঝঞ্চাটে তাকে ফেললেন মহাবীরজী!

এধারে শহরে তখন ঘোর অরাজক অবস্থা চলছে। ইংরেজরা এসে পেঁছেছে। নানাসাহেব যুদ্ধের একটা ক্ষীণ চেষ্টা করেছিলেন ভাইকে পাঠিয়ে—সে ভাই পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছে। নানাসাহেব, কানপুর তো বটেই, বিঠুরও ছেড়ে চলে গিয়েছেন কাল্‌পীর দিকে। ইংরেজরা এখন কানপুরের পূর্ণ মালিক। মাত্র কদিন আগে যাদের কুকুরের মত গুলি করে মারা হয়েছে, যাদের মেয়েরা এই দু দিন আগেই কসাইয়ের হাতে খাসীর মত কচুকাটা হয়েছে—তাদের জ্ঞাতি, স্বদেশবাসী এরা—এই বিজয়ীরা।

সুতরাং সেদিনের সেই বিশ্বাসঘাতকতা, অকারণ নিষ্ঠুরতার পূর্ণ শোধ উঠবে—এইটাই স্বাভাবিক। সে শোধও উঠছে তেমনিই, যেমন ঋণ তার তেমনি ওয়াসিল। শোধ হচ্ছে সুদসুদ্ধ, হয়তো চক্রবৃদ্ধি-সুদসুদ্ধ—কিন্তু তাতেই বা বলবার কী আছে? দেনা করলেই সুদ দিতে হয়।

ইংরেজরা যে-কোন এদেশী লোককে হাতের সামনে পাচ্ছে, বলতে গেলে

তাকেই ফাঁসির কাঠে চড়াচ্ছে। কিন্তু শুধুই ফাঁসি নয়—তার আগেও লাঞ্ছনা বড় কম হচ্ছে না। যে না প্রমাণ করতে পারছে যে, সে ইংরেজের শত্রু নয়, কোন রকমে তাদের বিরুদ্ধাচারণ করে নি—তারই এই পরিণাম ঘটছে। আর সাধারণ লোক প্রমাণ-প্রয়োগের কথা জানেও না। তারা ওসব গরজ করে রাখতেই বা যাবে কেন? সুতরাং তারাই এইভাবে মরতে লাগল দলে দলে। যারা হুঁশিয়ার, যারা ইংরেজের বাংলো লুট করে দু পয়সা করেছে—তারাই এখন সাড়ম্বরে ইংরেজ-ভক্তি প্রচার করতে লেগে গেছে—উঠে পড়ে, আর তাদের প্রমাণেরও অভাব হচ্ছে না।

এই হালচালের মধ্যে বেচারী দোকানদারের অবস্থাটা হয়ে উঠেছে অবর্ণনীয়। তার দিনের আহার রাত্রের নিদ্রা দুই-ই চলে গেছে। ব্যবসা তো গোল্লায় গেছেই—তা যাক্—এখন সে কোনমতে দেহাত-টেহাত পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে—কিন্তু সে উপায়ও যে বন্ধ হতে বসল। এই অজ্ঞান, অচৈতন্য মুমূর্ষু লোকটাকে ফেলে সে যায় কেমন করে? বিশেষ করে লোকটা ব্রাহ্মণ—জাতের পরিচয় আগেই দিয়েছিল, তা ছাড়া জেনেউ দেখেও মালুম হচ্ছে। ব্রাহ্মণ-সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে ফেলে যেতেও ঠিক মনটা সরছে না।

মরীয়া হয়ে সে ঐ গোলমালের মধ্যেই শহরে কে কোথায় 'বাঙ্গালী' আছে খোঁজ করতে লেগে গেল। খবর পাওয়াও গেল শেষ পর্যন্ত। অধিকাংশ বাঙালী—যারাই সুযোগ পেয়েছে কোন রকম—শহর ছেড়ে পালিয়েছে। যারা পালাতে পারে নি তারা দু-তিনটে জায়গায় জড়ো হয়ে অহরহ মৃত্যুভয়ের মধ্যে কোনমতে দিন কাটাচ্ছে। মৃত্যুভয় এই জন্যে যে—বাঙালীমাত্রেই সাহেবের পা-চাটা এবং গোপনে গোপনে তাদের সাহায্যকারী—সিপাহীদের এই বিশ্বাস। তারা এতদিন ঘোর সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে, হুমকিও বড় কম দেয় নি। কড়া নজর রেখেছে ওদের ওপর। অথচ যা দু-এক জন সাহেব কোনমতে সিপাহীদের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে—ছুটে এসেছে বাঙালীদের কাছেই একটু সাহায্য বা আশ্রয়ের জন্য। কখনও কখনও সেটুকুও দেওয়া যায় নি—তবে চেষ্টা করেছে অধিকাংশ সময়ই। তারা জানত যে, সাহেবরাই জিতবে শেষ অবধি—এবং তা না জিতলে বাঙ্গালীদের মঙ্গল নেই। কিন্তু আপাতত শমন শিয়রে যে! যদি এতটুকু এই আনুকূল্যের সংবাদ প্রকাশ পায় তো কারুর শির থাকবে না।

অবশ্য সিপাহীদের ভয় আপাতত কমেছে বটে কিন্তু এখনও চূড়ান্ত মীমাংসার অনেক দেরি। তা ছাড়া সাহেবরাও যে সবাই বাঙালীকে পূর্ণ বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখেন তা-ও নয়। বিশেষত ছেলে-ছোকরাদের সম্বন্ধে খুব যেন নিশ্চিত হতে পারেন না। কতকটা সেই জন্যেই—দোকানী প্রথম যে বাসায় এসে খবর দিলে যে, এক অপরিচিত বাঙালী ছোকরা বাবু জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে তার দোকানে—এবং 'খুন' 'রক্ত' এই সব কী বকছে—তখন সে বাসার কেউ ও উড়ো আপদ ঘাড়ে নিতে রাজী হলেন না। ব্যাপার-গতিক দেখে দ্বিতীয় বাসাতে গিয়ে অনুমতি নেবারও চেষ্টা করলে না দোকানী—দূর থেকে বাসাটা দেখে এসে অতিকষ্টে একটা ডুলি যোগাড় করে হীরালালকে তুলে এনে একেবারে দোরের কাছে নামিয়ে দিলে।

এঁরা আর এড়াতে পারলেন না। একে বাঙালী (চেহারা দেখেও তাই মনে হচ্ছিল, আর বিকারের ঘোরে যা বকছিল তা বাংলা ভাষাই), তার ব্রাহ্মণ—

এই দুর্যোগের দিনে কোথায়ই বা ফেলেন? আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়েও 'আপদ'কে আশ্রয় দিতে হল এবং শহরের অবস্থা একটু সহজ হতে বৈদ্য ডাকতে হল। আশঙ্কা এবার ইংরাজের কাছ থেকে—কথায় কথায় তারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে—তার পর এ ছোকরা যা বকছে তা আরও সাংঘাতিক; 'বিবিঘর', 'সর্দার খাঁ', 'খুন' 'রক্ত', 'তলোয়ার',—এই সব। সাহেবের কানে গেলে তো রক্ষা নেই-ই, পথে-ঘাটে অসংখ্য গোয়েন্দা, তাদের কানে গেলেই যথেষ্ট।

বৈদ্য এসে অবস্থা দেখে মুখ বিকৃত করলেও হীরালাল শেষ পর্যন্ত সেরেই উঠল। হয়তো তার স্বাস্থ্য অসাধারণ ভাল ছিল বলেই, কিংবা অল্প বয়সে রোগের সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা বেশি থাকে বলে—বৈদ্যরাজের 'সান্নিপাতিক বিকার'ও তাকে পেড়ে ফেলতে পারল না।

কিন্তু সে সেরে উঠে বসতে বসতে বহু দিন কেটে গেল। বহু ঘটনাই ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। ধারণা ও চিন্তাশক্তি যেমন একটু একটু করে ফিরে আসতে লাগল—একটু একটু করেই শুনলে সব খবর।

হীরালাল যেদিন জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে—তার পরের দিনই বিজয়ী ইংরেজ দল কানপুরে প্রবেশ করেছে। তখনও নানাসাহেব বিঠুরে ছিলেন—পরের দিন রাত্রে তিনি বিঠুর ত্যাগ করে গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে পালিয়ে গেছেন। ঠিক সময়ই গিয়েছিলেন, কেননা সেই রাত্রিশেষেই ইংরেজরা বিঠুর প্রাসাদ দখল করেছে ও ধ্বংস করেছে। ইংরেজদের এ-দলের প্রধান সেনাপতি হ্যাভলক কানপুরে বেশী দিন থাকেন নি, আট-ন দিন পরেই লক্ষ্ণৌএর দিকে রওনা হয়ে গেছেন—রেখে গেছেন নীলকে। নীল তার অভ্যাস ও স্বভাব মত পৈশাচিকতার তাণ্ডব শুরু করেছে।

কানপুর পর্যন্ত হ্যাভলকের গতি অব্যাহত থাকলেও, তার পরে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। কানপুরে পৌঁছবার আগে বার-দুই নানার প্রেরিত বাহিনী তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল—পারে নি। কিন্তু লক্ষ্ণৌএর পথে বশিরৎগঞ্জ পার হতে গিয়ে হ্যাভলককেই পিছিয়ে আসতে হয়েছে—দু-দু বার।

এর পর এসেছেন সেনাপতি আউটরাম। ওঁকে পারস্য থেকে আনানো হয়েছে। আগে ঠিক হয়েছিল আউটরাম বিহারেই থাকবেন—কারণ আরা ও দানাপুরে আগুন জ্বলেছে ভাল ভাবেই। কিন্তু কানপুর সম্বন্ধে অস্বস্তিকর সংবাদ পৌঁছতে তাঁকে সোজা কানপুরেই চলে আসতে হল। এর মধ্যে কানপুর গ্যারিসনের অবস্থা সত্যিই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। দু বার যুদ্ধ এবং মড়কে হ্যাভলকের দলে বিস্তর লোক মারা গেছে, দলে যোদ্ধার সংখ্যা মাত্র শ-সাতেকে এসে ঠেকেছে। অথচ চারিদিকেই প্রবল শত্রু। গোয়ালিয়রে নাকি বিরাট একটি দল প্রস্তুত হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে তারা কানপুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে হয়তো। নানাসাহেবও অদূরেই বসে আছেন—ফতেপুর চৌরাশীতে ঘাঁটি করে ঐ দলের অপেক্ষা করছেন, ওদের অগ্রগমনের সংবাদ পেলেই তিনিও এগিয়ে আসবেন। গোয়ালিয়র দল এতদিন এসেই পড়ত—শুধু নাকি সিন্ধিয়ার কৌশলেই তারা এখনও চুপ করে বসে আছে, এখনও ইতস্তত করছে। তার জন্য নাকি সিন্ধিয়া ইংরেজের কাছে ঘুষ খাচ্ছেনও প্রচুর।

ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌতেও নাকি অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে। লরেন্স মারা গেছেন—সে খবরটা অবশ্য হীরালাল আগেই পেয়েছিল পথে আসতে আসতে;

ইংরেজরা বেগতিক দেখে মচ্ছিভবন থেকে ঘাঁটি সরিয়ে এনেছে, সবাই এসে আশ্রয় নিয়েছে রেসিডেন্সিতেই। আসবার আগে মচ্ছিভবনের প্রাসাদ তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে এসেছিল খানিকটা—কিন্তু তাতে সিপাহীদের ভয় দেখানো যায় নি ; বরং অবরোধ তীব্রতর হয়েছে। মৌলবীসাহেব ও অযোধ্যার বেগম হজরৎমহল সিপাহীদের নেতৃত্ব নিয়েছেন—বহু সিপাহী এসে জড়ো হয়েছে, সিপাহী ছাড়াও বহু লোক এসেছে—তালুকদাররা অনেকেই এসেছেন লোকলস্কর নিয়ে বেগম-সাহেবার আহ্বানে। অবরোধের মধ্যে ইংরেজের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে, প্রতিদিন বহুলোক মারা যাচ্ছে—শত্রুপক্ষের গুলিতে, রোগে, খাদ্যাভাবে। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, ঔষধ নেই। স্নান, কাপড়-কাচা—এসব কল্পনাতীত বিলাস হয়ে উঠেছে।

তবুও ওরা কোনমতে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। অঙ্গদ তেওয়ারী নামে এক গুপ্তচর অসাধ্যসাধন করছে, ঐ নীরন্ধ্র অবরোধের মধ্য দিয়েও খবর আদানপ্রদানের কাজ অব্যাহত রেখে যাচ্ছে। তাইতেই এইসব শোচনীয় সংবাদ কানপুরে এসে পেঁছেছে এবং আউটরামও পেছনে গোয়ালিয়র বাহিনীর উদ্যত বজ্র উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছেন লক্ষ্ণৌএর দিকে।

কিন্তু লক্ষ্ণৌএর দুঃখ তাতে ঘোচে নি! হ্যাভলক ও আউটরাম লক্ষ্ণৌএ অবরোধ ভেদ করে রেসিডেন্সিতে ঢুকেছেন বটে, বেরিয়ে আসতে পারেন নি—অবরোধও বন্ধ হয় নি। তাঁরা সুদ্ধ আটকা পড়েছেন সেখানে। ফলে সেখানকার সেই সামান্য খাদ্যেই ভাগ বসাবার লোক বেড়েছে শুধু, আর কোন উপকার হয় নি। সব মিলিয়েও সমর্থ লোকের সংখ্যা এমন দাঁড়ায় নি যে শত্রুব্যূহ কেটে বেরিয়ে আসা যায়।

অভিভূতের মত হীরালাল শুনল এইসব কাহিনী। সে এতদিন রোগে পড়ে ছিল! এত ঘটনা ঘটে গেছে এখানে—আর সে কিছুই টের পায় নি!

এ যেন একেবারেই অবিশ্বাস্য, গল্পকথা।

কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কা শেষ হতেই দেখা দিল সমস্যা।

ভবিষ্যৎ এসে দাঁড়াল সামনে।

এখন কী করবে? যাদের আশ্রয়ে আছে—তাঁদের অবস্থাও কম শোচনীয় নয়, তাঁদের গলগ্রহ হয়ে আর এক দণ্ডও থাকা উচিত হবে না। অথচ করবেই বা কী? শরীর দুর্বল ; তা ছাড়া ওর প্রাক্তন মনিবদেরও তো কোন খোঁজ-খবর নেই। দেশে ফিরে যাবে? তাই বা কেমন করে ফিরবে—এখনও তো পথঘাট কিছুমাত্র নিরাপদ হয় নি। টাকাই বা কই?

অবশেষে ঐ বাসারই এক প্রবীণ ভদ্রলোক সুপরামর্শ দিলেন। ইংরেজরা এখানে এসে বসলেও ওদের ভিতটা এখনও পাকা হয় নি।—আবারও উৎখাতের ভয় আছে—সেইজন্যে বাঙালীরা এখনও প্রকাশ্যে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা করতে সাহস করে নি, তবে গোপনে পূর্ণ সহযোগিতাই করছে, কেউ কেউ যতটা সম্ভব ওদের কাজও করে দিচ্ছে। রামগোপাল চক্রবর্তী এই দলেরই লোক—তিনি এই সব গোলমালের আগে ছিলেন এক কাপড়ওয়ালা সাহেবের কেরানী, খাতাপত্রে পাকা। তিনিই এখন ইংরেজ গ্যারিসনের হিসাবপত্রের কাজে সাহায্য করছেন। রামগোপালবাবু ওকে বললেন, 'তুমি এখানকার অফিসারের সঙ্গে দেখা কর। সব কথা খুলে বল, এখানেই চাকরি পেয়ে যাবে।'

'এ'রা বিশ্বাস করবেন আমার কথা ?'

'অবিশ্বাস করবার কী আছে ? তুমি আমাদের এখানে এই আড়াই মাস রোগে পড়ে আছ এটা তো মিছে কথা নয়, আমরা সবাই জানি। আমরাই সাক্ষী দিতে পারব। আর তুমি কমিসারিয়েটে কাজ করতে কিনা—সেটা তো তোমাকে জেরা করলেই তাঁরা টের পাবেন। চল বরং আমিই তোমাকে নিয়ে যাই একদিন।'

রোগ ওষুধে সারে—শরীর সারাবার জন্য দরকার হয় রসায়ন। রামগোপালবাবুর এই আশ্বাসটুকু রসায়নের কাজ করল। হীরালাল এই ভরসা পাওয়ার তিন-চার দিনের মধ্যেই যেন বেশ খানিকটা সবল ও সুস্থ হয়ে উঠল। সে অবশ্য সেই দিন থেকেই নিত্য তাগাদা শুরু করেছিল—কিন্তু রাম-গোপালবাবু আরও কয়েকদিন সময় নিলেন—সাংঘাতিক রোগে রক্তশূন্য ও দুর্বল করে দিয়েছে, এই অবস্থায় বেশী পরিশ্রম করলে আবার পড়তে পারে—বৈদ্য বার বার সাবধান করে দিয়েছেন।

অবশ্য বেশীদিন অপেক্ষা করা গেল না। হীরালাল এই নিষ্ক্রিয়তা ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ছটফট করতে লাগল—আর একদিনও এমন করে পরের অন্ন খেয়ে বেঁচে থাকতে চায় না সে। ওর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়েই রামগোপালবাবুকে শীগগির একটা ভাল দিন দেখে ওকে সঙ্গে করে মেজর সাহেবের কাছে নিয়ে যেতে হল।

মেজর সাহেব ওর সব কথা শুনলেন। জেরা করলেন বিস্তর। লক্ষ্ণৌ ছেড়ে আসার অজুহাতটা তাঁর খুব পছন্দ হল না। হীরালাল অবশ্য সত্য কথাই বলেছিল—কিন্তু তাতে ওঁদের খুশী হবার কথা নয়। যাই হোক, সব শুনে বললেন, 'সার কলিন ক্যাম্পবেল আর তাঁর হাইল্যাণ্ডাররা আসছে লক্ষ্ণৌ জয় করতে। তাঁদের কমিসারিয়েটে অভিজ্ঞ লোক দরকার। আরও দরকার লক্ষ্ণৌএর পথঘাট চেনে, রেসিডেন্সির ম্যাপটা বোঝে এমন লোক। আমাদের এখানে এখন কেরানীর প্রয়োজন নেই—সে লোক ঢের আছে। আমাদের এখন যোদ্ধার দরকার।...তুমি এক কাজ কর—যদি সত্যি-সত্যিই আমাদের সার্ভ করতে চাও তো আজই রওনা হয়ে যাও ফতেপুরের দিকে। সম্ভবত তুমি সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে সার কলিনের দল সেখানে এসে যাবে। তাঁদের কাছে গিয়ে রিপোর্ট কর গে। ফতেপুর পর্যন্ত পথ পরিষ্কারই আছে এখনও—যেতে কোন অসুবিধা হবে না। চাও তো একটা চিঠি লিখে দিতে পারি—এখান থেকে একটা ঘোড়াও দিতে পারি।'

অগত্যা। হীরালাল মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

আবার অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাত্রা।

কিন্তু উপায়ই বা কি ? সাহেবের মুখ দেখে বোঝা গেল যে, এর বেশি কোন সুবিধাই সেখানে হবে না।

সাহেব আর এক বার শুধু প্রশ্ন করলেন, 'ঘোড়ায় চড়তে জান তো ?'

মাথা হেলিয়ে হীরালাল উত্তর দিল, জানে সে।

'তা হলে কাল ভোরে তৈরী হয়ে এস—ঘোড়া ও চিঠি প্রস্তুত থাকবে।'

৯৩নং গর্ডন হাইল্যাণ্ডারদের দলে এসে যে ছেলেটির সঙ্গে হীরালালের সব চেয়ে ভাব হল সে হচ্ছে কর্পোরাল. উইলিয়াম মিচেল। ঠিক এক-বয়সী নয় ওরা— বিলি মিচেলের বয়স বোধ হয় চব্বিশ-পঁচিশ হবে। ওর চেয়ে কম বয়সের ছেলে আরও ঢের আছে, কেউ কেউ এমন কি হীরালালের চেয়েও এক-আধ বছরের ছোট হবে হয়তো—তবু মিচেলের সঙ্গেই যে ওর ভাব হয়ে গেল, তার কারণ বোধহয় মিচেলের সহানুভূতিপ্রবণ এবং উৎসুক মনটি। এ দেশ সম্বন্ধে, দেশবাসী সম্বন্ধে জানবার ও বোঝবার আগ্রহ ওর অসাধারণ। আর সম্ভবত বোঝে ও বুঝতে চায় বলেই একটি সহানুভূতির ভাবও প্রকাশ পায় ওর প্রত্যেকটি আচরণেই। এখন শ্বেতাঙ্গ মাত্রেই 'কালা আদমী'দের সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট —সে প্রকট বিদ্বেষ যখন-তখন বীভৎস প্রতিহিংসার আকারে প্রকাশ পায়— এমন কি সে বিদ্বেষ থেকে বাঙালীরাও সম্পূর্ণ অব্যাহতি পায় না—যখন-তখন সেই প্রচ্ছন্ন রোষবহ্নি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে। এ হাইল্যাণ্ডাররা এদেশে নবাগত হলেও জনশ্রুতিতে স্বদেশীয়দের উপর অত্যাচারের কাহিনী বেশ একটু পল্লবিত হয়েই কানে পেঁছেছে তাদের—সেজন্য তাদেরও জিঘাংসা ও প্রতিহিংসাবোধ কম নয়। হীরালাল তাদের কাছাকাছি থাকতে থাকতে প্রত্যহই সেই আচ্ছাদিত রোষবহ্নির তাপটা অনুভব করত। বন্ধুত্ব যে শ্রেণীর ভাব দেওয়া-নেওয়ার ওপর নির্ভর করে সে শ্রেণীর মানসিক আদানপ্রদান তাই সম্ভব হত না ওদের সঙ্গে।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বোধ হয় বিলি মিচেল। সে এদেশবাসীর মনের ভাবটা বুঝতে চেষ্টা করত এবং এদেশের সকলেই যে এই সব নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়, এই সত্যটা সে স্বীকার করত। সেই জন্যই হীরালালের সঙ্গে তার সহজেই একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল।

এদের প্রথম আলাপের সূত্রটাও বড় বিচিত্র।

সুস্থ সবল জোয়ান পাহাড়ী হাইল্যাণ্ডারদের যা রেশন দেওয়া হত—বলা বাহুল্য তা তাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। কর্তৃপক্ষেরও তার চেয়ে বেশি দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তারা সর্বদাই ক্ষুধার্ত থাকত। তিনদিনের বিস্কুট এক-এক সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হত—কথা থাকত যে ওরা এক-এক বেলায় দুখানা করে খাবে। কিন্তু লম্বা 'মার্চ'-এর মুখে প্রথম প্রভাতেই সে বিস্কুটগুলি ঐ ষণ্ডখাদকদের উদর-গহ্বরে চিরনির্বাণ লাভ করত। তার পরে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধামাত্র থাকত সম্বল।

এরই মধ্যে একদিন একটা বিস্কুটের গাড়ির চাকা ভেঙে গাড়িখানা উলটে পড়ে গেল আর তার ফলে বিস্কুটের থলিগুলো পড়ল রাস্তার ওপর ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে। দৈবক্রমে সেদিন হীরালালের ওপরও তার ভার পড়েছিল ঐ বিস্কুটের গাড়িগুলো পাহারা দেবার। কিন্তু সে কী করবে, থলিগুলো জড়ো করার বা অন্য গাড়িতে তোলবার চেষ্টা করতে না করতে—অথবা কোন চেষ্টা করবার আগেই—পিছনের ক্ষুধার্ত হাইল্যাণ্ডাররা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং থলিগুলোর মুখ কেটে মুঠো মুঠো যে যার কাঁধ-ঝোলায় পুরতে শুরু করে দিলে।

বেচারী হীরালাল অবশ্য বাধা দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল—মানে তার পক্ষে যতটা বাধা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু দৈত্যের মত বলিষ্ঠ পাহাড়ে-গোরার

কাছে তার শক্তি আর কতটুকু। দু-চারটে কেঠো হাতের ধাক্কাতে আর গুঁতোতেই ওর শক্তি খতম হয়ে গেল। তবুও মার খেয়েও—বলতে গেলে জীবনপণ করেই ও বাধা দিয়ে যেত হয়তো, কিন্তু সেই সময় পিছন থেকে স্বয়ং সার কলিন এসে পড়ায় ব্যাপারটা সহজে মিটে গেল।

তিনি এসে ঘটনাটা কী খোঁজ করতেই হীরালাল কাঁদো-কাঁদো-হয়ে এসে নালিশ করল—'এরা জোর করে সব বিস্কুট কেড়ে খাচ্ছে হুজুর, আমার কোন কথা শুনছে না। উলটে বাধা দিতে গেলে ভয় দেখাচ্ছে, মেরে ফেলবে বলছে।'

সার কলিন ক্যাম্পবেল কঠিন দৃষ্টিতে চাইলেন ওদিকে।

ওদের মধ্যে 'অফিসার' বলতে কর্পোরাল মিচেল। অগত্যা তাকেই এগিয়ে আসতে হল। সে ঘাড় চুলকে আমতা-আমতা করে বললে, 'না, বিস্কুটগুলো মাটিতে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল—তাই আমরা—মানে নষ্টই তো হত—তাই হ্যাভারস্যাকে পুরে রাখছিলুম।'

'হুঁ, বুঝেছি।' অতিকষ্টে হাসি দমন করলেন সেনাপতি ক্যাম্পবেল, 'এবারের মত বিস্কুটগুলো তোমাদের দিলুম, কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান। বিশেষত মদের গাড়ি ভাঙলে যেন এমনি করে কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'র না!'

তিনি এগিয়েই যাচ্ছিলেন, কিন্তু হীরালাল অসীম সাহসে ভর করে তাঁর পথ আটকে দাঁড়াল।

'তা হলে হুজুর আপনিই আমাকে একটা রসিদ দিয়ে যান—নইলে মেজর ফিটজেরাল্ড আমাকে ছাড়বেন না—আমাকে চাবুক খেতে হবে শেষ পর্যন্ত।'

'তা বটে।' কলিন হেসে তার সঙ্গের আর একজন অফিসারকে ইঙ্গিত করলেন, 'দাও হে, একটা ভাউচার করে দাও। লিখে দাও যে, প্রধান সেনাপতি এই বিস্কুটগুলো বিশেষ উপহার হিসেবে দিয়েছেন। তোমরা বন্ধুদের মধ্যে ভাগযোগ করে নিও কিন্তু, স্বার্থপরের মত একা খেও না!'

সামান্য ঘটনা। কিন্তু সে-ই ওদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। ক্ষীণজীবী বাঙালীর ছেলের পক্ষে অতগুলো ষণ্ডা হাইল্যাণ্ডারদের বাধা দেবার চেষ্টা করা বা স্বয়ং প্রধান সেনাপতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে ন্যায়বিচার দাবি করা—কোনটাই কম দুঃসাহসের ব্যাপার নয়। আর সেই কারণেই বিলি মিচেলের দৃষ্টি পড়ল ওর দিকে। মনে মনে ওকে তারিফ না করে পারল না মিচেল। 'বাবু'রা ওদের কাছে একপ্রকারের অতি-নিরীহ পোষ-মানা জীব মাত্র। তাদেরই মধ্যে হঠাৎ একটা মানুষ দেখতে পেলে বিস্মিত হবার বা তার সম্বন্ধে সম্ভ্রম বোধ করারই কথা। আর সেই জন্যেই—এই নতুন পরিচয়ের পর কতকটা সমানে সমানে মিশতে পেরেই দুজনে অচিরে বন্ধু হয়ে উঠল।

অসুবিধা ছিল অবশ্য ঢের! ইংরেজদের ভাষা গত কয়েক মাসে ওর যদি বা কিছু বোধগম্য হয়েছে—স্কচদের বুলি একেবারেই দুর্বোধ্য। অতিকষ্টে আকারে-ইঙ্গিতে বুঝতে হত প্রথম প্রথম। তার পর—বোঝা হয়তো গেল—বোঝায় কী করে? ভাঙা ভাঙা ভুল ইংরেজি—এই তো ভরসা! তবুও দুটি মন যখন সত্যি সত্যিই পরস্পরকে বোঝার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে—তখন ভাষার বেড়া ডিঙোতে কি সত্যিই খুব অসুবিধা হয়?

অন্তত ওদের হয় নি।

আর মিচেলের মারফৎ রেজিমেণ্টের আরও কয়েকটি লোকের সঙ্গে ওর পরিচয় হল। সাহেব বলতেই হীরালালের মনে যে একটা বিচিত্র জীব জাগত

এত কাল—তাদের মন তো এত নরম, এত ভাবপ্রবণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। সে এই প্রথম বুঝলে যে, মানুষ হিসেবে এরা সকলে যেমন ভাল নয়, সকলে তেমনি খারাপও নয়। এবং চামড়ায় যতই তফাত থাক, আচার-আচরণে যত পার্থক্যই ধরা পড়ুক—আসলে ভেতরের মানুষগুলো তাদের মতই ভাবে, তাদের মতই কাঁদে হাসে, তাদের মতই সুখ-শান্তি কামনা করে। ওরাও মা'র চিঠির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, স্বপ্ন দেখে, মন খারাপ করে এবং দুর্লক্ষণ দেখলে মুখ শুকিয়ে ভাবতে বসে যে, এযাত্রা আর জীবন নিয়ে এ দেশ থেকে ফিরতে হবে না। পাশের লোককে অনুরোধ করে যে, মরবার পর তার গলায় ঝোলানো ক্রুশ এবং জিনিসপত্র যেন দেশে মার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেয় সে!...

কিন্তু তবু—অসাধারণ মানুষও দু-এক জন ছিল বৈকি।

সেটা অন্তত দুটি লোককে দেখে স্বীকার করতেই হল হীরালালকে।

'কোয়েকার' ওয়ালেস আর হোপ। বিচিত্র মানুষ দু জন।

মিচেলের মুখে শুনতে পেলে যে, এরা দু জনেই উচ্চশিক্ষিত—এবং নিঃসন্দেহে সম্ভ্রান্ত বংশজাত। আর যা-ই হোক এদের ঠিক সাধারণ সৈনিক রূপে কাজ করার কথা নয়। অথচ মজা এই, এরা কোন পদোন্নতি চায় না, উন্নতির প্রস্তাব এলেও গ্রহণ করে না।...দু জনের এই পর্যন্ত মিল থাকলেও অপরদিকে ছিল ঘোরতর অমিল। ওয়ালেস মদ খায় না, হল্লা করে না, মুখ খারাপ করে না। শান্ত সমাহিত মানুষ, অবসর সময়ে বাইবেল বা অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়ে কাটায়। আর হোপ দুর্দান্ত মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্ভাষী। জীবনটা যেন সে নিঃশেষে উড়িয়ে দিতে, নষ্ট করতেই চায়—সে-ই যেন তার সাধনা। কাউকেই তার ভয় নেই, কিছুতেই সে পরোয়া করে না, কেবল সাধ্যমত ওয়ালেসকে এড়িয়ে চলে প্রাণপণে। আর ওয়ালেসও নাকি—এমনিতে অত শান্ত হলেও হোপের কাছাকাছি এলেই সব প্রশান্তি হারিয়ে ফেলে। ওকে দেখামাত্র পৈশাচিক জিঘাংসা ফুটে ওঠে ওলালেসের মুখেচোখে—চোখ দুটো দানবীয় হয়ে ওঠে। মিচেল বলে যে, হোপের জন্যেই ওয়ালেস এই দলে নাম লিখিয়েছে। হোপকে সে ছায়ার মত অনুসরণ করে সর্বদা—পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, এক রণক্ষেত্র থেকে আর এক রণক্ষেত্রে। অথচ হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও কেন যে ওরা কোনদিন ডুএল লড়ে না, এমন কি ঝগড়াও করে না এইটেই আশ্চর্য!

আরও একটি বিষয়ে মিল ছিল—মিচেল একদিন চুপিচুপি বলছিল হীরালালকে। দু জনেরই গলায় নাকি চেনে বাঁধা দুটি লকেট ঝোলানো আছে। দুটিতেই আছে দুটি মেয়ের মুখ। হোপ প্রায়ই খালি গায়ে থাকে—এবং প্রকাশ্যেই সেই ছবিতে চুমো খায়—কাজেই ওর ছবি দেখেছে অনেকেই, কিন্তু ওয়ালেসের খবরটা আর কেউ জানে না। মিচেল বলে, জাহাজে আসতে আসতে একবার স্নানের সময় দৈবাৎ দেখতে পেয়েছিল সে। অবশ্য দূর থেকে চকিতে দেখা—মেয়েছেলে এবং সুশ্রী দেখতে—এ ছাড়া আর কিছুই ভাল করে বুঝতে পারে নি।...

হীরালাল এতদিনে এদের মাসিক আয় সম্বন্ধে রীতিমত ওয়াকিফহাল হয়ে উঠেছে। সে একদিন প্রশ্ন করলে মিচেলকে, 'হোপ যে এত মদ খায়—টাকা পায় কোথায়? এই তো তোমাদের মাইনে। ওতে হয়?'

'দূর পাগল, তা কখনও হয়! ও টাকাতে কিছুই হয় না। হোপের

দেশ থেকে টাকা আসে।...কনস্ট্যান্স বলে কে একটি মেয়ে নাকি মধ্যে মধ্যে ওকে প্রচুর টাকা পাঠায়। তাতেই ওর এত নবাবী।'

খানিকটা চুপ করে থেকে হীরালাল আবারও প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা তা হলে কি সেই মেয়েটিরই ছবি ও বুকে করে নিয়ে বেড়ায়? কে হয় সে ওর? বোন—মা—না স্ত্রী?'

'কি জানি। তা জানি না।' মিচেল উত্তর দিলে, 'হয়তো এর কোনটাই নয়—অন্য কিছু। কিন্তু সে তো জানবার উপায়ও নেই।' এ সব কথা তো জিজ্ঞাসা করা যায় না।'

তা বটে।

হীরালাল চুপ করে গেল।

মিচেলের পক্ষে যদিও প্রশ্ন করা অশোভন হয়তো, হীরালালের পক্ষে একেবারে ধৃষ্টতা। তাই কৌতূহল যতই থাক—প্রসঙ্গটা সে মন থেকে দূর করে দিলে একেবারেই।

কিন্তু এই কথাবার্তার ঠিক একদিন পরেই—লক্ষ্ণৌতে প্রবেশ করার মুখে রাত্রিবেলা আপনা থেকেই এ প্রশ্নের উত্তর মিলে গেল হীরালালের।

খোলা মাঠেই রাত কাটাবার হুকুম হয়েছিল সেদিন। স্থানে স্থানে আগুন করে তারই চারপাশে মালপত্র হাতিয়ার সমেত গোল হয়ে ঘিরে শুয়েছে সবাই—কেউ ঘুমিয়েছে, কেউ বা গল্প করছে—এমনই অবস্থা। কে জানে কেন, হীরালালের সেদিন বহু রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে নি। পরের দিন লক্ষ্ণৌতে ঢোকা হবে—সেই উপলক্ষে হয়তো রীতিমত লড়াই বাধবে—ওরা জিততে পারবে না পিছু হঠতে হবে—এই সব নানা চিন্তার ফলেই বোধ হয় মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। অথবা আর একটি বিশেষ মানুষের চিন্তাও ছিল তার সঙ্গে। দীর্ঘকাল দেখা হয় নি—সম্ভবত আর হবেও না—কিন্তু তবু মনের কোণে আজ সন্ধ্যা থেকে কেবলই একটা অকারণ আশা বার বার উঁকি মারছেই—হয়তো লক্ষ্ণৌতে গেলে তাঁর দেখা মিললেও মিলতে পারে। এ আশার কোন ভিত্তিই নেই—তা সে-ও জানে, তবু এক্ষেত্রে আশা করাটা তার নিজের গরজ বলেই বোধ হয়, কারণ যুক্তির বাইরে এই ক্ষীণ আশাটুকুকেই সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ছিল। আর চোখের ঘুম চলে যাবার পক্ষে সেই তো যথেষ্ট।

কারণ যা-ই হোক—বহুরাত্রি পর্যন্ত কম্বল জড়িয়ে বিনিদ্র পড়ে থাকবার পর সে উঠে মিচেলের সন্ধানে এদিকটায় এসে পড়ল। আলো নেই, কাঠ-ঘুঁটের স্তিমিত আগুন একমাত্র ভরসা। তাইতেই হেঁট হয়ে হয়ে মুখগুলো চিনে চিনে এগোতে হচ্ছিল। আর এইভাবে চলতে চলতেই একসময় সে হঠাৎ হোপের সামনাসামনি পড়ে গেল। সেখানটায় আর কেউ জেগে নেই,—একমাত্র হোপ ছাড়া। একা নিঃশব্দে বসে বসে মদ খাচ্ছে আর নিবন্তপ্রায় আগুনের ক্ষীণ আলোতে কী একটা দেখবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। কাছে এসে ওকে চিনতে পেরে হীরালাল সরে যাচ্ছিল, কিন্তু সে চেষ্টা করার আগেই মাতালের কাছে ধরা পড়ে গেল। মদ যতই থাক—চোখের নজর কমে নি লোকটার। পাশে পায়ের শব্দ পেয়ে প্রথমটা চাপা অথচ উগ্রকণ্ঠেই 'কে' বলে বন্দুকটার দিকে হাত বাড়িয়েছিল, তার পরই ওর দিকে চেয়ে সেই সামান্য আলোতেই চিনতে পারলে ওকে।

'ও—বাবু চ্যাটারজি! কাম ইয়া—ইধার আও। বৈঠো।'

অনুরোধ নয়—জোরই। কথার সঙ্গে সঙ্গে ওর একটা হাত ধরে টেনে কাছে বসাল হোপ।

মদের উগ্র গন্ধে হীরালালের গা বমি-বমি করছে তখন, একটু ভয়ও যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু গায়ের জোর নিষ্ফল জেনেই শান্ত হয়ে বসে রইল।

অবশ্য অত খেয়াল করার মত অবস্থা হোপের নয়, সে বাঁ হাতের তালুটা ওর সামনে মেলে ধরে বললে, 'দেখতে পাচ্ছ বাবু—এটা কী! পাচ্ছ না? ভাল করে তাকিয়ে দেখ। এ সুযোগ হয়তো আর না-ও পেতে পার। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরীর ছবি, মহত্তমা নারীও বলতে পার। সুইটেস্ট কন্‌স্ট্যান্স!'

সেই সময় একটা কাঠের গুঁড়ি পুড়তে পুড়তে অকস্মাৎ তার গায়ে-লেগে-থাকা একটা ছোট ছালের টুকরোতে আগুন লেগে দপ করে সেটা জ্বলে উঠল। তারই ক্ষণিক দীপ্তিতে হীরালাল সত্যই ভাল করে তাকিয়ে দেখল। ছোট্ট হাতীর দাঁতের ফলকে আঁকা একটি কমবয়সী মেয়ের মুখ। সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তার সোনালী চুল ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা গেল না। হয়তো লক্ষ্য করলেও বিশেষ কিছু বুঝত না—কারণ মেম তার কাছে মেমই—তাদের চেহারার ভালমন্দ অত তার মাথায় ঢোকে না। কিন্তু সেই সামান্য অবসরই হোপের পক্ষে যথেষ্ট। হয়তো তার সেটুকু আলোরও প্রয়োজন ছিল না—কারণ সেই ক্ষণদীপ্তি মিলিয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল। তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আমাকে বড্ড ভালবাসে বাবু, যেখানেই আমি যাই সেখানেই ওর মন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এখন এই মুহূর্তেও আমার মত সে-ও বিনিদ্র বসে আমার কথা ভাবছে—এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

এতক্ষণে হীরালাল অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। সে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলে, 'উনি কি আপনার স্ত্রী?'

'স্ত্রী!' যেন সাপের মত হিস্ হিস্ করে উঠল হোপ, 'স্ত্রীই তো হবার কথা! কিন্তু—না, সে কথা থাক্ বাবু। সে যদি আমার স্ত্রীই হত, তা হলে কি আর আমি এমন করে ভেসে বেড়াই!'

'তা—তাকে বিয়ে করেন কি কেন?' অসীম সাহসে ভর করেই আবার প্রশ্ন করে হীরালাল। হোপের কণ্ঠস্বরে সে বেশ একটু ভয় পেয়েছিল—তবু কৌতূহলও চাপতে পারল না শেষ পর্যন্ত।

'না বাবু, সে ভাগ্য আমার হবার নয়। কিন্তু ইউ রাস্কা, হাউ ডেয়া ইউ আস্ক সাচ্ কোয়েশ্চেনস্!...ভাগো, ভাগো হিঁয়াসে।'

অকস্মাৎ উগ্র হয়ে ওঠে মাতালটা। পাশ থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে সঙ্গীনটা উঁচিয়ে ধরে একেবারে।

হীরালাল ভয় পেয়ে একলাফে খানিকটা সরে যায়। হোপ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত হয়ে এসেছে। কতকটা বিড় বিড় করে বলে, ''কুজ মি বাবু। ডরো মৎ।...আমি তামাশা করছিলুম।...মানুষ আমি লড়াই ছাড়া মারি না—কন্‌স্ট্যান্স আমাকে বারণ করে দিয়েছে।'

হীরালাল কিন্তু তার মতি-পরিবর্তনের ওপর আর বিশেষ ভরসা করতে পারল না। মাতালের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করার ইচ্ছাও তার ছিল না—সে দূরত্বের ও অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দ্রুত সরে পড়ল সেখান থেকে।

যাবার সময় দৃষ্টি ছিল তার হোপের দিকেই। ঐদিকটায় নজর রেখে চলতে

গিয়ে হঠাৎ আর একটা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল সে। সেই ঘুমন্ত পুরীর নিস্তব্ধ প্রান্তরে একেবারে কাছে একটা নিঃশ্বাসের শব্দ পেয়ে চমকে উঠল, চেয়ে দেখবার আগেই বুকটা ঢিপ্ করে উঠল। চেয়ে দেখেও ভয় কমল না—অন্ধকারে প্রেতমূর্তির মতই স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। এত নিশ্চল এত স্থির যে—জীবন্ত মানুষ বলে মনে হওয়া কঠিন। হয়তো চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে একটা মৃদু শব্দও তার মুখ থেকে বার হয়ে থাকবে—আর সেই শব্দেই সম্ভবত সে মূর্তিটা একটু নড়ে-চড়ে উঠল। তখন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে ভাল করে চেয়ে দেখল হীরালাল—লোকটা ওয়ালেস।

হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই দাঁড়িয়ে আছে সে সেখানে। হয়তো হীরালাল আসার আগে থেকেই। একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে হোপের দিকে, মনে হয় চোখের পলকও পড়ছে না তার। আলো নেই বিশেষ—আশপাশের সব আগুন-গুলোই প্রায় নিভে এসেছে।—তবু সেই ক্ষীণ আভাতেই হীরালালের মনে হল সে-দৃষ্টিতে অমানুষিক একটা ঘৃণাই উপচে পড়ছে।

ঘৃণা আর বিদ্বেষ। যেন এই মুহূর্তে হাতে পেলে লোকটাকে ও টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে নখেতেই—

হীরালাল আর দাঁড়াল না। উপর্যুপরি ভয় পাবার ফলে তার বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। মানুষটাকে চিনতে পারলেও অন্ধকারে এইভাবে মূর্তিমান হিংসার মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে-সময় তাকে একটা পিশাচ বলেই মনে হল। বিলি মিচেলকে খুঁজে বার করবার আশা বিসর্জন দিয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুত সে নিজেদের ঘাঁটির দিকে সরে পড়ল।

॥ ৬৫ ॥

এতক্ষণ কথাটা মনেই ছিল না মিচেলের। দুপুরে অত ঠাণ্ডা ছিল না, তখন—বিশেষত সেই লড়াইএর মধ্যে—গ্রেটকোটটাকে অকারণ বোঝা বলেই মনে হচ্ছিল। তাই নিজের জীবন দিয়ে সে যখন ওর প্রাণরক্ষা করল—অর্থাৎ এক মুসলমান সিপাহীর তলোয়ারে জামাটা কাঁধের কাছ থেকে নীচে পর্যন্ত চিরে দুখান হয়ে গেল—তখন সেটা ফেলে দিতে পেরে ও যেন বাঁচল। তলোয়ারটা ওর ঘাড় লক্ষ্য করেই পড়েছিল, কোটটা না থাকলে ঘাড়টা হয়তো বাঁচানো যেত না কিছুতেই—সেটার ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা কেটে গেছে ভালয় ভালয়—সেজন্য একটু কৃতজ্ঞ থাকবারই কথা, কিন্তু দুখানা হয়ে চিরে যাওয়া ঝলঝলে জামা পরে চলা যেমন সুদৃশ্য নয় তেমনি সেভাবে লড়াই করাও সুবিধা নয়। সুতরাং সেটা ফেলে দেবার উত্তম অজুহাত পেয়ে বেঁচে গেল ও। দুপুরের রোদে, গোলা-গুলির তাপে আর লড়াইএর পরিশ্রমে ওটা অসহ্যই লাগছিল।

অবশ্য গ্রেটকোটের অভাবও ছিল না। সন্ধ্যা নাগাদ যে-কোন মৃত সহকর্মীর গা থেকে একটা খুলে নিলেই চলত—আসলে কথাটা মনেই পড়ে নি। মনে পড়ে নি তার কারণ তখনও বিশেষ ঠাণ্ডা বোধ হয় নি বলেই। কিন্তু এখন তাপও নেই—উত্তেজনাও নেই—এমন কি দুঃসাধ্য জয়লাভের আনন্দও অনেকটা থিতিয়ে এসেছে—এখন শীতটা বেশ জানান দিচ্ছে। একটু-আধটু নয়—রীতিমত হাড়-কাঁপানো শীত। দুপুরের গরম দেখে এ শীত কল্পনা

করাও শক্ত। অমন যে ঠাণ্ডা দেশের মানুষ ওরা—ওদের দাঁতে দাঁতে লাগছে ঠকঠক করে।

সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর ভেঙে আসছে। কিন্তু ঘুমের এখনও ঢের দেরি। দু ঘণ্টা করে পাহারা ভাগ হয়েছে। প্রথম দু ঘণ্টার দলে পড়েছে মিচেল। সেটা তবু মন্দের ভাল। পায়চারি করে শরীরটা একটু তাজা থাকছে—এর পর ?

মিচেল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এক বার চারদিকে চাইল।

জায়গায় জায়গায় আগুন করে গোল হয়ে শুয়েছে ক্লান্ত সৈনিকের দল। বন্দুকগুলো পাশেই পরস্পরের গায়ে টাল দিয়ে খাড়া করা রয়েছে—এক-একটা ছোট টিপির মত। শান্ত নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু ওরই মত আরও দু-এক জন্য হতভাগ্য এখনও যুদ্ধশ্রান্ত দেহটাকে টেনে টেনে সান্ত্রীর কর্তব্য সম্পাদন করছে।

পরিশ্রম তাদের বড় কম হয় নি। গত কয়েক মাস ধরেই হচ্ছে। দিনের পর দিন অবিরাম হাঁটতে হয়েছে তাদের। তার ওপর কদিন ধরে চলছে লড়াই। আজ তো ভোর থেকেই শুরু হয়েছে—জীবনমরণ যুদ্ধ বলতে গেলে। শত্রুর একটি বড় ঘাঁটি দখল করে ওরা এইখানে আসে। প্রত্যেকটির জন্যই বহু প্রাণ দিতে হয়েছে তাদের। সূচ্যগ্র জায়গাও দুশমনরা সহজে ছাড়ে নি। সব চেয়ে সাংঘাতিক পরিশ্রম করতে হয়েছে এই জায়গাটার জন্যে। এটাকে স্থানীয় লোকেরা বলে শাহ্‌নজফ্—আসলে এটা বুঝি কোন্ এক নবাবের সমাধি-মন্দির। কিন্তু সমাধি-মন্দির বলে চেনার উপায় আর রাখে নি ওরা—কিল্লার মতই সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করে তুলেছে। তাদের যা সাধারণ কামান—তার গোলা এর দেওয়ালে একটা গর্তও করতে পারে না—এমনই এর বজ্র-গাঁথুনি!

শাহ্‌নজফের কিল্লার ওপর অনেক ভরসা ছিল সিপাহীদের। এখানে শিক্ষিত সিপাহীই ছিল অন্তত আড়াই হাজার। তা ছাড়া সাধারণ লোকও কিছু ছিল। আর তারাও খুব অবহেলা করার মত নয়—তারা পাকা গোলন্দাজ না হোক—পাকা তীরন্দাজ। তাদের লক্ষ্যও অব্যর্থ এবং সে তীরও গুলির চেয়ে কম মারাত্মক নয়। এছাড়া প্রাকারের ওপর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ছিল কামান। এবং শুধুই কি সামনের শাহ্‌নজফ্—আশপাশের ঘাঁটিগুলোও নীরব বা নিষ্ক্রিয় ছিল না। পাশের ঐ কদম রসুলের বড় মসজিদটা বোঝাই ছিল দুশমন, আর সেখান থেকেও আসছিল গোলা-গুলি-তীর—অবিশ্রান্ত বেগে।

মিচেলরা কিছুই করতে পারত না হয়তো—শাহ্‌নজফের এই কিল্লার সামনে অধিকাংশ সহকর্মী বন্ধুকে চিরকালের মত রেখে হয়তো ওদের ম্লান নতমুখে পিছু হঠতেই হত—যদি না শেষ পর্যন্ত দৈব সহায় হতেন! একেবারে সন্ধ্যার মুখে জন প্যাটন বলে এক সার্জেন্ট নিজের জীবন বিপন্ন করে পিছনের একটা পথের সন্ধান নিয়ে এল। কদম রসুলের দিকে. শাহ্‌নজফের যে পাঁচিলটা পড়ে, তাতে প্রকাণ্ড একটা গর্ত হয়েছে ; সম্ভবত ওদেরই গোলা এসে পড়ে গর্তটা হয়েছে। সিপাহীরা অতটা লক্ষ্য করে নি, করলেও ওদিক দিয়ে শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করে নি—কারণ ওদিকেই কদম রসুল।

কদম রসুলে তখন এদের দিকে অগ্নিবর্ষণেই ব্যস্ত। তাদের লক্ষ্য দূরের দুশমনকে—ঠিক তাদের চোখের নীচেই যে গভীর পরিখা—শাহ্‌নজফ্ আর কদম রসুলের মাঝখানে—সেদিকে তাদের নজর ছিল না। সেখান দিয়ে কোন এক জন প্যাটন নিঃশব্দে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ইংরেজ ফৌজকে তা তারা কল্পনাও করে নি। আর সেই সামান্য অনবধানতাই তাদের কাল হল। শত্রু অতর্কিতে ভেতরে ঢুকে পড়তে তাদের এতক্ষণকার সমস্ত সাহস, সমস্ত বীর্য, জীবনমরণ পণ নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। মনোবল পড়ল একেবারে ভেঙে। তখন শুধু প্রাণপণে পালানো ছাড়া আর কোন পথই দেখতে পেলে না তারা। তখনও যে ঘুরে দাঁড়ানো যায়, সকলে মিলে জড়ো হয়ে আবারও যে প্রত্যাঘাত করা যায়—সে কথাটা একবারও তাদের মাথায় এল না।

অবশ্য তখন ইংরেজদেরও আর পরাজিত শত্রুর পিছনে তেড়ে যাওয়ার মত শক্তি ছিল না। তখন এরা কোনমতে কোথাও একটু বসতে পেলেই খুশী। 'যায় বিশ্ব যাক রসাতলে'—তখন এদের কতকটা এই মনোভাব। একটুখানি ঘুমের অবসর, দু ঘণ্টার বিশ্রাম—স্বর্গসুখের চেয়েও লোভনীয়।

সে সময় মিচেলেরও তাই গ্রেটকোটের কথা মনে পড়ে নি। পড়বার কথাও নয়। এখন সে ভুলের জন্য অনুতাপের সীমা নেই, কিন্তু এখন বোধ হয় আর পাওয়া সম্ভব হবে না। রাজকীয় সমাধি-মন্দিরের এই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে আজ মৃতদেহের অভাব নেই, কিন্তু এর অধিকাংশই শত্রুর মৃতদেহ—সিপাহীদের মৃতদেহ, ওদের গ্রেটকোটের বালাই নেই। এখানে মিচেলের স্বজাতীয়রা বিশেষ মরে নি।...বাইরে গেলে অবশ্য অভাব থাকবে না—কিন্তু বিনা হুকুমে যাওয়া যায় না। কথাটা একবার ওপরওলার কাছে পাড়তে গিয়েছিল—সুবিধা হয় নি। তাঁরা ছাড়তে রাজী হন নি—কারণ এখন একা একা বাইরে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। তা ছাড়া··· এই অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কঠিন শীতল শবদেহ থেকে জামা ছাড়িয়ে নেওয়া—না, সে সম্ভব নয়। ভাবতেই যেন কেমন লাগে। এ পিশাচের কাজ—মানুষে পারে না।

দেখা যাক—এখানেই কিছু পাওয়া যায় কিনা। কোথাও কিছু একটা নেই? নিদেন একটা কম্বল কি লেপও কি কেউ ফেলে যায় নি? খুঁজলে নিশ্চয় একটা বেরোবে। উদ্যোগে কী না মেলে?

মিচেল মনে মনে নিজের মনকেই আশ্বাস দেয়।

কিন্তু চারিদিকে তখন জমাট অন্ধকার। নক্ষত্রের আলোও কুয়াশায় ম্লান। আগুন জ্বলছে বটে অনেকগুলো—কিন্তু সে সবই ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে—হয়তো তার তাপ আছে, কিন্তু দীপ্তি নেই। ভাল করে খুঁজে দেখতে গেলে আর একটু আলো চাই।

কথাটা সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল। আছে, আলো নিশ্চয়ই আছে। ওরা যখন এখানে ঢোকে—তখন অনেকগুলো আলোই জ্বলতে দেখেছিল; নবাবের সমাধি-মন্দিরে বহু তীর্থযাত্রী অতিথি আসে। তাদের জন্যে পাঁচিলের গায়ে সার সার খুপরি ঘর করা আছে চারিদিক ঘিরে—কতকটা সরাইখানা বা অতিথিশালার মত। এধারে একটু বড়গোছের সব সমাধিতেই এই ব্যবস্থা থাকে। সেই ঘরগুলো সিপাহীরা ব্যারাকে পরিণত করেছি। মিচেলরা যখন ভেতরে ঢোকে তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—প্রায় সব ঘরেই চিরাগ জ্বলছে। সে চিরাগ নিভিয়ে যাবার অবসর পায় নি কেউ, এরা যখন

আসে তখনও জ্বলছিল। সেগুলো কিছু সবই নিভে যায় নি এর মধ্যে—এখনও এক-আধটার তেল আছে নিশ্চয়।

মিচেল সেই দিকেই পা চালাল। কাছে গিয়ে দেখল তার অনুমানই ঠিক। মধ্যে মধ্যে এক-আধটা নিভে গেছে—নইলে বেশির ভাগ ঘরের কুলুঙ্গীতেই চিরাগ জ্বলছে এখনও। সে ওরই মধ্যে থেকে বেছে—যেটার তেল বেশি আছে সেইটে তুলে নিল, তার পর ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

খুবই তাড়াতাড়ি গেছে বেচারীরা। কোথাও আটার তাল মাখা—রুটি বানাতে বসবার আগেই ফেলে চলে যেতে হয়েছে। কোথাও রুটির গোছা তৈরী—শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে; উনুনে ডাল চেপেছিল, সে ডাল ফুটছে এখনও। এক জায়গায় ডাল পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এছাড়া টুকরো টুকরো জিনিস প্রচুর পড়ে আছে—থালা-লোটা, কাপড়-চোপড়। বিছানাও আছে, কিন্তু বড়ই নোংরা সব। মিচেল যা খুঁজছে সেইটেই শুধু নেই। কম্বল দু-একখানা পড়ে আছে বটে, তবে তার অবস্থা দেখে গায়ে দেবার প্রবৃত্তি হল না ওর। সম্ভবত পিশুতে বোঝাই।

দক্ষিণের সারি দেখে শেষ করে মিচেল বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল। আর কোথাও ঘুরে লাভ আছে? এতগুলো ঘরে যা মিলল না—তা কি আর বাকি ঘরগুলোতে মিলবে? তার চেয়ে বরং ফিরে গিয়ে যা হয় ঐ আগুনেই শীতনিবৃত্তি করা ভাল।...

নিজের ঘাঁটিতে ফিরতে গেল মিচেল—কিন্তু তার আগেই আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। ওদিকে মুখ ফেরাতেই চমকে উঠল মিচেল।

দূরে ওটা কী—নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে!

ছায়া, না কোন জানোয়ার? জানোয়ার কেমন করে হবে, শিয়াল-টিয়াল তো হতেই পারে না—অত উঁচু আর লম্বা? তা ছাড়া দু-পায়ে হাঁটছে বলেই তো মনে হচ্ছে। মানুষ, নিশ্চয়ই মানুষ!

ওদেরই কোন সান্ত্রী কি? কিন্তু সান্ত্রীর পোশাক তো ওটা নয়। মনে হচ্ছে ওড়নার মত কী একটা উড়ছে ওর পিছনে—দ্রুত চলার ফলে যেমন মেয়েদের পেছনে ওড়ে।

স্ত্রীলোক! এখানে স্ত্রীলোক!!

তবে কি গুপ্তচর?

নিমেষে মাথা গরম হয়ে উঠল মিচেলের, রক্ত উঠল চঞ্চল হয়ে। ভুলে গেল যে রাইফেলটা সে রেখে এসেছে ওখানে—কোন হাতিয়ারই নেই সঙ্গে। হাত দিয়ে প্রদীপটা আড়াল করে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে সে সেই ছায়ামূর্তির পিছু নিল।

মূর্তিটা অবশ্য সে দেখেছিল দূরে—খুবই দূরে। এখন আর দেখাও যাচ্ছে না। কিন্তু একেবারে নজরের বাইরে মিলিয়ে যাবার আগেই সে দেখে নিয়েছে—মূল সমাধি-গহ্বরের অন্ধকার কোটরেই গিয়ে ঢুকছে সে; অন্তত ঐখানে পৌঁছেই মিলিয়ে গেছে।

এদেশে এসে এই একটা বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করেছে মিচেল। বড় বড় রাজা-বাদশার সমাধিতে দুটো করে কবর থাকে। প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ জমি নিয়ে এইসব কবর-মহল তৈরী হয়—ঠিক মাঝখানে থাকে মূল সৌধটা। আর সেই সৌধের মাঝখানে থাকে কবর-বেদী। কিন্তু সাধারণত সে ঘরটা হয়

দোতলায়, সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হয়। মাটিতে যেখানে আসল কবরের বেদীটা—সে ঘরটায় সাজসজ্জা বিশেষ কিছুই থাকে না। সাধারণ ঘর, আরও সাধারণ সাদাসিধা একটা বেদী। সাধারণত এ ঘরের মেঝেও মাটির থেকে বিশেষ উঁচু হয় না—বাইরের বাগানের সঙ্গে মিশে থাকে। শুধু মেঝেটা বাঁধানো থাকে, এইমাত্র। কোন কোন ছোট দরের সমাধিতে আবার তাও থাকে না—ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁত্ করে জায়গাটা।

অথচ ঠিক এর ওপরেই যে ঐ মাপের দ্বিতীয় ঘরখানা থাকে—যাকে অনায়াসে নকল কবর-ঘর বলা যেতে পারে—সেটায় নানা কারুকার্য, দামী গাঁথুনি—মূল্যবান পাথর ও মিনার কাজ। আর সেই ঘরের মাঝখানে—নীচের মূল কবরের ঠিক ওপরেই থাকে আর একটা কবর, মাপে নীচেরটার একেবারে সমান কিন্তু আর কিছুতে নয়। এ বেদীটা সাধারণত সাদা বা কালো মার্বেল পাথরে তৈরী হয়, তার চারদিকে ধারে ধারে মিনার ফুল লতাপাতা থাকে—নামও লেখা থাকে ঐখানেই। এই বেদীতে পড়ে দামী ভেলভেট বা কিংখাপের আস্তরণ, পড়ে ফুল, জ্বলে চিরাগ। এইটেই দেখবে সকলে—এই ভেবেই বোধ করি এ ব্যবস্থা করা হয়।

শাহনজফের এই কবরেও সে ব্যবস্থার অন্যথা ছিল না। আর মিচেল তার সামনের ছায়ামূর্তিকে ঐ মূল কবরখানাতেই ঢুকতে দেখেছে।

বহু মৃতদেহ ডিঙিয়ে, বহু স্থানে হোঁচট খেয়ে মিচেল এসে সেই ঘরটার সামনে পৌঁছল। চারিদিক নির্জন, নিস্তব্ধ। মানুষ তো দূরের কথা, কোথাও কোন জীবিত প্রাণীরই চিহ্ন নেই। দরজার সামনে চিরাগটা উঁচু করে তুলে ধরল এক বার—ভেতরেও যতদূর দৃষ্টি চলে—কোথাও কেউ নেই।

তবে কি—, এই প্রথম নিজের দৃষ্টি সম্বন্ধে সংশয় জাগল মিচেলের মনে—তবে কি সে-ই ভুল দেখেছে? মায়া? মরীচিকা? দৃষ্টি-বিভ্রম?

নাকি কোন অশরীরী আত্মা? রাশি রাশি শব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে—তাদেরই কোন আত্মা কি উঠে এল প্রতিহিংসা নিতে?

কথাটা আবছা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিচেল যীশু ও সেণ্ট অ্যানড্রুজকে স্মরণ করলে। মনে-মনেই একবার দ্রুত ক্রশ-চিহ্ন এঁকে নিলে কপালে ও বুকে।

কিন্তু না—এমন ভুল ওর নিশ্চয়ই হয় নি। একটা মানুষকেই যে ও দেখেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অত সহজে সে ছাড়বে না—অত সহজে তাকে ভয় দেখানোও চলবে না। ...মনে জোর আনে মিচেল—সে এর শেষ না দেখে ফিরে যাবে না। ভেতরে ঢুকে দেখবে নীচেটা—তার পর ওপরের নকল কবরখানা—তার চারপাশের ঘেরা অলিন্দ, সিঁড়ি এ সব তো আছেই।...

ভেতরে ঢুকতে গিয়ে একবার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। এতক্ষণে মনে পড়ল, সঙ্গে কোন হাতিয়ার নেই। ইস্, কাজটা বড়ই খারাপ হয়ে গেছে। নিশীথ-রাত্রির অন্ধকারে—চারিদিকে এত ঘর, এত সিঁড়ি, এত দেওয়াল, এত গাছপালা—অসংখ্য ছায়াঘন গুপ্তস্থান—শত্রুর লুকিয়ে থাকার হাজার সুবিধা সর্বত্র। কে জানে সবাই পালিয়েছে কিনা—হয়তো এখনও কেউ লুকিয়ে বসে আছে কোথাও, ফাঁক পেলেই জিঘাংসা চরিতার্থ করবে বলে। মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মারবার সংকল্প গ্রহণ করার লোক খুব কম নেই এদেশে—সে পরিচয় মিচেল এই কদিনেই পেয়েছে ঢের।

কিন্তু এখন আর উপায় কী? ফিরে যাওয়া চলে না, কিছুতেই। আলোটা মাথার ওপর ধরে—যাতে নিজের আলোতেই দৃষ্টি না ব্যাহত হয় এবং আলোটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে—বাঁ হাতটা কোমরবন্ধের এক জায়গায় মুঠি করে ধরে (যেন ওখানে কোন অস্ত্র গোঁজা আছে এমনি ভাবে) মিচেল সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল—না, লোক যে কেউ নেই এটা ঠিক। শুধু ওদিকে কবরের ওপাশে কতকগুলো পিপে পড়ে আছে। কে জানে কিসের পিপে ওগুলো—হয়তো খালি পিপেই হবে।

কিন্তু নরম নরম ধুলোর মত পায়ে কী লাগে?

এতক্ষণে ভরসা করে মিচেল নীচের দিকে চেয়ে দেখলে। সত্যই তো, কয়লার গুঁড়োর মত—তাই বা কেন—তার চেয়েও মিহি ধুলোর মত কালো একরাশ কী মেঝেতে পড়ে। তাইতেই ওর দু পায়ের গোছ পর্যন্ত ডুবে গেছে।

কী এগুলো? কৌতূহল হয় মিচেলের।

মাথার ওপর আলো—সুতরাং ঠিক ওর নীচেই অন্ধকার, ভাল করে কিছুই দেখা যায় না। আলোটা ধরে দেখা দরকার।

চিরাগটা মাথার ওপর থেকে নামাল মিচেল, আলো ধরে হেঁট হয়ে দেখতে গেল বস্তুটা—

ঠিক সেই সময়, চকিতের মধ্যে—ব্যাপারটা কী ঘটল তা বোঝা তো দূরে থাক্, সে সম্বন্ধে কোনরকম অবহিত হবার আগেই—পিছন থেকে কে একজন নিঃশব্দে এসে এক হাতে ওকে জড়িয়ে—আর এক হাতে চট করে প্রদীপের শিখাটি টিপে ধরল।

দেখতে দেখতে গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল চারিদিক।

প্রদীপের শিখা নিভে গেল।

'ভয় নেই বিলি, ভয় পেও না। আমি চ্যাটারজি!...চল চল—বাইরে চল—এখনই!'

চ্যাটারজি!

হীরালাল? সে কি!

মিচেল ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না, ভাবতেও পারল না। কতকটা যন্ত্রচালিতের মতই হীরালালের মৃদু আকর্ষণে বাইরে এসে দাঁড়াল।

এখানটায় অত অন্ধকার নেই। হীরালালকে চিনতে অসুবিধা হল না।

হীরালাল তখন ওকে ছেড়ে দিয়ে পোড়া আঙুল দুটো মুখের কাছে তুলে ফুঁ দিচ্ছে।

'ইস্! হাতটা পুড়ে গেল একেবারে। জ্বালা করছে।'

'কিন্তু তুমি এ কাজ করতে গেলেই বা কেন? ব্যাপারটা কী?'

'এদিকে এস বলছি। ঐ সাংঘাতিক ঘরটা থেকে আগে দূরে এস দিকি!'

সে মিচেলকে টানতে টানতে একটা আগুনের ধারে নিয়ে গেল।

'পা-টা দেখ তো আলোতে—জিনিসটা কী?'

মিচেল বিস্ময়ে কৌতূহলে তাড়াতাড়ি আগুনের কাছে গিয়ে পা-টা প্রায় শিখার ওপরই ধরতে যাচ্ছিল—আবারও এক হ্যাঁচকা দিয়ে টেনে সরিয়ে আনল হীরালাল, 'নির্বোধ! এখনই মরতে যে। পা-টা জ্বলে যেত!'

'ক্ল—কেন ?'

'ওটা যে বারুদ—বুঝতে পারছ না ?'

'বারুদ !'

'হ্যাঁ—বারুদ। স্তূপাকার করা বারুদ। পিদিমটা নিয়ে আর একটু হেঁট হলেই কাজ খতম হয়ে যেত। শুধু তুমিই যেতে না—এই কবর, চারপাশের এই সব বাড়ি—তোমার এই হাইল্যান্ডারের দল কিছুই থাকত না। ওখানে কত বারুদ পড়ে আছে জান ? অন্তত দেড়শ মণ।'

সম্ভাবনাটা সম্পূর্ণ বুঝতে পারবার সঙ্গে সঙ্গেই—বিপদের গুরুত্বটা ধারণায় এসে—সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল মিচেলের। একটা হিমশৈত্য শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে লাগল সমস্ত দেহে—

'বারুদ ! বাই জোভ ! কে রাখলে ওখানে ?'

'দুশমনরা। সম্ভবত ঐ ঘরটায় ওরা ম্যাগাজিন করেছিল। ঐটেই ছিল বারুদের ভাঁড়ার। যাবার সময় নিয়ে যেতে পারে নি। তা ছাড়া এরকম একটা সম্ভাবনার কথাও ভেবেছিল হয়তো। যায় তো ওর ওপর দিয়েই নিপাত যাক শত্রুরা !'

'কিন্তু তুমি টের পেলে কী করে ?'

একটু দেরি হয় হীরালালের উত্তর দিতে।

সামান্য ইতস্তত করে বলে, 'তোমার সন্ধানে এসে ঘুরছি—দূর থেকে তোমাকে দেখতে পেলুম। একটু চমকে দেব বলেই ডাকি নি, শুধু নিঃশব্দে পিছনে পিছনে আসছিলুম।...তুমি যখন ভেতরে ঢুকলে তখন তোমার মাথার ওপর আলো ছিল—তা ছাড়া তুমি পায়ের দিকে চাও নি কিন্তু আমি গোড়া থেকেই লক্ষ্য করেছিলুম। অনুমান করতেও দেরি হয় নি—কবর-ঘরের মধ্যে আর কী রাখবে এমন স্তূপাকার করে ? নিশ্চয়ই বারুদ !...তোমাকে ডেকে বলতে গেলে তুমি হয়তো চমকে উঠে সাবধান হবার আগেই একটা কাণ্ড করে বসবে—এই ভয়েই কিছু বলি নি—আগে আলোটা নিভিয়েছি !'

মিচেল কৃতজ্ঞতাভরে ওর হাত দুটো দু হাতে চেপে ধরে বললে, 'তুমি আমার প্রাণরক্ষা করলে চ্যাটার্জি—এ কথা—এ ঋণ আমি জীবনে ভুলব না।'

'ও কিছু নয়। ও অবস্থা দেখলে তুমিও এ-ই করতে। করতে না কি ?'

'তা হয়তো করতুম। কিন্তু তুমিও এই অবস্থায় পড়লে কৃতজ্ঞই হতে। সে কথা থাক্—আমি যাই, ক্যাপ্টেন ডসনকে কথাটা এখনই জানানো দরকার। তুমি একটু দাঁড়াও—'

সে যেতে গিয়েও বাধা পায়। হীরালাল তার হাত ধরে টানে।

'এক মিনিট মিচেল। তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?'

'তোমার অনুরোধ রাখব না ! বিশেষত এই ঘটনার পর ? তোমার এ প্রশ্ন করাই অন্যায় চ্যাটার্জি !'

'বেশ তাহলে শোন।...তুমি আরও কিছুক্ষণ এ-কথাটা কাউকে জানিও না। অন্তত—অন্তত আধ ঘণ্টা।'

'কেন বল তো !' বিস্ময়ের সীমা থাকে না মিচেলের, সে সেই অন্ধকারেই ওর মুখটা লক্ষ্য করবার চেষ্টা করে।

'কী ব্যাপার ? তোমার সঙ্গে এর...মানে, এই খবরটা রিপোর্ট করার কী সম্পর্ক ?'

'সেটা এখনই বলতে পারব না বিলি, মাপ কর। পরে বলব একদিন, যদি সময় পাই। মাত্র আধ ঘণ্টা—তার পর তুমি রিপোর্ট ক'র। আমার কথা বলতে হবে না—তুমিই আবিষ্কার করেছ, এই-ই ব'ল। আমার কোন কৃতিত্ব চাই না। তোমার পালা শেষ হতে এখনও বোধ হয় ঐ রকম সময়ই আছে, শেষ হবার মুখেই বরং খবরটা দিও—'

একটু সংশয়ের সুরে মিচেল বলল, 'কিন্তু সেটা কি উচিত হবে? এসব খবর দিতে দেরি করা ঠিক নয়—অনেক কিছু বিপদ ঘটতে পারে। তা ছাড়া আরও একটা কথা—আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই বাড়িটার মধ্যে কোন একজন স্ত্রীলোক লুকিয়ে আছে। আসলে আমি তার সন্ধানেই ওখানে গিয়েছিলুম। সম্ভবত সে গুপ্তচর—দেরি হলে সে পালাতে পারে।'

সংক্ষেপে সে নিজের অভিজ্ঞতাটা বিবৃত করে।

'প্লীজ মিচেল, আমার এটা একান্ত অনুরোধ।...তুমি আমার কাছে ঋণের কথা বলছিলে—যদি সত্যই কোন ঋণ আছে মনে কর এই অনুরোধটি রাখ, তোমার সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে। প্লীজ!'

মিচেল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'অল রাইট। তাই হোক। আধ ঘণ্টা পরেই আমি রিপোর্ট করব।...কিন্তু তুমি চললে কোথায়?'

'সেটাও আজ বলতে পারব না ভাই—তবে যেজন্যে এই আধ ঘণ্টা সময় নিলুম সেই কাজটাই সারতে যাচ্ছি, এইটুকু জেনে রাখ।'

তার পর একটু হেসে বললে, 'মনে কর আমি তোমার সেই ছায়ামূর্তি, সেই মায়াবিনী—সেই গুপ্তচরকেই খুঁজতে যাচ্ছি!'

সে হেসে মিচেলের কাঁধে একটা সস্নেহ মৃদু চাপড় মেরে—অন্ধকারেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ ৬৬ ॥

সমাধি-সৌধটার গা ঘেঁষে ওর ছায়ায় ছায়ায় হীরালাল নিঃশব্দে দ্রুত এগিয়ে চলল—এদিক দিয়ে ঘুরে, বলতে গেলে বাড়িটাকে প্রদক্ষিণ করে একেবারে ওপারে গিয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল সে। সামনেই কদম রসুল—আর ঐ দিকেরই প্রাকারের গায়ে সেই বড় ফুটোটা, যেখান দিয়ে আজ ইংরেজরা ঢুকেছে কিছু আগে। ওর ওপারে অন্ধকার গভীর খাদ, গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকার পক্ষে, পালাবার পক্ষে ভারি সুবিধা।...

কিন্তু এখান থেকে ঐ পাঁচিলটা পর্যন্ত অনেকখানি জমি পেরিয়ে যেতে হয়। চারিদিক নিস্তব্ধ, মনে হচ্ছে সকলেই ঘুমে অচেতন। তবু ঠিক সকলেই যে ঘুমিয়ে নেই তা হীরালাল জানে। এটুকু এ জাতটাকে সে এই কদিনে চিনেছে, শ্রান্তি যতই হোক—যাদের জেগে পাহারা দেবার কথা তারা ঠিকই জেগে আছে এবং পাহারা দিচ্ছে। তাদের সামনে পড়লে এখন নানা কৈফিয়ত। প্রাণ যাবার সম্ভাবনা নেই বটে, 'পাস ওয়ার্ড'টা সে জেনেই এখানে আসতে সাহস করেছে—কিন্তু অনর্থক খানিকটা দেরি হয়ে যাবে। আর সেটাই কোনমতে বাঞ্ছনীয় নয়। আধ ঘণ্টা মোটে সময় ওর হাতে।

অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। একটু থমকে চেয়ে দেখতেই চোখে

পড়ল সান্ত্রী একজন ঘুরে ওধারের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এই উত্তম সুযোগ। সে দ্রুত মাঠটা পেরিয়ে গেল। জুতো খুলে রেখে এসেছে সে—শুকনো শক্ত মাটিতে শব্দ জাগবার ভয়ে। সুতরাং প্রায় নিঃশব্দেই প্রাঙ্গণটা পার হয়ে প্রাকারের সেই বড় ফুটোটার সামনে এসে পৌঁছল।

আরও একবার ইতস্তত করলে সে। পাঁচিলের বাইরে যেন আরও জমাট অন্ধকার। গভীর নালাটা নেমে গেছে পাঁচিলের গা থেকেই, পা ঠিক রাখতে না পারলে গড়িয়ে পড়বে অনেক নীচে—হাত-পা ভাঙবার সম্ভাবনা ষোল আনা। তা ছাড়া কদম রসুল হয়তো এখনও খালি হয় নি—সেখানে শত্রুরা হয়তো এখনও কড়া পাহারা রেখেছে। এই নালার দিকটাতে পাহারা রাখাও আশ্চর্য নয়—বরং সেইটাই সম্ভব। তাদের হাতে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না কোনমতেই। এ অন্ধকারে সতর্ক হবারও উপায় নেই। হয়তো পা বাড়ালেই একেবারে কোন প্রহরারত সিপাহীর বাহুবন্ধনের মধ্যে গিয়ে পড়বে।

তবু—উপায়ও আর নেই। যেতেই হবে ওকে।

মাত্র আধ ঘণ্টা সময় চেয়ে নিয়েছে সে মিচেলের কাছে থেকে।

এর ভেতর খুঁজে বার করতেই হবে তাঁকে।

তাঁকে খোঁজবার জন্য—তাঁর দেখা পাবার জন্য কদিন থেকে সে বার বার জীবন বিপন্ন করছে। তার কাজ এখানে নয়, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে অনেক নিরাপদে তার থাকবার কথা। তবু সে ইচ্ছা করেই বার বার সামনে আসছে, সৈন্যব্যূহের মধ্যে মাথা গলাচ্ছে।

অসুখের পর ভাল করে জ্ঞান হওয়ার সময় থেকেই সে তাঁর খোঁজ করছে। কানপুর ত্যাগের আগে যতটা সম্ভব ঘুরে ঘুরে খবর নিয়েছে। কেউই বলতে পারে নি—জীবিত কি মৃত তিনি তাও জানতে পারত না, যদি না দৈবাৎ নানক-চাঁদজীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। তিনিও প্রথমটা ভাঙতে চান নি—শেষে কী ভেবে, হয়তো ওর রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে দয়াপরবশ হয়েই খবর দিয়েছিলেন, 'হুসেনী বেগম লক্ষ্ণৌতে আছে, সেখানে সে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে মিলে নিজেই যুদ্ধ-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। শুনছি বন্দুক ঘাড়ে করে সিপাইদের সঙ্গে সে-ও প্যারেড করতে শিখছে—'

এই বলে একটু হেসে বলেছিলেন, 'যদি তাকে চাও তো সোজা লক্ষ্ণৌ চলে যাও, সিপাহীদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়ে পড়—আর যদি জানটা বাঁচাতে চাও তো আংরেজদের ছেড়ো না। ভাল করে ভেবেচিন্তে কাজ ক'র।'

শুধু নিজের কথা হলে হয়তো জানের পরোয়া করত না—ভিড়েই পড়ত সিপাহীদের সঙ্গে, কিন্তু দেশে তার বিধবা মা তার মুখ চেয়েই দিন গুনছেন, সে ছাড়া তাঁর আর কোথাও কেউ নেই, কোন আশা বা আশ্বাস নেই। অনেক কষ্টে তাকে মানুষ করে তুলেছেন তিনি—শেষ জীবনে একটু সুখ, একটু আশ্রয় পাবার আশায়। জেনেশুনে ইচ্ছা করে সর্বনাশের মুখে এগিয়ে যাবার তার অধিকার নেই।

সুতরাং তখন লক্ষ্ণৌএর দিকে যেতে পারে নি। ইংরেজ কর্নেলের চিঠি নিয়ে উলটো দিকেই আসতে হয়েছিল। কিন্তু হুসেনী বেগমের চিন্তা সে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে নি। সব কাজের মধ্যে, মনের সব ভাবনার সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল তাঁর কথাটা। আর একবার তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর সঙ্গে দুটো কথা কইবার জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করত। এবার তাঁর

দেখা পেলে তাঁকে আর একবার বুঝিয়ে বলবে সে, আর একবার এই সাংঘাতিক পথ থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করবে। যদি না পারে তাঁকে চোখে চোখে রাখবে—সাধ্যমত তাঁর পথের কাঁটা দূর করবে। তাঁকে নিরাপদে রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবে। আর যদি—যদি এমন কোন মুহূর্ত আসে যে নিজের জীবন ও তাঁর জীবনের মধ্যে যে কোন একটার কথা ভাবতে হয় তো তাঁরই জীবনের কথা ভাববে, নিজের জীবন দিয়ে জীবনের ঋণ শোধ করবে। তখন আর মায়ের কথাও ভাববে না সে। এ জীবন যিনি রক্ষা করেছেন বার বার—তাঁর জন্য এ জীবন উৎসর্গ করতে সে ন্যায়ত ধর্মত বাধ্য, মাকে তাঁর ইষ্টদেবী মা কালীই রক্ষা করবেন।

কিন্তু নানকচাঁদের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে আর কোন সংবাদই পায় নি সে। পথে বহু লোককেই জিজ্ঞাসা করেছে—কেউই ঠিক খবরটি দিতে পারে নি। এক-এক জন এক-এক রকম বলেছে। কেউ বলেছে হুসেনী বেগম দিল্লীতে গেছে—কেউ বলেছে এখনও পর্যন্ত নানাসাহেবের সঙ্গেই আছে সে—কেউ বলেছে সাহেবদের হাতে ধরা পড়ে তার ফাঁসি হয়েছে।

এই সব পরস্পরবিরোধী সংবাদে তার মনটা যে এক-এক সময় ভেঙে পড়ত না তা নয়, কিন্তু আবার পরক্ষণেই সে জোর করে মনে ভরসা আনত। বাবু নানকচাঁদ পাকা লোক, খবর রাখাই তাঁর একরকম পেশা—তিনি যা বলেছেন সেইটেই ঠিক।

হুসেনী বেগম লক্ষ্মৌতেই আছেন নিশ্চয়।

আর, থাকাই তো সম্ভব। এ ভাগ্য-পরীক্ষা থেকে—নিজেরই আয়োজিত এই মহা-আহব থেকে দূরে থাকতে তিনি পারেন না।...

এই আশ্বাস মনে মনে জপ করতে করতেই সে কটা দিন এসেছে। তার ফলে যতই সে এ শহরের কাছাকাছি এসেছে ততই তার উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা বেড়েছে। আর গত দু দিন—শহরের উপকণ্ঠে পেঁছে তো তার দিনের আহার এবং রাত্রের নিদ্রা দুই-ই ঘুচে গেছে। আশা ও আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে না পারছে সে কোন কাজ ঠিক-মত করতে, না পারছে একটু স্থির হয়ে বসতে বা বিশ্রাম করতে।

এই শহরেই আছেন তিনি—হয়তো তাদের খুব কাছেই আছেন।

হয়তো—ঐ যারা সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে—তাদের পাশেই আছেন, কে জানে হয়তো বা তিনিও ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ছেন।

তবু দেখা করবার উপায় নেই, কাছে যেতে পারছে না সে।

তাঁর আর ওর মধ্যে আজ বলতে গেলে মৃত্যুর ব্যবধান।

এপারে সে, ওপারে তিনি। মাঝে সর্বাত্মক বৈরিতার দুস্তর নদী। জীবন পণ না করলে ওপারে পেঁছানো যাবে না—হয়তো করলেও যাবে না। সে চেষ্টায় জীবনটাই যাবে শুধু, জীবনদায়িনীর কাছে পেঁছতে পারবে না শেষ পর্যন্ত।

তবে কি সে আর কোনদিনই তাঁর দেখা পাবে না?

তাঁকে এই ধ্বংসের মুখ থেকে, সর্বনাশের মুখ থেকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাও করতে পারবে না? এই চরম বিপদের দিনে তাঁর কোন কাজেই সে লাগতে পারবে না?

অবশেষে আজ সন্ধ্যায়—আজকের সারাদিনব্যাপী এই ভয়াবহ ও বিপুল

রক্তক্ষয়ী প্রচণ্ড সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করবার পর—তার মনের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা আর এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এই যে হাজার হাজার শত্রুর শবদেহ ছড়িয়ে পড়ে আছে চারিদিকে—এর মধ্যে, এদের মধ্যে কোন পুরুষবেশিনী নারীর দেহ নেই তো!

কথাটা ভাল করে ভাবেও নি সে—আশঙ্কাটা মনের মধ্যে কোন স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করার আগেই তার বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে এসেছে, উত্তাল বক্ষ-স্পন্দনের শব্দ বাইরে থেকেই শুনতে পেয়েছে সে। জোর করে সে মনে অন্য চিন্তা এনেছে, বিনা প্রয়োজনে চেঁচিয়ে কথা বলে—অকারণে ছুটোছুটি করে কথাটা ভুলতে চেষ্টা করেছে—কিন্তু কোনটাই পারে নি। শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, মনে মনে স্বীকার করতে হয়েছে যে—চিন্তাটা মন থেকে কখনই তাড়াতে পারে নি সে—সেখানকার কপাট বন্ধ করেছে—কিন্তু তার ফলে কপাটের বাইরে সে-ই থেকেছে, আশঙ্কাটা নয়। সেটা কখন মনের মধ্যে মূলে বিস্তার করে পল্লবিত হয়ে উঠেছে।

কতকটা সেই আশঙ্কাই আজ সারাদিনের উদ্বেগ ও পরিশ্রমের পরেও তাকে তাঁবুর মধ্যে স্থির থাকতে দেয় নি—টেনে এনেছে সহস্র-শব-বিকীর্ণ এই শ্মশান-ভূমিতে। কেন এসেছে—এই অন্ধকারে এত মৃতদেহের মধ্যে বিশেষ একটি দেহ খুঁজে বেড়ানো সম্ভব কিনা—অথবা সবগুলো দেখার সময় পাবে কি না রাত্রের মধ্যে—এসব কোন কথাই সে ভাবে নি। শুধু মনের একটা প্রবল আবেগেই ছুটে চলে এসেছে।

কিন্তু এখানে, শাহ্‌নজফের প্রাঙ্গণে পা দেওয়া মাত্র সব যেন ওলটপালট হয়ে গেছে—সে আবেগ নতুন এক ধাক্কা খেয়েছে। শবদেহ খুঁজে বেড়ানোর আর প্রয়োজন হয় নি—জীবিতাকেই দেখতে পেয়েছে। বোধ করি তার আন্তরিক আকুলতাই দৈবকে স্থির থাকতে দেয় নি—তার ইচ্ছাশক্তির সাধনাই সিদ্ধিকে টেনে এনেছে। বিলি মিচেল দেখতে পাবার বহু আগেই তার নজরে পড়েছে—বহু দূরে, একেবারে দৃষ্টিরেখার শেষ সীমায়, মায়াবিনী ছায়ারূপিণী এক নারীমূর্তি।

হোক জমাট গাঢ় অন্ধকার, থাক্ দূরত্বের ব্যবধান—তবু সে গতি, সে দেহছন্দ, সে গঠনসুষমা তার ভুল হবার কথা নয়—দেখেই চিনেছে। ঐ লঘুসঞ্চারিণী নারী আর কেউ নয়—হুসেনী বেগম!

হয়তো তখনই ছুটে কাছে যেত সে—প্রথম ঝোঁকে সে পা উঠিয়েও ছিল সেই ভাবে—কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর বিপদাশঙ্কার কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় নিজের আবেগকে দমন করলে।

সান্ত্রীরা কেউ না কেউ জেগে আছে, পাহারা দিচ্ছে। কাছেই আছে হয়তো। সে দৌড়ুলেই তাদের নজরে পড়বে এবং নজরটা সেইখানেই আবদ্ধ থাকবে না। সেক্ষেত্রে যে অবস্থা হবে, চারিদিকে যে শোরগোল হৈচৈ পড়ে যাবে, তা হীরালাল বিলক্ষণ অনুমান করতে পারে। তখন সেই সদ্য-জাগ্রত এতগুলি প্রতিহিংসাতুর দৃষ্টির সামনে থেকে হুসেনী পালাতে পারবে না। আর বিবিঘর হত্যাকাণ্ডের নায়িকা ইংরেজের হাতে ধরা পড়লে কী হবে তাও সে জানে।

না। ছুটে কাছে যাওয়া বা অন্য উপায়ে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব নয়। এখানে দেখা করা বা কথা কওয়া কোনটাই উচিত হবে না। কিন্তু

সে কাছে না গেলেও—যদি এমনিই আর কারুর নজরে পড়েন উনি ?

কথাটা মনে হওয়া মাত্র সেই শীতের রাত্রেই নিমেষে ঘেমে উঠল হীরালাল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল তার সামনে—সামান্য দূরে বিলি মিচেল। আর একটু লক্ষ্য করে দেখার পর বুঝতে পারল সে ছায়ামূর্তি মিচেলের নজরে পড়েছে এবং সে-ও ওরই মত নিঃশব্দে সতর্কতার সঙ্গে সেই গোপনচারিণীকে ধরবার চেষ্টায় পিছু পিছু চলেছে।

অর্থাৎ আজ আর হুসেনী বেগমের রক্ষা নেই!

এখনও সাড়াশব্দ করে নি বিলি, তার কারণ হয়তো এখনও একা ধরবার আশা ছাড়ে নি সে, বাহাদুরিটা নিজে নিজেই রাখতে চায়—কিন্তু শেষ অবধি একেবারে নাগালের বাইরে যেতে দেখলেও কি আর চুপ করে থাকবে?

আশঙ্কা এবং আতঙ্কেরও বুঝি একটা সীমা আছে—সেই সীমায় পেঁছে গেলে ও দুটোই কেটে যায়—সে জায়গায় আসে সাহস। মরীয়া সাহস।

সহসা সেই সাহসই পেয়ে বসল হীরালালকে। দুর্জয় এক সংকল্পে ওর ওষ্ঠদুটি দৃঢ়সংবদ্ধ হল। সে নিজের মন স্থির করে ফেললে—প্রাণ দেওয়ার এই-ই সুবর্ণসুযোগ, প্রাণ দিয়েই ওঁর প্রাণ রক্ষা করবে সে। প্রয়োজন হলে বিলির প্রাণ নিতেও ইতস্তত করবে না।

বন্ধু-হত্যার পাপ! সে প্রায়শ্চিত্তের বহু সময় থাকবে।...

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে হল না।

বিলির হাতে আলো ছিল, তাই তার দৃষ্টি ছিল সীমিত—সে লক্ষ্য করে নি, কবরঘরের দোর পর্যন্ত গিয়েই কখন আবার বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেই ছায়ারূপিণী নারী ওপাশে সরে গেছে, দেওয়ালের ছায়ায় গিয়ে পড়ছে—সে ভেবেছে তার অগ্রবর্তিনী নীচের ঐ বড় ঘরটাতেই বুঝি ঢুকে পড়েছে, অন্ধকারের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

বিলি ভুল দেখলেও হীরালাল দেখে নি।

সে ঠিকই দেখেছে—শুধু এই ঘটনাই নয়, ঘটনার কারণটাও।

প্রহেলিকা আর তার কাছে প্রহেলিকা থাকে নি।

আমিনা অকারণে জীবন বিপন্ন করে এই শত্রুপুরীতে ঢোকে নি! বৃহত্তর কোন সর্বনাশেরই আয়োজনে এসেছে!

এ যাওয়া পালানো নয়—লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বিলিকে সে ইচ্ছে করেই দেখা দিয়েছে, জেনেশুনে চোখে পড়ে অদৃশ্য একটা রহস্যের সুতোয় বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে।

কেন? ঐ কবরখানাতে বিলিকে নিয়ে যেতে চায় কেন সে? ওখানেই কি আছে সর্বনাশের কোন ফাঁদ পাতা? সেই ফাঁদে ফেলবার জন্যই কি বিলিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে?

হীরালাল জুতোটা খুলে ফেলেই দ্রুতগতিতে বিলির কাছে এসে পড়ল—কিন্তু বিলিকে জানতে দিল না। সে তার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরে ঢুকল—একই সঙ্গে চেয়ে দেখল ভেতরের দিকে। তবে বিলি খুঁজছিল মানুষ, তার দৃষ্টি তাই মাটির দিকে পড়ে নি—কোণে কোণে ঘুরছিল! কিন্তু হীরালাল প্রথমেই দেখেছে—কবরবেদীর ওপাশে সার সার পিপে—আর তার পরই নজরে পড়েছে বিলি মিচেলের পায়ের তলায় ধুলোর মত স্তূপাকার পদার্থটা।

এসব কয়েক মুহূর্তের কথা, বরং বলা যায় কয়েকটি পলকের।

অবসরও ছিল না আর কয়েক মুহূর্তের বেশি চিন্তা বা কল্পনা করার—সেই অত্যন্ত মূল্যবান কটি মুহূর্তেরও চার-পাঁচটি কেটে গেল জিনিসটা কি অনুমান করতে।

তার পরই মাথাতে খেলে গেল—বিদ্যুৎবিকাশের মত।

বারুদ—স্তূপাকার বারুদ—একটা বড় কিল্লা উড়িয়ে দেবার মতই যথেষ্ট। হুসেনী জানে যে এখানে এই বারুদ আছে—তাই এসেছিল সম্ভবত নিজেই আগুন লাগিয়ে এই বাহিনীকে, তার সঙ্গে নিজেকেও নিশ্চিহ্ন করতে—সে প্রয়োজনের কাছে শাহনজফ বা কদম রসুলের ইমারত কত তুচ্ছ! কিন্তু আলো হাতে মিচেলকে দেখা মাত্র অন্য চিন্তা তার মাথায় খেলেছে, ওকে দিয়েই ওদের মারবার মধ্যে প্রতিহিংসার সাধারণ আনন্দ ছাড়াও বেশী কিছু আছে—আছে মারাত্মক কৌতুক। আর আছে নিজের নিরাপত্তার প্রশ্ন। তাই মায়াকুরঙ্গীর মতই লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছে সে বিলিকে—

এক লহমার বেশি এসব ভাববার সময় পায় নি হীরালাল—কেননা ততক্ষণে পায়ের নীচের ধুলোটা অনুভব করে আলোটা নামাতে শুরু করেছে বিলি।

সাবধান করার সময় নেই—বোঝাবার তো নয়ই—তাই একমাত্র যা করা যেতে পারত হীরালাল তাই করল—হাত দিয়ে জ্বলন্ত শিখাটা চেপে ধরল।

॥ ৬৭ ॥

এই পাঁচিলের ওপারে আছে সমস্যার সমাধান, আগ্রহের সমাপ্তি—আছে বহু প্রশ্নের উত্তর। অথবা আছে মৃত্যু,—আশা-আকাঙ্ক্ষা-সম্ভাবনা-ভরা এক তরুণ জীবনের অকাল অবসান।

কে জানে কী আছে!

তবু ইতস্তত করার সময় নেই। সময় মাত্র ওর হাতে আধ ঘণ্টা। তারও অনেকখানি কেটে গেছে ইতিমধ্যে।

হীরালাল মনে মনে একবার মাকে আর মা কালীকে স্মরণ করল, তার পরই সেই রন্ধ্রপথ দিয়ে বাইরের গাঢ় অন্ধকারে পা বাড়াল।

পাঁচিলের প্রায় গা থেকেই কঙ্করময় ঢালু জমি নেমে গেছে নালার দিকে। সে জমিতে ঘাস নেই, এমন সময় থাকার কথাও নয়—শুধু দূর্বাঘাসের শুকনো মূলগুলো মাত্র আছে, তাতে পা আটকায় না। আর আছে কতকগুলো নীচু নীচু কাঁটা-ঝোপ, সেখানে পড়লে আরও বিপদ।

সামান্য একটু দাঁড়াতেই অন্ধকারে চোখটা অভ্যস্ত হয়ে গেল—চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সে। এদিকটা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, জনমানবহীন। কিন্তু হীরালাল জানে—এ স্তব্ধতার কোন মূল্য নেই। হয়তো কাছেই লোক আছে, অন্তত কদম রসুলে যে আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তারা তাকে ঠিকই দেখছে! আর না দেখলেও—এখনই, একটু অসতর্ক হলেই তার অস্তিত্ব টের পাবে। সেক্ষেত্রে—

কিন্তু এ সব চিন্তা অনাবশ্যক। এখন প্রশ্ন—কোথায় যাবে সে?

এদিকে সিপাহীদের ঘাঁটি বলতে কদম রসুলে। কিন্তু সেখানে ঢোকবার

এদিক দিয়ে কোন পথ নেই। নিরন্ধ্র পাঁচিল। সুতরাং হীরালাল মনে মনে দ্রুত হিসেব করে নিল, এখান থেকে নেমে নালার পথ ধরে নদীর দিকে পেঁছে ওদিকের ফটক দিয়ে কদম রসুলে পড়াই সুবিধা। সে-ও সেই পথেই চলল।

কিন্তু অন্ধকারে নামতে গিয়ে প্রথম পদক্ষেপেই ওর পা পিছলে গেল। পড়েই যেত গড়িয়ে—কারণ আশেপাশে সামলে নেবার মত কিছু নেই—যদি না ঠিক সেই মুহূর্তে একখানি অদৃশ্য কোমল হাত ওর বাঁ হাতের কনুইএর কাছটা ধরে টেনে নিত।

'আস্তে বাবুজী, আস্তে। এ সব পথ তোমাদের মত সুখী বাবুদের জন্যে নয়!'

অভ্যস্ত বিদ্রূপের ভঙ্গি, চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর।

কিন্তু তাইতেই হীরালালের বুকের রক্ত যেন চলকে উঠল, হৃৎপিণ্ডটা উঠল লাফিয়ে। সমস্ত স্নায়ুগুলো যেন নিমেষে অবশ হয়ে এল।

যে ধরেছিল, সে ছাড়ে নি। বরং বেশ শক্ত করেই ধরে ওকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে নিয়ে দাঁড় করিয়ে পুনশ্চ বলল, 'তুমি কি আমাকেই খুঁজছিলে বাবুজী?'

এবার হীরালাল কথা কইল। কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'ভালই হয়েছে তা হলে, দেখা হয়ে গেছে। এখানেই একটু ব'স বরং—তোমার পা কাঁপছে।'

এ বিষয়ে আর দ্বিরুক্তির প্রয়োজন ছিল না, সত্যিই তখন হীরালালের দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। সে পাঁচিলের গা ঘেঁষে অপ্রশস্ত সেই সামান্য জায়গাটুকুতেই বসে পড়ল।

আমিনাও ওর পাশে বসল। একেবারে কাছে। তার পর মুহূর্তকাল নীরব থেকে ওর অবশ শিথিল ডান হাতখানার ওপর আলতো ভাবে নিজের একটা হাত রেখে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলল, 'কেমন আছ বাবুজী?'

হীরালাল সে কথার উত্তর দিল না।

এই প্রচণ্ড শীতের রাতেও ওর ললাটে ঘাম দেখা দিয়েছে। সরকারী গরম জামার ভেতরে সাদা বেনিয়ানটা জড়িয়ে গেছে গায়ের সঙ্গে। সে বাঁ হাতটা তুলে জামার হাতায় কপালটা মুছে নিয়ে কেমন একরকম আলগা ভাবে বলল, 'আপনি আরও একবার আমায় বাঁচালেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু—' এবার যেন একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলে আমিনা, 'কিন্তু তুমি এসব বিপদের মধ্যে আসতেই বা যাও কেন? তোমাকে বার বার সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি কথা শোন না কেন? একটা সাধারণ বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করারও তো তোমার শক্তি নেই। এখনই তো গড়িয়ে পড়তে নীচে—হাত-পা তো ভাঙতই, সেই শব্দে ওখানকার সিপাইরাই টের পেলে জানটাও বাঁচত না। আজ আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে তার পর কারুর কোন অনুরোধেই ইংরেজের চাকরকে হাতে পেয়ে ওরা ছেড়ে দিত না।...কেন এ কাজ করতে যাচ্ছিলে বল তো?'

'আপনাকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম। আপনি যে এই পথেই—'

'দেখতে পেয়েছিলে তা জানি। তাই আমার কাজটি পণ্ড করলে! কেন, আমার সঙ্গে দেখা করে তোমার লাভ কী? শুধু শুধু বিপদের মধ্যে পড়া বৈ তো নয়। তুমি কেন আমার কথা শুনছ না বলতে পার হীরালাল, বার বার

সাবধান করা সত্ত্বেও এসব পাগলামি কেন করছ? আমাকে ছাড়, আমাকে না ছাড়লে তোমার মঙ্গল নেই।' স্নেহময়ী জ্যেষ্ঠার মতই উদ্বেগ ফুটে ওঠে আমিনার আপাত-কঠোর তিরস্কারে।

হীরালাল কি আমিনার কণ্ঠস্বরে প্রশ্রয় পায় কিছু? সে বেশ একটু জোর দিয়েই বলে, 'তা হলে আপনিও ছাড়ুন এই সব!'

'কী সব?' বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে আমিনা।

'এই সব বীভৎস কাজ। এ পথ আপনি ছেড়ে দিন—এই ধ্বংসের পথ, মৃত্যুর পথ, অকল্যাণের পথ। একটু আগেই কী সর্বনাশ আপনি করতে গিয়েছিলেন বলুন তো!' হীরালাল অনেক চেষ্টায় যেন খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে—নিজের হাত উলটে আমিনার হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে, 'যুদ্ধের কথা আলাদা, কিন্তু এই ঘুমন্ত মানুষগুলোকে মারা —এ তো হত্যারই নামান্তর। আমি না দেখতে পেলে ওদের একজনও বাঁচত না। এতগুলো মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী হতেন আপনি। ওদের সঙ্গে আপনি আমি—সবাই যেতুম। হয়তো সামনের এই সিপাইগুলোও বাঁচত না।' সে কদম রসুলের দিকটা দেখিয়ে দেয়।

'না-ই বাঁচত!' যেন চাপা গর্জন করে ওঠে আমিনা, 'এর সিকির সিকি দুশমন মারবার জন্যে আজ সারাদিনে অন্তত তিন-চার হাজার সিপাইএর প্রাণ গেছে।…তার জায়গায় এই কটা প্রাণের মূল্য কি? আমি তো জেনেশুনেই গিয়েছিলাম।…আর তুমি? তোমারও মরাই উচিত ছিল। তোমার তো এখানে থাকার কথা নয়, তোমার ছাউনি তো অনেক পেছনে। কেন এর ভেতর এই এতিমখানাতে এসেছিলে তুমি? কেন আস?'

ক্রমশ ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে আমিনা। যেন হাঁপাতে থাকে সে কথাগুলো বলতে বলতে।

কিন্তু হীরালাল ভয় পায় না। বলে, 'আপনার কথা ভেবেই আমি যে স্থির থাকতে পারি না বেগমসাহেবা, আপনারি খোঁজেই আমি এসেছিলাম এখানে। এতে যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে—মাপ করবেন।'

'আমার খোঁজে?' চমকে ওঠে আমিনা, শেষের কথাগুলো তার কানেও যায় না, 'কেমন করে জানলে আমি এখানে থাকব?'

'তা নয়।' একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে হীরালাল, 'কদিন কেবলই মনে হচ্ছে, আপনি এখানে আছেন। আর যদি থাকেন—যুদ্ধের জায়গা থেকে দূরে থাকতে আপনি পারবেন না, কাছেই থাকবেন, এদের সঙ্গেই থাকবেন।… আজ এখন—' বলতে বলতে সহজ করার চেষ্টা সত্ত্বেও গলা কেঁপে যায় হীরালালের, 'সন্ধ্যের এই লড়াইএর পর কে জানে কেন, কেবলই ভয় হচ্ছিল যে, হয়তো—হয়তো আপনিও ছিলেন এখানে—'

'ও, ভেবেছিলে মরে গেছি! তাই মড়ার গাদার মধ্যে খুঁজতে এসেছিলে! কিন্তু সেইটেই বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকতে পার নি কেন হীরালাল? কেন আবার খুঁজতে এসেছিলে?…ইস! সব ঠিক ছিল, আমার হিসেবে কোথাও এতটুকু ভুল হত না—শুধু যদি তুমি না এসে পড়তে!…কেন এলে তুমি বাবুজী—কেন এলে? এলে তো চুপ করে মরতে পারলে না? কী ক্ষতি হত তুমি মারা গেলে? কেন আমার সব আয়োজন পণ্ড করলে? কেন, কেন?'

নির্মম কথাগুলো যেন বুকে দাগ কেটে কেটে বসে। অকস্মাৎ চোখে জল এসে যায় হীরালালের। নিরুদ্ধ অভিমানে গলার স্বরও ফোটে না ভাল করে। অনেক চেষ্টায় বলে, 'আমি সহজেই মরতে পারতাম বেগম-সাহেবা, আপনাকে সুখী করতে। আমি এখনও মরতে পারি। আমার রক্তে যদি আপনার রুধিরতৃষা মেটে তো এখনই হাসতে হাসতে সে রক্ত আপনাকে উপহার দিচ্ছি। কিন্তু এতগুলো মানুষকে খুন করার পাপে আপনাকে জড়াতে আমি দেব না। আমার সাধ্য থাকতে, আমার সামনে আপনাকে কোন অন্যায়ই করতে দেব না। এই লোকগুলো ব্যক্তিগতভাবে আপনার কোন অনিষ্টই তো করে নি, কোন দোষে দোষী নয় তো আপনার কাছে—তবে এদের আপনি কেন মারছিলেন? শুধু শুধু নরহত্যার পাতকী হতে যাচ্ছিলেন কেন?'

'এদের জন্যে তোমার বড় দরদ বাবুসাহেব! কিন্তু এরা কি করছে সে খবরটা রেখেছ? এরা বিনা দোষে হাজার হাজার লোক মারছে না? যে সব লোক প্রত্যহ এদের ফাঁসিকাঠে, এদের গুলিতে প্রাণ দিচ্ছে, এদের কোড়ায় জর্জরিত হচ্ছে—তার আগে তারা কী অনিষ্ট করেছিল এদের? সিপাইদের অপরাধে নিরীহ চাষীদের ওপর এ অকথ্য নির্যাতন কেন? কানপুরে কী হয়েছে তার খবর রাখ বাবুজী? একেবারে নির্দোষ লোকগুলোকে ধরে ফাঁসি দিয়েছে, কিন্তু তাতেও ওদের তৃপ্তি হয় নি—শুধু মরেও অব্যাহতি পায় নি বেচারীরা—মরার আগে প্রত্যেককে বিবিঘরের জমাটবাঁধা শুকনো রক্ত জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করতে হয়েছে। কোড়ার চোটে এই অমানুষিক কাজ করিয়েছে ওরা—যে ইতস্তত করেছে তারই পিঠের চামড়া গেছে। এর পরেও কি ওদের মানুষ হিসেবে দেখতে বল তুমি?'

আমিনা আরও কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে হীরালাল আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু তাদের কি খুব দোষ দেওয়া যায় বেগমসাহেবা? বিবিঘরে যা হয়েছে তার পর সেই হতভাগিনীদের স্বজাতীয়রা যদি মাথার ঠিক রাখতে না পেরে এ কাজ করেই থাকে—খুব বেশী অপরাধী কি তাদের করতে পারেন?'

এই বোধ হয় প্রথম আমিনা নিরুত্তর রইল। এই প্রথম যেন সে কোন জবাব খুঁজে পেল না। হীরালাল অনুভব করল ওর হাতের মধ্যে তার হাতখানা শিউরে কেঁপে উঠল একবার।

হীরালাল সভয়ে সসঙ্কোচে সে হাতে একটু চাপ দিয়ে বলল, 'দোহাই আপনার—আমার মিনতি শুনুন। যা হবার হয়ে গেছে, আর এর মধ্যে আপনি নিজেকে জড়াবেন না। আপনি এ থেকে সরে যান।'

হয়তো হীরালালের কণ্ঠে সেই মুহূর্তে ঠিক আকুতিটি ফুটেছিল, হয়তো সেই নিশীথ অন্ধকারে তার মনের চেহারাটা, তার আন্তরিকতাটা যথার্থ ধরা পড়েছিল—কিছুক্ষণের জন্য কেমন বিহ্বল হয়ে গেল আমিনা। চুপ করে বসে রইল সে, পাষাণ-প্রতিমার মতই নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে। তার পর স্খলিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি বাবুজী, আমার পক্ষে এখন আর ফেরবার বা বাঁচবার কোনও পথ কোথাও খোলা নেই। আমার সব কথা তুমি জান না, আজ আর জানাবার সময়ও নেই। জানলে হয়তো বুঝতে পারতে কেন আমি এই সর্বনাশের নেশায় এমন করে মেতে উঠেছি। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। শুধু এইটুকুই জেনে রাখ—এখন মৃত্যুর পথই আমার একমাত্র পথ।...আমাকে তুমি ছেড়ে দাও, ধরে নাও সত্যিই

আমি মরে গেছি। আমার কথা ভেবে তুমি আর নিজের জীবনে দুঃখ-দুর্গতি ডেকে এনো না।'

এর উত্তর দিতে গিয়ে হীরালালের গলা কেঁপে গেল। সে দু হাতে ওর দুটো হাত চেপে ধরে পাগলের মত বলে উঠল, 'তা হয় না বেগমসাহেবা, তা হয় না। আমি মার মুখে বহু বার শুনেছি এমন কোন কুকর্ম, এমন কোন পাপ মানুষ করতে পারে না—যা থেকে ফেরবার, যার জন্য অনুতপ্ত হবার বা প্রায়শ্চিত্ত করবার উপায় তার না থাকে।...এখনও দীর্ঘ জীবন আপনার সামনে পড়ে আছে, এখনও সময় আছে সে জীবনকে সার্থক করে তোলবার। কেন এমন করে শুধু শুধু মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন?'

'কিন্তু বেঁচেই বা আমার লাভ কী? জীবনের উদ্দেশ্য গেছে ফুরিয়ে। বাঁচবার আর ইচ্ছেও আমার নেই বাবুজী।'

'কে বললে লাভ নেই বেগমসাহেবা, কে বললে উদ্দেশ্য গেছে শেষ হয়ে? এখনও সময় আছে, এখনও হয়তো চেষ্টা করলে পারেন নতুন করে বাঁচতে, জীবনের নতুন অর্থ নতুন উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে।...চলুন আজই আমরা কোন দূর দেশে চলে যাই,—বহু দূরে, এসবের বাইরে কোন সুদূর নিরাপদ স্থানে—যেখানে এই মালিন্য, এই জ্বালা আপনাকে স্পর্শ করবে না—আবার আপনি মনের শান্তি খুঁজে পাবেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবেন।'

আমিনা যেন কেমন অবাক হয়ে যায়। সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে বলে, 'তুমি—তুমি আমার সঙ্গে যাবে বাবুজী? আমাকে নিয়ে যাবে? সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ বেগম সাহেবা, আমি যাব—এই মুহূর্তে, এখনই। কোন দিকে তাকাব না, কিছু ভাবব না। আপনি যাতে শান্তি পান, আপনি নিশ্চিন্ত নিরাপদ হতে পারেন—তার জন্য এখনই আমি সব ছেড়ে দিতে রাজী আছি।'

তবু যেন কথাটা বিশ্বাস হয় না আমিনার। বোধ করি এতখানি আশা করতে তার সাহসেও কুলোয় না। সে ছেলেমানুষের মতই ব্যাকুল ভাবে উপর্যুপরি প্রশ্ন করতে থাকে—'তুমি যাবে? সত্যিই যাবে? আমাকে নিয়ে যাবে?...সেখানে আমাকে কী দেবে তুমি? কতটুকু দিতে পারবে? বল বল বাবুজী—আমার পুড়ে যাওয়া, ছাই হয়ে যাওয়া জীবনের কতটুকু ফিরিয়ে দিতে পারবে?'

'আমি তোমাকে সব দেব বেগমসাহেবা। আমার যা কিছু আছে সব দেব।'

'ইজ্জৎ? ইজ্জৎ দিতে পারবে?' রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে আমিনা।

'তার চেয়েও বেশি দেব। আমার ধর্ম, আমার ইহকাল পরকাল—সব দেব। ঘর দেব, পদবী দেব—আমি, আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

ঝোঁকের মাথায় পাগলের মত বলতে থাকে হীরালাল। হয়তো কী বলছে, কতটা বলছে, তা সেও বোঝে না। কিংবা হয়তো মনের অবচেতনে যা ছিল সুপ্ত, যার দিকে সে জোর করে পিছন ফিরে ছিল এতকাল—সেই সত্যই এখন আপনার নিরুদ্ধ বেগে বেরিয়ে আসছে—তাকে রোধ করা ওর নিজেরও সাধ্যের অতীত।

'বিয়ে করবে! আমাকে বিয়ে করবে! বাবুজী, এ কি সত্যি? তুমি,—তুমি আমাকে এত ভালবাস?' চুপিচুপি প্রশ্ন করে আমিনা। যেন সে-প্রশ্ন সে নিজেকেই করছে।

'হ্যাঁ।' চুপিচুপিই উত্তর দেয় হীরালাল। কথা কইতে গিয়ে ওর কণ্ঠস্বর ভাবাবেগে বিকৃত হয়ে যায়, মুখের স্নায়ু ও পেশী পড়ে এলিয়ে—আল্‌গো আল্‌গো কথাগুলো বেরিয়ে আসে, তবু বলে, 'হ্যাঁ। তোমাকে আমি ভালবাসি। এ জীবনে এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলের চেয়ে ভালবাসি। চল, আমরা এখনই রওনা হই, এখনই পালিয়ে যাই চল।'

'কোথায় যাব? কী করব সেখানে গিয়ে?'

'কোন দূরে গ্রামে চলে যাব। সেখানে কেউ আমাদের খোঁজ পাবে না। সেখানে গিয়ে আমরা নতুন করে ঘর বাঁধব। আমি চাষ করব, মজুরি করব—তোমার সেবা করব। তোমাকে কিছুই করতে হবে না—তুমি শুধু শান্ত হবে, নিরাপদ হবে, সুখী হবে—সংসারের একটা কাঁটাও তোমার পায়ে বিঁধবে না—শুধু এই।...চল, এখনই যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

হীরালাল অধীর আগ্রহে ওর দুটো বাহুমূল ধরে তুলতে চেষ্টা করে। আমিনা কিন্তু ওঠে না। আপন মনেই হেসে ওঠে সে—ছেলেমানুষের মত হাসি। তৃপ্তির হাসি, সুখের হাসি।

তার পরই অকস্মাৎ দু হাতে নিবিড় ভাবে হীরালালের গলা জড়িয়ে ধরে। ওর কানের কাছে মুখটা এনে অস্ফুট বিহ্বল কণ্ঠে বলে, 'তুমি আমাকে এত ভালবাস! এত ভালবাস হীরালাল? কৈ এতদিন তো বল নি? আমাকে দেবী বলেছ, কিন্তু এমন ভালবাস—আমাকে বিয়ে করতে চাও, একথা তো বল নি? বড় যে দেরি হয়ে গেল বাবুজী, বড্ড দেরি হয়ে গেল!'

তার পর মুখটা তুলে অন্ধকারেই হীরালালের মুখখানা দেখতে চেষ্টা করে সে, খুব চুপিচুপি ফিসফিস করে বলে, 'আমিও তোমাকে ভালবাসি বাবুজী, এতটা যে ভালবাসি তা আগে বুঝি নি, এখন বুঝতে পারছি—আমিও হয়তো তোমার মতই ভালবাসি।...কেন আমাকে এতদিন বুঝতে দাও নি—কেন এমন করে বুঝিয়ে দাও নি? হয়তো তা হলে সত্যিই ফিরতে পারতুম—মৃত্যুর সাগর পেরিয়ে আবার একদিন জীবনের কূলে ভেড়াতে পারতুম নিজের ভাগ্যের এই নৌকাখানা! আজ—আজ যে বড্ডই দেরি হয়ে গেছে বাবুজী!'

আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল সে হীরালালকে, আরও জোরে চেপে ধরল নিজের মাথাটা ওর বুকে। থর থর করে কাঁপছে সে, বসন্তের নতুন বাতাস লাগা শুষ্কপত্রের মত কাঁপছে। তার বুঝি তখন স্বজন-পরিত্যক্ত পথহারা ভীত শিশুর মতই অবস্থা। যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী প্রতিহিংসাময়ী নারী সর্বপ্রযত্নে এই দিগ্‌দাহকারী বহ্নিকাণ্ডের আয়োজন করেছিল—এ যেন সে নয়, এ যেন আর কেউ। হীরালালের জীবনদাত্রী, অলৌকিক মনীষা ও প্রতিভার অধিকারিণী অসীম প্রতিপত্তিশালিনী দেবী আজ যেন সংসারের সকল পথ থেকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হয়ে ফিরে এসে একমাত্র তারই তরুণ বুকে এতটুকু আশ্রয় প্রার্থনা করছে।

কেঁপে উঠল হীরালালও। কিন্তু সবটাই আবেগে নয়, কিছুটা আশঙ্কাতেও। শেষের দিকে আমিনার কণ্ঠে যে একান্ত হতাশা, যে করুণ হতাশ্বাস ফুটে উঠেছিল—তাইতেই যেন কোন্ এক সর্বনাশের ইঙ্গিত লুকোনো ছিল, সে-ও মনে মনে একটা হতাশা অনুভব না করে পারল না।

তবু মুখে জোর আনল সে। ভীতা অসহায়া আশ্রয়প্রার্থিনী সেই নারীকে সজোরে বুকে চেপে ধরে তার রুক্ষ কেশের মধ্যে মুখটা গুঁজে দিয়ে

বললে, 'কে বললে দেরি হয়ে গেছে—কিছু দেরি হয় নি। এখনও ঢের সময় আছে। আমরা যে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে যাচ্ছি আমিনা। পুরনো জীবনের হিসেব-নিকেশে কী দরকার আমাদের!'

সে স্পর্শে, সে আলিঙ্গনে, সে আশ্বাসে যেন শিউরে উঠল আমিনা।

'হ্যাঁ, তাই যাব। আর কিছু ভাবব না, নিজে আর কিছুই করব না, আজ থেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেব নিজেকে তোমার কাছে।'

দু জনে তেমনি বসে রইল ক্ষণকাল—তেমনি অন্তরঙ্গ, তেমনি ঘনিষ্ঠ, পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে। স্থান কাল পাত্র সব কিছু মুছে গেছে ওদের মানসচক্ষের সামনে থেকে, মুছে গেছে অতীত তার তিক্ত স্মৃতি নিয়ে। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে ওরা এখন একাগ্রভাবে অনুভব করছে এই বর্তমান পরিস্থিতির অভাবনীয়তা—আর প্রাণপণে তাকাবার চেষ্টা করছে কল্পনার রঙীন ভবিষ্যতের দিকে।...

ইতিমধ্যে আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। কখন কেটে গেছে তা হীরালাল বুঝতে পারে নি। বিলি মিচেল আর তার কাছ থেকে চেয়ে-নেওয়া সময় সবই ওর কাছে অবাস্তব অকিঞ্চিৎকর, সুদূর কোন্ অতীতের সামগ্রী হয়ে গেছে।

মিচেল কিন্তু বসে নেই। সে ঘড়ি ধরে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে খবর দিয়েছে। তার ওপরওলাকে। বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে ভরা সে কাহিনী, ঘুমে-জাগরণে ভরা তার চৈতন্য। তবু একসময় বিশ্বাসও করতে হয়। তখন ঘুম ভাঙানো হয় আরও অনেকের। নিদ্রিত মৃত্যুপুরীতে আবার জীবনের পদশব্দ জাগে, কর্মস্পন্দন সঞ্চারিত হয়।

সে শব্দ-তরঙ্গের আভাস এতদূরে এসে হীরালালের অভিভূত আচ্ছন্ন চৈতন্যকেও আঘাত করে। মনে পড়ে সব কথা। এতক্ষণে ওরা তা হলে জেনেছে সব কথা, জেগেছে ওরা, ছুটোছুটি পড়ে গেছে ভেতরে। নিশ্চয় এখনই তারও খোঁজ পড়বে, আর সেই প্রহেলিকাময়ী ছলনাময়ী স্বর্ণমৃগী রমণীর!

তার সম্বিৎ ফিরে আসে। সে সামান্য একটু নড়ে বসে, বলে, 'এবার ওঠ আমিনা, এখনই ওরা এদিকে এসে পড়বে হয়তো—এতক্ষণে তোমার কথা নিশ্চয়ই বলেছে বিলি মিচেল। আর দেরি করো না, লক্ষ্মীটি!'

সে-ডাকে আমিনারও সম্বিৎ ফেরে। আর সেই সঙ্গে ওর সমস্ত রক্তে জাগে একটা নিদারুণ ঘৃণা, প্রচণ্ড ধিক্কার। সে ধিক্কার ওর নিজেকেই, সে ঘৃণা নিজের জীবনের ওপর। এই প্রবল আত্মগ্লানিতে আর একবার শিউরে কেঁপে ওঠে সে। তার পরই নিজেকে হীরালালের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে সোজা হয়ে বসে। মোহ কেটে গেছে তার, সেই সঙ্গে আবেগের দুর্বলতাও আর নেই।

গলাটা শুধু বোধ হয় তখনও কাঁপছে। তবু সে সহজ শান্ত কোমল কণ্ঠেই বলল, 'হ্যাঁ হীরালাল, আমিও তোমাকে ভালবাসি—সেই জন্যেই তোমার প্রস্তাবে রাজী হতে পারব না। এই গলিত ঘৃণ্য জীবনটা, তার সমস্ত কলঙ্ক পাপ ও অপরাধের বোঝাসুদ্ধ তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে তোমার জীবনকে বিড়ম্বিত করব না।...করলে সুখীও হতে পারব না। একদিন তোমার কাছে সে বোঝা অসহ্য হবে, একদিন তুমিও ঘৃণা করবে—সে ঘৃণা সে অবহেলা আমি সইতে পারব না। তোমার ভালবাসা তোমার শ্রদ্ধাই জীবনে আমার একমাত্র জমা, একমাত্র লাভ। আজ মনে হচ্ছে এই ভালবাসা পাবার জন্যেই সারা জীবন

অপেক্ষা করেছি, সারা জীবন তৃষ্ণার্ত হয়ে ছিলাম। সে তৃষ্ণা দূর হয়েছে, অন্তর ভরে গেছে আমার। এই অমৃতস্বাদকে বিড়ম্বনায় তিক্ত করতে চাই না।...তুমি ভেতরে যাও হীরালাল, আমাকে ছেড়ে দাও—'

হীরালাল যেন হাহাকার করে উঠল, 'এ কী বলছ তুমি বেগমসাহেবা, এ সব কী ছেলেমানুষি করছ! তোমাকে আমার বোঝা বলে মনে হবে? এ কথা কেমন করে ভাবতে পারলে তুমি? তোমার জন্যে কোনদিনই জীবনকে বিড়ম্বিত মনে করব না, তুমি বিশ্বাস কর!'

আমিনা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, হীরালাল সজোরে তার হাতটা চেপে ধরল।

'না, ছি!' ছেলেমানুষকে যেমন ভাবে নিরস্ত করে তেমনি ভাবেই ওর আবেগকে প্রতিহত করে হাতখানা ছাড়িয়ে নিল আমিনা। বলল, 'কৃতজ্ঞতা ও করুণায় তুমি জীবনের সত্যকে অস্বীকার করতে চাইছ—কিন্তু আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, জগৎকে তোমার চেয়ে ঢের বেশি চিনেছি। তোমার পক্ষে এ একেবারে আত্মহত্যা। এ আত্মদান আমি কিছুতেই নিতে পারব না বাবুজী। তুমি ফিরে যাও—আমি ভিক্ষা চাইছি তোমার কাছে, আমাকে ভুলে যাও। ভুলতে না পার, ত্যাগ কর। তোমার কাছে, আমার যদি কোন কৃতজ্ঞতা প্রাপ্য থাকে তা আজ আমাকে ত্যাগ করেই শোধ কর। বল করবে? কথা দাও আমাকে?'

হীরালাল স্তম্ভিতের মত বসে রইল কিছুক্ষণ, তার পর ভগ্নকণ্ঠে বললে, 'তা হয় না বেগমসাহেবা। যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে, ততদিন তোমাকে ছাড়তে পারব না—তোমার কল্যাণ-চিন্তা থেকে বিরত থাকতে পারব না।'

'আমি বেঁচে থাকতে আমাকে ছাড়তে পারবে না! তাই তো!'

একটু হাসল আমিনা। শব্দ করেই হাসল। এই আবেগ-গম্ভীর আবহাওয়ার মধ্যে সে হাসি যেন কেমন বেমানান অদ্ভুত বলে মনে হল হীরালালের—সে একটু চমকেও উঠল।

ওধারে শাহ্‌নজফের ঘুম ভেঙেছে, বহু লোকের কোলাহল শোনা যাচ্ছে সেখানে। সেই সঙ্গে পদশব্দও। কারা যেন এই দিকেই আসছে।

হীরালাল কী বলতে যাচ্ছিল, সম্ভবত এই আসন্ন বিপদের কথাটাই—কিন্তু সহসা আমিনা এক কাণ্ড করে বসল। একটু উঠে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দু হাত দিয়ে হীরালালের মাথাটা কাছে টেনে আনল। সেই ভাবেই দুই হাতের তালুতে ওর দুই গাল নেড়ে আদর করল খানিকটা—একবার কী ভেবে ওর মুখটা নিজের মুখের কাছে নিয়ে এল—তার পরই, বেশ একটু যেন ঠেলেই সরিয়ে দিয়ে একেবারে উঠে দাঁড়াল।

সমস্ত ব্যাপারটাই এমন আকস্মিক, এমন অভাবিত যে হীরালাল কিছুই করতে পারল না। ভাল করে বুঝতে বুঝতেই সবটা ঘটে শেষ হয়ে গেল। তাই তার পরই যখন 'আচ্ছা বাবুজী, তবে তাই হোক—আমিই যাই' বলে অত্যন্ত দ্রুত ও লঘু পদক্ষেপে সেই ঢালু জমি বেয়ে নেমে চলে গেল আমিনা, তখনও তাকে কোন বাধা দিতে পারল না।

আর সময়ও ছিল না। কারণ বোধ করি চোখের পলকও ফেলবার আগে চকিতের মধ্যে সে খাদে নেমে নদীর দিকে চলে গেল এবং দেখতে দেখতে কদম রসুলের পাঁচিলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রাণপণে চোখ মেলেও তার সেই চাঁপা রঙের ওড়নার আভাসমাত্র আর দেখতে পেল না হীরালাল।

চিঠিখানা আগের দিনই এসেছিল—কিন্তু সেটা আর খোলা হয় নি। তখন অবশ্য খোলার কথাও নয়, কিন্তু তার পরও মনে ছিল না। যুদ্ধের মধ্যেই কে যেন একজন এসে কী একটা পকেটে গুঁজে দিয়ে গিয়েছিল—অতটা খেয়ালও করে নি। একেবারে শেষরাত্রে বিউগলের আওয়াজে ঘুম ভেঙে উঠে বসে পাইপটার জন্য পকেটে হাত দিতেই খামখানা হাতে ঠেকল। তখন মনে পড়ল চিঠি এসেছে, আর তাতে সম্ভবত কনস্ট্যান্সের খবরই আছে। হয়তো সে নিজেই লিখেছে। গত সপ্তাহে চিঠি এসেছিল এক হাসপাতাল থেকে—কনির অসুখ, সে সেই হাসপাতালে আছে—এক নার্স সেই খবরটা দিয়েছিল। সামান্য অসুখ, ভয়ের কোন কারণ নেই—তবু নিজে হাতে লিখতে অকারণ বেশী পরিশ্রম করতে হবে বলে নার্স লিখতে দেয় নি—এই কথাই ছিল তাতে।

হোপ চিঠিখানা হাতে নিয়ে অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক তাকাল। আলো নেই—আগুন যা ছিল সব নিভে গিয়েছে। শীতের শেষরাত্রি কুয়াশায় ভরা, আলোর আভাসমাত্র নেই আকাশে।

কোথাও কি আগুন নেই?

এদিক-ওদিক তাকাতে নজরে পড়ল—দূরে এক জায়গায় একটা আগুনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। অগত্যা উঠে কোনমতে বেল্ট্‌টা এঁটে সেই দিকেই চলল সে। কাজটা খুব সহজ নয়, কারণ মাথা ছিঁড়ে পড়ছে তখন, মনে হচ্ছে সেখানে বিশ হন্দর ওজনের একটা পাথর কে চাপিয়ে রেখেছে। তার ফলে চোখটাও ভাল করে চাইতে পারছে না। কাল সারাদিন যেমন অমানুষিক পরিশ্রম গেছে—সেই মাপেই মদ খেয়েছে সে বলতে গেলে সারারাত—মাথার আর অপরাধ কী!

তবু উঠতেই হবে। এখনই বিউগল্ বাজবে, প্রস্তুত হতে হবে আর একটি ভয়াবহ দিনের জন্য। শেষরাত্রেই শুরু হবে লড়াই—কাল ক্যাপ্টেন ডসন বার বার বলে দিয়েছেন।

আগুনটার কাছে গিয়ে হোপ দেখল—সেটাতে তখনও বিস্তর কাঠ আছে, সম্ভবত আগুনটা নতুনই জ্বালা হয়েছে, শেষরাতের দিকে। পাশেই কে একজন আগাগোড়া একটা এইদেশী ছিটের 'রেজাই' গায়ে মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। কে জানে কেন ওর শুয়ে থাকার ভঙ্গিতে হোপের বড় হাসি পেল।

সে কাঠগুলো ঠেলেঠুলে দিয়ে—আশেপাশে যা দু-একটা শুকনো পাতা পড়ে ছিল সেগুলোও কুড়িয়ে ওর মধ্যে গুঁজে দিয়ে আগুনটা বেশ জাঁকিয়ে তুলল। ততক্ষণে চোখের অবস্থাটাও অনেকখানি সহজ হয়েছে। সে খামখানা আলোর কাছে তুলে ধরল। না, কনির হাতের লেখা নয়—একেবারেই অপরিচিত হস্তাক্ষর।

একটু বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল বৈকি!

কিন্তু পরক্ষণেই মনে জোর আনল হোপ। সামান্য অসুখ—নার্স বেশ স্পষ্ট করেই লিখেছিল। এ বোধ হয় অপর কারুর চিঠি। কিন্তু তাকেই বা আর কে চিঠি লিখবে ছাই! কেউ তো কোনদিন লেখে না তাকে!...খামখানা হাতে নিয়ে আরও মিনিট-দুই চুপ করে বসে রইল সে। কৌতূহল আর কিছুটা বিস্ময় তো আছেই—যেন সেই সঙ্গে কেমন একটা ভয়ও বোধ করছে। চিঠিটা

খুলতে যেন কিছুতেই ভরসা হচ্ছে না।

পাশে যে লোকটা লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছিল সে এর মধ্যে একটু আড়মোড়া ভাঙল। কী যেন ঘুমের ঘোরেই বলল জড়িয়ে জড়িয়ে। কিন্তু লেপ মুড়ি থাকায় তার কিছুই বোঝা গেল না। আবার হাসি পেল হোপের, আর সেই সঙ্গেই মনের দ্বিধার ভাবটাও কতকটা কেটে গেল। সে সোজা হয়ে বসে খামখানা ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে আলোর কাছে ধরল।

কিন্তু তার পরও অনেকক্ষণ সেটা সেইভাবে ধরেই বসে রইল হোপ। যেন চিঠিটার মাথামুণ্ডু কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না—অথবা যেন কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষায় লেখা সে চিঠি।

কে লিখেছে এ চিঠি? কারা এরা? কী লিখেছে? কার কথা লিখেছে?

কাগজখানার মাথায় কী একটা শিরোনাম ছাপা রয়েছে—কী যেন উদ্ভট নামের এক অ্যাটর্নীর ফার্ম। অনেক চেষ্টার পর অন্তত তাই মনে হল ওর। কিন্তু ওর সঙ্গে কী সম্পর্ক এদের? কী লিখেছে—কী যেন…কন্স্ট্যান্স মারা গেছে? তার শেষ ইচ্ছানুসারে ওকে জানানো হচ্ছে খবরটা? তার সব সম্পত্তি এবং মাসোহারা সে হোপকেই দিয়ে গেছে? হোপের অ্যাটর্নীদের নাম-ঠিকানা পেলে এরা সে-সব হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দিতে রাজী আছে?

কী লিখেছে এসব ছাই-ভস্ম মাথামুণ্ডু?

আবারও একবার পড়ল চিঠির গোড়ার দিকটা।

মাত্র সাত দিনের জ্বরে মারা গেছেন কন্স্ট্যান্স। কী যেন একটা উদ্ভট নামের জ্বর—আরে, এ জ্বর হবেই বা কেন কন্স্ট্যান্সের!

বিমূঢ়ের মত তাকায় হোপ চারিদিকে।

দূরে কোথায় বিউগ্ল্ বাজছে না? নাকি তাদেরই এখানে? প্রস্তুত হবার ইঙ্গিত? যুদ্ধের জন্য, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান? মৃত্যু-মহোৎসবের বাঁশি?

পাশে যে লোকটা ঘুমোচ্ছিল সে বিউগলের শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে ইতিমধ্যে, বোকার মত তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। তার দিকেও।

বিলি মিচেল! কোথা থেকে বুঝি কোন্ এক মরা সিপাহীর লেপ যোগাড় করেছে। মৃতের সম্পত্তি।—কিন্তু ওর তো অ্যাটর্নীর প্রয়োজন হয় নি!

অকস্মাৎ বড় হাসি পেল হোপের। সমস্ত পেটে মোচড় দিয়ে যেন কুলকুল করে হাসি বেরিয়ে আসছে তার। সে হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বিলি আগে ওকে চিনতে পারে নি। কিছু বুঝতে পারে নি প্রথমটা। কারণ মাত্র একঘণ্টা আগেই শুয়েছে সে। অনেক হৈ-চৈ হয়েছে, অনেক খোঁজাখুঁজি—বারুদগুলো পাহারা দেবার ব্যবস্থা—সব সেরে এই লেপটা যোগাড় করে শুতে একেবারে শেষরাত্রিই হয়ে গেছে। ফলে চোখটাই ভাল করে খুলতে পারছে না—এমন অবস্থা ওর।

কিন্তু হোপের এই উৎকট হাসিতে ওর জড়তা কেটে গেল।

আরে, কে এ লোকটা এমন করে পাগলের মত হাসছে?

আরও ভাল করে তাকিয়ে চিনতে পারল—হোপ!

সত্যিই পাগল হয়ে গেল, না মাতলামি করছে? সারারাত মদ খেয়েছে বুঝি?

'এই হোপ, ও কী করছ ? আরে, ওকি, অত হাসছ কেন ? কী হয়েছে ?' কাছে এসে ওর কাঁধটা ধরে নাড়া দেয় বিলি।

তবু কথা কইতে পারে না হোপ। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও না।

থামতে চেষ্টা করে, একটু সংযত হয়ে আসে, আবার প্রচণ্ডতর এক হাসির ধমকে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে—

'এই, কী হচ্ছে, শান্ত হও ! তৈরী হয়ে নাও, রোল-কল হবে যে এখনই, বিউগল্ বেজে গেছে শোন নি ?' বিলি ওকে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করে প্রাণপণে—ওর যেন কেমন ভয় করতে থাকে।

অবশেষে হোপ খানিক সামলে নেয়, অনেক চেষ্টায়।

উঠে বসে ওর দিকে কিছুক্ষণ সকৌতুকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'ভারি মজা হয়েছে, শোন নি। কন্স্ট্যান্স মারা গেছে—কী যেন একটা জ্বর হয়েছিল ওর, সে এক মজার নাম—তাইতেই মারা গেছে। সাত দিনে। আর জান ? ওর সব টাকাকড়ি আমাকে দিয়ে গেছে। ওর অ্যাটর্নী আমার অ্যাটর্নীর নাম জানতে চেয়েছে—বুঝিয়ে দেবে বলে। আচ্ছা বল, এর চেয়ে মজার খবর আর কিছু হতে পারে !'

সে আবারও বিপুল এক হাসির ধমকে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

বিলি স্তম্ভিত হয়ে গেছে তখন। প্রবল শোকের এই উন্মত্ত অভিব্যক্তির সামনে সান্ত্বনা দেবার মত একটি কথাও সে খুঁজে পেলে না। এ হাসির মত করুণ জিনিস বোধ হয় কিছুই দেখে নি সে—তার এই অল্প ক'বছরের জীবনে। এ ব্যাপারে তার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। এক্ষেত্রে কী করা উচিত, কী বললে শান্ত হবে লোকটা—তা কিছুই বুঝতে না পেরে অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

অবশেষে আর একটা বিউগল্ বাজতে হোপ নিজেই খানিকটা প্রকৃতিস্থ হল যেন। উঠে বসল সে। বিলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও, রোল-কল হবে এইবার, না ? চা দেবে না ওরা একটু ? চা আর রেশন ? আমার বন্দুকটা কোথায় ? ও, রেখে এসেছি বুঝি ওখানে ? কোথায় ছিলুম বল তো ? কোন্ দিক থেকে এসে পড়েছিলাম ? তুমিও তো জান না ছাই ! চিঠিটা পড়তে আলোর খোঁজে এখানে এসেছিলাম।…এই চিঠিটা—মজার চিঠি, না !'

আবার হাসিতে ফেটে পড়ল সে।

হো-হো—হা-হা— ! প্রচণ্ড হাসি।

তারপর তেমনি হাসতে-হাসতেই এক হাতে কোমরের কাছে বেল্ট্টা, আর এক হাতে চিঠিখানা ধরে ছুটে চলে গেল সে একদিকে।

সেদিন রাত্রিশেষে আবার যখন প্রচণ্ড লড়াই শুরু হল—তখন ইংরেজবাহিনী আর যাই হোক মদ্যপ ও লম্পট হোপের এই অসামান্য বীরত্বের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রায় সকলেই চোখ রগড়ে তাকাল একবার করে—ঠিক দেখছে তো তারা ! হোপই তো বটে ঐ লোকটা—যে বেছে বেছে সব চেয়ে যেখানে বিপদ সেইখানেই এগিয়ে যাচ্ছে, সর্বাপেক্ষা যেখানে অগ্নিবৃষ্টি সেই দিকে গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। হোপই তো—না আর কেউ ?

কিন্তু সন্দেহের কোন কারণ নেই। কেননা শুধু যে ওর হাত চলছে তাই তো নয়—মুখও যে চলছে! অমন অশ্রাব্য অশ্লীল গালিগালাজ আর কারুর মুখ দিয়ে সহজে বেরোয় না। লোকটা নিশ্চয়ই ভোরবেলায় মদ গিলেছে খানিকটা!

অসহ্য সে-সব গালিগালাজ। হোপ আজ যেখানে যাচ্ছে, বহুদূর অবধি বাতাস যেন বিষাক্ত করে দিচ্ছে। অবশেষে আর থাকতে না পেরে ক্যাপ্টেন তাকে সতর্ক করতে গেলেন, 'দেখ বাপু, লড়াই করছ কর—অত মুখ খারাপ করছ কেন? আর যাই হোক, অশ্লীল গালিগালাজটা যুদ্ধের অঙ্গ নয়!'

হোপ রক্তচক্ষুতে তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকেই গালাগালি দিয়ে উঠল বিশ্রী ভাষায়। বললে, 'যা পার কর গে—তোমার মত ক্যাপ্টেন আমি ঢের ঢের দেখেছি। তোমাকে আমি এক তিল পরোয়া করি না। যমকেই পরোয়া করি না তা তুমি! দেখছ না একটা গুলিও আমাকে বিঁধতে পারছে না?'

এই বলে উদ্ধতভাবে হা-হা করে হেসে উঠে ছুটে চলে গেল আরও সামনের দিকে।

ক্যাপ্টেনের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল এই ঔদ্ধত্যে ও ধৃষ্টতায়। তিনি বিলি মিচেলের দিকে ফিরে বললেন, 'এই, তোমরা জন-দুই লোক ওকে ধরে পেছনে নিয়ে যাও তো! ওকে কয়েদখানায় রাখবার হুকুম দিলাম। যুদ্ধের সময় মাতলামি করা অমার্জনীয় অপরাধ!'

পাশেই ছিল ম্যাকলিয়ড—সে আস্তে আস্তে বললে, 'মাপ করবেন ক্যাপ্টেন, কিন্তু মদ ও খায় নি—ওর নিয়তিই ঘনিয়ে এসেছে। আসলে ও আত্মহত্যা করতেই চায়।'

'তাই নাকি? কী করে জানলে?' ক্যাপ্টেন ডসন কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।

ম্যাকলিয়ড বললে, 'এ জিনিস আমি চিনি ক্যাপ্টেন, অনেক দেখেছি। মৃত্যু ওকে টেনেছে, এ সেই চেহারা।'

'ও তোমার অনুমান!' বলে ডসন উড়িয়ে দিচ্ছিলেন কথাটা। কিন্তু তার আগেই এগিয়ে এল বিলি মিচেল। সে ছোট্ট একটা অভিবাদনের ভঙ্গি করে বললে, 'পাইপ-মেজর ম্যাকলিয়ড ঠিকই বলেছে ক্যাপ্টেন, ও আত্মহত্যারই চেষ্টা করছে। কাল খবর এসেছে ওর প্রণয়িনী বা ওর বাগ্‌দত্তা মারা গেছে। সে চিঠি কাল খুলতে পারে নি—আজ ভোরে পড়েছে, তার পর থেকেই অমনি পাগলের মত হয়ে উঠেছে।'

'তাই নাকি! কে—সেই যে মেয়েটা ওকে মদ খাবার টাকা যোগায়? হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি, কে যেন ওর আছে, কন্‌স্ট্যান্স না কী যেন নাম! সে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ ক্যাপ্টেন। কন্‌স্ট্যান্সই তার নাম বলেছিল ও।'

'বাই জোভ্! ঐ লোকটার মধ্যে এত প্রেম ছিল তা কে জানত!···তা হলেও তো ওকে সরিয়ে আনা দরকার। মিছিমিছি আত্মহত্যা করতে দেওয়া ঠিক নয়। তোমরা কেউ—'

কিন্তু ক্যাপ্টেন ডসন তাঁর কথাটা শেষ করবার সময় পেলেন না। এরং মধ্যেই হোপ যখন একটা উঁচু ঢিপিতে লাফিয়ে উঠেছিল, সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছিল হাঁটু পর্যন্ত ওর গোটা দেহটা। তাই শত্রুপক্ষের লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কোন উপায় ছিল না। সে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে একটা ছোট গোলা এসে লাগল

ওর পেটে—এবং তাইতেই পেট ফেটে নাড়িভুঁড়িগুলো বেরিয়ে একেবারে ওর হাঁটুর কাছে এসে ঝুলে পড়ল। আর সে ধাক্কা সামলাবার আগেই আরো দুটো গুলি প্রায় একসঙ্গে এসে বিঁধল ওর বুকে। একটা আর্তনাদ, এমন কি একটা শব্দও করবার সময় পেল না লোকটা—মুহূর্তের মধ্যে তার প্রাণহীন দেহটা গড়িয়ে পড়ল ঢিপি থেকে।

।। ৬৯ ।।

স্বল্প কয়েকটি নিমেষের জন্য সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। আত্মহত্যারই রূপান্তর এই বীভৎস মৃত্যু—কদর্য জীবনের এই শোচনীয় পরিসমাপ্তি দেখে অল্পক্ষণ সকলেরই একটা চিত্তবৈকল্য ঘটেছিল—কিন্তু তার পরই এগিয়ে যেতে হ'ল সবাইকে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাববিলাসের অবসর থাকে না। মরছে চারিদিকেই—বন্ধু, সহকর্মী, স্বদেশবাসী সকলেই—কে কার জন্য শোক করবে! কে কতক্ষণ আছে তাই বা কে জানে! যে এই মৃত্যু দেখে বিচলিত হচ্ছে—আরও কোন ভয়াবহ মৃত্যু তার নিজের অদৃষ্টেই আছে কিনা কে বলবে। এসব দিকে তাকালে চলবে না। গোলা এবং গুলি বৃষ্টির মত বর্ষিত হচ্ছে—মৃত্যু-বর্ষণই বলা যায় তাকে। এ পক্ষের কামান অল্প, তাদের শক্তিও সামান্য। সামনের পাষাণ-প্রাচীর ভাঙবার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। বার বার পাঁচিল ডিঙিয়ে ভেতরে যাবার চেষ্টায় এদের লোকই বেশি মরছে।

সবাই চলে গেল—কেবল যেতে পারল না বিলি মিচেল। হোপ লোকটাকে সে কখনই প্রীতির চোখে দেখে নি, মাতাল বলে দুর্বৃত্ত বলে ঘৃণাই করেছে বরাবর—তবু আজ ওর ঘৃণিত জীবনেরই এই পরিসমাপ্তি দেখে বিচলিত না হয়ে পারল না। সকাল থেকে আরও কয়েকটা মৃত্যু দেখেছে; ঘনিষ্ঠ বন্ধু গেছে, এক বালক পড়ল চোখের সামনে—তার ওপর এই হোপ। পর পর কটা আঘাত কয়েক মিনিটের মত বিলিকে যেন স্থাণু করে দিল।

তবু উঠতেই হবে। পিছনের যারা আগে চলে যাচ্ছে, ডেকে যাচ্ছে ওকে। বিপদকে আগু বেড়ে বরণ করার সে আহ্বানে সাড়া না দিলে পৌরুষ লজ্জা পায়। মিচেলও উঠে দাঁড়াল। দুঃখ—না হোপের জন্য দুঃখ নয়। মানুষের পরিণাম দেখে দুঃখিত ও। আর সে পরিণাম স্বেচ্ছা-বৃত বলেই আরও দুঃখ। হোপের মত শিক্ষিত তরুণের সামনে ওপরে ওঠবার ও নীচে নামবার দুটো পথই খোলা ছিল। প্রথমটা ঈষৎ আয়াস-সাধ্য বলেই হয়তো ছেড়ে দিয়েছিল সে—বেছে নিয়েছিল সহজ পথটা। নিজের প্রবৃত্তির কাছে দাসখৎ লিখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কিন্তু তাতেই কি সুখী হতে পেরেছিল সে…?

থাক সে কথা। যুদ্ধে যেতে হবে এখন ওকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল মিচেল। কিন্তু সে যাবার আগেই কে একজন ওদিক থেকে সবাইকে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে এদিকে এগিয়ে এল।

এ সময় এ আচরণে বিস্মিত হবারই কথা। আরও বিস্মিত হ'ল মিচেল লোকটার দিকে তাকিয়ে।

কোয়েকার ওয়ালেস!

'একি শুনছি, পাপিষ্ঠটা নাকি মরেছে শেষ পর্যন্ত ?…ও, এই যে!'

কয়েক জনকে ঠেলে সরিয়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল সে। যে দৃশ্য

থেকে সকলেই চোখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে, সেইটেই ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যেন নিজের চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হতে চায়।

কিন্তু মৃত্যুর সামনে এসে দাঁড়িয়েও তো ওর চোখ থেকে ঘৃণা যায় নি। প্রবল ঘৃণা আর অমানুষিক বিদ্বেষ। হোপের মৃত্যু-বিবর্ণ পাণ্ডুর বিকৃত মুখের দিকে চেয়েও তো দৃষ্টি কোমল হ'ল না ওর—কিংবা মুখের রেখায় এতটুকু সহানুভূতি কি অনুশোচনা প্রকাশ পেল না। বরং মনে হতে লাগল অনেক দিন পরে পরিপূর্ণ একটা তৃপ্তির কারণ ঘটেছে, এই ভয়াবহ দৃশ্য উপভোগই করছে সে।

লোকটা কি পিশাচ?

বিলি মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওয়ালেস আবার কথা কইলে।

মনে হ'ল ওকেই উপলক্ষ করে বললে, 'এই লোকটা এককালে আমার বন্ধু ছিল।...তবু ওর এই অবস্থা দেখব বলেই সেনাদলে নাম লিখিয়েছিলাম আমি, ওর সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী ঘুরেছি। এতদিনে সে আশা মিটল।'

তারপর আস্তে আস্তে যেন কতকটা অনিচ্ছাতেই হাত তুলে ক্রুশচিহ্ন আঁকলে নিজের মাথায় আর বুকে।

এর পর ওয়ালেসও যেন ক্ষেপে উঠল। সে এগিয়ে গেল সকলের আগে —প্রথম সারিতে। বেছে বেছে কামানের সামনে গিয়েই দাঁড়াতে লাগল সে। যেখানে শত্রুর দল ঘনীভূত—সেখানেই গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, মরীয়া বেপরোয়া ভাবে। হোপেরই মত মরীয়া, সেই রকমই বেপরোয়া—কেবল ওয়ালেসের মুখে অশ্লীল ভাষা বা গালিগালাজ ছিল না—ছিল বাইবেলের স্তোত্র। উচ্চৈঃস্বরে সেই স্তোত্র গাইতে গাইতে উন্মত্তের মত এগিয়ে যাচ্ছে শত্রুর সামনে - উন্মত্তেরই মত শত্রুনিধন করছে সে। একা তার বন্দুকেই কুড়ি-পঁচিশটি দুশমন ঘায়েল হ'ল সেদিন—কিন্তু তবু তার শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই—বিরতি নেই।

হয়তো মৃত্যুই চাইছিল সে হোপের মত, আত্মহত্যার উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু কোন্ এক দুর্জ্ঞেয় কারণে মৃত্যু হ'ল না, বরং মনে হ'ল সঙ্গীনধারী ওর সেই কালান্তক মূর্তি দেখে স্বয়ং কালই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

অবশেষে একসময় যুদ্ধবিরতির বাঁশি বাজল। যে প্রাসাদভবনের জন্য এই প্রচণ্ড লড়াই চলছিল সে প্রাসাদ ইংরেজপক্ষের হস্তগত হয়েছে, শত্রুরা পালিয়েছে ওদিক দিয়ে—আপাতত কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। পরে আবার নতুন কোন ঘাঁটির দিকে অভিযান করতে হবে হয়তো—তবে তার কিছু বিলম্ব আছে।

এইবার ওয়ালেস কিছুটা আত্মসংবরণ করল। এতক্ষণ ছিল মরণের নেশায় আচ্ছন্ন, তাই নিজের দেহটার দিকে তাকাবার অবসর হয় নি, সে সম্বন্ধে কোন অনুভূতিই ছিল না ওর—কিন্তু এইবার যেন সব কটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙে পড়তে চাইল, সব চেয়ে বেশি কষ্ট হতে লাগল তৃষ্ণায়, বুক অবধি যেন শুকিয়ে গেছে।

জল চাই একটু—এখনই।

ভাগ্যক্রমে বাগানের মধ্যে ঢুকতেই প্রথম যে দৃশ্য ওর চোখে পড়ল তা হচ্ছে প্রকাণ্ড একটা পাকুড় গাছের নীচে সার সার মাটির জালা বসানো। তাতে যে

জলই আছে তা একবার সেদিকে তাকালে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মাটির পাত্র—অনেকক্ষণ জল থাকায় বাইরেটা পর্যন্ত ভিজে উঠেছে।

সুশীতল, সুমিষ্ট, সুপেয় জল। তৃষ্ণার্তকে পাগল করার পক্ষে এ দৃশ্য যথেষ্ট। ওয়ালেস পাগলের মতই দৌড়তে গেল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন ওর কনুইটা ধরে পেছনে টানল। ভীষণ ভ্রূকুটি করে মুখ ফেরাল ওয়ালেস—দেখল বাধাদানকারী স্বয়ং ক্যাপ্টেন।

'আস্তে বন্ধু—আস্তে।' ডসন বললেন, 'একবার ভাল করে তাকাও তো গাছতলাটায়—মৃতদেহগুলো লক্ষ্য করে দেখ তো!'

ওয়ালেস বিস্মিত হয়ে তাকাল—কিন্তু চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডসনের প্রশ্নটা বুঝতে পারল সে। ইংরেজ-বাহিনী তো মাত্র কিছু আগে এখানে ঢুকেছে, ভেতরে আসবার পর তেমন যুদ্ধও হয় নি—তবে এত শ্বেতাঙ্গ এর মধ্যে মরল কী করে? আর, এখানেই!

ডসন বললেন, 'চারিদিকে কোথাও তো ইংরেজের মৃতদেহ বিশেষ নেই—শুধু এখানেই এত এল কোথা থেকে? আরও একটা জিনিস দেখছ—অধিকাংশেরই মাথাতে বা কপালে গুলি লেগেছে। গাছটা একটু ভাল করে লক্ষ্য কর দেখি—ওপরে কেউ আছে কিনা। কে জানে এই সার সার জলের জালা—এ হয়তো একটা ফাঁদই—'

ওয়ালেস ও ডসন দুজনেই ওপর দিকে তাকাল।

ঘনপল্লব বিরাট গাছ। প্রথমটা কিছুই চোখে পড়ল না। আরও ভাল করে কিছুক্ষণ দেখার পর ওয়ালেসের চোখে পড়ল সাদা-মত একটা কি। সাদা শঙ্খচিলও হতে পারে—সাদা পোশাকের প্রান্ত হওয়াও আশ্চর্য নয়।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শ্রান্তিতে অধীর অসহিষ্ণু ওয়ালেসের আর বেশি ভাল করে দেখার মত অবস্থা নয়। সে বিনা বাক্যব্যয়ে বন্দুকটা তুলে নিয়ে সেই শ্বেতবিন্দুটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল।

অব্যর্থ লক্ষ্য! সঙ্গে সঙ্গেই একটি দেহ ওপর থেকে পত্র পল্লব শাখা কাঁপিয়ে দুলিয়ে শব্দ করে মাটিতে এসে পড়ল।

ডসনই প্রথম লক্ষ্য করলেন।

'মাই গড্!…এ যে স্ত্রীলোক!'

এবার ওয়ালেসেরও চোখে পড়ল—ওড়নাটা কোমরে বাঁধা কোমরবন্ধের মত, সম্ভবত তারই খাঁজে কার্তুজের থলি, হাতে একটা বন্দুক।

কিন্তু তবু স্ত্রীলোকই—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বারুদের গুঁড়ো, ধুলো, অনাহার, স্নানের অভাব—নানা কারণে সে উজ্জ্বল গৌরকান্তির কিছুই আর প্রায় অবশিষ্ট নেই; মুখেরও অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে গত ক বছরে, বিস্তর রেখা পড়েছে সেই আশ্চর্য ললাটে—কিন্তু তবু ওয়ালেসের চিনতে বিলম্ব হয় না। এত ধুলো, এত কালি, এত রূপান্তরও সে অনিন্দ্য লাবণ্য সম্পূর্ণ নষ্ট করতে পারে নি—শীত-মধ্যাহ্নের ঈষৎ ধূসর আলোয় সে দেহ আজও যেন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে—রক্তমাখা সে তনু রক্তচন্দনমাখানো পদ্মের মতই অপরূপ মনে হচ্ছে।…

দুই চোখ বিস্ফারিত করেই চেয়ে রইল ওয়ালেস, চোখে পলক নেই… পাষাণের মতই স্থির, নিস্পন্দ হয়ে গেছে সে।

তার মুখের ভাব দেখে ভয় পেয়ে গেলেন ডসন—কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতে

দিতে ডাকতে লাগলেন—'ওয়ালেস! ওয়ালেস!'

এইবার চোখে পলক পড়ল—বোধ হয় দুই চোখ জ্বালা করে জল ভরে এসেছিল বলেই পড়ল। সেই শীর্ণ, রুক্ষ, কর্কশ গাল বেয়ে অবিরলধারায় সে জল ঝরতে লাগল—তারই মধ্যে অস্ফুট ভগ্নকণ্ঠে বললে, 'আমিনা!…আমিই তোমাকে মারলাম শেষ পর্যন্ত!…এই জন্যই কি আবার ভারতে এসেছিলাম! হা ঈশ্বর!'

তার পর আস্তে আস্তে সেইখানেই আমিনার মৃতদেহের পায়ের কাছে মাটিতেই বসে পড়ল সে।

ডসন কিছুই বুঝতে পারলেন না, আর সেই জন্যই বাধা দেওয়া বা সান্ত্বনা দেওয়ারও কোন চেষ্টা করতে পারলেন না—শুধু বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলেন, এতকাল যে মানুষটিকে নির্মম, কঠোর, ইস্পাতের মতই অনমনীয় বলে জানতেন, সেই মানুষটিই সহসা আজ এক অপরিচিতা, বিদেশিনী, শত্রু-নারীর পায়ের ওপর বিহ্বল হয়ে ভেঙে পড়ল!

॥ ৭০ ॥

যুদ্ধ এমন একটা অবস্থা যা মানুষকে ভেঙে পড়তে দেয় না। কারণ তার মধ্যে কোথাও থামবার কি থমকে দাঁড়াবার কোন অবসর নেই। দুঃখ শোক বেদনা—এগুলো অনুভব করবার বা তাতে বিহ্বল হবারও একটু সময় দরকার। সেটুকু সময়ও যুদ্ধক্ষেত্রে নেই। মরা, অথবা সজাগ সতর্ক সক্রিয় থাকা, এ দুটোর মাঝামাঝি কোন অবস্থা নেই সেখানে।

ওয়ালেসও ভেঙে পড়বার অবসর পেল না। অপরাহ্নে আবার নতুন এক ঘাঁটি আক্রমণ করা হ'ল—বাধল প্রচণ্ড লড়াই। ওয়ালেসকেও তার সেই ভেঙে-পড়া, প্রায় টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়া দেহটাকে টেনে তুলে বন্দুক হাতে দাঁড়াতে হ'ল এসে, মানুষ মারবারও চেষ্টা করতে হ'ল যথারীতি। এ-বেলা ওর মধ্যে আর সেই দুঃসহ তেজের কিছুই অবশিষ্ট নেই—দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে যেন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে লোকটা—তবু দাঁড়িয়ে রইল ঠিকই, এগিয়েও গেল সময়-মত। একেবারে লড়াই যে না করল তাও নয়—মানুষও যথানিয়মেই মারা পড়ল দু-চারটে তার হাতে—কিন্তু চলা-ফেরা, বন্দুক ছোঁড়া সব কাজই করে গেল সে যন্ত্রের মত। মুখভাবে যেমন বেদনার পরিচয় নেই, তেমনি অন্য কোন হৃদয়াবেগের আভাসও তা থেকে বোঝা যায় না—শান্ত উদাসীন সে মুখ। কোন কিছুতে অভীপ্সা বা বিতৃষ্ণা কিছুই তার নেই—এ পৃথিবীর কোন অনুভূতিই হয়তো তাকে স্পর্শ করবে না আর কোন দিন।

শুধু একটা কথা তখনও মনে ছিল—সেটা হীরালালের কথা।

দুঃখের দিনে মানুষ অভাবনীয় বন্ধুলাভ করে। কে যে তার যথার্থ বন্ধু, বিপদের অংশভাগী, সেটা সুখের দিনে বোঝা যায় না—দুঃখের দিনেই আসল বন্ধুটি এসে পাশে দাঁড়ায়—অপ্রত্যাশিত পথ ধরে।

হীরালালকে আজ ওর সেই রকম বন্ধু বলেই বোধ হচ্ছে। তাকে খুঁজে বার করা দরকার। আজ প্রথম দেখেছে তাকে; হয়তো আগেও দেখেছিল, অতটা লক্ষ্য করে নি—কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গেই জেনেছে—সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশী বিধর্মী এই তরুণ বালকটিই এ বিশাল পৃথিবীতে তার একমাত্র ব্যথার

ব্যথী—শোকের দুঃখের অংশভাগী।

সেটা বিস্ময়ের কথাও বটে এবং কৌতূহলেরও।

আজকের সব দুঃখ সব ব্যথা সমস্ত মানসিক বিবর্ণতার মধ্যেও কৌতূহলটা জেগে আছে মনে। এতটা বিস্মিত জীবনে আর কোনদিন হয় নি ওয়ালেস, ওর মত আশ্চর্য আর কেউ কখনও হয়েছে কিনা সন্দেহ।

শোকের প্রথম আবেগটা কেটে গেলে যখন ক্যাপ্টেন ডসনের অনুরোধে কোন এক সহকর্মী ওর মুখের কাছে জলের পাত্র এনে ধরেছে—তখনই হীরালালকে প্রথম দেখলে ও। তাকে দেখে সবাই বিস্মিত, সকলেই প্রশ্ন করেছে, 'বাবু, বাবু, তুমি এখানে কেন?…লড়াইএর জায়গায় তুমি কেন?… ফিরে যাও, ফেরো—নইলে হয়তো কয়েদ হয়ে যাবে!' কিন্তু কারুর কথায় কান দেয় নি সে, কারুর দিকে ফিরেও তাকায় নি—সবাইকে ঠেলে সরিয়ে ছুটে এসে আমিনার দেহের ওপর আছড়ে পড়েছে।

পাগলের মত কেঁদেছে আর কপাল চাপড়েছে। আমিনার পায়ে মুখ ঘষেছে।

কী বলছিল ও!

বুঝতে পারে নি ওয়ালেস—ও বলছিল, 'আমার জন্যেই তুমি প্রাণটা দিলে বেগমসাহেবা, আমার জন্যেই। আমি তোমার ঋণের খুব শোধ দিলুম। তুমি বার বার আমায় বাঁচিয়েছ—আর আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ হলুম।'

কিন্তু তার মুখের কথা না বুঝলেও শোকের প্রচণ্ডতা ভুল বোঝবার কারণ নেই। সেটা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট।

যে ছেলেটি ওকে জল এনে দিয়েছিল—এক কর্পোরাল, সে গিয়ে ওকে তুলে ধরলে, বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল, 'হীরালাল, হীরালাল চ্যাটার্জি, প্লীজ প্লীজ—শান্ত হও, স্থির হও। কী ব্যাপার বুঝিয়ে বল।'

হীরালাল তার দিকে ফিরেও চাইল না। মুখই তোলাতে পারল না সে কর্পোরাল।

শেষ পর্যন্ত আশ্চর্য উপায়ে শান্ত করলে ওয়ালেসই। কী মনে হ'ল ওর,—কেন মনে হ'ল কে জানে, হয়তো ঈশ্বরই ওকে দিয়ে করালেন এবং বলালেন সব—সে কাছে গিয়ে হীরালালের কাঁধে হাত দিয়েই পরিষ্কার হিন্দী ভাষায় বললে, 'বাবু, তুমিও এঁকে ভালবাসতে?…তাই শোক করছ?…কিন্তু আমাকে দেখে তুমিও শান্ত হও।…জেনে রাখ আমার চেয়ে এঁকে কেউই ভালবাসত না, ভালবাসতে পারে না—এঁর জন্য আমার সমস্ত জীবন শ্মশান হয়ে গেছে—আত্মীয় স্বজন দেশ ভুঁই সব ছেড়েছি—তবু দেখ আমি তো কেমন স্থির হয়ে রয়েছি। আমার হাতে, আমার গুলিতেই মরেছেন ইনি—তবু দেখ আমি তো হাহাকার করছি না!'

ওর স্পর্শে, ওর কথাতে হীরালাল সত্যিই শান্ত হ'ল। মুখ তুলে তাকাল সে।

ওয়ালেস!

আশ্চর্য! ওয়ালেসের সঙ্গে আমিনার কী সম্পর্ক? পৃথিবীর কোন্ সুদূর প্রান্ত থেকে এসেছে সে, শ্বেতাঙ্গ খ্রীশ্চান—সে কী করে চিনলে এঁকে…হুসেনী বেগমকে? এত ব্যবধান এত দূরত্ব সত্ত্বেও কি এত ভালবাসা সম্ভব?

কিন্তু মিছে কথাও তো বলছে বলে মনে হচ্ছে না। মুখের রেখায় সুগভীর শোক ও প্রচণ্ড আত্মগ্লানি তো ভুল হবার নয়। তবে ?

বিহ্বল হয়ে খানিক তাকিয়ে থেকে বলে সে, 'ইনি দেবী, ইনি আমার নমস্যা, যতদিন বাঁচব মনে মনে পুজো করব এঁকে।'

ওয়ালেস হাত বাড়িয়ে ওর ডান হাতটা চেপে ধরল, 'তোমার সে পুজোয় আমিও একজন অংশীদার রইলাম বাবু, তোমার সঙ্গে এ শোক আমি ভাগ করে নিলাম ; তুমি আমার বন্ধু হলে—আজ থেকে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু।... কিন্তু তুমি শান্ত হও বন্ধু, স্থির হও। এ যুদ্ধক্ষেত্র, শোক করার স্থান এ নয়।...তা ছাড়া, আমাদের যে বিরাট একটা কাজ, একটা দায়িত্ব রয়েছে ভাই। সেটা ভুললে তো চলবে না। ওঁর এ দেহ না শেয়াল-কুকুরে খায় সেইটে দেখাই যে এখন সর্বাগ্রে দরকার। আর সে কাজটা তোমাকেই করতে হবে। আমার তো আর সময় নেই—এখন আমাদের অন্যত্র যেতে হবে, নতুন আক্রমণ শুরু হবে।'

বুঝল হীরালাল। মন্ত্রমুগ্ধের মত চোখের জল মুছে দাঁড়াল।

সে-ই সব ব্যবস্থার ভার নিয়েছিল—ওয়ালেসদের আর সত্যিই সময় ছিল না।

একেবারে সময় মিলল অনেক রাত্রে—আরও একটা লড়াইএর পর যখন বিশ্রামের আদেশ পাওয়া গেল, তখন।

বিশ্রাম নেওয়াই হয়তো উচিত ছিল, কিন্তু ওয়ালেস তা নিতে পারল না। কাঁধের বোঝাগুলো এক জায়গায় নামিয়ে রেখে সে তখনই বেরিয়ে পড়ল। হীরালালকে তার চাই, তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। শেষের ব্যবস্থাটা কী হ'ল সেটা জানা দরকার।

অনেক পিছনে কমিসারিয়েটের আস্তানা—সেইখানেই যাচ্ছিল হীরালালের সন্ধানে, কিন্তু অত দূর যেতে হ'ল না। শিবিরের প্রান্তসীমায় পেঁছিতেই দেখা হয়ে গেল বিলি মিচেলের সঙ্গে। বিলি ওকে দেখে কাছে এগিয়ে এল, সোজা প্রশ্ন করল, 'তুমি কি চ্যাটারজিকে খুঁজছ ?'

বিস্মিত হলেও ওয়ালেস তা মুখে প্রকাশ করল না। বলল, 'হ্যাঁ। তাকে দেখেছ ?'

'সে নদীতে স্নান করতে গেছে। ওদের দেশে নাকি আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে স্নান করাই নিয়ম।...আমি সেখানেই যাচ্ছি। যাবে তুমি ?'

'চল' বলে ওয়ালেস ওর সঙ্গে নদীর পথ ধরল।

খানিকটা চলবার পর ওয়ালেস খুব কুণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা সে মহিলার—মানে সেই মৃতদেহটার কী করতে পেরেছে জান ?'

'হ্যাঁ।' সহজ ভাবেই উত্তর দিল বিলি, 'জানি বৈকি। অনেক ঘুরে গ্রামের মধ্যে থেকে এক মোল্লাকে ধরে এই একটু আগে সব ব্যবস্থা ঠিক করেছে—সে-ই যা কিছু করবার করে কাল ভোরে মাটি দেবে।'

ওয়ালেস আর কিছু বললে না। শুধু যেন একটু সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নিঃশব্দে পথ চলতে লাগল।

হীরালালের স্নান শেষ হলে নদীর ধারেই একটা গাছতলায় বসল ওরা।

এদিক থেকে শত্রুর ঘাঁটি নির্মূল হয়েছে—এপারে ওপারে অনেকখানি পর্যন্ত এখন ইংরেজ-অধিকারে। নিশ্চিন্ত হয়ে বসা চলবে।

প্রথমটা তিনজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

পাশেই গোমতী নদী—শান্ত অচঞ্চল নিরুদ্বিগ্ন। হয়তো নিঃশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু সে বেগ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। পাতলা একটা ধোঁয়াটে কুয়াশা জমে আছে জলের ওপর—সেটাও স্থির। কাল এ সময় কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস চলছিল কিন্তু আজ সমস্ত প্রকৃতি নিস্পন্দ থম্‌থম্‌ করছে। কোথাও একটা গাছের পাতা নড়ার শব্দ পর্যন্ত নেই।

এমনি থম্‌থমে অবস্থা বুঝি ওদের মনেরও। হীরালাল একদৃষ্টে নদীর দিকে চেয়ে স্থির হয়ে বসে আছে একটা হাঁটুর ওপর মুখ রেখে। নিকট-আত্মীয়কে দাহ করে উঠলে যেমন হয়, তেমনি করুণ উদাস ভাব ওর মুখ-চোখের।...

বিলি এদের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারলেও শোকের তীব্রতাটা বুঝেছিল—সেই জন্যে একটা স্বাভাবিক সহানুভূতিতেই এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এইবার একটা দুটো সাধারণ কথা বলে আবহাওয়াটাকে অপেক্ষাকৃত সহজ করে আনল।

একথা-সেকথার পর সে আসল প্রশ্নে পেঁছিল। যে কৌতূহলটা মনের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে সেটা আর চেপে রাখতে পারল না।

'আচ্ছা ভাই চ্যাটার্জি, এই বেগমসাহেবা, মানে এ মহিলার সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় কী করে হ'ল?'

হীরালাল একটু চুপ করে থেকে তার কাহিনীটা বিবৃত করল। তার বক্তব্য বেশি নয়—সহজ সংক্ষিপ্ত কথায় হুসেনী বেগমের সঙ্গে তার আকস্মিক পরিচয়ের ইতিহাস থেকে শুরু করে গত রাত্রির ঘটনা পর্যন্ত সবই খুলে বলল। সে যে কাল মিচেলেরও আগে আমিনাকে দেখেছিল এবং তাকে দেখেই যে কোন একটা মৃত্যুফাঁদ আশঙ্কা করেছিল, আর শেষকালে যে ওর জন্যেই মিচেলের কাছ থেকে আধ ঘণ্টা সময় চেয়ে নিয়েছিল—এসব কিছুই গোপন করল না। আজ আর গোপন করার প্রয়োজনই বা কী?

পরিশেষে বলল, 'কাল যখন কথাটা বলেছিলেন তখন অতটা বুঝি নি, আজ বুঝছি। তিনি জীবিত থাকতে আমি তাঁকে ছাড়ব না জেনেই প্রায় স্বেচ্ছায় প্রাণ দিয়ে আমাকে মুক্ত করে দিয়ে গেলেন।'

সে আবারও হু-হু করে কেঁদে উঠল।

বিলি আস্তে আস্তে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'তুমি অনর্থক দুঃখ করছ চ্যাটার্জি। সমস্ত ঘটনারই একটা পরিণতি আছে, সেই সঙ্গে ভাগ্যেরও। এ-ই ওঁর জীবনের—ভাগ্যের পরিণতি—তুমি বা ওয়ালেস উপলক্ষ্য মাত্র।'

আবার কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করে রইল। বিলি একবার নিঃশব্দে ওয়ালেসের দিকে তাকাল—কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে বোধ করি ওর ভরসায় কুলোল না।

ওয়ালেস এতক্ষণ চুপ করে বসে শুনছিল। ঠিক চুপ করেও না—ওর ঠোঁট দুটি নিঃশব্দে নড়ছিল। সম্ভবত মনে মনে নিরন্তর প্রার্থনাই করে যাচ্ছিল মৃতের আত্মার জন্য, অথবা বাইবেল আবৃত্তি করছিল। সে এইবার কথা

কইল। বলল, 'আমার কাহিনী এ জীবনে আর কাউকে বলব না ভেবেছিলাম, ঠিক বলবার মতও নয়। তবে হীরালালকে বন্ধু বলেছি, আর বিলি তুমি ওর বন্ধু। এখন মনে হচ্ছে তোমাদের কাছে বলা দরকার—না বললে বুঝি আমার এক মহৎ পাপ, এক ঘোর অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। ভুলই সেটা আমার—কিন্তু যে ভুলে এতগুলো লোকের সর্বনাশ হয়ে যায়, এক মহান প্রাণ এমন করে জ্বলে ও জ্বালিয়ে ছারখার হয়—সে ভুল করার আমার কোন অধিকার ছিল না।...সেইটেই আজ বলব।...অবশ্য কাজ আর এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউই বেঁচে নেই—প্রায়—অন্তত এ কাহিনী প্রচারিত হলে ক্ষতি হতে পারে এমন কেউ নেই সুতরাং প্রত্যবায়ভাগী হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

এই বলে আরও কিছুক্ষণ মৌন থেকে ধীরে ধীরে আবার বলতে শুরু করলে সে। বলতে বলতে সংকোচ ও কুণ্ঠায় বার বার কণ্ঠ জড়িয়ে যেতে লাগল, অন্তরে অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল—তবুও থামল না। কঠোর কর্তব্য অপ্রিয় হলেও যেমন ভাবে পালন করে মানুষ, তেমনি ভাবেই সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনী বিবৃত করে গেল।

'ওয়ালেসও যেমন আমার নাম নয়—তেমনি ওরও নাম হোপ নয়। কিন্তু কী হবে আসল নাম বলে, মিছিমিছি পূজনীয় পূর্বপুরুষদের নামে খানিকটা কালি দিয়ে। যে নামের মর্যাদা আমরা রাখতে পারি নি—যে নাম আমরা গৌরবমণ্ডিত করতে পারি নি, সে নামে আমাদের অধিকার নেই।

'আমরা দুজনেই ভারতে এসেছিলাম অতি শৈশবে। আমাদের বাবারা ছিলেন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পদস্থ কর্মচারী। তার মধ্যে আমার বাবা ছিলেন যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, সেনাপতি। আমাদের ভাল করে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে ওঁরা দুই বন্ধু ব্যবস্থা করে তাঁদের পরিবার রেখেছিলেন স্থায়ীভাবে হিমালয়ের ওপরে এক পাহাড়ী শহরে। সেখানে আমরা এক সাহেবী স্কুলে পড়তাম, সেইখানেই থাকতে হ'ত—তবু কাছাকাছি থাকবেন বলে মায়েরাও গিয়ে ওখানে বাসা বেঁধেছিলেন। ঐখানেই আমাদের সঙ্গে পরিচয় হয় আমিনাদের। ওর বাবা খুব বড় জায়গীরদার ছিলেন—এ দেশের পুরোনো জমিদার বংশের লোক হলেও ওঁর মতামত ছিল খুব আধুনিক। ছেলে-মেয়েদের ইংরেজি পড়ানো দরকার এটা তিনি বুঝেছিলেন। ছেলেকে লক্ষ্ণৌ-এর এক মিশনারী স্কুলে পড়িয়ে রুড়কিতে পাঠিয়েছিলেন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে আর মেয়েদের দিয়েছিলেন আমাদের ঐ শহরের এক কন্‌ভেন্টে। মেয়েদের টানে ওঁরাও মাঝে মাঝে আসতেন—সেজন্যে ওখানে একটা বাড়িও কিনেছিলেন।

'একই শহরে বাস—তা ছাড়া আমিনার বাবা ছিলেন সাহেবভক্ত মানুষ—কাজেই আমাদের তিন পরিবারে ঘনিষ্ঠতা হতে দেরি লাগে নি। অল্প বয়সে বন্ধুত্ব হয় বড় সহজে—ফলে শীগগিরই আমিনা-আজিজন ওদের দুই বোনের সঙ্গেও আমাদের বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। সে পরিচয় অচিরে অন্তরঙ্গতায় দাঁড়াল।

'ওরা দুই বোন হলেও ওদের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজিজন বরাবরই চপল চটুল কৌতুকপ্রিয়। আমিনা স্থির, ধীর, বেশী বুদ্ধিমতী। আমাদের দুই বন্ধুর প্রকৃতিও ছিল কতকটা অমনি। আমি আমার বাবার

কাছ থেকে তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তির কিছুটা পেয়েছিলাম, কিন্তু হোপের ওসবের বালাই ছিল না। কিছুই মানত না—সুখ ভোগবিলাস ছাড়া কিছু জানতও না সে। জেদী দুর্দান্ত মেজাজের ছেলে ছিল। ফলে ওদের দুই বোন একটা সূক্ষ্ম অলক্ষ্য নিয়মে আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। আমিনা পড়ল আমার ভাগে. আজিজন হোপের। এক কথায় জোড় বেঁধে গেলাম আমরা।

'তরুণ-তরুণীর বন্ধুত্ব প্রণয়ে পরিণত হতে দেরি হয় না। আমাদেরও হ'ল না। শৈশবের খেলার সাথী যৌবনে প্রণয়ীতে পরিণত হবে এটা স্বাভাবিকও। আমরা স্থির করলাম আমরা কোন পারিবারিক বাধা মানব না—আমরা ওদেরই বিয়ে করব। আমিনার বাবার আপত্তি হ'ত না—হ'ত আমাদের বাপ-মায়ের, সেই জন্যই জীবিকা সংস্থানের কোন একটা উপায় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম আমরা। কিন্তু হোপের ধৈর্য ছিল না—বিয়ের আগেই আজিজনের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পাতিয়ে বসল। আমি এ নিয়ে তাকে অনেক তিরস্কার করলাম, কিন্তু সে হেসে উড়িয়ে দিল, বললে—যা হবেই, তা দু'দিন আগে হলে ক্ষতি কী পাদরীসাহেব?

'কোন জিনিস করায়ত্ত হয়ে গেলে তাতে আর বিশেষ স্পৃহা থাকে না। হোপেরও রইল না। আজিজন সম্বন্ধে কৌতূহল মিটে গেছে তার—এবার সে নতুনের জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। এ মনোভাবটা আমি বুঝেছিলাম—বুঝি নি কেবল যে, সে নতুন লক্ষ্য তার কোন্‌টি। সে যে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে—তা আশৈশব তাকে দেখেও বুঝি নি। একদিন...... একদিন একা বেড়াতে বেরিয়ে...আমিনার মাথা ধরেছিল বলে বেরোতে চায় নি...আমি একাই বেরিয়েছিলাম...হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে আমাদের একটি প্রিয় পরিচিত জায়গাতে গিয়ে পড়লাম। সেখানে উঠতে উঠতে দূর থেকেই এক নাটকীয় দৃশ্য চোখে পড়ল। এক পলকই দেখেছিলাম—কিন্তু তা-ই যথেষ্ট, আর বেশি দেখবার ইচ্ছা ছিল না। সেই এক লহমাতেই সমস্ত মানুষ, সমস্ত পৃথিবী, ঈশ্বরের সৃষ্টি এই জগৎ সংসার তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে গেল। জীবনে আর কোন স্বাদ রুচি রইল না—যা কিছু তার রঙ রস, সব চলে গেল—ধূসর বিবর্ণ হয়ে গেল সব কিছু। আমিনাকে উপলক্ষ্য করে সমস্ত নারীজাতির ওপরই আমার একটা প্রবল ঘৃণা এসে গেল।

'সেখানে আর দাঁড়ালাম না। একেবারে পাগল হয়েই গিয়েছিলাম বোধ হয়—তাই এতদিনের সম্পর্কে এত সুগভীর ভালবাসায়ও এতটুকু বিশ্বাস রাখতে পারলাম না। সেই দিনই বাড়ি ছেড়ে. সে শহর ছেড়ে চলে এলাম চিরদিনের মত। কত বড় অবিচার. কত বড় অন্যায় যে করে এলাম তা একবারও মনে করলাম না—যা দেখলাম তার যে অন্য কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে তাও মনে পড়ল না—নিজের অহঙ্কারে ঘা পড়ে এমনই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। শুধু কি তাই? শহর ছাড়ার পথে নিশীথরাত্রে পথের ধারে সে এসে দাঁড়িয়েছিল—হয়তো চরম অপমানের প্রতিকার প্রার্থনাতেই—কিন্তু আমি সেটাকে চূড়ান্ত অভিনয় মনে করে ঘোড়ার উপর থেকেই তাকে এক লাথি মেরে চলে এলাম। ওঃ ভগবান! সেই দিনই কেন মৃত্যু হয় নি আমার!

'এ ভুল ভাঙল অনেকদিন পরে। ইংলণ্ডের এক ক্লাবে নেশার ঝোঁকে

গর্ব করে বলছিল ঐ পাপিষ্ঠটা—কেমন আমাকে বোকা বানিয়েছে—কেমন করে আমার ওপর এক হাত নিয়েছে সে। সেই দিনই জানলুম—মাথাধরা অসহ্য হওয়াতেই বেচারী খোলা হাওয়ায় বেরিয়েছিল শেষ পর্যন্ত এবং সম্ভবত আমি আমাদের প্রিয় জায়গাতে থাকব মনে করে সেখানেই গিয়েছিল। আমার বদলে দেখেছিল হোপকে—তখনই চলে আসছিল, কিন্তু ঐ পশুটা আসতে দেয় নি। ওর মধ্যে তখন দানব জেগেছিল—সেই দানবটার শক্তির কাছে তার আর কতটুকু ক্ষমতা।

'তখনই ওকে শেষ করতাম। ওর মত পশুর সঙ্গে ডুএল লড়াও পাপ—হত্যাই করতাম—কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ পাপিষ্ঠটা আর এক সর্বনাশ করেছিল। আমারই এক আত্মীয়-কন্যা কন্স্ট্যান্স বলে একটি মেয়ের হৃদয় চুরি করে বসে আছে। তলোয়ার হাতে আমাকে আসতে দেখে সে আমার পায়ে আছড়ে পড়ল; তাতেও হয়তো শুনতুম না—কিন্তু বাইবেলের বাণী শুনিয়ে আমাকে সে নিরস্ত করলে। বললে, প্রভু বলেছেন Vengeance is mine, I shall repay, তুমি প্রতিশোধ নেবার কে?...ফিরে এলাম—তবে তাকে দিয়েও প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম যে সে হোপকে বিয়ে করতে চাইবে না কোন দিন।

'তখনই ছুটে এসেছিলাম ভারতবর্ষে, কিন্তু ওদের কোন পাত্তা পেলাম না। ওদের বংশের এক পুরাতন সেবক সর্দার খাঁ ও ওদের পুরনো গৃহ-শিক্ষক আমেদ-উল্লাকে খুঁজে বার করলাম। একই কথা শুনলাম—ইজ্জৎ ওদের প্রাণের চেয়েও বড়—সেই ইজ্জতের অপমান সইতে পারে নি—সেই দিনই ওরা দুই বোন গৃহত্যাগ করেছে। কোথায় গেছে তা কেউ জানে না।

'তার পর থেকে একই লক্ষ্য হয়েছিল আমার—জীবনের একই উদ্দেশ্য—ঐ পাপিষ্ঠটার মৃত্যু দেখব।...তাই ছায়ার মত অনুসরণ করেছি ওকে। ওর শাস্তি ও পেয়ে গেছে অবশ্য, ঈশ্বরের বিচারে এতটুকু ভুল হয় নি—কন্স্ট্যান্সকে ও সত্যিই ভালবাসত—কিন্তু তাকে বিয়ে করতে পারে নি—পারে নি আমারই জন্যে, ওর প্রাণের ভয়েই কন্স্ট্যান্স ওকে বিয়ে করে নি। তা ছাড়া, জীবনে শান্তি পায় নি একটুও—মূর্তিমান দুর্গ্রহের মত, অভিশাপের মত আমি পাশে পাশে থাকতাম। ইদানীং ওরও মৃত্যুই কাম্য হয়ে উঠেছিল—শুধু পারে নি কনির জন্যই...কনিও গেল। সবাই গেল।... আমারও আর কেউ রইল না পৃথিবীতে। যে ঘৃণাকে অবলম্বন করে সব ব্যর্থতা ভুলে ছিলাম—সেটাও আর রইল না।'

ভগ্নকণ্ঠে কথাগুলো বলে থামল ওয়ালেস। শেষের দিকে গলা বুজে এসেছিল ওর—এখন যেন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আবেগে বুকের কাছটা ফুলে ফুলে উঠছে—হতাশ্বাস, ব্যথা, একটা ঐকান্তিক আর্তি যেন এক-সঙ্গে নিরুদ্ধ বেগে মাথা কুটছে তার বুকে, প্রকাশের পথ পাচ্ছে না।—এমনি ভাবেই সমস্ত শরীর তার কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

হীরালাল আর মিচেল যেন সম্মোহিতের মত শুনছিল এই কাহিনী। অত্যাশ্চর্য অলৌকিক সে ইতিহাস। উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর, উপ-ন্যাসের মতই অবিশ্বাস্য।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে হীরালাল কথা কইল, বলল, 'এখন কী করবেন?'

'করব?' একটু ম্লান হাসল ওয়ালেস. 'কী করব তা জানি না। ঈশ্বর যা করাবেন। আত্মহত্যার অধিকার নেই—নইলে তাই করতুম।'

দুজনেব দীর্ঘ ইতিহাসে রাত কত হয়েছে কেউ-ই খেয়াল করে নি। হঠাৎ পত্রপল্লব কাঁপিয়ে ভোরাই হাওয়া উঠল একটা। প্রথম পাখী ডেকে উঠল ওদের মাথার ওপর। চমকে উঠল ওরা তিনজনেই।

'ইস! ভোর হয়ে গেল যে। একটু পরেই বিউগ্‌ল্‌ বাজবে। চল ওঠা যাক।' বিলিই সকলকে সচেতন করবার চেষ্টা করে।

'চল' বলে ওয়ালেস উঠে দাঁড়াল।

'তুমি এখন কোথায় যাবে চ্যাটারজি?' প্রশ্ন করল ওকে।

'আমি!' একটু চুপ করে থেকে হীরালাল বলে, 'যদি সকালটা একটু ছুটি নিতে পারি, ওঁর মাটি দেওয়ার সময়টা সেখানে যাব। সে সময়টা একটু থাকবার ইচ্ছা আছে।'

ওয়ালেস মুহূর্তকাল চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল—তার পর জামার বোতামটা খুলে বুকের মধ্যে থেকে টেনে বার করল একটা হার আর তার সঙ্গে একটা লকেট। একবার লকেটটা খুলে যেন দেখতে গেল. পরক্ষণেই কী মনে করে সবসুদ্ধ হারটা হীরালালের শিথিল হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললে. 'এটা তুমিই রাখ বন্ধু, এটাতে তোমারই অধিকার বেশি।...আর, আর যদি পার তো মাটি দেবার সময় আমার নাম করেও একমুঠো মাটি আর কটা ফুল ওর কাফনের উপর দিও—আর সেই সময় চুপি চুপি ওকে আমার দুটো কথা ব'ল.—তোমাকে সে ভালবাসত, তোমার কথা বিশ্বাস করবে। তাকে ব'ল, আমাকে যেন সে ক্ষমা করার চেষ্টা করে। ব'ল যে আমি সত্যিসত্যিই অনুতপ্ত—সারাজীবন ধরে সে অনুতাপ বহন করে বেড়িয়েছি আর বেড়াব। ব'ল—'

কথাটা শেষ করতে পারে না ওয়ালেস, আবারও গলা বুজে আসে তার। কিন্তু আর অবসরও মেলে না কিছু বলবার। তার আগেই দূরে কোথায় বিউগ্‌ল্‌ বেজে ওঠে।

সে ধ্বনিতে আছে কর্মের আহ্বান কর্তব্যের আহ্বান। হৃদয়াবেগের জড়তা থেকে মুক্তি।

ওরা দুজনে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

পৌষ-ফাগুনের পালা

গ্রন্থারম্ভ

ভোর হ'তে না হ'তে আসতে শুরু হয় হাওড়া ও শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে প্ল্যাটফর্মে—কেরাণী ও কুলিবোঝাই ট্রেনগুলো। হাজার হাজার মানুষ নামে সে সব গাড়ি থেকে। লিলুয়া-বেলুড়-দমদমের নানান কারখানার শ্রমিক এরা, অসংখ্য অগণিত অফিসের কেরাণী। এই দু দলই বেশী—কিন্তু তা ছাড়াও আসে বহুরকমের মানুষ, সারাদিন ঘুরে ঘুরে গস্ত ক'রে সন্ধ্যার সময় ফেরে বিপুল মালের বোঝা টেনে; আসে হোটেল-রেস্তোরাঁ মিষ্টান্নভাণ্ডারের বয়-খানসামা-কারিগর; বিপুল পণ্যের পসরা নিয়ে আসে ব্যাপারীর দল, শাকসব্জী-ফলমূলের ফসল নিঃশেষ ক'রে টেনে আনে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে; ইস্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরাও আসে কিছু কিছু; আসে কর্মপ্রার্থী বেকারের দল। আরও ছোট-বড় বহু উদ্দেশ্য ও আশা নিয়ে আসে বহু বিচিত্র মানুষ। সকাল থেকে বেলা দশটা-এগারোটা পর্যন্ত বিরাট জনতা দলে দলে এসে পৌঁছতে থাকে এই সুবিপুল মহানগরীর দুটি দ্বারপ্রান্তে।

এরা থাকে নানান জায়গায়। বহুদূরে—চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল কিংবা আরও দূরে থাকে কেউ কেউ। দূরবর্তী স্টেশন থেকেও হয়ত দু-তিন মাইল তফাতের ঝিঁঝিঁ-ডাকা, জোনাকি-জ্বলা জনবিরল নিভৃত গ্রাম সে-সব। আবার খুব কাছাকাছি জায়গা থেকেও আসে অনেকে। কলকাতার একেবারে কাছে, গায়ে-গায়ে লেগে থাকা গণ্ডগ্রাম ও উপনগরীর জনাকীর্ণ স্টেশন থেকেও বিস্তর লোক আসে। সংখ্যায় এরাই বরং বেশী। বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, কালিঘাট, উল্টোডাঙ্গা, দমদম, আগরপাড়া, সোদপুর, বালি, উত্তরপাড়া, বেলুড়, রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি, মৌরীগ্রাম, কদমতলা, বড়গেছে, মাকড়দা—আরও অসংখ্য নামের স্টেশন থেকে আসে তারা গাড়ি-বোঝাই হয়ে। ট্রেনগুলো যেন অজগরের মতো স্টেশনে স্টেশনে গিলতে গিলতে আসে মানুষগুলোকে—একেবারে এখানে পৌঁছে উগরে দেয়। ঐটুকু ট্রেনের একটা কামরায় অতগুলো মানুষ ছিল তা চোখে দেখেও বিশ্বাস হ'তে চায় না। যেমন বিশ্বাস হ'তে চায় না কাছাকাছির ঐসব স্টেশনগুলোয় দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য লোক শেষ পর্যন্ত উঠবে এই ঠাস-বোঝাই কামরাগুলোর মধ্যে।

নিঃশেষে শুষে নেয় এই শহর আর তার আশপাশের কলকারখানা অফিসগুলো—বহুদূরস্থিত উপকণ্ঠের কর্মক্ষম মানুষগুলোকে। অনেককে ভোরবেলাই বেরোতে হয়—ফেরে একেবারে রাত্রে। বহুদূরের গ্রাম থেকে আসে যারা, অথচ ঠিক আটটায় যাদের হাজিরা দিতে হয়, তাদের কেউ কেউ সূর্য অনুদয়েই ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। গরমের দিনেও দিবালোকে তাদের মুখ দেখতে পায় না ঘরের লোক। মেচাদা-বাগনান থেকে যারা লিলুয়ার কারখানায় চাকরি করতে আসে, তাদের ছেলেমেয়েরা রবিবার বাড়ির মধ্যে একটা অপরিচিত লোককে ঘোরাফেরা করতে দেখে অবাক হয়ে যায়।

এমনি করে আসতে আসতে বেলা দশটার মধ্যেই নিঃশেষে চলে আসে খেটে-খাওয়া মানুষের দল। পড়ে থাকে শুধু রুগ্ন অশক্ত শিশু ও ছেলেমেয়েরা। তারপর সারাটা দিন যেন ঘুমিয়ে থাকে এই সব জায়গাগুলো।

এখন—এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা লাভ ও ভারতভঙ্গের পর হয়ত আর অতটা নেই। এই শহর এগিয়ে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। এখন জনবিরল ও নিভৃত সুপ্ত-শান্ত গ্রাম খুঁজে পাওয়া কঠিন। অসংখ্য সমস্যার জটিল ও কুটিল ঘূর্ণাবর্তে শান্তি বা সুপ্তি গেছে তলিয়ে। কিন্তু উনিশ শ' কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশেও এরকম ছিল না। তখন সকাল আটটা থেকেই এই সব জায়গাগুলোতে শুরু হয়ে যেত প্রমীলার রাজত্ব। আপন আপন গৃহস্থালিতে খেটে খাওয়া বাঁধা জীবনযাত্রার মেয়ে তারা। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল সীমিত, শক্তি ছিল সামান্য। তাদের জ্ঞান ছিল সংসারের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ। অতি সংকীর্ণ গণ্ডীবাঁধা পথে আবর্তিত হ'ত তাদের জীবনযাত্রা। বাইরের বিপুল জগৎ তাদের কাছে অস্পষ্ট ধারণার বস্তু মাত্র। সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজেদের বিশেষ বিশেষ সমস্যার ঠুলি পরে তারা সংসারের ঘানি-গাছে ঘুরে মরত দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। ছোট ছোট সুখ-দুঃখ ছোট ছোট আশা-কামনা—অতি ক্ষুদ্র স্বার্থ-বুদ্ধি কলহ-কচকচির মধ্যেই একদিন তারা চোখ মেলত এ-পৃথিবীতে; আবার তার মাঝেই একদিন বুজে যেত সে-চোখ চিরকালের মতো। অতি ছোট ছোট তৃপ্তি বা অতৃপ্তি বুকে নিয়ে সেদিন যাত্রা করত তারা বিধাতার দরবারে—যিনি এ পৃথিবীতে পাঠিয়েও তার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয়ের সুযোগ দেন নি তাদের।

আমার এ কাহিনী আরম্ভ হচ্ছে এমনি সময়েই—এমনি মানুষদের নিয়েই। শ্যাওলাদামে ভর্তি টোপাপানায় ঢাকা ডোবার মতোই নিস্তরঙ্গ তাদের জীবন। সেখানে বাইরের ঝড়ঝাপটা সামান্য স্পন্দন মাত্র জাগাতে পারে—তরঙ্গ তুলতে পারে না। বাহির বিশ্বের বিপুল কোন বিপর্যয় তাদের কাছে দূরশ্রুত মেঘ-গর্জনের মতোই, বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস তাদের অলস-অবসর বিনোদনের উপাদান মাত্র। সে-সব যুগান্তকারী ঘটনার পরিণাম তাদের কাছে অকিঞ্চিৎকর, তার থেকে নিজেদের কূপমণ্ডুক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্যাও ঢের বড়।

তবু কাল বদলায়। বিশ্ব-সংসার নিজের নিয়মে আবর্তিত হয়। সে পরিবর্তন তাদের আপাত-স্থির জীবনেও চাঞ্চল্য আনে, ভাঙ্গন সৃষ্টি করে।

এ কাহিনী সেই নিস্তরঙ্গতার ও সেই চাঞ্চল্যের। সেই স্থাবরতার ও সেই ভাঙ্গনের।

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

লোকে বলে ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়—এ হবেই। যে সৎপথে থাকে, যে ধর্মকে ধরে থাকে শেষ পর্যন্ত তারই জিৎ হয় এ সংসারে। বহু লোকের মুখেই কথাটা শুনেছে মহাশ্বেতা। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছে। নানা বিভিন্ন রূপে, নানা বিভিন্ন শব্দবিন্যাসে। তবে শব্দে বা রূপে যে তফাৎই থাক—সব কথারই সার-মর্ম এক। দীর্ঘ-দিন ধরে শোনার ফলে বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল কথাটায়। আর সেই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি ক'রেই দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে একটা অস্পষ্ট আকারহীন আশার প্রাসাদও গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সে প্রাসাদের ভিত্তিমূল এবার নড়ে উঠেছে, সেই বিশ্বাসটাকেই আর ধরে রাখা যাচ্ছে না কোনমতে।

'মিছে কথা! মিথ্যে কথা ওসব! কথার কথা। লোকের বানানো গালগপ্প!...ধম্মপথে থাকো তাহ'লেই তোমার সব হবে। মুখে আগুন অমন সব হওয়ার। মুড়ো খ্যাংরা

মারতে হয় তমন একচোকো ধম্মের মুখে আর ঐ ধম্মের গৎ যারা আওড়ায় তাদের মুখে! গুণে গুণে সাত ঘা ঝ্যাঁটা মারতে হয়! আমার দরকার নেই আর ওসব ধম্মের বুলিতে। অরুচি ধরে গেছে একেবারে। জম্মের শোধ অরুচি ধরে গেছে। সব মিছে, সব ভূয়ো।—আসল কথা যে যা সুবিধে করে নিতে পারো এ সংসারে—নাও। হরেহম্মে হোক, লুটপাট করে হোক—আপনার কাজটি বাগিয়ে নাও—তোমারই জিৎ। কিচ্ছু হবে না। হবেই বা কি? অকা সরকার বলত না যে মাকড় মারলে ধোকড় হয়—চালতা খেলে বাকড় হয়, তাই ঠিক।...যার বুদ্ধি আছে, ক্ষ্যামতা আছে, বুকের পাটা আছে—এ সংসারে তারই জয়-জয়কার—বুঝেছ? খোদ ভগবানও তাকে ভয় করে চলে।'

কথাগুলো যে কাকে বোঝায়—নিজেকে না প্রতিপক্ষকে, তা মহাশ্বেতা নিজেও জানে না। বেলা নটা দশটার সময় পুকুরঘাটে যখন কেউ থাকে না তখন সকালের এক-পাঁজা এঁটো বাসন নিয়ে গিয়ে জলে ভিজোতে দিয়ে বসে বসে আপনমনেই গজরাতে থাকে সে। যেন বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করে।

মাঝে মাঝে শ্রোতাও জুটে যায় অবশ্য। ওবাড়ির জাঠতুতো বড় জা লীলার মা মাঝে মাঝে এই সময়টায় ঘাটে আসেন। তাঁর ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে, দুই বৌ-ই বলতে গেলে সংসার বুঝে নিয়েছে—সুতরাং কাজ কম। প্রথম প্রথম বৌদের সঙ্গে ঝগড়া করে দিন কাটত, এখন তারাই গিন্নি, তাদের স্বামীর রোজগারে সংসার চলে, কাজেই সেদিক দিয়ে বেশী সুবিধে হয় না। একটা কথা বললে তারা দশটা শুনিয়ে দেয়। এখন সকাল থেকে একটি গামছা কোমরে, একটি গামছা বুকে দিয়ে তিনি বাগানে ঘুরে বেড়ান। নিজের বাগানে উচ্ছে গাছে ঠেকো দেওয়া, শসা গাছের মাচা ঠিক করা হয়ে গেলে—কোন কোন দিন নিচু বেড়া ডিঙ্গিয়ে এসে এদের বাগানেরও তদ্বির করেন। অবশ্য একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে নয়—কারণ যেমন নিঃসঙ্কোচে তিনি এসে এদের বাগানে বেগার খাটেন তেমনি নিঃসঙ্কোচেই যাবার সময় এদের বাগান থেকে ডুমুরটা, খাড়াটা—সুবিধে হ'লে গোটাকতক আমড়া, এমন কি কাঁদি থেকে দুটো চারটে কাঁচ-কলাও পেড়ে নিয়ে যান। এরা তা' জানে, কারণ লীলার মা চুরি করেন না—প্রকাশ্যেই নেন। প্রমীলা প্রথম প্রথম ঝগড়া করত—বৃথা দেখে এখন আর করে না। লীলার মা সপ্রতিভভাবেই হেসে বলতেন, 'রাগ করিস কেন নতুন বৌ, এ তো আমার নেয্য পাওনা—ফী। কাজ করে দিই—তার মজুরী নেই?'

প্রমীলা হয়ত বলত, 'কে কাজ করতে বলে আপনাকে? কে সাধে?'

'ওমা—সাধাসাধির আবার কী আছে? এ তো পরের বাগানের কাজ নয়—আপনার লোক, দশরাত্তিরের জ্ঞাতি। আমারটা করব তোদেরটা করব না? এ আবার কি কথা!'

ভোর থেকে বাগানের তদ্বির ক'রে এই সময়টা লীলার মার স্নান করতে আসার সময় হয়। বিশেষ করে মহাশ্বেতার গলার আওয়াজ পেলে হাতের দুটো একটা কাজ বাকী রেখেও চলে আসেন। ওধারের ঘাটের একটা পৈঠেতে বসে হাঁক দিয়ে প্রশ্ন করেন, 'কী হ'ল লা সেজ বৌ, আজ আবার ধম্মকে নিয়ে পড়লি কেন?'

'এর আবার পড়াপড়ির কি আছে! অসহ্যি হয় বলেই বলা। তোমরা তো দেখছ, সেই সাত বছরের মেয়ে এদের বাড়ি এসেছি, একদিনের জন্যে কারুর মন্দ করেছি, না কারুর কুচ্ছো করে বেড়িয়েছি? ভূতের খাটুনি খেটেছি চিরকাল—গুরুজনরা যা বলেছে করেছি; কখনও উঁচু বাগে চেয়ে দেখেছি এমন কথাও কেউ বলতে পারবে না...তা কী ফলটা হ'ল বলতে পারো? আমি যে দাসী সেই দাসীই রয়ে গেলুম এ বাড়িতে। যিনি রাণীগিরি করতে এসেছিলেন তিনি রাণীগিরি করে যাচ্ছেন। এই কি ধম্মের বিচার হ'ল? কেন, আমি তাঁর কি করেছি?'

কৌতুকের ও তৃপ্তির হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায় লীলার মার। যতদূর সম্ভব কণ্ঠে সহানুভূতি টেনে এনে বলেন, 'আর দুটো চারটে বছর কাদায় গুণ ফেলে কাটিয়ে দে, তারপর আর তোর ভাবনা কি? ষেটের এখনই তো তোর ছেলেরা সব মাথাধরা হয়ে উঠেছে, ওরাই তো বড়ো—দুদিন পরে তো ওরাই বাড়ির কর্ত্তা হবে। তখন তোর কাছেই জোড়হস্ত থাকতে হবে সবাইকে।'

'ওগো রেখে বোস, রেখে বোস। ওসব কথা আমাকে শোনাতে এসো না। বলে অত সুখ তোর কপালে, তবে কেন তোর কাঁথা বগলে!...আমার কপাল কত পোস্কার দেখছ না। আমার দিদ্‌মা বলতেন যে, যে আঁটকুড়ো হয় তার পৌত্তুরটি আগে মরে।...ছেলে-দের কথা আর তুলো না। ওরা আরও এক কাটি সরেশ। নিজেরা তো নিজেদের গণ্ডা বুঝে নিতে পারেই না, আমি কিছু বলতে গেলে উল্‌টে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। ...হবে না, কেমন ঝাড়ের বাঁশ সব। ওদের গুষ্টি চিরকাল মহারাজা মহারাণীর সামনে হাতজোড় করে কাটালে আর যথাসম্ভব এনে তাদের খপ্পরে তুলে দিলে—ওরাও তাই শিখবে তো! এখনই সপুরী সব সেইখেনে দেখগে যাও হাতজোড় করে আছে। তাও যদি তারা মুখপানে চাইত একটু।...লজ্জা ঘেন্না পিরবিত্তি কিছু কি আছে ওদের! থাকবেই বা কি করে, জম্মে এস্তক যা দেখছে তাই তো শিখবে! বলে আগন্যাঙলা যেমনে যায় পেছন্যাঙলা তেমনে ধায়। ঝ্যাঁটা মারো এমন সংসারে আর এমন ছেলে-পুলেতে!'

নির্গমনের পথ পেলেই নাকি বাষ্পের বেগ প্রবলতর হয়ে ওঠে, সেইটাই নাকি বাষ্প-যন্ত্রের মূল কথা। মহাশ্বেতার অন্তরের পুঞ্জীভূত বিষ-বাষ্পও বহিরাগমনের এই সামান্য পথ বেয়ে প্রবলতর বেগ ধারণ করে। তারই উত্তেজনায় সে আর কিছু করার মতো খুঁজে না পেয়ে হাত দিয়ে ঢেইয়ে জল তুলে তুলে অকারণেই ঘাটের পৈঠে-গুলোকে ধুতে শুরু করে!

আসলে মহাশ্বেতার সবচেয়ে বড় ব্যথার জায়গাটাতেই ঘা দিয়েছেন লীলার মা।

জীবনে সব কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে মনে মনে এই শেষ আশাটিকেই ধরে ছিল সে। ছেলেরা তো তার আপন, ওরা তো তার পেটেই হয়েছে—ওদের ওপর তার কর্তৃত্বটা খাটবে। আর ওরা বড় হয়ে উঠলে সেই কর্তৃত্ব একদিন সংসারের ওপরও প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু সেই সর্বশেষ আশাটিতেই বুঝি ছাই পড়তে যাচ্ছে। ছেলেরা কেউ লেখা-পড়া শেখে নি, কেউ শিখছে না— । ওর মা বলেন, 'বামুনের ঘরের গোরু! ওরে তোর জন্মদাতাকে দেখে শিখলি না—ভদ্দরলোকের ছেলে বামুনের ছেলে মুখ্যু হ'লে কী হয়। যেমন করে পারিস লেখাপড়া শেখা। খানিকটা অন্তত ইংরিজী শিখুক। করছিস কি!' কিন্তু সেটা নিয়ে তত মাথা ঘামায় না মহাশ্বেতা। সে জানে যে এদের বংশে তেমন কেউ হবে না। লেখাপড়া শিখুক না শিখুক—ওদের দাদামশায়ের মতো অমানুষ হয়ে উঠবে না। সভ্যতা সহবৎ এ আর নতুন ক'রে জানবার দরকার নেই, এ ওদের মধ্যেই আছে। এদের—মানে ওদের বাপ-কাকার ধারা খানিকটা তো পাবেই।...আর রোজগার? তার জন্যেও ভাবে না সে। ওদের গুষ্টিরা কে কত লেখাপড়া শিখেছিল? তারা যদি মোট মোট টাকা রোজগার করে আনতে পারে—ওরা পারবে না! সে একরকম ঠিক হয়েই যাবে, বয়স বাড়লেই বাপ-কাকারা যেখানে হোক ঢুকিয়ে দেবে।...ওদের বাপ-কাকার সে আমল থেকে কালের হাওয়া যে খানিকটা পাল্‌টেছে, এ কথাটা মহাশ্বেতার মাথায়

ঢোকে না। সেটা বোঝবার মতো শিক্ষাদীক্ষা বা অনুকূল আবহাওয়া কিছুই তো সে পায় নি!

না, সে সব চিন্তা নেই ওর।

ওর জ্বালা অন্যত্র। ছেলেগুলো, মেয়েটা—যত বড় হচ্ছে সব যেন এক-কাঠ্‌ঠা হচ্ছে, সবাই গিয়ে জড়ো হচ্ছে ওদিকে, শত্রুর দিকে। কেউ কি তার দিক টানতে নেই! এই জন্যেই তো আরও এত আক্রোশ ওর জায়ের ওপর। গুণতুক যে কিছু করে সে সম্বন্ধে মহাশ্বেতার মনে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু কেন? কেন? এত করেও কি আবাগী সর্বনাশীর মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল না? ছেলের বাপকে তো স্বামী-স্ত্রী মিলে চিরকাল ভেড়া করে রাখলে—আবার ছেলেমেয়েগুলোকেও ধরেছে! মেয়েটাও তো ওর দিকে হ'তে পারত! কী মন্তর যে ঝাড়ে মেজবৌ, ছেলেমেয়েগুলো সব যেন ওর কথায় ওঠে বসে। একটা কিছু বলবার জো নেই—নেয্য কথা, যথা-কথা বলবার থাকলেও বলতে পারে না—ঐ ওদের জন্যে। শত্রু হাসবার লজ্জায় অপমানে সরে আসতে হয় মুখে কুলুপ এঁটে।

এ বাড়িতে এসে পর্যন্ত কম সইতেও তো হ'ল না মহাশ্বেতাকে। সাত বছরের মেয়ে সে এসেছে বৌ হয়ে—এখনকার দিনে সে বয়সে মেয়েরা পুতুল খেলে। সাত বছরের বৌ আর বাইশ বছরের বর। কথাটা শুনলে হাসে সবাই। এমন কি সেদিনও হেসেছিল অনেকে। কিন্তু এমন অসম বিবাহ দেওয়ার জন্যে মহাশ্বেতা অন্তত তার মাকে দোষ দিতে পারে না। সেদিন না হোক, পরে সে বুঝেছে যে কী অবস্থায় পড়ে তাঁকে এ বিবাহে মত দিতে হয়েছে। বরং সেদিন যে তাঁর মনে সামান্য এই বয়সের ব্যবধানটুকু বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি, এ জন্য মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়।

মহাশ্বেতার মা শ্যামা তখন একেবারে অসহায়। সরকার বাড়ির নিত্যসেবার আধ-সের চাল, ক'খানা বাতাসা আর একপো দুধ এই তাঁর তখন একমাত্র ভরসা—তিন চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঐটুকু সম্বল করেই দিন কাটছে তাঁর, অর্থাৎ দিনের পর দিন উপবাস করছেন। স্বামী নিরুদ্দেশ হয়ে থাকতেন অর্ধেক দিন, সে জন্য সে চালটুকুও ভোগে আসত না প্রায়ই, কারণ পুজোর কাজটা পরকে ডেকে চালাতে হ'ত সে সময়। যে পরের বাঁধা কাজে বেগার দিতে আসবে সে অবশ্যই শুধু হাতে যাবে না। অত-গুলি প্রাণীর ঐ সামান্য সম্বলটুকুও তাকে ধরে দিতে হ'ত। ঠাকুরের সেবা না হ'লে ঐ তিনদিক চাপা ঘরখানাও থাকে না—একেবারেই পথে বসতে হয়। উপবাস করে পড়ে থাকবার জন্যেও তো মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন চাই।

এই চরম দুঃসময়ের মধ্যেই সরকারগিন্নী মঙ্গলা প্রস্তাবটা এনেছিলেন। দোষে গুণে জড়ানো বিচিত্র মানুষ মঙ্গলা, কিন্তু দোষ যা-ই থাক, তিনি যে ওদের যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই প্রথম ও'দের বাড়ি আসার দিনটি থেকেই, শ্যামা ও'র কাছে নানাভাবে উপকৃত। তাছাড়া তিনিই সেদিন বলতে গেলে শ্যামাদের একমাত্র অভিভাবিকা। মনিবগিন্নী তো বটেই। সুতরাং তিনি যখন এই বিবা-হের প্রস্তাব নিয়ে এলেন এবং 'তুই ভাবিস নি বামনী, যেমন করে হোক হয়ে যাবে' এই আশ্বাস দিয়ে বিয়ের ভারটা সত্যি সত্যিই একরকম নিজের হাতে তুলে নিলেন—তখন আর শ্যামার ইতস্তত করা সম্ভব হয় নি, সে অবস্থা তাঁর ছিল না। তাই সাত বছরের মেয়ের চেয়ে বরের পনেরো বছর বেশী বয়সটা সেদিন কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।

কিন্তু বয়সের এই প্রায় দ্বিগুণ ব্যবধানটাই মহাশ্বেতার কাছে খুব বড় কথা ছিল না। বাইশ বছরের পুরুষ তারপর ঢের দেখেছে মহাশ্বেতা, এখনও ঢের দেখছে—ঐ বয়সে অমন রাশভারী পুরুষে পরিণত হ'তে আর কাউকে দেখে নি। তার কপালেই যেন

এমনি সৃষ্টিছাড়া হয়ে জন্মেছিল অভয়পদ। শুধু কি বয়সের, আরও বহু ব্যবধান ছিল দুজনে। মহাশ্বেতা চিরদিনই বেঁটেখাটো গোল-গোল—অভয়পদ লম্বা চওড়া দশাসই পুরুষ। মহার রঙ্ মাজামাজা, অভয় ফিট্ গৌরবর্ণ। অত বড় পুরুষ ঘনকালো চাপ দাড়ি নিয়ে বিয়ে করতে এসেছিল একরত্তি একটুখানি মেয়েকে। সেই প্রথম চার-চোখে চাওয়ার ক্ষণটি থেকেই মহাশ্বেতা স্বামীকে যে ভয় ও সমীহের চোখে দেখেছিল, সারা জীবনেও তার আর কোন পরিবর্তন হয় নি। পরবর্তীকালে তার সম্বন্ধে স্বামীর স্নেহেরও কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছে, তাঁকে পরম আশ্রয় বলে অবলম্বন করতে পেরেছে, তবু সেই স্বল্পভাষী গম্ভীর স্থিতধী মানুষটি সম্বন্ধে তার সেই সবিস্ময় সম্ভ্রমের ভাবটা কখনও কাটে নি ; আজও সে তাঁকে মনে মনে ভয় ও সমীহ করে চলে।

শ্বশুরবাড়িতে এসে পর্যন্ত কাকেই বা সে ভয় না করত!

একে তো ঐ বয়সে, বলতে গেলে মূলসুদ্ধ উৎপাটিত হয়ে, সম্পূর্ণ নতুন আব-হাওয়ায় নতুন জগতে আসা। তার ওপর উপদেশ ও হুঁশিয়ারীরও অন্ত ছিল না সেদিন। শ্বশুরবাড়িতে কী ভাবে চলতে হয়, কী রকম আচরণ করলে বাপের বাড়ির নিন্দা হ'তে পারে এবং সেটা যে কী পর্যন্ত গর্হিত কথা ও বাপ-মার সম্বন্ধে অপমানকর —কোন মতেই সে নিন্দা যে হ'তে দেওয়া উচিত নয়— সে সম্পর্কে বিচিত্র ও বিবিধ উপদেশে বিহ্বল ও দিশেহারা হয়েই এ বাড়িতে প্রবেশ করেছিল সে। সে জন্যে ভয়ের অন্ত ছিল না। তার ভালমানুষ শাশুড়িকে পরবর্তীকালে আর কেউ ভয় করেছে বলে জানা নেই মহাশ্বেতার, কিন্তু সে করেছে। ফলে সে দেবর ননদ কারুর কাছেই জ্যেষ্ঠা-বধূর পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হ'তে পারে নি কোনদিন। সকলেই তাকে অবহেলা করেছে, ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে নি কখনও। তার অনেক পরে মেজ বৌ এসে অনায়াসে তাকে ডিঙিয়ে এ বাড়ির কর্তৃত্বের রাশ টেনে নিয়েছে নিজের হাতে।

আসলে বুদ্ধি ও সাংসারিক অভিজ্ঞতাতেও সে সকলের পিছনে পড়ে আছে চির-কাল। বুদ্ধিটা হয়ত স্বাভাবিক ভাবেই তার কম, তার ওপর যখন তার বিয়ে হয়েছে তখন তার মস্তিষ্ক পরিণত হবার কথা নয়, বুদ্ধিও নিতান্ত অপরিণত। আর এখানে এসে এমন ভাবেই এদের সংসারের ঘানিগাছে আটকে গেছে যে, আর কোন দিকে তাকিয়ে দেখার—এ বাড়ি বা এ সংসারেব বাইরেকার কোন অভিজ্ঞতা লাভ করার—সুযোগ ঘটে নি। সুবিপুল জগৎ তার কাছে এই বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং সব দিক থেকেই, সে যেন তার সেই সাত বছরের বয়ঃসীমার কাছাকাছিই থেকে গিয়েছে।

কিন্তু মেজ জা প্রমীলা এসেছিল অনেক বেশী বয়সে। তাছাড়া স্বভাবতই সে তীক্ষ্মবুদ্ধিশালিনী। ভগবান এক একটি মেয়েকে অনেকের ওপর আধিপত্য করবার সহজ সনদ দিয়েই পৃথিবীতে পাঠান, প্রমীলাও সেই ধরনের মেয়ে। সে এসে স্বাভা-বিকভাবেই শাশুড়ি, জা, ননদদের ডিঙিয়ে গেছে। চেহারাও অবশ্য তার খারাপ নয়, কিন্তু পুরুষ রূপের চেয়ে অনেক বেশী আকৃষ্ট হয় মেয়েদের বুদ্ধির দীপ্তিতে, ব্যবহারে, কথাবার্তায়। প্রমীলার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ছোট দেওর দুর্গাপদ তো দিনকতক উন্মত্তই হয়ে উঠেছিল ওকে নিয়ে; ছোট বৌ তরলার কী দুঃখেই না দিন কেটেছে সে সময়টা—নিতান্ত তার কপালে আছে স্বামী পুত্র ভোগ করা তাই ফিরে পেয়েছে দুর্গাপদকে, সেও নিতান্ত দৈবাৎ। কিন্তু তবু পুরোটা পেয়েছে বলে মনে করে না মহাশ্বেতা—নইলে আজও তো সেই মেজ বৌয়ের কথায় দুর্গাপদ ওঠে বসে, মাইনের টাকা পাই-পয়সাটি এনে ধরে দেয় তাকেই।

অবশ্য সেদিক দিয়ে অভয়পদ সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই মহাশ্বেতার। দেবতা-দের চরিত্রেও দোষ আছে, অভয়পদর চরিত্রে নেই। সেদিক দিয়ে সাক্ষাৎ মহাদেব। মহা-

শ্বেতার ক্ষোভ অন্যত্র। অভয়পদও মুখে স্বীকার না করুক, মনে মনে প্রমীলাকেই ঐ সংসারের প্রকৃত গৃহিণী বলে জানে। আর বোধ হয় সেই জন্যেই, না কখনও সে মহা-শ্বেতার সঙ্গে কোন সাংসারিক বিষয়ে আলোচনা করে, না তাকে কোন কথা খুলে বলে। স্নেহ আছে—কিন্তু সে স্নেহ ছেলেমানুষের প্রতি বয়স্ক লোকের। জীবনের অংশীদার বলে গ্রহণ করতে পারলে না কখনও। ঠিক এমনভাবে গুছিয়ে হয়ত ভাবতে পারে না মহাশ্বেতা কিন্তু এই ধরনেরই আকারহীন একটা নিরুদ্ধ অভিমান তাকে নিরন্তর পীড়া দিতে থাকে। কিছুতেই কোন মতে স্বস্তি পায় না।

এত কথা ছেলেমেয়েদের জানবার কথা নয়, তারা জানেও না। এর মূল চলে গেছে বহুদূর অতীতে। এর ইতিহাস শুরু হয়েছে তাদের জন্মের পূর্ব থেকে। এ অভিমানের কারণ ও মূল্য বোঝবার মতো জীবন-অভিজ্ঞতাও তাদের নেই। তারা শুধু এর বহিঃ-প্রকাশটাই দেখে। কারণ খুঁজে পায় না বলেই ভাবে অকারণ। মহাশ্বেতাকে দোষী করে তাই।

এমন কি সেদিনের মেয়ে স্বর্ণলতা পর্যন্ত বলে, 'মা যেন সব্বদা কী এক জ্বালায় ছিট্‌ফিটিয়ে বেড়াচ্ছে। তোমার বাপু মনটা ভাল নয়, যাই বলো। বড্ড রীষ তোমার। তোমার কোনদিন ভাল হবে না, দেখে নিও। দিদিমা ঠিকই বলে, খল যান রসাতল। তোমার ভাল হবে কী করে?'

মহাশ্বেতা শোনে আর আরও জ্বলে যায়। ললাটে করাঘাত করে। ছুটে চলে যায় নির্জন জায়গায় মনের বিষ উদ্গীরণ করতে।

॥ ২ ॥

স্বামী অভয়পদের বিরুদ্ধে মহাশ্বেতার বিস্তর নালিশ। সে স্ত্রীর সঙ্গে কোন দিন কোন বিষয়ে আলোচনা করে না; সে স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘকাল—প্রথম সন্তান হওয়ার পর থেকেই এক ঘরে বাস করে না; তারই পয়সায় শুধু নয়, বেশির ভাগ তারই গতরে এতবড় বাড়িটা উঠেছে অথচ তার বৌ শোয় সবচেয়ে পুরানো আর সবচেয়ে চাপা ঘর-খানায় (তারই ব্যবস্থা) এবং সে নিজে শোয় চলনে, তাও একখানা কাঠের বেঞ্চির ওপর; যুদ্ধের সময় চোরাই মাল সরিয়ে মোটা টাকা কামিয়েছিল, সেই সব টাকাটাই সে মেজ ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে, শুধু তাই নয়—আজ পর্যন্ত মাইনের সমস্ত টাকাটা ধরে দেয় ভাইয়ের হাতে; খায় সে-ই সবচেয়ে খারাপ; কাপড় পরে সবচেয়ে মোটা আর খাটো; এক ময়লা জিনের কোট ছাড়া কোন জামা পরল না আজ পর্যন্ত; চিরকাল হেঁটে অফিস করেছে এখান থেকে—তিন ক্রোশ তিন ক্রোশ ছ' ক্রোশ পথ। এখন হাঁটিতে পারে না, ট্রেনে যায় কিন্তু ট্রামে কখনও চড়ে নি--অথচ তারই পয়সায় বড়মানুষ হয়ে ভায়েরা কত কাপ্তেনি করছে; সংসারে খাটে মজুরের মতো কিন্তু সে সংসার পরিচালনার ব্যাপারে একটা কথাও বলে না কোনদিন, এমন কি মেজকর্তার 'কুচক্কুরে-পানায়' ছেলেগুলো যে একটাও লেখাপড়া শিখছে না—সে সম্বন্ধেও সে সম্পূর্ণ উদা-সীন; ইত্যাদি, ইত্যাদি। তার পুরো নালিশের ফর্দ লিপিবদ্ধ করলে একটা বড় পুঁথি হয়ে যাবে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও, অভয়পদের এই সর্বশেষ কীর্তির জন্য মহাশ্বেতা সত্যিই প্রস্তুত ছিল না। সে যে ওর সঙ্গে এমন শত্রুতা করবে, এতবড় সাধে বাদ সাধবে তা কখনও কল্পনাও করে নি সে। যার সম্বন্ধে এই দীর্ঘকাল, প্রায় দু যুগ ধরে যে প্রচণ্ডতম অথচ

অসহায় বিদ্বেষ বহন করে আসছে—তাকে এতদিন পরে আঘাত দেবার এমন অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রটি যে কেড়ে নেবে অভয়পদই—এ সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

আর কী কৌশলেই না মেজকর্তা অম্বিকাপদ এই কাজটি করিয়ে নিলে! উঃ সত্যি, বুদ্ধির কথা ধরলে নিত্য উঠে মেজকর্তার 'পাদোক জল' খাওয়া উচিত, এত বড় ধূর্ত, এমন ফন্দিবাজ বোধহয় আর দ্বিতীয় কেউ নেই। অন্তত মহাশ্বেতার জীবনে আর কারুর কথা মনে পড়ে না। তার চেয়েও এক কাঠি-সরেশ হ'ল মেজগিন্নী। বিধাতা নির্জনে এসে এদের জোড় মিলিয়েছেন।

না, একটা অনাথ বালক আশ্রয় পেল তাতে কোন ক্ষোভ নেই মহাশ্বেতার। প্রথম যখন খবরটা কানে গেল যে মেজ-বৌয়ের সদ্য বিধবা বোন সরমা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, একমাত্র অনাথ ছেলেটার মুখে জল দেবার কেউ নেই, পাড়ার লোকের দয়ার ওপর নির্ভর করে একা সেই ভূতুড়ে ভাঙা বাড়িতে পড়ে আছে—তখন কথাটা ঠোঁটের ডগায় এসেছিল মহাশ্বেতার. 'আহা ছেলেটাকে এখানে এনে রাখলে তো হয়।' আগেকার মতো বোকা থাকলে বলেই ফেলত হয়ত কিন্তু ইদানীং অনেক অগ্রপশ্চাৎ ভাবতে শিখেছে সে, ওর মুখ থেকে কথাটা বেরোলেই মেজবৌ লুফে নেবে, আর সেই সঙ্গে সে সম্পর্কে ভবিষ্যতে কোন কথা শোনাবার মত পথটিও চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। সেই ভেবেই অতিকষ্টে মুখের কথা মুখে চেপে রেখেছিল মহাশ্বেতা।

অথচ ঠিক সেই কাণ্ডটিই তো হ'ল।

সরমা বেচারীর চিরকালই পোড়া কপাল। বিয়ে হয়েছিল যখন তখন ওর বর কোন্ সরকারী ইস্কুলে মাষ্টারী করে—তখনকার দিনের ঈপ্সিত পাত্র। কারণ বিদ্বান এবং সরকারী-চাকরে একাধারে। কিন্তু বিয়ের পরই দেখা গেল ওর স্বামী প্রভাস চিররুগ্ন; রোগ তার সর্বাঙ্গে, বলতে গেলে সর্ববিধ। বারোমাসই ভোগে এবং প্রায়ই শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। ফলে মাসের পর মাস ইস্কুল কামাই হ'তে থাকে। নেহাৎ সরকারী ইস্কুল বলেই কাজটা অনেকদিন টিকে ছিল কিন্তু সমস্ত রকম নিয়ম-কানুন এবং কর্তৃপক্ষের ধৈর্যের সীমা যেদিন লঙ্ঘন করল সেদিন আর টিকল না।

সেও প্রায় দশ বছরের কথা। এর পর থেকেই প্রভাস বসে বসে খাচ্ছে। তবু তখনও মা ছিলেন, মার জন্য ছোটভাইকে কিছু কিছু দিতে হ'ত—এমনই বরাত, কিছু দিন বাদেই মাও মারা গেলেন। কোথাও থেকে কোন আয়ের পথ রইল না। কখনও এক আধটা মাষ্টারী যে না পেয়েছে তা নয়, কিন্তু কোনটাই রাখতে পারেনি। একমাস কি আঠারো দিন কাজ করার পরই যদি দু-মাস কামাই হয় তো সে মাষ্টারকে রাখাই বা যায় কি করে? প্রাইভেট টিউশ্যানিও মধ্যে মধ্যে পেয়েছে—দেশে-ঘাটে সে টিউশ্যানির কীই বা মূল্য—তবু তাও তো থাকে নি। সর্বত্র একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অর্থাৎ এই দীর্ঘকাল বসে বসেই খেতে হয়েছে এবং কিছু কিছু চিকিৎসার খরচও যোগাতে হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার উপায় থাকত না প্রায়ই। চিকিৎসা করাতে গেলে ডাক্তার ডাকতে হয়, ওষুধ কিনতে হয়। ইদানীং চোখ বুজেই থাকত প্রায় সরমা—পাড়াঘর থেকে শোনা টোটকা-টুটকি ভরসা ক'রে। কিন্তু এক-এক সময় যখন খুব বাড়াবাড়ি হ'ত তখন আর চুপ করে থাকা যেত না। তার ফলে একে একে যথাসর্বস্ব—জমি জায়গা, গহনা, আসবাব, মায় বাসন-কোসন বিক্রি করতে হয়েছে। এছাড়া আত্মীয়স্বজনদের কাছে ভিক্ষা তো আছেই। কিন্তু ক্রমাগত সাহায্য করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়—সুতরাং তারা প্রায় সকলেই সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। একেবারে এমনি অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় এনে পৌঁছে দিয়ে প্রভাস যেদিন মারা গেল, সেদিন সরমা আর কোনও পথই কোথাও দেখতে পায় নি—আত্মহত্যা ছাড়া। সেই পথই সে বেছে নিয়েছে।

আসন্ন শ্রাদ্ধ ও ছেলের ভবিষ্যতের সমস্যা ভগবান ও পাড়ার লোকের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজে সে কড়িকাঠ ও পুরনো শাড়ির সাহায্যে সব জ্বালা থেকে মুক্তি লাভ করেছে।

খবরটা পাওয়া গেল সন্ধ্যাবেলা, ছোট দেওর দুর্গাপদর মুখে। সরমার গ্রামের একটি ছেলে ওদের অফিসে কাজ করে—তার মুখেই শুনেছে দুর্গাপদ। খবরটা শুনে মহাশ্বেতার চোখে জল এসে গিয়েছিল, ছেলেটাকে আনবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল সে—কিন্তু সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের এতবড় ব্রহ্মাস্ত্রটা নষ্ট করতেও মন ওঠে নি, দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে ছিল।

সব মাটি করল অভয়পদ।

তিনভাই এক সঙ্গে খেতে বসেছিল। অম্বিকাপদই কথাটা তুলল, 'আমার সেজশালীর কেলেঙ্কারীটা শুনলে দাদা?'

অভয়পদ মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল।

'কাল নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে সে!'

অভয়পদ মাথা নামিয়ে ধীরে সুস্থে ভাত মাখতে মাখতে শুধু প্রশ্ন করল, 'ছেলেটা?'

'ছেলেটা পাড়ার লোকের ওপর জিম্মে—আর কি! ঘরে নাকি একটা কাঁথাকানিও আর নেই বেচবার মতো। শ্রাদ্ধশান্তি করে শুদ্ধ হবারও একটা খরচ চাই তো, সেই জন্যেই বোধ হয় কোনদিকে কোন কূলকিনারা না পেয়ে গলায় দড়ি দিলে ছুঁড়িটা। কীই বা করবে—এমন অবস্থা হয়েছিল, ভিক্ষেও তো বোধহয় আর কেউ দিত না। নিত্যি নেই দেয় কে, নিত্যি রুগী দেখে কে! তা প্রভাসচন্দ্রের তো দুটোই ছিল কিনা।'

অভয়পদ কোন কথা কইল না, যেমন খাচ্ছিল তেমনি খেয়ে যেতে লাগল। রান্নাঘরের ভেতরেই ওরা খেতে বসেছে। বড় মেজ দুই বৌই সেখানে উপস্থিত। দেখা বা শোনা কোনটারই অসুবিধা নেই।

খানিকটা পরে অম্বিকাপদই আবার প্রসঙ্গটা তুলল, 'তাহ'লে কিছু তো সাহায্য করা দরকার—কী বলো দাদা?'

'সাহায্য কী করতে চাও?' শান্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল অভয়পদ।

'যাহোক কিছু। আমার শ্বশুরবাড়ি থেকেও কিছু আসবে নিশ্চয়, কিন্তু খরচও তো কম হবে না, নমো-নমো করে করলেও বেশ কিছু লাগবে। ছেলেটার তো শুনেছি লেখাপড়া বন্ধ হয়ে আছে। অথচ ওর নাকি মাথা খুব ভাল, পড়াশুনোয় চাড়ও খুব। পাড়ার লোকের কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে নিয়ে নিজে নিজেই পড়ে যা পারে।'

'ছেলেটাকে এখানে বরং আনিয়ে নাও, যা হয় করে এখানেই শুদ্ধ হবেখন্।'

সংক্ষেপে এই কথা বলে একেবারে উঠে দাঁড়ায় অভয়পদ। রাত্রের খাওয়া তার খুবই কম, সেটুকু সারা হয়ে গেছে।

ঠিক এতটার জন্যে বোধহয় অম্বিকাপদও তৈরি ছিল না, কিংবা সবটাই অভিনয় (মহাশ্বেতার বিশ্বাস তাই)—সে একটু অবাক হয়ে বললে, 'এখানে আনিয়ে নেব? মানে ববাবরের মতো? নইলে একবার নিয়ে এলে তো আর ঘাড় থেকে নামানো যাবে না!'

'সেইটেই যথার্থ উপকার করা হবে, নইলে দু-দশ টাকা সাহায্য করলেই বা কি না করলেই বা কি?' ওর শুদ্ধ হওয়া কি আর আটকে থাকবে? যেমন করেই হোক হয়েই যাবে।'

'কিন্তু তাই বলে এতবড় একটা দায়িত্ব নেওয়া—। এখানে আনলে মানুষ করার

সব দায়টাই তো চাপবে আমাদের ওপর!'

'তোমার এখানে এতগুলো লোক খাচ্ছে, একটা ছেলে বাড়তি খেলে টেরও পাবে না। আর মানুষ করা? মানুষ যদি হয় তো সে আপনিই হবে—না হয় সেখানে থাকলেও যা করত এখানেও তাই করবে। জবাবদিহি তো কারুর কাছে করতে হবে না সে জন্যে!'

অভয়পদ আর দাঁড়াল না। তার পক্ষে এতগুলো কথা বলাই ঢের।...

আর বলার দরকারই বা কি! অম্বিকাপদর মুখ স্মিত প্রসন্ন ভাব ধারণ করল। প্রমীলা স্বামীকে উপলক্ষ্য করে এবং সম্ভবত মহাশ্বেতাকে লক্ষ্য করে বলল, 'সত্যি, অনেক তপস্যা ক'রে এমন দাদা পেয়েছিলে! মানুষ নয়—সাক্ষাৎ দেবতা। আমাদের সঙ্গে মিলোতে গিয়েই আমরা ভুল করি, দোষ দিই--কিন্তু আমাদের মাপে মেলবার লোকই নয় যে।...ওঁকে এখনও তোমরা কেউ চিনতে পারো নি—এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি।'

মহাশ্বেতা এতক্ষণ অসহ্য ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষছিল। এবার আর থাকতে পারল না, বলে উঠল, 'কেমন করে চিনবে মেজবৌ, যাদের গোড়ে গোড় দেয় সদাসব্বদা, তারাই চেনে! মনের মতো কথা বললেই দেবতা—নইলে যারা হক্ কথা বলে তারা সব জানোয়ার বই তো কিছু নয়!'

'পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে! তোমারই বা অসৈরণ হয় কেন দিদি! তোমায় তো কেউ বলে নি। তাছাড়া কে হক্ কথা বলে আর কে মিছে কথা বলে তা তো ঠিক করে বোঝবার কোন উপায় নেই! তা তোমার হক্ কথাটা কি শুনিই না?'

'আর শুনে দরকার কি ভাই! যার কথা শোনবার তা তো শোনা হয়েই গেছে। দেববাক্য তো বেরিয়েছে মুখ দিয়ে—আর কেন?'

'তবে কি তুমি বলতে চাও, এনে কাজ নেই ছেলেটাকে? পষ্ট করে খুলে বলোই না মনের কথা! অনাথ আতুর একটা ছেলে তোমাদের বাড়ির দুটো পাতকুড়োনো ভাত খেয়ে মানুষ হ'ত—তা না হয় হবে না। কী করা যাবে, মনে করব সেও নেই, মরে গেছে। চোখে তো দেখতে যাচ্ছি না। তা ছাড়া—রাস্তা তো কেউ তার ঘোচায় নি, কত লোকই তো ভিক্ষে করে জীবন কাটাচ্ছে!...তার জন্যে এত রাগারাগির কী আছে? বট্ঠাকুর যাই বলুন, তোমার যদি মত না থাকে তো তাকে আনবে কে এখানে? আনব কি দুবেলা তোমার ঐ মধুর বাক্যি আর খোঁটা শোনবার জন্যে? তারপর শোকাতাপা ছেলেটা রেলে গলা দিক কি পুকুরে ঝাঁপ দিক--আমাদের মুখটা আরও উজ্জ্বল হোক আর কি! চোখের বাইরে যা-খুশি হোকগে, মরুক বাঁচুক আমরা তো আর দেখতে যাচ্ছি না। আমরা কেন এখানে এনে মাঝখান থেকে নিমিত্তের ভাগী হই?...না বাপু, ও বটঠাকুর যাই বলুন, বড়গিন্নীর যখন মত নেই, তখন তুমি ও ব্যাপারে আর যেও না, এই সাফ বলে দিলুম!'

মহাশ্বেতা এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল, মুগ্ধ হয়ে শুনছিলও বলা যায়—সে গালে হাত দিয়ে একদিকে মাথাটা হেলিয়ে বলল, 'বাব্বা, কী বানাতেই পারিস তুই মেজবৌ! তাকে আনা আমার ইচ্ছে নয়—একথা আমি কখন বললুম লা, কার গলা জড়িয়ে বলতে গেলুম? বলে শুনে এস্তক চোখে জল রাখতে পারছি না, মনটা ছট্ফট্ করছে—একটা দুধের বালক বাপ-মা মরা অনাথ—তার যদি একটা গতি হয় আমি তাতে বাদ সাধব! না তাকে আমি কথা শোনাতে যাবো?...আমি কি এমনই পিচেশ?... উঃ ধন্যি বাবা, ধন্যি! দিনকে রাত করতে পারিস তোরা। আমারই ঘাট হয়েছিল তোদের কাছে মুখ খুলতে যাওয়া। বলি না তো কখনও, মুখে তো কুলুপ এঁটেই থাকি! যে যা

খুশি করুক, মরুক হাজুক—এই শিক্ষা হয়ে গেল, আর যদি কখনও দুটি ঠোঁট ফাঁক করি!'

বলতে বলতে রাগে দুঃখে অভিমানে অবিচারবোধে দু চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে মহাশ্বেতার—সে ছুটে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আর যেতে যেতেই—সেই অবস্থাতেই—নিজের নির্বুদ্ধিতার পূর্ণ অর্থটা হৃদয়ঙ্গম হয়। এ বিষয় নিয়ে অন্তত মেজবৌকে কোন কথা শোনাবার পথটা সেও বন্ধ করে দিয়ে এল চিরদিনের মতো। আর শুধু অভয়পদকে দিয়েই নয়, তাকে দিয়েও বলিয়ে নিলে মেজবৌ, ছেলেটাকে এখানে আনাবার কথা!

॥ ৩ ॥

অরুণ প্রথমে এসে অতটা বুঝতে পারে নি। প্রথমত দুটো প্রবল শোক, একান্ত নিঃসহায় এবং পরমুখাপেক্ষী হওয়ার দুর্ভাবনা, তারপর একেবারে অপরিচিত পরিবেশ—সবটা মিলিয়ে সে একটু বিহ্বল হয়েও পড়েছিল। কোন জিনিস ভাল ক'রে লক্ষ্য করার মতো মানসিক অবস্থা তার ছিল না। তাছাড়া, কোন ঘটা না থাক—শ্রাদ্ধশান্তির কিছুটা ঝঞ্ঝাটও আছে—সেজন্য নিজেকে নিয়ে যথেষ্ট বিব্রত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু সে সবগুলো মিটে গেলে থিতিয়ে বসার পর যখন চারিদিকে চাইবার মতো দৈহিক ও মানসিক অবস্থা হ'ল, তখন সে বেশ একটু অবাকই হয়ে গেল। ছেলে তিন কর্তার মিলিয়ে ষেটের আটটি তখনই—মেয়ে অবশ্য একটি। লেখাপড়ার বয়স এদের সকলেরই হয়েছে, প্রথম তিনজনের তো উৎরেই গেছে। মেজকর্তা ও ছোটকর্তার তিন ছেলে এবং বড়কর্তার ছোটটি তবু ইস্কুল পাঠশালায় যায় একবার ক'রে—বড়গুলো তাও যায় না। যারা যায় তারাও কেউ কখনও বাড়িতে বই নিয়ে বসে না। এরা তাহ'লে পড়ে কখন?

অরুণের পড়াশুনো হয় নি, হ'তে পারে নি ব'লে। কিন্তু ভদ্রলোক ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলেরা যে পড়াশুনোর একটা ঠাট্ বজায় রাখারও চেষ্টা করে না এবং সেজন্যে তাদের অভিভাবকরাও কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন নন, এটা তার সমস্ত অভিজ্ঞতায় অতীত। তাই সে প্রথমদিকে একদিন বোকার মতো একটা প্রশ্নও ক'রে ফেলেছিল মেজছেলে কেষ্টকে, 'ভাই তোমরা পড় কখন?'

কেষ্ট বা কৃষ্ণপদকে প্রশ্ন করার কারণ—এ বাড়ির মধ্যে তাকেই ওর সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও ভদ্র ব'লে মনে হয়েছিল। সে কথাও কয় এদের মধ্যে কম।

কেষ্ট এ প্রশ্নে কিছুটা বিব্রত বোধ করেছিল। সে একবার ঢোঁক গিলে; বাইরের দিকে চেয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'না, মানে পড়ি—এই কদিন গোলমালে সব ওলটপালট হয়ে গেছে আর কি। বসতে হবে—এবার বসতে হবে!'

কিন্তু তার এই আত্মসম্মান বজায় রাখার ক্ষীণ চেষ্টাটুকুকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল স্বর্ণ, 'তবেই হয়েছে। তুমি কাকে কি জিজ্ঞেস করছ অরুণদা! পড়া! মেজদাকে তুমি গাছে ওঠার কথা জিজ্ঞেস করো, ঘুড়ি ওড়াবার কথা বলো—মাছ ধরতে বলো, পোষ্কার পোষ্কার জবাব পাবে। এমন কি খটির বাজারে কোন্ জিনিসের কি দর, তা পজ্জন্ত ওর মুখস্থ। ঐ লেখাপড়ার কথাটি বাপু জিগ্যেস করো নি! ওটা এ বাড়ির ধাতে সয় না!'

কেষ্ট আরও অপ্রতিভ হয়ে ওঠে। লজ্জাটা রাগে রূপান্তরিত হয়ে চোটটা গিয়ে পড়ে স্বর্ণর ওপর, 'দ্যাখ বুচি, মেলাই ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নি বলে দিলুম। মারব টেনে

গালে একটি চড়, ছোট মুখে বড় কথা বলা বার করে দেব একেবারে!'

ঠোঁটের একটা অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গি ক'রে বিচিত্র সুর টেনে সমান তেজের সঙ্গে জবাব দেয় বুঁচি, 'ইঃ! টেনে চড় মারবে? তবেই তো আমি ভয়ে ইঁদুরের গর্ত খুঁজলুম আর কি। মেয়েছেলের গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখ না একবার, মেজকাকী তোমার কি খোয়ারটা করে!...অত তো তেজ দেখাচ্ছ, বেশ তো কই বার করো না, দেখাও না অরুণ-দাকে তোমার কখানা আর কী কী বই আছে! নিয়ে এসো না, দেখি!'

'যাঃ যাঃ! ওকে দেখাতে যাবো কী জন্যে? ও কি আমাদের গার্জেন নাকি! যাকে দরকার বুঝব তাকে দেখাব!' কেষ্ট একটা অবজ্ঞার ভঙ্গি ক'রে চলে যায় সেখান থেকে।

আবারও খিল খিল করে হেসে ওঠে স্বর্ণ। বলে, 'মুখসাপোটটুকু তবু রাখা চাই ছেলের! ওধারে মুখ শুকিয়ে আম্‌সি।...সে যাকগে মরুক গে, মোদ্দা ওদের মুখ চাইলে তোমার পড়া হবে না। তুমি তোমার নিজের মতো নিজে পড়বে।'

দশ-বারো বছরের মেয়ে, সে তুলনাতেও বরং কিছু বেঁটেই দেখায় স্বর্ণকে। অর্থাৎ সেদিক দিয়ে মায়ের ধাতে গেছে। যদিও গায়ের রংটা তার দেখবার মতো, মুখচোখও কাটাকাটা, অভয়পদর মেয়ে বলে চিনতে ভুল হয় না। কিন্তু স্বভাবটি পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে, এই বয়সেই গিন্নি-গিন্নি ভাব, হাতপা ঘুরিয়ে মুখচোখ নেড়ে কথা বলে বয়স্কা ঠাকুমা-দিদিমার মতো।

ঐটুকু মেয়ের অমনি পাকা কথা আর গিন্নিদের মতো চোখমুখ ঘুরিয়ে কথা বলা দেখলেই হাসি পায় অরুণের। আজও হাসি পেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখখানি ম্লান হয়ে উঠল তার। মাথা হেঁট করে ডান পাশের বুড়ো আঙ্গুলটা দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা ঘষতে ঘষতে বলল, 'আমি—মানে আমার তো বই পত্তর কিছুই নেই, ভেবেছিলুম এদের বই চেয়ে নিয়ে পড়ব। তেমন বই-ই তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।'

'আছে। তেমন খুঁজলে এক-আধখানা বেরোবে বৈকি! মেজকাকার চেষ্টার তো কসুর নেই। বই সবাইকে কিনে দিয়েছিল—একেবারেই বাজে খরচ দেখে এদান্তে আর বড়গুলোকে দেয় না। তবে সে সব বই যে কোথায় আছে, কেমন আছে, তা বলতে পারব নি। সে বই খুঁজে বার করে তবে তুমি পড়বে—এই ভরসায় যদি থাকো তাহলে এহকালে আর তোমায় পড়তে হচ্ছে না, এ আমি পষ্টাপুষ্টি বলে দিচ্ছি! দাদার ভরসা বাঁয়ে ছুরি!...আর সে তুমি পড়বেই বা কি, ওরা তো সেই কোন্ কেলাস থেকে সব পড়া ছেড়েছে তার ঠিক নেই, সে বইতে তোমার কী হবে? তুমি তো আগে আগে ইস্কুলে পড়েছ শুনেছি।...না না, তোমায় অন্য ব্যবস্থা করতে হবে! দাঁড়াও মেজ-কাকীকে বলিগে—'

ছুটেই চলে যাচ্ছিল, অরুণ খপ্ করে ওর একটা হাত ধরে ফেললে। ধরে ফেলে-ছিল হঠাৎ একটা ঝোঁকের মাথায়, তারপরই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে, 'তা তোমার বই কই? তুমিও তো কিছু পড় না দেখি!'

স্বর্ণ ওর ধরণ দেখে আবারও হেসে উঠল। তারপরই কিন্তু মুখটা গম্ভীর করে পাকাগিন্নীর ভঙ্গিতে বললে, 'হ্যাঁ, মেয়েছেলের আবার পড়া! যাবো তো পরের বাড়ি, আজ না হোক দুদিন বাদে সেই যেতেই তো হবে। আর সেখানে গিয়ে তো সেই হাঁড়ি-বেড়ি ধরা আর গোবর নিকোনো! গোচ্ছার পড়ে হবেই বা কি! না, ওসব বাপু আমার ভাল লাগে না। ততক্ষণ মা কি মেজকাকীকে সংসারের যোগাড় দিলে ঢের কাজ হবে।'

এবার অরুণও না হেসে পারল না। বললে, 'কিন্তু পরের বাড়ি গিয়ে গয়লা ধোপার হিসেবটাও তো রাখতে হবে। তাছাড়া বাপের বাড়িতে চিঠিও লিখতে ইচ্ছে করবে তো

দুচারখানা। আজকাল তো সব মেয়েই পড়ে কিছু কিছু। একটু লেখাপড়া জানা থাকলে নিজের ছেলেমেয়েদেরও পড়াতে পারা যায়।'

'কে জানে বাপু! আমাদের তো হিসেব-টিসেব সব মেজকাকাই রাখে। অবিশ্যি মেজকাকী ছোটকাকীও কিছু কিছু জানে। ছোটকাকী তো বইটই হাতে পেলে বেশ পড়ে দেখিছি।...তা বেশ তো, তুমি পড়াশুনা আরম্ভ করো—আমি বরং তোমার কাছে পড়া বলে নেব, য়্যাঁ? সেই বেশ হবে।'

অরুণ হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল কিন্তু সেটা দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করল না স্বর্ণ—এক দৌড়ে চলে গেল রান্নাঘরে মেজকাকীর কাছে।

'হ্যাঁ গা মেজকাকী, তোমাদের তো মুখ্যুর সংসার, কারুর কিছু হবে না। তা ঐ ছেলেটাকেও কি বসিয়ে মুখ্যুর ডিম করবে?'

প্রমীলাও এই মেয়েটিকে ভালবাসে। এক মেয়ে বলে নয়—ওর মতো পরিষ্কার মন আর কারুর নেই বলে। ওর আপন-পর জ্ঞান কম, সবাইকেই আপন বলে মনে করে। তাছাড়া আজকাল মহাশ্বেতা কিছু কথা শোনাতে এলেই স্বর্ণ মেজকাকীর হয়ে ঝগড়া শুরু ক'রে দেয়। সেটাও সম্ভবতঃ ওর প্রতি প্রমীলার প্রীতির একটা প্রধান কারণ।

'কে লা, কার কথা বলছিস?' প্রমীলা একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে চায়।

বাড়ির মধ্যে এই একটিই মেয়ে বলে স্বর্ণলতার আদর বেশী, তার সর্বত্রই অবারিত দ্বার। আজকাল বড়দের কাছে কোন কিছু চাইতে হ'লে ছেলেরা ওকেই মুরুব্বি ধরে। ও'চি সুপারিশ করলেই আর্জি মঞ্জুর হয়—এ তারা বার-বারই দেখেছে।

আজও সে সস্নেহে স্বর্ণর একটা হাত ধরে বলল, 'বলি ব্যাওরাটা কি? গিন্নিমা আজ আবার সকালে কার ওপর সদয় হয়ে উঠলেন?'

'এই তোমার বোনপোর কথাই বলছি!' হাতমুখ-চোখ ঘুরিয়ে বলে স্বর্ণ, 'বলি ও তো এবাড়ির ছাঁচে নয়, ওর লেখা-পড়ায় চাড় আছে, ওর বিদ্যে হবেও। তা ওর বই-পত্তরের কিছু ব্যবস্থা করে দাও!'

'বল্ না গিয়ে তোর মেজকাকাকে। মেজকাকা তো তোর কথায় ওঠে বসে!' প্রমীলা ওর গাল দুটো টিপে দিয়ে বলে।

'হ্যাঁ, তা আর নয়! মেজকাকা যে কার কথায় ওঠে বসে তা এবাড়ির সবাই জানে। আমাকে ঘাঁটিও নি বাপু! এখন ওর কি করবে তাই বলো।'

'হবে গো গিন্নী হবে। এই তো আসছে মাস থেকে নতুন কেলাস শুরু হবে সব ইস্কুলে, তোমার মেজকাকা বলেছে ওকে একেবারে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে বইপত্তর কিনে দেবে!'

'বেশ বাপু বেশ। একটা সুরাহা হ'লেই ভাল।'

রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে বোধকরি অরুণকেই খবরটা দিতে আসছিল স্বর্ণ, কিন্তু রোয়াক পেরিয়ে দালানে পড়তেই পড়ে গেল একেবারে মায়ের সামনে। মহাশ্বেতা এখান থেকে সবই শুনতে পেয়েছে, সে মুখের একটা বিশ্রী ভঙ্গি করে চাপাগলায় বলে উঠল, 'পরের ভেয়ের জন্যে তো মাথাব্যথার অন্ত নেই একেবারে! নিজের ভাইদের লেখা-পড়ার কী হচ্ছে তা তো কোন দিন ভাবতে দেখি না। কৈ, এত তো পীরিত, তাদের জন্যে একটা মাষ্টার রাখতে তো বলতে পারিস মহারাজা-মহারাণীকে!'

'হ্যাঁ—তা আর নয়। যা রত্ন সব এক-একখানি গব্ভে ধারণ করেছ! ওদের জন্যে মাষ্টার রাখবে! কত পড়ার চাড় ওদের দেখছ না! বলি মেজকাকা কী চেষ্টার কমতিটা করছে শুনি। ওদের ইস্কুলে দেয় নে? না বই কিনে দেয় নে? সেসব কোথায় গেল? ছেলেদের ইস্কুলে পাঠাতে পেরেছিলে? মাস মাস একরাশ করে টাকা গুণগার দিয়ে

এদাল্তে না বন্ধ করেছে।...কত গুণের ছেলেরা তোমার তা দ্যাখো না—শুধু শুধু পরের ওপর রীষ করে জ্বলে পুড়ে মরো!'

'মুয়ে আগুন। মুয়ে আগন লাগুক তোমার! কথার ছিরি দ্যাখো না। ভায়েরা সব যেন শত্তুর ওর। পরঘরী এখন থেকে ঘর ভাঙছেন! মর্ মর্! একধার থেকে তোরা মরিস তো আমি শান্তি পাই, আমার হাড় জুড়োয়। ঘর-জ্বালানে পর-ভোলানে কোথা-কার? কবে মরবি তুই, কবে খালধারে যাবি তাই বলে যা আমায়!'

'দাঁড়াও আগে তোমাকে পাঠাই, তবে তো যাব!'

মুচ্‌কে হেসে আবার ছুটে চলে যায় স্বর্ণ। মার গালাগাল তার গা-সওয়া হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

মহাশ্বেতার নিজের কথাতেই, তার 'দুঃখের ভরা পরিপূর্ণ হ'লে' তবে সে মায়ের কাছে ছুটে আসে। কিন্তু শ্যামার আর ভাল লাগে না এ সব, তাঁর নিজেরই যথেষ্ট জ্বালা, যথেষ্ট দুর্ভাবনা। সে তুলনায় মহাশ্বেতা তো রাজরাণী। শুধু শুধু বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া বৈ তো নয়। এক এক দিন নিতান্ত অসহ্য হ'লে বলেই ফেলতেন মুখের ওপর, 'নে বাপু তোর ঐ একঘেয়ে থগ-বগানি আর নাকিকান্না থামা দিকি। সেই বলে না—মারবার না লোক থাকলে চালতাতলায় বাস—তা তোর হয়েছে তাই। নিজের ভাতার, নিজের ছেলেমেয়ে—তাদের তুই সামলাতে পারিস না—পরকে দোষ দিস কেন? হাতে পেলে আর কে কবে ছেড়ে দেয়। সবাই চায় নিজের দিন কিনে নিতে। তোর বুদ্ধি নেই, তুই পারিস না—ওদের আছে ওরা পারে। তোর ভাগ্যের দোষ দে, ওদের কি অপরাধ!'

এর পর—বলাবাহুল্য—এক অবর্ণনীয় কাণ্ড হ'ত। মহাশ্বেতা রেগে কেঁদে মাথা খুঁড়ে চিৎকার করে বুক চাপড়ে পাড়ার লোক জড়ো করত। আগে সত্যিই এদিক ওদিক থেকে লোক ছুটে আসত—এখন সবাই জেনে গেছে 'নতুন বামুনদের বড় মেয়ের মাথা-টায় বাপু বেশ ছিট আছে। বদ্ধ পাগল।' এখন আর বড় একটা কেউ আসে না।

এই সব দিনে যাবার সময় বারবার প্রতিজ্ঞা করে যেত মহাশ্বেতা যে, সে আর কখনও বাপের বাড়ি আসবে না। বাপের বাড়ি তার ঘুচে গেছে—সপুরী এক-গাড়ে গেছে, তা সে জানে। তাই সে ধরে নেবে। আর কখনও এ-মুখো হবে না। ফের যদি কখনও এ-মুখো হয় তো তার নামে সবাই যেন কুকুর পোষে, গুয়ের জল গায়ে ছেটায়...ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আবারও আসতে হয় তাকে ঠিকই। না এসে থাকতে পারে না। অন্য কোনও খবর থাকলে, মজাদার বা চটকদার কোন ঘটনা ঘটলে তার পরের দিন ছুটে আসতেও তার বাধা নেই। শ্যামা তা জানেন, তাই তিনি ওর চেঁচামেচি কান্নাকাটিতেও বিচলিত হন না, শাপমন্যি দিব্যি-দিলেশাতেও না। শ্যামার পুত্রবধূ কনকেরই অসহ্য লাগত প্রথম প্রথম. সে মৃদু অনুযোগ ক'রে বলত, 'কেন মা জেনেশুনে ও পাগলকে ঘাঁটান। চুপ ক'রে শুনে গেলেই হয়!'

'আমার আর সহ্যি হয় না মা। একে আমার জ্বালাতনের শরীর, নিজের ভাবনা-চিন্তেয় বলে আমার নিজের ঘুম হয় না, তার উপর কানের কাছে যদি নিত্যি ঐ সব

মিথ্যে নাকেকান্না কাঁদে আর হা-হুতাশ করে তো কার ভালো লাগে বল তো! হ্যাঁ, মা যদ্দিন ছিলেন আমিও মার কাছে গিয়ে পড়তুম কিন্তু সে যে কত দুঃখে, কত দুঃখ বুকে চেপে চেপে রেখে, সে কেউ জানে না। বুক যখন ফাটবার মতো হ'ত, যখন প্রাণ আসত ঠোঁটের ডগায়, তখনই ছুটে যেতুম! তাই কী সব কথা তাঁকে বলেছি? নিজের ভাতার-পুতের কেচ্ছা নিজের শ্বশুরবাড়ির খিটকেল কখনও বাপ-মায়ের কাছেও করতে নেই। আকাশের গায়ে থুতু দিলে সে থুতু নিজের গায়েই এসে পড়ে। বলে আহাম্মুক নম্বর চার, ঘরের কথা করে বার। ঐ হতো ওরই ছোট জা, দাঁতে দাঁত চেপে কী দুঃখটাই না সহ্য করলে, কৈ একদিন ওকে কেউ বাপের বাড়িতে এমনিও যাওয়াতে পেরেছিল? ছেলে পেটে আসতে একেবারে সাধ খেতে প্রথম বাপের বাড়ি গেল—মাথা উঁচু করে!'

আবার কোন দিন বলতেন, 'ওর ঐ মিথ্যে কথাগুলো আমার সহ্য হয় না বাপু, তা তুমি যতই বলো কোনদিনই অসৈরণ কথা আমার ভাল লাগে না। এতটি তো সাত ঝুড়ি নিন্দে করে শ্বশুরবাড়ির—তুমি একটা কথা বলো দিকি, তখনই ফোঁস করে উঠবে। মায় ঐ মেজকর্তা মেজগিন্নী, নিত্যি যাকে গাল না দিয়ে জল খায় না, তারাও দেখবে তখন কত জ্ঞানবান বিচক্ষণ কত বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে। তখন ওদের বিবেচনাই ধন্যি ধন্যি হবে। ওর ও রোগ, মধ্যে মধ্যে খানিকটা কান্নাকাটি চেঁচামেচি না করে থাকতে পারে না। বায়ু রোগ ওটা।...ছেলেগুলোকে নিজে ইচ্ছে করে অমানুষ করছে। কী সমাচার না ওর বাপ কাকারা কে কত লেখাপড়া শিখেছে, তারা করে খাচ্ছে না? দিন কতক হেসে-খেলে বেড়াক না। নিহাৎ যখন দেওরকে জাকে গাল দেবার দরকার হয় তখনই ছেলেদের পড়াশুনোর কথাটা মনে পড়ে। ওসব নাকে-কান্না আমার ভাল লাগে না।'...

কিন্তু সেদিন বলতে গেলে একটা অঘটনই ঘটল। মহাশ্বেতা এল প্রায় লাফাতে লাফাতে, খুশিতে ডগোমগো হয়ে, আহ্লাদে ফেটে পড়তে পড়তে। দূর থেকেই তার এ ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলেন শ্যামা, মেয়ে এসে বাড়ি ঢুকতে তাই অন্য দিনের মতো নিরাসক্ত ভাব বজায় রাখতে পারলেন না, একটু উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতেই মুখ তুলে চাইলেন।

'নাঃ, তা যাই বলো বাপু, ছেলেটার পয় আছে! মাওড়া অনাথা হ'লে কি হবে, আমার সংসারে এসে পয় ফলিয়েছে তা মানতেই হবে।'

'কে ঠাকুরঝি, কার কথা বলছেন?' কনক জিজ্ঞাসা করল।

প্রশ্নটা মার কাছ থেকে এলে মহাশ্বেতা আরও খুশী হ'ত। ঈষৎ একটু ভ্রূটা কুঞ্চিত হ'ল কনকের ব্যস্ততায়। তবু হাসি-হাসি মুখেই হাত পা নেড়ে বলল, 'ঐ মেজ-বৌয়ের বোনপোটার কথা বলছি। ঐ অরুণটার কথা। যাই হোক, ও আসবার পরেই তো তোমার নন্দায়ের সুবুদ্ধি হ'ল তবু, বিষয়ের কথা কইতে এল আমার সঙ্গে। কোনদিন তো এর আগে আমাকে মানুষের মধ্যেই গণ্যি করে নি, টাকা-পয়সার কথা আমার সঙ্গে যে কইতে হয় এ কখনও জানত না।...আর এ শুধু বলাই নয়, আমার একটা আয়ের পথও তো হ'ল। ছেলেটার পয় ছাড়া কি বলব বলো, নইলে এমন অকালে সকাল, আমার হঠাৎ এমন বরাত খুলবেই বা কেন?'

এবার শ্যামাও আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারেন না। 'আয়' এবং 'বরাত খোলা' শব্দ দুটো তাঁর কাছে কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। আজকাল মেয়েকে দূর থেকে দেখলেই কপালে যে বিরক্তির রেখাটা পড়ে সেটা মুছে গিয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠল তাঁর মুখ: বললেন, 'কী রকম, কী রকম। হঠাৎ বরাতটা কী খুলে গেল শুনি? জামাই তোর নামে সম্পত্তি কিনেছে?'

'তবেই হয়েছে! সেদিন পূবের সূয্যু পশ্চিমে উঠবে। তা নয়—অত আশা আমার নেইও। আমার কাছে দু পয়সা আয়ের পথ হ'লেই ঢের। দাঁড়াও আগে বসি একটু দম নিই। বলছি তারপর!'

অর্থাৎ বেশ ঘটা করেই বলবার মতো কথাটা।

শ্যামা তখন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে নারকেল পাতা চেঁচে খ্যাংরা কাঠি বার করছিলেন, তিনি পাতাগুলো এক দিকে সরিয়ে একটু জায়গা করে দিলেন। কনক তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে একটা পিঁড়ি পেতে দিল। চেপেচুপে বসে কিছুক্ষণ স্মিত কৌতুকোজ্জ্বল মুখে মা আর বৌদির দিকে চেয়ে রইল চুপ করে। যেন খুব মজার কোন কথা বলে তার ফলাফলটা দেখছে এখন।

শ্যামা ওর ভাবগতিক দেখে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। বললেন, 'নাও, তোমার দম নেওয়া হ'ল? এখন কী মতলবে এসেছ কথাটা খুলে বলো দিকি, অমন থিয়েটার য়্যাক্‌টো করতে হবে না!'

মনের পাত্রে তৃপ্তি আর বিজয়গর্ব তখন উছলে উঠেছে মহাশ্বেতার, তাই এসব তুচ্ছ খোঁচা গায়ে মাখল না। হাসি হাসি মুখে বলল, 'বলি মাথার ওপর ভগবান আছেন তো গা! দিনকে রাত বলে কতকাল চালানো যায়? একদিন না একদিন ভগবান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেন না?...চেরকাল মোটা মোটা টাকা এনে ঐ দুই রাজারাণীর শ্রীপাদপদ্মে ঢেলেছেন, যত কিছু উপাজ্জন গোদাপদে সমম্পন। কী না আমার ভাই-ভাজ খুব ভাল। লক্ষ্মণ ভাই! ও-ই সবাইকে দেখবে।...তা এবার চোখটা একটু খুলল তো? মানুষটা বেঁচে থাকতেই এই, চোখ বুজলে কী মুর্তি ধরবে তা বুঝছে না এবার? হাড়ে হাড়েই বুঝছে। তবে ঐ, ভাঙে তো মচকায় না। তেমন ঝাড়ের বাঁশ নয় কেউ। ওরা মরে তবু মর্যোদা হারায় না। সব সব, বুঝলে ও সব সমান। ছেলেগুলো পজ্জন্ত দ্যাখো না—লেখাপড়া করে না কিছু না, কথা কইতে যাও দিকি, মুখে তুবড়ি ছুটিয়ে দেবে একেবারে। কত এম-এ বি-এ লোক থ হয়ে যায় ওদের মুখের সামনে!'

এবার শ্যামার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বঁটিখানা দেওয়ালের খাঁজে উপুড় ক'রে রেখে পাতারই একটা ফালি বার ক'রে নিয়ে ঝ্যাঁটার কাটিগুলো বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'তুমি দেওয়ালের সামনে বসে বক্তিমে করো মা, আমি উঠলুম, আমার কাজ আছে!'

'রোস রোস। আমার আসল কাজটাই যে বাকী গো। বাবা, তুমি যে একেবারে সব্বক্ষণ ঘোড়ায় জীন কষে আছ দেখতে পাই!...তবে কাজের কথাই সেরে নিই। অ বৌদি, তুই একটু ওধারে যা ভাই, মার সঙ্গে দুটো পেরাইভেট কথা আছে!'

তারপর গলাটা নামিয়ে—ও ঘর থেকে কনকের শুনতে কোন রকম বাধা না হয় এমন পর্দাতেই—ফ্যাস ফ্যাস ক'রে বললে, 'দুশোটা টাকা দিতে হবে আমাকে এখুনি—জামাইয়ের দরকার!'

এইবার শ্যামার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। অন্ধকারও হয়ে উঠল বলা যায়। আর যাই হোক, ঠিক এ আক্রমণটা আশঙ্কা করেন নি তিনি। মেয়ের খুশির তালটা যে তাঁর ওপর এসে পড়বে তা একবারও ভাবেন নি।

প্রায় মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'হঠাৎ? জামাইয়ের কী এমন দরকার পড়ল? আমার কাছে তোর টাকা থাকে জামাই জানলেন বা কী করে?'

'না, মানে তোমার জামাইয়ের দরকারও বলতে পারো, আমার দরকারও বলতে পারো!'

'ঘোরপ্যাঁচ ছেড়ে একটু খোলসা করেই বলো না কথাটা বাছা!'

'ঘোরপ্যাঁচের আর আছে কি! আমিই বলেছি তাকে টাকাটা দেব। এখানে টাকা আছে তাও আমিই বলেছি।'

মেয়ের কণ্ঠে তাপের আভাস পেতেই শ্যামার কণ্ঠের তাপটা কমে আসে। এ তাপ মালিকানার তাপ, এর চেহারাটা শ্যামার চেনা আছে। যার টাকা সে চাইচে, এর মধ্যে কোন অনুরোধ কি অনুনয় নেই। এর ওপর কোন কথাও চলবে না।

বেশ একটু নরম গলায় প্রশ্ন করেন তিনি, 'তা হঠাৎ? জামাই-এর হঠাৎ টাকার দরকার হ'ল যে। সম্পত্তি কিনবেন নাকি কোথাও?'

'তবে বাপু খোলসা করেই বলি কথাটা। কাউকে যেন ব'লো নি। শোন। ওদের আপিসে নাকি দু-তিনটে নতুন সায়েব এসেছে—তাদের খুব জুয়োর বাই। শনিবারে শনিবারে রসার মাঠে কী ঘোড়দৌড় না কি হয়, সেখানে গিয়ে মড়-মড় টাকা ঢেলে আসে। এর জন্যে নাকি দুচোকের-ব্রত দেনা করে যেখানে পায়। আর মোটা মোটা টাকা সুদ গোনে। একশ' টাকায় এক মাসে পঁচিশ টাকা তিরিশ টাকা সুদ। অফিসের বেয়ারা দারোয়ানগুলো সব লাল হয়ে গেল সুদ খেয়ে খেয়ে। তাই দেখে ওর মাথায় ঢুকেছে কথাটা যে খোট্টা দারোয়ানগুলো এত পয়সা কামাচ্ছে—তবু ওদের কিছু নেই —আর আমরা এত টাকা নিয়ে বসে আছি, আমরা কামাতে পারব না! তা পেরথম পেরথম কাউকে বলে নি, নিজেই দু-চার টাকা যা নিজের হাতে ছিল দিয়েছে। মাস কাবারে পেয়েওছে সুদে আসলে সব টাকা। বলি টাকা তো হাতের মুঠোয় গো, মাইনে তো নিতে হবে, ঐখানে তো টিকি বাঁধা সব।'

এই পর্যন্ত বলে, বোধ করি দম নেবার জন্যেই একটু থামে মহাশ্বেতা। কথাগুলো বেশ গুছিয়ে বুদ্ধিমানের মতো বলতে পেরেছে, এর জন্যে একটু আত্মপ্রসাদের হাসিও হাসে।

শ্যামা স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন। কথাটা এত সহজ নয়, এর মধ্যে কোথাও একটা বড় রকম গোলমাল আছে। সেই গোলমালটাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন মনে মনে।

মহাশ্বেতাই আবার শুরু করল। পূর্ব প্রসঙ্গের খেই ধরে বলল, 'তা কথাটা তাই কাল হাটি-পাটি পেড়ে লক্ষ্মণ ভাইকে বলতে গেছল। আমি তো আজকাল সেয়ানা হয়ে গেছি কিনা যখনই দেখি আপিস থেকে ফিরে বড় ভাই গিয়ে মেজ ভায়ের ঘরে সেঁদিয়ে দোর দিলে, তখনই বুঝি যে এবার বিষয়-কম্মের ব্যাপার কিছু হবে। আমিও আজকাল সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আড়ি পাতি। তাতেই তো সব শুনলুম, নইলে কি আর আমাকে এ সব কথা ও নিজে থেকে বলবে? তবেই হয়েছে! সেই লোকই কিনা!'

কথাটা আবার সোজা রাস্তা থেকে সরে যাচ্ছে দেখে অসহিষ্ণু শ্যামা প্রশ্ন করলেন, 'তা মেজকর্তা কি বললে?'

'সব বিত্তান্ত খুলে বলে বড়কত্তা বললেন, আমাকে তুমি বেশী না, শ'তিন-চার টাকা দাও, ছ মাসে আমি ডবল ক'রে দিচ্ছি। তা মেজকত্তার মত হ'ল না। তিনি বললেন, না দাদা এসব কাজ ভাল না। এইভাবে ধার করতে করতে একদিন এমন হবে যখন আর মাইনের টাকায় কুলোবে না। তাছাড়া এর কোন লেখাপড়া নেই। সুদ নিচ্ছ তুমি কাবুলিওয়ালার বাড়া, কোম্পানীকে বলতে গেলে কোম্পানীও শুনবে না। লেখাপড়া যদি ক'রেও দেয় তবু কোম্পানী তার টাকা কেটে তোমাকে দেবে না। বলবে যেমন লোভ করতে গেছলে তেমনি তার ফল ভোগ করো গে!...তোমার জামাই কত বুঝিয়ে বললে; বললে দিনরাত ঐখেনে পড়ে আছি, এ তো মোটা কিছু নয়, আমি যদি অল্প দিনে আসলটাকে ডবল করে নিতে পারি শেষ পর্যন্ত না হয় কিছু টাকা ডুবলই। তাতে তো আর লোকসান নেই। তা মেজকত্তার বুদ্ধি বেশী—বললেন, না,

লোভ মানুষের বেড়েই যায়, দেখো তুমি ও সুদের টাকাও সরিয়ে রাখতে পারবে না, সবসুদ্দু খাটাবে, যাবে যখন সবসুদ্দুই যাবে। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, বেশী লোভ ভাল না। তার চেয়ে যেমন আছি তেমনি থাকি।'

'অম্বিক ঠিকই বলেছে। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু—এ সবও জুয়া খেলা। তাছাড়া ওরা, সায়েব জাত, হঠাৎ রাতারাতি সরে পড়লে আর কোথায় তাদের পাত্তা পাবি যে টাকা আদায় করবি? না বাপু, দরকার নেই তোরও ওসবে গিয়ে, ঐ তো কটা টাকা। গেলে আর দুঃসময়ের সম্বল বলতে কিছু থাকবে না।'

'দ্যাখো,' অকস্মাৎ তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার কণ্ঠ, 'তোমার জামাইয়ের চেয়ে টাকাটা বেশী বোঝে—এমন মানুষ তো আমি কই আর দেখলুম'না। বলি আজ যে মেজকত্তা সোনার খাটে গা রুপোর খাটে পা দিয়ে বসে আছেন সে টাকাটা করলে কে? সে কি ও'র রোজগারের টাকা? আজ যদি আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গি? যুদ্ধের সময় চোরাই লোহা চালান করে শুয়ে শুয়ে টাকাটা কে রোজগার করেছিল? তাতে ঝুঁকি ছিল না? ধরা পড়লে যে একেবারে পুলিপোলাও দেখিয়ে দিত। তখন এসব ধম্মের বুলি কোথায় ছিল! তা তো নয়, এখন টাকাটা গুদোমজাত করে বসে আছি, নাড়ছি চাড়ছি হাত বুলোচ্ছি সোনার বাটে—এখন বার করতে বড় মায়া লাগছে আর কি! হাত্তোর বেইমানের জাত রে? যার ধন তার ধন নয়—নেপোয় মারে দই!'

এর পর আর টাকাটা না দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ লোককে বোঝাতে যাওয়াও বৃথা হিতে বিপরীত হবে। হয়ত এর চেয়েও কটুকথা শুনতে হবে নিজেকেই। শ্যামা আর কথা বাড়ালেন না। পাতা চাঁচবার জন্যে একটা খাটো কাপড় পরে ছিলেন, সেটা ছেড়ে ভিজে গামছা পরে গিয়ে ঘরের দোর দিয়ে কোথা থেকে হাতড়ে হাতড়ে দুশোটি টাকা বার করে এনে নিঃশব্দেই মেয়ের সামনে ফেলে দিলেন।

মহাশ্বেতা টাকাগুলো নিয়ে পেট-কাপড়ে বাঁধতে বাঁধতে বললে, 'আমিও তেমন বাপের বেটি নই বাপু। যেমন মেজকত্তার ঘর থেকে বেরলো অমনি আমি ইশারা ক'রে ডেকে নে এসে আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিলুম। তা মানুষ তো নয়, পাথর—ওকে শোনানোও যা দ্যালটাকে শোনানোও তা। তবু মনের ঝালটা তো মিটিয়ে নিলুম। আর মুখে না মানুক, ভেতরে ভেতরে তো বুঝল।...ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দিয়ে বললুম, আমাকে তো কোনদিন বিশ্বাস করো না, আমার হাতে ভরসা করে কখনও টাকাও দিলে না। তবু আমিই তোমার মান রাখব। আমি তোমাকে এনে দেব দুশো টাকা। তখন একটু অবাক হ'ল, মুখটা একটু ওজ্জ্বলও হ'ল। বললে, তুমি কোথায় পাবে? আমি তা বলে অত বোকা নই যে সব টাকার সন্ধান দেব। আমি বললুম, সে আমি এনে দেব যেখান থেকে পাই। মোদ্দা সুদটা ঠিক ঠিক আমাকে এনে বুঝ ক'রে দিও, সেটা আবার যেন নিয়ে গিয়ে ঐ শ্রীপাদপদ্মে ঢেলো নি। তা বলে, না না—পাগল। তোমার টাকার সুদ তুমিই পাবে।...তাই এই ছুটে এলুম।'

এতক্ষণে আনুপূর্বিক ইতিহাস শেষ করে উঠে পড়ল সে।

'যাই; আবার এতটা পথ এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে যাওয়া তো, ভয় করে। ভেবেছিলুম দুপুরবেলা আসব, তা ও বিনি-মাইনের চাকরির কি ছুটি আছে! খোকাটা কোথায় গেল, এগিয়ে দিয়ে আসত একটু?'

'ঐ বাগানে কী করছে বোধ হয়। যাবার সময় ডেকে নিয়ে যা। সাবধানে যাস একটু। দুগ্‌গা দুগ্‌গা।'

শুষ্ক বিরস কণ্ঠে কর্তব্য পালন করেন শ্যামা। তাঁর মুখের অপ্রসন্নতাও ঢাকা থাকে না। কিন্তু মহাশ্বেতার তা লক্ষ্য করবার কথা নয়, করলও না— খুশী মনেই

বৌদিকে ডেকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হ'ল।

এ গাঁ ও গাঁ বটে, এপাড়া ওপাড়াও বলা যায়। সবসুদ্ধ তিন-পোর বেশী নয়, এটুকু পথ হাঁটতে এখানে কারুরই গায়ে লাগে না।

॥ ২ ॥

শ্যামার এ বিরসতার কারণ আছে বৈকি। টাকাটা যদিও মহাশ্বেতার, এবং সে জমাই রাখতে দিয়েছে মাকে, তবু এইটেই এখন শ্যামার প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছে। সব টাকাই অভয়পদ এনে ভাইকে ধরে দিত—এখনও দেয়। মাইনের টাকাই শুধু নয়—উপরির টাকাও, সৎ অসৎ সর্ববিধ উপার্জনের টাকাই। এই নিয়ে মহাশ্বেতার অশান্তির অন্ত ছিল না। সে অশান্তি অবশ্য মুখ ফুটে অভয়পদকে জানাবার বা এই নিয়ে তার সঙ্গে কলহ-কাজিয়া করার সাহস কোনদিনই তার হ'ত না, যদি না পিছনে থেকে শ্যামা তাকে নিরন্তর উত্তেজিত করতেন। শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়েই নিজের দাবি জানিয়েছিল মহাশ্বেতা এবং তার ফলে অভয়পদ দু-চার টাকা মধ্যে মধ্যে দিতে শুরু করেছিল। চেয়ে নেওয়া ছাড়াও, ইদানীং সাহস বেড়ে যেতে, পকেট থেকেও দু-এক টাকা ক'রে সরাতে শুরু করেছিল। অভয়পদ তা টের পেত আর টের যে পেত সে কথাটাও সে মহাশ্বেতাকে জানিয়ে দিয়েছিল—কিন্তু তা নিয়ে রাগারাগি করে নি। মহাশ্বেতা তাতেও কতকটা প্রশ্রয় পেয়েছিল।

তবু সে কতই বা! বেশী টাকা না-বলে নেবার সাহস মহাশ্বেতার আজও হয় নি। সুযোগও কম। তেমন বাড়তি টাকা ওর পকেটে পড়ে থাকে কদাচিৎ। সুতরাং সব জড়িয়ে মহাশ্বেতার জমানো টাকার পরিমাণ ছ-সাতশ'র বেশী ওঠে নি এখনও পর্যন্ত।

টাকাটা যতই হোক—শ্যামার কাছে অনেক। জামাইয়ের কাছে তাঁর কিছু ঋণ আছে, এই বাড়িখানা করার দরুন। সে টাকাটা আজও শোধ দিতে পারেন নি। কিছু কিছু যে দিতে পারতেন তা নয়—কিন্তু ইতিমধ্যে উপার্জনের একটা নতুন এবং অভি-নব পথ আবিষ্কার করেছেন, তা হচ্ছে সুদে টাকা খাটানো। এ পাড়ায় থালা বাটি গেলাস রুপোর বাসন—দৈবাৎ কখনও সোনার গহনা রেখেও টাকা ধার করতে আসে অনেকে। বেশী টাকায় শ্যামার উৎসাহ কম। চার আট আনা ধার দেওয়াতে সুদ বেশী আদায় হয়। টাকায় এক পয়সা সুদ, আট আনা চার আনাতেও এক পয়সা। কারণ, পয়সা ভেঙ্গে সুদ দেওয়া নিয়ম নেই।

এ পথটা একদিন অকস্মাৎ আপনিই খুলে গিয়েছিল। শ্যামাও সুযোগটা বুঝতে ও তার সদ্ব্যবহার করতে ইতস্তত করেন নি কিছুমাত্র! সেই থেকে জামাইকে টাকা দেওয়া বন্ধ করেছেন। জামাইও তাগাদা দেয় না অবশ্য, হয়ত সে ফেরত পাবার আশাতে ঠিক দেয়ও নি; তবে শ্যামা দেবেন ঠিকই। আপাতত যা হাতে আসে সুদে খাটান, এই সুদ বা সুদের সুদ থেকেই একদিন ও ঋণটা শোধ হয়ে যাবে—এ ভরসা তাঁর আছে।

মেয়ের টাকাও এই কারবারে খাটে তাঁর। অবশ্য টাকাটা সুদে খাটাবার জন্য মেয়ে রাখে নি তাঁর কাছে। পাছে আর কেউ বাটপাড়ি করে সেই ভয়েই রেখেছে। তবে মেয়েকেও তিনি এই লাভ বা সুদের কিছু অংশ দেবেন, অন্তত এখনও মনে মনে এ রকম শুভ ইচ্ছা আছে। মেয়েকেও সে কথা শুনিয়ে রেখেছেন। তবে সে হিসেব নেইও তাঁর। মেয়েকে যখন টাকাটা বুঝে দেবার সময় হবে তখন একটা আন্দাজী আয় ধরে ঠাওকো থোক কিছু ধরে দিলেই চলবে। সে পরের কথা। এখন যদি আসলই বেরিয়ে

যায় এইভাবে হাত থেকে—।

ভাবতেই খারাপ লাগছে শ্যামার।একদিন এমনিই, বলতে গেলে খেলার ছলে এ কারবার আরম্ভ করেছিলেন, সেটা যে এমনভাবে তাঁর সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তা আজকের আগে তিনিও বুঝি এমন ভাবে অনুভব করেন নি। অবশ্য সব টাকাটা খাটছে না এটা ঠিক—নইলে চাইবা মাত্র বার ক'রেই বা দিলেন কি করে—তবু মহাজনের হাতে টাকাটা সব সময় থাকা দরকার। নইলে এ কারবারের ইজ্জৎ থাকে না। মক্কেলও হাতছাড়া হয়ে যায়। 'নেই নেই' শোনাতে হয়, খুব অনিচ্ছাতে দিচ্ছেন এমন ভাবও দেখাতে হয়—তবু শ্যামা ফেরান না প্রায় কাউকেই। কারণ তিনি জানেন যার এমন ঠেকা, বাসন কি গয়না রেখে ধার নিতে এসেছে, সে নেবেই—তিনি ফেরৎ দিলে অপর জায়গা থেকে নেবে—মাঝখান থেকে তিনি সুদটা খোয়াবেন কেন? তা ছাড়া নতুন পথ পেলে পরেও হয়ত সেই পথেই চেষ্টা দেখবে, অর্থাৎ ঘরটাই নষ্ট হয়ে যাবে চিরকালের মতো।

অথচ এখন কীই বা করা যায়?

এ টাকাটা গেছে যাক, কিন্তু এখানেই যে ওরা থামতে পারবে না তা শ্যামা বুঝতে পারছেন। এ বড় সাংঘাতিক লোভ, প্রায় জুয়ার নেশার মতোই। আবারও আসবে. আবারও চাইবে। এক উপায়—হাতে নেই. সুদে খাটছে বলা. কিন্তু তা হ'লেই অনুমানের ঘরে সুদের অঙ্কটা বাড়তে থাকবে মেয়ের মনে—আশাটা বেড়ে যাবে। তখন আয়ের হিসাব চাইবে সে।

নাঃ. সেও কোন কাজের কথা নয়।

তবে?

এই তবেটাই ঠিক করতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসে রইলেন শ্যামা। তাঁর ভাবগতিক দেখে কনকেরও বিস্ময়ের সীমা রইল না। এখনও আকাশে আলোর আভাস আছে, এখনও পুরোপুরি অন্ধকার নামে নি ওদের উঠোনের কাঁঠালগাছ কলাগাছের ছায়ায়—এখনই এমনভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকা স্থির হয়ে—এ শ্যামার পক্ষে একেবারেই অভিনব। কনকের অভিজ্ঞতায় অন্তত এমন ঘটনা আর কখনও ঘটে নি।

কারণটা শুনলেও অবশ্য কনক বুঝত না। বরং আরও হাস্যকর মনে হ'ত। পরের টাকা ও'র কাছে খাটত, না হয় আর খাটবে না। এটা তো একটা বাড়তি আয়. এর ওপর ভরসা ক'রে কিছু ও'র সংসার চলছে না, তাছাড়া মেয়ের টাকাটা সব বেরিয়ে গেলেও ও'র কারবার অচল হবে না—তবে?

কনক বুঝতে পারত না. কারণ সে অনেক পরে এ বাড়িতে এসেছে। আভাসে ইঙ্গিতে. মেজো ঠাকুরঝির কথা থেকে, মহাশ্বেতার কদাচিৎ কোন বেফাঁশ কথাতে—সে কিছু কিছু পূর্ব ইতিহাসের আঁচ পেয়েছে ; কিছু বুঝেছে সে তার শ্বশুরের মৃত্যুর সময়—তাঁকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে—কিন্তু তবু সবটা সে জানে না, সে ইতিহাস তার কল্পনার অতীত।

শ্যামার শ্বশুররা ছিলেন খুব নামকরা গুরু-বংশ। বাড়িঘর শিষ্য-যজমান বিষয়-সম্পত্তি সব দিকেই প্রাচুর্য দেখে শ্যামার মা রাসমণি মূর্খ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী হয়েছিলেন। ঠিক অত সহজে, অত অল্পদিনে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে সত্যি-সত্যিই তাঁর মেয়েকে পথের ভিখিরী করবে সে ছেলে, তা তিনি তখন স্বপ্নেও ভাবেন নি। যা ছিল, তাতে বসে খেলেও দু'পুরুষ কেটে যেতে পারত। আর রাসমণিও

অসহায় বিধবা মেয়েছেলে—অভিভাবকহীন, সহায় সঙ্গতিহীন—তিনিই বা করবেন কি। ঘটক-ঘটকীর ওপর নির্ভর করা ছাড়া তাঁর তো উপায় ছিল না। ছেলে মূর্খ এটা জেনেছিলেন কিন্তু সে যে অমানুষ এটা জানতে পারেন নি।

শ্যামার স্বামী নরেন আর ভাসুর দেবেন—সেদিক দিয়ে দুজনের কেউই কম কৃতী নন। ও'দের বাড়ি বাগান প্রভৃতি সব যখন খিদিরপুর ডকে পড়ল তখন নতুন বাড়ি খোঁজার অছিলায় ও'দের গুপ্তিপাড়ায় এক শিষ্যের খালি বাড়িতে রেখে এসে দুই ভাই-ই প্রাণ খুলে উড়তে শুরু করলেন। বাড়ির টাকা, সরকার থেকে পাওয়া-- সে আর কদিন, তারপর অন্য বিষয়ও ভাগ ক'রে নিয়ে দুজনেই জলের দামে বেচে দিলেন, ওড়ার ব্যবস্থাটা রইল অব্যাহত। তারপর একদিন অবশ্য আবার মাটিতে পা দিতে হ'ল কিন্তু তখন সে সমস্ত টাকাই উড়ে চলে গেছে—রেখে গেছে দুজনের শরীরে কিছু কুৎসিত ব্যাধি। দেবেন তবু নিজেকে সামলে নিলেন, সামান্য কিছু ওষুধ সংগ্রহ ক'রে আরাতে গিয়ে 'ডাগদারি' শুরু করলেন (ওদেশে ডাক্তারি করার জন্য তখন নাকি চিকিৎসা শাস্ত্র জানবার দরকার ছিল না!) এবং স্ত্রীপুত্রকে ভরণ-পোষণ করার মতো আর্থিক অবস্থা ক'রে নিলেন। কিন্তু স্বভাবকে বা অভ্যাসকে কিছুতেই সংযত করতে পারলেন না নরেন। তার ফলে বহু দুর্গতির মধ্য দিয়ে এসে অবশেষে আশ্রয় যোগাড় করলেন পদ্মগ্রামের সরকারদের বাড়ি, পূজারী ব্রাহ্মণ হিসাবে। তবে সেটুকু আশ্রয়ই সেদিন শ্যামার কাছে স্বর্গের চেয়ে দুর্লভ ছিল, কারণ তার আগে নিঃসঙ্গ নিঃসহায় এবং নিঃসম্বল অবস্থায় একটি শিশু এবং বৃদ্ধা শাশুড়ীকে নিয়ে যেভাবে দিন কেটেছে, তা একমাত্র তাঁর অন্তর্যামীই জানেন।

এই পূজারীর কাজটাও যদি মন দিয়ে করতেন নরেন তো হয়ত সংসারটা দাঁড়াতে পারত। কিন্তু একেবারেই ভবঘুরে স্বভাব হয়ে গিয়েছিল—তাঁর মন কিছুতেই এক জায়গায় বাসা বাঁধতে পারত না। তাছাড়া কুসংসর্গ অভ্যাস থেকে স্বভাবের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল—সে লোভেও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হ'ত তাঁকে। দু'মাস, ছ'মাস কখনও বা এক বছর দেড় বছর অন্তর হুতাশনের মতো এসে পড়তেন কোথা থেকে, কখনও কিছু—চাল ডাল ময়দা বা পুরোপুরি একটা সিধা—সঙ্গে আনতেন, কখনও বা দুর্ভিক্ষক্লিষ্টের মতো এসে এদের ভিক্ষান্নে ভাগ বসিয়ে কিছুদিন পরে শ্যামার হত-দরিদ্র সংসার থেকেই কিছু চুরি ক'রে আবার সরে পড়তেন নিজের অজ্ঞাতবাসে। এ প্রায়ই হ'ত। কী ক'রে যে এই একেবারে অচল অবস্থা সচল রেখেছিলেন শ্যামা, একান্ত প্রতিকূল ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, আর ক'রে—টিকেছিলেন শুধু নয়-- দাঁড়িয়েও ছিলেন শেষ পর্যন্ত মাথা উঁচু ক'রে—মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিজের বাড়ি ক'রে ভবঘুরে স্বামীকে শেষ-নিঃশ্বাস ফেলবার নিজস্ব আশ্রয়টুকু দিতে পেরে-ছিলেন— সে ইতিহাস, কনক তার চিন্তাশক্তিকে যত উচ্চপ্রসারী পাখা মেলে কল্পনার সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনুক—সেই সত্য ইতিহাসকে কোনদিন স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না।

হ্যাঁ, বড়জামাই অভয়পদ অবশ্য অনেক সাহায্য করেছেন—যদিচ ঠিক কতটা করেছেন তা শ্যামা ছাড়া কোন দ্বিতীয় প্রাণী জানেন না; এমন কি মহাশ্বেতাও নয়। (মুখপোড়া মিনসে কি কোন কালে কোনকথা খুলে বললে ওকে! ওরই বাপের বাড়ির কথা চেরকাল ওর কাছে ঢেকে ঢেকে ম'ল। মুয়ে আগুন বুদ্ধির!)—তবু এ দাঁড়ানো যে কী দাঁড়ানো, কী অমানুষিক চেষ্টা, কী অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি এবং কী উত্তুঙ্গ উচ্চাশা থাকলে যে এই পুনরুত্থান সম্ভব—তা কনক কেন আর কেউই কোন-দিন ধারণা করতে পারবে না। আর তা না থাকলে সহস্র অভয়পদ পাশে এসে দাঁড়া-

সেও এভাবে দাঁড়ানো সম্ভব হ'ত না। হয়ত বড়জামাইও সেটা বুঝেছিল, নইলে সে-ও এমন ক'রে পাশে এসে দাঁড়াত না। তাকেও প্রায় বাল্যকাল থেকেই জীবনের সঙ্গে লড়াই ক'রে, একটি পয়সা বাঁচাবার জন্যও একান্ত সাধনা ও প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে, একদা শিশু ভাইবোনদের মানুষ করতে হয়েছিল। সেই দুর্লভ অথবা দুর্লভতর শক্তি শাশুড়ীর মধ্যে প্রত্যক্ষ ক'রেই সে সম্ভবত নিজে থেকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল।

সুতরাং আজ যদি পয়সা সম্বন্ধে একটা মোহই পেয়ে বসে থাকে তাঁকে, উপার্জন করাটা যদি নেশায় পর্যবসিত হয়ে থাকে তো শ্যামাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আজ তাঁকে সারা দিন-রাত পাতা কুড়িয়ে জড়ো করতে বা নারকেল পাতা চেঁচে ঝাঁটার কাঠি সঞ্চয় করতে দেখে যারা হাসে, তারা এ ইতিহাস জানে না বলেই হাসে, আর হাসবেও চিরকাল, কারণ আর কেউই জানবে না। কোনদিনই না। সেদিনের যারা প্রধান সাক্ষী—হেম আর মহাশ্বেতা—তাদের স্মৃতিতেও কি বর্তমানের সূক্ষ্ম সাদা পর্দা পড়ে যাচ্ছে না? অতীতের কথা আর বুঝি তাদেরও তেমন ক'রে স্মরণ করা বা অনুভব করা সম্ভব নয়! হয়ত তারাও এমনই হাসে মনে মনে অথবা বিরক্ত হয়।

॥ ৩ ॥

এরই মধ্যে একদিন—একেবারে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো—তরু এসে হাজির।

ভোরবেলা, সবে শ্যামা কাপড় কেচে এসে পাতার জ্বালে ছেলের ভাত চড়িয়েছেন, কনক উঠে ছড়া-ঝাঁট দিচ্ছে, অশ্রুমুখী মেয়ে এক কাপড়ে এসে দাঁড়াল।

বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠল শ্যামার।

জন্মের পর মোট নটি বছর নিশ্চিন্ত ছিলেন শ্যামা, যতদিন না বিবাহ হয়েছিল। তারপর দশ বছর বয়সে সেই বিবাহের পর থেকে—সারা জীবনই তাঁকে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ঘর করতে হয়েছে। দুঃসংবাদ শুনতে হয়েছে শুধু। এইতেই অভ্যস্ত তিনি। আকস্মিক, অভাবনীয় কোন ঘটনা ঘটলেই তিনি জানেন একটা বড়রকম দুর্ঘটনার সামনে দাঁড়াতে হবে এবার।

আজও সেই রকমেরই একটা বড় কিছু শোনাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এখনও খুব বেশীদিন হয় নি, এমনি ভোরবেলা এমনি কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে এসে পড়েছিল ঐন্দ্রিলা, স্বামীর কালব্যাধির সংবাদ নিয়ে। এও সেই ভোরবেলা। এরও চোখে জল।

আড়ষ্ট হয়ে গেলেন শ্যামা, কোন প্রশ্ন পর্যন্ত মুখ দিয়ে বেরলো না।

কনকই গোবরজলের বালতি নামিয়ে ছুটে এসে ওর হাত ধরল, 'এ কী ঠাকুরঝি! এ কী অলক্ষণ! ভোরবেলা এমনভাবে—কী হবে মা! এসো এসো, বসো এসে। কী হয়েছে কি?'

হাতধরে নিয়ে এসে বসাল সে রান্নাঘরের দাওয়াতেই।

'কী হয়েছে রে? জামাই, জামাই ভাল আছেন তো?'

এতক্ষণে স্বর বেরোয় শ্যামার কণ্ঠ দিয়ে। স্বাভাবিকতা বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে গিয়ে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ম ও বিকৃত একটা স্বরই বেরিয়ে আসে গলা দিয়ে।

'সে ভাল আছে।' কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে তরু।

'তবে? তুই একা, এ ভাবে?'

হেম রান্নাঘরেই শোয়, সে এতক্ষণ আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে একটু আলস্য করছিল, ভাতের ফ্যান উথলে উঠলেই মা ডাকবেন, তখন উঠে স্নান প্রাতঃকৃত্য সারতে যাবে। মায়ের তীব্র তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বরে সেও ছুটে বেরিয়ে এল, সেও আড়ষ্ট হয়ে গেল প্রথমটা।

এভাবে প্রশ্ন করলে তরুর পক্ষে কিছুতেই সব কথা খুলে বলা সহজ হবে না তা বুঝে কনক একেবারে ওর পাশে বসে ওর হাতদুটি কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'ঠাকুর-জামাইয়ের সঙ্গে রাগারাগি করে চলে এসেছ বুঝি?'

মাথা হেঁট ক'রে আরও অস্পষ্ট অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিল তরু, 'সে জানে না। আমি যখন এসেছি তখনও ঘুমোচ্ছে।'

যাক। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল এতক্ষণে শ্যামার। তবু ভাল, জামাইয়ের কিছু হয় নি। চরম বিপদ অন্তত নয়।

হেমই এবার তাড়া দিয়ে উঠল, 'সে জানে না, তবু তুই এমনভাবে এলি কেন? কি হয়েছে কি?'

'আমি—আমি আর ওখানে ঘর করতে পারব না। আমি তা হ'লে মরে যাব। ও বুড়ি আমাকে মেরে ফেলবে!'

কোনমতে প্রাণপণ চেষ্টায় কথা বলে ডুকরে কেঁদে উঠল তরু।

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল সকলে, বেশ কিছুক্ষণ। ওকে সান্ত্বনা দেবার কি আশ্বাস দেবার চেষ্টামাত্র কেউ করতে পারল না। এমন কি কনকও না। কিছুক্ষণের জন্য যেন অসাড় নিস্পন্দ হয়ে গেল সকলের চেতনা। ঠিক কি শুনছে, ঠিকমতো শুনছে কিনা, এ থেকে কতটা খারাপ অনুমান করতে হবে—তা বোঝবার মতো শক্তি রইলো না কারুর।

সম্বিৎ শ্যামারই ফিরে এল সকলের আগে। কিন্তু তিনিও কথা কইতে পারলেন না, শুধু পাগলের মতো সজোরে নিজের ললাটে করাঘাত করতে লাগলেন। যেন এই কপালটা সত্যিই ভেঙে ফেলতে পারলে তিনি বাঁচেন, অব্যাহতি পান।

সেই কোন্ সুদূরে অতীতে শুরু হয়েছে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত, আজও কি শেষ হ'ল না? আজও কি ক্লান্ত হলেন না সে অদৃশ্য দণ্ডদাতা? কী এত পাপ করেছিলেন আগের জন্ম-জন্মান্তর ধরে নিভৃতে বসে—কেউ কি বাধা দেবার ছিল না, কেউ ছিল না নিষেধ করবার?

তাঁর সঙ্গে তাঁর মেয়েরাও?

তারাও কি বসে বসে তাঁর সঙ্গে শুধু পাপই ক'রে এসেছে আগের জন্ম-ভোর?

না, এ তাঁরই পাপ। তাঁরই অন্যায় হয়েছে ওদের পৃথিবীতে আনা। তাঁরই বোঝা উচিত ছিল যে তাঁর রক্ত যেখানে এক ফোঁটাও আছে, কেউ সুখী হবে না। কেউ না।

একমাত্র অন্যথা হচ্ছে তাঁর বড় মেয়ে—অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত। তাও তার অদৃষ্টে কী আছে এর পরে, তা কে বলতে পারে?

বড় মেয়েরও বিয়েটা দিয়েছিলেন শ্যামা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে; বিয়ে দেবার সময় আর তার পরেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত নানা উদ্বেগ আর আশঙ্কায় কণ্টকিত ছিলেন। জীবনে এমনিতেই বিবাহ সম্বন্ধে যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁর আর তাঁর যমজ বোন উমার বিবাহ নিয়ে—তাতে বিবাহ সম্বন্ধে আতঙ্কের ভাব থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু মহাশ্বেতার বিয়েটাই সবচেয়ে ভাল দাঁড়িয়ে গেছে। জামাইয়ের তো কথাই নেই, অমন জামাই লোকে তপস্যা করে পায় না—শাশুড়ী জা শ্বশুরবাড়ির অপরাপর

লোকজন সম্বন্ধেও শ্যামার অন্তত কোন নালিশ নেই। এমন নির্বিবাদী ও নির্ঝঞ্ঝাট কুটুম্ব-বাড়ি লোকে কদাচিৎ পায়। মহাশ্বেতা যা-ই বলুক, শ্যামা তাঁর জীবনে অনেক দেখলেন, তিনি জানেন বহু ভাগ্যেই এমন শ্বশুরবাড়ি পেয়েছে তাঁর বড় মেয়ে।

মেজ মেয়ে ঐন্দ্রিলার বিয়ে দিয়েই সবচেয়ে সুখী আর নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন শ্যামা। মাধব ঘোষাল দৈবাৎ মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে যেচে সেধে নিয়ে গিয়েছিলেন পুত্রবধূ ক'রে। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন কোন রকম অযত্নও হ'তে দেন নি সে বধূর। আর জামাই হরিনাথ তো ছিল স্ত্রী-অন্ত প্রাণ। ওদের স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা পাড়া ঘরে একটা গল্পের বস্তু হয়ে উঠেছিল। এমন মিল কখনও-সখনও চোখে পড়ে। কদাচ কখনও শোনা যায়। অন্তত শ্যামা তাঁর এই দীর্ঘ জীবনে কখনও শোনেন নি এটা ঠিক।

কিন্তু মেয়ের কপাল। বোধ হয় ওর জন্মলগ্নে সবগুলি কুগ্রহ একসঙ্গে বাসা বেঁধেছিল নইলে এমন হবে কেন? দুদিনের জ্বরে বলতে গেলে ধড়ফড়িয়ে মারা গেল শ্বশুর, স্বামীর ধরল রাজযক্ষ্মা। যেন গ্রামসুদ্ধ দুর্ভাগিনীর ঈর্ষার নিঃশ্বাসেই স্বামী-সৌভাগ্য জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। সদ্যোজাত শিশু সন্তান নিয়ে এসে উঠল তাঁর বাড়ি—শুধু বিধবা হয়েই নয়, একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে। জামাইয়ের ঐ সাংঘাতিক অসুখের সময় দিশেহারা মেয়ে চিকিৎসার খরচের জন্য যথাসর্বস্ব লিখিয়ে দিয়েছে ওদের নাম—অর্থাৎ দেওরদের নামে। চিরদিনের গর্বিতা মেয়ে তাঁর, রূপসী, স্বামী-সৌভাগ্যবতী—আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী। ওর যে কী জ্বালা তা শ্যামা বোঝেন, অহর্নিশ সেই জ্বালায় নিজে জ্বলছে আর ওর চারিদিকে যারা আছে তাদের জ্বালাচ্ছে। সে জ্বালায় শ্যামাও দগ্ধ হচ্ছেন। কিন্তু উপায়ই বা কি।

তবু ছোট মেয়ে তরুর বিয়ে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন শ্যামা। অবশ্য সতীনের ওপর বিয়ে দেওয়া—কিন্তু তরুর বুড়ি দিদিশাশুড়ী অনেক জমি জায়গা দিয়ে সে বৌয়ের কাছ থেকে না দাবিনামা লিখিয়ে রেজেস্ট্রি করিয়ে একেবারে পাকা ক'রে নিয়েছেন। সে দলিল শ্যামা দেখেছেন, অক্ষয় সরকার উকীল দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছেন সুতরাং সেদিক দিয়ে কোন ভয় নেই। বিষয়-সম্পত্তি যথেষ্ট, ছেলেও চাকরি করে। যাকে বলে আল সোল নেই, তাই। এক বুড়ি ঠাকুমা, সে যে কোন দিন চোখ বুজবে। তারপর একেবারেই নিষ্কণ্টক। মেয়ে-জামাইয়ের ভাবও হয়েছে বেশ, তাও তিনি টের পেয়েছেন ওদের কথা-বার্তায়, ভাবে-ভঙ্গিতে।

কিন্তু সে সব আশাভরসা ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে এ কী হ'ল?

অকস্মাৎ কী এমন ঘটল যে তরুকে পালিয়ে চলে আসতে হ'ল?

শ্যামা ওকে কোন প্রশ্নও করতে পারলেন না। ললাটে আঘাত ক'রে ক'রে অবসন্ন হয়ে দেওয়ালে ঠেস দিলেন।

প্রশ্ন করল কনকই, আস্তে আস্তে সহানুভূতির সঙ্গে প্রশ্ন ক'রে ক'রে—কিছুটা বা ওকেই বলবার অবকাশ দিয়ে আদ্যোপান্ত ইতিহাসটা বার ক'রে নিল।

বুড়ি যে পরিমাণ ভালবাসে হারাণকে, সেই পরিমাণই ওর সম্বন্ধে তার আশঙ্কা। বৌ এসে পর ক'রে নেবে—বাংলাদেশের চিরকালীন আশঙ্কা শাশুড়ীদের, কিন্তু এ আরও উগ্র, আরও ভয়ঙ্কর। যদিও এ দিদিশাশুড়ী—তবু সাধারণ শাশুড়ীর চেয়েও যেন বেশী। কারণ সব হারিয়ে ওর এই হারান। হারানও যদি পর হয়ে যায় তো তাকে দেখবে কে? এই কারণে এ দিকটা সম্বন্ধে সে সদা-সতর্ক, সদা-জাগ্রত।

শুধু হারানকে হারাবারই ভয় নয়—আরও একটা অদ্ভুত ভয় ইদানীং পেয়ে বসেছে বুড়িকে। বিষয়-সম্পত্তি হারানের পৈতৃক নয়, বুড়ির নিজস্ব। বুড়ি হারানের

বাবার জেঠাইমা। সম্পত্তি সেই পিতামহের স্ব-ক্রীত। একটা উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা পরের মেয়ে তাঁর এই সমস্ত সম্পত্তিতে মালিক হয়ে বসবে—হয়ত বা উড়িয়ে দেবে নষ্ট করবে—এই ভেবে ভেবেই বুড়ি প্রায় পাগল হ'তে বসেছে। সম্পত্তি এমন কিছু নয়, ন'বিঘে বাগান ভদ্রাসন এবং বারো বিঘে আন্দাজ ধান-জমি। আরও কিছু ছিল, সে বৌকে দিয়ে হাতছাড়া হয়েছে। এছাড়া আছে বুড়ির কিছু গহনা এবং সম্ভবতঃ কিছু নগদ টাকা। তবে সেটা আছে কি না এবং থাকলেও ঠিক কত তা হারানও জানে না। পোস্ট অফিসে শ'পাঁচেক টাকা পড়ে আছে— কিন্তু সে টাকা বুড়িকে কখনও তুলতে হয় না, অথচ কিছু কিছু খরচ সে নিজেও করে—তাইতেই হারানের ধারণা যে বেশ কিছু তার হাতে আছে।

তবু এই সম্পত্তির ভাবনা ভাবতে ভাবতেই তার এমন মাথা খারাপ হয়ে গেছে যে শেষ পর্যন্ত হাওড়ার কাছ থেকে কোন্ এক তান্ত্রিককে আনিয়েছিল 'যক' দেবে বলে। সে সম্পত্তির পরিমাণ এবং বিবরণ শুনে হেসে চলে গেছে, তিরস্কারও ক'রে গেছে খুব—তার সময় নষ্ট করবার জন্যে, বলে গেছে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা খরচ না করলে এ ধরণের তান্ত্রিক ক্রিয়া হয় না। একটি ব্রাহ্মণ বালক চাই, তাকে খুনের দায়—এ কি সোজা কথা নাকি?

তার পর থেকেই বুড়ি নাকি আরও ক্ষেপে গেছে।

অবশ্য তার আগেও, সে-বৌয়ের ওপরও অত্যাচার নাকি কম করে নি। সে বাপ-মায়ের আদুরে মেয়ে, সহ্য করতে না পেরেই নাকি বাপের বাড়ি চিঠি লিখে পালিয়ে যায়। এসব কথা পুকুরে স্নান করতে বা বাসন মাজতে গিয়ে পাড়ার অন্য মেয়েদের কাছে শুনেছে তরু। অনেকেই বলেছে...এক কথা। সুতরাং খানিকটা সত্য আছেই।

আর তা-ছাড়া, সে সম্বন্ধে হারানও সচেতন। এর আগে এ ধরণের ঘটনা না ঘটলে সে-ই বা এত সতর্ক হবে কেন? সে যতদিন সতর্ক ছিল ততদিন এতটা বাড়াবাড়ি তো হ'তে পারে নি।

কী সতর্কতা? কনকের প্রশ্নের উত্তরে লজ্জায় রাঙা হয়ে মাথা নামিয়ে সেকথাও বললে তরু। সেও যেমন বিচিত্র, তেমনি হাস্যকর।

বিয়ের পর প্রথম হারান বৌ সম্বন্ধে খুব উদাসীন নিরাসক্ত ভাব দেখিয়েছিল। তরুকে ঠাকুমার কাছে শোওয়াবার প্রস্তাব করেছিল। অন্যথায় তিনজনই একসঙ্গে শোবে, এমন প্রস্তাবও করেছিল। বুড়ি ভারী খুশী, সে-ই তখন জোর ক'রে বৌকে হারানের ঘরে পাঠিয়ে দিত প্রতি রাত্রে। তবু তখনও হারাণ বৌয়ের সঙ্গে বিশেষ কথা-বার্তা কইত না। তরু প্রথমটা ওর ব্যবহারে একটু ভয় পেয়েই গিয়েছিল। ছোট মাসীর কাহিনী সে মা'র মুখে, মেজদির মুখে অনেকবার শুনেছে। বিয়ে করেছিল মেসোমশাই নাকি শুধু তার মা'র সংসারে খাটবার জন্যে, নিজে একরাত্রের জন্যেও গ্রহণ করে নি স্ত্রীকে। সুন্দরী উমা অনাঘ্রাতা থেকেই ধীরে ধীরে বুড়ো হয়ে শুকিয়ে গেল। স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করা আর হ'ল না। অথচ এমনিতে সে মেসোমশাই নাকি খুব ভদ্র, ওদের বাবার মতো নয়!

সে যাই হোক—হারান শিগ্গিরই তার ভয় ভেঙে দিল। একদিন একটা চিঠি লিখে ওকে জানিয়ে দিলে যে এতে ভয় পাবার কিছু নেই। শুধু এখন কয়েকটা দিন ওদের প্রেম এবং প্রেমালাপটা একটু সংযত হয়ে—যতটা সম্ভব সন্তর্পণে ও নিঃশব্দে করতে হবে এই মাত্র। বুড়ির ভীমরতি হয়ে মাথাটা একটু খারাপ-মতো হয়েছে, সুতরাং সাবধান থাকাই ভাল। বুড়ি আর কদিন? এই কটা দিন তরু যেন মানিয়ে নেয়, আর কিছু মনে না করে!

তবু তখনও হারানের আচরণের পুরো অর্থটা ওর বোধগম্য হয় নি। হারানও পরিষ্কার করে বলে নি যে বুড়ির ভীমরতির সঙ্গে ওদের নিঃশব্দে ও সন্তর্পণে প্রেমালাপ করার কী সম্পর্ক। বোধ হয় লজ্জায় বেধেছিল, কেলেঙ্কারিটা পুরোপুরি নববধূকে খুলে বলতে। কিন্তু পরে তরুই আবিষ্কার করেছিল কারণটা। বুড়ি প্রত্যহ ওদের ঘরে আড়ি পাতত। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কতদূর ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হচ্ছে সেটার খবর রাখত।

সবই জানত হারান কিন্তু মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। স্বামী-স্ত্রীর অন্ত-রঙ্গতাটা সম্পূর্ণ ঢাকা সম্ভব নয়। ইদানীং ওরা একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিল। একটু চালাকিও করতে গিয়েছিল। প্রথম রাত্রে দু'একটা শুষ্ক প্রয়োজনীয় কথা বলে দুজনেই কাঠ হয়ে শুয়ে থাকত। মধ্যে মধ্যে হারান নাক ডাকাবারও চেষ্টা করত, তার-পর ঘাটে যাবার অছিলায় কেউ দেখে আসত বুড়ি জেগে আছে কি না—বুড়ি ঘুমিয়েই পড়ত ততক্ষণে—তখন নিশ্চিন্ত হয়ে দুজনে গল্প করত।

কিন্তু বুড়ি আরও চালাক। সে তরুর চোখের দিকে চেয়ে সন্দেহ করত ব্যাপারটা। তার বয়স হয়েছে ঢের। মনের খুশি যে চোখের চাহনিতে অকারণেই উপ্‌চে পড়ে এটা সে জানে। তাছাড়া রাত্রি-জাগরণের কালিও চোখের কোণে ঢাকা কঠিন। বুড়িও তাই ইদানীং প্রথম রাতটা মটকা মেরে পড়ে থেকে গভীর রাত্রে উঠে এসে আড়ি পাতত। তার পরেই অত্যাচার চরমে উঠল। এবং সর্বশেষে—শ্যামারাও খবরটা এই প্রথম জানল—তরু গর্ভবতী হয়েছে টের পেয়ে যেন পুরোপুরি পাগল হয়ে গেল। হারান ভেবে-ছিল বুড়ি বংশরক্ষা হচ্ছে ভেবে, খুশী না হোক—একটু চেপে থাকবে, কারণ তারও জল-পিণ্ডির ব্যবস্থা আর নেই। সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবারও চেষ্টা করেছিল পরোক্ষভাবে—তাতে হিতে বিপরীত হ'ল। তা'হলে সবাই তার মরণের কথাই চিন্তা করছে, 'মরণ টাঁকছে' ভেবে ক্ষেপে উঠল। আগে গায়ে হাত তুলত না, এইবার মারধোর শুরু করল। গালাগাল তো অষ্টপ্রহর। এমন অকথা কুকথা নেই যা বলে না। দিনে-রাতে সদাসর্বদা তরুর পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার করছে।

এও সয়েছিল তরু কিন্তু গত সাত-আটদিন খাওয়ায় হাত দিয়েছে বুড়ি। ভাত বেড়ে খেতে বসেছে দেখলেই হয় ভাতের থালা টান মেরে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, নয়ত পুকুরে দিয়ে আসে। হাঁড়িসুদ্ধ ভাত গোরুর ডাবায় ঢেলে দেয়। একদিন ভাতের থালা জোর ক'রে চেপে ধরেছিল—নড়াতে পারে নি— ছাই এনে পাতে ফেলে দিয়েছে। কদিনই বলতে গেলে ওর খাওয়া নেই।

'তা ঠাকুরজামাই কি এসব টের পান না?' কনক কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকার পর অতিকষ্টে প্রশ্ন করে। তার চোখেও তখন জল এসে গিয়েছে এইসব শুনতে শুনতে। আরও, নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা ক'রেই হয়ত।

'কেন পাবে না! আমি তাকে কাগজে লিখে লিখে সব জানিয়েছি। সে শুধু বলে—আর একটু। দুটো দিন ধৈর্য ধরে থাকো। এবার পুরো ভীমরতি ধরেছে, শিগগিরই মরবে বুড়ি।......আসলে সেও বুড়িকে ভয় করে। তারও ঐ বিষয়ের ভয়। এতদিন এত কষ্ট সহ্য করল, দুদিনের জন্যে যদি সবসুদ্ধু যায়—বুড়ি যদি ছন্ন-মতি হয়ে আর কাউকে লিখে দিয়ে যায়! এই ভয়েই গেল। আমি তাও বলেছি, চল আমরা চলে যাই, কোথাও একখানা ঘর ভাড়া ক'রে থাকব, তুমি যা আনবে তাইতেই চালাব। তাতে শিউরে ওঠে, বলে, বাপ্‌রে, এতটা সম্পত্তি দুটো দিনের জন্যে হাত-ছাড়া হয়ে যাবে!'

'তারপর? আজ কী হ'ল তাই বল না!' অসহিষ্ণু হেম প্রশ্ন করে।

ওদিকে মুখ ফিরিয়ে তরু বলে, 'পর পর দু'দিন খাওয়া হয় নি শুনে পরশু রাত্তিরে পকেটে ক'রে দুটো সন্দেশ এনেছিল। রাত্রে সেই সন্দেশ খেয়ে দালানে জল খেতে বেরিয়েছি, বুড়ি নিজের ঘর অন্ধকার ক'রে জানলায় বসে ছিল, সব দেখেছে। কাল ভোরবেলা যে-ই আমি ঘাটে গিয়েছি বুড়ি ঘরে ঢুকেই ওর পকেটে হাত দিয়েছে। এসব দিকে আশ্চর্য মাথা এখনও বুড়ির। সকালে বাজার করার সময় বেরিয়ে পাঁদাড়ে ফেলে দেবে বলে শালপাতার ঠোঙ্গাটা পকেটেই রেখেছিল—বুড়ি টেনে বার করল। তখন সটেপটে চেপে ধরতে ওকেও মানতে হ'ল কথাটা। তখন তো ছড়া বেঁধে গালা-গাল দিলেই—তারপর ও বেরিয়ে যেতে একটা ছুতো ক'রে বললে, আমি পুলিশে যাব, তোরা আমাকে বিষ দিয়ে মারছিস। এর মধ্যে একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেছল—সেই থেকে মধ্যে মধ্যে ধুয়ো তোলে, তোরা আমাকে বিষ খাওয়াচ্ছিস। তা আমি পুলিশে যাবার কথায় আর থাকতে পারি নি, বলেছিলুম যান না পুলিশে, কত ধানে কত চাল একবার দেখুন না। যা নির্যাতন করছেন আমায় তা পাড়াঘরের সবাই জানে, দেখবেন আপনার হাতেই তখন দড়ি পড়বে।...তাতে বলে, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোর ঐ জিভ আমি আজ টেনে বার করব। এই বলে সাঁড়াশি টকটকে ক'রে পুড়িয়ে এনেছিল জিভ টানবে বলে, আমি কোনমতে হাত এড়িয়ে ছুটে বাইরে চলে এসে-ছিলুম, কিন্তু সেই সাঁড়াশি আমার বুকে লেগে কী কান্ড হয়েছে দ্যাখো—'

বলতে বলতে আবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল তরু। তারপর দাদার দিকে পেছন ফিরে বুকের জামা সরিয়ে বৌদিকে দেখাল—এতবড় একটা ফোস্কা পড়ে আছে তখনও বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে।

দেখেছিলেন শ্যামাও, তিনি আর্তনাদ ক'রে উঠলেন আর একবার। শুধু কনকই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল, 'তারপর? তা তখনই চলে এলে না কেন?'

সে কথাও বলল তরু, কোনমতে—থেমে থেমে, কান্নার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু ক'রে।

সে সময় আর তার কোন জ্ঞান ছিল না। ভয়ে যন্ত্রণায় দিশাহারা হয়ে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে এসে পাশের দত্তদের বাড়ি আছড়ে পড়েছিল সে। দত্তগিন্নী পোড়া জায়গাটায় নারকেল তেল লাগিয়ে বাতাস ক'রে একটু সুস্থ ক'রে তুলেছিলেন। তৃষ্ণায় তখন সমস্ত ভেতরটা ওর শুকিয়ে গেছে বুঝে একঘটি বাতাসার সরবতও ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁকেই বলেছিল তরু এখানে পেঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে, কিন্তু দত্ত-গিন্নী তা শোনেন নি। ওকেও ছাড়েন নি। আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'তোমার সোয়ামী আসুক, এমন কেলেঙ্কারী শুনলে কি আর একটা বিহিত করবে না? ফট্ ক'রে অমন এক কথায় শ্বশুরঘর ছেড়ে যেতে নেই মা!'

তরুও তাই আশা করেছিল। ভেবেছিল এবার অবস্থা চরমে উঠেছে জানলে—এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলে—নিশ্চয়ই তার চৈতন্য হবে। হারান অফিস থেকে ফিরছে দেখে দত্তগিন্নীই সঙ্গে ক'রে এনে সব বলে দিয়ে গেলেন তরুকে। সে কিন্তু সব কথা শুনে মন্তব্য করল, 'তা তুমিই বা জেনেশুনে ও পাগলকে ঘাঁটাতে গেলে কেন? সত্যিই কি আর কিছু ও পুলিশে যেত!'

এই পর্যন্ত।

একটা সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করে নি হারান কিম্বা পোড়া জায়গাটাও একবার দেখতে চায় নি। বুড়ি ভাত বেড়ে খেতে ডাকলে মুখ-হাত ধুয়ে এসে খেতে বসেছে, খেয়েই গিয়ে শুয়ে পড়েছে। বুড়িকেই রাঁধতে হয়েছিল, কারণ তরু তো ছিল না—নইলে না খেয়েও তরুই রান্না করেছে কদিন, আর যতই বিষ দেবার কথা বলুক মুখে,

বুড়ি খেয়েছেও এতটি—যেমন খায়। বুড়ি কাল কী মনে ক'রে তরুর মতোও রান্না করেছিল, হয়ত সকালের অতটা বাড়াবাড়িতে নিজেই ভয় পেয়ে থাকবে—হারানের পাতেই ভাত বেড়ে দিয়ে হেঁকে বলেছিল, 'ও ডাইনীকে দয়া ক'রে খেয়ে আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে বল্ হারাণ, আমার শরীর খারাপ, বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারব না!'

তরু খেতে যায় নি, ঘরে ঢুকে মেঝেতে পড়ে ছিল, সেখান থেকেও ওঠে নি। হারান কিন্তু নির্বিকার, ওকে খেতে অনুরোধ করা কিম্বা ডেকে বিছানায় শোয়ানো, কিছুই করে নি। তরুর বিশ্বাস, একটু পরে সহজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বরং।

তাই সারারাত জেগে পড়ে থেকে মনের ঘেন্নায় শেষরাত্রে উঠে চলে এসেছে ও।...

এখন যদি এরা আশ্রয় না দেয় তো—সামনেই পুকুর আছে,—কিম্বা স্টেশনে গিয়ে রেলেও গলা দিতে পারে। মোট কথা, ওকে যদি যেতেই হয়—পিতৃকুল, শ্বশুর-কুল সকলের মুখে কালি দিয়ে সে যাবে। এই তার স্পষ্ট কথা।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ ক'রে রইল। যেন নিথর নিস্পন্দ হয়ে গেছে সবাই।

হেমের অফিসের বেলা পার হয়ে গেছে। এরপর আর স্নানাহার ক'রে গিয়ে ছটা চল্লিশের ট্রেন ধরা সম্ভব নয়। সেদিকে খেয়ালও নেই হেমের। কোলের বোন তরু—বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট আর শান্ত বলেই বোধ হয় ওর প্রতি তার স্নেহ একটু বেশী চিরদিনই।

শ্যামা যেন আরও কাঠ হয়ে গেছেন। উনুনে ভাত ফুটে গলে গেছে। আঁচ ঠেলে দেওয়া বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণই কিন্তু ভেতরের তাপে তা এখনও ফুটছে। একটু পরেই হয়ত অখাদ্য পাঁক হয়ে যাবে, এতখানি খাদ্য-বস্তু নষ্ট হবে। তবু সেদিকেও শ্যামার ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি ভাবছিলেন তাঁদের রক্তের কথা। তাঁর মা'র রক্ত যেখানে এক ফোঁটাও আছে, কেউ সুখী হবে না। মনের মধ্যে এই আঘাতের মধ্যেও বিচিত্র হাসি একটা পাচ্ছিল তাঁর। তিনি ভেবেছিলেন যে মেজমেয়ের বৈধব্য এবং তাঁর স্বামী নরেনের মৃত্যুতেই বুঝি এ প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়ে গেল। হায় রে! এতই সহজে ভাগ্যকে ফাঁকি দেবেন তিনি!

সম্বিৎ ফিরল বুঝি কনকেরই প্রথম।

সে উঠে দাঁড়িয়ে তরুর হাত ধরে টেনে বললে, 'তুমি ঘাটে চল ঠাকুরঝি, মুখ-হাত ধুয়ে কাপড়টা কেচে নাও, আমার একটা শাড়ি আছে আলনায়, ঐটেই পরো। মুখে একটু জল দাও। অমন করে বসে থেকে তো লাভ নেই!'

এইটুকু সহানুভূতির স্পর্শেই এতদিনের নিরুদ্ধ বেদনা আবার প্রবল হয়ে ওঠে তরুর। সে হু হু ক'রে কেঁদে বৌদির কাঁধে মুখ গুঁজে বলে, 'আমার কি হবে বৌদি, আমি কোথায় দাঁড়াব!'

এইবার হেমও খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়।

তার কণ্ঠস্বরও সম্ভবত খানিকটা বাষ্পার্দ্র হয়ে এসেছিল। জোর ক'রে সে কণ্ঠকে সহজ করতে গিয়ে কেমন যেন অস্বাভাবিক রকমের কঠোর শোনাল।

সে বলে উঠল, 'হবে আবার কি? আমরা তোকে দুটো ভাত দিতে পারব না? একটা বোন পুষছি, না হয় আর একটাকেও মনে করব তেমনি হয়ে এসে উঠেছে!'

শিউরে উঠল কনক।

'ও মা, ছি ছি! ও কী অলক্ষণে কথা!' অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে কনক, 'দুদিনের ব্যাপার দুদিনেই মিটে যাবে ঠাকুরঝি, তোমার ঘর-বর তুমি ঠিকই পাবে। নাও এখন ঘাটের দিকে চল দিকি!'

শিউরে ওঠেন শ্যামাও। অস্ফুট কণ্ঠে 'ষাট। ষাট!' ক'রে ওঠেন।

তেমন ক'রে আর কাউকে না এসে উঠতে হয়।

ছেলেটা যেন কি!

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ভাতের হাঁড়িতে খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে ফ্যান গালতে বসেন। যদি কিছুটাও আদায় হয়। হয়ত সবটা এখনও পাঁক হয়ে যায় নি।

কনক একরকম জোর ক'রেই তরুকে ঘাটে পাঠিয়ে দিয়ে ফিরে এসে অনুচ্চকণ্ঠে বলে, 'মা, ও'র তো অফিসে যাওয়া হ'লই না আজ, যা দেখতে পাচ্ছি—তা ও'কে একবার বলুন না নিবড়েয় যেতে!'

হেম কথাগুলো বলে উঠোন পেরিয়ে ওধারের সিঁড়িতে গিয়ে বসেছিল। সে তীক্ষ্মকণ্ঠে মন্তব্য ক'রে উঠল, 'কিসের জন্যে ঐ ছোটলোকদের কাছে যাব শুনি!... এই ব্যবহারের পর পায়ে ধরে বোনকে ফিরিয়ে দিতে যাব? ওরা তো আরও পেয়ে বসবে। এবার তো সোজাসুজি খুন ক'রে ফেলবে তাহলে। না, সে আমি পারব না। ও থাক এখানেই—নিজেরা যদি খেতে পাই তো বোন ভাগ্নেও একমুঠো খেতে পাবে।'

অগত্যা চুপ ক'রে যায় কনক। কিন্তু কথাটা তার আদৌ ভাল লাগে না। অথচ তার আর কীই বা বলার আছে, স্বামীর ওপরই বা তার কতটুকু অধিকার।

সে শুধু নীরব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায় শাশুড়ীর মুখের দিকে।

কিন্তু শ্যামা কিছুতেই বলতে পারে না। কিছুই ভেবে পান না যেন। বহু আঘাত সহ্য করেছেন জীবনে কিন্তু তখন নিশ্চিন্ত ভাবটা ছিল না, আঘাতের জন্যেই যেন সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকতেন তিনি। এখন, এই বছর-কতকের নিশ্চিন্ততার পর, আকস্মিক এই আঘাতে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন তিনিও। তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ম বুদ্ধিও যেন আজ আর কোন কাজ করছে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

শাশুড়ী যতই চুপ ক'রে থাকুন এবং হেম যতই ভাত-কাপড়ের ভরসা দিক, কনকের বুকের মধ্যে যেন ঢিপ্ ঢিপ্ করতে থাকে তরুর অবস্থাটা চিন্তা ক'রে। কিছুতেই সে স্বস্তি পায় না; তরুর দিকে চোখ পড়লেই চোখে জল এসে যায় তার।

হয়ত এতটা উদ্বেগ অকারণ, কিছুই হয়ত হবে না শেষ পর্যন্ত, হয়ত ওবেলাই মিটে যাবে সব—তবু একটা আকারহীন অজ্ঞাত আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে থাকে সে। মনে হয়, এ ঠিক হচ্ছে না; তাদের তরফ থেকে কিছু একটা করা দরকার, যেমন ক'রেই হোক এটা মিটিয়ে নেওয়া দরকার। যদি—যদি শেষ পর্যন্ত হারানেরও বিষ-নজরে পড়ে যায় তরু এই ঘটনা উপলক্ষ ক'রে?

দোষ তরুর নেই সত্যি কথা—কিন্তু পুরুষের মন কি সূক্ষ্ম ন্যায়বিচার ধরে চলে!

তা যদি চলত তবে কনকেরই বা এ অবস্থা হবে কেন?

কনকের এতটা উদ্বেগের কারণ যে ঐখানেই।

তার নিজের কথা ভেবেই তরুর জন্যে এত দুশ্চিন্তা।

আহা যে পেয়েছে, সে সুখী হয়েছে—সে আর না হারায়, সে সুখ থেকে না বঞ্চিত হয়।

পোড়া ঘায়ের ক্ষতটা তরুর বুকের ওপর—আর কনকের বুকের মধ্যে, আজও সমান দগদগ করছে।

অথচ তার এ কথা কাউকে বলবার নয়—জানাবার নয়। কাউকে খুলে বলতে পারলেও হয়ত একটু শান্তি পেত সে। কিন্তু কী বলবে? তার এ অদ্ভুত অবস্থা—ত্রিশঙ্কুর মতো স্বামীর হৃদয়াকাশে ঝুলে থাকা কে বুঝবে? হয়ত বলবে বাড়াবাড়ি, আদিখ্যেতা। সহানুভূতির পরিবর্তে উপহাসই করবে তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারই দোষ দেবে—বলবে তারই অক্ষমতা, স্বামীর মন সে দখল করতে পারে নি। মেয়েমানুষের পক্ষে চরম অপমানের কথা এটা। আর সেই কারণেই সে কাউকে বলে না, নিজের বাবা-মার কাছেও না। তাঁরা জানেন—বোধহয় সবাই জানে, কনক সুখী, স্বামী-সৌভাগ্যবতী।

আর বাস্তবিকই—সে যে কী—সৌভাগ্যবতী না দুর্ভাগ্যবতী—তা সে যে নিজেই বুঝতে পারে না এক এক সময়। কারণ ঠিক স্বামী-পরিত্যক্তা বলতে যা বোঝায়—এদেশে মেয়েরা যাকে বলে 'বর নেয় না'—সে অবস্থাও তো তার নয়। স্বামীর ঘরে থাকে স্বামীর পাশে শোয়, স্বামী তাঁর সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সুবিধা দাবী করেন, হাতে হাতে পান-জল কাপড়-জামা যুগিয়ে দিতে হয়— প্রয়োজন মতো কথাও বলেন সহজেই—রাত্রে শোবার পর কনক পা টিপে দেয়. সে সেবাটা তিনি অত্যন্ত আরামের সংগেই উপভোগ করেন।

কোন অসদ্ব্যবহারও করে না হেম। এমনিতেই তার মেজাজটা ইদানীং একটু রুক্ষ হয়েছে—সেটা মা বোন সকলের সঙ্গে ব্যবহারেই সমান প্রকাশ পায়—হয়ত কনকের বেলাও তার ব্যতিক্রম ঘটে না। তেমনি, অতিরিক্ত রূঢ়তা কিছু প্রকাশ পেয়েছে তার প্রতি, এমন নালিশও কনক করতে পারবে না। এমন কি, বহুদিনের ব্যবধানে মধ্যে মধ্যে তাদের দৈহিক মিলনও ঘটে—তবু কনক জানে যে হেম তাকে আজও পর্যন্ত ঠিক স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারে নি। প্রয়োজনের আসবাব এই পর্যন্ত, তার প্রতি সপ্রেম তো দূরের কথা—সকাম কোন আসক্তিও বোধ করে না। আর তা জানে বলেই ঐ দৈহিক মিলনের দিনগুলো তার পক্ষে আরও বেদনাদায়ক আরও অপমানকর হয়ে ওঠে। কে জানে কেন, তার কেবলই মনে হয় হেম তাকে মূক পশুর মতো মনে করে, আর সেই ভাবেই আচরণ করে। সে দিনগুলোর অপমান ভুলতে তাই কনকের বহুদিন সময় লাগে। অথচ তার দোষ কি—সে কিছুতেই বুঝতে পারে না।

মোটামুটি তার চেহারা খারাপ নয়—লোকে বলে ভালই, অন্তত তাই সে শুনে এসেছে চিরকাল। বয়স বরং হেমের তুলনায়, মানান-সই যা, তার চেয়ে অনেকটাই কম। তার বিয়ের সময় এ নিয়ে আত্মীয়মহলে অনেক কথা উঠেছিল। কিন্তু অত বিচার করা সম্ভব ছিল না তার বাবার, অনেকগুলি বোনের একটি সে। তার দিদির বিয়েতেই তার বাবা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন, এই যা পাত্র পেয়েছেন তিনি ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছিলেন। তা হোক, কনকের অন্তত সেজন্য কোন নালিশ ছিল না। বয়স যাই হোক—সে বয়সের ছাপ হেমের মুখে আজও পড়ে নি। যথেষ্ট রূপবান সে, বিয়ের পরের দিন দিনের আলোয় বরকে দেখে কনকের মন তৃপ্তিতেই ভরে গিয়েছিল।

কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই তার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। বর রান্নাঘরে শুতে চেয়েছিল—সম্ভবত ফুলশয্যা সম্বন্ধে কোন মোহ বা ভুল ধারণা কনকের না হয় সেই জন্যেই। সেদিনটা মা বোন বকাবকি ক'রে ঠেকালেও পরের দিন থেকে আজও সে রান্নাঘরেই শুচ্ছে। স্ত্রীর সঙ্গে সে কথাও বলে নি দীর্ঘকাল, খুব প্রয়োজন ছাড়া, কোন প্রণয়-

সম্ভাষণ তো দূরের কথা। ওরা বাপের বাড়িতে শিখিয়ে দিয়েছিল স্বামীর পা টিপতে হয়—সেই মতো সব লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে সে নিজে থেকেই পা টিপতে শুরু করেছিল। কোন বাধা দেয় নি হেম। কোন সেবাতেই তার অরুচি নেই—সবই তার প্রাপ্য বলে গ্রহণ করে। অথচ কনকেরও যে কিছু প্রাপ্য থাকতে পারে, তাকেও যে কিছু প্রতিদান দেওয়া উচিত, সেইটে তার মাথাতে ঢোকে না। ও শুনেছে ওর মেজ ননদের মুখে ওদের মাসশাশুড়ীর কথা, মেসোমশাই ফুলশয্যার দিন মধ্যে বালিশ রেখে শুয়েছিলেন, জীবন কখনও গ্রহণ করেন নি স্ত্রীকে। সেই মেসোমশাই নাকি বুড়ো বয়সে রক্ষিতা হারিয়ে সেবা নেবার জন্য স্ত্রীর কাছে এসে উঠেছেন। এই রকমই এদের ধারা নাকি? কনক ভাবে মধ্যে মধ্যে—আর সে সম্ভাবনার কথা মনে হ'লে শিউরে ওঠে।

অবশ্য আগের মত কঠোরতা আর নেই। এমন কি সাংসারিক পরামর্শও কোন কোন সময় নিজে থেকেই যেচে নেয় তার কাছে। এর মধ্যে একদিন কনকের শরীর খুব খারাপ হ'তে মৌড়ির হাসপাতাল থেকে ওষুধ এনে দিয়েছিল শাশুড়ীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। মেয়েদের অসুখ হ'লে ডাক্তার দেখাতে হবে কি ওষুধ খাওয়াতে হবে--এটা শ্যামার মতে বাড়াবাড়ি। বৌদের জন্যে আবার এত! একটা যাবে আর একটা হবে। 'বেঁচে থাক আমার মোহনবাঁশী, কত শত মিলবে দাসী!' ঠিক ওর সম্বন্ধে এসব কথা না বললেও বৌদের সম্বন্ধে এই ধরণের বহু মন্তব্য করতে শুনেছে কনক—সুতরাং তাঁর মনোভাব জানতে বাকি নেই।

কিন্তু এতেও তৃপ্ত নয় কনক। সে জানে যে এটা নিতান্তই মায়া, স্নেহ। পাখী পুষলেও মায়া হয়—এ তো মানুষ। সে যে দিয়েছে অনেক। এ সংসারে ঢুকে পর্যন্ত দিনরাত পরিশ্রম করছে, নীরবে প্রতিটি লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ক'রে যাচ্ছে, ওর জন্য একটুখানি অন্তত করতে বাধ্য হেম।

আসলে হয়ত তার বিধবা মেজ ননদ ঐন্দ্রিলাই বিষিয়ে দিয়ে গেছে তার মন। তা নইলে হয়ত এতটা মাথা ঘামাত না। ঐন্দ্রিলা তাকে গোপনে সব কথাই বলে গেছে। এই রেল অফিসে ঢোকবার আগে নাকি হেম থিয়েটারে চাকরি করেছিল কিছুদিন। সেইখানে নলিনী বলে এক অভিনেত্রীর সঙ্গে খুব প্রেম হয় ওর। একেবারে নাকি তাকে নিয়ে পাগল হ'তে বসেছিল। সেইটে হাতেনাতে ধরা পড়েই নাকি সে চাকরি যায়। কিন্তু তবু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যায় নি—তাও জানে ঐন্দ্রিলা। কনকের বৌ-ভাতের দিনও তাকে নিমন্ত্রণ করেছিল এবং সেও এসেছিল। 'গরদের শাড়ি পরে এসে সোনার জিনিস দিয়ে মুখ দেখে গেল—মনে নেই তোমার?' প্রশ্ন করেছিল ঐন্দ্রিলা।

খুবই মনে আছে কনকের। কারণ সে মহিলার চালচলন বেশভূষা সবই ছিল উপস্থিত সমস্ত অভ্যাগতা থেকে স্বতন্ত্র। তাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত ও বিব্রত ছিল হেম—তাও লক্ষ্য করেছে কনক, ঘাড় হেঁট ক'রে বসে থাকা সত্ত্বেও। আরও মনে আছে এই জন্যে যে, তাকে নিয়ে বড় ননদের শ্বশুরবাড়ির মধ্যে বেশ একটা চাপা গুঞ্জরণ উঠেছিল। মহাশ্বেতার মেজ জার হাসি আর মন্তব্যটা কনকের আদৌ ভাল লাগে নি। তখনই কেমন খট্‌কা লেগেছিল।

কিন্তু ঐন্দ্রিলা ঐখানেই থামে নি।

আরও কিছু বলেছিল কনককে।

ঐন্দ্রিলা অদ্ভুত, তাকে দেখলে ভয় করে কনকের, সাক্ষাৎ হুতাশনের মতো জ্বলে ও জ্বালিয়ে বেড়ায় সর্বদা। ওর সম্বন্ধেও যে তার কোন প্রীতি নেই তাও কনক জানে। আসলে কেউ সুখে আছে—এটা সুদূর কল্পনাতে অনুমান করলেও

জ্বলে ওঠে সে। সে সুখের মূলসুদ্ধ উৎপাটিত না করা পর্যন্ত যেন তার শান্তি থাকে না।

সেইজন্যেই এত কথা বলেছিল ওকে ঐন্দ্রিলা—প্রীতিবশত নয়।

স্বামী যে তাকে ভালবাসে এমন অসম্ভব দুরাশা যেন কনক কখনও না পোষণ করে। এইটেই বার বার বোঝাতে চেয়েছিল সে।

হেমের মন পড়ে আছে বহু দূরে।

উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দিকে চেয়ে চোখ ধেঁধে আছে তার। পতঙ্গের মত সেই-দিকেই শুধু লক্ষ্য—সামান্য মাটির প্রদীপ কনকের সাধ্য নেই যে সে পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে।

তার মাসতুতো দাদা গোবিন্দর দ্বিতীয়পক্ষের বৌ রানীই নাকি সেই জ্যোতিষ্ক।

ইদানীং দীর্ঘকাল ধরে তার জন্যেই নাকি ঐন্দ্রিলার দাদা পাগল। সে নাকি মহা খেলোয়াড় মেয়ে, ধরাও দেয় না ছেড়েও দেয় না, শুধু অবিরাম খেলায়। হেমও নাকি বেশী কিছু চায় না—তাকে দেখে তার কথা শুনেই সে মুগ্ধ। সেইটুকু পেলেই খুশী সে। আর সেটুকু পাবার কোন বাধাও নেই। তাই সে মোহ খুব তাড়াতাড়ি ঘুচবে হেমের, এমন অসম্ভব আশা যেন কনক না মনে ঠাঁই দেয়।

রানীদিদিকে দেখেছে কনক। মুগ্ধ হবার মতোই মেয়ে।

শুধু রূপেই নয়—রূপোসী মেয়ে কনক আরও দু-একজন দেখেছে, কিন্তু তারা যেন পুতুলের মতো, আলতো সন্তর্পণে রেখে রূপ বাঁচাতেই তারা ব্যস্ত, প্রাণহীন অহঙ্কারের পুতুল এক-একটি। কিন্তু রানীদি তেমন নয়—কারুর মতোই নয়, সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অত উচ্ছল প্রাণশক্তি আর কারুর মধ্যে দেখেছে বলে কনকের মনে পড়ে না। হাসিতে-খুশীতে কথায়-বার্তায় কাজকর্মে অনন্যা সে।

যদি সত্যিই সে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে থাকে হেমের, তার মন যদি সেখানে বাঁধা পড়ে থাকে, তাহলে কনকের বিশেষ কোন আশা নেই, তা সেও বোঝে।

তাই তার আরও হতাশা, আরও অতৃপ্তি। যেটুকু পায় তাতে মন ওঠে না—ঐন্দ্রিলার দেওয়া বিষ তার ক্রিয়া করেছে মনে, সে কেবলই দেখে স্বামী তার সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট না হোন—উদাসীন।

তাই অন্তর তার তৃষ্ণার্ত হয়েই থাকে। আর কেবলই মনে হয় বিবাহিতা মেয়ে-দের সব সুখ-সৌভাগ্যের বড় কথা হ'ল স্বামী-সোহাগ, তা থেকে যেন কোন দুর্ভা-গিনী কখনও বঞ্চিত না হয়।

যে কখনও পায় নি তার কথা তবু আলাদা, যে একবার পেয়েছে সে তা হারিয়ে বাঁচে কি ক'রে।

ঐন্দ্রিলা ওর মহা সর্বনাশ করেছে জেনেও তাই কনক তাকে মার্জনা করে। বোঝে যে এই জ্বালাই তার স্বাভাবিক। তার বিশেষ দোষ নেই, বেচারী!

আজ তাই তরুর জন্যও ওর এত দুশ্চিন্তা।

বেলা বারোটা নাগাদ হারানের গলা পাওয়া গেল বাইরে।

'দাদা আছেন নাকি, দাদা?'

হেম ঘরেই ছিল, অফিস যাওয়া তার হয় নি, সে-বেলা উৎরে গিয়েছিল, আর বোধ হয় যাওয়ার মতো মানসিক অবস্থাও ছিল না। সেই সময়, কনক তরুকে ঠেলে ঘাটে পাঠাবার পর সে যা কটা কথা বলেছিল হেম, তারপরই আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল। আর ওঠেও নি, কথাও বলে নি কারুর সঙ্গে। স্নানাহারের তো প্রশ্নই ওঠে না। শ্যামা অবশ্য বসে নেই তাঁর অভ্যস্ত কাজ ঠিকই ক'রে যাচ্ছেন, কিন্তু সে

কতকটা কলের পুতুলের মতো, তাঁরও যে বেলার দিকে নজর আছে তা মনে হয় না।

ভোরের রান্না বাদে সাধারণ গৃহস্থর যা রান্না কনকই করে। আজ যতটা সম্ভব সংক্ষেপে সে-পর্ব শেষ ক'রে তরুকে ধরে এক রকম জোর ক'রেই একগাল ভাত খাইয়ে দিয়েছে—তারপর থেকে সে-ও চুপ ক'রে বসে আছে দাওয়ায়। হেমের এই অবস্থায় স্নান করতে যাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত হবে কিনা তাও বুঝতে পারছে না সে। হয়ত মা'রই একসময় খেয়াল হবে, তিনিই বলবেন। অথবা শেষ পর্যন্ত হেমই উঠবে। কনকেরও সমস্ত মনটা ভারী হয়ে আছে, এদিকে বিশেষ তাগিদ নেই। তাই চুপ ক'রে অপেক্ষাই করছে সে ঘটনার গতি স্বাভাবিক ভাবে আবর্তিত হবার।

হারানের গলা পেয়ে সে-ই ছুটে বাইরে এল, 'ঠাকুর জামাই যে, কী ভাগ্যি। আসুন আসুন—ভেতরে আসুন। অমন পরের মতন বাইরে থেকে ডাকছেন কেন?'

কনকই যে আগে বেরিয়ে আসবে তা বোধ হয় ভাবে নি হারান, সে একটু থতমত খেয়ে গেল। কোনমতে কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, 'আর বৌদি, ব্যাপার-গতিকে পরই হ'তে বসেছি।'

তারপরই আবার গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি আর এখন ভেতরে যাব না, আপনি দয়া ক'রে আপনার ছোট ননদকে বলুন যে, কেলেঙ্কারি যা হবার তা তো চরমই হ'ল, বাকী তো কিছু রইল না। এখন তার যদি সে ঘর করবার ইচ্ছে থাকে, তাহ'লে এক্ষুনি এই দণ্ডে আমার সঙ্গে যেতে হবে। নইলে সে-মুখো যেন আর কখনও না হয়।'

'ছি ছি! কী সব বলছেন ঠাকুরজামাই। বেশ তো, তাই না হয় হ'ল—তা একটু ভেতরে আসতে দোষ কি। জামাই মানুষ, বাইরে দাঁড়িয়ে এমন করে ভরদুপুর-বেলা— । চলুন চলুন। যা বলবার আপনিই বলুন না তাকে, আমরা কেন আর নিমিত্তের ভোগী হই।'

'না না, ওসব আদর-আপ্যায়ন এখন থাক। ওসব আমার এখন ভাল লাগছে না। আপিস কামাই হ'ল মিছিমিছি— । আবার এই ঠেকো-রোদ্দুরে এতটা পথ যেতে হবে— ।'

'তাই তো বলছিলুম, নেয়ে খেয়ে বেলা পড়লেই না হয় যাবেন। আপিস তো গেলই, শুধু শুধু এখনই ছুটে লাভ কি। আসুন আসুন, একটা কথা রাখুন, আমি আপনার গুরুজন হই—তায় কুটুম, আমার কথা রাখতে হয়।'

বোধ হয় চক্ষুলজ্জা এড়াবার জন্যেই, একেবারে ওর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল হারান। তারপর একটু চেষ্টাকৃত কর্কশ কণ্ঠেই বলল, 'মাপ করবেন বৌদি, যদি ছোট হয়ে বড়কথা বলে ফেলি। কুটুম কিসের, বোয়ের সম্পর্কেই তো। এ কুটুম্বিতেয় আমার আর রুচি নেই। আপনি দয়া ক'রে ওকে গিয়ে বলুন—আমি ঠিক ঘড়িধরা আর পাঁচ মিনিট এখানে দাঁড়িয়ে থাকব। এর মধ্যে যদি আসতে পারে—আর সেখানে থাকতে চায় তো আসবে, নইলে এই শেষ!'

ওর ভাবভঙ্গি দেখে এই উদ্বেগের মধ্যেই হাসি পেয়ে গেল কনকের। যেন যাত্রার দলের সেনাপতি। মনে পড়ল হারানের থিয়েটার করার খুব শখ, পাড়ার ক্লাবে খুব নাকি নামও ওর।

হাসি পেল বলেই বোধ হয় অপমানটা গায়ে লাগল না। সে আরও কি বলতে যাচ্ছিল, হয়ত হাতটাই ধরত শেষ পর্যন্ত, কিন্তু তার আগেই হেম বেরিয়ে এল। একটা দু-সুতির থান-ছেঁড়া জড়িয়ে শোয় সে রাত্রে (অফিস থেকে নিয়ে আসা), সেই অবস্থাতেই এসে দাঁড়াল ভগ্নীপতির সামনে।

'পাঁচ মিনিটও তোমার থাকবার দরকার নেই, তুমি এখনই পথ দেখতে পার। কী করতে যাবে আমার বোন সেখানে আবার শুনি—খুন হ'তে? শেষ করেই তো এনেছিলে দুজনে মিলে, এখনও যেটুকু প্রাণ ধুকধুক করছে কণ্ঠার কাছে, সেটুকুও না নিঃশেষ করতে পারলে বুঝি তোমাদের দিদি-নাতির মনস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে না? রাস্কেল কম্‌নেকার! আবার মেজাজ দেখানো হচ্ছে। তোমাদের পুলিশে দিতে পারি জানো? তোমাকে আর তোমার ঐ ডাইনী ঠাকুমাকে! আর তাই দেওয়াই উচিত। নইলে আরও কার কি সর্বনাশ করবে তার ঠিক কি!...তুমিও যেমন, ঐ রাস্কেলকে আবার মিস্টি কথায় ঘরে ডাকছ!'

হারান হেমের উগ্রমূর্তিতে কেমন যেন একটু নরম হয়ে এসেছিল গোড়ার দিক-টায়, কিন্তু দু-দুবার 'রাস্কেল' শুনে তার মুখও অগ্নিবর্ণ ধারণ করল। সে বলল, 'বেশ তো—তাই দিন না, দেখি কত মুরোদ! থানাপুলিশ আমরাও করতে জানি। সে কোমরের জোর আমাদের আছে।...যা ঢ্যাঁটা আপনার বোন! বাড়িতে ঠাকুমা দিদিমা থাকলে অমন একটু-আধটু শাসন করেই। তার জন্যে কোন্ ভদ্দরলোকের মেয়ে ভাতের ওপর ঠ্যাকার ক'রে না খেয়ে পড়ে থেকে এমন হুট্ ক'রে একা একা চলে আসে তাই শুনি! এ তো কুলত্যাগ করা।..আর কেউ হ'লে ঘরে নেবার নাম করত না। পাড়াঘরে শুনলে বলবে কি? আর শুনতেই কী বাকী আছে! কেলেঙ্কারে যে মুখ দেখাতে পারব না আমরা।—তবু তো ঠাক্‌মার অনেক সহ্য—বললেন, যা হবার হয়ে গেছে, এবারের মতো মাপ কর, ওকে নিয়ে আয়। ঠাক্‌মা এখনও এ বাড়িকে চেনেনি তো!...বেশ, থাক না আপনার বোন এখানে। চিরদিনই পুষুন। হয়ত কাজেও লাগাতে পারবেন। কিন্তু মনে থাকে যেন, সে দরজা চিরদিনের জন্যে বন্ধ হ'ল। এই শ্বশুরবাড়িতে লাথি মেরে আমি চলে যাচ্ছি!'

সে হন হন ক'রে বেরিয়ে গেল।

হেম প্রলয়ংকর মূর্তি ধরে পিছু পিছু ছুটে যাচ্ছিল। বোধ করি গিয়ে গলা টিপেই ধরত। কনক সব লাজলজ্জা ভুলে পেছন থেকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল, 'করছ কি! হাজার হোক ও জামাই। একদিন হাঁটু ধরে ওর হাতে বোনকে তুলে দিয়েছ। ও শত অপমান করলেও আমাদের সয়ে যেতে হয়। বোনের কথাটাও ভাবো, ওর যে সারাজীবন এখনও সামনে পড়ে।'

অগত্যা হেম নিরস্ত হ'ল। ততক্ষণে হারানও ওদের বাগান পেরিয়ে একেবারে বাইরে রাস্তাতে গিয়ে পড়েছে—ছুটে যাওয়াও আর সম্ভব নয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে ততক্ষণে অশ্রুমুখী তরু বেরিয়ে এসেছে।

'আমি যাই বৌদি, আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে। যদি আর দেখা না হয়, দোষ-ঘাট যা করেছি, মাপ ক'রো—'

কিন্তু সে আর এগোবার আগেই হেম তার একখানা হাত চেপে ধরল, 'খবর-দার! এক পা বাড়ালে কেটে দু টুকরো ক'রে ঐ পগারে ফেলে দেব। তারপর আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে।...কতবড় ছোটলোক! শ্বশুরবাড়িতে লাথি মেরে চলে গেল, আর তুই এ বাড়ির মেয়ে হয়ে সেখানে যাবি শেষে ঘর করতে!...আবার বলে কিনা —কাজেও লাগাতে পারেন! আমি ওদের মতো বোনকে দিয়ে রোজগার করাই কিনা! —হাত্তোর ছোটলোকের ঝাড়!...থাক তুই মনে করব তুইও খেঁদির মতো বিধবা হয়ে এসেছিস!'

॥ ২ ॥

এসব ঘটনা যখন ঘটে তখন ঐন্দ্রিলা এখানে ছিল না। এমন প্রায়ই থাকে না সে আজকাল। বিধবা হবার পর সর্বস্বান্ত হয়ে যখন চলে আসে তখন আর কোনদিন শ্বশুরবাড়ি সে যাবে না—এই প্রতিজ্ঞা ক'রেই এসেছিল। আর যাবার কথাও নয়, কারণ তার শাশুড়ী সে সময় যে চরম দুর্ব্যবহার করেছিলেন তা ক্ষমার অযোগ্য। অবশ্য তাঁর তরফ থেকে সে দুর্ব্যবহারের একটা কৈফিয়ৎ ছিল। তাঁর বিশ্বাস তাঁর স্বামী এবং পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্য ঐন্দ্রিলাই দায়ী। ওরই বিষনিঃশ্বাসে তাঁর সোনার সংসার শুকিয়ে গেল। এ বিশ্বাস তিনি চেপে রাখারও চেষ্টা করেন নি। হেমকেও সেকথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রতিজ্ঞা যা-ই করুক, কিছুদিন এখানে থাকার পর এখানটাও অসহ্য হয়ে উঠল যখন—তখন চরম একটা রাগারাগি ক'রে সেই শ্বশুরবাড়িতেই আবার গিয়ে উঠল ঐন্দ্রিলা। ভাগ্যক্রমে তাদেরও সেটা খুব দুঃসময় চলছে। ওর শাশুড়ী শয্যাগত, জা পোয়াতি, ননদের অসুখ—কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই। সুতরাং তারাও বেঁচে গেল ওকে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়ে। সাদর অভ্যর্থনা ও সস্নেহ আচরণের কোন অভাব ঘটল না, এমন কি ওর শাশুড়ীর মুখ থেকেও অভাবনীয় মিষ্টবাক্য বেরোতে লাগল।

কিন্তু যে মেয়ে বাপের বাড়িতে বনিয়ে চলতে পারে নি সে শ্বশুরবাড়িতে বনিয়ে চলবে—এটা সম্ভব নয়। একদা সেখানেও অশান্তি চরমে উঠল। তাছাড়া তাদেরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে তখন, তাদের মনের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে। অগত্যা আবারও এখানে এসে উঠতে হ'ল। সে সময় উপলক্ষ্যও জুটে গিয়েছিল একটা—ফিরে আসাটা খুব বেমানান হয় নি।

তারপর থেকেই এই চলেছে। যখন আসে তখন ভালমানুষ—তার পরও দু-তিন মাস বেশ থাকে। মেজাজ ভাল থাকলে রান্নাবান্নাও করে, তাও না থাকলে কাপড় জামা বিছানার চাদর যেখানে যা আছে, একরাশ ক্ষার ফুটিয়ে দমাদম কাচতে বসে। কিম্বা বাগানের তদ্বির ক'রে বেড়ায়। মুখের উগ্রতা তখনও প্রকাশ পায় তবে সেটা মারাত্মক নয়। কিন্তু কোনমতে মাস তিনেক কাটলেই আবার অসহ্য হয়ে ওঠে, ওরও —এদেরও। আবার একদিন কোন একটা তুচ্ছ ও হাস্যকর রকমের উপলক্ষ ধরে প্রচণ্ড কলহ সৃষ্টি করে—এবং সে কলহ চরমে উঠলে—চরমেই ওঠে—আবারও মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে যায়।

এখান থেকে শ্বশুরবাড়িতেই যায় সে সাধারণত। সোজা গিয়ে উঠলে তারাও ঠিক বাধা দিতে পারে না। এক সময় ওকে বড়ই প্রয়োজন লেগেছিল, আবারও হয়ত লাগতে পারে ভেবে—অথবা চক্ষুলজ্জায়, তারাও আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। সম্পত্তিতে অধিকার থাক বা না থাক, বাড়ির বৌ এবং নাতনী—দুচার দিনের জন্যেও আশ্রয় না দিলে পাড়াঘরে মুখ দেখানো কঠিন হয়ে উঠবে।

কিন্তু সেখানেও সেই মাস দুই তিন, বড় জোর। তারপরই আবার একটা বড় রকমের ঝগড়া—শাপশাপান্ত গালিগালাজ—কাঁদতে কাঁদতে মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে আসা। সেই পুরাতন নাটকের পুনরভিনয়। এই-ই চলছে দীর্ঘকাল।

ঈষৎ পরিবর্তন হয় মধ্যে মধ্যে অবশ্য। যখন কোন এক আকস্মিক কারণে অল্প-

কালের মধ্যেই কোথাও প্রবল ঝগড়া হয়ে যায়—তখন মধ্যে মধ্যে কলকাতাতে বড়-মাসিমার কাছেও ওঠে। তবে সেখানে স্থান কম, অসুবিধাও ঢের। সুতরাং খুব বিপাকে না পড়লে সেখানে যায় না।

তরু যেদিন আসে সেদিন ঐন্দ্রিলা শ্বশুরবাড়িতেই ছিল। সংবাদটা পেতে তার একদিনের বেশী দেরি হয় নি। এ সব সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে কখনই খুব দেরি হয় না, এ ক্ষেত্রে হারানদের পাড়ার লোকেরা বহুদিন পরে পরিবেশন করার মতো এমন মুখরোচক সংবাদ পেয়ে—(দু-দুবার বৌ পালানোর খবরটা মুখরোচক তো বটেই) উপযুক্ত উৎসাহের সঙ্গেই তা প্রচার করেছে। ঐন্দ্রিলাও খবর পেয়েই চলে এল এখানে। বিধবা হবার পর এই প্রথম বোধ হয়, রাগারাগি না ক'রে এল সেখান থেকে।

সেটা বিকেলবেলা, তরু বিষণ্ণভাবে বড়ঘরের সামনের সিঁড়িটাতে বসে ছিল চুপ ক'রে। ঐন্দ্রিলাকে দেখে তার মাথাটা আরও হেঁট হয়ে গেল। সম্ভবত দাদার কথাটা মনে ক'রেই। দু-দুবার ইঙ্গিত করেছে হেম। ইঙ্গিত কেন, স্পষ্টই বলেছে কথাটা। বিশ্রী তুলনা। দারুন মর্মঘাতী শব্দ। হে ঈশ্বর তেমন সর্বনাশ যেন কখনও না হয়। যা করেছে করেছে—তবু সে বেঁচে থাক, সুস্থ থাক।...কাল থেকে অন্তত হাজার বার এই প্রার্থনা করেছে সে মনে মনে। মনে মনেই সিদ্ধেশ্বরীতলায় মাথা খুঁড়েছে।

আজ এখন ঐন্দ্রিলাকে দেখে সেই কথাটাই মনে পড়ল আবার। শিউরে উঠল সে সঙ্গে সঙ্গেই। হে ঈশ্বর! এই হুতাশন হয়ে বেঁচে থাকা! অতি বড় শত্রুরও যেন এমন অবস্থা না হয়! ঐ বুড়িও বোধ হয় এই অবস্থারই পরিণতি। হে ভগবান! আবারও শিউরে উঠল সে।

ঐন্দ্রিলা এত জানত না। জানলেও অত সূক্ষ্ম জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাত কিনা সন্দেহ। এ অবস্থা এ দুঃখ অনুমান করার মতো— উপলব্ধি করার মতো সহজ সহানুভূতি আর তার কারুর ওপর নেই এ পৃথিবীতে। হয়ত এক নিজের মেয়ে ছাড়া। সেই জন্যই তাকে অমন দমকা বাতাসের মতো বাড়ি ঢুকতে দেখে শুধু তরু নয়, কনকও কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

ঐন্দ্রিলা কোন দিকে না তাকিয়ে একেবারে সিঁড়ির সামনে এসেই দাঁড়াল, 'ওমা, যা শুনলুম তা তাহ'লে সত্যি? আমি বলি কথার কথা...তাহ'লে সবই সত্যি বল্! তোকে নাকি ওরা দুজনে মিলে খুন করতে গিয়েছিল? গরম লোহা পুড়িয়ে নাকি সর্বাঙ্গে ছ্যাঁকা দিয়েছে?...কী হবে মা!'

তারপর একটু থেমে, যেন কতকটা বিজয়গর্বের সঙ্গে চারদিকে চোখ বুলিয়ে —'একটু বসি বাবা, এতটা হেঁটে এসে কোমর ধরে গেছে'—বলে সেই সিঁড়িতেই তরুর পাশে বসে পড়ল।

'এই শুনলুম এত ভাল•বে হয়েছে ত্যাত ভাল বে হয়েছে—কত কথাই শুনলুম! জিনিসপত্তর ঢেলে দিলে মায়ে-বেটায়, সোহাগী ছোট মেয়ের ঘটা ক'রে বিয়ে হ'ল—তা এই বিয়ের ছিরি! বলি সেই তো আমার মতোই সব ঘুচিয়ে-পুচিয়ে এসে উঠতে হ'ল বাপের বাড়ি।'

তরু আর শুনতে পারল না, ডুকরে কেঁদে উঠে ছুটে চলে গেল খিড়কীর বাগানের দিকে। কনকও প্রতিবাদ না ক'রে পারল না। যদিও সে তার এই মেজ ননদটিকে যথেষ্ট ভয় করত, তবু মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল, 'ওকি কথার ছিরি, মেজ-ঠাকুরঝি!...ষাট ষাট! ওদের ও দুদিনের মন কষাকষি—দুদিন পরেই আবার ঠিক হয়ে যাবে। ঘুচিয়ে-পুচিয়ে চলে আসতে হবে কেন!...অমন কথা কেউ বলে! একে কাল থেকে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল মেয়েটা!'

ঈষৎ যেন একটু অপ্রতিভই হয়ে পড়ে ঐন্দ্রিলা, 'না আমি অত ভেবে বলি নি। সত্যিই তো, আমার মতো জন্ম জন্ম ধরে এত পাপ তো আর কেউ করে নি—কেনই বা অমন হবে। যা হবার এই আমার কপালের ওপর দিয়েই হয়ে গেল, আর তাই যাক। আর কারুর এমন হয়েও কাজ নেই।...আর হবেই বা কী জন্যে বলো, ওর কপাল যে ঢের ঢের ভাল; আজ বলে নয়, চিরদিনই ভাল। মা ভাই ভাজ সকলেরই আদরের নিধি ও—বরেরও নয়নের মণি হয়ে থাকবে বৈকি।......তা-হ'লে এমনটা হ'লই বা কেন? তরু ঠিক এল কবে? কাল তো? তাঁ তারপর আর কোন খোঁজখবর করে নি ওরা?' খাপছাড়াভাবে হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে সে।

অর্থাৎ বিষ আর কৌতূহলের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত কৌতূহলেরই জয় হয়। কনকের এই সস্নেহ সহানুভূতি যথারীতিই ঐন্দ্রিলার সর্বাঙ্গে বিষের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল, দৃষ্টিও কঠিন হ'তে শুরু করেছিল, কিন্তু সে ঝগড়া এখন শুরু করলে ইতিহাসটা পুরোপুরি শোনা হয় না বলেই সেটা এখন মুলতুবী রাখল।

'তা করবে না. কেন? কালই তো ঠাকুরজামাই নিতে এসেছিলেন দুপুরবেলা!'

'তারপর? তা হ'লে গেল না কেন?' তীক্ষ্ন বিরস কণ্ঠে প্রশ্ন করল ঐন্দ্রিলা।

এ নাটকের এমন দ্রুত পরিসমাপ্তি নৈরাশ্যজনক বৈকি।

'তোমার দাদা মত করলেন না।'

'দাদা মত করলেন না? কেন? বোন পোষবার খুব শখ বুঝি দাদার? একটা বোন ভাগ্নীকেই পুষতে পারে না, আবার আর একটার দায় ঘাড়ে নিতে যায় কোন আক্কেলে! ভীমরতি ধরেছে নাকি দাদার?'

ঝড় যে কখন কোন্ দিক থেকে উঠবে ঐন্দ্রিলার রসনায়—তা আজও কোন হদিস পায় না কনক।

অগত্যা তাকে সংক্ষেপে কালকের ঘটনাটা খুলে বলতে হয়।

'বেশ করেছে দাদা! ঠিক করেছে! কেন কিসের জন্যে এত অপমান সয়ে সেখানে মেয়ে পাঠাব আমরা! ইস! ভাত দেবার ভাতার নয়. নাক কাটবার গোঁসাই! না খেয়ে সেখানে শুধু মার খাবার জন্যে পড়ে থাকবে. না? কেন, মেয়ে-জন্ম কি এতই ফ্যালনা একেবারে! তরি কোথায় গেল, ও যেন না কোন দুঃখু রাখে মনে। কী হয়েছে, একটা পেট তো! চলেই যাবে। দু'বোন বসে যদি ঠোঙা তৈরী করি তাহ'লেই দুটো পেট চলে যাবে আমাদের। আজকাল রোজগারের কত রাস্তা হয়েছে। বলি এই তো মা— পাতা বেচে কত পয়সা কামায়!'

আবারও সেই তুলনা।

কনক বিব্রত বোধ করে কিন্তু কেমন ক'রে ওকে সামলাবে ভেবে পায় না। তাকে বাঁচিয়ে দেন শ্যামা। তিনি এতক্ষণ বাগানে শশাগাছের মাচা ঠিক করছিলেন, তরুকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যেতে দেখে এবং ঐন্দ্রিলার গলার আওয়াজ পেয়েই ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি উঠোনে ঢুকে বললেন, 'ওর ভাবনা আর এখন থেকে তোমাকে ভাবতে হবে না মা, তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও গে!'

বোধ করি এইটেরই অপেক্ষা করছিল ঐন্দ্রিলা। সে এবার নিজমূর্তি ধারণ করল। কনকের সহানুভূতির আয়নাতে নিজের অবস্থাটা প্রত্যক্ষ ক'রে সেই থেকেই জ্বলছিল সে, এখন কৌতূহল অবসান—সে বিষ উদ্গার করতে কোন অসুবিধাও নেই।

'সে তো জানিই, আমার কপালই যে এমনি, ভাল বলতে গেলেও মন্দ হয়ে যায়। ঠিকই তো, আমার যা-খুশি হোক গে, তোমাদের সোহাগী মেয়ের পায়ে কাঁটাটিও না ফোটে। আমার সঙ্গে তুলনা করলেও বুক ফেটে যায় তোমাদের। কৈ, আমার জন্যে

তো এত প্রাণ কাঁদতে দেখি নি কখনও! আমিও তো মেয়ে। আমিও তো সইছি এই দুঃখ। আমি কিছু ফ্যালনা নই। রূপেগুণে আমার পাশে দাঁড়াতে পারে ও? চিরকাল তোমাদের এই এক-চোকোমি দেখে এলুম। ভাল হবে না—বুঝলে? তোমাদের কখনও ভাল হবে না। এত অর্শদর্শ ভাল নয়, এত একচোকো, যারা তাদের কখনও ভাল হয় না! ইত্যাদি ইত্যাদি।

কনক বেগতিক দেখে অনেক আগেই চলে গিয়েছিল বেরিয়ে--তরুর কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাগানের শেষপ্রান্তে, পুকুরেরও ওধারে—অর্থাৎ শ্রুতিসীমার বাইরে।

শ্যামার এ সবই গা-সওয়া। তিনি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তা আমরা যদি এতই মন্দ আর একচোকো—তো আমাদের কাছে আসো কেন মা—আমাদের হাড় ভাজা ভাজা করতে! আমরা তো কোনদিন এরেবেরে আনতে যাই না! আজও তো কৈ আসতে বলি নি! যেখানে সুখে থাকো, যারা ভাল—তাদের কাছে সেখানে থাকলেই তো পারো।'

'বাব্বা! এত বিষ তোমাদের মনে মনে! এত বিষ হয়েছি যে আর এক দণ্ডও সহ্য হচ্ছে না আমাকে!...না, তোমার ঐ আত্তরাসী রাঙের রাধা মেয়ের অসুবিধে হবে আমি থাকলে? আমার মুখ দেখলে আমার হাওয়া লাগলেও ওর মন্দ হবে বোধ হয়?...তাই ওর বিয়ের সময় একটা ছুতো ক'রে ঝগড়া বাধিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিলে আমায়? মনে করো আমি কিছু বুঝি না—না!...কেন, কিসের জন্যে আমি যাব? আলবৎ থাকব। যদ্দিন খুশি তদ্দিন থাকব। কৈ, তাড়াও দিকি, কেমন তাড়াতে পারো। অমন বিয়ে দিয়েছিলে কেন আমার যে দুদিন না যেতে যেতে সব ঘুচে যায়! এখন যাও বললে আমি শুনব কেন! আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও—মাসোয়ারা বন্দোবস্ত করো, বাড়ি কিনে দাও—আমি চলে যাচ্ছি। অমনি অমনি তোমাদের সুবিধে ক'রে দিতে চলে যাব—তা স্বপ্নেও ভেবো না!'

এ রকম কতক্ষণ চলত তা বলা কঠিন। কোন যুক্তি-তর্কে বোঝানোর চেষ্টাও বাতুলতা। তরুর বিয়ের সময়ে তুচ্ছ ছুতো ক'রে ঝগড়া বাধিয়ে ঐন্দ্রিলাই চলে গিয়েছিল। কিন্তু সে কথা বলেও লাভ নেই। এখন প্রথম প্রশ্ন ওকে থামানো। কিন্তু কেমন ক'রে থামাবেন তা শ্যামাও ভেবে পান না। যতটা অপ্রীতি আরও ঘটাতে পারলে ও আবার রাগ ক'রে ঝগড়া ক'রে চলে যায়, ঠিক ততটা এই সন্ধ্যাবেলা করতে ইচ্ছাও করে না। বিশেষত কাল থেকে তাঁর মনটা অত্যধিক দমে গেছে। এমন কখনও হয় নি এর আগে। হয়ত এটা বয়স বাড়বারই লক্ষণ। তা ছাড়া ভরসন্ধ্যাবেলায় কিচি কিচি ঝগড়া ঘোর অলক্ষণ, ভদ্রলোকের বাড়ির পক্ষে বেমানান তো বটেই। অনেক হয়েছেও তাঁর জীবনে, আর কোন অলক্ষণ ঘটতে দিতে সাহস হয় না তাঁর; কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে, এখন মিষ্টি কথা বলতে গেলেও ও শান্ত হবে না, তার মধ্যে কোন মতলব খুঁজে বার ক'রে আরও চেঁচাতে থাকবে। পেয়েও বসবে খানিকটা।

প্রমাদ গুনছেন শ্যামা—এমন সময় এক অঘটন ঘটল। সহসা হেম এসে পড়ল। অঘটনই বলতে হবে, কারণ কোনদিনই এত সকাল সকাল সে বাড়ি ফেরে না। সম্ভবত কালকের ঘটনার জের তার মনকেও ভারী ক'রে রেখেছিল, তাই অফিসের ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে এসেছে।

হেমকে দেখেই ঐন্দ্রিলা একেবারে চুপ ক'রে গেল। যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল। হঠাৎ যেন শামুকের খোলায় আঘাত লাগার মতো গুটিয়ে ছোট হয়ে গেল সে। আস্তে আস্তে ঘাটে গিয়ে কাপড় কেচে এসে সহজভাবেই ঘরে গিয়ে ঢুকল।

তার এ ভাবান্তরের কারণ ছিল। আসার সময় মেয়ে সীতাকে আনতে পারে নি। সে মেজকাকীর সঙ্গে তার বাপের বাড়ি গেছে, আজ বিকেলে ফেরবার কথা। ঐন্দ্রিলা বার বার বলে এসেছে যখনই ফিরুক, এমন কি রাত হয়ে গেলেও যেন তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে কথার অন্যথা করতে তাদের সাহস হবে না। পাঠাবে তারা নিশ্চয়ই। হয়ত ছোটকাকার সঙ্গেই পাঠাবে। যে কোন মুহূর্তেই তারা এসে পড়তে পারে। সে সময় যদি বড় রকমের একটা ঝগড়া—'হ্যাড়াই-ডোমাই' গোছ চলতে থাকে তো ওদের কাছে বড্ড খেলো হয়ে যাবে। তার ওপর দাদা যা মেঘের মতো মুখ ক'রে এসে ঢুকল—এখন কোন কথা বললে সে হয়ত এমন রুদ্রমূর্তি ধরবে যে তখন বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন পথ থাকবে না। আজই এসে আবার আজই ঝগড়া ক'রে বেরিয়ে যাওয়া—সেটা, এমন কি ঐন্দ্রিলার পক্ষেও, বড় লজ্জার কথা। দাদার ব্যাপার সব সময় বুঝতেও পারে না সে—এক সময় যতই ওদের রাগারাগি চেঁচামেচি হোক, নির্বিকারভাবে বসে থাকে সে পাথরের মতো, আবার এক এক সময় একটুতেই ক্ষেপে ওঠে। এই সব ভেবেই তাড়াতাড়ি চুপ করে ঐন্দ্রিলা।

হেম অত লক্ষ্য করে নি। কিছুক্ষণ পূর্বে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছিল এখানে তার কোন আভাসও পায় নি। সেক্‌রাদের বাড়ির কাছ থেকেই ঐন্দ্রিলার গলার আওয়াজ পেয়েছিল সে, কিন্তু ঝগড়া ক'রে ক'রে ওর স্বাভাবিক গলাও চড়া হয়ে গেছে, দূর থেকে পাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। সামনে ঐন্দ্রিলাকে দেখেও কিছু বলল না তাই। কখন এল কেন এল—মেয়ে কোথায়, এসব প্রশ্নও করল না। যথানিয়মে কাপড়-জামা ছেড়ে ঘাট থেকে মুখ হাত ধুয়ে এসে একেবারে শুয়ে পড়ল।

চা বা জলখাবারের পাট নেই এ বাড়িতে। হেমও কোনদিন কিছু খায় না। শনিবার সকাল ক'রে ফিরলেও কিছু খেতে চায় না। একেবারে রাত্রে ভাত খায়—এই তার চিরদিনের অভ্যাস।

সুতরাং তার আচরণে বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলেন না শ্যামা। করল কনকই।

প্রথমত অফিস থেকে সোজা বাড়ি চলে আসা, এইটেই যথেষ্ট অস্বাভাবিক। মন খারাপ বলেই আরও, বেরিয়ে কোথাও আড্ডা দিতে যাবার কথা। মন-মেজাজ খারাপ থাকলে সাধারণত সে সিমলেয় যায় বড়মাসিমার বাড়ি—সেদিনগুলো টের পায় কনক। প্রথমত ফিরতে অতিরিক্ত রাত হয়, এখানে খায় কম, ভাত নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করে—তাছাড়া মেজাজও প্রসন্ন থাকে। সুতরাং আজ ছুটির পরই বাড়ি চলে আসা প্রচণ্ড ব্যতিক্রম। তার ওপর মুখের ভাবটা সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা আলোতে শ্যামা লক্ষ্য না করলেও বাগানে ঢোকবার মুখে কনক লক্ষ্য করেছিল। অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়, হয়ত আরও কোন দুঃসংবাদ আছে কোন দিকে।

তখনই কিছু বলল না সে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দোরে চৌকাঠে জল দিয়ে তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে বসল। শাশুড়ী ঘাটে গেছেন স্নান করতে—তিনি এসে একটি ডিবে জ্বেলে ভাত চড়াবেন। পাতার জ্বালটা এবেলা আর বৌকে লাগাতে দেন না। তরকারী রাঁধাই থাকে, শুধু দুটি ভাত ফুটিয়ে দেওয়া। তাঁর বা ঐন্দ্রিলার জন্যে খাবার করার পাট নেই—চাটটি ক্ষুদভাজা বা চালভাজা তেলহাত বুলিয়ে নিয়ে খাবেন যখন হয়—অন্ধকারে বসেই।

শ্যামা কাপড় কেচে ঝাপ্‌সা আলোতেই ঘাট থেকে চাল ধুয়ে এনে রাখলেন। কাপড় ছাড়লেন অন্ধকারেই। এইবার তুলসীতলার প্রদীপ থেকে 'লম্প' বা ডিবেটো জ্বেলে এনে বসবেন উনুনের কাছে। ঐ থেকেই পাতা জ্বেলে উনুন ধরাবেন। দেশ-

লাইর কাঠির অনর্থক খরচা শ্যামা পছন্দ করেন না। একোটা দেশলাই প্রায় একপয়সা পড়ে, কটাই বা কাঠি থাকে—একমাসও যেতে চায় না একটা দেশলাই।' হ্যারিকেন একটা আছে বাড়িতে, সেটা কদাচিৎ জ্বালা হয়। বর্ষাকাল বা ঝড়জল না হ'লে সেটা তোলাই থাকে। এই 'লম্প'টিই জ্বলে, বাড়ির মধ্যে একমাত্র আলো হিসেবে। যেদিন হেমের আসতে অনেক রাত হয়, সাতটার গাড়ি চলে যাওয়ার আওয়াজ হয় জগাছার পুলের ওপর, সেদিন আবার এরই আলোতে নতুন ক'রে পাতা চাঁচতে বসেন শ্যামা কিংবা তেঁতুলের বিচি ছাড়াতে কিম্বা এই ধরনের কিছু। অর্থাৎ আলোটা বাজে খরচা না হয়। কনক নিদ্রালু চোখে বসে বসে শুধু দেখে, হয়ত একটু-আধটু গল্প করে। এ সময়টায় তার কোন কাজ থাকে না। সকাল ক'রে খাওয়ার পাট চুকলে ঘাট থেকে বাসন মেজে এনে রাখে রাত্রেই। তখনও ঐ লম্পই নিয়ে যেতে হয়। নইলে বসেই থাকা। কাজের সময় গল্প করাটা শ্যামা ভালবাসেন না, কাজ খারাপ হয়, হাত-কাটার ভয় থাকে। তাই গল্পও তেমন জমে না। খুব কষ্ট হচ্ছে দেখলে এবং শ্যামার মেজাজ ভাল থাকলে বলেন, 'তুমি শুয়ে পড়োগে বৌমা, হেম এলে আমি ডেকে দেব তখন।'

ঐন্দ্রিলা যখন এখানে থাকে তখন সীতাকে বসিয়ে ঐ আলোতেই অল্পস্বল্প পড়াবার চেষ্টা করে কনক। তার লেখাপড়ার পুঁজিও অবশ্য সামান্য—তবু যা পারে একটু পড়ায়। আসলে একটা কাজ নিয়ে থাকা। নইলে শুধু শুধু বসে থাকলেই রাজ্যের চিন্তা এসে মাথায় ঢোকে—বাজে চিন্তা। নিজের দুর্ভাগ্যের চিন্তাকেই বেশী ভয় ওর, তাই সবরকম চিন্তাকে এড়াতে চায় সে।

সুতরাং শ্যামার পর পর কার্যপদ্ধতি ওর জানা আছে। ওর ছোট দেওর বলে 'রুটিন বাঁধা কাজ'। সে থাকলে কনকের একটু সুবিধা হয়। কিন্তু এবার অনেক চেষ্টা ক'রে তাকে কলকাতাতে ছোট মাস-শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়েছে হেম, এখানে থাকলে নাকি তার পড়াশুনো কিছুই হবে না। মাসিমার শরীর খারাপ, একটু-আধটু বাজারহাট ক'রে দেয়, ইস্কুলে পড়ে। হেম গোপনে পাঁচ টাকা ক'রে দেয় সেখানে—সেটা শ্যামা জানেন না, জানলে প্রলয় কাণ্ড হবে। নগদ টাকা দিয়ে ছেলে পড়ানোর পক্ষপাতী তিনি নন।

শ্যামা লম্পটা নিয়ে তুলসীতলায় আসতেই কনক কাছে এগিয়ে গেল। আস্তে ডাকল, 'মা।'

'কেন গা বৌমা?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করেন শ্যামা। প্রদীপের সেই সামান্য আলোতেই ওর মুখখানা ঠাওর করার চেষ্টা করেন। ডাকবার ধরণেই বুঝতে পারেন যে কোন জরুরী বক্তব্য আছে তার।

'না, তেমন কিছু নয়।' তাড়াতাড়ি তাঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে সে, 'বলছিলুম যে—আপ—মানে ও'র মুখের চেহারাটা আমার তত ভাল লাগছে না। কিছু একটা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। একবার জিজ্ঞাসা করুন না। ঠাকুরজামাইদের কোন খবরটবর আছে কিনা—'

শ্যামা চুপ ক'রে যান। তাঁর ছেলের খবর বৌয়ের কাছ থেকে শোনাটা খুব রুচিকর নয়। হয়ত 'ঠাকুরজামাই' সংক্রান্ত প্রশ্নটা মধ্যে থাকাতেই সামলে নিলেন। একটু-খানি চুপ ক'রে থেকে শুধু বললেন, 'তা তুমিই জিজ্ঞেস করো না বৌমা।'

'না না—। তা ছাড়া আমাকে উনি বলবেনও না তেমন কোন কথা হ'লে।'

এবার একটু খুশী হন শ্যামা। আশ্বস্তও হন। তাড়াতাড়ি লম্পটা জ্বালিয়ে এনে ঘরে ঢোকেন, 'হ্যাঁরে, অমন ক'রে এসে শুয়ে পড়লি কেন রে? শরীরটা খারাপ

করছে নাকি?'

'না।' সংক্ষেপে জবাব দিল হেম। দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে শুয়ে ছিল, তেমনিই রইল। এপাশও ফিরল না।

এরপর আর কথা বাড়ানো উচিত নয়। ছেলের আজকাল বড় মেজাজ হয়েছে। কী বলতে কী বলে বসবে হয়ত।

তবুও ইতস্তত করেন শ্যামা। এবার তিনিও বুঝতে পারেন যে ছেলের মন খারাপ হবার কোন বিশেষ কারণ ঘটেছে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে সামান্য একটু কেশে গলার আওয়াজ ক'রে বলেন, 'তা হ্যাঁ রে—ওদের কোন খবরটবর পাস নি, মানে নিবড়ের?'

ছিলেকাটা ধনুকের মতো লাফিয়ে সোজা হয়ে বসে হেম, 'খবরদার বলছি, এ বাড়ির কেউ যেন সে ছোটলোকদের নাম না নেয়। ওদের নাম যে করবে তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না বলে দিলুম।'

এখনই আর কোন কথা বলা সম্ভব নয়। শ্যামাও চুপ ক'রে থাকেন। হঠাৎ যেন তাঁর মনে হয় নরেনকে দেখছেন—বা, তার কথাগুলো শুনছেন। এই দুশ্চিন্তার মধ্যেও কেমন ভয় হয় তাঁর—ছেলে কালক্রমে বাপের স্বভাবই প্রাপ্ত হবে না তো।...

চুপ ক'রে থাকে সকলেই। শ্যামার পিছু পিছু কনকও এসে দাঁড়িয়েছিল চৌকাঠের বাইরে, সে যেন নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ ক'রে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিথর নিস্পন্দ হয়ে যায় যেন আবহাওয়াটাও। শুধু শ্যামার হাতে ধরা 'লম্প'র শিখাটা অল্প অল্প কাঁপতে থাকে তাঁর নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে, আর তাতেই হেমের ছায়াটাও একটু একটু কাঁপে পিছনের দেওয়ালে।

কিন্তু হেমই চুপ ক'রে থাকতে পারে না বেশীক্ষণ। সে নিজেই ওদের প্রসঙ্গ তোলে এবার, 'ছোটলোকটা কি করেছে জানো? এখান থেকে গিয়ে সোজা সেই প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ি উঠেছে। তাদের হাতে-পায়ে ধরে সেই বৌকে নিয়ে এসেছে আবার।'

'কী সর্বনাশ!' শ্যামা ও কনক দুজনের কণ্ঠ থেকেই একসঙ্গেই বেরিয়ে আসে কথাটা—চাপা, অস্ফুট—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো।

'হ্যাঁ। সকালে উঠে ওর ঠাকুমা নাকি খুব চেঁচামেচি করেছিল, আমি আবার হারানের বিয়ে দেব, সাত দিনের মধ্যে যদি আর একটা বৌ না আনতে পারি তো আমার নাম নেই—এইসব। তাতে নাকি ওর পাড়ার কেউ কেউ এসে ছোটলোকটাকে ডেকে বলেছে যে ওসব মতলব করলে আমরাই এবার পুলিশে গিয়ে খবর দেব যে তোমাদের এই ব্যবসা দুজনে মিলে বৌ খুন ক'রে নতুন নতুন বৌ আনো তার গয়নাগাঁটি মারবে বলে! তাতেই নাকি ভয় পেয়ে ও এখানে এসেছিল। দিদি নাতিতে কিছু মতলব এঁটেই এসেছিল বোধ হয়—এখান থেকে তাড়া খেয়ে সটান সেখানে চলে গেছে।

'তা তারা আবার পাঠালে?' আড়ষ্ট কণ্ঠে কোনমতে প্রশ্ন ফোটে।

'পাঠাবে না কেন! তারা কড়ার করিয়ে হারানকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে যে ওর সঙ্গে দিদিশাশুড়ীর কোন সম্পর্ক থাকবে না—রান্না-খাওয়া পর্যন্ত আলাদা করতে হবে। জেদ্ বই তো নয়—জেদ বজায় রাখতে সবেতেই রাজী হয়েছে। তাদেরই তো ভাল হ'ল!'

'তা তোকে কে বললে?'

এখনও যেন আড়ষ্টতা কাটে নি শ্যামার! বিহ্বলভাবে কতকটা কাঠের পুতুলের মতোই প্রশ্ন ক'রে যাচ্ছেন শুধু।

'ওদের পাড়ার নাড়ু চক্কোত্তি আছে না, ওরেদই কী রকম হয় সম্পর্কে, তার ছেলে আমাদের অফিসে ঢুকেছে আজ মাস কতক হ'ল। তার মুখেই শুনলুম।—আবার বলেছে কিনা—'

কথাটা শেষ হ'ল না। তার আগেই কী একটা ভারী জিনিস পড়ার আওয়াজ হ'ল বাইরে! কে যেন পড়ে গেল।

তরু কখন নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল তা কনকও টের পায় নি।

এখন চমকে পিছন ফিরে অন্ধকারেই বুঝতে পারল।

'মা, শিগ্‌গির একবার আলোটা আনুন তো। ঠাকুরঝির ফিট হয়েছে বোধ হয়! চেঁচিয়ে উঠল কনক।

ওধার থেকে অন্ধকারেই ঐন্দ্রিলার কণ্ঠ ভেসে এল। সে অর্ধ-স্বগতোক্তি করছে, 'এখনই মুচ্ছো গেলি—এর পর কী করবি? এই তো কলির সন্ধ্যে লো। কত মুচ্ছো যাবি এর পর?...কত কল্লাই জানে বাবা আজকালকার মেয়েরা।'

॥ ৩ ॥

এই ঘটনার পর থেকে তরু যেন কেমন হয়ে গেল। কথা সে চিরদিনই কম বলে, সেদিক দিয়ে তার স্বভাব মহাশ্বেতা ও ঐন্দ্রিলার বিপরীতই বলা যায়—কিন্তু এখন যেন একেবারেই কথা ছেড়ে দিল সে! কেউ কথা কইলে উত্তর দেয় না, দু'তিনবার পর পর কোন প্রশ্ন করলে কিম্বা বকাবকি করলে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়। 'হ্যাঁ' কিম্বা 'না' —এর বেশী নয়। তাও ঘাড় নেড়ে কাজ সারা সম্ভব হ'লে তাই নাড়ে। চুপচাপ বসে থাকে অধিকাংশ সময় ঘরের জানলায়। বাইরের দিকে বা বাগানের দিকের জানলায় নয়—উঠোনের দিকের জানলায় বসে একদৃষ্টে কাঁঠাল চারাটার দিকে চেয়ে থাকে। দিনে রাতে, সব সময়। কেউ এসে জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেলে স্নান করে খায়—তা নাহ'লে তাও করতে চায় না। সারাদিন খেতে না দিলেও কোন কথা বলে না বা খেতে চায় না।

কনকই এসবগুলো করে। সে-ই জোর ক'রে নিজের সঙ্গে ঘাটে নিয়ে যায়, জোর ক'রে গিয়ে ভাতের সামনে বসিয়ে দেয়। তাও প্রথম প্রথম ঠিক গোনা দু'গ্রাস খেয়েই উঠে পড়ত, কনক ছেলেটার কথা স্মরণ করাতো, 'পেটে যেটা আছে তার কথাটা একটু ভাবো ঠাকুরঝি। ওটাকে বাঁচাতে হবে তো। ওটা তো তোমার নিজস্ব—তাতে তো কেউ ভাগ বসাতে পারবে না। তার কথাটা ভাবছ না কেন?'—বলাতে এখন খায় কিছু। তাও যা প্রথম দেওয়া হয় তা-ই খায়, আর চায়ও না, দিতে এলেও নেয় না। হাসিখুশি তো দূরের কথা—যদি একটু কাঁদত, তা'হলেও শ্যামা কতকটা স্বস্তি পেতেন।

'পোড়ামেয়ের চোখে কি জলও থাকতে নেই একফোঁটা?...কী হবে বৌমা, মেয়েটা শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যাবে নাকি? কোন মতে ওকে একটু কাঁদাতে পারো না মা?'

সে চেষ্টা অনেক করেছে কনক ; কোন ফল হয় নি। ওর ভেতর-বার সবটা স্তম্ভিত হয়ে গেছে বোধ হয়—কোন কিছুরই বোধশক্তি আর নেই। চোখের জলের উৎসও বুঝি গেছে শুকিয়ে। দুঃখের বহিঃপ্রকাশের মধ্যে আছে শুধু মূর্ছা রোগটা! সেদিনের পর থেকে ওটা থেকেই গেছে। দুদিন তিনদিন অন্তরই মধ্যে মধ্যে ফিট হয়!

মহাশ্বেতা বলে, 'ওর ওপর বাপু, আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি, কোন অন্যিদেবতার ভর হয়েছে। এ একেবারে পষ্ট লক্ষণ। এ আমি ভাল বুঝছি না। ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা

করাও তোমরা। বল তো মাকড়দায় একজন ভাল গুণীন্ আছে শুনেছি, তার খবর করি। খুব বেশী নেয়ও না শুনেছি। সেবার আমার বড় ননদের ভাসুরঝির অমনি হয়েছিল—'

বিরক্ত হয়ে শ্যামা থামিয়ে দেন ওকে, 'তুই চুপ কর তো। তোর সব তাইতে বক্তিমে আমার ভাল লাগে না। অন্যিদেবতার ভর হয়েছে! সে হয়ে থাকলে তোরই মাথাতে হয়েয়ে। গুণীন্ তুই দেখাগে যা!'

মহাশ্বেতা ঐন্দ্রিলা নয়। সে ঝগড়া করতে পারে না, ম্লানমুখে চুপ ক'রে থাকে। তবে সে তখনকার মতোই। একটু পরেই হয়ত কনকের কাছে গিয়ে ফ্যাশ ফ্যাশ ক'রে বলে, 'আমি বলছি বৌদি, তুমি দাদাকে বলে একটা ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা করাও। যে রোগের যা। এ মন্তর-তন্তর ছাড়া ভাল হবে না। মা তো এদান্তের কথা জানে না, এখন খুব ভর হচ্ছে অন্যিদেবতাদের।

কনক অবশ্যই চুপ ক'রে থাকে। ইদানীং 'অন্যিদেবতা'দের খুব বেশী ভর হচ্ছে এ কথা শোনবার পর হাসি চাপা কঠিন। সেইজন্যে আরও প্রাণপণে চুপ ক'রে থাকতে হয়। তার বড় ননদটিকে সে চিনেও নিয়েছে এর মধ্যেই—জানে যে ওকে এসব কথা বোঝাতে যাওয়া বৃথা।

তার উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করে না মহাশ্বেতা। হয়ত তখনই আবার তরুর সামনে গিয়ে বলে, 'কী লো, কী খেতে টেতে ইচ্ছে হয় খুলে বল্। যা মন চায় বল্, আমি পাঠিয়ে দেব। এখানে তো ভাল-মন্দ কিছু হবার যো নেই। ভাত-হাঁড়ির ভাত খাও, তাতে মা গররাজী নয়, তার ওপর কিছু চেয়ো না বাপু। হি হি।...তা আমাকেই বলিস—যখন যা ইচ্ছে হবে। পেটে-পোয়ে খাবার সাধ চেপে রাখতে নেই। ছেলের মুখ দিয়ে নাল পড়ে। কচুরি খাবি দু'খানা? হিংয়ের কচুরি? বল্ তোর দাদাবাবুকে বলে দিই, বড়বাজার থেকে এনে দেবে। আ-মর, মুখপোড়া মেয়ে হাঁ-ও করে না হুঁ-ও করে না। বাক্যি হরে গেছে যেন।'

তারপরই আবার হয়ত—কিছুক্ষণ পূর্বের ধমকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে—মা'র কাছে গিয়েই উপদেশ দেয়, 'তুমি ওকে দিয়ে খুব কাজকম্ম করাও। অমন ক'রে বসিয়ে রেখো নি। পোয়াতী মেয়ে, শেষে যে গুম পাগল হয়ে যাবে। খাটলে-খুটলে অত ভাববার সময় পাবে না, মনটাও ভাল থাকবে তখন!'

এ যে সৎ-পরামর্শ তা শ্যামাও জানেন। কথাটা তাঁর মাথাতেও গিয়েছিল বহু-পূর্বেই। কিন্তু কাজটা করাবেন কাকে দিয়ে? একশবার কি টেনে টেনে নিয়ে জোর করে কাজ করানো যায়? কীই বা কাজ তাঁর সংসারে? তাঁর যা নিজস্ব কাজ—পাতা কুড়োনো, পাতা চাঁচা, তা ও পারবে না। বাগানের তদারক ও কখনও করে নি—কিছু জানে না। এক যেটা পারে, কনকের কাজ কিছু কিছু ভাগ ক'রে নিতে। তা-ও এখন ঐন্দ্রিলা রয়েছে—সে যেন আরও, তরু এসেছে বলেই, বেশী ক'রে ক'রে কাজ করছে। রান্না, বাসন মাজা, ঘর-দোরের পাট—কনকের কাছ থেকে টেনে নিয়ে করছে।

সবচেয়ে বড় কথা—অনিচ্ছায় কোন কাজই করানো যায় না। জোর ক'রে বসিয়ে দিয়েও দেখেছেন, টেনে নিয়ে গিয়ে উনুনের ধারে বসিয়ে পাতার জ্বাল দেওয়াতে শুরু ক'রে চলে এসেছেন—খানিক পরে গিয়ে দেখেছেন সে তেমনি চুপ ক'রে বসে আছে। উনুন নিভে ধুস। ভাতও খানিকটা কাঁচা, খানিকটা সেদ্ধ—ঢিকচেলো হয়ে আছে। দুপুরে বাসন দিয়ে ঘাটে বসিয়ে রেখে এসেছেন, বেশ খানিকটা গড়িয়ে উঠে গিয়ে দেখেছেন যে, সে তেমনি বসে আছে, বাসন একখানাও মাজা হয় নি।

আবার কনক অনুযোগ করে, 'অমন ক'রে ঘাটে-টাটে একা বসিয়ে রেখে আসবেন

না মা, ফটির ব্যারাম হয়েছে, যদি হঠাৎ জলের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়? আমরা তো জানতেও পারবো না!'

কথাটা ঠিকই, শ্যামাও তা বোঝেন। সুতরাং সে চেষ্টা ছেড়ে দেন।

অর্থাৎ কিছুই করা যায় না—সমস্যা শুধু দিন-দিন উগ্রতর হয়ে ওঠে।

আরও বেশী সমস্যা হয়েছে ঐন্দ্রিলাকে নিয়ে।

তার বাক্যবাণ অহরহ বর্ষিত হয়ে চলেছে তরুকে উপলক্ষ ক'রে। অথচ এমন কিছু ঝগড়া-ঝাঁটিও করে না যে বাড়াবাড়ি হয়ে চলে যাবে আবার। এবার যেন সে একটু বেশী সতর্ক হয়েছে। যাকে অন্তর-টিপ্পনী বলে, শুধু সেইটুকু দিয়েই সরে যায় অন্যত্র, ঝগড়া পেকে ওঠবার অবকাশ দেয় না।

হয়ত তরুর কাছে গিয়েই হাত-পা নেড়ে চাপা গলায় মুখের বিকৃত ভঙ্গি ক'রে বলে, 'রাখালী লো রাখালী—কত খেলাই দেখালি!......মাইরি, আদর নিতে তুই জানিস বটে। তোকে সবাই ভালমানুষ বলত। আমি জানি—চিরকাল মিচকে পোড়া শয়তান তুমি! কেমন কল্লা করলে—কোন কাজকম্ম কিচ্ছু করতে হচ্ছে না, অথচ সকলে হা-হুতাশ করছে, কী হ'ল কী হ'ল মেয়েটার কী হ'ল!'

আবার হয়ত জানলার বাইরে উঠোন থেকে কিছুক্ষণ ওর দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে, 'নমস্কার। নমস্কার। তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার। একবছর ধরে নিত্যি তোমার পাদোকজল খেলে তবে যদি তোমার বুদ্ধির ধার দিয়ে যেতে পারি!'

এক এক সময় অন্তরের বিষও চাপতে পারে না। হিংস্র গলায় তর্জন ক'রে ওঠে, 'হবে না! এত দেমাক ভাল নয়। বড্ড অহঙ্কার হয়েছিল তোর, ভেবেছিলি বর একেবারে হাতের মুঠোয় এসে গেছে,—তুই রাগ দেখিয়ে এখানে চলে এলেই চোখে শর্ষে ফুল দেখে ছুটে এসে হত্যে দিয়ে পড়বে। ওরে, হাজার হোক ওরা পুরুষ জাত, ওদের চার দোর খোলা।...আমার বর সত্যি-সত্যিই আমার হাতধরা ছিল, আমার কথায় উঠত বসত, তবু কখনও এরকম ঘাঁটাতে যাই নি আমি। তুই ভাবিস্ তোর খুব বুদ্ধি! ঐ বুদ্ধিই তোর কাল হ'ল!' ইত্যাদি—

এ ছাড়া ওকে উপলক্ষ ক'রে এবং শুনিয়ে মাকে বৌদিকে বলা তো আছেই।

মাঝে মাঝে উদ্বেগে কনকের চোখে জল এসে যায়।

'কী হবে মা! মেজ ঠাকুরঝি দেখছি মেয়েটার একটা ভালমন্দ কিছু না ঘটিয়ে ছাড়বে না। নিত্যি শুনতে শুনতে শেষে যদি মনের ঘেন্নায় একটা কিছু ক'রে বসে?'

'সবই তো বুঝি মা। কী করব সেইটেই যে শুধু বুঝতে পারি না। দুই-ই যে আমার পেটের কাঁটা। কোনটাই যে ফেলবার নয়। কাকে কি বলি বলো! ওকে তো দুবেলা টাঁইস করছি—দেখছই তো। কিন্তু ও কি কথা শোনবার পাত্তর! ওকে তো চেনো। এর পর কিছু করতে গেলে গলা-ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিতে হয়। মা হয়ে সেটাই বা করি কি ক'রে বলো?'

এক এক সময় আর থাকতে না পেরে চরম সাহসে ভর ক'রে হেমের কাছে গিয়েই বলে কনক, 'কী করলে বলো তো মেয়েটার? সত্যি-সত্যিই পাগল হয়ে গেলে কি করবে?'

হেম গোড়ার দিকে অত গ্রাহ্য করে নি। শ্যামা কি কনক উদ্বিগ্ন হয়ে কিছু বলতে গেলে উড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'প্রথম প্রথম শক্‌টা পেলে অমন হয়ই। দুটো চারটে দিন যেতে দাও না,—একটু সামলে নিক, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কেউ দুঃখে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদে, কেউ গুম হয়ে থাকে—দ্যাখো না? সব দুঃখই জুড়িয়ে যায়, ওরও যাবে!'

হেম বাড়িতে থাকেই কম, রবিবারেও পুরো দিনটা বাড়ি থাকে না—খাওয়া-দাওয়ার পরই বারোটা নাগাদ বেরিয়ে যায়। শনিবার সকাল ক'রে ফিরে কাপড়-জামায় সাবান দিয়ে—হয় বিকেলেই আবার বেরিয়ে পড়ে, নয়ত বাগানে মন দেয়। তরুর অবস্থাটা তত চোখে পড়ে না ওর। কাজেই প্রথম প্রথম অতটা উদ্বেগের কারণও বুঝতে পারে নি।

কিন্তু ক্রমশ সেও চিন্তিত হয়ে উঠল।

অথচ এখন যে কী করা উচিত তাও ভেবে পায় না সে।

কনকের অনুযোগে এক সময় চটে ওঠে, 'তা কী করতে হবে কি? এখন আবার পায়ে ধরে সতীনের ওপর গিয়ে দিয়ে আসতে হবে? সে আমি অন্তত পারব না। দিতে হয় তোমরা দাওগে।...আর দিলেই বা সে সতীন ঢুকতে দেবে কেন?'

আবার কখনও ঠাণ্ডা মেজাজেই জবাব দেয়, 'তা আমিই বা কি করছি বলো। তখন ঐ অবস্থায় মেয়েটাকে খুন হ'তে পাঠানোই কি ঠিক হ'ত? দেখলে তো কি মেজাজ। ও রকম কথা শুনলে মরা মানুষের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, তা আমি তো জ্যান্ত মানুষ। এ ওর বরাত। বরাত ছাড়া কিছু নয়।'

এ কথার পর চুপ ক'রে থাকা ছাড়া উপায় নেই। কনক বা শ্যামা কারুরই কোন উত্তর যোগাত না।

॥ ৪ ॥

হঠাৎ একদিন কথাটা উঠল।

সেটা শনিবার না হ'লেও কী কারণে সকাল ক'রে ছুটি হয়েছিল—সিমলেয় বড় মাসিমার কাছে হয়ে আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরেছে হেম। শ্যামা যথারীতি বসে তেঁতুল কাটছেন, সীতা বই খুলে বসে ঢুলছে এবং মধ্যে মধ্যে শ্যামা বা কনকের কাছে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করছে। ঐন্দ্রিলার জ্বর—সে শুয়ে পড়েছে। কনক বাইরের অন্ধকার বাগানটার দিকে চেয়ে বসে আছে স্থির হয়ে। অন্ধকারে জোনাকিগুলো জ্বলছে আর নিভছে। অসংখ্য জোনাকি। এক এক সময় ভয় হয় ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলে—কত, বোধ হয় হাজার হাজার হবে। এরা দিনের বেলা থাকে কোথায়, কই তখন তো মোটে দেখা যায় না!

সন্ধ্যেটা এমনি এলোমেলো চিন্তাতেই কাটাতে হয়। কনকের লেখাপড়া খুব বেশী জানা নেই, তবু হয়তো চেষ্টা করলে একটু-আধটু পড়তে পারত, কিন্তু বইয়ের পাটই নেই বাড়িতে। শ্যামা নাকি সেকালের মতে লেখাপড়া ভালই জানতেন, এখনও তাঁর হাতের লেখা মুক্তোর মতো—অনভ্যাসে সব ভুলে গেছেন। সীতারই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ধাঁধায় পড়েন, দ্বিতীয় ভাগের বানান বলতে পারেন না সব শব্দের। ছোট দেওর এখানে এলে তার পড়ার বইগুলো নিয়ে মধ্যে মধ্যে পাতা ওল্টায় কনক, তাও শ্যামার সামনে নয়, মেয়েদের 'আয়না মুখে ক'রে বসা' তাঁর ভাল লাগে না। ওতে সংসার বয়ে যায়, সাত হাল হয় মানুষের। মেয়েরা সংসারের কাজ নিয়ে না থাকলে লক্ষ্মীশ্রী থাকে না।

সুতরাং—আরও অন্তত দুটো ঘণ্টা কী ক'রে কাটবে এই ভেবে যখন অস্থির হচ্ছে মনে মনে, তখন হঠাৎ সদরে পরিচিত জুতোর আওয়াজ উঠতে যেন বেঁচে গেল সে। প্রথমটা একটু চিন্তাও হয়েছিল—আবার কোন দুঃসংবাদ নয় তো? কিন্তু 'লম্প'র কাছাকাছি আসতে দেখল যে মুখের ভাব প্রসন্ন, চোখের কোণে তখনও একটা কৌতুক-

হাস্যের আভাস লেগে আছে—উচ্ছল হাস্য-পরিহাসের স্মৃতি সেটা।

ঘাট থেকে মুখহাত ধুয়ে আসতে কনক মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল, 'ভাত দেব এখন?'

'ভাত?' উদার প্রসন্নতার সঙ্গে বলল হেম, 'তা দাও। কতক্ষণ আর বসে থাকবে। আটটা বেজে গেছে। আজ বড়মাসিমার ওখানে গেছলুম মা (শ্যামা মনে মনে বললেন, 'তা জানি, সে তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি!'), হঠাৎ সকাল ক'রে ছুটি হয়ে গেল আজ—কে এক সাহেব মরেছে, তাই চলে গেলুম। বৌদির আবার ছেলে হবে!'

'তাই নাকি?' এবার শ্যামা আর চুপ ক'রে থাকতে পারেন না।

'যাক, এবার একটা ছেলে হ'লে দিদির একটু শান্তি হয়।' তিনি একটু থেমে বলেন।

'ছোটমাসিও আজ এসে পড়েছিল। দুবাড়িতে বুঝি মেয়েরা পড়ে নি—তাই একটু সময় পেয়ে এসেছিল। মেসোমশাইয়ের শরীর খুব খারাপ, হাঁপানির টানে সারারাত ঘুমোতে পারেন না, মাসিকেও বসে তেলমালিস করতে হয় বুকে অর্ধেক দিন।'

'তা হাঁরে—খোকা কেমন আছে?'

'ভাল আছে। বলছিল যে চ দেখে যাবি। কিন্তু তখন গেলে বড্ড রাত হ'ত।'

'উমা কি আর ওকে একটু দেখছে-শুনছে? কে জানে। পয়সা নিয়ে পরের বাড়ি পড়িয়ে পড়িয়ে ঘরে এসে আর কি ওর গাধার খাটুনি খাটতে ইচ্ছে করে।...ত হাঁরে, শরৎ জামাই তো কিছু কিছু পান ছাপাখানা থেকে, উমা তো এবার একটু বিশ্রাম নিলে পারে।'

স্বামী-পরিত্যক্তা উমা একদা অবলম্বন হিসেবে এই মেয়েপড়ানোর কাজ নিয়েছিল—নিজের স্বল্পবিদ্যা সম্বল ক'রেই। দুটাকা একটাকা মাইনের টিউশ্যানিই বেশী, তাই দুপুর থেকে রাত নটা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি পড়িয়ে বেড়াতে হয়, নইলে ঘরভাড়া খাওয়াপরা একটা লোকের খরচ ওঠে না। শ্যামার মনে হয়—ঘরে থাকলে তার কোলের ছেলেটাকে একটু দেখতে পারত। একটা ছেলে পড়ে আছে মহার মামাতো ননদের বাড়ি—জায়গাটা ভাল নয়—তবু আদরযত্নেই আছে। যখন আসে তার বেশভূষার মহার্ঘ্যতাতেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখাপড়াতেও ভাল সে। তার জন্যে চিন্তা নেই। চিন্তা এই ছেলেটার জন্যেই।

ভাবতে ভাবতে একনিমেষে বহুদূরে চলে গিয়েছিলেন শ্যামা। হঠাৎ কানে গেল হেম বলছে, 'সে তো মেসোমশাই নিজে কতবার বলেন। তা কে শোনে বলো! মাসি বলে যে, না, যতদিন পারব নিজের রোজগারে খাব। যে স্বামী কখনও ফিরে চাইলে না তার পয়সায় বসে খাব কিসের জন্যে।...আর খোকার পড়ার কথা বলছিলে। খোকা এখন সিক্সথ্ ক্লাসে পড়ছে—ইংরিজী বই সব তার, সে কি মাসি পড়াতে পারে?'

'কেন—উমা তো ইংরিজী শিখেছিল গোবিন্দর কাছে।'

'হ্যাঁ সে কী শিখেছিল—ফার্স্টবুক পর্যন্ত। নেহাত আজকালকার দিনে কোন মেয়েই শুধু বাংলা শিখতে চায় না—কাজচলা গোছের একটু শেখাতে হয়—তাই!'

ইতিমধ্যে কনক ঠাঁই করে ভাত বেড়ে দিয়েছে। হেম গিয়ে খেতে বসে। শ্যামাও কাছে এসে বসেন। 'লম্প' এখানে, সুতরাং তাঁর কাজ বন্ধ। তাছাড়া জেগে থাকলে, ছেলের খাওয়ার সময় এসে বসেন প্রত্যহই। ভাতটা আর বেড়ে দিতে পারেন না—একশবার ওঠা-বসা করতে কোমর-ব্যথা করে তাঁর।

দু-এক গ্রাস খাবার পর হেম বলল, 'বড় বৌদি কি বলছিল জান মা খুকীর কথায়?'

গলাটা অকারণেই একটু বড় ক'রে হেম। খাওয়ার ব্যবস্থাটা রান্নাঘরের দাওয়ায়। ভাত বেড়ে দিয়ে কনক ঘরের মধ্যে চৌকাঠের অপর পারে দাঁড়িয়ে থাকে। শাশুড়ী যখন সামনে বসে থাকেন তখন এখানে থাকার প্রয়োজন নেই, শোভনও নয় সেটা। যা দরকার শ্যামাই বলতে পারবেন, ও শুধু এসে দিয়ে যাবে।

সেই অন্তরালবর্তিনীও যাতে শুনতে পায় সেই উদ্দেশ্যেই গলাটা চড়ানো। খুশী হবারই কথা কনকের কিন্তু বড়বৌদির নামটা সেই উথলে-ওঠা খুশির ফেনায় যেন জল ঢেলে দেয়। তার প্রসঙ্গ শোনামাত্র মনের ধনুকে কে যেন টং ক'রে টঙ্কার দিয়ে ওঠে। বিদ্বেষের আগুনে কান-মাথা গরম হয়ে ওঠে, কঠিন হয়ে ওঠে দেহ, মনও জুগুপ্সু হয়ে ওঠে। সমস্ত ইন্দ্রিয় টান টান হয়ে যেন নামটাকে সরিয়ে দিতে চায় স্মৃতি ও শ্রুতি থেকে।

বড়বৌদি কি বলছে তা শোনার জন্য শ্যামাও খুব উৎসুক নন। ছেলের এই অত্যধিক বড়বৌদি প্রীতি তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। তবে এ বীতরাগ কনকের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা ক'রে নয়; ছেলের এই অত্যধিক আকর্ষণের পিছনে কিছু অর্থব্যয়ও হয়—এই তাঁর আশঙ্কা।

'যেখানে এত সোহাগ পীরিত, সেখানে কি আর এমনি হাত মুখে ওঠে, মন পাবার জন্যে কি আর চাট্টিটি সেই শ্রীপাদপদ্মে ঢেলে দিতে হয় না মনে করো?' প্রায়ই বলেন ছেলের আড়ালে।

সুতরাং কোন উত্তর দেন না শ্যামা, কথাটা শোনবার জন্যে কোন আগ্রহও দেখান না।

তবে তাতে যে হেমের উৎসাহ কমে তা নয়, সে আগের মতোই ঈষৎ গলাটা চড়িয়ে বলে, 'বলছিল যে ওর বৌদি যদি একটা শনিবারে আসবার জন্যে নেমন্তন্ন ক'রে চিঠি লিখে পাঠায় তো কেমন হয়? আমাকেই বলছিল খুকীর বৌদির জবানীতে একখানা লিখতে—তা আমার হাতের লেখা তো সে জানে। সেটা দেওয়া ঠিক হবে না!'

'এই ছিরির কথা! তাই আবার তুমি সবিস্তারে ব্যাখ্যানা ক'রে বলতে এসেছ! মনের অপ্রীতি কণ্ঠে চাপা থাকে না শ্যামার, 'আহা কী বুদ্ধি!' যেন সে সেই নেমতন্নর জন্যই হাত ধুয়ে বসে আছে। অমনি তু করলেই চলে আসবে! বলে সে এখন এতদিন পরে তার প্রথম বৌকে এনেছে, সে তো বলতে গেলে এখন নতুন তার কাছে। তাকে ছেড়ে তাকে চটিয়ে এক কথায় অমনি ছুটে আসছে! রেখে ব'সো দিকি! একে বলে চ্যাংড়ার বুদ্ধি।'

হেম বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়। উৎসাহের আধিক্যেই সে অমন জমাট-বাঁধা আড্ডাটা ছেড়ে ছুটে এসেছে। এই প্রস্তাবের যে এই পরিণাম হবে তা ভাবে নি।

সে একটু চুপ ক'রে থেকে বেশ মুষড়ে পড়া গলাতেই বলে, 'সে তো আমি বললুম। তা বৌদি বললে, ঠাকুরঝির পেটে তার ছেলে, প্রথম সন্তান, সে টান তো একটা আছে। তুমি লিখে দ্যাখোই না— অফিসের ঠিকানায় দিও বরং।'

'দূর! দূর! যত সব বাজে কথা।'

কথাটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেন শ্যামা।

হেম আর কিছু বলে না, গম্ভীর ভাবে খেয়ে উঠে যায়। সেদিন রাত্রে আর কনকের সঙ্গেও কোন কথা বলে না। একেবারে দেওয়ালের দিকে ফিরে শোয় গোড়া থেকেই।

কিন্তু কনকের মনে যতই বিদ্বেষ থাক বড়বৌ সম্বন্ধে—কথাটা তার মন্দ লাগে না। কোন উপায়ই তো হচ্ছে না—একটু বেয়ে-চেয়ে দেখতে দোষ কি! সত্যিই তো, প্রথম সন্তান এসেছে পেটে—তার ওপর একটা টান তো থাকবেই। যতই বলো বাপু,

বড়দির মাথায় খেলেও খুব!

সেদিন বহু রাত্রি পর্যন্ত জেগে জেগে ভাবল কনক। দিনের বেলাও কাজকর্মের ফাঁকে তোলাপাড়া করল অনেক, তারপর চিঠি একটা লেখাই সাব্যস্ত করল। কী আর হবে, না হয় উত্তর দেবে না—এই তো।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সীতার কাছ থেকে খানদুই খাতার পাতা আর দোয়াত কলম চেয়ে নিয়ে চিঠির মুসাবিদা করতে বসল। বার বার কাটাকুটি হয়, কোনটাই পছন্দ হয় না। এককালে ও পাড়ার অনেক বিবাহিতা মেয়ের প্রেমপত্র লিখেছে, কিন্তু অনভ্যাসে এখন যেন কোন কথাই মনে পড়ে না। হাতের লেখা ভাল নয় কোনকালেই—এখন আরও কদর্য হয়ে গেছে।

তবু তিন-চারবার চেষ্টার পর একটা চিঠি খাড়া করল শেষ পর্যন্ত।

লিখল—

'ঠাকুরজামাই,

ছোটঠাকুরঝি আপনার জন্য দিনরাত কাঁদিতেছে এবং পাগলের মতো হইয়া গিয়াছে। খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে। এমন অবস্থায় সে বেশীদিন বাঁচিবে বলিয়া মনে হয় না। একবার আসিয়া অন্তত শেষ দেখা দিয়া যান। তাহার গর্ভে আপনার প্রথম সন্তান, সে গেলে সন্তানও যাইবে। দয়া করিয়া সামনের শনিবার একবার আসুন, মিনতি করিতেছি। আপনি আমার আশীর্বাদ লইবেন। গুরুজনদের প্রণাম দিবেন। ইতি—

আপনার বৌদি।'

বানান ভুল যে অনেক হ'ল তা কনকও জানে। তবু এইটে লিখে ওর মনে হ'ল মন্দ দাঁড়ায় নি। হাতের লেখাও, চেষ্টা করলে পড়া যাবে। তবে খামে কি আর দিতে দেবে হেম, মিছিমিছি দুটো পয়সা যে খরচ করবে তা মনে হয় না। আবার হয়ত পোস্টকার্ড এনে দেবে, আবার নকল করতে হবে। সেটা কেমন দাঁড়াবে কে জানে।

শ্যামা গড়িয়ে ওঠবার আগেই দোয়াত-কলম যথাস্থানে রেখে এল সে। আঙুলে একটু কালি লেগেছিল, ঘষে ঘষে তুলে এল ঘাট থেকে।

হেমকে জিজ্ঞাসা না ক'রে এ চিঠির কথা সে কাউকে বলবে না।...

হেম প্রথমটা একটু অবাক হয়ে গেল, খুশীও হ'ল।

বড়বৌদির কথাটা উড়িয়ে দেয় নি কনক বরং সেই মতো কাজ করেছে, খুশীটা এই জন্যই বেশী।

তারপর প্রদীপের আলোতে (হঠাৎ কোন দরকার পড়তে পারে বলে সব ঘরে একটা ক'রে প্রদীপ দিয়াশলাই রেখে দিতেন শ্যামা—রান্নাঘরেও) চিঠিটা পড়ে বলল, 'বাঃ এই তো বেশ হয়েছে। দিব্যি গুছিয়ে লিখেছ তো। বাবা, তোমার পেটে পেটে এত। আমি সাত জন্মে বসে ভাবলেও এর একটা লাইন আমার মাথাতে যেত না। খুব লোককে লিখতে বলেছিল বড়বৌদি!'

বড়বৌদির নামেতে আজও মনের মধ্যে তেমনি একটা টং ক'রে শব্দ উঠলেও খুশীও হ'ল কনক। স্বামীর মুখে তার এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এই প্রথম শুনল সে। খুশির জোয়ার মনের কানায় কানায় উপ্‌চে উঠে অপ্রীতিকর নামটাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তার গৌরাভ মুখবর্ণে ক্ষণে ক্ষণে রক্তোচ্ছ্বাস হ'তে লাগল। আর সেইদিকে চেয়ে ক্ষীণ আলোতেই মনে হ'ল হেমের যে অনেকদিন পরে সে নতুন ক'রে দেখল কনককে। রানীবৌদির দীপ্তি নেই বটে—সে কটা মেয়েরই বা আছে বাংলাদেশে?—তবু কনকেরও যে কিছু নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য আছে সেটা আজ লক্ষ্য করল সে। প্রদীপের

ম্লান আলো হ'লেও—আলোর-কাছে ঝুঁকে-পড়া মুখের ফরসা রঙের ওপর ঢেউ-খেলে-যাওয়া আবীর গোলার মতো রক্তোচ্ছ্বাসটাও তার চোখ এড়াল না। লজ্জারও যে—এটাকে লজ্জার লালিমা বলেই ধরে নিল হেম—একটা শোভা আছে, তা মানতেই হবে। এটা কিন্তু সকলের থাকে না। অতি সপ্রতিভ রানীবৌদির এই শোভাটি তেমন চোখে পড়ে না। নলিনীরও এমন মধুর লজ্জা দেখার অবকাশ হয় নি তার।...সুতরাং সে তাকিয়েই রইল সেদিকে—কয়েক মুহূর্ত। সুশ্রী মসৃণ ললাটে পটে আঁকার মতো সুন্দর ভ্রূ—তারই মধ্যে কালো টিপ একটি; বার বার ঘোমটা টানবার ফলে ঈষৎ বিপর্যস্ত কেশের কোলে কোলে সূক্ষ্ম একটি স্বেদরেখা বরাবরই ছিল, এখন সম্ভবত প্রদীপের তাপেই তার বিন্দুগুলি বৃহত্তর হয়ে ঐ টিপটির চারপাশে নামছে, ভ্রূর উপরে উপরে জমা হচ্ছে—সবটা জড়িয়ে ভালই লাগল হেমের।

ওর হঠাৎ চুপ ক'রে যাওয়াটা লক্ষ্য করতে কনকেরও একটু সময় লাগল। সেও তন্ময় হয়ে উপভোগ করছিল এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতাটা। যখন খেয়াল হ'ল, তখন বিস্মিত হয়ে চোখ তুলে তাকাতেই চোখে পড়ল স্বামীর সেই ঈষৎ মুগ্ধ দৃষ্টি, ফলে সে আরও সুখী, আরও লজ্জিত, আরও বিব্রত হয়ে পড়ল। এই-ই প্রথম, তবু এ দৃষ্টি বুঝতে বোধ করি কোন মেয়েরেই ভুল হয় না।

আবারও প্রবল খুশির জোয়ার বিচিত্র বর্ণাভার সৃষ্টি করল তার মুখে—তবু কনক সেটা উপভোগ করার জন্য অপেক্ষা করল না। সে যেন বড় বেশী দৈন্যপ্রকাশ করা হয়, ছি!

সে বরং এই মোহটা ভাঙবার জন্যেই জোর ক'রে বাস্তবে নেমে এল, 'তা এটা তো আবার পোস্টকার্ডে নকল ক'রে দিতে হবে? পোস্টকার্ড আছে তোমার কাছে?'

'দূর পাগল! পোস্টকার্ড কি? অফিসে চিঠি দিতে হবে—এসব চিঠি কখনও পোস্টকার্ডে দেওয়া চলে। তুমি এমনি আমার জামার পকেটে রেখে দাও, কাল আমি খাম কিনে ঠিকানা লিখে ফেলে দেব।...মাকে বল নি তো? এখন ব'লো না—দেখাই যাক না কী ফল হয়।'

পাগল শব্দটাও স্নেহ ও প্রশ্রয়-সূচক।

এই ধরনের সাদর সম্ভাষণের জন্যই তো কতকাল অপেক্ষা করেছে সে!

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা; কিন্তু তখনই ঘুম এল না।

তরুর যা হয় হবে কিন্তু এই উপলক্ষে কনক তার পথ দেখতে পেয়েছে।

রানীদিকে বৈরীভাবে দূরে রেখে কোন লাভ নেই। এই প্রসঙ্গ ধরেই, এই পথ দিয়েই স্বামীর অন্তরঙ্গ হ'তে হবে। অন্তরঙ্গতা না জন্মালে কোন দিনই সে তার মনোরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। বরং এই পথটাই সোজা—এতদিন বোকার মতো এড়িয়ে যেত সে। বড়ই বোকামি করেছে, আর না।

সে হেমের পা টিপতে টিপতে যেন কতকটা আপন মনেই বলল, 'রানীদির খুব বুদ্ধি, না?

একেবারে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল হেম।

'বুদ্ধি ব'লে বুদ্ধি—আমি কোন ব্যাটাছেলের অমন বুদ্ধি দেখি নি। আঁচে বুঝে নেয় কথা। এই তো আমাদের সব অফিসের সায়েবদেরও দেখি—একটা কথা 'বোঝাতে ঝিক্কুড় নড়ে যায়। অথচ দ্যাখো হাজার হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে। তাই তো বলি আমি এক একদিন যে, লেখাপড়া শিখলে তুমি জজ ব্যারিস্টার হ'তে পারতে।...... তা হাসে, বলে ভাগ্যিস শিখি নি তাহলে তো এমন ক'রে আমার দেখা পেতে না, দারোয়ানকে কার্ড দিয়ে সেলাম ক'রে ঢুকতে হ'ত!'

এমনিই চলে দীর্ঘক্ষণ। শেষে এক সময় রাতই শেষ হয়ে আসে। ফরসা না হোক —ভোরাই বাতাসে তা টের পায় কনক। তবু সে-ই প্রসঙ্গটা থামতে দেয় না। হেমের উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে এলেই সে নতুন প্রশ্নের ইন্ধন যোগায়—নতুন প্রসঙ্গ তোলে রানীদি সম্পর্কে। নতুন ক'রে আবার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে হেম।

এ খেলা সুখের নয়। এক নারীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সর্বক্ষেত্রেই অপর নারীর অন্তরে বিষদাহের সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে সে দাহের তো কারণই আছে যথেষ্ট। তবু সে থামতে দেয় না। স্বামীর সঙ্গে এত দীর্ঘক্ষণ ধরে এমন ভাবে প্রাণখোলা-গল্প করতে পারবে সে—এও যে তার কাছে কল্পনাতীত। তাই তিক্ততায় যতই অন্তরের পাত্র পূর্ণ হয়ে যাক, বেদনার ভারে মনটা যতই পিষে গুঁড়ো হয়ে যাক—সে যেন আর নিজেও থামতে পারে না। শুনেছে নিম-উচ্ছে ফুলেও মধু থাকে, মৌমাছি তাতে গিয়েও বসে, লেবুর তেতো খোসা দিয়েও নাকি মোরব্বা হয়—তেমনি সেও এই তিক্ততার মধ্যে থেকে স্বামীর অন্তরঙ্গ সাহচর্যের যে মধুটুকু আস্বাদ করতে পায় —সেইটেই পরম লাভ বলে মনে হয় তার।

এই প্রথম তাদের বিবাহিত জীবনে গল্প করতে করতে সারা রাত কেটে গেল। ওঘরে শ্যামার দোরখোলার আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি কনক বেরিয়ে এসে যখন অবসন্নভাবে দাওয়ায় বসে পড়ল—তখন তার সমস্ত শরীর যেন অল্প অল্প কাঁপছে। সে কম্পন সুখের কি বিষাদের, আনন্দের কি ঈর্ষার তা সে নিজেও বুঝতে পারল না।

॥ ৫ ॥

মনে মনে এবং প্রকাশ্যে যতই রানীদির বুদ্ধির তারিফ করুক কনক—সত্যি সত্যিই যে ও চিঠিতে কোন কাজ হবে তা সে আশা করে নি। অন্তত এ শনিবার আসবে না, এটা ঠিক। আরও দু-তিন বার লিখলে হয়ত আসতে পারে সে। অর্থাৎ আরও দু-তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।

তবু সে হেমকে শনিবার দিন বিকেলে বেরোতে বারণ করল।

হেম কপালটা কুঁচকে বলল, 'কেন, তোমাদের জামাই আসবে, তোমরাই আদরযত্ন ক'রো। আমি না থাকাই তো ভাল!'

'তা তো ভাল বুঝলুম। আশা নেই—তবু যদিই এসে পড়ে—জামাই মানুষ, কিছু তো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে! তোমাদের ঘরে তো কিছুই নেই!'

'হ্যাঁ—! ঐ যা ডাল-ভাত হয় তাই খাবে।'

'না না—তা হয় না। একটু মাছ ওর মতো, কি দুটো আলুও অন্তত না হ'লে কী ক'রে চলে!'

এ বাড়িতে আলু কেনার পাট নেই। নতুন আলু যখন খুব সস্তা হয় তখন এক আধদিন হেম নিয়ে আসে পোস্তা থেকে একেবারে পাঁচ সের। কৃপণের ধনের মতো সে-ই রেখে রেখে দীর্ঘকাল ধরে খাওয়া হয়। একটু দাম বাড়লেই সেটুকু কেনাও বন্ধ হয়ে যায়। তখন চলে উঠোন কুড়িয়ে যা বাজার পাওয়া যায় তাই দিয়ে। তা শ্যামার বাড়িতে হয়ও অবশ্য অনেক রকম—থোড় মোচা কাঁচকলা ডুমুর, সজনে ও নাজনে ডাঁটা, সজনে শাক, আমড়া। এ-ছাড়া পুকুরের ধারে ধারে সুষুনি ও কলমী শাক তো অজস্র। এরা তো খায়ই, পাড়ার লোকও অনেকে তুলে নিয়ে যায়। পুঁই কুমড়ো লাউ-

ডগা, এগুলো মধ্যে মধ্যে। কুমড়ো লাউ খুব ফলে না—অল্প জায়গায় এত গাছ, কোনটাই জুত হয় না তাই—তবু মাঝে মাঝে দু একটা মেলে বৈকি। সুতরাং অভাব খুব হয় না আনাজের, আর-একটু তেল কি মশলা পেলে এসব দিয়েও মুখরোচক তরকারী হয়। সেটারও যে একান্ত অভাব। সপ্তাহে পাঁচ-ছটাকের বেশী তেল আসে না। আগে হাসি পেত কনকের, এখন সেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে—সে নিজেও তাই রান্না করে। শুধু ফোড়ন চোঁয়ানোর মতো তেল দেওয়া হয়। শ্যামা নিজেও বলেন, 'তেলের কী স্বদ আছে গা? একটু কাঁচা তেল মুখে দিয়ে দ্যাখো দিকি! সুসিদ্ধ এবং পরিমাণ-মতো নুন—এই তো ব্যান্ননের স্বদ। বড়জোর একটু ঝাল দাও। গন্ধ করবার জন্যে ফোড়ন—ফোড়ন চোঁয়ানোর মতো তেল—এইটুকু দরকার! বেশী ঢেলেই বা লাভ কি?'

সয়ে গেছে সবই, মাছও চায় না সে, তবু মধ্যে মধ্যে একটু আলুর জন্যে মনটা বড় ছট্‌ফট্‌ করে; অথচ আলুই একেবারে দুর্লভ এ বাড়িতে। মেজাজ ভাল থাকলে তবু রবিবার সকালে এক-আধদিন হাতছিপে এক-আধটা মাছ ধরে হেম—কিন্তু আলু কেনার ইচ্ছা বা সাহস তারও নেই।...

হেম কথাটা শুনে চুপ ক'রে রইল। খুব মনঃপুত যে হ'ল না, তা কনক বুঝতে পারল মুখ দেখেই।

সে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'না হয় আধপো একপো আলু এনে রেখে তুমি চলে যাও, তারপর যা হয় ক'রে চালিয়ে নেবো 'খন!'

'না, সে আবার মার কাছে কী বলবে? সতেরো রকম কৈফিয়ৎ। দ্যাখো আসে কিনা—এলেও খায় কি না, শুধু শুধু কতকগুলো খরচান্তর ক'রেই বা লাভ কি!' ...দেখি একটু—'

হেম বাইরে যাবার জন্য কাপড় কোঁচাচ্ছিল—এ বিলাসটুকু তার আজও আছে, শনিবার দেশী কাপড় পরে বিকেলে কলকাতায় যাওয়া—কোঁচানো শেষ ক'রে সেটা আবার সযত্নে তুলে রেখে টান হয়ে শুয়েই পড়ল বিছানাতে।

এত অল্পে যে সে রাজী হবে তা কনক ভাবে নি। সাধারণ দিনে তো নয়ই, সামান্য জল-ঝড়েও তার এই বেরনো আটকানো যায় না। এও এক রকমের জয় তার।

সে একটু মুখ টিপে হেসে বলল, 'মা যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন আবার, যদি বলেন আজও বেরোল না যে বড়? তা'হলে কী উত্তর দেব? কোনদিনই তো থাকো না, মানে কোন শনিবার—জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

'যা হয় ব'লো। ব'লো যে মাথা ধরেছে একটু। হয়ত পরে যাবে। কিংবা কিছুই বলে কাজ নেই। ব'লো যে আমি কি জানি!'

এই বলে সেও হাসল একটু। হয়ত অকারণেই।

আসলে তারও এ কদিনে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সে যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করেছে কনককে। ওর সঙ্গেও যে গল্প ক'রে সুখ হয়, অনেক রাত পর্যন্ত জেগেও গল্প করা চলে—এটাই যেন একটা আবিষ্কার।

আর তার এই সামান্য পবিরর্তনের ফাঁকেই কখন যে কনক তাদের গল্প করাটাকে সুকৌশলে রানী বৌদি থেকে প্রসঙ্গান্তরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েও তাকে জাগিয়ে রাখছে গত দুদিন, তাও লক্ষ্য করে নি। অত জানতও না সে, কনকের মনেও যে এত কথা উঠতে পারে, তারও যে এত কৌশল জানা, এত বুদ্ধি থাকা সম্ভব—এ তাকে কেউ বলে দিলেও বোধ করি সে বিশ্বাস করত না।

এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা এবং বেশ ভাল লাগছে—এইটুকুই শুধু জানত।

তাই অন্য শনিবারে বেরোতে না পারলে যতটা অসহ্য মনে হ'ত আজ আর ততটা হ'ল না। বরং আজ একটু আলস্য করতে ভালই লাগল যেন। কদিনই রাত্রে যথেষ্ট ঘুম হচ্ছে না—শোবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটোও বুজে এল সহজেই।

নিশ্চিন্ত হ'ল কনক। তৃপ্তও হ'ল। ঘরে যদি বাঁধতে পারে একবার, মনেও পারবে। আর ঘরের লোক কোনদিনই ঘরে না থাকলে যেন খাঁ-খাঁ করে—সে যদি ঘরে শুয়ে ঘুমোয় তাও ভাল।

সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল।

ঠিক সেই সময় বাগান থেকে একরাশ শুকনো আমড়া পাতা ও বাঁশ পাতা নিয়ে বাড়িতে ঢুকছেন শ্যামা। ওকে দেখেই—কনক যা আশঙ্কা করেছিল—উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁগা বৌমা, হেম যে আজ এখনও বেরোল না বড়? সাড়ে চারটের গাড়ি তো যাবার সময় হয়ে এল প্রায়! এতক্ষণ তো কোন শনিবার থাকে না। শরীর-টরীর খারাপ হয় নি তো?'

গুছিয়ে কি উত্তর দেবে ভাবছে কনক—এমন সময় বাইরে থেকে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শোনা গেল—'সীতা আছিস নাকি রে, সীতা?'

'ওমা, জামাই!'

এতখানি জিভ কেটে দুড়দুড় ক'রে পালিয়ে গেলেন শ্যামা খিড়কীর বাগানের দিকে। কারণ এই পাতা কুড়নোর সময়টা তিনি যে বেশ ধারণ করেন, তাতে কোনমতেই জামাই বা কুটুমসাক্ষাতের সামনে বেরনো যায় না। একটা গামছা বা হেমের অফিস থেকে আনা দুসুতির টুকরো পরেন এবং একটু ছেঁড়া ন্যাকড়া-গোছের গায়ে দেন। অনেকে এ নিয়ে অনেক অনুযোগ করেছে কিন্তু তিনি গায়ে মাখেন না। বলেন, 'হ্যাঁ, বুড়ো হ'তে চললুম—বিধবা মানুষ—আমাদের আবার অত বেশভূষা কি গা? কী থাকে না পাতায়, কুকুর বেড়ালের গু থেকে সত্তিক জাতের এঁটো—মাছের কাঁটা পাঁঠার হাড়—চান তো করতেই হবে, মিছিমিছি একটা কাপড় ভেজাই কেন?'

আবার ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে ডাকে হারান, 'কৈরে সীতি, কোথায় গেলি!'

অর্থাৎ দাদাকে ডাকবে না। এত লোক থাকতে বৌদিকে ডাকাও ভাল দেখায় না।

কনক শাশুড়ীর সরে যাওয়ার অপেক্ষা করছিল। এইবার সে বেরিয়ে এল. 'আসুন আসুন, ঠাকুরজামাই। আসুন।'

'হ্যাঁ—এই তাই আপনার জোর তলবেই ছুটে আসা। তা যা বলব, আদরযত্ন আর কি, খাওয়া তো আজ খেলে কাল ময়লা, মুখের মিষ্টি কথাই লোকে মনে রাখে। তা সেটা আপনার আছে খুব। বড় বংশের মেয়ে আপনি, আপনার কথাই আলাদা।'

কথা বলতে বলতেই ভেতরে এসে দাঁড়াল। কনক ছুটে গিয়ে ঘর থেকে একটা আসন এনে দাওয়ায় পেতে দিল, 'বসুন ভাই। তা মিষ্টি কথায় কি আর আপনার সঙ্গে তা বলে পারব? মুখ্যু সুখ্যু মানুষ। আপনারা নাটক নভেল পড়া লোক, গা গুছিয়ে বলতে পারেন—'

এ কামড়ের দিক দিয়েও যায় না হারান। উদ্দীপ্ত হয়ে বলে, 'না না বৌদি ওসব নাটক নভেল টভেল আমি বুঝি না, আমিও থার্ড ক্লাস পড়া লোক, কোন মতে আপনাদের আশীর্বাদে করে খাচ্ছি। আমার স্বভাব একেবারে অন্য রকম, পেটে এক মুখে এক নই—যা মনে আসে বলে দিই, ব্যস খালাস!'

কনক ভাবছে অন্য কথা। মা ওদিক দিয়ে পুকুরে গেছেন—কিন্তু আসবার এই পথ। হয় জামাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরে বসিয়ে এদিকের দোর জানলা

বন্ধ ক'রে দিতে হয়—নয় তো একখানা কাচা ভাল কাপড় ঘাটে দিয়ে আসতে হয়। অথচ জামাইকে ফেলে যাওয়া—এখনই একটা দুটো কথা না বলে—সেটাও ভাল দেখায় না।

তরু যথারীতি জানলাতেই ছিল। প্রথম ডাকটা কানে যেতেও বিশ্বাস করে নি। ভেতরে ঢুকতে দেখে ছুটে গিয়ে ঘরে দাঁড়িয়েছে—কনক যখন আসন আনতে গিয়েছিল তখন দেখে এসেছে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে সে দাঁড়িয়ে। তার দ্বারা কোন কাজ হবে না। সীতাও ঘুমুচ্ছে, ঐন্দ্রিলাও ঘরে নেই।

হারান কিন্তু বলেই চলেছে, 'অনেক ভাবলুম চিঠি পড়ে, বুঝলেন বৌদি, কী কর্তব্য। ভাবলুম হাত যখন একবার ধরেছি শালগ্রামশিলা সাক্ষী ক'রে, ওর নাম কি ওর গর্ভে যখন আমারই বংশধর—তখন আমার উচিত ওকে দেখা।'

কী একটা আওয়াজ হ'ল না? কনক কান খাড়া ক'রে থাকে। কিন্তু হারানের কথার মধ্যে চলে যাবার মতো ফাঁকও যে পাওয়া যাচ্ছে না।

হারান বলছে, 'ও ছেলেমানুষ, বোকার মতো একটা কাজ করেছে—তাই বলে আমিও ছেলেমানুষী করব? তা হ'তে পারে না। বাড়িতে ফিরে এসে বললুম, আমি ওখানে যাচ্ছি—তা তিনি তো একেবারে দশবাই চণ্ডী—বুঝলেন না? মরুক গে, মেয়েমানুষ চেঁচায়ই, তা আমি কি আর সে জন্যে কর্তব্যভ্রষ্ট হব! চলে এলুম সটান—সামনে দিয়েই।......মোদ্দা সকাল ক'রে ফিরতে হবে বৌদি—জরুরী রিয়ের্সাল আছে ক্লাবে, না গেলেই নয়!

'ও মা, তাই কখনও হয়! কনক আরও কি বলতে যাচ্ছিল, ভেতর থেকে সীতার নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ও মামী শিগ্‌গির এসো, ছোট মাসীর আবার ফিট হয়েছে!'

'ঐ, চলুন চলুন—একেবারে ভেতরেই চলুন।' তারপর ঘরে ঢুকে পাখা খোঁজবার ছল ক'রে সীতাকে চুপি চুপি বলে, 'শিগ্‌গির তোর দিদিমার কাপড়টা ঘাটে পৌঁছে দিয়ে আয় মা!'

অত বেলা অবধি ঘুমোনোর ফলে সীতার তখনও আচ্ছন্ন বিহ্বল ভাবটা রয়েছে, সেটা বিকেল কি সকাল—ভাববার চেষ্টা করছে প্রাণপণে—সে বেশ কলরব ক'রেই প্রশ্ন করল, 'কোন্‌টা মামীমা—পাঁচিধুতিটা? ঐটেই তো পরে সকালে!'

'না রে, কাচা থানটা!' থানটা আনলা থেকে পেড়ে ওর হাতে গুজে দিয়ে একরকম ঘর থেকে ঠেলেই দেয়।

ততক্ষণে হারান নিজেই কলসী থেকে খানিকটা জল হাতে ক'রে নিয়ে মুখে ছিটোচ্ছে তরুর, 'ইস, এমন হাল হয়ে গেছে! এ যে চেনাই যায় না। খেত না মোটে—নাকি? দেখুন দিকি; একে বলে ছেলেমানুষি! ছি ছি! পেটে একটা আছে, তার কথাও তো ভাবতে হয়। কি দরকার ছিল এত কাণ্ডর বলুন তো। আসবারই বা কি দরকার, এলেও, তখন চলে গেলেই হ'ত। আমি দেখছি আপনার—এক আপনারই এর মধ্যে স্থির বুদ্ধি, ভাল বুদ্ধি! ঐ তো—ঠাকমার তো বিষ-দাঁত ভেঙ্গে গেছে, গেল হপ্তা থেকে পক্ষাঘাত হয়ে বাঁ দিকটা পড়ে গেছে একদম, বিছানায় শুয়ে যা কিছু। আমার তিনি তো দুবেলা গঞ্জনা দিয়ে তবে কন্না করছেন। এখন চুপ একদম, শুধু পড়ে পড়ে কাঁদছে। সামনে গাল দেবার সাহস আর নেই, দিলেও আড়ালে—বুঝলেন না!'

ততক্ষণে তরুর জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসে মাথায় ভিজে কাপড়টাই টেনে দিলে।

'উঁহু-উঁহু, উঠো না। উঠো না। আর ভিজে আঁচলটাই বা মাথায় দেবার দরকার কি? অসুখ করবে যে! ঘরে কে আর আছে—বুঝলে না—বৌদি তো ঘরের লোক। সত্যি, অনেক পুণ্যি করে বৌদি পেয়েছিলে—বুঝলে—না—'

কনক মুখ টিপে হেসে সেইখানেই একখানা আসন পেতে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'আসল ঘরের লোকটিকে নিয়ে এখন থাকুন ভাই, নকল ঘরের লোক এখন কাজে যাচ্ছে!'

বাইরে তখন শ্যামা অনেকটা সাব্যস্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন বটে, কিন্তু মুখ তাঁর আষাঢ়ের মেঘের মতো অন্ধকার!

কনক উঠোনে নেমে কাছে যেতেই চাপা অথচ তীক্ষ্ম কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'সে-ই চিঠি পাঠানো হয়েছিল বুঝি—আমার কথাটা অগেরাহ্যি ক'রে?'

সে কণ্ঠস্বরে কনকের বুক শুকিয়ে উঠল। আসল কথাটা বলতে সাহস হ'ল না—একেবারে মিথ্যাও বলতে পারলে না, ঢোঁক গিলে লেখার কথাটা পাশ কাটিয়ে গিয়ে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'উনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।'

'হুঁ। তা তো দেবেনই। বড় বৌদি বলেছেন, সে যে বেদবাক্যি— গুরুমন্তর একেবারে। আমি বেটি কে, ঘুঁটে-কুড়ুনী কানিপরা দাসী বৈ তো আর নই!'

তাঁর এই অযৌক্তিক বিষোদ্গার দেখে অবাক হয়ে যায় কনক। এবাড়িতে এসে পর্যন্ত মানবচরিত্রে তার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে কিন্তু আজকের এটা একেবারে নতুন। মা সন্তানের সুখে সুখী নন, তার জীবন, তার ভবিষ্যতের চেয়ে তাঁর কাছে তাঁর অত্যন্ত তুচ্ছ একটা কর্তৃত্বের প্রশ্নই বড়—এরকম এখনও ভাবতে অভ্যস্ত নয় সে, তাই তার অবাক লাগল। কিম্বা ঠিক কর্তৃত্বর প্রশ্নও নয়—বুদ্ধির অহংকারে আঘাত লাগলে বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেই এমনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, কে জানে।

সে কোনমতে ও'কে এড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল।

হেম উঠে তখনও বিছানাতেই বসে আছে চুপ ক'রে। তার মুখ প্রসন্ন। তরুর ভবিষ্যতের চেয়েও তার বর্তমানের চিন্তাটাই পাষাণ-ভার হয়ে চেপে বসেছিল মনে, সেই ভারটাই নেমে গেছে। রানী বৌদির কথাটা ফলেছে, তৃপ্তি সে জন্যেও।

ওকে ঢুকতে দেখে বলে, 'তাহ'লে ছটাকখানেক কাট্‌া মাছ নিয়ে আসি, আর দুটো মিষ্টি—কি বলো?'

'তাই আন। কিন্তু দোহাই তোমার—চিঠিটা যে আমি লিখেছিলুম, মাকে যেন ব'লো না!'

'জানি।' বলে মুখ টিপে হেসে বেরিয়ে যায় হেম।...

হারানের যে জরুরী রিহার্সাল আছে ক্লাবে, তখনই যাওয়া দরকার—সে কথাটা আর তার মনে রইল না। বলা বাহুল্য, এরাও কেউ মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করল না।

শাশুড়ী সামনে এসে দাঁড়াতে খুব সহজভাবেই তাঁকে প্রণাম ক'রে কুশল প্রশ্ন করল। তরুর ছেলেমানুষী প্রসঙ্গে তাকে মৃদু তিরস্কার এবং সাধারণভাবে অনুযোগ করল। অর্থাৎ লজ্জা পাবার মতো কোথাও কিছু ঘটেছে, তা তার আচরণে আদৌ প্রকাশ পেল না।

শ্যামা অবশ্য বেশীক্ষণ বসলেন না, রান্না করার অছিলায় বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে কিন্তু তাতে হারানের উৎসাহ কমল না। ততক্ষণে ঐন্দ্রিলা এসে পড়েছে পাড়া বেড়িয়ে। সে তাকে নিয়েই পড়ল। তা ছাড়া সীতা কনক—এবং নীরব নত-মুখী তরু তো আছেই—গল্প করার লোকের তার অভাব ঘটল না।

হেম একবার মাত্র এসে দাঁড়িয়েছিল। হারান শশব্যস্তে উঠে গিয়ে প্রণাম করল।

তারপর ঘাড় হেঁট ক'রে মাথাটা চুলকে বলল, 'দাদা, অভাগা ছোট ভাইকে মাপ করেছেন তো? রাগের মাথায়—আর তখনও খাওয়া হয় নি বুঝলেন কিনা—এতটা পথ ঠেঙো রোদ্দুরে এসে আর লঘু-গুরু জ্ঞান ছিল না!'

এত সহজে এসব কথা যোগায় না হেমের মুখে। সে একটু মৃদু হেসে আশ্বস্ত করে, 'সব ভালো তো?'—কুশল প্রশ্ন মাত্র ক'রে সরে পড়ল। তখন আর কলকাতা যাওয়া সম্ভব নয়, সে হাত-ছিপটা পেড়ে নিয়ে কেঁচোর সন্ধানে চলল। যদি দু-একটা মাছ ওঠে।

যথা নিয়মে চা জলখাবার—এবং যথা সময়ে ভাতও খাওয়া হয়ে গেল। কনক আগেই বাইরের ঘরে ওদের বিছানা ক'রে দিয়েছিল, মুচকি হেসে বলল, 'যান সটান একেবারে ওঘরে চলে যান। আপনাদের ঐসব ছাই-ভস্ম কি ধোঁয়া-টোঁয়া খাওয়া আছে সারুন গে, ঠাকুরঝি খেয়ে-দেয়ে যাচ্ছে।'

সবকটা দাঁত বার করে হে হে ক'রে হাসে হারান।

'এই তো সব মাটি করলেন বৌদি। মা দাদা সব রয়েছেন—ধোঁয়া খাবার কথাটা চেঁচিয়ে বলে দিলেন!'

'না, তাঁরা তো আর টের পাবেন না। একটু পরেই যে বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোবে—তখন!'

'আরে সে অন্য কথা।'

হাসতে হাসতেই গিয়ে ঘরে ঢোকে।

তার পরের দিনও থাকল সে। একেবারে সোমবার এখান থেকেই খেয়ে-দেয়ে অফিস রওনা হ'ল।

যাবার সময় কনকই প্রশ্ন করল, 'তার পর? আবার মশাইয়ের দেখা পাচ্ছি কবে? ...শনিবার অন্ততঃ আসছেন তো?'

'এ শনিবার নয় বৌদি।' হারান বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলে, 'আপনিই বুঝে দেখুন, তারও তো একটা ক্লেম হয়ে গেল কিনা—নতুন ক'রে। ফি শনিবার এলে কুরুক্ষেত্তর করবে—হয়ত আপিং খাবে কি জলে ঝাঁপ দেবে।...সে আবার বাপের আদুরে মেয়ে--বুঝলেন না! আর আমার কাছে—সর্বদা ন্যায্য বিচার। এক শনিবার তার এক শনিবার এর। বলে কয়েই আসব, নুকোছাপা কিছু নেই তো! হাত যখন ধরেছি—বুঝলেন না?'

'তা—তাঁর তো এই হপ্তার দিনগুলো রইলই!' মৃদুস্বরে তবু কনক বলতে যায়।

'উঁহু, তার নয়—তার নয়। এ দিনগুলো ধরুন ঠাকুমা-মাগীর! সে তো শুষছে। তার কন্না করছে তো—ও। গু-মুত থেকে নাওয়ানো-খাওয়ানো সবই তো করতে হচ্ছে—তবে? তার দরুন একটা বাড়তি ক্লেম তার আছে—বুঝলেন না?'

হে হে ক'রে হাসতে হাসতে চলে গেল হারান।

কনক ফিরে দেখল তরু নিজে থেকেই ও ঘরের বিছানা তুলছে। সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

শুধু শ্যামা কটু কণ্ঠে মৃদু মন্তব্য করলেন, 'খুব হ'ল আর কি! মেয়ে তো বসে রইলই বুকের ওপর বারোমাস—তার ওপর এখন ঘর-জামাই পোষো। একগাদা খরচান্ত শুধু!'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥১॥

গোবিন্দর বৌ রানীই প্রথম কথাটা তুলল।

সেদিন অফিস থেকে বেরোতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল হেমের। সিমলেয় বড় মাসিমার বাড়ি এসে যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই। বড় মাসিমা গেছেন পাড়াতে কোথায় চণ্ডীর গান শুনতে। এ একটা যেন নেশা হয়েছে তাঁর—রোজ যাওয়া চাই। গোবিন্দ তখনও বাড়ি আসে নি। নটার আগে কোন দিনই আসতে পারে না সে, শনিবার ছাড়া। তাও শনিবারও ফিরতে ছটা সাড়ে ছটা বেজে যায়। ইস্কুল সিজন-এ অর্থাৎ শীতকালে কাজের চাপ যখন পড়ে—তখন নটাতেও আসতে পারে না, আরও রাত হয়। সে যখন ফেরে তখন এদের এক ঘুম সারা হয়ে যায়। গোবিন্দ তার এক বন্ধুর ছাপাখানায় কাজ করে। মাইনে কম, কাজ বেশী। কিন্তু তবু এইখানেই কাজ শিখে চাকরি নিয়েছে বলে চক্ষুলজ্জায় বাধে, কাজ ছাড়তে পারে না। সাধারণ ছাপাখানা নয়—মানচিত্র ভূচিত্রাবলী ছাপা হয় সেখানে। দায়িত্বর কাজ, ঝুঁকি অনেক। ছাপাখানার ছুটি না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হয়। কারণ মালিক ছটা বাজলেই বাড়ি চলে যায়—সে ছাড়া ছাপার খুঁটিনাটি গোবিন্দর মতো আর কেউ বোঝে না। সাধারণত সাড়ে আটটা অবধি খোলা থাকে প্রেস—সব বন্ধ ক'রে ফিরতে নটা তো বটেই, দেরিও হয়ে যায়।

সেই সময়টা রানী বৌয়ের নিরঙ্কুশ অবসর। সে সন্ধ্যার আগেই বিকেলের রান্না সেরে নেয়। কারণ মেয়ে আগলানো এক হাঙ্গামা। সে কাজটা ওর শাশুড়ী থাকলে করতে পারেন। কোনদিন হয়ত তিনিই রান্না করেন, ও মেয়ে আগলায় আর ঘরের খুঁটিনাটি কাজ সারে।

রান্না সেরে চুল বেঁধে গা ধুয়ে এলে ওর শাশুড়ী কাপড়-চোপড় কেচে আহ্নিক সেরে বেরিয়ে যান। কোনই কাজ থাকে না হাতে। কেউ না এলে একটু বই-টই পড়ে। পাড়ার লাইব্রেরী থেকে হেমই এনে দেয় বই। হেম এলে বই-পড়া হয় না, গল্পই করে বসে বসে। অবশ্য গল্পটা একতরফাই চলে বেশী। হেম বেশী কথা কইতে পারে না, বিশেষ ক'রে বড়বৌদির সামনে এলে যেন তার সমস্ত কথা ফুরিয়ে যায়। শুধু চুপ ক'রে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বসে থাকে। কথা কইতে ইচ্ছাই করে না তার—মনে হয় সে সময়টা বৌদির কথা শুনলে কাজ হবে।

আজও তাই শুনছিল সে। ঘুমন্ত মেয়েকে একটা পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে কথা বলছিল বড় বৌ, আর হেম সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চক্ষু ও কর্ণে ঘনীভূত ক'রে বসে শুনছিল এবং দেখছিল। শিগ্‌গিরই আবার ছেলেপুলে হবে, সাধ হয়ে গেছে—এখন-তখন অবস্থা। তবু কী দেহের বাঁধুনি, বোঝাই যায় না যে এত ভারী হয়ে এসেছে দেহ। দাঁড়ালে তবু যদি-বা বোঝা যায়—বসে থাকলে একেবারে টের পাওয়া যায় না। এদিক দিয়েও রানীবৌদির বরাত ভাল। পর পর হয়ে ন্যাঙ্গারি হয়ে পড়ে নি। বড়টি বোধ হয় বছর চার-পাঁচের হ'ল—মনে মনে হিসেব করে হেম। যার ভাল হয়, তার সব ভাল।

কথাটা উঠেছিল তরু প্রসঙ্গে। তরুর ঠাকুমা-শাশুড়ী মারা গেছেন—সেই উপলক্ষে, একত্রে অশৌচ পালন করবার নাম ক'রে হারান নিয়ে গেছে তাকে। শ্রাদ্ধশান্তি

মায় জ্ঞাতিভোজন পর্যন্ত মিটে গেছে আজ প্রায় দু-সপ্তাহ হ'ল। তবু সেখানেই আছে। হারানের তরফ থেকে ফিরিয়ে আনবার বা দিয়ে যাবার কোন কথাই ওঠে নি এখনও পর্যন্ত।

'তোমরা কোন কথা তোল নি তো?'

'পাগল!'

'যাক—বোধ হচ্ছে তাহ'লে তোমাদের ঘাড় থেকে ও ভার সরেই গেল। ওরও টানা-পড়েন হচ্ছিল তো—'

'বিশেষ। এদান্তে তো ফি শনিবারেই আসছিল।'

'তার মানে টানটা আছে এর ওপরই। তাছাড়া প্রথম সন্তান—সেটাও একটা চিন্তা আছে তো! ভালই হ'ল। ছোট ঠাকুরঝিরও তো সময় হয়ে এল; কবে বলতে কবে হয়ে পড়বে। তোমাদের কাছে থাকলে ঐ ঝঞ্ঝাটটি পুরো তোমাদের ঘাড়ে পড়ত—আর খরচা। একটা বিয়েন তোলার কি কম খরচা!

এই বলে একটু মুচকি হেসে বলল, 'আমাদের ইনি তো সেই নাম ক'রে জোর ক'রে পঞ্চাশটা টাকা আদায় করেছেন বন্ধুর কাছ থেকে। ধার বলেই চেয়েছিলেন, তা কী ভাগ্যি টাকাটা দিয়ে বলেছে যে ও আর খাতায় লিখতে-টিখতে হবে না।'

'ভালই তো!' হেম বলে।

'হ্যাঁ! কত তো ভাল। আজকাল সবাইকে ওপরটাইম দিতে হয় নাকি বেশী খাটলেই। ছাপাখানার জমাদার থেকে সবাই পাচ্ছে। ও'কে দেয়! দিলে পঞ্চাশ টাকা তো এক মাসেই পাওনা হয়ে যাবে মশাই।'

তারপর আবার হঠাৎ তরুর প্রসঙ্গে চলে যায়।

'তা হ্যাঁ ভাই—ওদের বন্দোবস্তটা কী রকম হবে?'

'কাদের?' অন্যমনস্ক হেম অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

'ঐ ছোট ঠাকুরঝিদের? কে থাকবে আর কে যাবে? পুরনো যিনি তিনি কি আর এখন যেতে রাজী হবেন? অসময়ে এসেছেন!'

'তা জানি না। শুনছি নাকি সেও আছে এখনও। তারও নাকি—'

এই বলে থেমে যায় হেম। সংকোচে কথাটা শেষ করতে পারে না।

'ওমা সেও পোয়াতী! তবেই তো বললে ভাল! তারও তো একটা কেলেম জন্মে গেল তাহ'লে!'

'হুঁ। তাই তো মনে হচ্ছে। আমি জানি না—ও বলছিল। ও তো দু-তিন দিন দেখলে কিনা। ওর ওপর খুব ভক্তি। শ্রাদ্ধের আগের দিন থেকে নিয়ে গিয়ে রেখে-ছিল। বলে বৌদি না গেলে হবেই না।'

'তা তোমার বৌ যদি দেখে থাকে তো ঠিকই দেখেছে। সে বোকা মেয়ে নয় তাহলে কি করবে এখন হারান? দুই বৌ নিয়েই ঘর করবে নাকি?'

'কে জানে!'

'তা সে যাকগে মরুক গে—তোমাদের ঘাড়ে আবার না চাপিয়ে দিয়ে গেলেই হ'ল। যার দায় সে বুঝুক!'

তারপরই—একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিল সে।

'আচ্ছা, ছোট ঠাকুরঝি তো নিজের বাড়ি চলে গেল। খোকাও তো ছোট মাসিমার ওখানে। এবার কান্তি ঠাকুরপোকে বাড়িতে আনিয়ে নাও না! আর কেন ওখানে ফেলে রাখছ।'

চমকে উঠেছিল হেম, 'কান্তিকে? কেন, সে তো বেশ আছে। রাজার হালে আছে।

অমন ভাল ভাল কাপড় জামা পরিয়ে মাস্টার রেখে কি আমরা তাকে পড়াতে পারব!'

'কী দরকারই বা তাকে অমন রাজার হাল অব্যেস করাবার। গরীবের ছেলে গরীবের মতো থাকাই তো ভাল। সেটা তো তার বাড়ি নয়, এইটেই তার বাড়ি, এইখানেই আসতে হবে থাকতে হবে তাকে। তা না ক'রে—অমনি চাল যদি অব্যেস হয়ে যায়, তাহ'লে কি ও লেখা-পড়া শিখলেও তোমাদের কোন কাজে লাগবে?'

হেম চুপ ক'রে থাকে। এমনভাবে কখনও ভাবে নি সে। মাত্র তিন-চার দিন আগে কনকও এই প্রসঙ্গ তুলেছিল—তাকেও চুপ করিয়ে দিয়েছিল ঐ বলে। আশ্চর্য, মনে মনে স্বীকার করে হেম, সহজ সাংসারিক বুদ্ধিটা তাদের চেয়ে এই এক ফোঁটা মেয়েগুলোর কত বেশী।

রানী আবার বলে, 'যতই হোক, ছেলে যতই ভাল হোক—তবু ওসব জায়গায় না রাখাই ভাল। জায়গাটা ভাল নয় বুঝলে...তোমরা বলো বা নাই বলো আমি তো সব জানি। ও বড় ঠাকুরঝির কী রকম ননদ, নন্দাই কী করে—কিছুই আমার জানতে বাকী নেই। তাছড়া সে যেমনই হোক, পাড়াটাই যে খারাপ। মানুষ-খেকো রাক্কুসীর পাড়া! অমন সোনারচাঁদ ভাই তোমার—কার নজরে পড়বে, ইহকাল-পরকাল সব যাবে।'

'কিন্তু দুদিন পরে কলেজে পড়ার কথা। তখন তো আমরা আর কিছু করতে পারব না। সে তো হাতীর খরচ!'

'কিসের হাতীর খরচ এমন। এখন তো তোমার সংসার হাল্‌কা হয়ে এল। কোনমতে কলেজের মাইনেটা টানতে পারবে না? বই তো কত ছেলে শুনেছি চেয়ে-চিন্তে, হাতে-লিখে নিয়ে কাজ চালায়। ভাল ছেলে, চাই কি বিনা মাইনেতেও পড়তে পারবে, জলপানি পায় তো কথাই নাই। এখন আর কেন পরের বাড়ি ফেলে রাখা অমন ক'রে। বলি সে দৈন্যদশা তো আর তোমাদের এখন নেই!'

'তা নেই, তবুও—! অনেক খরচা শুনেছি। তবে ঐ যা বলেছ, জলপানি একটা পেতে পারে। ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছিল ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে!'

'তবে! সে তো আমিও শুনেছি। তাহ'লে জলপানি নিশ্চয় পাবে, দেখে নিও!'

তারপরই বুঝি কথাটা মনে পড়ে যায় তার।

'আচ্ছা, এই ফার্স্ট ক্লাসে ওঠার কথা তো কবে শুনেছি। তার তো এবার এগ্‌জামিন দেবার কথা।'

'এবারই তো দেবে!' নিশ্চিন্ত হয়ে জবাব দেয় হেম।

'দেবে কী গো—সে এগ্‌জামিন তো হয়ে গেছে!'

'যাঃ!' অবিশ্বাসের সুরে বলে হেম।

'এই দ্যাখো! কবে হয়ে গেছে। আর বোধ হয় মাস-খানেকের মধ্যেই ফলাফল বেরিয়ে যাবে।'

'সে কী?'

'হ্যাঁ—আমি বলছি। আমার মেজ খুড়তুতো ভাই দিলে না এবার। শেষ দিন দেখা ক'রে গেল। সে তো কবের কথা!'

'সে কি!' আবারও বিমূঢ়ভাবে বলে হেম।

'তোমাদের জানালে না, মাকে পেন্নাম ক'রে এল না—কী কথা!' বড় বৌ বিস্মিত হয়ে বলে, 'তাছাড়া এগ্‌জামিন শেষ হয়ে গেছে, এখন তো বাড়িতে এসেই থাকবার কথা! আর তোমরা খবরও রাখো না! বেশ লোক বাবা তোমরা।'

'তাই তো!' এবার রীতিমতো চিন্তিত হয়ে ওঠে হেম, 'মুস্কিল হচ্ছে এদানি তো আর ছুটিছাটাতে বাড়ি আসত না, এলেও কদাচিৎ কখনও—একদিন দু দিন থেকে

চলে যেত। ওরা পয়সা খরচা ক'রে মাস্টার রেখেছে, মিছিমিছি পড়া কামাই করানো—এই জন্যেই আমরাও কিছু বলতুম না। আর ভাল যে আছে সে তো চেহারা দেখলেই টের পাওয়া যায়—কাজেই আর পেড়াপীড়ি করতুম না। কিন্তু এগ্‌জামিন হয়ে গেল বলছ—অথচ আমরা একটা খবর পর্যন্ত পেলুম না! এইটে যেন বড় খারাপ লাগছে। সত্যিই কি ছেলেটা পর হয়ে গেল নাকি? রতনের ওর ওপর নজর পড়েছে খুবই—যে রকম আদরযত্ন করছিল, পুষ্যিপুত্তুর-টুত্তুর নিয়ে নেয় নি তো?'

এবার খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে বড় বৌ, 'মাইরি ঠাকুরপো, তোমার যা বুদ্ধি, ঘুঁটের মেডেল গড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। নিদেন একটা পেরাইজ!'

'কেন—কী বললুম এমন?' অপ্রতিভ হয় হেম। ভালও লাগে তার। বড় বৌদির কাছে বোকা বনতে দোষ নেই।

'তা নয়! যা শুনেছি আমি বড়-ঠাকুরঝির মুখে, এত কিছু বয়স নয় ওর রতন ঠাকুরঝির যে অত বড় ছেলের মা সাজতে পারে। তাছাড়া পুষ্যিপুত্তুর কেউ অত বড় ছেলেকে নেয়ও না আর তা নিলেও তোমাদের না জানিয়ে নিতে পারে কখনও? আইনে তা টিকবে কেন! তা নয় ফুটফুটে ছেলে—শান্তশিষ্ট, পড়ায় মন আছে—তাই ভালবাসে যত্ন করে।'

তারপর একটু থেমে বলে, 'তা যাই হোক, তুমি বাপু একবার খবর নাও।'

'নেব। তুমি তো আমায় ভাবনা ধরিয়ে দিলে।'

'আবার নেব-তে দরকার কি, আজই যাও না। এখনও তো আটটা বাজে নি!'

'না, আজ হবে না। এখন রামবাগানে গিয়ে দেখা ক'রে কথা কয়ে হাওড়ায় ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। নটা পঁয়ত্রিশ না পেলে একেবারে দশটা চব্বিশ—বাড়ি পৌঁছতে দুপুর রাত।'

'তবু ভাল—বাড়ির ওপর টান হয়েছে একটু!' এক রকমের অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে মুখ টিপে হাসে রানী।

'না, তা নয়। আবার তো সেই ভোরে ওঠা!' অকারণেই লাল হয়ে ওঠে হেম, 'তাছাড়া রাত্রে গেলে ওখানে দেখাও পাওয়া যায় না। দারোয়ান ঢুকতেই দেবে না হয়ত। সে বলাই আছে। গেলে সন্ধ্যের আগে।'

'রতনের সঙ্গে না দেখা হোক—তোমার ভাইকেও ডেকে দেবে না?'

'না—সে ওদের বারণ করাই আছে। মানে একটু পত্তর আড়াল দেয় তো এখনও, সেই ইজ্জতটা নষ্ট করতে চায় না আর কি! তাছাড়া পাড়াটা ভাল নয়, রাত্তির বেলা যেতে ইচ্ছেও করে না—আর দরকারই বা কি, পরশুই তো শনিবার, অফিসের ফেরৎ বাড়ি না গিয়ে এখানে এসে মুখ হাত ধুয়ে চলে যাব এখন—চারটে নাগাদ যাওয়াই ভাল।'

'তাই যেও।'

তারপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে থাকে।

বলার মতো কথা যেন হঠাৎ ফুরিয়ে যায় দুজনেরই।

এ রকম আজকাল প্রায়ই হয়।

বহু দিন বহু ঘণ্টা এমনি ক'রে সামনা-সামনি বসে কাটিয়েছে ওরা, ওদের সংকীর্ণ গণ্ডী বাঁধা জীবনে কী-ই বা এত কথা থাকতে পারে?

আগে নিত্যই আসত হেম, এখনও সপ্তাহে দু-তিন দিন ক'রে আসে। রবিবারে গোবিন্দ থাকে কিন্তু বাকি দিনগুলোতে ওরাই শুধু বসে থাকে—এমনি মুখোমুখি। সুতরাং যতরকম প্রসঙ্গ প্রায় নিঃশেষ ক'রে এনেছে ওরা।

অবশ্য হেমের তাতে আপত্তি নেই। বরং এমনি ক'রে চুপ ক'রে বসে থাকতে পারলেই ও খুশী—এমনি বড়বৌদির মুখের দিকে চেয়ে।

বেশীক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকতে কিন্তু রানীর ভাল লাগে না। তার গা ভারী হয়ে এসেছে, আলস্য করতেই ইচ্ছে করে।

সে একটু পরে বিরাট একটা হাই তুলে বলে, 'ঠাকুরপো, আমি ভাই শুই একটু। কিছু মনে ক'রো না।'

'না না, মনে করব কেন? আমি বরং যাই আজ—তুমি দোর দিয়ে শোও বরং। বড় মাসিমা তো অন্য দিন এসে যান এতক্ষণ, সাড়ে আটটা তো বাজে!'

'মা'র আজ ফিরতে রাত হবে। আজ বুঝি খুল্লনার সাধ গাইবে—মা সব সিধে সাজিয়ে নিয়ে গেছেন। গান শেষ হবে, সিধের থালা আজাড় হবে তবে তো আসবেন! আজ যার নাম সেই ফিরতে নটা স-নটা!'

'তবে আমি যাই—তুমি দোর দাও।'

দোরের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে আসে বড় বৌ। হেম চৌকাঠ ডিঙোতে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে সে ডাকে, 'ঠাকুরপো!'

হেম চমকে পিছনে ফেরে। দৃষ্টিটাও কেমন যেন অদ্ভুত বড় বৌদির।

সে আবার ভিতরে একটা পা দেয়, 'কিছু বলবে?'

'বলছিলুম কি—তুমি কিছু মনে ক'রো না ঠাকুরপো, অনেক ভেবে দেখেই বলছি—বলছিলুম যে তুমি কোথাও বদলির চেষ্টা করো। তোমাদের তো রেলের চাকরি, বদলি হয় শুনেছি। হয় না?'

'সে যারা লাইনে কাজ করে তাদেরই বেশী হয়। আমাদেরও হ'তে পারে—অপর কারখানায়। চেষ্টা করলে অন্য কোন কারখানায় যেতে পারি বটে, আরও দুটো জায়গা আছে। কিন্তু কেন বলো তো?'

বেশ একটু অবাক হয়েই চায় হেম তার দিকে।

ঠিক তখনই উত্তর দেয় না রানী, হয়ত দিতে পারে না। আরও কিছুক্ষণ সেই বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে হেমের মুখের দিকে। সে চাহনি যেন কী রকম। হঠাৎ সে দিকে চেয়ে আজ বড় দীন বোধ করে হেম নিজেকে।

একটু পরে রানী বলে, প্রায় চুপিচুপি, 'আমার কাছ থেকে দূরে কোথাও না গেলে তোমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে ঠাকুরপো, এ মোহ তুমি ঘোচাতে পারবে না। তোমার জীবন শুধু নয়, ভেবে দ্যাখো আরও একটা জীবন যেতে বসেছে। এর আগেও তোমাকে বলেছি, এখনও তোমাকে বলছি, বহু ভাগ্য করলে কনকের মতো বৌ মেলে। ওর দিকটা চেয়ে দ্যাখো, ওর জীবনটা নষ্ট করো না। তুমি দূরে কোথাও চলে যাও কনককে নিয়ে—এক বছর বাইরে থাকলেই এই মোহটা চলে যাবে, বৌকে নিয়ে সত্যি-কারের সুখী হ'তে পারবে। শুধু শুধু—। ভেবে দ্যাখো, কোন লাভ তো নেই!'

কথাটা শুনতে শুনতে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল হেমের মুখ। সেটা ডবল-পলতের বড় টেবিল-ল্যাম্পের আলোতে রানীর চোখ এড়াল না। মনে হ'ল যেন কে এক ঘা চাবুক মেরেছে হেমের মুখে- এমনি করুণ আর অসহায় দেখাচ্ছে তাকে।

এই ভয়েই—এই রকম মর্মান্তিক আঘাত লাগবে তার বুঝেই—বহুদিন বলতে গিয়েও বলতে পারে নি সে। কিন্তু আজ সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে মিছিমিছি, অনেক অপরাধ তার জমে যাচ্ছে তারই মতো আর একটা মেয়ের কাছে। আর না!

অনেকক্ষণ পরে, যেন অসাড়-হয়ে-যাওয়া জিভে কিছুক্ষণ ধরে শক্তি সঞ্চয় ক'রে

নিয়ে হেম আস্তে আস্তে বলে, 'আমি যে এখানে এমন ক'রে আসি—তাতে তুমি বিরক্ত হও!'

এতখানি জিভ কেটে রানী একেবারে ওর হাত দুখানা চেপে ধরল, 'ছি ছি! স্বপ্নেও তা ভেবো না। এক-এক সময় মনে হয় তোমার মতো আমার কোন সোদর ভাই থাকলেও তাকে আমি এতটা স্নেহ করতে পারতুম না। আমার এখানে কে আছে বলো। একা-একা মুখ বুজে থাকা বুড়ো শাশুড়ীকে নিয়ে—এই তো। তবু তুমি আস, গল্পে-গুজবে হাসি-ঠাট্টায় আনন্দের মধ্যে দিয়ে সময় কেটে যায়—টেরও পাই না। কিন্তু আমার ভাল লাগে সেটা বড় কথা নয় ঠাকুরপো, তোমার আর তোমার বৌয়ের সারা জীবনটা পড়ে রয়েছে, সেই কথাটা একবার ভাবো!'

'আমি—আমি তো এখন আর ওকে অযত্ন করি না।'

'তাও আমি জানি।' একটু হেসে বলে রানী, 'তুমি কি আমার চোখ এড়াতে পার! আমি বলছি—তোমাদের মধ্যে আমি যতদিন থাকব তোমরা ঠিক সুখী হ'তে পারবে না। তাই বলছি কিছু দিনের জন্যে অন্তত তুমি সরে যাও!'

আবারও কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হেম। কিছু যেন তার মাথাতে ঢুকছে না। কতকটা বজ্রাহত তাল গাছের মতো অবস্থা তার—দাঁড়িয়ে আছে খাড়া হয়ে বটে কিন্তু কোথাও যেন কোন প্রাণলক্ষণ নেই, ভেতরকার সবটা ঝলসে গেছে।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে আবার বুঝি তার জিভে সাড় ফিরে এল।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও চেপে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, চেষ্টা করব।'

কিন্তু তার সেই রক্তহীন বিবর্ণ মুখ আর দীপ্তিহীন চোখের দিকে চেয়ে রানীই এবার ব্যাকুল হয়ে উঠল। তার আঘাতটা যে এমন ভাবে বাজবে তা বোধ হয় আগে অতটা ভাবে নি। নিজের এই নিষ্করুণ হিত-বাক্যের প্রতিক্রিয়া নিজের মধ্যেই হ'তে শুরু করেছে।

সে আবারও হেমের হাত দুটো ধরে ফেলে বলল, 'আমার ওপর রাগ করলে ঠাকুরপো?'

'না। রাগ করব কেন, তুমি তো আমার ভালর জন্যই বলেছ।'

'না না, মাইরি ঠাকুরপো, ও সব ভদ্দর্তা কথা রাখো। ঠিক ক'রে বল তো!...তুমি বরং একটু বসে যাও, মা আসুন। নইলে আমার মনে হবে রাগ ক'রে চলে গেলে! ...কী বলতে কী বলে ফেললুম, না বললেই হ'ত।...এখন আমার দুর্ভাবনায় সারা রাত ঘুম হবে না।...একটু ব'সো। বরং কাগজ জ্বেলে একটু চা ক'রে দিই, খেয়ে যাও!'

তার এই ছেলেমানুষী আকুলতায় হেসে ফেলল হেম। ম্লান হাসি, তবু তাতেই ক্ষমার চেহারা দেখতে পেল রানী। যে যথার্থ ভালবাসে সে কোন অপরাধই ক্ষমা না ক'রে পারে না।

হেম ততক্ষণে কণ্ঠস্বরকেও অনেকটা আয়ত্তে এনেছে। হাসি-মুখেই বলল, 'ভয় নেই। রাগ-টাগ কিছুই না। আজ আসি—তুমি দোর বন্ধ ক'রে শুয়ো পড়গে। পরশু তো আসছি, সেই দিন এসে চা খেয়ে যাবো বরং—'

সে আর দাঁড়াল না। রাস্তাতে পড়েও প্রায়-বিকল পা-দুটোকে যথাসম্ভব টেনে টেনে দ্রুতই চলবার চেষ্টা করল।

এর অনেকক্ষণ পরে ট্রেন থেকে নেমে যখন বাড়ীর পথ ধরল তখন কিন্তু মনে হ'ল পা দুটো বেশ স্বাভাবিকভাবেই চলছে। কিছু পূর্বের সে দুর্বলতা আর নেই।

অন্ধকার বিজন পথ। বাজারের কাছে না গেলে, পোলটা না পেরোনো পর্যন্ত কোথাও আলো পাবে না। চারিদিকের ঝুঁকে-পড়া বহু বিচিত্র গাছের ছায়ায় নক্ষত্রের আলোও এসে পৌঁছবার উপায় নেই। নভেলের ভাষায় একেই বুঝি বলে সূচীভেদ্য অন্ধকার। কিন্তু, হেমের মনে হ'ল নভেল যারা পড়ে সেই শহরের মানুষরা কখনই এ অন্ধকার কল্পনা করতে পারবে না।

আলো অবশ্য আছে, জোনাকীর আলো। কিন্তু তাতে পথ দেখা যায় না—বরং আরও দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। তবে হেমের বিশেষ আর অসুবিধে হয় না। অনেকেই, যাদের ফিরতে রাত হয়, তারা স্টেশনের কাছে দোকানে লণ্ঠন রাখার ব্যবস্থা করে, ফেরার পথে আলো জেবলে নেয়। হেমের অত ঝঞ্ঝাট ধাতে সয় না। নিত্য গিয়ে গিয়ে অভ্যাসও হয়ে গেছে তার, অন্ধকারেই বেশ চলতে পারে।

আজ বরং কলকাতা থেকে এসে এই অন্ধকারটাই বেশ ভাল লাগল। হঠাৎ কেমন মনে হ'ল ঐ কোলাহল আর উজ্জ্বল আলোর মধ্যে সে হারিয়ে গিয়েছিল, এখানে এসে আবার তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, নিজেকে দেখতে পাচ্ছে সে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে কখন ডান দিকে বেশী বেঁকে গিয়ে পড়েছিল—টের পায় নি। একটা বাঁশের ডগা মাথায় লাগতে খেয়াল হ'ল তার। ভাগ্যিস চোখে লাগে নি। হেঁট হয়ে সেটা বাঁচিয়ে আবার রাস্তার মাঝখানে এসে পড়ল। নিত্য মানুষের চলাচলে এই মাঝখানটাই পরিষ্কার থাকে, একটা মানুষের সমান উচ্চতার মধ্যে কোন ডাল-পালা এসে পড়তে পারে না।

সোজা ফাঁকা পথে পড়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে চলতে এতক্ষণ পরে ভরসা ক'রে সে রানীবৌদির কথাটা মনে করল। ওখান থেকে বেরিয়ে অবধি প্রাণপণে ও প্রসঙ্গটাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিল। জোর ক'রে ভাবছিল বা ভাববার চেষ্টা করছিল অন্য কথা। অফিসের কথা—ছোটসাহেব বদলি হয়ে যাচ্ছে, চাঁদা দিতে হবে ফেয়ার-ওয়েলের। বাজার—পোস্তা থেকে অনেক দিন ডালের ক্ষুদ আনা হয় নি। একটা গরু পুষলে কী হয়? এ ছাড়া তরু, হারান, ঐন্দ্রিলা, খোকা, ছোট মাসী—সকলের কথা মনে আনবার চেষ্টা করেছে রানী ছাড়া। তার কথাটা মনে আনতে সাহস করে নি—যদি আরও দুর্বল হয়ে পড়ে? যদি না স্বাভাবিক ভাবে পথ চলতে পারে?

কিন্তু এখন ভেবে দেখল সে। রানীবৌদি, তার প্রস্তাব—তার মৃদু তিরস্কার, সবই। একে একে সন্ধ্যার সব কথা ও ঘটনাগুলো ভেবে নিল। না, সত্যিই তার ওপর রাগ করে নি ও। এমন কি ক্ষুণ্ণও তেমন হয় নি। আশ্চর্য। নিজের পরিবর্তনে নিজেই যেন খানিকটা অবাক হয়ে গেল। এ কী কনকেরই প্রভাব? ঠিকই বলেছে বড়-বৌদি। নিজে থেকে হয়ত এ মোহ সম্পূর্ণ দূর করতে পারত না কোন দিনই—ভালই হ'ল ওদিক থেকে কথাটা উঠল। সত্যিই তো, কী লাভ হচ্ছে দিনের পর দিন এই কাঙালপনা ক'রে, এই ভিক্ষাপাত্র ধরে থেকে। কী পাচ্ছে সে?

মনে পড়ল আর একটা দিনের কথা। নলিনীর বাড়ি থেকে যেদিন বিতাড়িত হয়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল সেই দিন সেই মুহূর্তটার কথা। ওঃ কী কষ্টই হয়ে-ছিল সেদিন। মনে হয়েছিল বুঝি আর বাঁচবেই না সে। আত্মহত্যাই করত হয়ত, নলিনীকে দেখার আশাতেই বুঝি মরতে পারে নি। তরুণ বয়সের প্রথম প্রেমের ব্যাকু-লতা মনে করলে আজ হাসি পায় বটে—কিন্তু নলিনী তাকে অনেক দিয়েছিল। তার মতো সে ভালই বেসেছিল ওকে।

তবু সেও দৈন্য আর কাঙালপনা ছাড়া আর কিছু নয়। এও তাই। না, চিরদিন ধনীর প্রাসাদের বাইরে ভিখারী হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু লাভ নেই। ওখানের উজ্জ্বল

আলো ওর কি কাজে আসবে? তার পর্ণকুটিরের মাটির প্রদীপই ভালো। সে স্নিগ্ধ আলো কাজে সহায়তা করবে, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করবে না।...

পোল পেরিয়ে বাজারে এসে পড়ল সে। হারাধন নন্দী বসে এখনও হিসেব করছে। ভোঁদার দোকানে ভিয়েন চলছে এখনও।

হঠাৎ মনে হ'ল বিস্মৃত অতীত কোন জীবন থেকে বর্তমানে এসে পড়ল সে! তার আসল জীবন, বাস্তব জীবন।

না, কালই সে বদলির চেষ্টা করবে অফিসে গিয়ে।

॥ ২ ॥

শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ল না এদের, কান্তির খবরের জন্যে। শুক্রবার বিকেলে মহাশ্বেতাই এল ছুটতে ছুটতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে।

'বলি তোমার গুণধর ছেলের কাণ্ডটা শুনেছ! ছি ছি, কি কেলেঙ্কারটাই করলে আর কী মুখটাই পোড়ালে!'

বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতেই কথা বলতে শুরু করে সে। তারপর বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে।

আলো বেশীক্ষণ পাওয়া যাবে বলে আজ বাইরের ঘরের রকে এসে বসেছিলেন শ্যামা। কাজটাও একটু নতুন ধরেছিলেন আজ—চিরাচরিত পাতা চাঁচা বা গামড়া থেকে পাতা ছাড়ানো নয়—কাঁথা সেলাই করতে বসেছিলেন। অনেকগুলো ছেঁড়া কাপড় জমেছে, এদিকে আর হাত না দিলেই নয়। সামনে শীতকালেই দরকার হবে। পুরনো কাঁথা সবই প্রায় ছিঁড়ে এসেছে, সে এখন বিছানায় পাতা চলবে আরও দু-এক বছর—কিন্তু গায়ে দেওয়া চলবে না আর।

'গুণধর ছেলের কাণ্ড' বলতেই বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠেছিল শ্যামার—ছুঁচটাও হাতে বিঁধে গিয়েছিল সজোরে—কিন্তু তবু কোন্ গুণধর ছেলে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি কদিন ধরে ভাবছিলেন খোকার কথাই। উমা তো ফেরে রাত নটার সময়—খোকা ইস্কুল থেকে ফেরে চারটেয়। তারপর যে কী করে তা কে জানে! হয়ত যত রাজ্যের পাড়ার ছোটলোকদের ছেলেদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলে, কি কী করে তার ঠিক কি! হয়ত কোন দিন বিড়ি খেতে শিখবে। শরৎ জামাই আছেন বটে তা তিনিও তো রুগ্ন, বসে বসে হাঁপান। তিনি কি আর অত বড় ছেলের ওপর নজর রাখতে পারেন?

ভয় যেটা মনে প্রবল ও প্রধান হয়েছিল সেইটেই মুখে বেরিয়ে গেল, 'খোকা?'

'খোকা কেন গো! তোমার গব্বের সেরা যিনি—যিনি তোমার মুখ ওজ্জ্বল করবেন! কান্তিচন্দর!...বাবা,, আমড়া গাছে কি আর ন্যাংড়া ফলে, বাবা এদান্তে বলত ঠিকই। কচুর বেটা ঘেঁচু—বড় জোর মান।'

মহাশ্বেতার ধরন দেখে মনে হ'ল যেন পরমাত্মীয়ের দুঃসংবাদ নিয়ে আসে নি—কোন শত্রুর মহাসর্বনাশের আনন্দসংবাদ বহন ক'রে এনেছে। ঠিক তেমনি বিজয়দীপ্ত চাহনি তার, তেমনিই উল্লাস।

আসলে তার সন্তানরা লেখাপড়া শেখে নি বা শিখছে না বলে এঁরা যত কথা শুনিয়েছেন, তার জ্বালাই মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। দুর্বল মানুষকে তার আত্মদোষ দেখিয়ে দিলে প্রতিকার করতে পারে না সংশোধন করতে পারে না—কিন্তু যে দেখিয়ে

দেয় তার ওপর বিশ্বিষ্ট হয়ে থাকে। তার ছেলেদের লেখাপড়া শেখার কোন ব্যবস্থাই করতে পারে না সে—সব চেয়ে বড় কথা তার তেমন প্রয়োজনও বোঝে না—তবু এ'দের গঞ্জনা ও বিদ্রূপের জ্বালাটা পোষণ ক'রে রাখে। আজ যেন তার সেই শোধ নেবার দিন এসেছে।

শ্যামা কিন্তু কান্তির নাম শুনে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যান। কি হয়েছে, কী করেছে সে প্রশ্নও করতে পারেন না।

কনক ওধারে কি কাজ করছিল, বড় ননদের আওয়াজ পেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল. সে-ই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল, 'কী হয়েছে বট্ ঠাকুরঝি?'

প্রশ্ন করে আর মনে মনে কাঁপতে থাকে। দুঃসংবাদের কী আর শেষ হবে না! এদের বাড়িতে দুঃসংবাদও যা আসে কখনও ছোট তো আসে না কিছু—একেবারে মহাবিপদের বার্তা নিয়েই আসে।

'হবে আর কী বলো—কান্তিচন্দ্র তোমাদের ফেল ক'রে বসে আছেন?'

'ফেল করেছে! কান্তি ফেল করেছে!' বার দুই বিহ্বলের মতো প্রশ্ন করেন শ্যামা।

বিশ্বাস হয় না কিছুতেই। বিশ্বাস করার কথাও নয়। গতবারেও যে ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেছিল! প্রাইজ পেয়েছিল। প্রাইজের বই এখানেই রেখে গেছে সে। এখনও রয়েছে ও-ঘরে।

'তার যে এবার পাস দেবার কথা!' কনক প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ গো—পাস দেবারই তো কথা। তা ঐ বড় পাসের আগে একটা কি ছোট পাসও দিতে হয়—তবে বড় পাস দিতে যেতে দেয় তো, সেই পাসই দিতে পারে নি—সব বিষয়ে নাকি ফেল করেছিল।'

'কিন্তু তা কী ক'রে হবে ঠাকুরঝি! গত বছরেই সে প্রথম হয়েছে সে কি ক'রে সব বিষয়ে ফেল হ'তে পারে! হয়ত খুব ভাল না হ'তে পারে, হয়ত দুটো-একটায় দৈবাৎ ফেল হ'তে পারে—তাই বলে সবেতে ফেল! পাসের এগ্‌জামিনেই বসতে দেবে না?'

'সে এগ্‌জামিন তো কবে হয়ে গেছে। সে কী আর বাকী আছে তোমার!'

'কিন্তু সে কী রকম ক'রে হ'ল বট্‌ঠাকুরঝি! আপনি শুনলেন কার কাছে?'

'আবার কার কাছে। খোদ তোমার নন্দায়ের কাছে। মিথ্যে বলবার বান্দা সে নয়। তারও খুব দুঃখ হয়েছে। তার মুখটাও তো পুড়ল। বড় মুখ ক'রে রেখে এসেছিল। আসলে ওরই ভুল হয়েছে. আমার ননদ ভালমানুষ হ'লে কি হবে—পাড়াটা যে খারাপ। ছেলে তো বকে যাবেই।'

সেই প্রথম একটি বিহ্বল প্রশ্নের পর একটি কথাও বলতে পারেন নি শ্যামা, কোন প্রশ্নই করতে পারেন্ নি। মহাশ্বেতার শেষ কথাটায় প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, 'কি বললি. কি বলেছেন জামাই—বকে গেছে! কান্তি বকে গেছে?'

এইবার বোধ হয় মা'র অব্যক্ত ব্যথার আর্তস্বরে লজ্জা পেল মহা, মাথা হেঁট ক'রে বললে., 'তাই তো বলেছে রতন তোমার জামাইকে। অবশ্য রতন ঠিক বলে নি। সে নাকি একটা কথাও বলতে পারে নি, ঘাড় হেঁট ক'রে ছিল সব্বক্ষণ। বলি তারও খুব লজ্জা হয়েছে তো গা, বিশ্বাস ক'রে তার কাছে গচ্ছিত রেখে এসেছিল। বলেছে ওদের মুকী ঝি. রতনের সামনেই বলেছে। খুব নাকি বকে গিয়েছিল, ওরা নাকি মোটে টের পায় নি। এদান্তে নাকি ইস্কুলেও যেত না। কাজেই কোথায় কি কখন করছে—এরা জানতে পারে নি। ঐ ছাই কী যেন এগ্‌জামিন—তার ফল বেরোতে তখন সবায়ের চোখ খুলল, তখন খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সব খবর। তোমার জামাই

তো অধোবদন একেবারে।...ঐ দিকে গেছল কী কাজে, নতুন বাজারে বুঝি কি দরকার ছিল—হঠাৎ মনে হয়েছে অনেকদিন তো খোঁজ-খবর করা হয় নি একবার খবর নিয়ে যাই। তা খবরের তো ঐ ছিরি। মাথা হেঁট ক'রে ঐ বিত্তান্ত শুনে চলে এল। আর হবে কি, তোমরা তো কেউ খবরও নাও না—ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত!'

এ অনুযোগের উত্তর দিল কনকই। সে আর থাকতে পারল না, বলল, 'আমরা খবর নিলেই বা কী হ'ত ঠাকুরঝি, যাদের বাড়িতে আছে তারাই কিছু টের পায় নি—একদিন দুদিনে মানুষ এত খারাপ কিছু হ'তে পারে না—নিশ্চয় অনেকদিন ধরেই বদ্‌সংসর্গে মিশেছে—তা তারাই যদি জানতে না পেরে থাকে, আমরা এক-আধ দিন গিয়ে খবর নিয়ে এলেই কি আর জানতে পারতুম!'

কনকের মনটাও বড় খারাপ হয়ে গেছে। বিয়ের সময় এসে দাঁড়িয়ে ছিল—মনে আছে—যেন রাজপুত্তুর। যেমন রূপ তেমনি মিষ্টি কথা। সেই ছেলে এমন বিগড়ে গেল!

'না, তবু—, একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে মহাশ্বেতা—'তবু বাড়ির লোক ঘন ঘন যাওয়া আসা করলে একটু ভয় থাকে বৈকি। এ একেবারে নিশ্চিন্তি তো!'

শ্যামা উত্তর দেন না কোনটারই। আসলে তখন তিনি প্রাণপণে তাঁর অন্তরের ফেনায়িত বিষকে সংযত করছেন, প্রচণ্ড উষ্মাকে পরিপাক করছেন প্রাণপণে। তাঁর মাথাতে কথাগুলো ভাল ঢোকে নি—কিছু গুছিয়ে ভাবতেও পারছেন না, সব যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে—আর তার মধ্যে মনের সব যুক্তি ছাপিয়ে যেটা উঠে আসতে চাইছে তা হ'ল একটা ভয়ংকর চণ্ডাল ক্রোধ। একটা বীভৎস কিছু করতে পারলে যেন শান্তি পান তিনি, পৈশাচিক একটা কিছু। এ উষ্মা বিশেষ কোন ব্যক্তির উপর নয়—একসঙ্গে যেন অনেকের উপর। এই মেয়ে, জামাই, তার বোন, সেই বিশ্বাস-ঘাতক ছেলে, উদাসীন মোহাচ্ছন্ন বড় ছেলে—সর্বোপরি নিজের অদৃষ্ট এবং এই সমস্তর মূল, এই ছেলে-মেয়ের জন্মদাতা পরলোকগত স্বামীর ওপরও। সব কটাকে শিক্ষা দেবার মতো একটা কিছু করতে পারলে তবে হয়ত এ ক্রোধের শান্তি হ'ত তাঁর।

ইচ্ছা করছিল এক-একবার ঐ মেয়েটাকে ঠাস ঠাস ক'রে চাঁড়িয়ে দেন, যে মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে এই খবরটা দিতে এসেছে। আবার মনে হচ্ছিল কোমর বেঁধে ছুটে গিয়ে জামাই বা তার সেই স্বৈরিণী বোনের সঙ্গে খুব খানিকটা ঝগড়া ক'রে আসেন। ছোটলোকদের মত উগ্র কলহ—তাঁর মেজ মেয়ের মতো—ঐ রকম ভাবে কোথাও একটা মনের বিষ ঝাড়তে পারলে যেন শান্তি হয় তাঁর।

কিন্তু কিছুই করা হয় না শেষ অবধি। এ জীবন তাঁকে আর কিছু না দিক—ধৈর্যটা দিয়েছে খুব। ওটার প্রয়োজনও যেমন হচ্ছে জীবনভোর, তেমনি ভগবান তাঁকে দিয়েছেনও খুব অকৃপণ হাতে।

সামলেই নিলেন নিজেকে শেষ পর্যন্ত। শুধু কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় মনের সেই প্রচণ্ড উষ্ণতার সামান্য আভাসটুকু মাত্র ধরা পড়ল।

বললেন, 'তা সে—সে কী করছে এখন? তার সঙ্গে দেখা হয় না জামাইয়ের? বাড়ি ছিল না সে?—তখুনি কান ধরে তাকে টেনে আনতে পারলেন না? তার বকামি বার করতুম শয়তান, পেটের শত্তুরের!'

'ও মা, সে কোথায় যে তাকে টেনে আনবে!'

বেশ সহজ ভাবেই কথাগুলো বলে রকে উঠে বসে পা ছড়িয়ে পায়ে হাত বুলোয় মহাশ্বেতা।

'ওখানে নেই? সে কি? তবে সে কোথায়? কৈ এখানে তো আসে নি! এসব কথা

তো বলিস নি এতক্ষণ।'

'বলছি বলছি। রোস, বলবার ফুরসৎ পেলুম কোথায়।...ওরা নাকি এখানেই পাঠাতে চেয়েছিল, বলেছিল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও কিন্তু তোমার ছেলেই নাকি লজ্জায় আসতে চায় নি। তখন রতনের বর—', কনককে প্রায় দেখিয়েই তার দিকে ইঙ্গিত ক'রে চোখ টিপল মহাশ্বেতা, 'ঐ যে কী বাবু, তার যেন কোন্ দেশে জমিদারী আছে, কী যেন বেশ বললে বাপু নামটা তোমার জামাই—কী যেন আরাম না কি—হ্যাঁ আরামবাগ অঞ্চল বলে কী এক জায়গা আছে, খুব নাকি দূরেও নয় জায়গাটা এখান থেকে—সেইখানেই পাঠিয়েছে। ওদের গাঁয়ের পাশের গাঁয়েই ইস্কুল আছে, ওদের কাছারীবাড়িতে থাকবে আর সেই ইস্কুলে পড়বে এ-বছরটা। তারপর এ বছর যদি ঐ মাঝারি এগ্জামিনে পাস করতে পারে, তখন আসবে আবার এখানে।'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা গুছিয়ে বলতে পেরে একবার যেন বিজয়গর্বে চারিদিক চেয়ে নিল সে।

শ্যামা আরও স্তম্ভিত হয়ে যান। 'আরামবাগ! সে তো শুনেছি হুগলী জেলায়। আমাদের এঁদের ক-ঘর শিষ্য ছিল সেখানে—শাশুড়ীর মুখে শুনেছি। সে তো একেবারে ম্যালেরিয়ার ডিপো, যেসব শিষ্যরা ছিল কেউ টিকতে পারে নি—একধার থেকে মরে হেজে গিয়ে সব পালিয়েছিল ঘরবাড়ি ছেড়ে। সেইখানে পাঠিয়েছে আমার ছেলেকে মেরে ফেলতে! কী আস্পদ্দা তাদের। কেন পাঠায়, কার হুকুমে পাঠায় তাই শুনি। আমাদের একবার জিজ্ঞেস নেই বাদ নেই—খবর করা নেই, ড্যাং ক'রে পাঠিয়ে দিলে! বাঃ, বেশ তো!'

মহা এবার একটু বিরক্তই হয়ে ওঠে, 'তা বাপু একযাই তাদের দোষ দিচ্ছ কনে! তোমার ছেলে তোমাদের কাছে আসতে না চেয়ে থাকে, খবর দিতে না দিয়ে থাকে তো তারা কি করবে! ঐখানে বসিয়ে রেখে দেবে ছেলেকে আরও মাথাটি বেশী ক'রে চিবিয়ে খাবার জন্যে! এখানে থেকে নষ্ট হয়ে যেত, ভালই তো করেছে দূরদেশে পাড়াগাঁয়ে পাঠিয়ে। কী এমন অন্যায়টা করেছে তা তো বুঝলুম না। ম্যালেরিয়া—বলি সে গাঁয়ে কি সবাই ম্যালেরিয়ায় উজুড় উঠে যাচ্ছে ফী বছর? তাহ'লে গাঁয়ে লোক আছে কি ক'রে, ইস্কুলটা চলছে কী ক'রে? পড়ছে কে?'

তারপর একটু থেমে বললে, 'তা বেশ তো, তোমাদের পছন্দ না হয়, আনিয়ে নাও না! এ তো আর জোর-জবরদস্তির কথা নয়। তোমার বড় ছেলেকে পাঠাও, ঠিকানা নাও, চিঠি লেখ কিম্বা কেউ গিয়ে কান ধরে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে এসো। এ তো তোমাদেরই করবার কথা। তোমরা কেউ খবর রাখ নি—তোমার জামাই ওপযাচক হয়ে খবরটা দিয়ে তো আর এমন কিছু অন্যায় করে নি যে, সেই থেকে আমার ওপর টাঁইশ করছ! আমারই ঘাট হয়েছিল বলতে আসা, শুনেছিলুম, চুপ ক'রে বসে থাকলেই হ'ত।'

অভিমানে মহাশ্বেতার গলা ভারী হয়ে আসে।

কিন্তু শ্যামা আরও বিরক্ত হন। বোধ করি অন্তরের সেই বিষটা প্রকাশের পথ খুঁজে বেড়ায় গলার মধ্যে।

'তুই থাম্ বাপু! কাকে বলছি কী বলছি তা কিছু ভাল ক'রে না শুনে না বুঝে তুই আর গ্যাজোর গ্যাজোর করিস নি। তোকে বলছি, না জামাইকে বলছি? আর তোরও তো ভাই—নাকি তোর পর? আমরা ওদের চিনতুম? ওদের দেখালে কে—জামাই দেখিয়েছেন তো! তোরা খবর রাখবি খবর দিবি—এ এমন আর বড় কথা কি?'

'ঘাট হয়েছিল—হ্যাঁ সেটা স্বীকার করছি একশো বার—ঘাট হয়েছিল তার, তোমা-

দের ওপকার করতে আসা কি ওখানে ছেলে রেখে আসা। তার যে স্বভাব এই—এত জায়গায় এত খোয়ার হয় তবু ওপকার করতে যাওয়া চাই!......তা অন্যায় হয়ে গেছে মানছি আমি—এখন কী করবে করো। জামাইকে ধরে ফাঁসী দেবে না শূলে দেবে—যাতে তোমাদের মন ওঠে তাই করো—আমি আর কী বলব!'

এ লোকের সঙ্গে তর্ক করা চলে না, যুক্তির কোন মূল্যই নেই এর কাছে। মর্মান্তিক দুঃখের মধ্যে এই এক নূতন উপদ্রবে বিরক্ত হয়ে উঠে শ্যামা বলেন, 'আচ্ছা হয়েছে—সে যা করবার জামাইয়ের সঙ্গে বোঝাপাড়া করব এখন। তুই এখন সরে যা দিকি সামনে থেকে—'

'তাই যাচ্ছি। একেবারেই যাচ্ছি। থাকতে আসিও নি। ঐ যে বলে না, মনের গুণে ধন। তা তোমারও তাই, মনটা ভাল নয় বলেই যাতে হাত দাও বিষ হয়ে যায়। তুমি নেমোখারাম বলে তোমার ছেলেও তাই হয়েছে!'

সে উঠে হন হন ক'রে বাড়ির পথ ধরল। কনক হাত ধরে টেনে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল একবার, তার হাত জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সে।

'না ভাই খুব শিক্ষা হয়েছে। জীবনভোরই শিক্ষা পাচ্ছি—তবু মন তো মানে না। তবে এবার এই শেষ, জন্মের শেষ!'

চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল সে।

ওর এ জন্মের শেষ এবার নিয়ে অনেক বারই হয়েছে। সম্ভবত কালই আবার ছুটে আসবে ও—তেমন লাগ-সই কোন কথা থাকলে। সুতরাং মহাশ্বেতার চলে যাওয়া নিয়ে কোন চিন্তা নেই শ্যামার। তিনি আড়ষ্ট হয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলেন—কান্তির কথাটা।

তাঁর গর্ভের শ্রেষ্ঠ সন্তান—গর্ব করার মতো ছেলে কান্তি। রূপের তো তুলনাই নেই, মেয়েদের মধ্যে ঐন্দ্রিলা, ছেলেদের মধ্যে কান্তি। কিন্তু ঐন্দ্রিলার গুণ নেই—এর তাও আছে। ঐন্দ্রিলা সুযোগ পেয়েও লেখাপড়া শেখে নি—এ সুযোগ না পেয়েও লেখাপড়ার জন্য পাগল ছিল।

শান্ত বিনয়ী ভদ্র। যেমন মিষ্টভাষী তেমনি সৎ।

মিথ্যা কথা পর্যন্ত কখনও বলতে পারে না।

সেই ছেলে এমন হয়ে গেল! এত বকে গেল!

এমন নষ্ট হয়ে গেল যে আর কোন পদার্থ রইল না!

কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না কথাটা।

আর এই ক-মাসের মধ্যে! এই তো মনে হচ্ছে সেদিন এসে প্রাইজের বইগুলো রেখে গেল।

শ্যামাই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন পদ্মগ্রামে—মঙ্গলা দেখে কত খুশী হলেন, কত আশীর্বাদ করলেন।

সৎপরামর্শও দিয়েছিলেন একটা। সেদিন তাঁর পরামর্শটা শুনলেই ভাল হ'ত।

প্রস্তাবটা একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন শ্যামা।

মঙ্গলা বলেছিলেন, 'তোমাদের পাড়ায় মল্লিকদেরই এক জ্ঞাতি পশ্চিমে থাকে শুনেছি। অগাধ সম্পত্তি করেছে—এক মেয়ে। ঘরজামাই করবার জন্যে সোন্দর ছেলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছেলেমানুষ বর চাই—শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে। বিষয়-আশয় কারবার দেখতে পারে এমন ভাল ছেলের দিকেই ঝোঁক। দ্যাখ—তুই বলিস তো আমি খোঁজ-খবর করি। এমন ফুটফুটে শান্তশিষ্ট ছেলে পেলে লুফে নেবে।'

'হ্যাঁ, মার যেমন কথা! বুড়ো হয়ে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে মা।......এই

ছেলের ওপরই আমার ভরসভর—একে বিলিয়ে দিয়ে বসে থাকব! আর ঘরজামাইতে বড্ড ঘেন্না মা আমার চিরকালের। না, না, সে হয় না।'

'দ্যাখ, যা ভাল বুঝিস। সত্যিই আমি বড্ড বুড়ো হয়েছি রে—আর বেশী দিন নেই।......তবে দিলে ভাল করতিস বামনী,—এমন ডবকা ছেলে শহরে রেখে দিয়েছিস—ফেরৎ পেলে হয়!'

সেই শেষ কান্তি এসেছিল! হ্যাঁ—মধ্যে আর একদিন এসেছিল, বিজয়ার দিন। তাও পুরো একটা দিনও থাকে নি। সন্ধ্যায় এসেছিল ভোরে চলে গেছে।

মঙ্গলা ঠাকরুণের আশঙ্কা যে হাতে হাতে ফলবে—তা কে জানত। তাহ'লে কি আর ছেড়ে দিতেন!

মঙ্গলা চিরদিন তাঁদের মঙ্গলই করেছেন এটা ঠিক। রাগারাগি ঝগড়া যে হয় নি তা নয়—কিন্তু আজ ঠাণ্ডা মাথায় শ্যামা ভেবে দেখেন যে, দোষ তাঁদেরই বেশী ছিল। এতটা যে সহ্য করেছেন ও'রা এই আশ্চর্য। এখনকার দিনের মানুষ হ'লে সহ্য করত না। কী অন্যায় না করেছে তাঁর স্বামী—ব্রাহ্মণ যদি অভিসম্পাত দিয়ে চলে যায়—এই ভয়ে সব সহ্য করেছেন ও'রা। মহাশ্বেতার বিয়ে, ঐন্দ্রিলার বিয়ে, তরুর বিয়ে পর্যন্ত—সবই মঙ্গলার যোগাযোগে হয়েছে। চিরদিনের উপকারী মানুষ।

খুব উচিত ছিল শ্যামার—মঙ্গলার কথা শোনা, অন্তত সতর্ক হওয়া!

বিষয়ী কায়স্থ পরিবারের মেয়ে, বিষয়ী কায়স্থ পরিবারের বধূ—বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ির মধ্যে আবাল্য প্রতিপালিত। ভূয়োদর্শী স্ত্রীলোক মঙ্গলা—তাতেও সন্দেহ নেই। অনেক দেখেছেন জীবনে, অনেক বেশী মানুষ চেনেন। তাঁর কথাটা উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হয় নি।

আসলে কান্তির যে ঠিক এতটা বয়স হয়ে গেছে, সত্যিই ডব্‌কা হয়ে উঠেছে—সেইটেই খেয়াল হয় নি শ্যামার। অনেক বেশী বয়সে পড়াশুনো' শুরুই করেছে কান্তি—সুতরাং বয়স হয়েছে বৈকি!

বকে যাবার তো এ-ই বয়স!

তাঁর ছেলে, তাঁর তাই নজরে পড়ে নি! ছেলে কবে বড় হয়ে যায় মা তা বুঝতে পারে না—পরের নজরে ঠিক পড়ে। মঙ্গলা ঠিকই ধরেছেন।

তাছাড়া তাঁর মা একটা কথা বলতেন, 'আকরে টানে!' যে আকর থেকে বেরিয়েছে তার কিছু প্রভাব থাকবেই। ছেলের জন্মদাতা যে কী ছিলেন—সেটাও মনে রাখা উচিত ছিল শ্যামার।......

ছুঁচ সুতো হাতে নিয়ে কাঁথার কাপড় সাজিয়েই বসে থাকেন শ্যামা—সেলাই করা আর হয় না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে ক্রমশ। কনক সন্ধ্যা দিতে চলে যায়—তবু শ্যামা বসে থাকেন। তাঁর এখনও কাপড় কাচা হয় নি—বাগানের অনেক কাজ বাকী রইল, সন্ধ্যাহ্নিক আছে—এসব কিছুই মনে পড়ে না তাঁর। বসেই থাকেন চুপ ক'রে।

কত ছেলে তো দস্তুরমতো বকে গিয়েও সামলে নেয় নিজেকে। আবার ভাল হয়ে পড়াশুনো ক'রে মানুষ হয়। কান্তি কি পারবে সামলে নিতে নিজেকে। আবার কি ফিরে পাবেন তাঁর ছেলেকে! তাঁর সেই ছেলে—তাঁর আশা ভরসা, তাঁর গর্ব!

কে জানে সত্যিই বকে গেছে কিনা, গেলেও ঠিক কতটা গেছে! কিছুই যে জানতে পারছেন না এখনও। হেম কাল না গেলে কিছু জানাও যাবে না। এই দীর্ঘ সময়টা কী ক'রে অপেক্ষা করবেন, এই ভেবেই ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে থাকেন শ্যামা।

হেমও কথাটা শুনে ঘুমোতে পারে না সারারাত। আশ্চর্য, কালই বড় বৌদি কথাটা বলেছে। কনকও বলেছিল তবে অতটা জোর দেয় নি। বোধ হয় সাহস করে নি দিতে। এখনও কনক তার কাছে অনেকটা ভয়ে ভয়ে থাকে। কোন কিছুই জোর ক'রে বলতে পারে না এখনও।

কথাটা সে স্বীকার করে কনকের কাছেও।

'তুমিও বলছিলে, পরশু বড় বৌদিও খুব যাচ্ছেতাই করলেন। তাঁকে বলেই ছিলুম শনিবার যাব। তাঁর মুখেই খবর পেলুম যে ম্যাট্রিক এগ্‌জামিন কবে হয়ে চুকে বুকে গেছে। তাইতেই তো প্রথম ভাবনা ধরেছিল। তাই বলে যে এমনটা হবে—ইস, এ কখনও ভাবতেও পারি নি।'

কনক কোন কথা বলে না। নীরবে বসে ওর পা টিপতে থাকে।

তার বুদ্ধি বা তার দূরদর্শিতা যে বড় বৌয়ের থেকে কম নয়—এটায় বেশী জোর দেওয়া ঠিক হবে না—এসব জয়লাভ শান্ত সংযত হয়ে উপভোগ করতে হয়, কচলে তেতো করতে নেই।

তাছাড়া সে জানে যে, হেম তার সব ভাই-বোনকেই মনে মনে ভালবাসে। জীবনের বহু দুর্যোগ বহু ঝড়ঝাপ্‌টা বহু কষ্ট সহ্য করেছে সে, বহুদিন উপবাস গেছে তার জীবনে—এখনও জলখাবারের কথা সে ভাবতেই পারে না—সুতরাং বাহ্য রুক্ষতা তার স্বাভাবিক। কিন্তু এত কষ্ট সহ্য করেছে বলেই হয়ত ভাই-বোনদের সকলের ওপরই তার টান আছে।

শুধু স্নেহ নয়—এই ভাইটি সম্বন্ধে অনেক আশা, অনেক গর্বও ছিল হেমের।

সেটা নানা কথার ফাঁকে, নানা লোকের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে প্রকাশ পেতে দেখেছে কনক।

সুতরাং আঘাতটা যে কতটা বেজেছে তার, তা সে জানে। এসময়ে নিজের কথা বলে বিরক্ত করতে নেই।

অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য হয় হেমের— কনক এখনও বসে বসে পা টিপেই যাচ্ছে।

'তুমি শোও, শোও। সারারাত বসে থাকবে নাকি!'

'শুচ্ছি, তুমি ঘুমোও।' মৃদুকণ্ঠে বলে কনক।

'পাগল। আমার ঘুম আসতে আজ অনেক দেরি। তোমার খাটা-খাটুনি যায় সারাটা দিন, তুমি শুয়ে পড়।'

'খাটা-খাটুনিটা তোমার হয় না বুঝি!' একটু হেসে বলে কনক।

যতটা বলেছে হেম তাইতেই সে কৃতার্থ। এর জন্যে সারারাত বসে পা টিপতেও সে রাজী।

'হ্যাঁ, আমাদের খাটুনি তো কাগজ-কলম নিয়ে ! বসে বসে কাজ। মাথার খাটুনী। নাও নাও, তুমি শুয়ে পড়।'

আজ এই প্রথম, হাত ধরে তাকে জোর ক'রে শুইয়ে দেয় হেম।

কিন্তু কনকেরও ঘুম আসে না আজ। এই সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার উত্তেজনা তো আছেই। কিন্তু তা ছাড়াও, সেও ভাবছিল কান্তিরই কথা।

ভাল হয় নি, কাজটা ভাল হয় নি এদের—অমন জায়গায়, অমন পাড়ায় রেখে

আসা।

এরা এখনও ভাবে যে কনক রতনের পূর্ণ পরিচয় জানে না। হয়ত আভাসে ইঙ্গিতে কিছু বুঝেছে, তবু সবটা নিশ্চয়ই শোনে নি। তাই এরা প্রাণ খুলে ওর সামনে আলোচনা করতে পারে না। হেমও পারছে না তাই—নইলে, সব কথা খোলাখুলি বলতে পারলে বোধ হয় হাল্‌কা হ'ত ওর মন। ঐ বিশ্বাসটা ওদের আছে জানে বলেই, কনক চুপ ক'রে আছে—নইলে কথাটা সেও তুলতে পারত।

কী দরকার মিছিমিছি ওদের অপ্রস্তুত ক'রে।

সবই জানে কনক, ঐন্দ্রিলা কিছুই বলতে বাকী রাখে নি!

আরও বলেছে সে অভয়পদদের সম্বন্ধে তার একটা বিজাতীয় আক্রোশ আছে বলেই। ওদের কেলেঙ্কারি বলতে বলতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যথার্থ আনন্দ পায়।

বোধ হয় বোনের সুখের সংসার বলেই তার এই আক্রোশ।

রতন অভয়পদদের মামাতো বোন—সেটা মিথ্যে নয়। কিন্তু সেইটাই তার সম্পূর্ণ পরিচয়ও নয়। দেবার মতো পরিচয় আর নেই তার। তাই এরাও দেয় না কারও কাছে: ওর প্রসঙ্গই তোলে না, একেবারে চুপ ক'রে থাকে। ক্রিয়া-কর্মে তাকে নিমন্ত্রণ করে পাওনার লোভে, সে আসবে না জেনে নিশ্চিন্ত হয়েই করে। লোক পাঠিয়ে লৌকিকতা করে সে—এরা বলে, 'ও আমাদের এক আত্মীয়।' নামটাও করে না।

সেও অবশ্য এখানে আসে না। খোঁজ-খবরও করে না। কোন আত্মীয়-সমাজেই যায় না সে।

এরা কিন্তু যায় মধ্যে মধ্যে। বেশির ভাগ অম্বিকাই যায়।

তার কারণ রতনের নাকি অগাধ পয়সা। তাই সব মান-মর্যাদা খুইয়েও সম্পর্কটা এরা ধরে আছে এখনও।

সে সম্পর্কের সূত্রেই অভয়পদ ছেলেটাকে দিয়ে এসেছিল তার বাড়ি।

এত বুদ্ধি অভয়পদর, সে এ কাজটা কেন করল আজও ভেবে পায় না কনক।

কে জানে কী বুঝেছিল সে। কনক অন্তত আজও বুঝতে পারে না এর যুক্তি। রতনের বিবরণ শুনে ওর প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় ছেলেটা সম্বন্ধেই। কাজটা ভাল হয় নি —নিজের মনে বার বারই বলেছে— উচিত হয় নি ওখানে দিয়ে আসা—কিম্বা এতদিন ফেলে রাখা। কোনমতেই উচিত হয় নি।

বিশেষত ঐ লোকটা, অভয়পদর মামা এখনও জীবিত! ঐ বাড়িতেই বাস করে। স্বার্থপরতার এমন কুৎসিত দৃষ্টান্ত উঠ্‌তি বয়সের ছেলেমেয়েদের সামনে কিছুতে রাখা ঠিক নয়—মূর্খ হ'লেও কনক এটা বোঝে।

ছি ছি! ঐ কি মানুষের কাজ! একি মানুষ পারে!

বিশ্বাস করে নি কনক। উড়িয়ে দিয়েছিল সে, বাজে কথা বলে।

ঐন্দ্রিলা তার গায়ে হাত দিয়ে বলেছিল, 'মাইরি বলছি, এই তোমার দিব্যি, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। ওরা মনে করে কেউ জানে না, চেপে চেপে রাখে কিন্তু জানতে কার বাকী আছে এ কেলেঙ্কার। বলি এ চত্বরে যত বামুন সবাই ওদের জানে, আত্মীয়গুষ্টি তো কম নয় ওদের। দাদাবাবুর যে বোনের বিয়ে হয়েছে—তারাও যে আবার দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি হয় ওর মামার। তারা কোন সম্পর্ক রাখে না ওদের সঙ্গে। কেউ নাম করলে সকলের সামনে থুতু ফেলে। এ'রাই গিয়ে পাত চাটেন। পয়সার চেয়ে বড় এদের কিছু নেই!'

তবু যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না।

গরীব অনেকেই থাকে! তাই বলে অমানুষ হবে! এ তো রাক্ষসের কাজ। তারাও বোধহয় নিজের সন্তানের সর্বনাশ করে না!

ঐন্দ্রিলা গলা নামিয়ে ফিসফিস ক'রে বলে, 'আসলে লোকটা কুড়ে মড়া। কোন্ ছাপাখানায় কম্পোজিটারী করত—খোলার ঘরে থাকত। তাও নাকি এগারো না বারোটাকা মাইনে ছিল, কাজে ফাঁকি দিত বলে অত বছর কাজ ক'রেও মাইনে বাড়ে নি। আদ্ধেক দিন খেতে পেত না, দৈন্যদশা একেবারে। কিন্তু রূপটা ছিল খুব মিনসের। দাদাবাবুর মাকে দেখে বুঝবে না, তাছাড়া সহোদর ভাই তো নয় খুড়তুতো বা জাঠ-তুতো নাকি মামাতো—ঠিক জানি না। তবে নিজের নয় শুনেছি। মিন্সের রূপেই পেয়েছিল মেয়ে দুটো। খোলার ঘরে অত রূপ—সে কি চাপা থাকে। শিগ্গিরই পেছনে লোক লাগল। তখন ওর মোটে বুঝি তেরো বছর বয়স। মিন্সে পেয়ে গেল দাঁও! মোটা টাকা হেঁকে বসল—ব্যাস আর কি, ঢালাও কারবার। খোলার ঘর থেকে বড় বাড়িতে এসে উঠল। শুয়ে থাকে দিনরাত আর নভেল পড়ে। ভালমন্দ খাবার, ভাল ভাল পান তামাক। ওর মামীটা ছিল সতীলক্ষ্মী—সে মনের ঘেন্নায় পাগলের মতো হয়ে গেছল। বলতে গেলে না খেয়ে ম'ল সে!'

'তিনি মারা গেছেন?' অভিভূত কনক প্রশ্ন করেছিল।

'হ্যাঁ—মরে জুড়িয়েছে সে! রতনের যে প্রথম বাবু ছিল সে ছিল খুব ভাল, স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকত। সে মরতে না মরতে মিন্সে আর একটি জুটিয়ে দিলে গা! মেয়েটাকে প্রাণভরে কাঁদতে পর্যন্ত দিল না। এ নাকি মহা বদমাইশ—দুর্দান্ত মাতাল, মেয়েটাকে পর্যন্ত মাতাল ক'রে দিয়েছে! ছিঃ ছিঃ কানে শোনাও পাপ, ভদ্রলোক বামুনের বংশ—মেয়ে বেচে খাচ্ছিস।'

'তা ওর আর একটি বোন?'

'সে খুব সেয়ানা। সে দুদিনেই বাপকে বুঝে নিলে। সে বললে, তুমি বাপ হয়ে তোমার স্বার্থ দেখলে যখন—আমাদের দিকে চাইলে না, তখন তোমার কথাই বা আমরা ভাবব কেন? নিজেকে বেচে যখন খেতে হবে, তখন তোমার এক্তাজারিতেই বা থাকব কিসের জন্যে। সে আলাদা থাকে। বাপকে এক পয়সা তো দেয়ই না—বাড়িতে ঢুকতে পর্যন্ত দেয় না। সে এর মধ্যে নাকি তিন-চারখানা বাড়ি ক'রে ফেলেছে কলকাতায়। কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না সে। এঁরা তো গিছলেন কুটুম্বিতে ঝালাতে, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, কিসের আত্মীয় তোমরা, বাবা যখন আমাদের সর্বনাশ করলে, তোমরা কেউ এসে দাঁড়িয়ে ছিলে? বাধা দিয়েছিলে? তোমরা নিয়ে গিয়ে যদি রাখতে তোমাদের কাছে, বিয়ে দিতে তো বুঝতুম আত্মীয়। এখন এসেছ পাপের পয়সায় ভাগ বসাতে! দূর হও, বেরোও।...এমনি তার কাটাকাটা কথা। জাঁহাবাজ মেয়ে সে—এর মতো ভালমানুষ বোকা নয়।'

এ কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নয়—ঐন্দ্রিলা দিব্যি গেলে বললেও সে বিশ্বাস করত না, যদি না এদের এতটা ঢাক ঢাক ভাব দেখত। এত চাপাচাপি এত লুকোনো কিসের জন্যে, যদি না এদের ভেতরে গলদ থাকে। এদের ব্যাপার দেখেই কথাটা ক্রমশ বিশ্বাস হয়েছে তার।

ছি ছি। অসৎ জায়গায় পড়ে অসৎ সংসর্গে ছেলেটা বুঝি বরবাদই হয়ে গেল।...

ঘুম হয় না কনকেরও। হেমও যে জেগে আছে তা সে বুঝতে পারে। তবু কথাও কয় না। নিথর হয়ে শুয়ে থাকে সে।

কথা কইলেই ঐ প্রসঙ্গ উঠবে, কী বলতে কী বলে ফেলবে সে। কনক সব জানে বুঝলে হয়ত দারুণ লজ্জা পাবে হেম। যতদিন না হেম নিজে থেকে বিশ্বাস ক'রে

সব কথা বলছে, ততদিন সেও জানতে দেবে না যে সবই জানে।

চুপ ক'রে শুয়ে থাকার আরও কারণ আছে অবশ্য।

আর একটা অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তার। সেইটেই প্রাণপণে উপভোগ করছে সে।

মাথার দিকটা দক্ষিণ—এবং সেদিকে জানলাও আছে একটা, তবু রুজুরুজি বন্ধ না বলে তেমন হাওয়া ঢোকে না। তার ওপর চালাঘর—জানলার ওপরই চালাটা পড়েছে এসে। গরমের সময় চাপা ভ্যাপ্সা গরম লাগে। অন্য দিন ঘুমিয়ে পড়ে হেম—অতটা টের পায় না। তাছাড়া এমনিতেও ঘাম তার কম।

কনকেরই গরম লাগে বেশী, সে ঘামেও খুব, কিন্তু এই ঘরেই শুয়ে শুয়ে সয়ে গেছে তার, ঘুম পেলে অনায়াসে ঘুমোতে পারে।

আজ হেমেরও গরম লেগেছে। অনেকক্ষণ পরে—কনক ঘুমিয়েছে ভেবেই সে উঠে চালের বাতা থেকে সন্তর্পণে পাখাটা টেনে নিয়েছে। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে টেনেছে সে—পাছে কনকের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর আল্‌তো একবার তার গায়ে হাত দিয়ে দেখেছে যে কনকও ঘামছে। তারপর থেকে এমনভাবে হাওয়া খাচ্ছে যাতে কনকেরও হাওয়াটা লাগে ভালভাবে। মধ্যে মধ্যে শুধু কনকের দিকেও হাওয়া করছে।

সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেছে কনকের। শুধু শরীর নয়, মনও।

বহুদিনের সঞ্চিত গুমোট গরমে লেগেছে স্বামীর স্নেহের বাতাস। তার আর কোন দুঃখ নেই।

আরামে চোখ জড়িয়ে আসারই কথা—কিন্তু চেষ্টা ক'রেই জেগে রইল সে। পাছে এই অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়।...

ভোরবেলা রাজগঞ্জের কলে ভোঁ বাজতেই উঠে বসতে হয়।

তার উঠে বসার ধরণ দেখেই হেমের সন্দেহ হয় যে সে জেগেছিল। সে বলে, 'ওকি, তুমি ঘুমোও নি!'

তখনও ভাল ক'রে ভোর হয় নি, তেমন আলো হয় নি। তাই কনকের মুখটা দেখা গেল না। সুখে ও লজ্জায় সে মুখে কী অপূর্ব রঙ লেগেছে তাও দেখতে পেল না হেম। কনক শুধু একটু হেসে স্বামীর হাত থেকে পাখাটা টেনে নিয়ে জোরে জোরে বাতাস করতে লাগল।

'ওরে দুষ্টু মেয়ে! সারারাত মট্‌কা মেরে পড়ে থেকে আমার সেবা খাওয়া হ'ল! এখন আবার লোক-দেখানো বাতাস করা হচ্ছে। থাক্। এখন ভোরাই হাওয়া উঠে গেছে আর দরকার নেই!...আচ্ছা, ঐ গরমে অত ঘামের মধ্যে চুপ ক'রে শুয়ে ছিলে কী ক'রে!'

এবার কনক মৃদুকণ্ঠে উত্তর দেয়, 'ও আমাদের সহ্য হয়ে যায়!'

'নমস্কার বাবা তোমাদের সহ্যতে। গায়ে হাত দিয়ে আমার তো মনে হ'ল কে এক বালতি জল ঢেলে দিয়েছে তোমার গায়ে।'

তারপর অল্প কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে বসে থাকে। হঠাৎ হেম বলে ওঠে, 'দ্যাখো আমি ভাবছি—এখান থেকে চেষ্টা ক'রে কোথাও বদলি হয়ে যাই। এখন আমি বদলি হ'লে কোয়ার্টার পাবো। তুমি সুদ্ধ গিয়ে থাকতে পারবে। এখান থেকে—এসব ঝামেলা থেকে দূরে কোথাও নিরিবিলি সংসার পাততে চাই। কী বলো?'

বদলি শব্দটা শুনেই নিমেষে বুকটা যেন হিম হয়ে গিয়েছিল, বুকের স্পন্দন গিয়েছিল থেমে। এত দুঃখের এত দীর্ঘ তপস্যার ফল হাতের কাছে এগিয়ে এসেও দূরে সরে যাবে, জীবনের সুধাপাত্র ওষ্ঠের সামনে থেকে যাবে ফিরে? আবার এক

যন্ত্রণাদায়ক অন্ধকার অনিশ্চয়তার মধ্যে গিয়ে পড়বে সমস্ত ভবিষ্যৎ!

কিন্তু সংগে সংগেই পরের কথাটায় রুদ্ধ নিঃশ্বাস পড়তে শুরু হয়, আবার বুকের স্পন্দন অনুভব করে সে। বরং সে স্পন্দন যেন দ্রুততর হয়ে ওঠে। দেহের লোমকূপ-গুলো পর্যন্ত যেন কী এক পুলকে রিন্‌রিন্ করতে থাকে। সে নিজেও টের পায় এক ঝলক উষ্ণ রক্ত যেন হৃদয়ের পাত্র উপ্‌চে মুখে এসে পড়ে।

ভাগ্যে ঘরে আলো নেই—নইলে এত আনন্দ কিছুতেই ঢাকতে পারত না সে হেমের কাছ থেকে। আর তার কাছে মনের এই গোপন সাধ, গোপন স্বপ্ন ধরা পড়ে গেলে বড় লজ্জার কারণ হ'ত।

স্বপ্ন বৈকি!

শুধু সে আর হেম! কোন দূরে দেশে গিয়ে নিরিবিলি নিভৃতে সংসার পাতবে। সে কি সত্যিই হবে কোন দিন? এ যে স্বপ্ন দেখতেও ভয় করেছে এতকাল। সুদূরতম অসম্ভব কল্পনার কথা এ সব!

মনে হ'ল বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। স্বামী প্রশ্ন ক'রে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন।

'সে তো ভালই!' অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে কনক (তবু সুখের এই বিপুল আবেগ কণ্ঠে কি প্রকাশ পায় না একটুও?)।—'কিন্তু মা? উনি তো এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও নড়তে চাইবেন না। ও'র কাছে কাকে রাখবে? এক মেজদি—কিন্তু তার ওপর ভরসা করা যায় না একটুও!'

'সেও ভাবছি। খোকাটাকে এনে রাখতে হবে আর কি! দেখি কী হয়। যাবো বললেই তো আর এখুনি যাওয়া হচ্ছে না, বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হবে তার আগে। এমনি ভাবছিলুম কথাটা!'

আর কোন কথা বলার অবকাশ হয় না। ওঘরের দোর খোলার আওয়াজ হয়েছে, শ্যামা উঠে পড়েছেন। ঘাট থেকে ঘুরে এসেই রান্না চাপাবেন।

কনকও উঠে দোর খুলে ও-ঘরে চলে যায়। আঁচলটা পেতে ঠাণ্ডা মেঝেটায় শুয়ে পড়ে সে। শ্রান্তিতে ও শান্তিতে চোখের পাতা দুটো বুজে আসছে তার—কিছুতেই যেন চেয়ে থাকতে পারছে না!

হেম ফিরলো গভীর রাত্রে। এরা সকলেই তখন উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে।

তরু আর হারান হঠাৎ এসে পড়েছে বিকেলে—আজ থাকবে তারা। তরু অনেকদিন পরে বেশ হাসি-হাসি মুখেই এসেছিল, চাপা মেয়ে—তবু চোখে খুশির আভা স্পষ্ট। খুশির কারণটাও খুলে বলেছে সে কনককে এসেই। সতীন ক'দিন ধরে খুনসুটি ক'রে ক'রে ওর সংগে ঝগড়া বাধাচ্ছিল, সেটা লক্ষ্য ক'রে—তরু কিছু না বলতেই—আজ ওকে নিয়ে হারান এখানে চলে এসেছে, তাকে জব্দ করবার জন্যে।

কিন্তু এখানে এসে কথাটা শুনে তারও মুখ শুকিয়ে গেছে। হাজার হোক মার পেটের ভাই—তারই ঠিক পরের পিঠোপিঠি ভাই। মধ্যে একটা হয়ে নাকি মারা গেছে কিন্তু সে কথাটা বোঝবার মতো বয়স তখন ছিল না তরুর—একেই সে দেখেছে তার পরে। খেলা করেছে এর সংগে। এর ওপর কত আশা-ভরসা মায়ের তাও সে জানে। সেও তাই জেগে বসে আছে খবরটা শোনবার জন্যে।

রাত হচ্ছে দেখে শ্যামার এক একবার মনে হচ্ছিল যে হেম বুঝি আজও তার বাঁধা সাপ্তাহিক আড্ডায় গেছে—সে সন্দেহ মুখেও প্রকাশ করেছিলেন একবার। কিন্তু কনক জানে যে তা নয়। সে একবার নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রতিবাদও ক'রে ফেলল, 'আমার তো তা মনে হয় না মা, তিনি জানেন যে এখানে সবাই ভাবছে!' বলেই লজ্জিত হয়ে

পড়ল। মার সামনে কথাটা বলা ভাল হয় নি। বড় বেশী গিন্নেমো হয়ে পড়ল। শ্যামা একবার এ পাশ ফিরে চাইলেনও। অন্ধকারে দৃষ্টির তীক্ষ্নতা দেখা না গেলেও সেটা বেশ অনুভব করল কনক। অর্থাৎ বৌ তাঁর ছেলের খবর তাঁর চেয়ে বেশী রাখতে শুরু করেছে!

তা তিনি যা-ই মনে করুন—কনকের এটুকু বিশ্বাস আছে হেমের ওপর। আজ অন্তত আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করবে না সে—এটুকু দায়িত্বজ্ঞান তার আছে। খবরটাই ভাল নয় নিশ্চয়। আর সেই সম্পর্কিত কোন কারণেই এতটা রাত হচ্ছে।

হেম ফিরল দশটারও পর।

মুখ অন্ধকার ক'রেই ফিরল সে। এরা তারই আসার অপেক্ষায় বসে আছে জেনেও সে কারও সঙ্গে কোন কথা কইল না, সোজা জুতো ছেড়ে নিজের ঘরে অর্থাৎ রান্না-ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কোন রকম সম্ভাষণ পর্যন্ত না ক'রে সটান ঘরে চলে যাওয়া তার পক্ষে নূতন কিছু নয়। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা অন্য রকম। সে জানে যে আজ তার মুখ থেকে খবর শোনবার জন্যই এরা অপেক্ষা ক'রে আছে। তবুও কোন কথা না বলে ভেতরে চলে যাওয়ার কারণটা সুস্পষ্ট।

অর্থাৎ কোন দুঃসংবাদ আছে।

কিন্তু কী সে দুঃসংবাদ? ঠিক কতটা খারাপ? সেটা-ও তো জানা দরকার।

প্রশ্নটা সকলের ঠোঁটের কাছে এসে নিঃশব্দে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। কেউই উঠতে পারল না কিন্তু। গিয়ে জিজ্ঞাসা করার সাহসও নেই কারো।

শ্যামা কোন কথাই বলতে পারছেন না। ঠোঁট দুটো বড় বেশী কাঁপছে তাঁর কথা কইবার চেষ্টা করলেই।

অনেকক্ষণ পরে কোনমতে বলেন শুধু, 'তুমি একবার যাও বৌমা!'

কনক ঘাড় নাড়ে।

'আপনিও চলুন মা। আমার ভরসা হচ্ছে না।'

তবুও যেন শ্যামা উঠতে পারেন না।

অথচ একজনের যাওয়াও দরকার। লোকটা সেই ভোরে বেরিয়ে এতক্ষণ পরে তেতেপুড়ে বাড়ি ফিরেছে। তারও একটু স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা দরকার।

তাছাড়া এ সংশয়ও সহ্য হচ্ছে না।

অগত্যা শ্যামাকেই উঠতে হয়। রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়ান তিনি। প্রশ্ন করতে সাহস হয় না তখনও।

হেম এসে জামা-কাপড় সুদ্ধই শুয়ে পড়েছিল। এদের দেখে এবার উঠে বসল।

তাকে কোন প্রশ্নও করতে হ'ল না। নিজে থেকেই সে জানাল সব কথা।

কিন্তু জানাবারও বিশেষ কিছু ছিল না।

তার বক্তব্য থেকে এইটুকুই শুধু জানা গেল যে সে বিশেষ কিছুই জানতে পারে নি।

রতন দেখা করে নি তার সঙ্গে। রতনের নাকি শরীর খারাপ—দেখা করা সম্ভব নয়। মোক্ষদা এসে বলেছে যা কিছু। হ্যাঁ, পরীক্ষায় ফল একেবারেই ভাল হয় নি তাই এসব সংসর্গ থেকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছেন তার মনিব। কোন্ দেশ, কী ঠিকানা এমন কি কোন্ ইস্কুলে পড়ছে তাও বলতে পারবে না সে। ঠিকানা নাকি রতনও জানে না। তাকে এ নিয়ে বিরক্ত ক'রেও লাভ নেই। বাবু এলে সে ঠিকানা জেনে রাখতে পারে। কিন্তু বাবুও এখন কলকাতায় নেই—তিনি বাঙ্গাল দেশে কোথায় গেছেন

একটা বড় মকদ্দমা নিয়ে—ফিরতে আরও দশ বারো দিন দেরি হবে।

এ ছাড়া আর কিছুই জানা যায় নি। বহু জেরা, এমন কি অনেক অনুনয় বিনয় ক'রেও নয়। এমন ব্যবহার এর আগে আর কখনও করে নি ওরা। হেম যখনই গেছে, ওপরে ডেকে পাঠিয়েছে রতন। চা জলখাবার খাইয়েছে জোর ক'রে। আজ এমন ভাব দেখাল মোক্ষদা, যেন সে কোন অবাঞ্ছিত অনুগ্রহপ্রার্থী, অকারণে উত্ত্যক্ত করতে গেছে! রতনের বাবার সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছিল হেম—তাও পারে নি। মোক্ষদা বলেছে, বাবুর শরীর ভাল নয়, আর মেজাজ তো জানেনই কী রকম—ও দেখা না করাই ভাল। তাছাড়া তিনি তো জানেও না কিছু। এ সব ঝামেলা ভালবাসে না তিনি মোটে!'

এর পর আর কি বলবে হেম। চলেই এসেছে।

আসার মুখে সে একেবারে মহাদের বাড়ি হয়ে এসেছে।

অভয়পদকে জানিয়ে এসেছে সব কথা। তাকেই বলে এসেছে হেম—একদিন গিয়ে ঠিকানাটা নিয়ে আসতে। তার আর যাবার ইচ্ছে নেই। ভালও দেখায় না। অভয়পদ অবশ্য এক কথাতেই রাজী হয়েছে। সব কথা শুনে সেও খুব দুঃখিত, লজ্জাও পেয়েছে একটু। কিন্তু দু-একদিনের মধ্যে পারবে না সে। কোমরে প্রকাণ্ড একটা ফোড়া হয়ে কষ্ট পাচ্ছে। জ্বরও হয়েছে তার তাড়সে—ফোড়াটা না ভাল হ'লে যেতে পারবে না।

তার মানে এখনও অন্তত সাত-আট দিন না গেলে কোন খবরই পাওয়া যাবে না।

কী আর বলবেন শ্যামা। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে।

তাঁর আজকাল আর দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়ে না, এক এক সময় নিজেই ভাবেন--ভেতরটা কি তাঁর পাথর হয়ে গেল নাকি?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

অভয়পদ ভাল হয়ে উঠে ঠিকানা সংগ্রহ করার আগেই কান্তির কাছ থেকে একটা চিঠি এল। সম্ভবত রতনদের দিক থেকে কোন রকম তাড়া দেবারই ফল এটা। সামান্য চিঠি, তবে তারই হাতের লেখা বটে।

গোনা দুটি ছত্র লিখেছে সে,—'আমি ভালই আছি, আমার জন্য চিন্তা করিবেন না।'

চিঠির সঙ্গে ঠিকানাও আছে। আরামবাগ এলাকারই ছোট গ্রাম একটা। তারকেশ্বর লাইনের এক স্টেশন থেকে নেমে গোরুর গাড়ি ক'রে যেতে হয়—বেশ খানিকটা পথ।'

ঠিকানা পাওয়ার আগে যতটা ব্যাকুলতা ছিল—পাওয়ার পর আর ততটা রইল না। এখন যেন সে অনেকটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসে গেছে—ইচ্ছে করলেই আনিয়ে নেওয়া যায়। সুতরাং এখন আর তেমন দুশ্চিন্তা নেই।

কনক অবশ্য বলল, 'আপনি লিখেই দিন মা আসতে। যা হবার এখানে এলে হবে। পড়াশুনো করতে চায়, এখানেও তো ইস্কুল আছে।'

শ্যামাও ভেবেছেন অনেক। তিনি বললেন, 'তা তো আছে কিন্তু সেখানে একগাদা খরচ-পত্তর ক'রে ভর্তি হয়েছে নিশ্চয়, বইও কিনে দিয়েছে ওরা সব। এখানে এলে সে

সমস্তই বরবাদ হবে। সেখানকার এক রকম বই, এখানে হয়ত অন্য রকম। একটা বছর নষ্ট হ'ল, আবারও একটা বছর নষ্ট করব? খানিকটা পড়তে পড়তে চলে আসবে আধাখ্যাঁচড়া হয়ে—এখানে এসে যদি এখানের পড়া ধরতে না পারে? খরচও তো হবে একগাদা। ইস্কুলের মাইনে আছে, বই কেনা আছে। অত পেরে উঠব কেন? থাক্ কাদায় গুণ ফেলে এই ক'টা মাস, যা হয় হবে!'

তবু কনক একবার বলতে গেল, 'কিন্তু পাসের পড়া তো সব ইস্কুলেই এক রকম হয় শুনেছি মা!'

শ্যামা বললেন, 'না না। আমি হেমকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, সে বললে, মোটামুটি পড়াটা এক—কিন্তু বই আছে অনেক রকম। এক এক ইস্কুলে নাকি এক এক বই পড়ায়। যে ইস্কুলে ভর্তি হবে, সেই ইস্কুলের মতো বইও নাকি চাই। নইলে নাকি খুব মুশ্-কিল হয়ে পড়ে, রোজের পড়াটা পড়তে পারে না।'

প্রসঙ্গটা ঐখানেই চাপা পড়ে যায়।...

কনকের—কে জানে কেন—খুব ভাল লাগে না এদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু কিছু বলতেও পারে না সে। শাশুড়ীর কাছে জোর ক'রে বা জেদ ক'রে কিছু বলার সাহস তার নেই। বলতে পারত হয়ত হেমের কাছে—কিন্তু সেখানেও একটা বাধা দেখা দিয়েছে! বেশী বললে হেম মনে করতে পারে যে তার ভাইয়ের কল্যাণ-চিন্তার চেয়ে কনকের স্বার্থ-চিন্তাটাই বড় কথা এর মধ্যে। তার কারণ খুব সম্প্রতি, মাত্র দুদিন আগেই কথাটা উঠেছিল। হেমের বদলির কথা।

হেম বলেছিল, 'এদিকে দ্যাখো না মজাটা। অন্য সময় কোন আর্জি জানালে ওপর-ওলাদের কাছে, কত অসুবিধে হয়—এখন বলতে না বলতেই তো মঞ্জুর হয়ে যাচ্ছে দেখছি। জামালপুরে নাকি লোক দরকার—কেউ নাকি যেতে রাজী হচ্ছে না। আমি বলতেই বড়বাবু লাফিয়ে উঠলেন একেবারে। বললেন—এক্ষুনি, এক্ষুনি! বল তো নতুন কোয়ার্টার ভাল দেখে দিয়ে দিচ্ছি ব্যবস্থা ক'রে!'

'তারপর?' রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে কনক।

'মুশকিল হয়ে গেছে যে। আমি এখন যাই কী ক'রে? কথাটা তুমি সেদিন ঠিকই তুলেছিলে। তখন অত ভাবি নি। কিন্তু এখন যত ভাবছি ততই দেখছি যে ঐ জন্যেই শেষ পর্যন্ত যাওয়া আটকাবে আমার। বাড়িতে কে থাকবে। খেঁদির ওপর তো কোন ভরসাই নেই। খোকাকে ওখান থেকে ইস্কুল ছাড়িয়ে আনতে গেলে সেখানের সব বই নষ্ট হবে, এখানে আবার নতুন ক'রে কিনতে হবে। বছরের গোড়াতে হ'লে তবু এর-ওর কাছে চেয়ে-চিন্তে পাওয়া যায়—অন্তত কতকগুলো তো পাওয়া যায়ই—এখন আর কে দেবে? মা শুনলেই ক্ষেপে যাবে। তবু তো মা মনে করে সেখানের সব খরচাই মেসোমশাই দেন, মা তো অত জানে না যে আমিও কিছু কিছু দিই।......সেও না হয় হ'ল—কিন্তু অঘ্রাণ মাস না এলে কিছুই করা যাচ্ছে না দেখছি। একটা ক্লাসে উঠলে ছাড়িয়ে আনা অনেকটা সহজ হয়ে পড়ে। সেখানে ছোট মাসিরও অবশ্য খুব কষ্ট হবে, হাত-নুড়কুৎ হয়ে উঠেছিল তো খানিকটা!'

সেই সময়েই কনক বলেছিল কথাটা। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি কি একেবারে না বলে দিয়েছ?'

'বলি নি এখনও, কিন্তু বলতেই তো হবে। উপায় কি বলো?'

'দুটো একটা দিন দ্যাখো না। ঠিকানাটা আসুক—যদি মেজ ঠাকুরপোকে এখানে আনানোই হয় তো—। তোমার অত ইচ্ছে বলেই বলছি।'

তাড়াতাড়ি যোগ করে সে শেষের কথাগুলো।

'হ্যাঁ—তাহ'লে তবু হয় বটে একটা উপায়। তবে তারও তো পাসের পড়া। তার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে চলে যাওয়া—। সেও ভাবছি। দেখি। ওর খবর তো আসুক আগে।'

এই কথার পর কনকের তরফ থেকে তাকে আনানোর জন্য পীড়াপীড়ি করলে একটা কদর্থ হওয়া স্বাভাবিক।

কী মনে করবে হেম। বড় বেশী লোভী আর স্বার্থপর ভাববে হয়ত। ছিঃ। সে ভাল নয়।

ওদের ছেলে—ভাল-মন্দ ওরা না বোঝে, তারই বা এত দায় কি!'

তার বাইরে গিয়ে সংসার পাতার প্রশ্ন? সে না হয় আর কিছুদিন পরেই হবে। এত দিন যখন এখানে থাকতে পেরেছে, আরও কটা মাস অনায়াসে পারবে। তার সে-জন্যে অত তাড়াও নেই! স্বামীকে যদি পায় সে—সব কষ্টই সহ্য হবে তার। আর হেম তো বলেইছে, অঘ্রাণ মাসে খোকাকে আনানো যেতে পারে, সেই সময়ই বরং সুযোগ বুঝে কথাটা মনে করিয়ে দেবে একবার!

কিন্তু অঘ্রাণ মাসে আর কথাটা পাড়া যায় না।

অনির্দিষ্ট কালের জন্যে চাপা পড়ে যায় কথাটা তার আগেই।

আশ্বিন মাসের গোড়াতেই ঐন্দ্রিলা চলে গেল।

তার চলে যাওয়া কিছু এমন অভিনব নয়, ওটা আজকাল বরং নিয়মিত হয়ে উঠেছে; দু-তিন মাস ওখানে—দু-তিন মাস এখানে, এই ভাবেই চলে। তাই এবারও, যাওয়ার সময় কিছুই বুঝতে পারেন নি শ্যামা। কোন সন্দেহও হয় নি তাঁর। বরং এখন দুটো-তিনটে মাস অন্তত কলহ-কচকচির হাত থেকে অব্যাহতি পাবেন—এই ভেবে মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

খুব একটা কিছু নতুন রকমের অপ্রীতিকর ব্যাপারও ঘটে নি।

যেমন হয়—ঝগড়াটা একদিন চরমে উঠলে মেয়ের হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে আর গালাগাল দিতে দিতে বেরিয়ে যায়—তেমনি গেছে। শুধু এবার একেবারে ভোর থেকেই আরম্ভ করেছিল বলে এক সময় হেম তেড়ে এসেছিল, 'চুপ করবি, না কি? এবার একদিন বুকে বসে সাঁড়াশি দিয়ে জিভ্ ছিঁড়ে বার করব—চিৎকার করা জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেব!'

এই! তারপরই তো সে অফিসে বেরিয়ে গেছে। ঐন্দ্রিলা চালিয়েছে দুপুর পর্যন্ত। আর হেমের তেড়ে আসাও একেবারে নতুন নয়। এর আগেও—তার সামনে খুব বাড়াবাড়ি হ'লে—এমন তেড়ে এসেছে, গাল-মন্দও দিয়েছে।

সুতরাং অকস্মাৎ এ কাণ্ডর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না শ্যামা আদৌ।

খবরটা পাওয়া গেল কদিন পরেই—ঠিক পুজোর মুখটাতে।

সেদিন বোধ হয় পঞ্চমী কি ষষ্ঠী।

খবর আনল—চিরকাল যে ভগ্নদূতের কাজ করছে—সেই মহাশ্বেতাই।

দূর থেকে তার আসার ভঙ্গি দেখেই কনকের বুক কেঁপে উঠেছিল। ও রকম ছুটতে ছুটতে, মহাশ্বেতার নিজের ভাষায় 'রুদ্ধু শ্বাসে', আসা মানেই কোন নিদারুণ সংবাদ। সুসংবাদ আর তাদের কী আসবে—নিশ্চয়ই দুঃসংবাদ।

আর সেই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হ'ল।

সেদিন গোটা বাগান ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার ক'রে বেলা তিনটের সময় সবে খেতে বসেছেন শ্যামা—মহাশ্বেতা এসে সামনে বসে পড়েই বলল, 'শুনেছ, তোমার মেজ

মেয়ের কীর্ত্তি!'

কনক ভেবেছিল চোখ টিপে দেবে, সারা দিনের পর খেতে বসেছেন বেচারী, কোন দুঃসংবাদ হয় তো দু মিনিট পরে বলাই ভাল— কিন্তু সে সুযোগই পেল না সে। মহাশ্বেতা কোন দিকেই চাইল না। মা এত বেলায় কেন খেতে বসেছেন সে প্রশ্নও করল না। যখন কোন বড় খবর তার মাথার মধ্যে থাকে—তখন আর কোন কিছুই মাথায় ঢোকে না। সে নিজে থেকে অবস্থা বুঝে বিবেচনা করবে—খেয়ে নিতে সময় দেবে সে আশা বৃথা।

শ্যামার উদ্যত আহার্যের গ্রাস মুখের কাছ থেকে নেমে আসে আবার। তাঁরও বুকটা ধ্বক করে ওঠে। দুঃসংবাদ আর অমঙ্গল—এইতেই তো অভ্যস্ত তিনি। তবু এখনও একবার বুকটা কেঁপে ওঠে বৈকি!

'না তো। কী কীর্তি?'

'তিনি যে রাঁধুনীর চাকরি নিয়েছেন!'

'চাকরি নিয়েছে? রাঁধুনীর? সে কি!'

খাবারের থালাটা ঠেলে দিয়ে সরে বসেন শ্যামা।

'আপনি খেয়ে নিন্ মা—খাওয়াটা শেষ ক'রে উঠুন। সারা দিনের পর—। ঠাকুর-ঝিও আর কথাটা বলার সময় পেলেন না। যা হবার তা তো হয়েইছে আর হবেও, খাওয়ার মধ্যেই কথাটা না বললে হ'ত না?'

কনক আর থাকতে পারে না। তার কণ্ঠস্বরটা আপনা থেকেই একটু তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

মহাশ্বেতাও এবার একটু অপ্রস্তুত হয়।

'সত্যিই তো, তুমি বাপু খেয়েই নাও না! কথা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আমি না হয় বসছি দু দণ্ড। যা হবার তো হয়েই গেছে। সে কথা যথার্থ, লেহ্য কথা। তা তোমারই বা এমন তিনপোর বেলায় খাওয়া কেন?'

কিন্তু শ্যামা ঘাড় নাড়েন, 'আমি আর খাব না। থালা সরিয়ে দিয়েছি, বিধবা মানুষ আর খাওয়া চলবেও না। একটু তো খেয়েছি—ওতেই চলে যাবে আমার। তুই বল।'

'বলব আর কি বলো। মুখটা তো দিন দিনই উজ্জ্বল হচ্ছে আমার! এক-একজন এক-একবার ক'রে মুখ পোড়াচ্ছেন আর শত্তুর হাসছে। এই তো খবর দিলেন মেজ-গিন্নি স্বয়ং—কী হেসে হেসে আর টিপ্পুনি কেটে কেটে বলার ঢং। যেন আমার দুঃখে গলে পড়ছেন একেবারে।'

'তা সে কবে নিলে এ কাজ? কোথায়ই বা নিলে!

'নিয়েছে নাকি পরশু থেকে। কি তার আগের দিন থেকে। অত পোষ্কার ক'রে শুনি নি বাপু। নিয়েছে আবার কোথায়—যাতে আমাদের মুখটা বেশী করে পোড়ে তাই করা চাই তো তার! মেজগিন্নীরই কে মামাতো বোনের বে হয়েছে ঐ ওদিকে কোথায় ডোমজুড়ের কাছে—বর বুঝি উকিল, মস্ত সংসার তাদের—সেইখানে চাকরি নিয়েছেন। তা নিলি নিলি পরিচয়টি হাটিপাটি পেড়ে না দিলে হ'ত না। সেই উকীল বোনাই ওঁর সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠিয়েছেন মেজকত্তার আপিসে—ওদের আবার কে যেন কাজ করে ঐ আপিসে—সে-ই এসে বলে গেছে মেজকত্তাকে। ছি ছি। কথাটা যখন বললে মেজগিন্নী, তখন মনে হ'ল ধরিত্তির দ্বিধা হও মা, আমি প্রেবেশ করি। কোন দিক দিয়ে আর আমার মুখ পুড়তে বাকী রইল না। নিত্যি এক এক কেলেঙ্কার লেগেই আছে আমার বাপের বাড়িতে।'

আড়ষ্ট হয়ে বসে শুনছিলেন শ্যামা এতক্ষণ।

এইবার শুধু প্রশ্ন করলেন, 'তা তার মেয়ে? মেয়েকে নিয়ে গেছে?'

'কৈ মেয়ের কথা তো বললে না কিছু। মেয়ে সুদ্ধ আর কে চাকরি দেবে। মেয়ে বোধ হয় রেখে গেছে শ্বশুরবাড়ি। কে জানে? কে আবার খবর নিচ্ছে খুঁটিয়ে। আমি কি আর এই সুখবর কানে শোনবার পর কোন-কিছু জিজ্ঞেস করেছি! যা বলেছে, ওরাই বলে গেছে নিজগুণে।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'মুখটা কি আর তোমার এক মেয়ের বাড়ি পুড়ল—তা যেন স্বপ্নেও ভেবো না। সব মেয়েরই মুখ ওজ্জ্বল হ'ল একেবারে। মেজবোয়ের ঐ মামাতো বোনের বড় জা আবার হ'ল কে জানো—হারানের ঠাকুমার সম্পর্কে ভাই-ঝি। আপনার ভায়ের মেয়ে নয়, বুড়ির নাকি নিজের ভাই কেউ ছিল না, খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই হবে। জ্ঞাতি। তা খবরটা কি আর সেখানে পেঁাচচ্ছে না মনে করো!'

শ্যামা উঠে পড়েছেন ততক্ষণ।

পাতের খাবার কনক গুছিয়ে রাখবে। তাকেই খেতে হবে রাত্রে। এ বাড়িতে খাদ্য কিছু ফেলার রেওয়াজ নেই। সীতা থাকলে সে খায়—নইলে কনককেই উদ্ধার করতে হয়। নেহাৎ ডাল ঝোল মাখা ভাত থাকলে ফেলা যায়—তাও সীতা থাকলে তাকে খাওয়ানো হয়—কিন্তু সাদা ভাত বা আস্ত রুটি—রুটি কদাচিৎ হয়—চালের ক্ষুদ ও ডালের ক্ষুদ মিশিয়ে সরুচাকলিই বেশী—এসব ফেলার কথা ভাবতেই পারেন না শ্যামা। যদিচ একটা অদ্ভুত উদারতা তাঁর আছে—বোধ হয় নিজে বহুদিন ধরে অন্নের কষ্ট পেয়েছেন, উপবাস ক'রে দিনের পর দিন কেটেছে বলেই—দুপুরের দিকে কোন ভিখারী এলে ফেরান না। পাতা পেতে উঠোনে বসিয়ে ভাত খাইয়ে দেন। নিজের ভাতও অনেকদিন ধরে দিয়েছেন, পাতার জ্বালে নিজের মতো ভাত ফুটিয়ে নিয়েছেন পরে। তেমন বেলা হ'লে নিজের জন্যে আর রান্নাও করেন না, যা হোক মুড়ি বা ক্ষুদ-ভাজা খেয়ে কাটিয়ে দেন। কিন্তু তাদেরও—পাতের এঁটো ভাত দেন না। বলেন, 'বাপরে, ওরা হ'ল নারায়ণ, জন্মের মধ্যে কম্ম একদিন দুটো ভাত খেতে বসেছে আমার বাড়ি, এঁটো ভাত দিতে পারব না!'

শ্যামা পুকুরে চলে গেলেন আঁচাতে, কিন্তু তাতে মহাশ্বেতার উৎসাহ কিছুমাত্র কমল না। সে কনককে উদ্দেশ ক'রেই বলে চলল, 'ঐ হারানই কি কম কেলেঙ্কারটা করল! সে নিয়ে অমনি আমার বাড়িতে কথায় কথায় হাসাহাসি আর টিটকিরি। আমার ছেলেগুলো সুদ্দু এমন বোকা—মুখ্যুর ডিম তো সব তার হবে কি—আপনার পর হুস্যিদিঘ্যি জ্ঞান আছে?—ওরা সুদ্দু শত্তুরদের সঙ্গে হেসে গড়িয়ে পড়ে একেবারে—কথা উঠলে হয়। আবার আমার গুণের মেয়ে মেসোমশাই বলেন না, বলেন, তোমার বোনাই, তোমার ভগ্গিনপোত—এই সব! হবে কি, দিন রাত ঐ মহারাজা মহারাণীর কাছে শিখ্‌নে পাচ্ছে তো—কত ভাল আর হবে বলো! ঐ মেয়ে হ'তে আমার হাড় ভাজাভাজা যদি না হয় এর পরে তো আমি কী বলেছি। তোমরা দেখে নিও!'

হারানের ব্যাপারটা হাসবার মতোই বটে। মনে হ'লে কনকেরও হাসি পায়। শুনেছে সেও মহার ছেলে-মেয়েদের কাছেই। মহার কোন ভাগ্নে বুঝি হারানের সঙ্গে কাজ করে—সেই এসে বলেছে। প্রথম যেদিন শুনেছিল কনক, সেদিন মুখে কাপড় গুঁজেও হাসি চাপতে পারে নি। ও-ঘর থেকে এসে রান্না-ঘরে শুয়ে পড়েছিল হাসতে হাসতে।

তরুর একটি ছেলে হয়েছে। তরুর সতীনও নাকি পূর্ণ গর্ভবতী। ঘরে জোড়া খাটে বড় একটা ঢালা বিছানা করে দুই বৌকে নিয়ে এক বিছানাতেই শোয়। দুই বৌ দুদিকে থাকে, মাঝে হারান।

এ সব কথা হারানই নাকি গল্প করেছে আফিসে।

বেশ গর্বের সঙ্গেই নাকি সে এ সব গল্প করে।

আফিসের বন্ধু বুঝি কে একদিন এই কথা শুনে একটু খোঁচা দিয়ে বলেছিল, 'কী ক'রে দুটোকে সামলাও ভায়া—কীভাবে জল খাওয়াও বাঘে গরুকে এক ঘাটে—একটু শিখিয়ে দাও না!' তাতে উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে থিয়েটারী বক্তৃতার মতো বলেছে হারান, 'হুঁ—হুঁ—তোমাদের মতো ছটাকখানেক প্রাণ নিয়ে ঘর করে না এ শর্মা। মরদ বাচ্ছা, বুঝলে? যে খাওয়াতে জানে সে বাঘে গরুকে এক ঘাটেই জল খাওয়ায়। আমার কাছে ও সব নেই। ঢাকঢাক নেই, অর্শদর্শও নেই। দুজনেই সমান আমার কাছে, সমান ব্যবহার পাবে। কম-বেশী কাউকে দেখব না—ব্যস। এক ঘরে এক বিছানায় শান্তিতেই শুচ্ছি। লোকের বাড়িতে সতীন থাকলে আলাদা আলাদা ঘরে রেখেও শান্তি পায় না, বাড়িতে কাক-চিল বসে না একেবারে। আমার বাড়িতে যাও, দেখবে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। শব্দ করবে কেন, পুরুষের দাপট থাকলে মেয়েদের সাধ্যি কি যে টুঁ শব্দ করে! আমার খুশি, আমি দুটো ছেড়ে চারটে বে করব—তোমার কি? তুমি তোমার পাওনাগন্ডা পেলেই তো হ'ল! বুঝলে, এ তোমরা নও। সংসারে আদর্শ স্থাপন ক'রে যাব—দেখবে এব পর লোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে—হ্যাঁ, মরদ বাচ্ছা বটে। মরবার পর জীবনী লিখে বাহা বাহা করবে।'

সত্যিই বাপু বাহাদুরী আছে হারানের! শান্তিতেই তো আছে। তরুকে অনেক জেরা করেছে কনক—মোটামুটি শান্তিতেই আছে, ঝগড়া কচকচি নেই। তরু না হয় ভালমানুষ কিন্তু তার সতীনটি যেমন পাড়াগাঁয়ের সাধারণ মুখরা মেয়ে হয় তেমনিই। তার ওপর আবার বাপসোহাগী, আদুরী মেয়ে। তাকে যে শাসনে রেখেছে সেটা খুব কম কথা নয়!...

মহা আরও খানিকটা বকে কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেল। শ্যামা খুব যে একটা বিচলিত হয়েছেন তা তাঁর আচরণে বোঝা গেল না—অভ্যস্ত কাজ-কর্ম সবই ক'রে যেতে লাগলেন তিনি—কিন্তু তাঁর গম্ভীর মুখ দেখেই বুঝতে পারল কনক যে মনের মধ্যে তাঁর গভীর আলোড়ন চলছে একটা। দুটি ওষ্ঠের এই বিশেষ ভঙ্গি এতদিনে কনকের পরিচিত হয়ে গেছে। শ্যামার পূর্ব সৌন্দর্যের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই বিশেষ—শুধু মুক্তোর মতো সাজানো দাঁত এবং পাতলা ঠোঁট দুটি এখনও অবশিষ্ট আছে। হাসলে এখনও সুন্দর দেখায়, তেমনি ঐ দুটি ঠোঁট যখন পরস্পরের সঙ্গে গাঢ়সম্বন্ধ হয়ে চেপে বসে—তখন সমস্ত মুখটা এমন কঠিন ও পরুষ দেখায় যে এখনও কনকের বুকের মধ্যেটা গুরগুর করতে থাকে! রূঢ় ভাষা যে বেশী ব্যবহার করেন শ্যামা তা নয়, অভদ্র ভাষা এখনও তাঁর মুখে আটকে যায়—কিন্তু এই সব সময়গুলোতে যখন কথা বলেন কিছু, তখন যার সম্বন্ধে বলেন তার গায়ে যেন কেটে কেটে বসে। একেই বুঝি কবিরা বলেছেন বাক্যবাণ। এমন তীক্ষ্ন ও অন্তর্ঘাতী ভাষা যে কোথায় পান শ্যামা তা কনক অনেক চেষ্টা ক'রেও ভেবে পায় না। আবার এক এক সময় ভাবে সে, এ হয়ত দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর জীবন-সংগ্রামেরই ফল, হয়ত এই বয়সে তারও মুখে এই ধরণের কথা আপনিই যোগাবে।

আজ কিন্তু সে রকম আঘাত কারুর ওপর পড়ল না। পাতা চাঁচতে চাঁচতে অনেকক্ষণ পরে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন শ্যামা, 'ঐ মেয়ে নিয়ে বৌমা আমার শ্মশানে গিয়েও শান্তি হবে না। পরের বাড়ি গিয়েও যদি শান্ত হয়ে থাকতে পারত, যদি টিকে থাকত তো আমার বলবার কিছু ছিল না। একটা কাজ নিয়ে থাকা তো ভালই—আমার অত লজ্জা-সরম নেই, রাজ-রাজেশ্বরের মেয়ে নয় তো যে খেটে

খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। আমার ভাবনা হচ্ছে যে জাতও যাবে পেটও ভরবে না। ওখানেও টিকতে পারবে না—দেখো ঝগড়াঝাঁটি ক'রে অপমান হয়ে বেরিয়ে আসবে। যারা পয়সা দিয়ে লোক রাখবে তারা অত ঝাল সহ্য করবে না তো। শুধু এর জন্যে কুটুম্ব-সাক্ষাতের কাছে মাথা হেঁট করা—মুখ পুড়নোই সার হবে!'

খানিকটা পরে আবার বলেন, 'শুধু কি একটা ভয়? এখনও ঐ রূপ দেখছ তো—আগুনের মতো। পরের বাড়ি হয়ত এক ঘর পুরুষের মধ্যে থাকা। কার খপ্পরে পড়বে, কী করবে—সেই আরও ভয়। আরও কত মুখ পুড়বে এই ভয়ে সর্বদা কাঁটা হয়ে থাকা!'

কনক চুপ ক'রেই শোনে বসে বসে। কী বলবে সে! আর উত্তরের জন্যও বলেন নি শ্যামা, এটা তাঁর স্বগতোক্তি কতকটা।

খানিকটা আরও নিঃশব্দে পাতা চাঁচবার পর বললেন তিনি, 'গেল তো মেয়েটাকেই বা ওখানে রেখে গেল কেন? সেই মতলবই যদি ছিল তো এখানে রেখে গেলেই হ'ত। তবু তুমি একটু দেখতে শুনতে পারতে। ওখানে একা থাকলে একেবারে চাষার ঘরের মেয়ে তৈরী হবে, তুমি দেখো!'

এইবার কনক কথা বলল, 'তা ওকে না হয় আনিয়ে নিন না মা!'

'কখ্খনও না!' তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠেন শ্যামা, 'এমন অন্ধ মায়া আমার নেই মা। এক তো যেচে অপমান হতে যাওয়া—তারা যদি বলে ওর মা আমাদের কাছে দিয়ে গেছে, তোমাদের বাড়ি পাঠাব না—তখন মুখটা কোথায় থাকবে! তার ওপর তাঁকেও তো চিনি, এখানে এনে রাখব—যদি কোন রকম পান থেকে চুন খসে তো কৈফিয়ৎ চাইবেন—কেন আমার মেয়েকে আনতে গিছলে তোমরা, কিসের জন্যে!...না মা, বেশ আছি। অত টান আমার কারুর ওপর নেইও আর। ঢের শিক্ষা হয়েছে—ঢের পেয়েছি, আর কেন! ও মেয়ে যদি ওখানে মরেও যায় তো নিজে থেকে আনতে যাব না!'

এর পর আর বলবার কিছু নেই। কনক চুপ ক'রেই থাকে। কিন্তু ওর সত্যিই মন-কেমন করে মেয়েটার জন্যে। কাছে থাকলে তবু সময় কাটে একটু। তার সঙ্গেই তবু গল্প করা যায়। এ নিঃসঙ্গ ও নিঃশব্দ পুরীতে যেন মাঝে মাঝে দম আটকে আসে কনকের।

॥ ২ ॥

অঘ্রান মাসের পয়লা তারিখেই হঠাৎ একটা পাল্কি এসে থামল কনকদের বাগানে। দুপুর পার হয়ে গেছে বিকেল শুরু হয় নি—এমনি সময়টা, শ্যামা খেয়ে আঁচিয়ে উঠে ঘাটের ধারে দাঁড়িয়েই রোদ পোয়াচ্ছেন। উঠোনে এত গাছপালা হয়েছে যে ভাল ক'রে রোদ নামেই না কখনও।

হঠাৎ পাল্কি আসতে দেখে শ্যামা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, কনকও বাড়ির ভেতর থেকে শব্দ পেয়েছিল, সেও ছুটে বেরিয়ে এল। তাদের বাড়িতে আবার পাল্কি ক'রে কে আসবে। এতকালের মধ্যে তো কাউকে আসতে দেখে নি সে।

পাল্কির পিছনে পিছনে একজন পিলেরোগা ধরনের ক্ষয়া-ঘষা মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আসছিলেন, এতক্ষণ ওরা দেখতে পায় নি। তিনি পাল্কি-বেয়ারাদের সঙ্গে অত দ্রুত চলতে পারেন নি—পিছিয়ে পড়েছিলেন। এইবার তিনি ছুটে এগিয়ে এসে পাল্কির দোর খুলে কাকে যেন হাত ধরে আস্তে আস্তে টেনে বার করলেন। তারপর তাকে

জড়িয়ে ধরে প্রায় বয়ে আনার মত ক'রেই বাইরের ঘরের রকে বসিয়ে দিলেন। একটা সাদা বোম্বাই চাদর মুড়ি দেওয়া মানুষ—ঠকঠক ক'রে কাঁপছে সে, আর কী রকম একটা অব্যক্ত আওয়াজ করছে।

মুড়ি দেওয়া হলেও মেয়েছেলে নয় এটা বোঝা-গেল। খানিকটা কোঁচা ঝুলে পড়েছে এদিকে—অর্থাৎ পুরুষ।

সঙ্গের অভিভাবকটি এতক্ষণ এদের সঙ্গে একটিও কথা বলেন নি, এদিকে ফিরে তাকান নি। এবার এদিকে ফিরে—কাকে নমস্কার করবেন ঠিক করতে না পেরে, শ্যামা ও কনকের মাঝামাঝি একটা জায়গা লক্ষ্য ক'রে নমস্কার করলেন। শ্যামা বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও একখানি খাটো ময়লা ধুতি পরে ছিলেন—তাই বাড়ির গৃহিণী না দাসী বুঝতে পারেন নি ভদ্রলোক।

সে ভদ্রলোকটিও অবশ্য খুব সুস্থ নন। তাঁর মুখের চেহারাও যৎপরোনাস্তি শীর্ণ ও দুর্বল—অনেকদিন কোনো রোগে ভুগছেন বলেই মনে হয়। বেশভূষাও তথৈবচ। অত্যন্ত মলিন ধুতি পরনে—জীর্ণ গলাবন্ধ ময়লা কোটের ওপর ততোধিক ময়লা একটি উড়ুনি। নমস্কার করা হয়ে গেলে দু-হাত উড়ুনির দুই প্রান্ত ধরে ওধারের তুলসী গাছটার দিকে চেয়ে রইলেন।

শ্যামা এতক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে ছিলেন শুধু, এবার বিস্মিত এবং ঈষৎ বিরক্ত-ভাবেই বললেন,—'এসব কী ব্যাপার? কারা আপনারা? কোথা থেকে আসছেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। নিশ্চয় আপনাদের বাড়ি ভুল হয়েছে। কোন্ ঠিকানা খুঁজছেন বলুন তো?'

গলার আওয়াজে নিঃসংশয়ে শ্যামাকেই বাড়ির কর্ত্রী বুঝতে পেরে তিনি চাদর ছেড়ে দিয়ে জোড় হাতে আর একটি নমস্কার করলেন, তারপর বিনীত কণ্ঠেই বললেন, 'আজ্ঞে না মা-ঠাকরুণ, বাড়ি ও-ই চিনিয়ে দিয়েছে। আপনার ছেলে!'

আপনার ছেলে!

চমকে শিউরে উঠলেন শ্যামা। কনকও।

বোধ হয় সামনে ভূত দেখলেও অত চম্‌কাত না তারা।

'ছেলে!' খানিকটা পরে বাক্যস্ফূর্তি হয় শ্যামার, 'আমার ছেলে? কোন্ ছেলে!'

বলেই উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে এগিয়ে যান তিনিই সেই মুড়ি-দেওয়া কম্পমান মূর্তিটার দিকে। সামনের দিকে ঝুঁকে ভাল ক'রে মুখটা দেখার চেষ্টা করেন।

অনেকক্ষণ পরে চিনতেও পারেন।

কান্তি!

সঙ্গে সঙ্গে—এতকাল পরে তাঁর সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তিনি ডুক্‌রে কেঁদে ওঠেন। চিৎকার ক'রে—মড়া কান্নার মতো। কনক ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু কোন সান্ত্বনা দিতে পারে না। তারও দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছে। চিনতে পেরেছে সেও।

কান্তিই--কিন্তু এ কী চেহারা তার!

শেষ যেবার আসে সে—কনক দেখেছিল—একেবারে রূপকথার রাজপুত্রের মতো। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, অপূর্ব মুখশ্রী; কান্তিমান তরুণ ছেলে। দীঘল সুস্থ গঠন, দীর্ঘায়ত টানা চোখে ঘন পল্লব, সুন্দর বঙ্কিম ঠোঁটের ওপর ঘন শ্যামল রেখা। আর তেমনি সরল ঋজু চেহারা—আর কিছুদিন পরে শুধু সুন্দর নয়, সুপুরুষ হয়ে উঠবে—তা তখনই দেখে বোঝা যাচ্ছিল।

আর এ যে এসেছে—তার রং রোদেপোড়া তামাটে কালো গায়ে খড়ি উড়ছে, রুক্ষ

পাত্‌লা চুল, হাত-পা কাঠিকাঠি। মুখে যেন—বলতে নেই—মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এসেছে একেবারে। তেমনি ঘোলাটে শূন্য দৃষ্টি।

এ কী সেই লোক? বিশ্বাস হয়৽না কিছুতেই।

শ্যামার মড়া-কান্না শুনে আশপাশের বাড়ি থেকে ছুটে এল অনেকে। স্বয়ং মল্লিক-গিন্নীও এসে দাঁড়ালেন। তিনি প্রবীণ লোক, বহুদর্শী। এক নজরে দেখে নিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। শ্যামাকে ধমক দিয়ে উঠলেন, ষাট্‌ ষাট্‌, ও কি কথা। অমন মড়া-কান্না জুড়ে দিয়েছ কেন গা! এ কী অলুক্ষণে কান্ড, ঠিক দুপুর বেলা! রোগা ছেলে এসেছে—আগে তাকে ঘরে তোল, তার মুখে একটু জল দাও—তা নয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্না জুড়ে দিলে! আর তুমিও তো তেমনি বৌমা। নাও ওকে ছাড়, দেওরকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যাও। এত কান্নাকাটির হয়েছেই বা কী, অসুখ করলে সকলেরই চেহারা খারাপ হয়—তায় পুরুষ মানুষ, সুন্দর চেহারা ওর কী কাজেই বা আসবে। নিশ্চয় ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে তাই অমন কাঁপছে—আহা বাছা রে।'

সঙ্গের ভদ্রলোকটি এই কান্নাকাটি দেখে হকচকিয়ে গেছলেন। মল্লিক-গিন্নীর কথাতে তিনিও খানিকটা ধাতস্থ হলেন। অকারণেই তাঁকেও একটা নমস্কার করে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মা-ঠাকরুন্‌, ঠিক ধরেছেন। ম্যালেরিয়াই বটে। ঐ এক কাল-রোগেই দিলে আমাদের দেশটাকে উচ্ছন্ন ক'রে। কী কালব্যাধি যে তা বলবার নয়। এ ছেলেটিও অনেকদিন ধরে ভুগছে মা—পুরনো রোগে দাঁড়িয়ে গেছে। এখনও চিকিচ্ছে করলে হয়ত বাঁচবে, যেভাবে পড়ে ছিল, না চিকিচ্ছে না কিছু—বেঘোরে, সে ভাবে থাকলে আর বাঁচত না।'

মল্লিক-গিন্নী বললেন, 'তা তুমি কে বাছা? একে পেলেই বা কোথায়?'

'আজ্ঞে মা, আমি ওখানকার ইস্কুলের জয়েণ্ট হেডমাষ্টার। আমাদের ইস্কুলেই পড়ত! জ্বরে পড়েছে অনেকদিন। সেই বর্ষার গোড়া থেকে ধরুন। ভোগেই বেশী, মাঝে মাঝে একটু ভাল থাকলে ইস্কুলেও আসে। আমাদের হোস্টেলে তো থাকে না—থাকে বাবুদের কাছারী-বাড়ীতে। সেইখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা—গোমস্তা-মুহুরীদের সঙ্গে। আমাদের অত দায়ও নেই তাই। এবারে অনেকদিন ইস্কুলে আসে না দেখে—পরীক্ষার সময় এসে গেল ওর, হেডমাষ্টারমশাই আর আমি পরশু দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখি এই অবস্থা—উঠতে পারে না, মড়ার আকৃতি। ওদের জিজ্ঞাসা করলুম যে ডাক্তার দেখিয়েছ? বলে সে রকম তো হুকুম নেই। আমরা কলকাতায় লিখেছি--কোন উত্তর পাই নি। খরচা করলে দেবে কে? তা মাষ্টার মশাই বললেন, বাপু হাসপাতালেও তো দেখাতে পারতে—তা বলে, আজ্ঞে দুকোশ পথ, গোরুর গাড়ি ছাড়া তো যাওয়া চলবে না—সে ভাড়া দেবে কে? চোর চোর—বুঝলেন না, মহা চোর। জ্বর হ'লে শুধু একটু নির্লক্ষে জল-সাবু দিয়ে ফেলে রাখত। একটা চাকর আছে কাছারীর—হরিহর বলে—সে নাকি মধ্যে মধ্যে তার নিজের পয়সায় পোষ্টাপিস থেকে কুইনাইন এনে খাওয়াত, র' কুইনাইন, খেয়ে খেয়ে কান ভোঁ ভোঁ করছে, কানে শুনতে পায় না। কেন মা—আপ-নিই বলুন, বাবুরা ওর খোরাকীর পয়সা দেয় তো—তা থেকেও তো বাঁচে কিছু, অসুখ হ'লে তো এক পয়সার সাবুতেই চলে যায়—তা এক দিন আর গ্রামের বটুক ডাক্তারকে ডাকা যেত না। তার তো মোটে এক টাকা ফী। আমাদেরও খবর দিলে পারত!'

'এখানে চিঠি দেয় নি কেন, এদের ছেলে, এরা গিয়ে নিয়ে আসত!' মল্লিক-গিন্নী প্রশ্ন করেন।

'কি জানি মা, তা বলতে পারব না। ওরা তো বলে ছেলে নাকি বারণ করেছিল!

বলেছিল শুধু শুধু ব্যস্ত করা তাঁদের, এমন পয়সা নেই যে আসবেন বা চিকিৎসার টাকা পাঠাবেন।......তা আমাদের হেডমাষ্টারমশাই বললেন, এ তো ছেলেটা এখানে থাকলে এক মাসও বাঁচবে না ভাই জয়কেষ্ট, একে দিয়ে আসতে হবে। সব মাষ্টার-মশাইয়ের কাছ থেকে দু-আনা, চার-আনা চাঁদা তুলে, ইস্কুল থেকেও বই বাঁধাই চার্জ বলে কিছু লিখিয়ে নিয়ে—আমাকে দিয়ে পাঠালেন।'

পাল্কি-বেয়ারারা এতক্ষণে অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছে, তারা ভাড়ার তাগাদা দিয়ে উঠল। জয়কৃষ্ণবাবুর বোধ করি ওদের কথাটা মনেই ছিল না, তিনি অকারণেই এত-খানি জিভ কেটে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বাবারা, দিচ্ছি। এক মিনিট!'

যথারীতি ভাড়া নিয়ে খানিকটা তকরার করার পর পয়সা বুঝে পেয়ে যখন তারা চলে গেল, তখন জয়কৃষ্ণবাবু তাকিয়ে দেখলেন যে চারিদিক খালি হয়ে গিয়েছে। শ্যামা ও কনক ধরাধরি ক'রে কান্তিকে নিয়ে ঘরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশে যারা ছিল তারাও ঘরে গিয়ে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। শুধু মল্লিক-গিন্নীই তখনও সদরের চৌকাঠে একটা পা দিয়ে ইতস্ততঃ করছেন। বোধ হয় জয়কৃষ্ণবাবুর কথাটা ভেবেই ভেতরে যেতে পারেন নি।

খানিকটা বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকবার পর জয়কৃষ্ণবাবুর সম্ভবত বোধগম্য হ'ল এই তথ্যটা যে, এখন তিনি অনাবশ্যক।

বাড়িতে যে অবস্থা চলছে, তাঁর দিকে কারুর মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয় তা তিনি বুঝতে পারলেন। লোকও বেশী নেই—ঐ দুটি স্ত্রীলোক ছাড়া—নইলে তাদের কাউকে দেখা যেত। পুরুষ-মানুষ কেউ এখন থাকার কথাও নয়।

সুতরাং এখন চলে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু কাউকে বলে যাওয়া উচিত কিনা, এবং কাকেই বা বলে যাবেন বুঝতে না পেরে মল্লিক-গিন্নীকেই উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'তাহলে আমি মা এখন যাই, ও'দের বলে দেবেন। ভাল হয়ে যদি আবার যেতে চায় তো যাবে। তবে এ বছরের টেস্ট্ বোধ হয় আর দিতে পারবে না—সে তো এসে পড়ল বলে। আর তা যদি দিতে না-ই পারে তো গিয়েই বা লাভ কি। ওখানে থাকলে আবারও পড়বে। আমরা ফি হপ্তায় কুইনাইন খাই নিয়মিত—তাই দেখুন না হাল।'

তিনি একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চাদরের খুঁট-দুটি আবার দুহাতে চেপে ধরলেন, অর্থাৎ রওনা দেবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

মল্লিক-গিন্নী মিনিটখানেক ইতস্তত করলেন, ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার, তারপর আবার বেরিয়ে এসে বললেন, 'যাবেন? কিন্তু আপনার তো খাওয়া-দাওয়া কিছু হয় নি বোধ হয়!'

'আজ্ঞে কখন আর হবে বলুন। রাত থাকতে গোরুর গাড়িতে চেপেছি তো—অনেকটা পথ তাই গাড়োয়ানকে বলে বোর্ডিং-এই গাড়ি মজুত রেখেছিলুম রাত্তিরে। তারপর তো ধরুন তিনবার ট্রেন বদলে আসা। সকালে সেওড়াফুলিতে একটু যা চা খেয়ে নিয়েছিলুম—ওকেও দিয়েছিলুম, সহ্য করতে পারলে না, বমি হয়ে গেল।...... তা সে যা হোক, আমার জন্যে ভাববেন না, এই যাবার পথে যা হয় জলটল খেয়ে নেব এখন। দিয়েছেন, মাষ্টারমশাই পয়সা সব হিসেব করেই দিয়েছেন। এই পাল্কিটাতে যা আনা চারেক বেশী লাগল। তা তাতেও আটকাবে না। যা হোক ক'রে হয়েই যাবে।'

তিনি একটু হেসে যাওয়ার জন্যে ফিরে দাঁড়ালেন। মল্লিক-গিন্নী বললেন, 'না না, সে কখনও হয়! আপনি এত কষ্ট ক'রে নিয়ে এলেন আমাদের ছেলেকে, মহা উপকার করলেন, প্রাণরক্ষাই করলেন ওর বলতে গেলে। এরা বড্ড কাতর হয়ে পড়েছে,

বুঝলেন মা—অমন সোনার চাঁদ ছেলের এই ছিরি, আঘাতটা লেগেছে খুব। তাই আর হুঁশপব্ব কিছু নেই। নইলে এখানেই সব ব্যবস্থা ক'রে দিত এরা। ছেলের দাদা থাকলে খরচপত্রও দিয়ে দিত। তা আপনি বরং আমার ওখানেই—যা হয় দুটো মুখে দিয়ে নেবেন। ডাল তরকারী সবই কিছু কিছু আছে—দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে বেশী দেরি লাগবে না। আমরাও ব্রাহ্মণ, আমাদের ওখানে খেতে আশা করি আপনার আপত্তি হবে না।'

'না, না—সে সব কোন-কিছুই নেই আমাদের। আমরা পাল—ঐ মৃত্তিকার কাজ আমাদের কুলকর্ম। তা চলুন। তবে বিকেলের গাড়ি না ধরতে পারলে ওদিকে ইণ্টি-শানে পড়ে থাকতে হবে। যা পথ, রাত বেশী হয়ে গেলে আর যেতে ভরসা হয় না। নেই কি, বাঘ ভালুক থেকে সাপখোপ সব আছে। বুনো শিয়ালরাও কম যান না। অবিশ্যি আছে, ইষ্টিশানের কাছেই একঘর কুটুম্বও আমাদের আছে। অনেককাল দেখা-সাক্ষাৎ নেই এই যা—তবে গিয়ে দাঁড়ালে চিনতে পারবে। সে যা হয় একটা হবেই'খন ব্যবস্থা। আপনাদের প্রসাদ দু'টি পেয়েই যাই।'

মল্লিক-গিন্নী একটু হেসে বললেন, 'না না, আমি বেশীক্ষণ আটকাব না। ট্রেন আপনি পাবেন। না হয় একগাল আলোচালই চড়িয়ে দিচ্ছি, পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে। আপনি স্নান করতে করতেই—'

এতখানি জিভ কেটে জয়কৃষ্ণবাবু বললেন, 'স্নান ? ঐটি মাপ করবেন মা। স্নান করি আমি ধরুন মাসে একদিন। তাও ফুটনো জল ছাড়া চলে না। তাতেই কি নিস্তার আছে—যতদিন পরে যেভাবেই করি না কেন, মাথায় জল পড়লেই জ্বর আসবে। ঐ জন্য ছুটিছাটা দেখে করতে হয়—যাতে একদিন শুয়ে থাকলেও কোন ক্ষতি হয় না। স্নান করার দরকারও নেই তেমন—মুখ হাত ধুয়ে নিলেই চলবে।'

'তা হ'লে চলুন।' বলে মল্লিক-গিন্নী আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান তাঁকে।

হেম সেদিন এসে পৌঁছল রাত নটারও পর। সব শুনে সে অবশ্য তখনই ছুটল ডাক্তারের বাড়িতে কিন্তু ডাক্তার এলেন না। তাঁর কোমরে ব্যথা, রাত্রে আর বেরোতে পারবেন না। আর একজন নতুন ডাক্তার বসেছেন বটে, তাঁর দু'টাকা ফী, ডাক্তারও তত সুবিধের নন। এমনিতেই তো শ্যামা ডাক্তার ডাকাতে আপত্তি করছিলেন, পরের দিন সকালে হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথাই বলেছিলেন। হেম ধমক দিয়ে উঠেছিল বলে খুব বেশী কিছু বলতে পারেন নি।

'তোমার যেমন কথা! অজ্ঞান অচৈতন্য রুগী, বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে, ওকে টেনে নিয়ে যাব হাসপাতালে! তা হ'লে তো পালকি করতে হয়, সেও তো যাতায়াতে অন্তত দেড় টাকা। তাছাড়া ও অবস্থায় পালকিতেই বা ওঠাবে কী করে! একটু ধাতে না এলে ওকে নড়ানোই উচিত নয়!'

সুতরাং সে রাত্রে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই হ'ল না। এরা শুধু সবাই মিলে জেগে ঘিরে বসে রইল সারারাত। রোগীর কোন জ্ঞানই নেই, অসাড়ের মতো পড়ে আছে। শেষরাত্রের দিকে জ্বর একটু কমল কিন্তু তখনও জ্ঞানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বেঁচে আছে কিনা—এক এক সময় সেই ভয় হতে লাগল। কেবল মধ্যে মধ্যে ঠোঁট নড়ে উঠছে একটু—মনে হয় জল খেতে চাইছে, অল্প অল্প জল দিলে খাচ্ছেও—সেই যা ভরসা। তাও শ্যামা একবার একটু বেশী জল দিয়ে ফেলেছিলেন, দুদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল, মুখে রেখে একটু একটু ক'রে খেতে পারল না।

সকালবেলাই হেম আবার গেল ডাক্তারের কাছে। ফকির ডাক্তার—দক্ষিণ পাড়ার

বাড়ি, খুব দূর নয়, কিন্তু একবার বেরিয়ে পড়লে ধরা মুশকিল। ফকির এককালে এখানকার এক বড় ডাক্তারের কম্‌পাউন্ডার ছিলেন, তিনি মারা যেতে বাজারে এক ডিস্‌পেন্‌সারী সাজিয়ে বসেছেন, নিজেই চিকিৎসা করেন। সবাই বলে ফকির বিচক্ষণ ডাক্তার—এম-বি পাস ডাক্তারের চেয়েও ভাল। হয়ত আরও বলে, মাত্র এক টাকা ফী বলে। কোথাও কোথাও আট আনাও নেন। ডিস্‌পেন্‌সারীতে গেলে (ফকির বলেন চেম্বার) তাও লাগে না, অথচ প্রত্যেককেই যত্ন ক'রে দেখেন। ওষুধও অনেক সময় বাকীতে দেন—ওষুধের দামও কম। যে মিক্সচারটা সব জায়গায় বারো আনা—কলিকাতায় এক টাকা পাঁচসিকে—উনি সেইটাকেই নেন দশ আনা ক'রে। গরীব দুঃখীর ক্ষেত্রে আরও কমিয়ে দেন দাম। আট আনা সাত আনা—যার কাছে যা পান তাই নেন।

ডাক্তার এসে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। এসেছিলেন হাসি হাসি মুখে কিন্তু দেখতে দেখতেই মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, 'শুনেছিলুম বটে ওদেশের ম্যালেরিয়ায় বাঘ সুদ্ধ জব্দ হয়ে যায়—কিন্তু ভাবতুম ওটা কথার কথা। এখন দেখছি সাংঘাতিক সত্যি। ইস্‌! এখানেও তো কম নেই, কিন্তু এমন ব্যাড টাইপের ম্যালেরিয়া তো কখনও দেখি নি মশাই। সমস্ত রক্ত শুষে খেয়েছে একেবারে! বললে বিশ্বাস করবেন না—বোধ হয় এক ছটাক রক্তও আর দেহে নেই। এধারে পিলে লিভার দুই-ই বেশ ডাগর। খুব সাবধানে রাখতে হবে। দুধ দেবার আর চেষ্টা করবেন না এখন, লিভারের যা অবস্থা—সইতে পারবে না। ফলের রস মিছরির জল—এইসব খাওয়ান। ওষুধ দিচ্ছি দুরকম—তবে ওষুধের চেয়ে পথ্যির দিকেই মন দিতে হবে বেশী। পাৎলা সাবুর জল আর মিছরির জল, এই-ই এখন চলুক। নাড়াচড়া করতে যাবেন না—যে কোন সময়ে হার্টফেল করতে পারে—দেহের এমনি অবস্থা। এতটা পথ এল কী ক'রে তাই ভাবছি।'

এর পর দশবারোদিন ধরে চলল—বলতে গেলে যমে-মানুষে টানাটানি। শ্যামা দিনরাতই আগলে বসে রইলেন। হেম অফিসের ফেরৎ এসে কাছে বসলে তিনি একটু উঠতেন। তাও হেমকে সন্ধ্যা-বেলাই ডাক্তারের কাছে ছুটতে হ'ত দুদিন একদিন অন্তর। ভোরে তার সময় হ'লেও ডাক্তার ভোরে উঠবে কেন? কনকের ওপর সারা সংসার পড়েছে—বাড়ির পাট বাসন-মাজা রান্না সব। দুপুর ছাড়া সে কাছে এসে বসবার ফুরসুৎ পেত না। সেই সময়ই যা একটু ছাড়া পেতেন শ্যামা। প্রাতঃকৃত্য থেকে স্নানাহার একসঙ্গে সেরে নিতে হ'ত। ঐ সময়েই ঘণ্টা দুই একটু গড়িয়েও নিতেন তিনি। রাত্রে ঘুম হ'ত না। একটি প্রদীপ জেবলে রেখে রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে একা জেগে বসে থাকতেন। জেগে না থেকে উপায়ও নেই। অজ্ঞান অচৈতন্য ছেলে মুহুর্মুহু শুধু হাঁ করছে আর ঠোঁট নাড়ছে অর্থাৎ জল। সাবুর জল ফলের রস মিশ্রীর জল—সবই ঝিনুকে ক'রে ক'রে খাওয়াতে হচ্ছে। অচৈতন্য অবস্থায় খাওয়া। ডাক্তার শাসিয়ে গেছেন, 'খুব সাবধানে পথ্যি দেবেন—এ অবস্থায় বিষম লাগলেই বিপদ!'

দিনের বেলা আসে অনেকেই। তরু আর হারান এসে একদিন লেবু আঙুর দিয়ে গেছে। বড় জামাই এসে খবর নিয়ে যান প্রায় নিত্য। নিত্যই এক জোড়া ক'রে কমলালেবু এনে রেখে যান। এ ছাড়া ডাক্তারের ফল খাওয়াবার নির্দেশ মানা যেত না। সাবু, মিশ্রী ছাড়া আর কিছু কিনতে দেন নি শ্যামা। ফলের কথায় বলেছিলেন, 'ওসব বড়লোকের জন্যে ব্যবস্থা। ফল না খেলে যদি ছেলে সারবে না—তবে ডাক্তার দেখাচ্ছি কেন? রাশ রাশ ওষুধই বা কিসের জন্যে? না, অত পারব না। তা ছাড়া, কমলালেবুতে ঠাণ্ডা করে—আমরা দেখেছি কবরেজরা খেতে দিত না। জ্বর থাকতে লেবু খেলে

মুখে ঘা হয়!

কিন্তু পরে কিনে দিয়ে যেতে খুব আর আপত্তি করেন নি।

যারাই আসত দিনের বেলা। একদিন পাল্কি ক'রে এসে মঙ্গলাও দেখে গেলেন। একেবারেই অথর্ব হয়ে পড়েছেন আজকাল। ছুঁচিবাইয়ের দরুন জল ঘেঁটে ঘেঁটে হাতে-পায়ে হাজা দগ্‌দগ্ করছে। ফিসফিস ক'রে বললেন, 'আসতে কি দেয়! সব্বস্ব ছেলেরা বার ক'রে নিয়েছে, এখন তো ওদের এন্তাজারি! একটা পয়সা খরচ করতে গেলেও ওদের কাছে হাত পাততে হয়। আর হাত পাতলেই কী চোখ-রাঙ্গানি বাবু-দের—পারব না অতসব, অত নবাবি চলবে না! এইসব। কী করব—হাতী যখন দ'কে পড়ে ব্যাঙেও তাকে চাট্ মারে!' তারপর গলাটা আরও একটু নামিয়ে বললেন, 'কী জানিস বামনি, আছে, এখনও কি দুচার টাকা নুকুনো নেই মনে করিস—তা আছে। কিন্তু তবুও ছেলেদের কাছে চাইতে হয়। না চাইলেই সন্দ করবে যে, তবে তো মা-মাগীর কাছে এখনও দুপয়সা আছে—আর অমনি ভাগাড়ে গরু পড়ার মতো চিল-শকুনের দল এসে পড়ে দুয়ে বার ক'রে নেবে। এই শেষ বয়সে একটা পয়সার আজীর হয়ে পড়ব নাকি? এখনও কতদিন বাঁচতে হবে তার ঠিক কি?'

তারপর মুখ বাড়িয়ে হাতে ক'রে বয়ে আনা পিকদানীটায় খানিকটা পিক ফেলে বললেন, 'দেখলি তো বামনি—তখন যদি ছেলেটাকে ঘরজামাই দিতিস তাহ'লে আজ আর ওর এই হাল হ'ত না। সেই যে বলেছিলাম তোকে—মনে আছে? সে মেয়ের তো বে হয়ে গেছে। বে দিয়েই তো বাপ মিন্‌সে অক্কা—এখন জামাইয়ের বাপ, মা, ভাই ঘরে এসে জুড়ে বসে রাজত্ব করছে, তাদেরই যথাসব্বস্ব। জামাইকে পোষ মানিয়ে পর ক'রে নেবার তো আর সময় হ'ল না—তার বাপমায়ের দিকে টান ষোল আনাই থেকে গেল যে মেয়ে শাশুড়ীর ঘর করতে গেলে দুঃখু পাবে বলে এত কান্ড করলে মিন্‌সে, সেই মেয়েই এখন উঠতে বসতে শাশুড়ীর ঠোনা খাচ্ছে! তুই যদি দিতিস তা'লে তোরও আজ অমনি দম্ভজ্জি বজায় থাকত।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'তোর কপাল তো ভাল নয়—বারবার তো দেখছিস। তোর উচিত ছিল দিয়ে দেওয়া। পরের কপালে ছেলে ঠিক থাকত। এখন গেল তো—ছেলের রূপের দেমাক, নেকাপুড়ার দেমাক কিছুই তো রইল না আর—এখন কেঁদে কেঁদে মর্। আর কী হয় তাই দ্যাখ—এই রকম শক্ত অসুখ হলে শুনেছি একটা অঙ্গ নিয়ে তবে রোগ যায়। ভাল যদিবা হয়, আস্ত ছেলে ফিরে পাবি কিনা সন্দেহ!'

শ্যামা এতক্ষণে কথা বলার অবকাশ পেলেন, 'ওসব কথা বলবেন না মা, বরং আশীর্বাদ করুন ছেলে ভাল হয়ে উঠুক!'

'ও কী লো, বামুনের ছেলেকে আশীর্বাদ ক'রে কি অকল্যেণ টেনে আনব আমার ঐ শত্তুরগুনোর মাথায়! বেশ বললি তো! ভগবানকে ডাক্, তাঁর কাছে মাপ চা। গেল জন্মে এ জন্মে ঢের পাপ করেচিস—তাই এত দুগ্‌গতি। ভগবানের কাছে মানৎ কর তবে যদি গোটা ছেলে ফিরে পাস!'

তারপর আঁচল খুলে দুটো টাকা বার ক'রে কান্তির বিছানার পাশে রেখে বললেন, 'তোর অভাব নেই আর—তবু আমার একটা কত্তব্য আছে তো। সাবু, মিছরি কিনে দিস ছেলেটাকে। পেটের শত্তুরদের ভয়ে ওখান থেকে কিনে আনতে পারি নি—তা-হ'লেই জেনে যাবে হাতে টাকা আছে। আর একবার টাকার গন্ধ পেলে হয়, ছিনে জোঁকের মতো ছুটে আসবে অমনি!'

আরও অনেকেই খবর পেয়ে এসে দেখে গেল।

মল্লিক-গিন্নীও দুপুরবেলা এসে বসেন।

কিন্তু রাত্রে কেউ থাকে না। একা একটা ঘরে মিটমিটে আলোতে জেগে বসে থেকে অজ্ঞান কঙ্কালসার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে—বহুদিনের শুকিয়ে যাওয়া কান্না গলার কাছে এসে আকুলিবিকুলি করতে থাকে, ছেলের অকল্যাণের ভয়ে কাঁদতেও পারেন না।

মঙ্গলার কথাটা মনে হয়ে আরও বুকের মধ্যেটা যেন হিম-হিম ঠেকে। তিনি কি আর সত্যিই গোটা ছেলেকে ফিরে পাবেন? অমন রূপবান, কান্তিমান ছেলে তাঁর।

হে মা সিদ্ধেশ্বরী! এ কী করলে মা!

আর তখনই মনে হয় ছোট খোকাটাকে বোনের কাছ থেকে আনিয়ে নেবেন এবার। বিশ্বাস নেই আর কাউকেই।

॥ ৩ ॥

এখানে আসবার ঠিক বারো দিন পরে ভাল ক'রে জ্ঞান হ'ল কান্তির। চোখের চাউনি থেকে ঘোলাটে ভাবটা চলে গিয়ে পরিচয়ের দীপ্তি ফিরে এল। মনে হ'ল তাকে ঘিরে মা-দাদা-বৌদির বসে থাকবার কারণটাও বুঝতে পারল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল একটা নিরতিশয় লজ্জা। যেন সেই লজ্জা থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্যই আবার চোখ বুজল সে।

শ্যামা তখনই সাগ্রহে কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, কনক বেশ একটু দৃঢ়-কণ্ঠেই নিবৃত্ত করল তাঁকে, 'এখন নয় মা, আরও কিছুদিন যাক, দুর্বল শরীর মাথাও দুর্বল —এখন কি কোন কথা ভাল ক'রে গুছিয়ে ভাবতে পারে? সেটা ভাবতে দেওয়াও ঠিক নয়। আর একটু সারুক শরীরটা!'

শ্যামা তা বুঝলেন, চুপ ক'রে গেলেন খানিকটা।

আরও চার-পাঁচ দিন পরে কথা কইল সে। জল চেয়ে খেল, খাবার চাইল।

কিন্তু সেই সময়ই তার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে প্রথম আবিষ্কার করলেন শ্যামা যে সে কানে ভাল শুনতে পাচ্ছে না। মুখের দিকে চেয়ে থাকলে ঠোঁট-নাড়া দেখে তবু বোধ হয় খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে, জবাবও দিচ্ছে কিছু কিছু—কিন্তু মুখ ফিরিয়ে কিছু বললে বা শিয়রের দিক থেকে কোন প্রশ্ন করলে একটা উত্তরও পাওয়া যাচ্ছে না। রীতিমতো চেঁচিয়ে বললে তবে শুনতে পাচ্ছে।

পরের দিনই ফকির ডাক্তারকে খবর দিয়ে পাঠালেন শ্যামা। তিনি এসে পরীক্ষা ক'রে দেখে বললেন, 'ভয়-নেই—ও কুইনাইনের এফেক্ট, সারতে দেরি লাগবে। ওর প্রাণটা যখন ফিরিয়ে আনতে পেরেছি তখন কানটাও ফেরাতে পারব। তা ছাড়া একটু জোর পেলে না হয় কলকাতার কলেজে নিয়ে যাবেন, সেখানে বড় বড় ডাক্তার আছে, ভাল চিকিৎসা হ'লে সেরে যাবে। শরীরে রক্ত নেই, একটু দুধ পেটে পড়ে নি, শুধু খানিকটা ক'রে র কুইনাইন খেয়েছে তার আর কী হবে বলুন।...না, ও ভাল হয়ে যাবে তবে সময় লাগবে ঢের—তা বলে দিচ্ছি। রোগটি খুব সহজ হয় নি ওর, এটা মনে রাখবেন। পিলে-লিভার এখনও জেঁকে বসে আছেন। জ্বরও—এখন তো তিনচার দিন অন্তর আসছে, ওটা কমে গেলেও দেখবেন একাদশী অমাবস্যে পুন্নিমেতে গা-গরম হবে এখন দু-চার বছর। তবে বেলপাতার রস শিউলিপাতার রস এইসব টোট্‌কা খাওয়াবেন—খরচ নেই, অথচ উপকার হবে।'

কিন্তু ফকির ডাক্তার যতই আশা ও আশ্বাস দিয়ে যান—জ্বর আসবার দিন-

গুলোর মধ্যেকার সময়টা দীর্ঘতর হয়ে এলেও—কানের কোন উপকার হ'ল না। বরং আরও যেন বেশী কালা হয়ে যেতে লাগল দিন দিন। সেটা শ্যামার যত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও কনকের চোখ এড়ায় নি। সে চুপি চুপি হেমের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেদিকে। বলল, 'তুমি আর দেরি ক'রো না—বড় কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। ফকিরবাবু যা জানেন তা করেছেন, এর বেশী আর ও'র কাছে আশা করাও অন্যায়!'

হেমও লক্ষ্য করল ব্যাপারটা। কিন্তু বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার মতো অবস্থা তাদের নয়। নিয়ে গেল সে মৌড়ীর হাসপাতালেই। তাঁরা দেখে বললেন, "কানের পর্দা তো ঠিক আছে, কালা হবার তো কথা নয়। সম্ভবত দুর্বলতার জন্যেই হয়েছে, একটু ভাল ক'রে খাওয়ান দুধ-টুধ—তাহ'লেই ভাল হয়ে যাবে। তাড়াহুড়োর কাজ নয়—অত ব্যাড টাইপের ম্যালেরিয়া হয়েছিল বলছেন—তাহ'লে সারতে সময় লাগবে বৈকি!'

ভাল ক'রে কীই বা খাওয়াতে পারে ওরা। খুব অসুখের সময় তবু পাঁচজন ফল-টল দিত—এখন তাও বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক ভেবে হেম একপো ক'রে দুধের রোজানি ক'রে দিল। তাও মায়ের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া ক'রেই। শ্যামা রুক্ষকণ্ঠে বলেছিলেন, 'কেন, কিসের জন্যে—ও ছেলে আমার কী স্বগ্গে বাতি দেবে তাই শুনি। ওর ইহকাল পরকাল সব গেছে। আমার সর্বনাশ ক'রে ঘরে-বাইরে মুখ পুড়িয়ে পঙ্গু হয়ে এসে বসলেন চিরকালের মতো—একটা বিধবা মেয়ে নিয়ে জ্বলে মরছি আবার একটা হয়ত পুষতে হবে। তার আবার অত কেন—একগাদা পয়সা খরচ ক'রে দুধ খাওয়ানো!'

হেম বললে, 'তোমার যেমন কথা। বেটাছেলে বিধবা মেয়ের মতো বসেই বা খাবে কেন! লেখাপড়া যদি আর না-ই করে, তা ব'লে রোজগার ক'রে খেতে পারবে না? কানটা যদি যায় বরং সেই একটা ভাবনার কথা। ওটা যাতে ফিরে পায়, সেটা আগে দেখা দরকার নয়?'

তাতেও হয় নি অবশ্য। শেষ অবধি বলতে হয়েছে হেমকে যে দুধের টাকা সে আলাদা দেবে, মাসের খরচ ছাড়া। হেম যে মাইনের সব টাকা মাকে দেয় না—এ শ্যামা জানেন। হেমও গোপন করে না। মাসে কুড়ি টাকা ক'রে দেয় সে—এ ছাড়া সে কত রাখে, ঠিক কত তার এখন আয় তা শ্যামা জানেন না। এ নিয়ে প্রচ্ছন্ন অনুযোগ যে করতে যান নি শ্যামা তা নয় কিন্তু সুবিধা হয় নি, হেম স্পষ্টই জবাব দিয়েছে, 'এই থেকেই তো বাঁচিয়ে তুমি টাকা জমাচ্ছ, তেজারতি খাটাচ্ছ। আর দরকার কী? সবই বা ধরে দেব কেন? আমারও তো আপদ-বিপদ আছে।'

আর কিছু বলতে পারেন নি শ্যামা। আজও কিছু বলতে পারলেন না। হয়ত বলারও কিছু নেই। হয়ত এটাই চেয়েছিলেন। টাকাটা ওপক্ষ থেকে বার করার জন্যেই এত কঠিন হয়েছিলেন তিনি।

ছেলে একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই—অর্থাৎ উঠে বসবার মতো হ'তেই শ্যামা তাঁর নিরুদ্ধ প্রশ্নের স্রোতকে ছেড়ে দেন।

'কেন এমন হ'ল? কী করেছিলি যে ওরা এত বড় শাস্তিটা দিলে? তুই এখানে চলে এলি না কেন? এমন হয়েছিল যখন তখনই বা চলে এলি না কিসের জন্যে? কি এত লজ্জা তোর? খুন-জখম করেছিলি না রাহাজানি করেছিলি? কী জন্য তুই আমার এত বড় সর্বনাশটা করলি! এখন যদি কানটা তোর না সারে? যদি জন্মের মতো কালা হয়ে যাস? লেখাপড়া তো গেলই—এরপর যে ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে তা হ'লে! এমন ক'রে শরীরটা পাত করলি কি কারণে? এমন দুর্বুদ্ধি কেন হ'ল তোর আমার মাথাটা চিবিয়ে খেতে!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্নগুলো বেশ চেঁচিয়েই করেন শ্যামা। কান্তির শ্রুতিগম্য ক'রেই। শুনতে যে পেয়েছে সে সম্বন্ধেও সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। কারণ প্রতিক্রিয়া জাগে সঙ্গে সঙ্গেই। কথা উঠলেই সেই যে মাথা হেঁট করে—সে মাথা আর তোলে না কিছুতেই। কিন্তু উত্তরও দেয় না। একটি কথাও বলে না। দিনের পর দিন সহস্র প্রশ্ন তেমনি নিরুত্তরই থেকে যায় সেই প্রথম দিনটির মতো। ক্রমশ রূক্ষতর হয়ে ওঠে শ্যামার মেজাজ—ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। কণ্ঠের স্বর ও প্রশ্নের ভঙ্গী দুইই কঠোরতর হয়ে ওঠে। নির্মমভাবে বাক্যবাণ প্রয়োগ করেন তিনি—আর এই জিনিসটা প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। তবু কান্তির কণ্ঠ থেকে একটি শব্দমাত্র উচ্চারিত হয় না। সমস্ত প্রশ্ন-বাণই নিশ্ছিদ্র নীরবতার প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। এক এক সময় প্রায় ক্ষেপে ওঠেন শ্যামা, গায়ে হাত তুলতেও যান—কনক কাছে থাকলে হাত ধরে প্রতি-নিবৃত্ত করে। কিন্তু কান্তি চুপ ক'রেই থাকে, শুধু দুই চোখ দিয়ে এই সময়গুলোয় নিঃশব্দে যে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে অবিরল ধারায়—তাইতে বোঝা যায় যে শ্যামার কথাগুলো যথাস্থানে গিয়েই পেঁচেছে—কথাগুলোর প্রয়োগ কিছুমাত্র ব্যর্থ হয় নি। বাইরের নীরবতার চর্ম ভেদ ক'রে সে বাক্যবাণ মর্মে গিয়ে বিঁধেছে।

অবশেষে এক সময় হার মানেন শ্যামা।

হাহাকার ক'রে ওঠেন নিজে নিজেই। ললাটে করাঘাত করতে থাকেন বার বার। গাল পাড়েন তাঁর চিরন্তন ভাগ্যকে আর নবতম দুর্ভাগ্যের উপলক্ষ তাঁর এই ছেলেকে। সে সময় সমস্ত রকম শালীনতার সীমা লঙ্ঘন ক'রে যায় তাঁর মুখের ভাষা। কুৎসিত ইতর গালিগালাজ বেরোয় মুখ দিয়ে। দীর্ঘকাল পল্লীগ্রামে থাকার ফলে যা শুনে এসেছেন, কিন্তু এতকাল কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারেন নি—এমন সব ভাষা। সে সময় কনকের সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। হেম প্রায়ই সে সব সময়গুলোয় থাকে না—তার উপস্থিতিকালে অপেক্ষাকৃত ধৈর্য ধরেই থাকেন শ্যামা—থাকলে সে ধমক দেয়, নয় তো অর্ধবিহ্বল ভাইকে হাত ধরে টেনে উঠিয়ে দেয় সেখান থেকে।

গালাগাল দেন তিনি রতনকেও।

সে সময় এ খেয়ালও থাকে না যে তার আসল পরিচয় এতকাল সযত্নে পুত্রবধূর কাছে গোপন করার চেষ্টা করছেন তাঁরা। মনে থাকে না যে এ গালাগাল তাঁদের গায়েই এসে পড়ছে। সে স্ত্রীলোকটার যে পরিচয় আজ তিনি উদ্‌ঘাটিত করছেন, সে পরিচয় জানার পর কোন ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান পাঠানো বাপ-মা-অভিভাবকদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। এ ধরনের মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা স্বীকার করার কোন অধিকার পর্যন্ত তাঁদের নেই। হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়েই গালাগাল দেন, তিনি তাঁর ছেলের সর্বনাশ-রূপিণী সেই নারীকে। দেখতে শুনতে যদি না-ই পারবে, যদি নজর রাখা সম্ভবই না হবে—তবে কেন সে এমন ক'রে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল তাঁর ছেলেকে। আর যখন বুঝল যে ওখানে রাখা আর উচিত নয়—কেন সে জোর ক'রে পাঠিয়ে দেয় নি তার ছেলেকে তাঁর কাছে! কেন? কেন? কী এমন শত্রুতা করতে গেছলেন তিনি তার? কী তার পাকাধানে মই দিতে গেছলেন—কিম্বা বুকে বাঁশ দিয়ে ডলেছিলেন!'

অভিসম্পাত করেন তাকে—'সর্বনাশ হোক। সর্বনাশ হোক। যে পয়সার অহঙ্কারে এমন ধরাকে সরা দেখা, সে পয়সা যেন একটিও না থাকে—মালা হাতে ক'রে যেন পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে হয়। সর্ব অঙ্গ থাকতে যেন চোখটি যায় আগে। হাতে যেন মহাব্যাধি হয়।' ইত্যাদি—

তবুও কোন কথা বলে না কান্তি। শুধু নীরবে অশ্রুপাত করে বসে বসে।

উত্তর দিতে পারে না কান্তি তার কারণ উত্তর দেবার মতো কিছু নেই ওর। কিছুই বলবার নেই। মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা সম্ভব নয় সে সুগভীর কলঙ্কের ইতিহাস। অন্তত ওর পক্ষে সম্ভব নয় এটুকু লজ্জা ও ঘৃণা তার এখনও অবশিষ্ট আছে।

যা ঘটেছিল তা বলবার আগ ওর আত্মহত্যা করা উচিত ছিল। এমনিই হয়ত করা উচিত ছিল, অনেক আগেই,—এই কৈফিয়ৎ দেবার মুহূর্ত উপস্থিত হবার আগেই উচিত ছিল এ-পৃথিবী থেকে সরে যাওয়া, কিন্তু পারে নি সে। আসলে বড় দুর্বল সে ভেতরে ভেতরে। দুর্বল বলেই পারে নি সেদিন আত্মহত্যা করতে। দুর্বল বলেই ভাগ্য ওর জীবন নিয়ে এই মর্মান্তিক খেলা খেলতে পারল।...

ঠিকই বলছেন মা। সেই সর্বনাশিনীই ওর এই দুর্গতির প্রধান কারণ—কিন্তু ওর নিজের দিক থেকেও দায়িত্ব কাটিয়ে ফেলবার উপায় নেই যে। তার সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অপরাধ একদিকের পাল্লায় তুললেও ওর নিজের অপরাধের বোঝা কিছুমাত্র হাল্‌কা হয় না—ওর দিকের পাল্লাও তেমনি ভারী হয়ে ঝুঁকে থাকে। ওর অন্যায়ও তো কম নয়। বরং আরও বেশী, আরও অমার্জনীয়। ওর অন্তরের দিকে তাকালে যত-দূর দৃষ্টি যায়—সেখানেও তো কলুষ কম জমা হয়ে নেই। দেবার মতো কৈফিয়ৎ বরং তার কিছু আছে—কারণ সে যা তাই, তার বেশী নিচে তো নামে নি। কোন কৈফিয়ৎ নেই ওরই, এই জঘন্য আচরণের কোন জবাব নেই। ওর নিজের মনেই যে সীমাহীন গ্লানি আর লজ্জার ইতিহাস লিখিত হয়েছে, যে অপরাধবোধ রয়েছে পুঞ্জীভূত—তারপর আর কাউকে দোষ দিতে যাওয়া, অপরাধের দায়িত্বটা আর কারুর ঘাড়ে চাপাতে যাওয়া আরও একটা বিপুলতর অন্যায় আর একটা অক্ষমণীয় অপরাধ হয়ে উঠবে।

না, দোষ ও দেবে না রতনদিকে। যদিও সে-ই হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে গেছে এই সর্বনাশের দিকে, অধঃপতনের দিকে। কিন্তু কান্তিও তো বাধা দেয় নি কিছু, কোন প্রতিবাদ করে নি। নিজের জন্ম, নিজের অবস্থা—আত্মীয়স্বজন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই তো ভুলে বসেছিল সেদিন। ওরই তো বাধা দেওয়া উচিত ছিল—এমন অস্বাভাবিক, এমন অন্যায় পথে পা দেবার আগে। এটুকু জ্ঞান যে সেদিন তার না ছিল তাও তো নয়—একেবারে সরল শিশু ছিল না সেদিনও। এটা ঠিক যে, এই গত ক'মাস একরকম বনবাসে একা পড়ে থাকতে থাকতে—রোগশয্যায় একা শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে যতটা গুছিয়ে ভাবতে শিখেছে সে, যতটা বয়স তার দেহের তুলনায় বেড়ে গেছে—ততটা জ্ঞান অভিজ্ঞতা চিন্তাশক্তি কিছুই ছিল না সেদিন, তবু মোটামুটি ন্যায়-অন্যায় বোধ একটা ছিল বৈকি। কাজটা যে ভাল নয়, তাও সেদিন সে জানত। তাকে মানুষ হ'তে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে—সেইজন্যই তাকে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে—এসবও জানত। তার মা দাদা ভাইবোনেরা তার মুখ চেয়ে আছেন, সেটাও সেদিন অজানা ছিল না।...তবে?

বাধা সেদিন দেয় নি তার কারণ সেই আপাতরমণীয়, আপাতমধুর সর্বনাশের পথে নামতে তার তরফ থেকেও বুঝি উৎসাহের অভাব ছিল না।

মনে আছে তার—কিছুই ভোলে নি। প্রতিটি দিনের ইতিহাস তার মনে আছে। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি বিপলের। মনে গাঁথা আছে প্রতিটি ঘটনা। চরম সর্বনাশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ইতিহাস।

এ ইতিহাস শুরু হয়েছে অনেকদিন—দু-তিন বছর আগেই।

সেই দাদার বিয়ের সময় থেকে। কিম্বা বলা যায় তারও আগে থেকে।

তবে ঐ সময়টায়ই প্রথম সে রতনদির আচরণে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল।

অদ্ভুত লেগেছিল তার ব্যাপারটা ঃ অকারণে লজ্জাও হয়েছিল একটু। এখানে যে দিন আসবে—দাদার বৌভাতের দিন—হঠাৎ নিজে হাতে ওকে সাজাতে বসলেন রতনদি। এরকম কখনও করেন নি। পরিবর্তনটা শুরু হয়েছে তার আগেই অবশ্য, কিন্তু তখন অতটা বুঝতে পারে নি। কিছুদিন ধরেই পাগলের মতো ওর জন্যে জামার ওপর জামা করাতে দিচ্ছিলেন, ধুতির ওপর ধুতি কিনছিলেন। সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনেই। আদ্দি আব্রোঁয়া রেশমের পাঞ্জাবি—দেশী ফরাসডাঙ্গার দামী মিহি ধুতি। সেই সঙ্গে মুসলমান দর্জি ডেকে চুড়িদার পাজামা-আচকান।

অবাক হয়ে যেত কান্তি, কিছুই বুঝতে পারত না রতনদির মতিগতি। প্রতিবাদ করতে যেত প্রথম প্রথম, ব্যাকুলভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করত, 'এ কী করছেন রতনদি, মিছিমিছি কেন এত খরচ করছেন বলুন তো! আমার তো একগাদা জামাকাপড় রয়েছে। একেই তো কত খরচ করাচ্ছি আপনার, তার ওপর অকারণে এ সব করছেন কেন?'

রতনদি কিন্তু উড়িয়ে দিতেন কথাটা। কখনও ধমক দিতেন, 'আচ্ছা আচ্ছা—হয়েছে, যাও, তোমাকে আর অত পাকা-পাকা কথা বলতে হবে না।' কখনও বা ওর কাঁধে হাত রেখে ওর মুখের দিকে দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে চেয়ে বলতেন, 'কী হবে আমার এত পয়সা রে? কার জন্যে রেখে যাব? তোকে সাজিয়ে যদি আমার সুখ হয়, করলুমই নয় দুটো পয়সা খরচ। তোর কি?' আবার এক একদিন বলতেন, 'সুন্দর চেহারাতেই তো সুন্দর পোশাকের দাম। এই তো তার সার্থকতা। আমাদের আর কি—দেখেই তৃপ্তি।'

ও'র মনের ভাবটা ঠিক ধরতে পারত না কান্তি, আরও কুণ্ঠিত, আরও অপ্রতিভ হয়ে পড়ত।

সে যে এত সুন্দর দেখতে তাও তো আগে সে জানত না। রতনদির মুখে বার বার শুনেই কতকটা সচেতন হয়েছিল সে। ইদানীং আয়নায় নিজেকে দেখে ভাববার চেষ্টা করত সত্যিই সে সুন্দর কিনা। আবার ভাবত রতনদিটা পাগল। সুন্দর সুন্দর ক'রে এত মাথা ঘামাবার কী আছে। রতনদিও তো কী সুন্দর দেখতে। নিজেকে সাজালেই তো পারে, আর সাজাচ্ছেও তো—তবে আর কি!

আগে কুণ্ঠিত হ'ত সে শুধু খরচের কথাটা ভেবেই। কিন্তু ঐদিন—দাদার বৌ-ভাতের দিন থেকে লজ্জার ও সঙ্কোচের আরও একটা কারণ দেখা দিল। কেন লজ্জা তা বলা মুশকিল ছিল সেদিন—আর সেই জন্যেই কথাটা কাউকে বলতে পারে নি। প্রথমত বিয়ের দিন তো যেতেই দিলেন না রতনদি, পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে: দাদার বিয়েতে একদিন বরযাত্রী গেলে এমন কি ক্ষতি হ'তে পারে তা তার মাথাতে যায় নি সেদিন, মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছিল। বৌভাতের দিন সকালেই যাবার কথা, কী খেয়াল গেল রতনদির, তাঁর সেই অত শখের দেড় ঘণ্টা ধরে চান তাড়াহুড়ো ক'রে সেরে এলেন ওকে সাজাতে। নিজে হাতে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে ওর চিবুকটি ধরে কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'সত্যি, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ভাই তোমাকে কান্তি, যেন সত্যিকারের রাজপুত্তুর!'

আর তারপরই দুহাতে ওর মুখটি ধরে কাছে এনে একটি চুমো খেয়ে বলেছিলেন, 'যাও, সাবধানে যেও। সকাল ক'রে চলে এসো। দারোয়ান যাচ্ছে সঙ্গে, আমার হয়ে ও-ই নৌকতা করবে।'

লজ্জার পরিসীমা ছিল না সেদিন, কিন্তু তবু সে নিতান্তই নির্দোষ গ্লানিহীন লজ্জা। অনেকটা সুখের ও আত্মপ্রসাদেরও বটে। রতনদির মাথাটা খারাপ এই কথাই বার বার বোঝাতে চেয়েছিল সে নিজেকে। সেই সঙ্গে এ কথাটাও মনে উঁকি মেরেছিল যে সে সুন্দর দেখতে—আর রতনদি সত্যি-সত্যিই ছোট ভায়ের মতো দেখেন ওকে।

তবু—মনের মধ্যে অস্বস্তিও একটা কোথায় ছিল।

কেমন একটু ভয়-ভয়ও করেছিল যেন সেদিন। নাম-না-জানা ভয়। মনে হয়েছিল এতটা ভাল নয়, এতটা সইবে না। হয়ত সকলের চোখ টাটাবে, রতনদির বাবাও বিরক্ত হবেন হয়ত—ওর জন্য এত খরচ করছে জানতে পারলে।

কিন্তু রতনদির যেন সব ভয়ডর হঠাৎ ঘুচে গেল। সমস্ত হিসেবের বাঁধ গেল ভেঙ্গে। সাবধান হওয়া তো দূরের কথা, এর পর থেকে বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করলেন। প্রত্যহই ওকে নিজে হাতে সাজাতে যেতেন—ভাল ভাল দামী দামী পোশাক পরাতেন। নিতান্ত কান্তি খুব বিদ্রোহ করত বলে—ইস্কুলের সময়টা পাগলামি একটু বন্ধ রাখতেন। রতনদিদের পুরনো ঝি মোক্ষদাও ওর পক্ষে যোগ দিয়েছিল, তাই আরও সংযত হয়েছিলেন খানিকটা। মোক্ষদা বলেছিল, 'সত্যিই তো বাপু, তুমি যেন পাগল হয়েছ তাই বলে ও তো আর হয় নি যে অমনি লব-কাত্তিক সেজে ইস্কুল পাঠশালে যাবে। অপর ছেলেরা ক্ষেপিয়ে শেষ করবে যে জামাইবাবু বলে।'

কিন্তু ইস্কুল থেকে এলে আর রক্ষে নেই। ইস্কুলের জামা-কাপড় ছেড়ে মুখহাত ধুয়েই ভালভাল জামাকাপড় পরতে হবে, সেজেগুজে রতনদির কাছে বসতে হবে খানিকটা। এ সময়টা তাঁরও প্রসাধনের সময়, কান্তিকে সাজিয়ে বসিয়ে রেখে নিজে সাজতেন—কোনদিন বলতেন, 'চলো ছাদে বেড়াতে যাই।' ছাদে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে কিংবা কাঁধে হাত দিয়ে পায়চারি করতেন। কোনদিন বা শুধুই মুখোমুখি বসে গল্প করতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে বেড়াতে যাওয়া বা খেলাধুলোর পাট ছিল না কান্তির—পাড়াটা খারাপ বলে বিকেলের দিকে বেরোতে নিষেধ করতেন এঁরা, তাছাড়া তার নিজেরও ভাল লাগত না। ইস্কুলের ছেলেরা আগে আগে ওর ঐ পাড়ায় থাকা নিয়ে নানারকম বাঁকা মন্তব্য করত, ওর সম্বন্ধে একটা হীন ধারণাও ক'রে নিয়েছিল, সেটার পুরো কারণটা না বুঝলেও ঐ পাড়ায় বাস করা যে কোন ভদ্রসন্তানের পক্ষে শোভন নয় এটা সে বুঝেছিল। তাই যেটুকু না বেরোলে নয় সেইটুকুই শুধু বেরোত। আর পড়বার সময় তো সেটা নয়ই, মাস্টার মশাইরাও বলতেন, "All work and no play makes Jack a dull boy"—রতনদিও বলতেন, 'ইস্কুল থেকে এসেই আবার বই নিয়ে বসতে নেই, ওতে পড়াশুনো এগোয় না। মাথাকে বিশ্রাম দিতে হয় একটু।'

কিন্তু সন্ধ্যে হ'লে, যখন পড়াশুনোর সময় হ'ত, তখনও রতনদি ওকে ছাড়তে চাইতো না। সঙ্গে সঙ্গে তেতলায় ওর ঘরে এসে বলতেন, 'তুমি পড়, আমি তোমার সঙ্গে গল্প করব না, শুধু চুপ ক'রে বসে থাকব!'

ওর ওপরের ভোল্ পালটে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। সে মেঝেতে পাতা তোশকের বিছানা আর নেই (যদিচ সেই শয্যাতে শুয়েই কান্তির প্রথম মনে হয়েছিল সুখ-স্বর্গ!), সে জায়গায় একজনের মতো বোম্বাই খাট এসেছে, গদি তোশক ঝালর-দেওয়া বালিশে সাজানো হয়েছে বিছানা। পড়বার জন্যে একটা ছোট টেবিল চেয়ারও আনিয়ে দিয়েছেন রতনদি!

কান্তি গিয়ে চেয়ার টেবিলে বই খাতা নিয়ে বসলে রতনদি ওর পাশে বিছানার ওপর বসতেন। রতনদির বর নটার আগে আসেন না কোনদিনই। আগে আগে এ-সময়টা রতনদি বই পড়তেন শুয়ে শুয়ে—এখন আর বই ছোঁন না। ও'র বর রাশীকৃত বাংলা বই কিনে পাঠিয়ে দেন, সে সব গাদামারা পড়ে থাকে। এখন ও'র এই নতুন নেশায় পেয়ে বসেছে—হাঁ করে কান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা।

চুপ ক'রে বসে থাকব বললেই কিন্তু আর চুপ ক'রে বসে থাকা যায় না। রতনদিও বসতে পারতেন না। দু'চার মিনিট পরেই উশখুশ ক'রে উঠতেন, একথা সেকথা পাড়-

তেন। কান্তিরও অস্বস্তি লাগত, একটা মানুষ দুহাতের মধ্যে বসে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে—এ অবস্থায় বই-খাতায় ডুবে থাকে কী ক'রে? ওর মাস্টার আসতেন সকালে ; এক এক সময় কান্তির মনে হ'ত, মাস্টারমশাই যদি পড়াবার সময়টা বদলে দেন তো ভাল হয়। কিন্তু পাড়া খারাপ বলেই বোধ হয়—সন্ধ্যার দিকে তিনি আসতে চাইতেন না।

প্রথম প্রথম পড়ার ব্যাঘাত হ'ত বলে এ ব্যাপারটা আদৌ ভাল লাগত না কান্তির —নটা বাজলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচত। কারণ নটা বাজলেই ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক রতনদিকে নেমে যেতে হ'ত নিচে। জামাইবাবুর আসবার সময় হ'ত। কিছুদিন পর থেকে আর তত খারাপ লাগত না। তারপর এক সময় কান্তি আবিষ্কার করল যে তারও ভালই লাগে এই গল্প করাটা। ক্রমশ এমনও হ'ল যে, রতনদি নিচে চলে গেলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত মন বসাতে পারত না পড়ায়। কেবলই মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে কিছুক্ষণ আগেকার কথাগুলোরই রোমন্থন চলতে থাকত। মনে হ'ত বেশ মানুষ রতনদি। যেমন মিষ্টি কথা, তেমনি জমিয়ে গল্প করতে পারেন। যার ভাল হয় তার সব ভাল হয়। যেমন সুন্দর দেখতে তেমনি স্বভাবটিও সুন্দর। সত্যি দেখতেও কেমন চমৎকার, যখন সেজেগুজে বসেন তখন যেন মনে হয় পটে-আঁকা কোন ঠাকুর-দেবতার ছবি।...তারপর সময়ের হিসাবটাও যেতে লাগল গুলিয়ে, কোথা দিয়ে ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরে নটার ঘরে আসত তা দুজনের কেউই টের পেত না। অসহিষ্ণু মোক্ষদা গলির মোড়ে 'দাদাবাবু'র গাড়ির আওয়াজ পেয়ে যখন ওপরে এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠত—তখন খেয়াল হ'ত ওদের। 'কী গো তোমাদের আর কথার ঝুলি ফুরোবে না—না কি? ওদিকে মানুষটা এসে দেখতে না পেলে যে রণিনরস্ত পাতালস্ত করবে তার ঠিক আছে? গাড়ি এসে ভ্যাঁক্ ভ্যাঁক্ করতেছে তাও কি কানে শুনতে পাও না? একেবারে রুন্মত্ত হয়ে বসে গপ্প করা যে দেখতে পাই—জ্ঞানগম্যি থাকে না একটু? এখনি তো রোপরে উঠে আসবে—ত্যাখন আমি কি জবাব দেব মানুষটাকে!' চমকে উঠত রতনদি, 'ওমা, নটা বেজে গেছে নাকি রে? কখন বাজল? টের পাই নি তো?'

'তা টের পাবে কেন? নটা কি আজ বেজেছে—কুড়ি পঁচিশ মিনিট পার হয়ে গেছে দ্যাখো গে যাও! বলি তোমার না হয় পয়সার রভাব নেই, ঐ গরীবের ছেলেটার মাথা খাচ্ছ কেন বল দিকি অমন কড়মড়িয়ে চিবিয়ে? নেকাপড়া তো ওর শিকেয় উঠল দেখতে পাই। একটা পাসও কি করতে দেবে না?'

'তুই থাম মুকী। তোর বড্ড আসপদ্দা বেড়েছে।' এই বলে, কান্তিরই ছোট আয়নাটায় মুখখানা দেখে নিয়ে আলতো হাতে চুলটা একটু ঠিক ক'রে দ্রুত নেমে যেতেন রতনদি।

মোক্ষদার এই তিরস্কারের দিনগুলোতে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ত কান্তি, অনুতপ্ত হ'ত একটু। জোর ক'রে পড়ায় মন বসাবার চেষ্টা করত। কিন্তু মন আবার কখন বইখাতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে স্মৃতির রোমন্থন শুরু করত তা নিজেই টের পেত না। সত্যি কোথা দিয়ে নটা বেজে গেল—আশ্চর্য তো! এই তো মনে হচ্ছে একটু আগেই ছাদ থেকে ঘরে এসে ঢুকেছে ওরা!...না, কাল থেকে একটু হুঁশ রাখতে হবে। রতনদিকে শাসনও করতে হবে একটু। রোজ রোজ মজার গল্প ফেঁদে ওর পড়া নষ্ট করা! আর কি বাজে কথাই বলতে পারে রতনদি, এত কথা পায় কোথা থেকে! তবে ঐ যে বইয়ের গল্পগুলো বলে—ওগুলো কিন্তু বেশ। বঙ্কিমবাবুর বইগুলো এবার পরীক্ষা হয়ে গেলে পড়বে সে। রতনদির কিন্তু মনেও থাকে খুব—এক-এক সময় তো মুখস্থ বলে যায়। লেখাপড়া করলে ভাল হ'ত।

এমনি ক'রে কখন আবার ডুবে যায় সে রতনদিরই চিন্তায়, তা বুঝতেও পারে না। টেবিলের ওপর আলোটা জ্বলতে থাকে, বইখাতা মেলাও থাকে সামনে—ওর মুগ্ধ দৃষ্টি কিছুক্ষণ-পূর্বে-বসে-থাকা রতনদির শূন্য জায়গাটায় স্থির-নিবদ্ধ ক'রে বসে বসে কত কী ভাবতে থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

প্রথম বিপদের সঙ্কেত পেল কান্তি একদিন মোক্ষদার কাছ থেকেই। সেদিন কী একটা হাফ-হলিডের দিন, শনিবারই বুঝি, দুপুরবেলা ইস্কুল থেকে বাড়ি এসেছে যখন সে—রতনদি তখনও ঘুমোচ্ছেন। একটু ইতস্তত করল, একবার ভাবল ঠেলে ঘুম ভাঙায় রতনদির। আবার কী মনে ক'রে ওপরে উঠে গিয়ে বইখাতা নিয়েই বসল। অনেকদিনের টাস্ক জমে গেছে সব। মাস্টারমশাইদের কাছে ক'দিন ধরেই বকুনি খাচ্ছে—রতনদি এবার উঠে পড়লে আজও হবে না কিছু। এই বেলা সেরে নেওয়াই ভাল।

সে বিছানাতে বসে অঙ্ক কষছে, মোক্ষদা এল ঘর ঝাঁট দিতে। খানিকটা নীরবেই ঝাঁট দিল সে, তারপর্ কী মনে ক'রে ঝাঁটাটা ফেলে কান্তির কাছে এসে দাঁড়াল কোমরে হাত দিয়ে।

প্রথমে অতটা বুঝতে পারে নি কান্তি। ঝাঁটার শব্দ থেমে যাওয়াও লক্ষ্য করে নি অত—হঠাৎ এক সময় কাছে একটা মানুষের উপস্থিতি অনুভব ক'রে মুখ তুলে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে মোক্ষদা। মুখেও তার কেমন একধরনের হাসি। সে কি কৌতুকের না অনুকম্পার—না বিদ্বেষের, তা ঠিক ধরতে পারল না কান্তি। কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল তার। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, 'কী গা মোক্ষদাদি, আমায় কিছু বলবে?'

মুচকি হাসল মোক্ষদা। বলল, 'আর কিছু নয়—বলছিনু কি আর নেকাপড়ার ঠাট কেন ঠাকুর, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও না! আর যে কিছু হবে না এখানে থেকে তা তো নিজেই বুঝতে পারতেছ। এই বেলা পালাও—ভাল চাও তো। তবু এখনও জাত-ধর্মটা আছে—আর কিছু দিন এখানে পড়ে থাকলে সে দুটোও যাবে, রেহকাল পরকাল দুই-ই খুইয়ে বসে থাকতে হবে। লাভ তো হবেই না কিছু উপ-রন্তু মার খেয়ে বেরোতে হবে এ বাড়ি থেকে, এও বলে রাখছি। মুকী আজকের লোক নয়, দেখল ঢের...ও-মাগীর ছেমো যখন চেপেছে তখন বেশী দিন আর তোমার বাঁচোয়া নেই, তোমার কাঁচা মাথাটি পরিপুন্নু ক'রে চিবিয়ে না খেয়ে ছাড়বে না। তবে এখনও সময় আছে, যদি পালিয়ে বাঁচতে পারো তো দ্যাখো। বামুনের ছেলে তায় গরীবের ছেলে--চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাবে সেই জন্যেই বলা।'

সত্যিই সেদিন কিছু বুঝতে পারে নি কান্তি, শুধু একটা অজ্ঞাত ভয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল তার, অকারণেই কানের কাছটা উঠেছিল লাল হয়ে। অবাক হয়ে বলেছিল, 'তুমি কি বলছ মোক্ষদাদি, আমি তো—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'বুঝতে যে পারবে না তা আমিও জানি! তাহ'লে আর তোমাকে সাবধান করতে আসবই বা কেন? এত যদি তোমার বুদ্ধি থাকত তাহ'লে কি আর এমনি ক'রে

নিজের সর্বনাশ নিজে করতে। তাহ'লে তো দিন গ্রুছিয়ে নিতে। এই যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচা করতেছে—এ তোমার কী কাজে আসতেছে বলো? তেমন সেয়না শঠ ঠ ছেলে হ'লে বেশ ক'রে দ্রুয়ে বার ক'রে নিত। ম্যাগী যেকালে ফলেন্ হয়েছে সেকালে কি আর কিছ্র হিসেব করত—যা চাইতে তাই দিত।...নাও না, তুমিও দিন কিনে গ্রুছিয়ে নাও না—কিচ্ছ্র বলব না। তব্র তো ব্রঝব একটা কাজ হচ্ছে রাখেরের। এ যে ষাঁড়ের নাদ হয়ে থাকছ। জাতও যাবে পেটও ভরবে না!'

আরও বিহ্বল হয়ে পড়ে কান্তি। এ সব ভাষা তার বোধশক্তির বাইরে। 'ফলেন্' হওয়াটা যে কী বস্তু—তা আজও জানে না কান্তি, তবে একটা ঝাপ্সা ঝাপ্সা রকমের অর্থ আন্দাজ করতে পারে বটে। কিন্তু সেদিন সবটাই দ্রুর্বোধ্য হেঁয়ালি বলে বোধ হয়েছিল।

খানিকটা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমি কিন্তু সত্যিই কিছ্র ব্রঝতে পারছি না মোক্ষদাদি, তুমি একট্র খ্রলে বলো। তুমি কি রতনদির কথা বলছ?'

'না—ওপাড়ার আস্র দত্তর কথা বলছি। তুমি বেহেড্ বোকা, যাকে রাবর বলে তাই। আমার ঝকমারি হয়েছিল তোমাকে এ সব বলতে আসা! যাবে রধঃপাতে, তুমি যাবে—আমার কি? মাঝখান থেকে লাভের মধ্যে লাভ এই— এখন যদি সাতখানা ক'রে গিয়ে নাগাও আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি!'

তারপর ঘ্ররে গিয়ে ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে আবার সামনে এসে বলেছিল, 'তবে এও বলে রাখছি ঠাকুর, আমার সঙ্গে নাগতে এসো নি। ভাল হবে না তাহ'লে। জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বাদ করলে ঠকতে হয়; মনে এখো।'

সে অবশিষ্ট ঘরট্রকু এক মিনিটের মধ্যে ঝাঁট দেওয়া শেষ ক'রে পাশের ঘর-খানাতে ঢ্রকে গিয়ে দড়াম্ ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল। ওঘরটাতে আসলে ঠাকুরের থাকবার কথা—কিন্তু মোক্ষদাদিও গভীর রাত্রে এসে ওঘরে শোয়—এ নিজে চোখে দেখেছে কান্তি। মোক্ষদা ভোরে সকলের আগে ওঠে—কিন্তু কান্তি ওঠে এক একদিন তারও আগে—ভোরবেলা চোখ ম্রছতে ম্রছতে ঐ ঘর থেকেই বেরোতে দেখেছে তাকে। তবে তাতে যে কিছ্র দ্রষ্য আছে তা ওর মাথাতে অত ঢোকে নি। সেকথা আলোচনাও করে নি সে কার্রর সঙ্গে। একদিন শ্রধ্র গল্প করতে করতে রতনদির কাছে বলে ফেলেছিল, তাতে রতনদি হেসে ওর গাল টিপে দিয়ে বলেছিল, 'দ্রর পাগল! আমার কাছে যা বললে বললে— অপর কার্রর কাছে ব'লো না। ঝি-চাকরদের এ সব কথা নিয়ে মনিবদের আলোচনা করতে নেই। ও অমন হয়েই থাকে!' কী হয়ে থাকে ঠিক তা না ব্রঝলেও জিনিসটা যে ভাল নয় সেটা ব্রঝতে পেরেছিল সেদিন।

সেই মোক্ষদাদি আজ ওকে উপদেশ দিতে এসেছে!

চাকরদের কথায় মনিবের থাকতে নেই—চাকররাই বা মনিবের কথায় থাকে কেন?

রতনদিকে খারাপ বলবে কেন? আবার বলছে মাগী! আস্পদ্দা তো কম নয়! কী সাহস ওর!

কথাটা যে রতনকে আর তাকে জড়িয়ে বলা হচ্ছে এটা ব্রঝতে অবশ্য আরও মিনিট দ্রই সময় লাগল। কিন্তু তারপরই একটা অসহ্য ক্রোধে কান-মাথা আগ্রন হয়ে উঠল তার, ইচ্ছে হ'ল ওঘরে গিয়ে খ্রব দ্র-কথা শ্রনিয়ে দিয়ে আসে সে। কিম্বা রতনদিকে ব'লে আজই ওর চাকরিতে ইস্তফা দিইয়ে দেয়। কিন্তু তারপরই মনে পড়ল মোক্ষদা মান্রষটি বড় সহজ নয়। যখন কার্রর সঙ্গে ঝগড়া করে, তখনকার হিংস্র চেহারাটা ওর দেখেছে কান্তি, তাতে ব্রকের মধ্যে গ্রর্গ্রর্ ক'রে উঠেছে তার।

তাছাড়া—রতনদির বাবা মামাবাব্র পর্যন্ত ওকে কতকটা ভয় ক'রে চলেন তা সে

দেখেছে। এতদিনের পুরনো ঝি, তার নামে লাগাতে গেলে ওর কথা কি বিশ্বাস করবে কেউ? রতনদিও হয়ত শেষ পর্যন্ত জবাব দিতে পারবেন না—মায়ায় পড়ে। মাঝখান থেকে প্রবল শত্রু সৃষ্টি হবে শুধু শুধু। ঐ যা বলেছে মোক্ষদাদি, জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা ঠিক নয়।

সুতরাং মনের রাগ মনের মধ্যেই পরিপাক করতে হয় কান্তিকে। কোন কালেই কাউকে চড়া কথা বলা অভ্যাস নেই ওর, চিরদিন সকলকে ভয় ক'রেই এসেছে—চেষ্টা করলেও হয়ত ভাল ফল হবে না, উল্‌টে মোক্ষদার মুখ থেকে আরও কতকগুলো কটু কথা শুনে চলে আসতে হবে মাথা হেঁট ক'রে।

চুপ ক'রে বসেই থাকে তাই কান্তি। বই-খাতা সামনে খোলা থাকে, কলমের কালি নিবের ডগায় শুকিয়ে যায়—বার বার কালিতে ডুবিয়ে কাজ শুরু করতে চেষ্টা করে, বার বারই হাত থেমে যায় কখন।

রাগের প্রথম প্রবলতাটা কেটে যাবার পর আর একটা কথাও ওর মনে হ'ল। আচ্ছা, মোক্ষদাদি যে কথাগুলো বলে গেল তার কতকটা কি ঠিকও নয়। অধঃপথে যাওয়ার কথাটাতে ঠিক কতকটা কি বলতে চাইছে তা না বুঝলেও—পড়াশুনো যে তার হচ্ছে না কিছুদিন থেকেই, সেটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই। এতদিন ইস্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে বলেই মান ছিল তার, ইদানীং সে নাম একেবারে ঘুচতে বসেছে। ক্লাসের পড়া পারে না, মাস্টারমশাইদের কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়—বকুনিও খায় সেজন্যে। পর পর তিন-চার দিন হোমটাস্ক দেখাতে না পারায় অঙ্কের মাস্টার প্রফুল্ল-বাবু ওকে সেদিন বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়েও দিয়েছিলেন। অথচ ঐ প্রফুল্লবাবু কী ভালই না বাসতেন ওকে। শুধু দাঁড় করিয়েই দেন নি—খুব বকেও ছিলেন। বলে-ছিলেন, 'পিপুল পাকছে বুঝি! হবেই তো, যে পাড়ায় আর যে বাড়িতে থাকো। এতদিন পাকে নি তাই আশ্চর্য। তা আর বেঞ্চিটা জোড়া ক'রে রেখেছ কেন বাবা, যাও না, পান-বিড়ি খেয়ে ইয়ার্কি দিয়ে ঘুরে বেড়াও না—তোমারও সুবিধে হবে, আমাদেরও হাড় জুড়োবে।'

সেদিন খুব রাগ হয়েছিল প্রফুল্লবাবুর ওপর। বিশেষত 'যে বাড়ি' বলাতে। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের মধ্যে একটা চাপা হাসির ঢেউ বয়ে গিয়েছিল সেটাও চোখ এড়ায় নি ওর। দারুণ অপমান বোধ হয়েছিল। কিন্তু আজ ভেবে দেখল প্রফুল্লবাবু কিছু মিছে বলে নি। দোষ তো তারই। পড়াশুনো করতে এসেছে সে, এমনিই তো অনেক বেশী বয়সে ইস্কুলে পড়ছে—তার ওপর যদি এমনভাবে বকে যায়—। আর বকে যাওয়া না তো কী।

মোক্ষদাদি যা বলেছে ওর হিতাকাঙ্ক্ষীর মতোই বলেছে। রাগ না ক'রে কথাটা ভেবে দেখাই উচিত ওর! সত্যিই তো, গরীবের ছেলে, মানুষ হবে, মানুষ হয়ে তাঁদের দুঃখ ঘোচাবে এই আশাতেই তো মা-দাদা তাকে এত দূরে ফেলে রেখেছেন। তা যদি না-ই হয় তো এখানে থেকে লাভ কি? বাড়িতে চলে গেলে তবু তাঁদের সংসারের কাজে সাহায্য করতে পারে।

না, মোক্ষদাদি ভালই করেছে ওকে একটু সাবধান ক'রে দিয়ে। এবার থেকে সাবধান হয়ে চলবে। রতনদির আর কি, তাঁর সময় কাটে না—তাই ওর সঙ্গে বসে গল্প করেন কিন্তু তাঁর তো মাথার ওপর এত দায়িত্ব, এত ভাবনা নেই।...

সে আবারও দোয়াতে কলম ডোবায় একবার।

কিন্তু রতনদিকে কেমন যেন দুঃখী দুঃখী মনে হয়। সত্যিই তো, তার কে আছে? বর আসে রাত নটায়, এসেই মদ খেতে শুরু করে। এক একদিন চেঁচামেচি মারধোর

কত কী না হয়! তারপর খেয়ে ঘুমোল, ভোর হ'তে না হ'তে তো চলে গেল। মামাবাবু নিজের খাওয়া, তামাক খাওয়া আর আরাম এই নিয়েই থাকেন। ঝি-চাকররা বোঝে শুধু পয়সা। রতনদির মুখের দিকে কে চায়! না একটা বন্ধু-বান্ধব না কোন আত্মীয়স্বজন। কথা কইবার পর্যন্ত লোক নেই এ বাড়িতে, সারাদিন মুখ বুজে মানুষ থাকতে পারে! কখনও কখনও দৈবাৎ ওর বরের বন্ধু-বান্ধব দু-চারজন আসে, তবু দুটো বাইরের মানুষের মুখ দেখতে পায়। কিন্তু তারাও সব মাতাল। তারাও এসে মদ খেতে শুরু করে—দু-একজন তো ঘুমিয়েই পড়ে, ধরাধরি ক'রে গাড়িতে তুলে দিতে হয়। এক-একজন বমি ক'রে ভাসায়। সে কী দুর্গন্ধ! সে সব পরিষ্কার করতে হয় তখন মোক্ষদাদিকেই। ঐ জন্যেই ওর আরও জোর।...থিয়েটার-বায়স্কোপ তাই বা কবে যায়। একবার এক সপ্তাহ রতনদির বর কোথায় গিয়েছিল বাইরে, একেবারে তিন-চার দিনের মতো থিয়েটার-বায়স্কোপের টিকিট কিনে দিয়ে গিয়েছিল। হুকুম ছিল মোক্ষদাকে নিয়ে যাবার। সব নাকি ফিমেল সীটের টিকিট। তারই মধ্যে একদিন দারোয়ানকে দিয়ে লুকিয়ে একখানা টিকিট কিনে রতনদি তাকেও নিয়ে গিয়েছিল। 'সীতা' পালা—বড় দুঃখের কিন্তু চমৎকার পালা। দেখে এসে যত কেঁদেছে কান্তি তত উচ্ছ্বাস করেছে।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। রতনদির জীবনটা কি। কী আছে ওঁর সাধ-আহ্লাদ—বলতে গেলে বন্দী হয়ে আছেন। পয়সা আছে ঢের, বর অনেক পয়সা দেয় ঠিকই—কিন্তু পয়সাই কি সব! পয়সা খরচ করারও তো উপায় নেই নিজের খুশি-মতো। শুধু তার মা'র ভাষায়, 'ভূত-ভোজন করানো'। সেই জন্যেই তো আরও বিনা দরকারেও কান্তির জামার ওপর জামা করিয়ে দেন, কাপড়ের ওপর কাপড় কেনেন আর একটু-খানি গল্প করবার জন্যে ছুটে ছুটে আসেন, হ্যাঙ্গালি জ্যাঙ্গালি করেন।...

অর্থাৎ আবারও কখন ডুবে গিয়েছিল ঐ রতনদির চিন্তাতেই। সেটা খেয়াল হ'ল খোদ রতনদির ঘুম ভেঙে ওর খোঁজে ওপরে উঠে আসতে।

'বা রে ছেলে, কখন ইস্কুল থেকে এসে চুপি চুপি ঘাপ্‌টি মেরে ওপরে বসে আছ! আমাকে ডাকতে নেই বুঝি! আমি বলে আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছি যে তুমি সকাল ক'রে এসে ডাকবে, পেট ভরে গল্প করব। আজ তোমার সঙ্গে বসে মুড়ি বেগুনি খাব শখ হয়েছে।...তা আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছি—জানি ঠিক এসে ডাকবে।...ডাকো নি কেন? আমি যদি মুকীকে না জিজ্ঞেস করতুম তো টেরই পেতুম না যে চারটে বাজে।'

যে সব ভাল ভাল কথা এতক্ষণ ধরে ভেবে রেখেছিল গম্ভীরভাবে গুছিয়ে বলবে বলে—তা এর পর আর বলতে মন সরে না। যে মানুষটা সকাল থেকে আয়োজন ক'রে রেখেছে তার সঙ্গে গল্প করবে—তাকে কোন্ প্রাণে বলবে যে, 'আর তোমার সঙ্গে গল্প করব না আমি, গরীবের ছেলে পড়তে এসেছি, লেখাপড়া নিয়েই থাকব। তুমি আর আমার পড়াটা মাটি করতে এসো না।'

কিছুই বলা হয় না তাই। লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে বরং—যে কথাগুলো বলবে বলে ভেবে রেখেছিল—সেই কথাগুলো মনে ক'রে। তার বদলে কুণ্ঠায় জড়োসড়ো হয়ে বলে, 'তা নয়। এই টাস্কগুলো—। অনেক দিন হয়ে গেল কিনা, আমারই গাফিলি। আজ বড্ড বকুনি খেয়েছি। তাই ভাবছিলুম—তা যাক, না হয় রাত জেগে সেরে নেবো।'

'টাস্ক না দেখাবার জন্যে বকুনি খেয়েছ? তা কৈ বল নি তো। সকালে মাস্টার-মশাই কি করেন? তিনি করিয়ে দেন না কেন?'

'না, তাঁর অত সময় হয় না। আর এ তো আমারই করবার কথা। তিনি কষে দিয়ে

গেলেও আমাকেই তো খাতায় তুলতে হবে।'

'তাই তো! সত্যি, আমারই অন্যায় হয়ে গেছে—রোজ তোমার সময় নষ্ট করি। ক্লাসের প্রথম ছেলে তুমি—তুমি আঁক-কষে না নিয়ে গেলে কী মনে করবেন তাঁরা। যৎপরোনাস্তি ম্লান হয়ে যায় রতনদির মুখ, 'তা তুমি ভাই অঙ্ক কষো, আমি এখন যাই। তোমার টাস্ক সারা হ'লে বরং নিচে যেও। তখনই বরঞ্চ মুখ-হাত ধুইয়ে জামা-কাপড় ছাড়িয়ে দেবো। আমি তোমার চা-জলখাবার এখানেই দিয়ে যেতে বলছি।'

রতনদি একেবারে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁর সেই ম্লান মুখের দিকে চেয়ে, অপ্রতিভ করুণ কণ্ঠস্বরে কান্তির বুকের মধ্যটা যেন কেমন ক'রে উঠল। সে যা কখনও করে না তাই ক'রে বসল। কিছু না ভেবে-চিন্তেই খপ ক'রে রতনের একটা হাত ধরে ফেলে বলল. 'না না, রতনদি তুমি যেও না। একটু বসে যাও। টাস্ক আমি রাত্রে ঠিক সেরে ফেলব।'

ঝোঁকের মাথায় ধরে ফেলেই হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল অবশ্য কিন্তু সেই সঙ্গেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে এর আগে কখনও 'তুমি' বলে নি রতনদিকে। বলা উচিতও নয়। সে আরও লাল হয়ে মাথা নামাল, দেখতে দেখতে তার কপাল গলা ঘেমে উঠল—ভয়েও বটে, তার এই ধৃষ্টতা কী চোখে দেখবেন রতনদি, যদি রেগে যান এই ভয়ে—আর লজ্জাতেও বটে।

কিন্তু রতনদি রাগ করলেন না, বিরক্তও হলেন না। উল্‌টে তাঁর চোখ মুখ যেন মনে হ'ল আনন্দে জ্বলে উঠল। যেন কৃতার্থই হয়ে গেলেন তিনি। একটু ইতস্ততও করলেন, একবার বসতেও গেলেন আবার, কিন্তু তারপরই মন শক্ত ক'রে নিলেন যেন। উঠে দাঁড়িয়ে কেমন এক রকমের অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন, 'অমন ক'রে প্রশ্রয় দিও না—কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই। অত নরম হ'লে দুনিয়ায় টিকতে পারবে না...আমি এখন যাই—সন্ধ্যের সময় আবার আসব বরং। তুমি কাজ সেরে ফেল—'

চলে গেলেন রতনদি সত্যি-সত্যিই। কিন্তু তিনি যে খুব ব্যথা পেয়েই গেলেন, সেই কথাটা মনে ক'রে কান্তির মন খারাপ হয়ে গেল। এতক্ষণের প্রতিজ্ঞা তো ভেসে গেলই—উপরন্তু যেটুকু লেখাপড়া এতক্ষণ জোর ক'রে হচ্ছিল বার বার চেষ্টার ফলে, সেটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। রতনদির ম্লান মুখ, তাঁর করুণ কণ্ঠস্বর আর শেষের এই কথাগুলো—সব জড়িয়ে কেবলই মনে হ'তে লাগল—এত সব থাকতেও রতনদির কিছু নেই, রতনদি বড় দুঃখী। বড় দুঃখেই ছুটে ছুটে আসে তার কাছে। এই একটুখানি যা তার সান্ত্বনা—তা থেকেও বঞ্চিত করল কান্তি। না বললেই হ'ত টাস্কের কথাটা, কেন বলতে গেল! ভারী অনুতাপ হ'তে লাগল।

॥ ২ ॥

অতঃপর সোজাসুজি বই-খাতা গুটিয়েই বসে রইল সে। মোক্ষদা এল না—আজ স্বয়ং ঠাকুর এসে ওর চা-জলখাবার দিয়ে গেল। আজ আর বাঁধা-বরাদ্দ ঘরে তৈরী পরোটা নয়—কান্তি যা ভালবাসে বেছে বেছে তা-ই আনিয়েছে রতন। বড় বড় হিংয়ের কচুরি, আলুর দম—তার সঙ্গে খাস্তা গজা। দুঃখই করুক অভিমানই করুক—রতনদির স্নেহ তার প্রতি কিছুমাত্র কমে নি— এই খাবার আনানোতে আর এক দফা তাঁর অপরিসীম স্নেহেরই পরিচয় পেল কান্তি।

এর পর বসে বসে প্রায় ছটফট করতে লাগল সে। রতনদি যে নিজেই উঠে আসবেন একটু পরে কিম্বা ডেকে পাঠাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। থাকতে পারবেন না কিছুতেই। সেইটেরই অপেক্ষা করছে সে, তার আগে যাওয়াটা ভাল দেখায় না।

কিন্তু অপরাহ্ন ক্রমশ সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে এল, আবছা হয়ে এল বাড়ির ভেতরের দিকটা, তবু রতনদির তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ এল না। এই সময় প্রসাধন শেষ ক'রে চা খেয়ে প্রায় রোজই ওপরে ওঠেন। তবে আজ এমন চুপচাপ কেন? সত্যি বটে একবার বলেছিলেন—ওকেই নিচে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে জামা-কাপড় বদলাতে, সেই-টেই ধরে বসে আছেন নাকি? বেশ মজার লোক তো! আবার যে বলে গেলেন, 'আমি বরং সন্ধ্যের সময় আসব'—সেটা ভুলে গেলেন! কিন্তু এ ভুল'তো স্বাভাবিক নয়। কান্তি বেশ জানে ওদের এই সান্ধ্য আসরে মন পড়ে থাকে তাঁর। তবে কি সত্যি সত্যিই খুব অভিমান হয়েছে? চাপা মেয়ে, অভিমান চেপে অন্য রকম ব'লে চলে গেলেন?

সে আর থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল। অন্য দিনের চেয়ে একটু সন্তর্পণেই নামল। কেন যে এই সতর্কতা তা সে জানে না। এটা যে সঙ্কোচ—এবং এ ধরনের সঙ্কোচের যে কোন কারণ নেই, সে সম্বন্ধেও সে সচেতন নয়, আপনা থেকেই পা টিপে টিপে নামল। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে—মোক্ষদা নিচে রান্না-ঘরের সামনে পা ছড়িয়ে বসে ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করতে করতে চা খাচ্ছে দেখে যেন একটু আশ্বস্ত হ'ল। এর পর নিশ্চিন্ত হয়েই ঢুকল রতনদির ঘরে।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই চমকে উঠল সে। ঘরে আলো জ্বালা হয় নি, এখনও বেশভূষা সারা হয় নি রতনদির, চুলটা পর্যন্ত বেঁধে দিয়ে যায় নি মোক্ষদা—যেমন সেই বিকেলে ওর কাছে গিয়েছিল তেমনি অবস্থাতেই আছে এখনও। সেই ঘুম-থেকে-ওঠা সাধা-রণ-কাপড়-পরা আলুথালু অবস্থা। ঝুপসি অন্ধকারে চুপ ক'রে বসে আছেন নিচের ঢালা বিছানাটাতে একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে—সামনে হাতের কাছে একটা গেলাসে লাল-পানা কী শরবতের মতো।

কী যে সেটা, তা আজ আর বলে দিতে হ'ল না। গন্ধতেই টের পেয়েছে। এত-দিনে গন্ধটার সঙ্গে ভাল রকম পরিচয় হয়ে গেছে ওর। সে একটা চাপা আর্তনাদের মতো 'রতনদি' বলে ডেকে কাছে গিয়ে বসে বলে উঠল, 'এ কী করছ রতনদি, এমন ক'রে বসে এখন থেকেই মদ খাচ্ছ!' তারপর কেমন একটু অসংলগ্নভাবেই বলল, 'আমার ওপর রাগ করেছ রতনদি? কিন্তু আমার ওপর রাগ ক'রে এ কাণ্ড কেন করতে গেলে। ছি ছি!'

ওর ওপর রাগ ক'রেই এই কাণ্ড করেছেন রতনদি, এটা মনে করবার তার কোন অধিকার নেই—এটাও এক রকমের ধৃষ্টতা, অনধিকারচর্চা তো বটেই—কিন্তু সে সব কথা সে মুহূর্তে মনে এল'না ওর। আবারও যে সে 'তুমি' বলছে তাও লক্ষ্য করল না।

বরং আরও আবেগের সঙ্গে, ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবেই রতনের একটা হাত ধরে নাড়া দিয়ে বলল, 'ওঠো—উঠে বসো রতনদি—লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি। তুমি গা-হাত ধুয়ে নাও। এ সব ছাইভস্ম আর এখন থেকে শুরু ক'রো না। মাথায় বরং জল দাও একটু—নইলে সন্ধ্যে থেকেই মাথা ধরবে হয়ত।'

এতক্ষণ পাথরের মতোই বসে ছিল রতন, কিন্তু ওর এই স্পর্শে যেন পাষাণী প্রাণ পেল। হাতটা কান্তির হাতের মধ্যে থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে-ই দুহাতে চেপে ধরল কান্তির দুটো হাত। তারপর প্রবল আকর্ষণে ওকে আরও খানিকটা কাছে টেনে এনে বলল, 'সাধ করে কি খাই। না খেয়ে উপায় কি বল্? দুঃখ ভুলতে পারি আর

যে আমার কিছু নেই, কেউ নেই। ওরে আমি যে বড় দুঃখী, কত যে দুঃখী তা তুই বুঝবি না।'

'কে বললে বুঝব না রতনদি। আমি বুঝেছি তোমার দুঃখ। বুঝেছি বলেই তো ছুটে এসেছি। কেউ নেই তোমার কেন এ কথা বলছ—আমি তো আছি। আমি তো তোমাকে কখনও ছাড়ব না রতনদি।...তুমি এখানে এমনি ক'রে বসে না থেকে আমার কাছে গেলে না কেন, অন্যাদিনের মতো জোর ক'রে ডেকে নিলে না কেন? কেন এমন অন্ধকারে একা বসে ঐ সব বিষ খাচ্ছ?'

'একটা বিষ নামাতে এই বিষ খাচ্ছি—বুঝলি? নইলে সে বিষে সব ছারখার হয়ে যাবে। তুই যা ভাই আমার কাছে আর থাকিস নি। নয়ত এ বিষে তুইও জ্বলে পুড়ে মরবি। তুই কালই বাড়ি চলে যা!'

আর যা-ই হোক ঠিক এ কথাটা আশা করে নি কান্তি। সে একেবারে আড়ষ্ট স্তম্ভিত হয়ে গেল। রতনদির রাগ হয়েছে অভিমান হয়েছে—এটা সে আগেই আশঙ্কা করেছিল কিন্তু ঠিক এতটা যে হয়েছে, তা বুঝতে পারে নি। সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রায় ভেঙে-আসা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'তুমি আমার ওপর মিছিমিছি রাগ করছ বতনদি, আমি—আমি তো বলি নি কিছু। আমি তো বললুম রাত জেগে সেরে নেব পড়া—তুমিই তো চলে এলে। আমার ঘাট হয়েছিল টাস্কের কথা তোলা। সত্যি বলছি, আর কখনও বলব না। এই বারটি মাপ করো আমাকে!'

সে হাত দুটো রতনের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সত্যিই দু হাত জোড় করল।

অকস্মাৎ যেন পাগল হয়ে গেল রতন। একটা প্রবল ধাক্কায় ওকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলল, 'যা বলছি আমার সামনে থেকে, দূর হয়ে যা! নাকী কান্না কেঁদে আমার মন ভোলাতে এসেছ! যত সব মায়াকান্না! ওসব আমি ঢের দেখেছি। দূর হ হতভাগা। কাল সকালে উঠে যেন তোর মুখ আর আমাকে না দেখতে হয়। আমি ওঠবার আগে বই-খাতা জামা-কাপড় সব নিয়ে চলে যাবি—কোন চিহ্ন না থাকে তোর!'

চাপা হিংস্র গলায় কথাগুলো বলে যেন হাঁপাতে থাকে রতন।

ওর এ চেহারা বহুকাল দেখেনি কান্তি। অনেক দিন আগে একেবারে গোড়ার দিকে একদিন সকাল বেলা স্নান করার আগে মদের খোঁয়াড়ি না ভাঙা অবস্থায় দেখে বকুনি খেয়েছিল—সেই সময় কতকটা এইরকম চেহারা দেখেছিল ওর। কিন্তু তাও এতটা নয়। বাঘিনী কেমন তা জানে না সে, কখনও দেখে নি—কিন্তু বই পড়ে যা ধারণা হয়েছে তার—হঠাৎ মনে হ'ল রতনদি আর মানুষ নেই, সেই বাঘিনী হয়ে উঠেছে।

ভয়ে ভয়ে বিবর্ণ মুখে বেরিয়ে এল সে সেখান থেকে। অপমানে দুঃখে দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল আসছিল ভরে, গলা অবধি ঠেলে উঠছিল কান্না—কিন্তু এখানে এর পর চোখের জল ফেলতেও সাহস হ'ল না ওর। প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু চেপে পা পা ক'রে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছুটে ওপরে চলে এল।

নিজের ঘরে এসে কান্না আর কোন শাসন মানল না। বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে রীতিমতো শব্দ ক'রেই কাঁদতে লাগল সে—ছেলেমানুষের মতো। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। অপমান তো বটেই,দুঃখও তার কম হচ্ছিল না। বিনা দোষে সে এমনি লাঞ্ছিত হ'ল, সেইটেই আরও দুঃখ। কেন এমন হয়ে গেল রতনদি, এতদিনের স্নেহ ভালবাসা একদিনে ভুলে গেল! নাকি বড়লোকের ধরনই এই? এতদিনের এত ঘনিষ্ঠ সাহচর্য—এত হাসি তামাশা গল্প-গুজব একসঙ্গে খাওয়া বসাতেও কান্তি কিছুমাত্র আপন হ'তে পারে নি রতনদির, কিছুমাত্র কাছে পৌঁছাতে পারে নি। দুজনের

অবস্থার মধ্যে—ভিক্ষাদাতা ও গ্রহীতার যে দুস্তর ব্যবধান তা ঠিক রয়ে গেছে। তাই না আজ রতনদি এমন ক'রে অনায়াসে ছেঁড়া জুতোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারল তাকে!...ওদের গরীবের ঘরে ছেঁড়া জুতোও, বুঝি এমন ক'রে ফেলে না।...এখন ও বাড়িতে গিয়েই বা কি বলবে, কি কৈফিয়ৎ দেবে? তাঁরা কি বিশ্বাস করবেন যে কান্তির সত্যিই কোন দোষ ছিল না? তাই কি কেউ বিশ্বাস করে? যেখানে এত আদর-যত্ন সেখান থেকে বিনা দোষে বিতাড়িত হয়েছে—এ তো বিশ্বাস করার কথাও নয়।

ছি ছি, এর চেয়ে মরে যাওয়াও ঢের ভাল ছিল। আজকের রাতটা শেষ হবার আগে কোন রকমে তার মৃত্যু হয় না?

কান্নার ফাঁকে ফাঁকে এমনি এলোমেলো আবোল-তাবোল কত কী কথা ভাবতে লাগল সে। মুখেও দু'একটা কথা বেরিয়ে এল। ভাগ্যে এ সময়টা ওপরে কেউ থাকে না। নইলে পাগল ভাবত তাকে! সে চেষ্টা ক'রেও যে সামলাতে পারছে না নিজেকে।

অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবার পর অনেকটা শান্ত হয়ে উঠে বসল। বিছানাটা ভিজে গেছে ওর চোখের জলে, মোক্ষদাদি এসে দেখলে কী মনে করবে! যদি প্রশ্নই করে—কিসে ভিজল? অবশ্য রাত্রে বড় একটা ওপরে ওঠবার সময় পায় না। তবু—আসতেও তো পারে। ছিঃ—যদি জানতে পারে, সে বড় লজ্জার কথা হবে।

দুঃখের প্রথম আবেগটা কেটে গিয়ে এইবার মনে হ'ল—তাহ'লে কী সত্যিই বই-খাতা গুছিয়ে নিতে হবে তাকে? জামা-কাপড় সে নেবে না, যেমন একবস্ত্রে এসেছিল তেমনি একবস্ত্রে চলে যাবে। ওসব ভাল জামা-কাপড় যাকে খুশি দিন রতনদি, নয়ত জ্বালিয়ে দিন—ওতে কান্তির কোন দরকার নেই। আবার মনে হ'ল সত্যিই কি রতনদির ওটা মনের কথা? নেশা কেটে গেলে আবার ওকে খুঁজবে—আনতে লোক পাঠাবে? নিশ্চয়ই তাই। কী একটা ভেবে দুঃখ হয়েছিল, তাই মদ খেতে শুরু করেছে—আর মদ খেলেই তো রতনদির অমনি মেজাজ হয়। মাতালের কথা কি ধরা উচিত?

ভাবতে ভাবতে বেশ একটু জোর পেল মনে। সোজা হয়ে উঠে বসল। হাসি পেতে লাগল নিজের ছেলেমানুষিতে। মিছিমিছি এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে তিলকে তাল ক'রে তুলে নিজেই কষ্ট পেল সে। রতনদির এত স্নেহ—এমন একদিনে মুছে যেতে পারে না। এই তো ক'বছরই দেখছে তাঁকে, এক-আধদিন তো নয়, তা সত্ত্বেও এমন ভুল বুঝতে পারলে কী ক'রে আশ্চর্য!

আবার এক সময়ে মনে হ'ল—কিন্তু যদি সত্যিই বলে থাকেন। ওটা যদি তাঁর অন্তরের কথাই হয়? হয়ত কী শুনেছেন কার কাছে, হয়ত মোক্ষদাদিই মিছে করে কী লাগিয়েছে ওর নামে—সত্যিসত্যিই রেগে গেছেন। যদি তাই হয়, কাল সকালে ওকে দেখে যদি এমনি রেগে ওঠেন, সকলকার সামনে যাচ্ছেতাই করেন? সে যে আরও অপমান!......

অনেকক্ষণ বসে ভাবল কান্তি। অনেক ভেবেও কোন কূল-কিনারা পেল না। কী করবে, কি করা উচিত কিছুই বুঝতে পারল না। খাবার সময় হ'তে ঠাকুর যখন ডাকতে এল, একবার ভাবল সহজভাবেই গিয়ে খেয়ে আসবে—কেউ না কিছু সন্দেহ করে, লোক-জানাজানি না হয়! আবার ভাবল, খেতে গেলেই সে সম্ভাবনাটা বেশী থাকবে, কারণ এখন তার যা অবস্থা, একগালও বোধ হয় খেতে পারবে না। সমস্ত দেহটা ভেতরে ভেতরে থরথর ক'রে কাঁপছে—গা বমি-বমি করছে সর্বক্ষণ। সে আস্তে আস্তে বলল, 'আমার শরীরটা ভাল নেই ঠাকুরমাশাই, আজ আর কিছু খাব না। তখন ঐ সব খেয়ে বোধ হয় অম্বলমতো হয়েছে—গা গুলোচ্ছে বড্ড!'

ঠাকুর অবশ্য তাই বুঝেই নেমে চলে গেল। কিন্তু একটু পরেই দেখা দিল মোক্ষদা-ঝি।

'বলি ব্যাপারটা কি বল তো ঠাকুর—খোলসা ক'রে বল দিকি আমায়? আমার সেই দোপর বেলাকার কথাতেই মন ভারী হ'ল নাকি? নাকি দুজনে সোহাগের আগাআগি হয়েছে? আমার কথাগুলো নাগানো হয়েছে বুঝি?'

'না—মাইরি বলছি মোক্ষদাদি, এই বিদ্যে ছুঁয়ে বলছি, তোমার কথা কাউকে একটাও বলি নি! বিশ্বাস করো!'

'তা যদি বল নি বাপু তা হ'লে দুজনেরই মেজাজ গরম কেন? আগাআগিটা হ'ল কি নিয়ে? উনি তো মান ক'রে পড়ে ছিলেন এতক্ষণ—নিহাৎ নটা বাজে দেখে ত্যাখন উঠে যেমন তেমন ক'রে কাপড় বদলে চুল বেঁধে নিলেন, তুমি তো রাহার-নিদ্রাই ছেড়ে দিলে! আবার দিদিবাবুর হুকুম হয়েছে, দাদাবাবুর সরকারমশাইকে জোর তলব দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিয়েছেন, কালকের মধ্যেই কোথায় বোটিং-ওলা রিস্কুল আছে খোঁজ ক'রে দেখে তোমাকে ভত্তি ক'রে দিয়ে আসতে হবে। তোমাকে উনি এ বাড়িতে আর আখবেন না!...এসব তো অমনি অমনি হয় না বাপু—কারণ একটা আছে। এ সমিস্যেটা কি হ'ল আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও দিকি!

এ আবার এক নতুন খবর। মন্দের ভাল অবশ্য। তাড়িয়ে দেবেন না বাড়িতেও যেতে হবে না—বোর্ডিং ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবেন। একদিক দিয়ে হয়ত খুবই ভাল হ'ল। পড়াশুনোটা হবে। তবে বাড়িতে কী বলবে, সে কথাটা থেকেই যাচ্ছে যে!

আর, আর যেটা—সেটা হ'ল রতনদি আর তাকে এ বাড়িতে রাখতে চান না। তাকে দেখতে চান না তাঁর সামনে। সে কি তারই মঙ্গলের জন্যে—না সত্যিসত্যি তার ওপর রেগে গেছেন?

'কী গো, মুখে আ নি কেন? শরীর সত্যি খারাপ, না আগ হয়েছে?—বল তো খাবার রোপরে পেঁাছে দিয়ে যাই। খাও নি শুনলে কাল সকালে আমাদের কারুর ধড়ে মাথা থাকবে না!'

'না মোক্ষদাদি, রতনদি আমার ওপর বিরক্ত হয়েছেন, আমার আর মুখ দেখতে চান না। আমি খাই নি শুনলে কিছুই বলবেন না আর, খোঁজও করবেন না!'

'হুঃ!' অদ্ভুত একটা শব্দ ক'রে ওঠে মোক্ষদা, টক্ ক'রে জিভেরও একটা আওয়াজ করে, তারপর যেন একপাক নেচে নিয়ে বলে, 'ইল্‌লো! মরে যাই লো!......তা আর না। বেরক্ত হয়েছে! বেরক্ত হওয়া কাকে বলে তা আর কি আমি জানি না! ওসব সোয়াগের কোঁদল—আত পোয়াতে যা দেরি, আত পোয়ালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে ঐ বোটিং মোটিংএ যেতে দেবে ভাবছ? তবেই হয়েছে। তবেই চিনেছ মেয়ে-জাতকে। মিছিমিছি সরকারমশায়ের অদেষ্টে হয়রানি আছে, ঘুরে মরবে। ওগো ঠাকুর, এই মুকী ঝির রনেক বয়স হয়েছে—অনেক দেখেছে এ।......নাও, নাও, সোজা হয়ে ব'সো দিকি। চোখে জল দাও। কেঁদে কেঁদে তো চোখ ফুলিয়েছ দেখছি। একেই বলে ছেলে-মানুষ। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করা ঠিক নয়, কাঁচা বয়স এখন তোমাদের—বলে, আত-উপোসী হাতি পড়ে। খাবার আমি রোপরে দিয়ে যাচ্ছি, লক্ষ্মী ছেলের মতো খেয়ে শুয়ে পড়ো সকাল সকাল। ওসব আগাআগি নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না তোমাকে।'

তারপর যেতে গিয়েও ফিরে এসে—গলাটা আরও নামিয়ে ফিসফিস ক'রে বলে, 'বরং যদি সেয়ানা হও তো এই তালে কিছু রাদায় ক'রে নাও মোটামুটি। দু' দণ্ড মান ক'রে বসে থাকলেই যথাসব্বস্ব দিয়ে মেটাবে। নতুন নেশা তো—তার জন্যে সব

করতে পারে। হি-হি!'

চাপা হাসিতে যেন ফেটে পড়তে পড়তে চলে গেল মোক্ষদা।

॥ ৩ ॥

রাত্রে ঘরের দোর দিয়ে শোওয়ার অভ্যাস ছিল না কান্তির। কৌটোর মতো চারিদিক আঁটা বাড়ি, সদর দরজা বন্ধ হ'লে আর একটা মাছিরও ঢোকবার উপায় নেই কোন-দিক দিয়ে—এমন সব বন্দোবস্ত করা। তাছাড়া কীই বা আছে তার ঘরে যে চোর ঢুকবে? বইখাতা কতকগুলো—দু'-একটা জামা কাপড়, এই তো। বেশী জামাকাপড় নিচেই থাকে আজকাল রতনদির দেরাজে। যেদিন মনে পড়ত সেদিন দরজাটা ভেজিয়ে দিত শুধু, আর যেদিন পড়তে পড়তে খুব ঘুম পেয়ে যেত, সেদিন কোনমতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ত, দরজার কথা মনে থাকত না। রাত্রে মোক্ষদা বা ঠাকুর শুতে আসবার সময় কপাটটা হয়ত টেনে দিয়ে যেত।

সেদিনও খোলাই ছিল দরজা। ভেজানো কপাট প্রায় নিঃশব্দেই খুলেছে—তবু খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙ্গে গেছে কান্তির। কারণ বহু রাত অবধি ঘুমোতে পারে নি সে—এলোমেলো চিন্তায় আর পরস্পর-বিরোধী ভাব-সংঘাতে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল ঘুম আসে নি তাই। একেবারে শেষের দিকে, হয়ত এই ঘণ্টাখানেক আগে একটু তন্দ্রা এসেছে। তাও খুব পাতলা ঘুম—সামান্য শব্দে জেগে উঠেছে আবার।

কে একজন তার ঘরে ঢুকছে!

তখনও ঘুমের ঘোর রয়েছে চোখে—এবং মনেও। অনিদ্রার গ্লানি আর অতৃপ্ত নিদ্রার জড়তা তখনও জড়িয়ে আছে তাকে। 'কে' বলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে, কিন্তু আওয়াজটা ভাল ক'রে বেরোল না গলা দিয়ে। আরও যে চেঁচিয়ে উঠতে পারল না, তার কারণ উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই, 'কে' বলে প্রশ্ন করার সময়েই, তার মনে হ'ল রতনদি। রতনদি ছাড়া আর কেউ নয়।

কিন্তু এ সময় এমনভাবে রতনদির আসাটা এতই বিস্ময়কর, এতই অবিশ্বাস্য যে চোখে দেখেও বিশ্বাস হ'তে চাইল না।

'রতনদি?' বলে প্রশ্ন করতে গেল সে, কিন্তু ভয়ে আর বিস্ময়ে যেন কণ্ঠরোধ হয়ে এল তার—ভাল ক'রে স্পষ্ট উচ্চারণও করতে পারল না। অস্ফুট একটা স্বরই বেরোল শুধু কোন রকমে।

মূর্তিটা আরও কাছে এল। আর সন্দেহের অবকাশ নেই। কৃষ্ণা দ্বাদশীর চাঁদ সবে উঠেছে—পূর্বমুখী দরজা দিয়ে ভেতরে এসেও পড়েছে তার এক ফালি আলো। তাতেই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। মুখচোখ খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই—তার অত দরকারও নেই। এ সবই পরিচিত ওর। ঐ বেশভূষা, ঐ চলবার ভঙ্গি, দেহের গঠন! সেই চওড়া কালাপাড় দেশী শাড়িটা—হাতে সেই ফারফোরের বালা ঝিকঝিক করছে। কানে হীরের টব দুটো এই সামান্য আলোর আভাসেই ঝিলিক দিয়ে উঠল।

'রতনদি!' এবারে অস্ফুট কণ্ঠে হ'লেও স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারল। এতক্ষণে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে কান্তি। জামাইবাবুর কোন অসুখ-বিসুখ করল না তো—কিম্বা ও'রই?

রতন ঘরে ঢুকেছিল আস্তে আস্তে—বোধ হয় অন্ধকারে আগে কিছু ঠাওর

পাচ্ছিল না—তাই। এখন চোখটা সয়ে আসতে একরকম ছুটে এসেই বিছানায় বসে কান্তিকে জড়িয়ে ধরল একেবারে। যা কখনও করে নি আজ পর্যন্ত—পাগলের মতো একেবারে ওর গালে নিজের গালটা চেপে ধরে চুপিচুপি বলল, 'তুমি, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে কান্তি? চলে যেতে পারবে? একটু মায়া হবে না তোমার? মন কেমন করবে না? তবে যে তুমি বললে তোমাকে কখনও ছাড়ব না রতনদি! কেন বললে তাহ'লে?'

কান্তির প্রথমে মনে হ'ল মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে একেবারে রতনদির। কিম্বা মদের ঝোঁকেই উঠে এসেছেন।

কিন্তু কৈ না, তেমন উগ্র গন্ধ তো ছাড়ছে না রতনদির নিঃশ্বাসে। খুবই কম—একটু আভাস মাত্র পাওয়া যাচ্ছে! সম্ভবত সেই সন্ধ্যায় যেটুকু খেয়েছিল—তারপর রাত্রে আর খায় নি। কোনমতে এড়িয়ে গেছে ওর বরের জবরদস্তি। কিন্তু তবে? তবে এসব কী বলছে?

সেও তেমনি চুপিচুপিই উত্তর দিল—পাশেই মোক্ষদারা আছে হয়ত, ভয়ে ওর বুক কাঁপছে ঢিপঢিপ ক'রে, যা মুখ, কী সব যাচ্ছেতাই ঠাট্টা করবে হয়ত এই নিয়ে যদি টের পায়—'কিন্তু আমি তো—মানে তুমিই বললে আর মুখ দেখবে না। তুমিই তো শুনছি বোর্ডিং-এ পাঠাবার ব্যবস্থা করছ! আমার কী দোষ, বা রে! আমি তো কিছু বলি নি। আমি—আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে তো চাই নি।'

'ছাড়বে না? আমাকে ছাড়বে না তো? যাই কেন হোক না, কোন দিন কিছুতে ছেড়ে যাবে না? বলো বলো—উত্তর দাও। এই আমাকে ছুঁয়ে বলো।'

'না না—রতনদি, তুমি "যাও" না বললে যাব না।'

'না, সে আমি বলতে পারব না প্রাণে ধরে। বলাই উচিত, তবু পারব না। অনেক ভেবে দেখলুম। তোমাকে কোথাও পাঠাতে পারব না।...আমার কথা যখন কেউ ভাবে না—আমিই বা অপরের কথা ভাবব কেন? আমি বড় দুঃখী কান্তি, আমাকে তুমি দয়া করো। আমি বড় দুর্বল আর লোভী। যদি অন্যায় ক'রে ফেলি—তবু আমাকে তুমি ছেড়ে যেও না।'

'ছি ছি। ওসব কথা কেন বলছ রতনদি। তুমি আমার কাছে এমন কোন অন্যায় করতেই পারো না। তোমার কাছে যা পেয়েছি তা কি আমি জীবনে ভুলব? জীবন দিয়েও তোমার ঋণ দিয়েও শোধ হয় না?'

'ঠিক বলছ? অন্তরের কথা তোমার? জীবন দিতে পারবে আমার জন্যে? আমি যে তাই চাইতেই এসেছি। পালিয়ে চলে এসেছি তোমার কাছে। ওরা ঘুমোচ্ছে, সবাই ঘুমোচ্ছে, কিন্তু আমি ঘুমোতে পারি নি। সারারাত ভেবেছি। ভেবে দেখেছি ভাল ক'রে তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তাতে যা হয় হবে। জীবনে কিছুই পাই নি—এটুকু আমি আদায় করব। কিন্তু জীবন দেবে তো আমার জন্যে? দিতে পারবে? কথার কথা নয় তো—মন বুঝে বলছ তো?'

'ঠিকই বলেছি রতনদি। তুমি যা করতে বলবে আমি তাই করব।'

'আঃ, বাঁচলুম, বাঁচলুম। তুমি আমাকে বাঁচালে।'

এই বলে অকস্মাৎ আরও জোরে আরও নিবিড়ভাবে ওকে জড়িয়ে ধরল রতন—তারপর পাগলের মতো চুমো খেতে লাগল ওকে বার বার। এত জোরে জড়িয়ে চেপে ধরেছিল যে কান্তির মনে হ'ল পিষে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। চেখেও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। অনুভব করছে শুধু আগুনের মতো ঐ চুম্বন-গুলো।

কী যেন ভয়ঙ্কর মোহ গ্রাস করছে ওকে। যেন কোন্ মায়াবিনীর মায়া তার সব শক্তি হরণ ক'রেছে।

ভাববারও অবসর ছিল না কিছু। কারণ একটু একটু ক'রে ওর সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে এল সেই মায়ায়। তারপর আর কিছু মনে নেই ওর। আর কিছু মনে পড়ে না।

।

তারপর আর কিছু মনে পড়েও নি। সেই দিনগুলোয় আর কিছু মনে ছিল না। সব একাকার অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল মাথার মধ্যে। তার লেখাপড়া বর্তমান-ভবিষ্যৎ —তার মা দাদা বৌদি, যারা তার মুখ চেয়ে আছে অনেকখানি আশা নিয়ে—কিছু না। একটা সীমাহীন নির্লজ্জতায়, এক সর্বনাশা উন্মত্ততায় সব কিছু ঘুলিয়ে তলিয়ে গিয়েছিল। যেন একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিতে আত্মসমর্পণ করেছিল; সেটা যে ঘূর্ণি—ও যে শূন্যেই ঘুরছে ওর জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, চারিদিকে ধূলির আবরণ সৃষ্টি ক'রে, এ ঘূর্ণি যেমন অকস্মাৎই একদিন শূন্যে তুলেছে তেমনি অকস্মাৎই একদিন কোথাও আছাড় মেরে ফেলবে—তাও বুঝতে পারে নি। এক আধ দিন নয়, অনেক দিনই—কোথা দিয়ে কেটে গেল তাও টের পায় নি। দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না, কোন লজ্জার আবরণ ছিল না। সাংঘাতিক এক নেশায় লজ্জা ঘেন্না ইহকাল পরকাল সব কিছু উড়িয়ে দিয়ে বুঁদ হয়ে বসেছিল।

ইস্কুলে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিল বলতে গেলে—কারণ ইস্কুলে গেলে পড়তে হয়, পড়া দিতে হয়—টাস্ক ক'রে নিয়ে যেতে হয়। রতন শুধু মাসে মাসে মাইনে পাঠিয়ে দিত, আর খবর পাঠাত যে শরীর খারাপ, শরীর ভাল হ'লেই যাবে আবার। সে প্রতি-দিনই আশা করত যে এবার সে সংযত হবে, কান্তিকে এখান থেকে সরিয়ে দেবে—কোন বোর্ডিংএ কোথাও—যাতে নতুন ক'রে পড়াশুনো আরম্ভ করতে পারে। তার ভরসা ছিল কান্তি ভাল ছেলে—একটা বছর নষ্ট হ'লেও আবার ঠিক ধরে নেবে।

এরই মধ্যে টেস্ট পরীক্ষার দিন কবে পেরিয়ে গেল—কান্তির মনেও পড়ল না। কিছুই মনে ছিল না তার, হুঁশ ছিল না। সকাল থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত কাটত এক উন্মত্ত নেশার মধ্য দিয়ে—রাত নটা থেকে পরদিন প্রভাত পর্যন্ত কাটত সারা দিনের স্মৃতি-রোমন্থনে ও আসন্ন দিনের সুখ কল্পনায়। এর মধ্যে তুচ্ছ জীবন বা ভবিষ্যতের কথা ভাববার মতো ফাঁক কৈ?

অবশেষে আবারও একদিন এল বিপদের সঙ্কেত। নিয়ে এল সেই মোক্ষদাই।

নটার সময় বাবু এসে এসে গেলে একদিন ওপরে উঠে এল সে। কান্তি তখন বিছানায় চুপ ক'রে শুয়ে ভাবছে রতনের কথাই। রতন যেন চির-বিস্ময় তার কাছে, চির-বাঞ্ছিত। তার চিন্তায় ওর ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। কিন্তু মোক্ষদার রূঢ় পদক্ষেপে সেই চিন্তায় ছেদ পড়ল—স্বপ্ন ভঙ্গ হ'ল। 'কে' বলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে।

'ও' মোক্ষদাদি? তাই ভাল। আমি বলি কি—'

'কী বলো? ভাবছিলে তোমার অতনদি? হ্যাঁ—ঐটে এখনও বাকী আছে! পয়সা দেনেয়ালা বাবুকে ছেড়ে অসের নগরের কাছে অস করতে আসা! বলি ঠাকুর—অনেক অগ্রেই সাবধান ক'রে দিয়েছিলুম, তা আমার কথা শুনলে না। উলটে বেশী ক'রে মুখ জুবড়ে পড়লে দ'কের মধ্যে। তা আমার কি। আমিও চুপ ক'রই ছিলুম। নিহাৎ শেষ পর্যন্ত একটা খুনোখুনি বেহ্ম-অক্তপাত হবে বলেই আবার হুঁশ করাতে আসা। শোন না শোন—তোমার ইচ্ছে!'

'কী বলছ মোক্ষদাদি—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!' কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল কান্তি। লজ্জা, সামনাসামনি প্রকাশ্যভাবে এই সব কথা আলোচনার লজ্জা আর তার সঙ্গে সত্যিকারের একটা ভয় যেন তার কথা বলার শক্তি কেড়ে নিয়েছে। হঠাৎ ওর মনে হ'ল মোক্ষদার কথাগুলোর মধ্যে সত্যিই একটা আসন্ন বিপদের আভাস আছে।

'বেশ বুঝেছ।' চোখ-মুখ ঘুরিয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে বলে মোক্ষদা, 'বলি বুঝতে তো তোমার বাকী নি কিছু। বুঝবে না কেন? সেই য্যাখন কচি খোকাটি ছিলে—ত্যাখন বুঝতে পারনু নি বললে সাজত। র‍্যাখন আর সাজে না। র‍্যাখন আর বুঝতে জানতে কোন্ জিনিসটা বাকী আছে তোমার? বলে সপ্ত কাণ্ড আমায়ণ, সীতে কার পতি।...শোন ঠাকুর, বাজে বকবার সময় নি আমার, বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারব নি। এক আশ কাজ পড়ে আছে নিচোয়। ওসব ন্যাকাপানায় আর কাজও নি—যা বলছি ঠিকঠাক মন দিয়ে শোন। বাবু—মানে জামাইবাবু একটা কিছু সন্দ করেছে। ঠাকুরকে দারোয়ানকে ডেকে নানা অকম জেরা করেছে—আমাকে করে নি তার রুদ্দেশ্য এই যে, আমাকে জানে দিদিবাবুর হাতের নোক বলে! তাও করতে পারে। এমনি কেউ বলে দেবে না। দিদিবাবু মুঠো মুঠো টাকা দে মুখ বন্ধ করে এসেছে সব। কিন্তু জেরার মুখে কোন কথার ফাঁকে কী বেইরে যাবে তা কি কিছু ঠিক আছে? ত্যাখন কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে নি বাবু, তেমন বাবু নয় কো। আগলে, মদ পেটে পড়লে পিচেশ হয়ে ওঠে তা তো জানই। যদি সটে-পটে কোনদিন ধরে ফেলতে পারে তো তেক্ষুনি কেটে দু-টুকরো ক'রে ফেলবে।'

হয়ত ওর কথাগুলো বলবার এই উদ্ধত অপমান-কর ভঙ্গিতে, কিম্বা তাকে উপলক্ষ ক'রেই ওরা নিয়মিত অর্থ দোহন করছে রতনদির কাছ থেকে—এই কথাটা শুনে, হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল কান্তির। সে-ও বেশ চড়াসুরেই উত্তর দিল, 'তা আমাকে এসব কথা শোনাতে এসেছ কেন? নিজের মনিবকে গিয়ে বলো না। তিনি ছাড়লেই আমি যাব। বিপদ তো শুধু আমার একলার নয়, তাঁরও—আর তেমন কিছু হ'লে, তোমাদেরও। এত সুখের চাকরি কোথায় পাবে?'

মোক্ষদা কিন্তু রাগ করল না। কথাটা মেনে নিয়েই বলল, 'সে কথা একশো বার। হক কথা এটা। এমন পরিপুষ্টু গাই সহজে মেলে না। দুয়ে উঠতে পারলেই হ'ল। বলি সেই জন্যেই তো এত মাথাব্যথা গো। কিন্তু রোকে তো বলবার যো নি। ও তো পাগল এখন, কোন কি হস্যি-দীঘ্যি জ্ঞান আছে? তুমি একটু বুঝে করে দ্যাখো। মার খেয়ে সে-ই যেকালে বেরোতে হবে, সেকালে এই বেলা মানে মানে সরে পড়া ভাল নয় কি? আর বলি তোমারও রেহকাল পরকাল দু-কালই তো গেল ঝরঝরে হয়ে, এর পরে খাবে কি ক'রে তাও ভাব। রাজকাল নেকাপড়া না হ'লে সায়েবের চাকরি হয় না। তোমার তো অইল ধর গে হয় উনুনে ফুঁ নয়তো শাঁকে ফুঁ। তা যে লবাবী মেজাজ ক'রে দিয়েছে তোমার, তাতে কি আর ঐ ওজগারে মন উঠবে? তার চেয়ে সময় থাকতে এই বেলা দু-চার হাজার বাগিয়ে নে সরে পড়ো। তোমারও রাখেরের কাজ হোক—ও ছুঁড়িও বাঁচুক। নেশা কেটে গেলে এমন কত টাকা দুয়ে বার ক'রে নিতে পারবে বাবুর ঠেঙে। তুমিও চাই কি ঐ টাকায় একটা দোকান-দানী দিয়ে ক'রে খেতে পারবে। আর কেনই বা পড়ে আছ, তোমারও তো সাধ মিটে গেছে—এবার রব্যাহতি দাও না।'

আবারও সেই টাকার ইঙ্গিত।

এবার বেশ রুঢ়ভাবেই বলল, কান্তি, 'আমি তোমাদের মতো অত ইতর নই:

মোক্ষদাদি যে এতদিন এত খেয়ে এত হাত পেতে নিয়ে আবার টাকা বাগিয়ে সরে পড়ব। যেতে হয় তো এমনিই চলে যাব। পুরুষমানুষ—আর কিছু না হয় মোট বয়ে খাব। তাতে কি?'

মুচকি একটু হেসে আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা মেজাজেই জবাব দিল মোক্ষদা, 'তা বাপু মানছি আমরা রিতোর ছোটলোক। পয়সা খুব চিনি। পয়সার জন্যেই তো খানকি-বাড়ি গতর খাটাতে এসেছি। পয়সা চিনব না। তুমি চেনো না চেনো—নিজের ভাল বোঝ না বোঝ—সে তোমার রভিউচি। তবে তাও বলি, টাকা তোমার পাওনা—বেহক্কের কিছু নয়। নিলে এমন কিছু ছোটনোকপানা হ'ত না। তোমার কাঁচা মাথাটি চিবিয়ে খেয়ে বসে অইল—তার দাম দেওয়া তো রুচিতই।'

এই-বলে আর কোন প্রত্যুত্তরের অবকাশ মাত্র না দিয়ে মোক্ষদা চলে গেল।

কিছুই বলতে পারল না কান্তি। খুব দুকথা শুনিয়ে দিতে পারলে একটু শান্তি হ'ত ওর—কিন্তু বলা হ'ল না। অবসর মিলল না বলে নয়—ডেকে থামানো যেত, জোর ক'রে ধরে দু'কথা বলা যেত—কী বলবে তাই ভেবে পেল না যে। শুধু একটা দুঃসহ রাগে সমস্ত দেহটা চিনচিন করতে লাগল—অব্যক্ত কী রকম কষ্ট হ'তে লাগল। রাগ আর অপমানবোধ। ওদের দুজনকে জড়িয়ে বার বার যে ইঙ্গিত দিয়ে গেল মোক্ষদা সেইটেই যথেষ্ট অপমানকর। অথচ কী-ই বা বলবার আছে? কথাটা এত নির্ঘাৎ সত্য যে অস্বীকার করবার, কি মোক্ষদাকে ধমক দেবার কোনও উপায় নেই কোথাও। আজ তারা এমনভাবেই নিজেদের নামিয়ে এনেছে যে, এইসব সামান্য দাসী-চাকরের বিদ্রূপ-ইঙ্গিত-অপমান নীরবে সয়ে যেতে হচ্ছে। জবাব দেবার মতো কিছু নেই ওদের তরফ থেকে।

কিন্তু তবু বার বার মনে হ'তে লাগল—এত স্পর্ধা ওদের, এত দুঃসাহস! যে মুখ নেড়ে এই অপমান ক'রে গেল সেই মুখখানা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারলে ঠিক জবাব হ'ত এ আস্পর্ধার।

একবার মনে হ'ল, কালই রতনদিকে বলে ওকে জবাব দেওয়ায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রস্তাবের মূঢ়তা নিজের কাছেও ধরা পড়ল। কোন ফল হবে না। রতনদি সাহস করবেন না ওকে জবাব দিতে! এই জন্যেই করবেন না। বড় বেশী জানে ওরা। বিশেষত মোক্ষদা। যে মুহূর্তে জবাব দেওয়া হবে সেই মুহূর্তে মোক্ষদা গিয়ে জামাইবাবুকে খবর দেবে—জানিয়ে দেবে সম্পূর্ণ ইতিহাস! তারা এখন ওদের হাতের মুঠোয় চলে গেছে। একদিক দিয়ে অপমানিতও হ'তে হবে আর একদিক দিয়ে টাকাও গুণতে হবে। মাথায় পা দিয়ে চললেও কিছু বলবার যো থাকবে না।

মনে পড়ল একদিন ইংরিজী কি খবরের কাগজে 'ব্ল্যাকমেল' কথাটা পেয়েছিল। মানেটা ঠিক বুঝতে পারে নি। ইংরিজীর মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন, 'ওর মানে কোন গোপন কথা ফাঁস ক'রে দেবার ভয় দেখিয়ে টাকা বা সুবিধে আদায় করা। এই ধরনের ব্যাপার।' তারপরই বলেছিলেন, 'বড় খারাপ কাজ ওটা। বড় ঘৃণ্য। ওর মানে না বোঝাই ভাল। কোনদিন যেন বুঝতেও না হয়!' আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা। একেই বুঝি ব্ল্যাকমেল বলে। এরা ব্ল্যাকমেল ক'রে রতনদির কাছ থেকে টাকা আদায় করছে।...

কী করবে, এ অবস্থায় কি করা উচিত ভেবে পেল না কান্তি। যেন কী একটা দৈহিক অস্বস্তিতে ছট্‌ফট ক'রে বেড়াল খানিকটা।

বলবে রতনদিকে মোক্ষদার কথাটা?

লাভ কি?

বড় ম্লান হয়ে যাবেন। কষ্ট পাবেন খুব। সেই মলিন মুখ এবং নত দৃষ্টি কল্পনা করেই মায়া হ'তে লাগল কান্তির। অথচ শুনবেনও না কথাটা—তাও সে ভাল ক'রেই জানে। প্রাণ ধরে বিদায় দিতে পারবেন না।

কান্তিই কি পারবে এই নিরানন্দ পুরীতে ও'কে ছেড়ে যেতে?

তার চেয়ে ওদের ঘনিষ্ঠতাটাই কমিয়ে দেওয়া ভাল। তাছাড়া এইবার চেপে পড়তে বসতেও হবে। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। সামনের বার পরীক্ষা না দিলেই নয়। ভাগ্যিস দাদারা অত হিসেব রাখেন না—নইলে কী কৈফিয়ৎ দিত তার ঠিক নেই। মুখ দেখাতে পারত না তাঁদের কাছে।

সাত-পাঁচ ভেবে কিছুই বলা হ'ল না রতনদিকে। মোক্ষদারা এই ব্যাপার নিয়ে টাকা আদায় করছে তাঁর কাছে, এটা কান্তি টের পেয়েছে জানলে লজ্জায় মরে যাবেন রতনদি। এতটুকু হয়ে যাবেন অপমানে। না না—ছিঃ, সে মুখ ফুটে বলতে পারবে না এ কথাটা।

যেটা বলতে পারে সেটাই বলল একদিন—ঐ ঘটনার দিন চার-পাঁচ পরে। বলল, 'এবার একটু চেপে পড়তে হয় রতনদি। একটা বছর গেল, আর গেলে চলবে না।'

'একটা বছর গেল মানে? নষ্ট হয়ে গেল?'

'গেল বৈকি। টেস্ট দেবার কথা ছিল, দিলুম না। এই তো সামনেই এগ্‌জামিন; টেস্টে পাস না করলে তো তাতে বসতে দেবে না!'

'তা কৈ—।' কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যায় রতন। 'তা কৈ বল নি তো'—এই কথাই বলতে যাচ্ছিল। দোষটা যে তার ঘাড়েই এসে পড়বে, সেইটে মনে পড়ে যাওয়ায় আর বলল না। আস্তে আস্তে মাথা নামাল। মুখটা লাল হয়ে উঠল—কানের ডগা পর্যন্ত।

তেমনি মাথা নামিয়েই একটু পরে বলল, 'তাহ'লে তুমি কাল থেকেই আবার ইস্কুলে যেতে শুরু করো। আর কামাই ক'রে কাজ নেই।'

এবার মাথা নামাবার পালা কান্তির। সে নত-মুখে রতনের ব্রেসলেটটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'ইস্কুলে আর আমার যেতে ইচ্ছা করে না। সকলে ঠাট্টা করবে, যা-তা বলবে। মাস্টারমশাইরা বকবেন, নতুন সব ছেলেদের সামনে। এখন যারা ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছে তারা আমার নিচে পড়ত, কত খাতির করত। তাদের সামনে অপমান হওয়া--'

'তবে কি করবে? নতুন কোন ইস্কুলে ভর্তি হবে? কিন্তু আমি তো সে সব সন্ধান জানি না। সরকারমশাইকে বললে নানান্ কৈফিয়ৎ—জানাজানি।'

আবার মাথা নামায় রতন।

কান্তির মাস্টারমশাইও, রোজ এসে ফিরে যেতে হয় বলে, গত মাসখানেক আসছেন না সেটাও মনে প'ড়ে গেল দু'জনকারই।

'মাস্টারমশাইকে বরং খবরটা দিই। এবার থেকে নিয়মিত আসুন।'

'না-না। ও'কে না। তুমি বরং সরকারমশাইকে বলো অন্য একজন মাস্টারমশাই ঠিক করতে। এ'কে দিয়ে চলছে না, ভাল একজন মাস্টারমশাই চাই—এ বলতে তো কোন দোষ নেই। তাতে কি কিছু—মানে—মনে করবেন ও'রা?'

'না, না। তা মনে করবেন কেন? তাই বলি বরং সরকারমশাইকে। একটু যদি চেপে পড়ান বেশী ক'রে সময় দিয়ে। মানে ঘন্টা দুই-আড়াই—না হয় বেশী মাইনেও নেবেন কিছু।'

'সে রকম হ'লে বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশ টাকা হে'কে বসবেন।' ভয়ে ভয়ে বলে

কান্তি।

'তা হোক। টাকার জন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

কান্তি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। এবার আস্তে আস্তে সে দূরে চলে যেতে পারবে।...

কিন্তু সে অবসর আর মিলল না। ঠিক পরের দিনই—সরকারমশাইকে ডেকে নতুন মাস্টার খোঁজার কথা বলবার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। তখন তিনটে-চারটে হবে, রতনদির খাটে পাত্‌লা বাঘের ছবি আঁকা বিলিতে কম্বলটার মধ্যে ওরা দুজনে ঘুমোচ্ছিলো। দরজা ছিল ভেজানো। হঠাৎ সজোরে দোরটা খুলে ভেতরে ঢুকলেন রতনদির বর—বা বাবু—দত্তসাহেব। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলেন একেবারে!

ঘটনাটা এতই আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিত যে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও ব্যাপারটা বুঝতে খানিক সময় লাগল ওদের। তারপরই ধড়মড় ক'রে দুজনে দুদিক দিয়ে নেমে এল খাট থেকে। কিন্তু দত্তসাহেবের মুখ দেখেই বুঝল ওরা যে আর রক্ষা নেই কারুর। ও'র দুদিকের রগের শিরাগুলো ফুলে উঠে দব্‌দব্‌ করছে তা এখান থেকেই দেখা যায়। দুই চোখ টক্‌টকে লাল—হয়ত মদও খেয়েছেন একটু—কিন্তু এ লাল অন্যরকম—মাথায় রক্ত ওঠার দরুন এত লাল হয়েছে নিশ্চয়।

ওদের তরফ থেকে কিছু বলবার—কৈফিয়ৎ দেবার কি ক্ষমা চাইবার—কোন অবসর মিলল না। জিজ্ঞাসাও করলেন না দত্তসাহেব। কেউ কোথাও চুকলি খেয়েছে নিশ্চয়। পাকা খবর পেয়েই এসেছেন। কৈফিয়ৎ অনেক দেওয়া চলতে পারত অবশ্য—ভাইবোন, বিশেষ ছোট ভায়ের সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়া কিছু অন্যায় নয়, অশোভনও নয়। কিন্তু সে কৈফিয়ৎ শুনবে কে? ওদেরও দেবার মতো অবস্থা নয়। দাঁড়িয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলে না ওরা। মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোল না। আর সেইটেই তো ওদের তরফ থেকে অপরাধের স্পষ্ট স্বীকৃতি।

প্রস্তুত হয়েই এসেছেন দত্তসাহেব।

যে হাতখানা এতক্ষণ পিছনে ছিল সেইটে এবার সামনে এল।

শঙ্কর মাছের চাবুক একটা। এ বস্তুটা চেনে কান্তি। এ ঘরেও একটা টাঙ্গানো আছে।

হিস হিস ক'রে উঠলেন দত্তসাহেব, 'রাস্তার কুকুর,—তুমি মুখ দিতে এসেছ ঠাকুরের নৈবিদ্যিতে। এত আস্পদ্দা তোমার! এত সাহস! এত সাহস কোথা থেকে এল তাই ভাবছি। ভিখিরী বামুনের ছেলে—পেট পুরে ভাত জুটছিল না—আশ্রয় দিয়ে খাইয়ে-পরিয়ে রেখেছিলুম—তার এই শোধ! চমৎকার! এই তো নিয়ম, আমারই খেয়ে আমারই পয়সায় বিষ সঞ্চয় ক'রে আমাকে ছাড়া আর কাকে কামড়াবে? সাপের দস্তুরই যে এই! তবে সাপের ওষুধও আমার জানা আছে। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। হারামজাদা, কুত্তাকি বাচ্ছা কাঁহাকা!'

সব কথা শুনতেও পেল না কান্তি। কারণ তার আগে সপাসপ চাবুক পড়তে লাগল—পিঠে হাতে বুকে মুখে—সর্বত্র। কেটে কেটে বসতে লাগল শঙ্কর মাছের চাবুক। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল ওর সর্বাঙ্গে। রতন ব্যাকুলভাবে কি বলতে যাচ্ছিল, চাপা রোষে ধমক দিয়ে উঠলেন দত্তসাহেব—'চুপ! তুমি কি ভাবছ তুমি বাদ যাবে? ও কসবীর জাতকে শাসন করতে হয় কী ক'রে তা আমি জানি। ওর হয়ে সুপারিশ করতে আসছ!...নিজের ভাবনা ভাব গে। তবে এ আগে। কসবী কসবীর

ধর্ম পালন করবে সেইটেই স্বাভাবিক। কিন্তু এর অন্যায়ের কোন মাপ নেই। বেই-মানী হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপ—'

চাবুক কিন্তু বন্ধ নেই এক মিনিটের জন্যও। কান্তি এতক্ষণ ছট্‌ফট করছিল, এই বৃষ্টির মতো আঘাতের মধ্যে থেকে আত্মরক্ষার এতটুকু ফাঁক খুঁজছিল আকুল হয়ে—দুই হাত বাড়িয়ে অন্ধের মতো। এবার অবসন্ন হয়ে পড়ে গেল সে।

এক মুহূর্তও থামলেন না দত্তসাহেব, একবার ফিরে তাকালেন না তার দিকে, একবার হাতটা পর্যন্ত বদল করলেন না। বাঘের মতো ফিরে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন রতনের ওপর। এবারের আঘাতটা যেন আরও নিষ্ঠুর, আরও সাংঘাতিক, আরও অব্যর্থ। কাপড়জামা ভেদ করে সে চাবুক মাংসতে চেপে বসে সেগুলোকে রক্তে ভিজিয়ে তুলল।

এরা কেউই কাঁদে নি, চেঁচামেচি করে নি। কিন্তু নিচে থেকে সবাই ছুটে এসে জড়ো হয়েছে বাইরে। অমন ভাবে অসময়ে অগ্নিশর্মা হয়ে বাবুকে ছুটে ওপরে আসতে দেখেই ব্যাপারটা বুঝেছে তারা। তাছাড়া চাবুকের শব্দ বন্ধ দোরের মধ্যে দিয়েও বাইরে আসছিল।

মোক্ষদা হাউ-মাউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওমা, কী হবে গো। একটা খুনোখুনি করবে নাকি শেষমেষ। ওমা—কোথায় যাব গো। থানা-পুলিশ করতে হবে নাকি শেষ পর্যন্ত। ওগো ও জামাইবাবু, খোল খোল দরজা খোল। দরজা বন্ধ ক'রে আবার কী শাসন। শেষে কি সবাইকার হাতে দড়ি দেওয়াবে নাকি! অ ঠাকুর, যাও যাও কত্তা-বাবুকে ডেকে নে এসো। আর, দারোয়ান তুমিই বা কী রকম নোক গা। এত ডালরুটি খাও বস্তা বস্তা...একটু গায়ে জোর নি, দরজা ভাঙতে পার না? মনিব খুন হচ্ছে ওধারে, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেছ সঙের মতো। ভাঙ্গ ভাঙ্গ কপাট, ভেঙে ভেতরে সেঁধোও--'

দারোয়ান সাহস পেয়ে দুম-দুম লাথি মারতে লাগল দরজায়। একটু পরে কর্তা-বাবু অর্থাৎ রতনের বাবাও ছুটে এলেন। ভারী গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, 'এ সব কী হচ্ছে কী? দত্ত, এই দত্ত—দরজা খোল শিগ্‌গির।'

ততক্ষণে রতনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। রক্তাক্ত চাবুক শেষবার ওর অনড় দেহটাতেই আছড়ে ফেলে দোর খুলে বেরিয়ে এলেন দত্তসাহেব। ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে একটু চড়া গলাতেই কি বলতে যাচ্ছিলেন কর্তাবাবু, এক ধমকে তাঁকে চুপ করিয়ে দিলেন, 'তুমি চুপ ক'রে থাকো! বুড়ো শুয়োর কোথাকার, মেয়ে বেচে খাচ্ছ বসে বসে—মেয়েকে পাহারা দিতে পারো না? পথের কুকুর এসে ঘরে ঢুকছে দেখতে পাও না? ছোটোলোকের জাত!'

তারপর সকলকার সামনে দিয়েই গট গট ক'রে বেরিয়ে চলে গেলেন তিনি। কর্তাবাবু পর্যন্ত একটি কথাও বলতে পারলেন না!

এরপর কদিন আর কান্তির কোন জ্ঞান ছিল না। কদিন তাও জানে না সে। গায়ের ব্যথায় আর প্রবল জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। গায়ে নাকি ঘাও হয়ে গিয়ে-ছিল চার-পাঁচ জায়গায়।

যেদিন জ্ঞান হ'ল সেদিন দেখল পাশে একটা টুলে ডাক্তারী ওষুধ সব রয়েছে। কাটা ঘাগুলোতেও মলম লাগানো। অর্থাৎ ডাক্তার ডাকা হয়েছে, শুশ্রূষাও হয়েছে কিছু কিছু। আরও ভাল ক'রে চেয়ে দেখল যে, সে তার ওপরের ঘরে নিজের বিছানা-তেই শুয়ে আছে।

জ্ঞান হবার পর প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হ'ল ওর—তা হচ্ছে অপরিসীম লজ্জার। ছি ছি, এ বাড়িতে আর মুখ দেখাবে কি ক'রে—এই সব ঝি-চাকরদের সামনে। এখনই পালিয়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু কোথায়ই বা পালাবে! বাড়িতে গিয়েই বা কি বলবে! সেখানে গিয়েই বা কোন্ মুখে দাঁড়াবে।

একটু পরে হাসিমুখে মোক্ষদা এসে দাঁড়াল।

'এই যে, হুঁশ ফিরে এসেছে? যাক বাবা, বাঁচা গেল। যা ভাবনা হয়েছিল! এধারে ইনি পড়ে রজ্ঞান রচৈতন্যি—ওধারে উনি পড়ে। আমরা যাই কোথায় বল দিকি! তবু ভাগ্যে জামাইবাবুই ডাক্তার পাঠিয়ে দেছল তাই অক্ষে।'

তারপর একটু থেমে আঁচলের নাড়া দিয়ে কান্তির মুখের ওপর থেকে মাছি সরিয়ে দিয়ে বলল, 'যাও, এবার চটপট সেরে উঠে সময় থাকতে থাকতে সরে পড় দিকি। ব্যবস্থা একটা হয়েছে যেকালে—সেকালে আর দেরি ক'রে নাভ নি। মানুষের মন না মতি। এখন মত হয়েছে আবার সে মত ঘুরে যেতে ক্যাতক্ষণ? এই বেলা কাজ গুছিয়ে নাও!'

কান্তির এ সব বোঝার কথা নয়। তার তখনও একটু জ্বর রয়েছে, দুর্বল মাথায় এ সব কথা ঢুকলও না। সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়েই রইল মোক্ষদার মুখের দিকে।

মোক্ষদাই বুঝিয়ে দিলে এবার, 'তা বাপু মারুক ধরুক যা-ই করুক—এধারে মানুষ-টার বেবেচনা আছে, তা কিন্তুক মানতেই হবে। আমরা তো ভাবনু তাড়িয়েই দেবে সোজাসুজি, দেশে গিয়ে যেখানকার ছেলে সেখানে উঠতে হবে। মুখ দেখাবে কী ক'রে সেই ভাবছিলুম। তা সেদিক দিয়ে বাবু যায় নি, হুকুম দিয়েছে কোথায় কোন্ ওর জমিদারীতে কি রিস্কুল আছে সেখানে যদি গিয়ে থাকতে চাও তো রিস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবে—কাছারীবাড়ীতে থাকবে, রামলাদের সঙ্গে খাবে—রিস্কুলে পড়বে। খরচা সব তেনার। তবে লবাবি চলবে নি। গরীব গেরস্তর চালে থাকতে হবে। পোষায় ভাল, তিনি নোক দেবে, সঙ্গে গিয়ে ভর্তি ক'রে দে আসবে, আর না পোষায় তো পত্তরপাঠ তোমাকে পথ দেখতে হবে।...তা আমি বাপু তোমার হয়ে বলেই দিয়েছি ও সেখানে যেতেই আজী।...জানি তো দেশে-ঘাটে যাবার মুখ নি তোমার—কোথায় যাবেই বা।'

এই প্রথম মোক্ষদা সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা বোধ করল কান্তি। আঃ বাঁচা গেল! বাঁচা গেল! বেঁচে গেল সে। বাঁচল এই লজ্জা থেকে শুধু নয়—সর্বনাশ থেকেও। আর কোন পথ কোথাও ছিল না। বাড়ি গেলে পড়াশুনো আর হ'ত না এটা নিশ্চিত। এ তবু নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করার একটা সুযোগ মিলল। এখন যদি চেপে খাটে তাহ'লে আবারও হয়ত ভাল রেজাল্ট করতে পারবে।

হায় রে! তখন যদি জানত দত্ত-সাহেবের এই আপাত-দয়ার পিছনে কি সুপরি-কল্পিত নিষ্ঠুরতা আছে! সামান্য দৈহিক শাস্তিতে কিছুই মন ওঠে নি তাঁর, দুঃসহ ক্রোধের কিছুমাত্র শান্তি হয় নি। বড় রকমের শাস্তির জন্যেই তাঁর এই সদয় প্রস্তাব। পৈশাচিক শাস্তি—যা দীর্ঘকাল মনে থাকে, সারা জীবনে যা বাঘের দাঁতের মতো স্থায়ী দাগ রেখে যায়—তারই জন্যে এই বদান্যতার ব্যবস্থা, এই আয়োজন।

মোক্ষদা বলল, 'তাই বলছিনু তোমায়—মেজাজ ভাল থাকতে থাকতে সেখানে গে চেপে ব'সো গে যাও। তারপর আর কী মনে থাকবে ওর! বলে হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। একবার হুকুম হয়ে গেলে রামলা-গোমস্তারা ঠিক খরচা যুগিয়ে যাবে পরের পর। মোদ্দা আর দেরি ক'রো নি। কখন আবার মেজাজ পালটে যাবে,

অক্ত চড়ে যাবে মাথায় আবার দুম ক'রে কী বলে বসবে।...দেখলে তো—যা বলেছিনু সেদিন, তাই ফলে গেল রক্ষরে রক্ষরে। খুন হও নি সে তোমার গুরুর ভাগ্যি, আর আমাদের বাপ-মা'র পুণ্যি—বামুনের অক্ত দেখতে হ'ল নি। গরীবের কথা বাসি হ'লেই খাটে। এবার আর দেরি করো নি। আমি যে মানুষ চিনি—এই সব বাবু ভাইদের চিনতে কি আর বাকী আছে। ঘরের মাগকে পাহারা দেয় কে তার ঠিক নি—বাইরের আঁড়কে পাহারা দেবার জন্যে চোখে ঘুম নি! হাত্তোর বড়মানুষ রে!'

বোধ করি একটু দম নেবার জন্যই থামল একবার মোক্ষদা। সেই ফাঁকে কান্তি আস্তে আস্তে বলল, 'আমি আজই যেতে চাই মোক্ষদাদি, যত শিগ্গির পারো একটু ব্যবস্থা ক'রে দাও—সরকারমশাইকে বলে। আমি আর একদিনও থাকতে চাই না।'

'ওমা তাই বলে কি আজই এক্ষুনি যাওয়া হয়। এখনও গায়ে তাত অয়েছে বেস্তর'—হাতের উলটো পিঠ দিয়ে কপালটা দেখে নিল মোক্ষদা, 'ওঠো, একটু ভাল হও, পথ্যি কর দুটো, তারপর তো যাওয়ার বন্দোবস্ত। ভয় নি—একদিনে কিছু মহাভারত রশুদ্ধু হয়ে যাবে না। সরকারমশাইকে তো আমি তোমার জবানীতে বলেই দিয়েছি, তিনিও নাকি চিঠিপত্তর নিকে দিয়েছে!'

এর তিন-চার দিন পরেই, প্রথম যেদিন ভাত পেয়েছে সে—সেই দিনই রওনা হয়ে গিয়েছিল কান্তি, কিছুতেই আর থাকতে রাজী হয় নি।

যাবার আগে রতনের সঙ্গে দেখাও হয় নি আর। সে কথা কেউ বলেও নি। রতনও চেষ্টা করে নি দেখা করার। কান্তিও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি। হয়ত দত্তসাহেব শুনতে পেলে আবার রাগ করবেন, হয়ত রতনদিকেই তার জন্যে কথা শুনতে হবে। কিম্বা আবার মার খেতে হবে—। নিজের আঘাত দিয়েই রতনদির কী পরিমাণ লেগেছিল তা বুঝতে পারে কান্তি। অমন ননীর মতো নরম দেহে ঐ চাবুক যখন কেটে কেটে বসেছে তখন না জানি কী যন্ত্রণাই পেয়েছে রতনদি। আজও সে কথা মনে হ'লে দু'চোখে জল ভরে আসে তার। সত্যিই বড় দুঃখী রতনদি, বড় অসহায়। সে তো তবু পালিয়ে যেতে পারছে, ওকে পড়ে মার খেতে হবে। থাক, আর দেখা করার চেষ্টা করবে না সে। তাছাড়া, রতনদিও লজ্জা পাবে মিছিমিছি। এমনই বোধ হয় লজ্জাতে মরে যাচ্ছে সে। আর লজ্জা বাড়িয়ে দরকার নেই।

সেও ভাল হয়ে উঠেছে, ভাত খেয়েছে—এটুকু মোক্ষদাই একদিন উপযাচক হয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল তাকে। সেই জেনেই নিশ্চিত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল কান্তি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

এসব কথা বলার নয় কাউকে। মা-দাদা-বৌদির কাছে তো নয়ই—এতখানি অপরাধের কথা, লজ্জা ও কলঙ্কের কথা, অস্বাভাবিক অমানুষতার কথা কারও কাছেই বুঝি বলা যায় না। সুতরাং চুপ ক'রেই থাকে সে। চোখ দিয়ে শুধু জল পড়ে যায় উত্তরের বদলে। এক এক সময় মা ক্ষেপে যান—সব কথা সে শুনতে পায় না বটে, কানের মধ্যে সর্বদা যেন একটা ঝম ঝম ক'রে আওয়াজ হচ্ছে, দিনরাতই—আভাসে আন্দাজে তাঁর তিরস্কারের কঠিন ভাষা সে কিছু কিছু বুঝতে পারে—কিন্তু জবাব দিতে পারে কৈ? মা এক-এক দিন তেড়ে মারতেও আসেন, অথচ, কী ক'রে বোঝাবে

সে তাঁকে যে বলার মতো তার কিছুই নেই। বলবার কোন উপায় নেই। সে তিরস্কারে মাথাটাই শুধু আরও খানিকটা হেঁট হয়, চোখের ধারাটাই শুধু আরও প্রবল হয়।

বৌদি আড়ালে আবডালে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে। হেঁকে বললে মা শুনতে পাবেন বলে সীতার ফেলে যাওয়া স্লেটটা খুঁজে বার ক'রে লিখে জানায় যে, 'তুমি আমার কাছে বলো, কেউ টের পাবে না। তেমন যদি কিছু কথা হয় তো আমি বলবও না কাউকে। আর যদি এমন হয় যে মা'র কাছে বলতে লজ্জা করছে তোমার তো তাও আমাকে বলা সুবিধে, আমি ও'দের বলতে পারব। চক্ষুলজ্জা হয় তো আমি চলে যাচ্ছি সেলেটে লিখে রাখো। দূরে নিয়ে গিয়ে পড়ব।'

কিন্তু তাও পারে না কান্তি। হাত জোড় করে শুধু।

এদিকে কানের রোগটা ওর বেড়েই যায় দিন দিন। আগে একটু চেঁচিয়ে বললেই শুনতে পেত—এখন কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করলে তবে কিছুটা শুনতে পায়! তাও অর্ধেক কথা বুঝতে পারে না। কেমন একরকম করুণ অসহায় ভাবে চেয়ে ঘাড় নাড়ে, কানটা এক হাত দিয়ে খানিকটা চোঙের মতো ক'রে বক্তার মুখের আরও কাছে নিয়ে আসে।

এবার হেমও চিন্তিত হয়ে পড়ে। এখানের হাসপাতাল থেকে সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে। তারা আর পারবে না কিছু করতে।

কনক ক্রমাগত খোঁচায়, 'ওগো কি করছ? এর পর যে চিকিচ্ছের বাইরে চলে যাবে। দুটো একটা দিন আপিস কামাই করো। কলকাতার কলেজে নিয়ে যাও।'

অগত্যা তাই করতে হয়। অফিস কামাই ক'রে মেডিকেল কলেজের আউটডোরে নিয়ে যায়। 'ই-এন-টি'তে ধর্না দিয়ে যখন ডাক আসে তখন কিন্তু আশার সঞ্চার হয় একটু হেমের মনে। কারণ ডাক্তার যিনি দেখছিলেন তিনি ওর কেস দেখে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। ছাত্রদের ডেকে দেখালেন, 'স্ট্রেঞ্জ! ড্রামে কিছুই হয় নি, কালা হওয়ার অন্য কোনও কারণ নেই—অথচ শুনতে পাচ্ছে না। এ একটা ইণ্টারেস্টিং কেস কিন্তু।'

দু-দিন বড়মাসীর কাছেই রইল ওরা দু-জনে। ছোটমাসীর একখানা ঘর, তাতে ওদের ছোট ভাই খোকাকে নিয়ে তিনটি প্রাণী। সেখানে থাকা সম্ভব নয়। বাড়ি থেকে রোজ রোজ আসার খরচাও আছে, ঝঞ্ঝাটও আছে।

তিন দিন পর পর গেল কান্তি। শেষের দিনে বলে-কয়ে শরৎ মেসোমশাইকে সঙ্গে দিয়ে হেম অফিস গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হ'ল না। এঁরাও বললেন, 'দুর্বলতার জন্যেই এ রকম হয়েছে। ভাল পুষ্টিকর কিছু খেতে দিন। টনিক খাওয়ান একটা।' টনিক লিখেও দিলেন। বিলিতি নার্ভ-টনিক। সাত-আট টাকা দাম।

হেমের মুখ শুকিয়ে উঠতে দেখে শরৎ মেসোমশাই আটটা টাকা বার ক'রে দিলেন। বললেন, 'তুমি লজ্জা ক'রো না বাবা, এ লৌকিকতা-লজ্জার সময় নয়। আছে বলেই দিচ্ছি, নইলে কি আর দিতে পারতুম। তুমি ওষুধটা কিনে নিয়েই যাও। আর ওখানে গিয়ে একটা দুধের যোগানি ব্যবস্থা করো, অন্তত এক পো ক'রে। সেটাও আমি দেব। শুধু টনিকে কিছু হবে না, তার সঙ্গে ভাল খাওয়াও চাই। মাছ মাংস খাওয়াতে তো পারবে না তেমন, তবু এক পো ক'রে দুধ খেলেও কিছুটা হবে।'

নেবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিতে হ'ল। কারণ সত্যিই তারও এমন সঙ্গতি নেই যে দুম ক'রে আট টাকার ওষুধ কিনে খাওয়ায় এখুনি। কিছু সে হাতে রাখে ঠিকই মাইনের টাকা থেকে—কিন্তু সেও হাতি-ঘোড়া কিছু নয়। তা থেকেও তো

ডাক্তারের ওষুধে কত টাকা বেরিয়ে গেল গত দু মাসে। আরও কি আপদ বিপদ হয় ঠিক আছে!

শরৎ মেসোমশাইয়ের দিল আছে কিন্তু, নইলে ও'রও কীই বা আয়। একটা ছোট ছাপাখানা ছিল—নিজে দেখতে পারেন না, লীজ দিয়েছেন, তারই কটা টাকা ভরসা। তারও অর্ধেক নাকি আদায় হয় না! গিয়ে তাগাদা দিয়ে দু টাকা এক টাকা ক'রে আদায় করতে হয়। দুর্দান্ত হাঁপানি মেসোমশাইয়ের, রোজ যাওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু মাসীমা এখনও টিউশ্যানি ক'রে সংসার চালাচ্ছেন তাই রক্ষে, নইলে খেতেই পেতেন না।

বিচিত্র ভাগ্য ছোটমাসীর। ওষুধটা কিনতে কিনতে কথাটা মনে হ'ল হেমের। জীবনে একদিনও স্বামীর সাহচর্য পেলেন না—ফুলশয্যার রাত্রেও না। স্বামী তাঁর কোন্ ডোমের-মেয়ে-রক্ষিতা নিয়েই রইলেন সারাজীবন, অসচ্চরিত্র স্বামী স্পর্শ করলে স্ত্রীর অপমান হবে এই ভয়ে স্পর্শ পর্যন্ত করলেন না কোনদিন। মা'র কাজের সুসার হবে বলে শুধু নাকি বিয়ে করেছিলেন। তারপর শাশুড়ীর জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে এলেন মাসিমা! দিদিমা একা, সহায়সম্বলহীন। কোথাও দাঁড়াবার কোন আশ্রয় না পেয়ে সেদিন ছোটমাসী উপার্জনের এক অভিনব পন্থা বেছে নিয়েছিলেন, সামান্য লেখাপড়া সম্বল ক'রে এক টাকা দু টাকার টিউশ্যানি ধরে ছিলেন গোটাকতক। তার পর থেকে সে-ই চলেছে আজও। একেবারে বুড়ো বয়সে বলতে গেলে, শরতের সেই রক্ষিতাটি গত হ'লে, শরৎ যখন অসহায় হয়ে পড়লেন—অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে মেসবাড়ির নিচের তলার ঘরে পড়ে পড়ে কাশছেন আর হাঁপাচ্ছেন দেখে হেমই এসে খবর দিয়েছিল ছোটমাসীকে। ছোটমাসী গিয়ে মেস থেকে উদ্ধার ক'রে এনে কাছে রেখে সেবা করছেন এখন। কিন্তু নিজের কোট ছাড়েন নি তাই ব'লে, মেসোমশাইয়ের শত অনুরোধেও টিউশ্যানি ছাড়তে রাজী হন নি। বলেছেন, 'জীবনের এতগুলো বছর যদি স্বামীর ভাত না খেয়ে চলে যেতে পেরে থাকে তো এখনও পারবে। মানুষের জীবন, বলা যায় না কিছু—তবে পারি তো শেষ দিন পর্যন্ত নিজের ভাতই খেয়ে যাব। দুদিন ভাত দিয়ে যে তুমি বিয়ের সময়কার করা প্রতিজ্ঞা সেরে নেবে—তা হবে না!'...

শরতের দেওয়া সে টনিক ফুরোবার আগেই খবর পেয়ে অভয়পদ আর এক শিশি কিনে পাঠিয়ে দিলে। একদিন একরাশ ফলও পাঠিয়ে দিয়েছিল। দুধের যোগানি টাকা হেম অবশ্য কারুর কাছ থেকে নেয় নি—নিজেই দিয়ে যাচ্ছে যেমন ক'রে হোক। তবে মাছ মাংস খাওয়াবার কোন সুবিধে হয় নি। শনি-রবিবার হাত-ছিপে যা দু-একটা ধরা পড়ত, তারই বেশির ভাগটা কান্তিকে দিত কনক, এই পর্যন্ত।

এর জন্য কান্তির লজ্জার অবধি ছিল না। আরও মাথা নুয়ে পড়ত তার। অত দামী ওষুধ খাবার সময় প্রত্যেকবারই লজ্জায় তার কান-মুখ রাঙা হয়ে উঠত। উপায় নেই বলেই খেতে হ'ত তবু। এতগুলো লোককে ব্যস্ত করছে, এত টাকা খরচ করাচ্ছে—এখন তাড়াতাড়ি সেরে উঠে এদের অব্যাহতি দিতে পারলেই ভাল। বৃথা চক্ষু-লজ্জা ক'রে রোগ বাড়িয়ে আরও বিব্রত করা উচিত নয়।

কিন্তু দু শিশি টনিক খেয়েও কানের কোন উপকার হ'ল না। বরং মনে হ'তে লাগল আরও কালা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কিছুই প্রায় শুনতে পায় না এখন, কানের কাছে গিয়ে প্রাণপণে চিৎকার করলে দুটো-একটা কথা ধরতে পারে শুধু। এবার তার নিজেরও চিন্তা হয়েছে খুব। কান না ভাল হলে ইস্কুলে যেতে পারবে না—মাস্টার-

মশাইয়ের পড়ানো তো কিছুই শুনতে পাবে না।

সেখানকার বই-খাতাগুলো সেই কাছারী বাড়ীতেই পড়ে আছে। কে-ই বা আনতে যাবে। তারা যে গরজ ক'রে পাঠাবে সে সম্ভাবনাও নেই। চিঠি লিখলেও কোন সুরাহা হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং শুধু চুপ ক'রে বসে থাকা ছাড়া কোন কাজ নেই। কখনও কখনও সাধ্য মতো টুকটাক বাগানের কাজ করে এক-আধটু, নইলে বেশির ভাগ সময়ই চুপ ক'রে বসে থাকে আর ভাবে এই অসুখের কথা, নিজের জীবনের কথা, এই সর্বনাশা রোগের কথা। ভেবে ভেবে কূল-কিনারা পায় না কিছু —অসুস্থ শরীরে খানিকটা ভাববার পর মাথা ঝিমঝিম করে। লজ্জায় অনুতাপে চোখে জল এসে যায় বার বার।

দু শিশি টনিকেও কোন কাজ হয় নি—উন্নতি তো হয়ই নি উলটে বরং কিছু অবনতিই ঘটছে শুনে গোবিন্দ ওকে আবার কলকাতাতে পাঠাতে বললে। কে একজন ই-এন-টি'র বড় ডাক্তার আছেন, ওর বন্ধু এবং মনিব ধরের আত্মীয় হন তিনি। ওর বন্ধুকে বলেই ব্যবস্থা করেছে গোবিন্দ, তিনি বিনা পয়সায় দেখতে রাজী হয়েছেন। যদি ছোটখাটো কোন অপারেশন করলে কাজ হয় তো তিনিই করবেন—তারও কোন খরচ লাগবে না। তিনিই হাসপাতালে ভর্তি ক'রে নেবেন।

কিন্তু এবারও কোন লাভ হ'ল না। দু দিন তিন দিন ধরে দেখলেন ডাঃ মল্লিক। কোন আশাও দিতে পারলেন না তিনি। বললেন, 'আসলে ওর কানের নার্ভগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ওর কোন চিকিৎসা বিলেতে হয় কিনা জানি না, এদেশে এখনও পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নি। বৃথা চেষ্টা। এর পর একেবারেই কিছু শুনতে পাবে না। কানের কাছে বাজ পড়লেও বুঝতে পারবে না। একেবারেই বরবাদ হয়ে গেল ছেলেটা।......ঐ যে দুর্দান্ত ম্যালেরিয়া হয়েছিল বললেন, তাতেই এই কান্ডটি হ'ল। সাধারণত ঐ টাইপের ম্যালেরিয়া শরীর একেবারে ঝাঁঝরা ক'রে দিয়ে যায়। মনে হয় ওর বংশে ভি-ডি ছিল। তাতেই আরও অনিষ্ট হয়েছে। সরি, কী আর বলব। I feel pity for the boy.'

অর্থাৎ এদিক দিয়ে আশা-ভরসা আর কিছু রইল না। একেবারেই নিশ্চিন্ত হ'ল ওরা।

এই খবরের পর শ্যামা আর একবার আছাড় খেয়ে পড়লেন। আর এক দফা—রতনকে উদ্দেশ্য ক'রে—গালিগালাজ শাপ-শাপান্তর ঝড় উঠল। কান্তি কিছুই শুনতে পেল না তার, তবে বুঝতে পারল। বুঝতে পারল সে অনেক কিছুই। তাকে কেউ বলে দেয় নি যে আর কোন আশা নেই কোথাও তার কান সারাবার—কিন্তু দাদা বৌদির অন্ধকার হতাশ মুখ, বড়মাসীমার চোখের জল আর মা'র এই রণরঙ্গিণী মূর্তি ও আছড়ে পড়া দেখে কিছু আর বুঝতে বাকী রইল না। এবার পাথর হয়ে গেল সে। চোখে আর জল নেই তার। সব যেন শুকিয়ে গিয়েছে। এত বড় সর্বনাশের কথা যখন ভাবতেও পারে নি—তখন লজ্জায়, অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে চোখ দিয়ে জল পড়ত; এখন আর কিছুই নেই, এ সবের অতীত হয়ে গিয়েছে সে। এখন শুধু সামনে দিক-দিশাহীন অন্ধকার, নিঃসীম শূন্যতা। ভয়েই পাথর হয়ে গেল সে।

অনেক চেঁচামেচি, অনেক কান্নাকাটির পর শ্যামাও এক সময় বোধ হয় শ্রান্ত হয়েই চুপ করলেন। কিন্তু মনের আক্রোশ মেটে নি তাঁর—এই কথাটা নিয়েই মনে মনে তোলপাড় করতে লাগলেন। একবার ভাবলেন সত্যি-সত্যিই যাবেন সেখানে সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেতাই ক'রে আসবেন, কৈফিয়ৎ তলব করবেন তাদের এই আচ-

রণের। কোন্ অধিকারে ও'দের না জানিয়ে ছেলেকে সেই মৃত্যুপুরীতে পাঠিয়েছিল তারা? কেন? কেন এ কাজ করতে গেল তারা, কিসের জন্যে?

আবার পরক্ষণেই মনে হ'ল, ছিঃ! জামাইবাড়িতেই কোন দিন গেলেন না তিনি—তা আবার তাদের আত্মীয়বাড়ি। বিশেষ ক'রে ঐ বাড়িতে—ঐ পাড়ায়। না, সে সম্ভব নয়; তা তিনি পারবেন না।

অনেক ভেবে-চিন্তে একটা কাজ করলেন। মহাশ্বেতার বড় ছেলেটা এসেছিল একদিন, তার শরণাপন্ন হলেন, 'বুড়ো ভাই, একটা কাজ করবি? চুপি চুপি কোন রকমে তোর মেজকাকীর কাছ থেকে তোর রতনপিসীর ঠিকানাটা যোগাড় ক'রে দিবি? এরা শুনলে হৈ-চৈ ক'রে উঠবে—কিন্তু সেখানে কান্তির একরাশ কাপড়-জামা পড়ে রয়েছে— মিছিমিছি নষ্ট হবে বৈ তো নয়। ঠিকানাটা পেলে আমি মন-মন কাজে একটা চিঠি লিখে দেব, কাউকে দিয়ে তারা পাঠিয়ে দেবে।'

বুড়ো কথাটা বুঝল। নিতান্তই স্বাভাবিক এটা তার দিদিমার পক্ষে। তবে সে পারবে না, অন্য ব্যবস্থা করবে। সেই কথাই বলল, 'না দিদিমা, আমার কম্ম নয় ওসব। তবে কথাটা বার ক'রে নেব। বুঁচি আছে মেজকাকীর পেয়ারের মন্ত্রী, তাকেই বলব। বরং তোমার নাম ক'রেই বলব।'

'তাই বলিস। আর ঠিকানাটা পেলে আমাকে দিয়ে যাস। লক্ষ্মী দাদা আমার, তবে দেখিস, এরা না কেউ টের পায়।'

'ঠিক আছে, সে তুমি কিছু ভেবো নি।' আশ্বাস দিয়ে চলে যায় বুড়ো অর্থাৎ বিষ্ণুপদ।

অবশ্য বুড়োর বুদ্ধিতে কাজও হয়। দু দিন পরেই হাসতে হাসতে ঠিকানাটা এনে দিয়ে যায়। 'মেজকাকীও জানত না ঠিক—মেজকাকার কাছ থেকে জেনে দিয়েছে। বাব্বা, ও কি আমাদের কাজ। বুঁচি বলেই পেরেছে!'

বুড়োকে দিয়েই একখানা দু-পয়সার খাম আনিয়ে নিলেন শ্যামা। তারপর অনেক দিন পরে সীতার খাতা থেকে একখানা কাগজ যোগাড় ক'রে চিঠি লিখতে বসলেন। সবাইকে বাঁচিয়ে আড়ালেই লিখতে হ'ল—সেজন্যে দুদিন সময় লাগল তাঁর চিঠি শেষ করতে। বহুদিনের অনভ্যাস, কলমও সরতে চায় না। দেরি হওয়ার সে-ও একটা কারণ।

শ্যামা লিখলেন,

"কল্যাণীয়াসু,

তোমার কল্যাণ কোন-ক্রমেই আমার কাম্য নয়, তবে অন্য পাঠ খুঁজিয়া না পাইয়াই এই পাঠ দিলাম। কল্যাণ কামনা তো দূরের কথা, তোমাকে নিত্য অভিসম্পাৎ না দিয়া আমি জল খাই না। তোমার অনিষ্টই এখন আমার একমাত্র কাম্য। কারণ বিশ্বাস করিয়া তোমার কাছে আমার গর্ভের সেরা সন্তানটি গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম, তুমি দয়া করিয়া একটু যদি মানুষ করিয়া দাও এই আশায়—তুমি চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া আমার সর্বনাশ করিয়াছ। এমন স্থানেই তাহাকে পাঠাইয়াছিলে যে ক'মাসেই বাছার আমার জীবনসংশয় ঘটিয়া গেল। দুর্দান্ত ম্যালেরিয়ায় মৃতপ্রায় হইয়া জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পড়িয়া ছিল, একজন অপরিচিত লোক দয়া-পরবশ হইয়া পোঁছাইয়া দিয়া গেলেন বলিয়া তবু প্রাণটা বাঁচিল। তাও অনেক কষ্টে, অনেক অর্থব্যয় করিয়া। বহু রাত জাগিয়া শুশ্রূষা করিতে হইয়াছিল, দশ-বারোদিন পর্যন্ত জীবনের কোন আশা ছিল না। প্রাণ যদি বা বাঁচিল চিরদিনের মতো পঙ্গু অক্ষম হইয়া গেল। শুনিয়া বোধ হয় সুখী হইবে—চিরদিনের মতো তাহার দুটি

কান কালা হইয়া গিয়াছে। সাধারণ কালা নয়, বন্ধ কালা। এখন কানের কাছে ঢাক বাজিলেও শুনিতে পায় না। আমরা ভিখারী, তবু ভিক্ষা দুঃখ করিয়াই বড় বড় ডাক্তার দেখাইয়াছি, চিকিৎসারও কোন ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু ডাক্তাররা বলিতেছেন ও কান আর ভাল হইবে না। কোনদিনই না। সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ার বিষেই উহার কানটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সে কী করিয়া খাইবে বলিতে পারো? পথের ধারে বসিয়া ভিক্ষা করা ছাড়া তো আর কোন উপায় রহিল না। মা, একটা কথা তোমাকে দুই হাত জোড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমরা তোমার কী অনিষ্ট করিয়াছিলাম যে তুমি বা তোমরা আমার এত বড় অনিষ্টটা করিলে? সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম—না পারিলে সোজাসুজি বলিয়া দিলে না কেন? সে নাকি বিগড়াইয়া গিয়াছিল—তোমরা বলিয়াছ, (সেও তো তোমার দায়িত্ব!) সেক্ষেত্রে আমাদের কাছেই পাঠাইয়া দিলে না কেন? আমাদের ছেলে আমরা বুঝিতাম। তাহাকে সাক্ষাৎ যমপুরীতে পাঠাইবার তোমার কী অধিকার ছিল? এই রহস্যটা যদি খোলসা করিয়া জানাও, এক্ষণে তবু মনকে একটা সান্ত্বনা দিতে পারি। আশা করি এ জবাব চাহিবার আমার সম্যক অধিকার আছে! পরিশেষে আবারও জানাই, সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত নিত্য অভিশাপ দিব, তুমিও যেন এমনি করিয়া সকল ভালোর মাথা খাইয়া বসিয়া থাক। ইতি—

কান্তির মা।"

বহুকাল পরে লিখতে বসা। হাতের লেখা এককালে মুক্তোর মত ছিল—এখন এঁকেবেঁকে বিশ্রী হয়ে গেল। বিস্তর বানানভুলও হ'ল নিশ্চয়ই? তবু পড়ার কোনও অসুবিধা হবে মনে হ'ল না। শ্যামা চিঠিখানা খামে এঁটে ঠিকানা লিখে দুপুরের দিকে নিজে সিদ্ধেশ্বরীতলার কাছে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এলেন।

জবাব পাবেন আশা করেন নি। প্রধানত গায়ের ঝাল মেটাতেই চিঠিটা লেখা। তবু দুদিন পর থেকেই একটু উৎসুক হয়ে দুপুরের দিকটায় বাইরের বাগানে ঘুরতে লাগলেন। ঐ সময় পিওন যায় প্রত্যহ এই পথ দিয়ে। যদিই চিঠি আসে, তার হাতেই পড়া বাঞ্ছনীয়। বৌমা কি কান্তির হাতে পড়লে অনেক ঝামেলা। কৈফিয়ৎ দিতে হবে বিস্তর। এখনকার ছেলেমেয়েদের আবার বড় বেশী ভদ্রতাজ্ঞান। যে আমার মন্দ করেছে তাকে দু-কথা শোনাব—এতেও ওঁদের ভদ্রতায় বাধে।...

জবাব ডাকে এল না অবশ্য। তবে জবাব পেলেন শ্যামা।

অপ্রত্যাশিত ভাবে। অচিন্তিত পথ দিয়ে এসে পেঁাছল।

চিরদিনের ভগ্নদূত মহাশ্বেতাই নিয়ে এল সে জবাব, প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিল সে।

'আর শুনেছ ব্যাওরাটা। রতন গো রতন, আমার মামাতো ননদ, গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে পরশুদিন। কাল ইনি শুনে এসেছেন। পুলিশ-হাঙ্গামার কান্ড তো—সবাইকেই জানিয়েছে তাই, যে যেখানে আছে আপ্ত-স্বজন।'

'গলায় দড়ি দিয়েছে! সে কি?' আড়ষ্ট কণ্ঠে কোনমতে প্রশ্ন করেন শ্যামা।

'হ্যাঁ গো। ঠিক দুপুর বেলা। নিজেরই শাড়ি কড়িকাঠের সঙ্গে বেঁধে এই কান্ড ক'রে বসে আছে মেয়ে। কেউ জানে নি, কেউ টের পায় নি, এমন চুপিসাড়ে কাজ সেরেছে। সন্ধ্যে হয়ে যায় তবু দোর খোলে না, ঘর থেকে বেরোয় না, এতেই সন্দ হ'তে দোর ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখে ঐ কান্ড। চিঠি লিখে গেছে নাকি—কারুর হাত নেই এতে, নিজের পাপের প্রাচিত্তির করতে আমি মরছি!...এমন ঘর-বাড়ি, এত পয়সা, সুখের জীবন, দ্যাখো দিকি বাপু! কী যে হ'ল। তোমারই শাপমন্যি ফলল আর

কি। যা গালটা দিলে ক'দিন ধরে ছড়া কাটিয়ে, এত কি সহ্য হয়! তোমার বাপু কথা বড্ড ফলেও যায়, কালমুখের বাণী।......বলে কে যেন একখানা চিঠি দিয়েছিল দুদিন আগে, সেই চিঠি পেয়ে এস্তক মন ভার ক'রে ছিল, খায় নি দায় নি কিছু করে নি দুদিন। সে চিঠিও পাওয়া যায় নি—তা'হলে তবু একটা কিনারা হ'ত যে কেন এ কাজ করলে। কে যে বাপু এমন শত্তুরতা ক'রে চিঠি দিলে! কী লিখেছিল কে জানে, এমন কে চিঠি দিলে ওকে যে আত্মঘাতী হ'তে হ'ল!

বকেই যায় মহাশ্বেতা আপনমনে, ওর অভ্যাসমতো।

কিন্তু শ্যামা যেন আর শুনতে পারেন না। তাঁর দু কান যেন পুড়িয়ে দেয় কে। বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে।

অভিশাপ দিয়েছিলেন সত্য কথা—কিন্তু এ রকম তো তিনি চান নি। ঈশ্বর জানেন এমন শোচনীয় মৃত্যুর কথা তিনি কখনও চিন্তা করেন নি।

এমন হবে জানলে ও চিঠি কখনই দিতেন না তিনি। যদি মেজবৌয়ের মনে পড়ে, যদি সন্দেহ করে যে তাঁর চিঠিতেই এই কাজ করেছে রতন তো তিনি ওদের কাছে মুখ দেখাবেন কী ক'রে?

আর তা ছাড়া—আজ যত বড় অনিষ্টই ক'রে থাক সে—অনেক উপকারও করেছে, কান্তিকে যে যথার্থই ভালবাসত, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। তার এমন ভয়াবহ পরিণতি—কোন অন্ধ ক্রোধের বশেও কখনও কল্পনা করেন নি। ছি ছি, কী করল হতভাগী। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে গেল তাঁকেই!

শ্যামা নির্জনে বার বার নিজের ইষ্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। পরলোকে গিয়ে যেন হতভাগিনী শান্তি পায় একটু—সেখানে না আবার এই আত্ম-হত্যার শাস্তি বইতে হয় তাকে।

'ঠাকুর তাকে মাপ করো, তাকে তোমার কাছে টেনে নাও।'

॥ ২ ॥

মহাশ্বেতার ইচ্ছে ছিল কান্তিকেও খবরটা দিয়ে যায়। বোধ করি পেট ফুলছিল তার তখনও। তাই শ্যামা যখন সেখান থেকে উঠে একরকম ছুটেই পিছন দিকের বাগানে চলে গেলেন নিজেকে সামলাতে—মহাশ্বেতা খুঁজে খুঁজে কান্তিকে বারও করেছিল।

'ঐ, শুনছিস! তোর সেই তিনি রে—তোর রতনদি যে ঘোগুা উল্‌টেছেন। অক্কা পেয়েছে।...আ-মর্‌ চেয়ে আছে দ্যাখো কেমন ক'রে—রতনদি তোর, রতন, আমার সেই ননদ মরে গেছে, বুঝলি? এই—গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলছে। মা মানুষটি তো আমার সহজ নয়—মা'র গাল সহ্য করতে পারবে কেন? হাতে হাতে ফলে গেল ওর শাপ! বাব্‌বা, মনে হ'লেও ভয় করে।'

যৎপরোনাস্তি চেঁচিয়েই বলেছিল মহাশ্বেতা, কিন্তু কান্তির কানে তাও পোঁছ-বার কথা নয়। সে তেমনি করুণ অসহায় ভাবে চেয়ে বললে, 'কিচ্ছু বুঝতে পারছি না কি বলছ। কার কথা বলছ! কার কী হয়েছে? একটু লিখে দেবে?

'দূর হ কালার ডিম। এক জ্বালা হয়েছে কালাকে নিয়ে। আমি তোদের মতো লিখতে পড়তে পারি কি না, যে লিখে দেব। বলে কবে সেই দাগা বুলিয়েছিলুম দিনকতক, এখনও তা নাকি মনে আছে। আন্দেক বানান জানি না।......শোন যা

বলছি, আমার মুখের দিকে তাকা। তবু চেয়ে থাকে দ্যাখো বোকার মতো—'

আরও ভাল ক'রে জিনিসটা বুঝিয়ে দেবার হয়ত চেষ্টা করত কিন্তু ইতিমধ্যে হাঁকাহাঁকিতে আকৃষ্ট হয়ে কনক এসে পড়ল। সে ভেতরের কথা কিছুই জানতে পারে নি বটে, তবে এটা সে তার সহজ সহানুভূতি দিয়ে বেশ বুঝেছে যে, কান্তির এই দুর্গতির জন্য রতন যতই দায়ী হোক, কান্তির তার প্রতি এখনও যথেষ্ট টান আছে। কারণ এতদিনের এত কথার মধ্যেও ওর মুখ দিয়ে একটি দিনের জন্যেও রতনের বিরুদ্ধে কোন নালিশ উচ্চারিত হয় নি। হয়ত এককালে প্রচুর স্নেহ পেয়েছে তার কাছ থেকে বলেই—কৃতজ্ঞতাটা ভুলতে পারে নি, অথবা ওর এই অনিষ্টের মূলে রতনের সত্যিই তেমন কোন হাত ছিল না,—কারণ যা-ই হোক, কান্তি মনে মনে আজও রতনকে স্নেহ বা শ্রদ্ধা করে। সুতরাং হঠাৎ এত বড় খবরটা পেলে দুর্বল শরীর আরও ভেঙে পড়বে।

সে ব্যস্ত হয়ে এসে মহাশ্বেতার হাত ধরে একরকম টেনেই বাইরে নিয়ে গেল।

'ও কি করছিলেন ঠাকুরঝি, ওকে কি এখন এই খবর দেয়! এখনও ভাল ক'রে সেরে উঠতে পারে নি, রোগা শরীর,—এখন এত বড় আঘাত সইতে পারবে কেন?'

'নে বাপু, তোদের আদিখ্যেতা দেখলে আর প্রাণ বাঁচে না। এখনও কি তার ওপর এত টান এত ছেদ্দা-ভক্তি আছে ওর যে একেবারে বুক ফেটে যাবে! সে মাগী তো ওকে মেরে ফেলতেই বসেছিল! মা কি মন্যিটা দিত অমনি অমনি!'

'তাই বলে কি এতদিনের ছেদ্দা-ভক্তি একদিনেই উবে যায়! এত বছর ধরে এত যত্ন করেছে, সে-সব একদিনেই ভুলে যাবে? অন্তরের টান থাকবে না একটা!'

'জানি নে বাপু! তোদের কথার ধাঁচধরণ বুঝতে পারি না। বলে—যে দিয়েছে মনে ব্যথা তার সঙ্গে আমার কিসের কথা, তবু যদি কই কথা ঘুচবে না মোর মনের ব্যথা!'

গজগজ করতে করতে মহাশ্বেতা চলে যায়।

কিন্তু ঐ ভাবে তাকে টেনে আনতে কান্তির মনে একটা খটকা লাগে। সে কনকের কাছে এসে বলে, 'কী হয়েছে বৌদি, বড়দি কী বলছিল। কেউ মরেছে? কার কথা বলছিল? গলা দেখাচ্ছিল—!'

ঠোঁটের ভঙ্গি ক'রে কনক বুঝিয়ে দেয়, 'ও কিছু না। ওর কে এক পাড়ার লোক মরেছে!'

কান্তি চুপ ক'রে যায়—কিন্তু মনের খট্‌কাটা যে দূর হয় না সেটা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারে কনক।

পরের দিন দুপুরে আবার এসে কনককে ধরে সে। এদিক-ওদিক চেয়ে চুপি-চুপি বলে, 'একটা কথা বলব বৌদি, কাউকে বলবে না?—লক্ষ্মীটি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, না বলে আমি থাকতে পারছি না!'

কনকের মুখ শুকিয়ে ওঠে। তবুও বলতে হয়, 'বলো না কী বলবে! কী এমন কথা?'

বলবার আগেই কান্তির মুখ লাল হয়ে উঠে। মাথা নিচু ক'রে খুব চুপি-চুপি বলে, 'এর মধ্যে—এর মধ্যে তোমরা রতনদির কোন খবর পাও নি?' আটকে আটকে যাচ্ছিল কথাগুলো। বিশেষ ক'রে রতনদির নামটা। কোনমতে যেন মরীয়া হয়েই শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করল।

যা আশঙ্কা করেছিল তাই। হয় ডাহা মিথ্যে বলতে হয়, নয় তো সত্যটা স্বীকার করতে হয়। তবু পাশ কাটাবার জন্যে পালটা প্রশ্ন করল কনক, 'কেন বলো তো?'

আবারও মুখ নীচু করল কান্তি। রান্নাঘরের মাটির মেঝেতে নখ দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে বলল, 'কাল রাত্রে বড় বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি। যেন ছেঁড়া-ময়লা একটা কাপড় পরা, গলায় একটা কাটা দাগ—এসে আমার কাছে হাত জোড় করে কী চাইছে। কী যে চাইছে তা বুঝতে পারলুম না। সেই যে ঘুম ভেঙ্গে গেল, আর ঘুম এল না। রতনদির কিছু হয়েছে—হ্যাঁ বৌদি? লক্ষ্মীটি, আমার কাছে গোপন ক'রো না, সে—সে বেঁচে আছে তো!'

একেবারে নির্জলা মিথ্যাটা মুখে আটকায় বৈ কি!

কনক মাথা নিচু করল এবার।

কান্তির গলাটা যেন একেবারে ভেঙ্গে এল। সে স্খলিত কণ্ঠে একেবারে ফিসফিস ক'রে বলল, 'তাই বুঝি কাল বড়দি বলতে এসেছিল? কেউ—কেউ খুন করেছে বুঝি তাকে? গলা কেটে দিয়েছে?'

কনক ঘাড় নাড়ল। ইঙ্গিতে দেখাল যে গলায় দড়ি দিয়েছে রতন।

চুপ ক'রে গেল কান্তি। শুধু আবার দুই চোখ দিয়ে তার এতদিন পরে অশ্রুর বন্যা নামল।

এর পর দুটো দিন তার যে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাটল তা কনক ছাড়া পুরোটা কেউ বুঝতে পারল না। ঠিক এইটেই আশঙ্কা করেছিল সে। যদি বেচারা প্রাণ খুলে কাঁদতেও পারত তো হয়ত আঘাতের তীব্রতা অতটা লাগত না। কিন্তু ভয়ে ভয়ে দাদা বা মা'র সামনে সে চোখের জলও ফেলতে পারত না। কে জানে অপরাধিনীর জন্যে চোখের জল ফেললে যদি এঁরা রাগ করেন? ঠিক সেই কারণেই তাকে প্রতিদিনের কাজগুলো স্বাভাবিক ভাবেই ক'রে যেতে হ'ত—অন্তত চেষ্টা করতে হ'ত। ভাতের সামনে গিয়েও বসতে হ'ত, যদিও খেতে পারত না প্রায় একগালও! প্রথম দিন রাতে ইচ্ছে ক'রেই হেমের সঙ্গে তাকে খেতে দেয় নি কনক, হেমের প্রশ্নের উত্তরে 'আমার সঙ্গে খাবে' বলে কাটিয়ে দিয়েছিল। মা'রও সেদিন একাদশী, ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন। তা নইলে বিস্তর বকুনি খেতে হ'ত ওকে। ভাত কমই দিয়েছিল কিন্তু তাও খেতে পারল না সে— দুএক গ্রাস নাড়াচাড়া ক'রে কনকের চোখে চোখ পড়তেই কেঁদে ফেলল। ইঙ্গিতে আশ্বস্ত ক'রে কনক তাকে চুপ ক'রে বসে থাকতে বলল, তারপর নিজের খাওয়া হ'তে নিঃশব্দে ভাতসুদ্ধ থালাটা নিয়ে পুকুরে চলে গেল।

পরের দিন কিন্তু আর চেপে রাখা গেল না। তবে বিচিত্র কারণে শ্যামা খুব একটা বকাবকি করলেন না। শুধু কনককে প্রশ্ন করলেন একবার, 'খবরটা ও শুনেছে বুঝি বৌমা? মহাই বুঝি এই উপকারটি ক'রে গেলেন আমার?'

কিন্তু শ্যামা বকাবকি না করলেও দুদিনেই আবার কান্তির যা চেহারা হয়ে গেল, তা দেখে ভয় পাবারই কথা। কনক তো বটেই—শ্যামাও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। শ্যামা যে এতটা সহানুভূতির চোখে ব্যাপারটা দেখবেন তা আশা করে নি কনক, সে ভরসা পেয়ে বলল, 'কী হবে মা—আবার একটা কিছু ভারী অসুখ-বিসুখ হবে না তো গুমরে গুমরে!'

'কী জানি মা, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। একটা কিছু কাজের মধ্যে থাকলেও বা যা হয় হ'ত—শুধু শুধু চুপ ক'রে বসে থাকা—এই যে হয়েছে আরও কাল!'

'ওকে—ওকে কোথাও দু-একদিনের জন্যে পাঠালে হ'ত না?'

'কোথায় পাঠাব বলো। উমার কাছে একটা রাত্তিরও কাটাবার জায়গা নেই, পাঠাতে গেলে এক বড়দির কাছে। তা কালা-মানুষ কিছুই শোনে না—কলকাতায় গাড়ি-ঘোড়ার পথ, ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আরও, কলকাতায় গেলে—ঐসব কথা বেশি

ক'রে মনে পড়বে হয়ত!'

সুতরাং কোন মীমাংসাই হয় না। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ওকে বাঁচিয়ে দেয় উমাই।

তৃতীয় দিনে ডাকে একটা চিঠি আসে কান্তিরই নামে। উমা ওকে বিস্তর সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে লিখেছে—

'তুমি কোন কারণেই হতাশ হইও না—বা হাল ছাড়িয়া দিও না। মেয়েদের পড়ার বইতে অনেক অনেক জীবনী নিত্যই পড়িতেছি, তোমার অপেক্ষা গুরুতর রকমের অঙ্গহীন লোকও পৃথিবীতে বহু বড় বড় কাজ করিয়া কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে হাত-পা বা ঐ ধরনের কোন অঙ্গ যায় নাই। আমি বলি কি, তুমি আবার পড়াশুনাতেই মন দাও। ফার্স্ট ক্লাস অবধি পড়িয়াছিলে মোটামুটি অনেকটা জানাই আছে। এখন বই দেখিয়া নিজেই পড়িতে পারিবে। এখন তো লিখিত পরীক্ষা—কানে শুনিবার কোন প্রয়োজন হয় না। তুমি বরং ওখানকার ইস্কুল হইতে, বা যেসব বই তুমি পড়িতে, মনে করিয়া পুস্তকের তালিকা করিয়া আমাকে দাদার মারফৎ বা ডাকে পাঠাইয়া দাও, আমি আমার ছাত্রীদের বাড়ী হইতে যতটা পারি যোগাড় করিয়া দিব, বাকীগুলি তোমার মোসোমশায় কিনিয়া দিবেন। তুমি আর এক দিনও সময় নষ্ট না করিয়া কাজে লাগিয়া যাও।'

উমার এই চিঠিখানাই যেন দশ বোতল টনিকের কাজ করল। কান্তির মুখ-চোখের চেহারা ফিরে গেল দুদিনে। রতনের শোকটাও এই প্রবল উৎসাহের বন্যায় অনেকটা দূরে চলে গেল। এক আধবার—বিশেষত সন্ধ্যার সময়টা—একটু উন্মনা হয়ে উঠত, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও হয়ত ফেলত কিংবা দূর শূন্যে চেয়ে চোখ দুটো উঠত ছলছল ক'রে—কিন্তু সেই গুম হয়ে বসে থাকা বা শুকিয়ে, ওঠাটা একেবারে চলে গেল। সে সেইদিনই বসে বসে একটা বইয়ের ফর্দ ক'রে দাদার হাতে দিয়ে দিলে ছোটমাসীকে দেবার জন্যে। তারপর খুঁজে খুঁজে সীতার দরুন বালির কাগজের খাতাটা বার ক'রে তারই দোয়াত কলম নিয়ে লিখতে বসল। যে ইংরেজী প্রবন্ধগুলো তার তৈরি করা ছিল, সেইগুলোই নতুন ক'রে লিখে মিলিয়ে নিতে লাগল। অর্থাৎ নতুন উৎসাহ এসেছে জীবনে—হতাশ ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। এরাও নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল এবার।

দিন পাঁচ-সাত পরেই ছোটমাসী একদফায় কতকগুলো বই পাঠিয়ে দিলেন। হেম ইতিমধ্যে ওর অফিস থেকে রেলের কখানা বাঁধানো খাতা এনে দিয়েছিল—অঙ্ক কষা ও অন্য সব লেখার জন্যে। এ তো আর ইস্কুলে দেখাতে হবে না— মিছিমিছি সাদা খাতা কিনে পয়সা নষ্ট করার প্রয়োজন কি! তাতে অবশ্য কান্তিরও কোন আপত্তি নেই। সে এবার দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে নিয়মিত পড়াশুনো শুরু করল। অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে সে। শুধু ওর এই একেবারে কালা হয়ে যাওয়াটা এদের এখনও অভ্যাস হয় নি বলে এদেরই একটু অসুবিধা হচ্ছে। পেছন ফিরলে আর কোনমতেই ডাকার উপায় নেই। সামনে ফিরে থাকলে হাতপায়ের ভঙ্গি ক'রে ঠোঁট নেড়ে তবু কাজ চলে। অন্যদিকে ফিরে থাকলে গায়ে হাত দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। নয়ত ঘুরে গিয়ে চোখের সামনে দাঁড়াতে হয়—কি ঘাড় হেঁট ক'রে থাকলে, একটা হাত ওর চোখের সামনে ঘুরিয়ে মাথা তোলবার ইঙ্গিত জানাতে হয়।

এইসব দেখে হেম মধ্যে মধ্যে হতাশ হয়ে পড়ে। মাকে বলে, 'পড়ছে তো, প্রাইভেটে একজামিন দিয়ে পাসও হয়ত করতে পারবে কিন্তু কোন কাজ হবে কি তাতে? ও যে কোথাও চাকরি পাবে বলে তো মনে হয় না। কে দেবে ওকে কাজ? যে মাইনে

দেবে সে এত দিকদারি সহ্য করবে কেন?...যা দেখছি ষাঁড়ের নাদ হয়েই ওকে জীবন কাটাতে হবে।'

শ্যামা চুপ ক'রে থাকেন। তিনি হেমের সঙ্গে একমত হ'তে পারেন না। মধ্যে মধ্যে তিনিও যে একটা হিম হতাশা বোধ করেন না তা নয়—কিন্তু ঠিক এতখানি অন্ধকার ভবিষ্যৎ মেনে নিতে তাঁর মন চায় না। এ ছেলের ওপর যে অনেকখানি ভরসা ছিল তাঁর। সে আশার প্রাসাদ একেবারে ধূলিসাৎ হ'লে তিনি দাঁড়ান কোথায়? তাই কতকটা নিজের গরজেই একটা ক্ষীণ আশা আঁকড়ে ধরে থাকেন। একটা কি কিছু উপায় হবে না, ভগবান কি এতটা অবিচার করবেন? তবে যে লোকে বলে 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি'—সে কি মিছে কথা? শুধুই কথার কথা? তাঁর জীবনে তিনি যেভাবে দাঁড়িয়েছেন সে কথা ভেবেও বল পান অনেকটা। আবার এমনও একটা ক্ষীণ আশা মনে মনে উঁকি দেয়—ভালও তো হয়ে যেতে পারে, যেমন হঠাৎ কালা হয়ে গেছে তেমনি হঠাৎই আবার হয়ত শুনতে আরম্ভ করবে। অনেক সময় দৈব ওষুধেও কাজ হয়। একবার তাই না হয় যাবেন মঙ্গলার কাছেই। তাঁর অনেক জানাশুনো আছে—যদি তেমন কোন ওষুধ-বিষুধের সন্ধান দিতে পারেন তিনি।

ছেলের মুখে চোখে নতুন উৎসাহের দীপ্তি জেগেছে, তার আলোও খানিকটা তাঁর মনে এসে পড়ে। হবেই একটা উপায়, যা হোক ক'রে। ভগবান কোন মতে একটা পথ দেখিয়ে দেবেনই।

॥ ৩ ॥

এর মধ্যে আর একটা প্রবল আঘাত এসে পড়ল কান্তির মনে। তার থিতিয়ে-আসা স্মৃতির সরোবরে নতুন ক'রে আলোড়ন জাগল। সে আঘাত বহন ক'রে নিয়ে এল একেবারেই অপ্রত্যাশিত একটি মানুষ—মোক্ষদা, রতনের ঝি।

তখন বেলা তিনটে হবে। কান্তি বাইরের ঘরে পড়াশুনো করছে, শ্যামা সেই-খানেই বারান্দায় বসে পাতা চাঁচছেন। হঠাৎ বাগানের বেড়ার আগড় ঠেলে একটি অপরিচিত মধ্যবয়সী স্ত্রীলোককে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। যে এসেছে সে এখানকার কেউ নয়। এখানকার সম্ভ্রান্ত ভদ্রপরিবারেও বিধবা মেয়েরা সাধারণত ক্ষারে-কাচা কাপড় পরে। এর পরণে পরিষ্কার বাসিধোপ-করা নরুণপাড় ধুতি। অথচ চালচলন দেখলে ঝি বলেই মনে হয়—বা ঐ শ্রেণীর কেউ। কলকাতা শহরের কোন বড়মানুষের বাড়ির ঝি হবে হয়ত।

আর একটু কাছে আসতে শ্যামা তীক্ষ্ণ কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন, 'কে গা বাছা—চিনতে পারছি না তো! কোথা থেকে আসছ?'

যে আসছিল সে তখনই জবাব দিল না। কাছে এসে সিঁড়ি দিয়ে দুটো ধাপ উঠে রকের প্রান্তে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বলল, 'বলছি মা। একটু বসি আগে—দম নিই।'

তারপর অনিমন্ত্রিত ভাবেই রকের ওপর জেঁকে বসে বলল, 'আপনি তো কান্তি দাদাবাবুর মা? এটাই তো তাঁদের বাড়ি?'

কান্তি দাদাবাবুর মা!

বিদ্যুৎবেগে মনে পড়ে যায় কথাটা। এক রতন বা তাদের বাড়ির কোন লোক

ছাড়া এ পরিচয় ধরে কেউ খোঁজ করবে না। এ নিশ্চয় মোক্ষদা। এর কথা বহু গল্প করেছে কান্তি। মহাশ্বেতাও।

মোক্ষদা পাকা লোক! সে ওঁর মুখের রেখা দেখেই বুঝতে পারল যে তিনি ভাবছেন। ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ মা, আমি মোক্ষদা। অতন দিদিমণিদের বাড়ির ঝি।'

অপ্রসন্ন হয়ে উঠল শ্যামার মুখ ওদের কথা তিনি সর্বতোভাবেই ভুলতে চাইছেন প্রাণপণে। আবার মনে করাতে এল কেন মিছিমিছি!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হ'ল—যে রহস্যটা কিছুতেই এত-কাল আবিষ্কার করা যায় নি—কান্তিকে বার বার নানা ভাবে জেরা ক'রেও জানা যায় নি—সেইটেই হয়ত এবার পরিষ্কার হ'তে পারে।

তবু তিনি বিরস কণ্ঠেই বললেন, 'তা তুমি আবার কী মনে ক'রে বাছা? তোমাদের দিয়ে তো আমার ঢের উপকার হয়েছে—আর কেন? আরও কী তোমাদের অভিরুচি আছে—তাই শুনি! অনেকটাই তো সেরে এনেছিলেন তোমার মনিবরা—বাকী তো শুধু চামড়া আর হাড় কখানা। তুমি বুঝি এবার সেটুকুও সেরে যেতে এসেছ? ঐ যে বলে—হাড় খাব মাস খাব চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাব, তা সেই শেষের কাজটুকু সারতে এসেছ বুঝি!'

অকস্মাৎ মোক্ষদা ঠাঁই ঠাঁই করে দুহাতে নিজের দু-গালে চড়াতে লাগল।

'এই! এই! আমার প্রাচিত্তির এই! নিত্যি নিজে হাতে নিজেকে প্রেহার করছি মা, দিন আত্তির। তাই তাতেই কি প্রাচিত্তির হবে? হবে না, নরকেও ঠাঁই হবে না আমার! মহাপাতক করেছি মা, নিজের হাতে গু গুলে খেয়েছি। তবে হ্যাঁ—তার সাজাও পেয়েছি হাতে হাতে। ঠাকুর আর আত পোয়াবার নেগে তুলে আকে নি—সদ্য সদ্য শোধ দে দিয়েছে। আমার মনিব সাক্ষাত রন্নপুর্ণো, তাকে আমিই তো বলতে গেলে মেরে ফেন্নুগা! য্যাদ্দিন বাঁচত কখনও কোন অভাব থাকত নি। যা চেয়েছি চেরকাল তাই দিয়েছে। একটি দিনের জন্যে না বলে নি কখনও। বলি মেয়ে-জামায়ের গুষ্টিসুদ্দু পালছিনু ঐ খুঁটির জোরেই তো গা! একেবারে ধনে-পরানে মেরে রেখে গেল! আর তার মূল হনু এই আমি—আব্বুশী শতেকক্ষোয়ারী!'

কৌতূহল অসম্বরণীয় হয়ে ওঠে। উত্তেজনাও বোধ করেন শ্যামা। সুগভীর রহস্যের বুঝি আজ তল মিলল। এতদিনের কৃষ্ণ যবনিকা বুঝি অপসারিত হ'ল চোখের সামনে থেকে। তবু যথাসাধ্য বাহ্যিক নিস্পৃহতা রক্ষা করে বসে থাকেন। ওকেই বলবার সুযোগ দেন আরও।

ঘরের মধ্যে থেকে কান্তিও দেখেছে মোক্ষদাকে। কাঠ হয়ে গেছে সে ওকে দেখে। বাইরে এসে লাভ নেই, কিছুই শুনত পাবে না সে—তাছাড়া, তা ছাড়া কী জন্যে কী বলতে এসেছে ও—কে জানে! এতদিন এত যত্নে যে কলঙ্ক ঢেকে রেখেছিল, সেই কলঙ্কই বুঝি সকলের সামনে খুলে দিতে এসেছে ও। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে তার। ইচ্ছা হয় ছুটে পালিয়ে যায় কোথাও।—চিরকালের মতো। রতনদিই চালাক, মরে বেঁচেছে। কান্তিরও যদি সে সাহস থাকত!

মোক্ষদা দম নেবার জন্যে একটু থেমেছিল; একটু পরে বলল, 'তা হ্যাঁ মা, আপনি শোন নি আমাদের দিদিমণি গলায় দড়ি দেচে?'

অকারণেই কানের কাছটা কেমন গরম হয়ে ওঠে শ্যামার। তিনি ঘাড় নেড়ে শুধু জানান যে শুনেছেন।

'তা কিসের জন্যে, কেন—সে বিত্তান্ত কিছু শোন নি আপনি? আমাদের কান্তি দাদাবাবু কিছু বলেনি আপনাকে?'

'বলবার কি হাল ছিল তার!' ঝেঁঝে ওঠেন শ্যামা, 'সে তো মড়া এসে পেঁাছল; বলতে গেলে। তাকে তো যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। সে কী বলবে? তার কিছু হুঁশপব্ব ছিল। এখন তো কথাই নেই—দু কান কালা হয়ে বসে আছে —দুনিয়ায় এত শব্দ তা একটাও কানে যায় না তার। জবু-থবু জন্তু হয়ে গেছে একেবারে। তাকে জিগ্যেসই বা করবে কে? আমরা মানুষ তো—গন্ডার তো আর নই। ঘেন্না-পিত্তির মাথা খেয়েও বসে নেই।'

মুখে সমবেদনাসূচক চুকচুক শব্দ ক'রে মোক্ষদা বলে, 'আহা রে! কানে একে-বারে শুনতে পায় না? তাহলে বদ্ধ কালা হয়ে গেছে বলো! ইস্! কী ছেলের কী হাল। রমন আজপুত্তুরের মতো ছেলে—কী বলছ মা!'

'সত্যি বলছি কি মিথ্যে বলছি দেখে যাও না বাছা। চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন ক'রেই যাও না। এই ঘরেই তো আছে!'

'না মা থাক। বাপ্‌রে, এ মুখ আর তাকে দেখাতে পারব নি। এ কালামুখীর পাপের কি শেষ আছে মা! যত শুনতিছি তত বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে যাচ্ছে। বলি এসবই তো তোলা থাকতেছে গো। এর শেষ কি রমনি উঠবে!'

এবার শ্যামা আর থাকতে পারেন না, সোজাসুজি প্রশ্ন করেন, 'তা কী হয়েছিল বাছা একটু শুনতে পাই না? কী এমন করেছিল ও, যে, এত বড় শাস্তিটা তোমরা দিলে?'

মোক্ষদা মাথা নামাল এবার। আঁচলের প্রান্তে বাঁধা গুলের কৌটোটা খুলে হাতে নিয়েছিল, সেটাও বাঁ-হাতে ধরা রইল। কৌটো খুলে গুলটুকু মুখে দেবারও যেন উৎসাহ রইল না তার। হেঁট মুখে কিছুক্ষণ একটা নারকেলপাতার ডগা নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর বললে, 'তা মা করেছিল। আমার দোষ কম নয়, ষোল আনার রোপর রাঠারো আনা তা আমি মানতিছি—তবে দাদাবাবুও কাজটা খুবই গরিত করেছিল, তাতে কোন সন্দ নি। তুমি ছেলেমানুষ, এখনও রিস্কুলে পড়তেছ—তায় গরীব বামুনের ছেলে, নেকাপড়া শিখে নিজের রুন্নতি করতে গেছ—তোমার কী দরকার নৈবিদ্যির কলাতে হাত বাড়াবার? রন্যায় অবিশ্যি দিদিমণিরই বেশী—সে আমি একশ বার বলব—লেহ্য কথা বলতে মুকী ভয় পায় না তা নিজের বেলায়ই বা কি রপরের বেলায়ই বা কি—আসল কথা ফুটফুটে রাজপুত্তুরের মতো চেহারা হয়ে উঠেছিল তো দাদাবাবুর, বয়েস যা তার চাইতে যেন বেশী ছাওয়ালো হয়ে উঠেছিল গড়নটা—আর লোভ সামলাতে পারলে নি, নষ্ট করে বসল। তা তাও বলি, সেও তো দগ্দাচ্ছে কম নয়—চেরকালই ঐ আক্কশ মেয়ে-খেকো মিনসে মাতাল দাঁতাল বাপের বয়িসী সব বুকচাপা মানুষগুলো এনে বসিয়ে দিচ্ছে বৈ তো নয়—সাধ-আহ্লাদ বলতে তো কোন দিন একটা মিটতে দেয় নি। কখনও কোথাও কি যেতে পেরেছে? গয়না গড়িয়ে দিয়েছে তো মাথা কিনেছে একেবারে, সে গয়না যদি কাউকে দেকাতেই না পারলে তো লাভ কি মা বলো! বলি এই কলকেতা শহরে যে এতটা কাল কাটিয়ে গেল তা এই শহরটাই কি কোনদিন ঘুরে দেখেছে, কেমন গমগমা শহরখানা! বাড়ির বাইরে পা দেবার তো হুকুম ছেল না গা। বাবুরো যত না হোক ঐ মেয়ে-খেকো মিন্সের শাসন যে আরও বেশী, সব্বদাই পেরানে ভয় যে মেয়ে পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই তো দুঃখু করে বলত—মুকী, রেতকাল এখানে কাটল; জন্মকম্ম! সব এখেনে—তা একদিন চিড়িয়াখানা মরা-সোসাইটি পজ্জন্ত দেখা হ'ল না! জন্মের মধ্যে কম্ম, কাশী যাবে বলে বায়না ধরেছিল সে জামাইবাবুর কাছে—সে আজীও হয়েছিল, কিন্তু ওর বরাতে নি, পট্ করে মরে গেল। আর হ'ল নি কাশী

যাওয়া। গেলে আমারও হ'ত—মুকী ছাড়া তো যেত নি সে। এ বাবু তো যমের দূত, দস্যি একেবারে—সদরের চৌকাট ডিঙোবার হুকুম ছেল না এর আমলে।'

স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলেন শ্যামা। ওর এই অনর্গল বাক্যস্রোতের মধ্যে থেকে সার যেটুকু সেটুকু নিতে পেরেছিলেন তিনি—আর তা-ই যথেষ্ট। বাকী কথার অর্ধেকও কানে যায় নি, তিনি চুপ ক'রে বসে ভাবছিলেন ঐ কথাটাই। তাঁর রাজপুত্রের মতো রূপবান ছেলে পেয়ে সে নষ্ট করেছিল! ডাইনী! ডাইনী চুষে খেয়েছে তাঁর ছেলেকে—তাই অমন ডাইনীচোষা কঙ্কালসার চেহারা হয়েছে ওর। গলায় দড়ি দিয়েছে, বেশ হয়েছে। গলায় দড়ি দেওয়াই উচিত। জন্মে জন্মে যেন গলায় দড়ি দেয়—তবে যদি এ অপরাধের স্খালন হয়। যে অনুতাপটুকু ছিল তাঁর এ কদিন ঐ চিঠিখানা দেবার জন্য, সেটুকু নিঃশেষে দূর হয়ে গেল। অনুতাপের জায়গায় প্রচন্ড একটা আক্রোশ অনুভব করতে লাগলেন তিনি—নিষ্ফল অথচ সীমাহীন একটা রোষ। বিশ্বাস করে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন তার কাছে—সেই বিশ্বাসের এই প্রতিদান। বলতে গেলে মার বয়সী তুই—তুই এই কাজ ক'রে বসলি! তাঁর দুধের ছেলে—বয়স হ'লে কি হবে. মনে মনে এখনও শিশু রয়ে গিছল যে। দুনিয়ার কোন মন্দ জিনিস, মন্দ কথা জানত না—নির্মল ফুলের মতো অকলঙ্ক ছেলে তাঁর। সেই জন্যেই আরও সোজা হয়েছে কাজটা। কেমন ক'রে প্রবৃত্তিই বা এল তার। ছি ছি! ঐ জন্যেই বলে নষ্ট মেয়েমানুষের ছায়া মাড়াবে না। ঐ জন্যেই তিনি শুনে অত রাগ করেছিলেন। তিনি ঢের বেশী মানুষ চিনতেন।...

ছেলের ওপরও রাগ তাঁর কম হ'ল না। এই কান্ড ক'রে বসে আছেন বাবু। তাই মুখে রা নেই. তাই চুপচাপ। তাই কথা তুললেই কেবল চোখে জল। বলবেই বা কি! বলবে কোন্ মুখে। এই বয়সেই এই! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! ছেলের বাইরের শান্ত সরল চেহারা দেখে ভুলেছিলেন তিনি—ভুলে গিয়েছিলেন কোন্ বংশের ছেলে ও। বাপজেঠার নাম রাখবে না! যে ঝাড়ের বাঁশ সেই ঝাড়ের মতো না হ'লে চলবে কেন! সরকার-গিন্নী ঠিকই বলেন, ভাতার থেকে যার সুখ হ'ল না, তার সুখ আর এ জন্মে হবে না! ভেবেছিলেন এই ছেলে তাঁর মানুষের মতো মানুষ হয়ে মার মুখ উজ্জ্বল করবে। সেই বরাতই তাঁর বটে!......

বাইরে কথা বলার আওয়াজ পেয়ে কনক বেরিয়ে এসেছিল। অপরিচিত মানুষ দেখে সে ভেতরে চলে গেল বটে কিন্তু শ্যামার এবার চমক ভাঙ্গল। নির্জন নিস্তব্ধ দুপুরে গলার আওয়াজ বহুদূর যায়। ছেলেকে তিনি কোথায় পাঠিয়েছিলেন তা আর বিজ্ঞাপন ক'রে জানাবার দরকার নেই পাড়ার লোককে।

তিনি চাপা তিক্ত কণ্ঠে বললেন—অন্তরের বিষ কিছুতেই গোপন করতে পারলেন না—অনেক চেষ্টাতেও, 'যাক গে বাছা, তুমি একটু গলা নামিয়ে কথা বলো দিকি, ব্যাগত্যা করি। এ সব তো আর ঢাক পিটিয়ে বলবার কথা নয়। ভদ্দরলোক বামুনের ঘরের মেয়ে হয়ে যে কাজ করত তোমার মনিব সেটা আর না-ই শোনালে পাঁচজনকে। আমরা পাঁচটা কুটুম নিয়ে ঘর করি—তা ছাড়া এ হ'ল কুটুম-বাড়িরই কেচ্ছা। কুটুমের কুটুম তো—মেয়ের ননদ!'

অপ্রতিভ হয়ে পড়ে মোক্ষদা। যথাসাধ্য গলা নামিয়েই বলে, 'তা যা বলেছ মা, লেহ্য কথা। এ সব কি আর লোককে বলবার না জানাবার! আপনাদের এ হ'ল গে চোরের মার কান্না, মুখ বুজে সব সইতে হবে!'

শ্যামাও একটু নরম হয়ে আসেন। এখনও সবটা জানা যায় নি। রহস্যটা পুরো পরিষ্কার হয় নি এখনও। তিনিও অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে বলেন, 'তা নষ্টই যদি

করেছিল—তুমি যা বলছ যদি সত্যিই হয়—ওকে চোখে লেগেছিল মনে ধরেছিল বলেই তো করেছে কাজটা—তা তবে ওর অমন সব্বনাশটা করলে কেন? এ আবার কেমন-ধারা ভালবাসা?'

'সে কি করেছে? করেছে তো ঐ দস্যি, ঐ দত্যি-দানোটা!' ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে মোক্ষদা, 'আমি কি ছাই তখন বুঝেছি যে ওর ভাল-মানুষির মধ্যে রেত কাণ্ড আছে, ওর ভেতরে ভেতরে এত মৎলব ঘুরছে। আমি ভেবেছি রমন চোরের মার মেরে—আধমরা করেই তো ফেলেছিল বলতে গেলে—বুঝি মনে একটু দয়া হয়েছে। ছেলেটা যাতে আবার দাঁড়িয়ে যায়, ক'রে খেতে পারে, সেই জন্যে ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে একটা ভাল ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছে। সে যে অমন দেশ—এমন সাংঘাতিক ম্যালোয়ারী রোগ সেখেনে—তা কেমন ক'রে জানব মা! তা হ'লে কি আর আমি দাদাবাবুকে যেতে বলি সেখানে—আমিই তো বারণ করতুম!'

'মেরেছে! মেরেছে ওকে—আমার ছেলেকে!' আড়ষ্ট বিহ্বল কণ্ঠে বলে ওঠেন শ্যামা। যেন বিশ্বাস হয় না কথাটা তাঁর।

'সে কি একটু-আধটু মার মা। আমরা সব্বাই মিলে গিয়ে না পড়লে বোধহয় দুজনকেই খুন ক'রে ফেলত। শুধু কি দাদাবাবুকে—নিজের আঁড়কেও এহাই দেয় নি।'

'এতবড় আস্পর্দা—বামুনের ছেলের গায়ে হাত তোলে! কী ভেবেছে, মাথার ওপর চন্দ সুয্যি নেই!' শ্যামা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'কী জাতের লোক সে?'

তাঁর সেই আগুনের শিখার মতো মুখ-চোখের দিকে চেয়ে মোক্ষদা যেন গুটিয়ে যায়। বেশ একটু ভয়ে ভয়েই বলে, 'তা জানি না মা, বলে তো দত্ত। তা দত্ত তো শুনেছি কায়েতও হয়, বেনেও হয়। কী দত্ত তা জানি নি!'

'ফল পাবে। আমি যদি যথার্থ বামুনের মেয়ে হই—আর ও-ও যদি বামুনের ঘরে সতীর পেটে জন্মে থাকে তো এর ফল পাবে সে, দেখে নিও।'

মোক্ষদার মুখ বিবর্ণ থেকে বিবর্ণতর হতে থাকে ক্রমশঃ। সে আস্তে আস্তে বলে, 'পাবে কি মা, পেয়েছেই তো শুনছি। দিদিমণি গলায় দড়ি দেবার পর থেকেই নাকি পাগলের মতো হয়ে গেছে। খায় না দায় না, কারো সঙ্গে কথা বলে না—রাপিসেও নাকি যায় না, গুম্ খেয়ে এক জায়গায় বসে থাকে!'

'হবে না!' যেন বিজয়গর্বে বলে ওঠেন শ্যামা, 'আমার ছেলের গায়ে হাততোলা, আমার ছেলের এমন সর্বনাশ করা—এর শোধ উঠবে না! এখনই হয়েছে কি, ওরও—তোমাদের ঐ দত্তবাবুরও অপঘাত মৃত্যু হবে দেখে নিও!'

তারপরই কথাটা মনে পড়ে যায়, 'তা সে টের পেলেই বা কী ক'রে। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যেই কেউ চুক্‌লি খেয়েছে!' বলতে বলতে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চান মোক্ষদার মুখের দিকে। ওর সেই প্রথমকার অনুশোচনামূলক কথাগুলোর সঙ্গে এই ঘটনার একটা যোগসূত্র বুঝি খুঁজে পান এতক্ষণে।

আবার নিজের দুই গালে চড় মারতে থাকে মোক্ষদা, হাউ-মাউ ক'রে ওঠে একে-বারে, 'হেই মা, আমি তোমার রবোধ সন্তান মা, তুমি সাক্ষেত দেবতা, হেই মা, মন্যি দিও না, দোহাই তোমার। আমি নরকের কীট মা, এমনিই নিজের সব্বনাশ নিজে করেছি—তার রোপর শাপ-মন্যি দিও না মা, তোমার পায়ে ধরতিছি!'

'চুপ চুপ, আবার চেঁচায়!' প্রায় ধমক দিয়ে ওঠেন শ্যামা।

'না মা চেঁচাই নি। চুপি চুপি বলতিছি! সে বেইমানী আমিই করেছি মা, স্বীকার পাচ্ছি। এদান্তে দিদিমণি বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল, দাদাবাবুকে নিয়ে

র্‌দ্রমত্ত হয়ে উঠেছিল একেবারে। তাই দেখেই যে কী ইষ হলো মা, মাথায় যেন অক্ক চড়ে গেল ক্রেমশ। ইষ হ'লো যে, খেতে পেত না, ভিখিরীর ঘরের ছেলে এসে মনিবের মনিব সেজে বসল। আরও ভয় হল মা—মিছে কথা বলব নি, তুমি মা সাক্ষেত ভগবতী তা আমি ব্‌ঝে নিয়েছি, তোমার কাছে মিছে বলে পারও পাব নি—মনে মনে ছেল যে, দিদিমণির তো ছেলেপ্‌লে হ'ল্‌ নি, পয়সায় দ্‌ক-দরদও নি, যা পাব দ্‌য়ে নোব, দেশে বেশ গ্‌ছিয়ে দোব মেয়ে-জামাইকে—এখন ভয় হ'ল যে দাদাবাব্‌র রোপর যা টান কোন্‌ না ওকেই যথাসব্বস্ব দেবে—যা জামার রোপর জামা, কাপড়ের রোপর কাপড় দিচ্ছিল, জ্‌তোই তো দাদাবাব্‌র জমেছিল কম করে ছ জোড়া—তা এত দিয়ে কি আর আমাদের কপালে কিছ্‌ বাকী থাকবে! তারপর তো ক্রেমশ দাদাবাব্‌রও চোখ খ্‌লবে, কোন্‌ না পাওনাগণ্ডা ব্‌ঝে নিতে শিখবে সে। তখন আমাদের টাকা দেওয়াও বন্ধ করবে—যা বাঁচবে তা ওরই থাকবে, এই কথাটা যদি বোঝে অযথা খরচ কি আর করতে দেবে? আর দিদিমণির যা অবস্থা—সে তো তোমার ছেলের কথায় ত্যাখন উঠতেছে বসতেছে। দাদাবাব্‌র কথা তো বেদবাক্যি একেবারে। এই সব সাত-পাঁচ ভেবেই জামাইবাব্‌কে কথাটা আমি নাগিয়েছিল্‌ম। ডান হাতে করে গ্‌ গ্‌লে খেয়েছিল্‌ম। হেই মা, আমাকে রেবারের মতো ঘাট করো মাপ করো মা—আমার যা সাজা তা আমিই ভোগ করতিছি। এর রোপর তুমি আর মন্যি দিও নি। একটা মেয়ে নিয়ে আমি ঘর করি মা।'

'মন্যি আমাকে দিতে হবে না মা, আর আমি কেনই বা দেব, আমারও অদেষ্ট, নইলে এমন হবেই বা কেন—নষ্ট মেয়েমান্‌ষের কাছে ছেলে কেউ কখনও পাঠায়—' আস্তে আস্তে বলেন শ্যামা, 'তবে বাছা বেইমানীর দেনা তোমার তোলা থাকল, সে আমি মন্যি দিই না দিই—সে দেনা তোমাকে শ্‌ধতেই হবে! এর স্‌দস্‌দ্ধ উশ্‌ল দিতে হবে একদিন!'

যেন শিউরে ওঠে মোক্ষদা। বলে, 'আমি এতটা ভাবি নি মা সত্যি বলতিছি। তাও ম্‌খে ঠিক বলি নি, একট্‌ রিসারা দিয়েছিল্‌ম মাত্তর। তাই থেকেই যে এত কাণ্ড হবে—তিল থেকে তাল—এমন সব্বনাশ হয়ে যাবে—কেমন করে জানব মা!'

চ্‌প করে থাকেন শ্যামা। সামনের এই প্রায় কু'কড়ে-বসে-থাকা মান্‌ষটা সম্বন্ধে যেমন একটা অপরিমিত ঘৃণা বোধ হ'তে থাকে, তেমনি একটা অন্‌কম্পাও অন্‌ভব না করে পারেন না। কী তুচ্ছ ঈর্ষার বশে নিজেরই এতবড় অনিষ্টটা করে বসে রইল! অকারণ, অম্‌লক ঈর্ষা—যার কোন ভিত্তিই নেই—তাইতেই পাগল হয়ে নিজের সবচেয়ে বড় আশ্রয়টা নিজেই প্‌ড়িয়ে দিলে। ওর চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে! নিজেরও অনিষ্ট করল আর সেই সঙ্গে তাঁরও অতিবড় সাধে এমন বাদ সাধল।

খানিক পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শ্যামা যেন আবার কতকটা স্বাভাবিক হন। বলেন, 'তা আজ কী মনে ক'রে এসেছ বাছা এখানে—সে কথাটা তো এখনও বললে না। এই সব স্‌খবর দিতে নিশ্চয়ই গাড়িভাড়া করে এত দ্‌রে আসো নি। ব্যাপারটা কি খ্‌লে বলে ফেল। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে, এবার উঠতে হবে!'

মোক্ষদাও এবার যেন একট্‌ প্রকৃতিস্থ হয়। সামনে আর একট্‌ এগিয়ে এসে আরও ফিসফিস ক'রে বলে, 'হ্যাঁ গো মা—এসব কথা বলতে কি আর আসে মান্‌ষ, কথায় কথায় বেরিয়ে গেল তাই! বলছিল্‌ম কি দাদাবাব্‌র নেয্য পাওনা অত বড় সম্পত্তিটা রমনি রমনি ছেড়ে দেবে? একবার লড়ে দেখবে না? এদিকে তো বলতেছ ছেলে ঐ কাজের বার হয়ে গেল—ওজগার ক'রে খাবার ভরসা তো আর অইল না— তা একদিক দিয়ে ক্ষেতিটা প্‌ষিয়ে নাও। সম্পত্তিটা তো বড় কম না—পেলে ঐতেই সারা

জীবন কেটে যাবে ওর!'

সম্পত্তি!

ছিলে-কাটা ধনুকের মতো সোজা হয়ে বসেন শ্যামা, শব্দটা শোনবামাত্র।

তীক্ষ্ম কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, 'সম্পত্তি? কিসের সম্পত্তি? ওর আবার সম্পত্তি এলো কোথা থেকে?'

'তাই বলতেই তো আমার আসা গো! একখানা সেই কী চিঠি গেল না—তাতেই দাদাবাবুর বিত্তান্ত সব জানতে পারলে তো—আমাকে বলে নি কিছু দিদিমণি, তবে আমি বুঝেছি মা, সে চিঠি আপনিই দিয়েছিলে, ও আমি ঠিক ধরতে পেরেছি। আর কে এমন কড়া চিঠি লিখবে বলো। পড়তে পড়তেই মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল, দুচোখ দিয়ে দর-দর ক'রে জল ঝরতে লাগল। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, মুকী এত ক'রেও তোদের আশা মেটে নি, তোরা তাকে সেখানে মরতে পাঠিয়েছিলি! ...তাতেই তো জাননু যে দাদাবাবুর খবর দিয়ে কে চিঠি নিকেছে। তা সে তুমি ছাড়া আর কে নিকবে বলো গরজ করে।......সেই যা একবার একটা কথা মুখ দে বার করেছিল, তারপরই একেবারে যেন কাঠ হয়ে গেল। অত তো জানত না, জানে সেখেনে আছে, লেখাপড়া করতেছে—ভালই আছে, কেমন আছে কী বিত্তান্ত তা তো আর জিজ্ঞেসা করবার সাহস ছিল না, কাউকে দিয়ে যে খোঁজ করাবে সে জোও নি। বাপ তো ঐ চণ্ডাল। সরকারকে জিজ্ঞেস করবে—সে যদি আবার নাগায় বাবুর কাছে!...... তা সে যাক গে, চিঠি পেয়ে গুম্ হয়ে অইল সারাদিন। বিকেলে উঠলে নি, গা ধুলে নি, মাথা বাঁধলে নি—কিচ্ছু না। আমি বলতে গেনু—তা বললে, ফের যদি আমার দিক করতে রাসিস তো আমি এক্ষুনি ঐ ফলকাটা ছুরিখানা গলায় বসিয়ে দোব!

'আত্তিরে বাবু এল—তা ওপরের ঘরে গে একটা চাদর মুড়ি দে পড়ে অইল। সেই যে-ঘরে দাদাবাবু থাকত গো—সেই চৈকীর রোপরেই পড়ে অইল, সারাআত। বাবুকে বলে পাঠাল শরীর বেস্তর খারাপ, কেউ যেন না দিক্ করে। বাবু নিজে এল, মুখের রোপর থেকে চাদর না সরিয়েই বললে, আমার বাড়ি আমার ঘর—তোমার পয়সাতেও এ বাড়ি কেনা নয়—তা আমার শরীর খারাপ হ'লেও কি সেখানে আমি এক জায়গায় শান্তিতে পড়ে থাকতে পারব নি নাকি?......অমন কথা বাবু এর পুব্বে আর কখনও শোনে নি, সে হকচকিয়ে ভয়ে ভয়ে চলে গেল। বোধ হচ্ছে যে কত্তা-বাবুকে গে নাগিয়ে থাকবে, কত্তাবাবু আসতেছিল, আমি বারণ কনু। বনু যে, একেবারে ক্ষেপে আছে এখন যেও নি, কারুর কথা মানবে নি, হিতে বেপরীত হবে। তা কত্তাবাবু বুঝল। চলে এল চুপি চুপি।...তা সেই পর আত ঝাঁঝাল, উঠল নি, খেলো নি, মুখে একটু জল দিল নি। পরের দিনও তাই। খুব করে বলতে, হাতে পায়ে ধরতে উঠে শুধু এক কাপ চা খেয়েছিল। তারপর দোপর বেলা হঠাৎ কী মনে করে উঠল, নিজের ঘরে কাগজ কলম টেনে নিয়ে খস খস ক'রে কি নিক্‌ল—এক-খানা চিঠি এমনি খামে আঁটল, আর একখানাতে সই করার পর আমাকে আর ঠাকুর-কে বললে সই দিতে দুটো—তা আমি তো সই করতে জানি নি, টিপ দিনু। বনু এ কি সব নেকন গা, তা বললে, আমি যদি মরে যাই, এই বাড়ি আর আমার যা-কিছু আছে কান্তি পাবে, এ সব তারই অইল। আমার তেখুনি সন্দ হ'ল—বনু তা এখুনি মরার কথা কেন গা? বললে, মানুষের মরণ-বাঁচনের কথা কি কিছু বলা যায় মুকী! আগে ভাবতুম আমি মরে গেলে ওরা তাকে দেখবে—এখন তো দেখছি সবাই শত্তুর। সে মানুষটা কাজের বার হয়ে গেল, এরপর খাবে কি? য্যাদ্দিন বাঁচি না হয় কিছু কিছু পাঠালুম—আমি মলে ত্যাখন? তা আমিও তাই বুঝনু। তখন কি জানি ওর

মনে এই মতলব আছে, তাহলে কি সংগ ছাড়ি! আমাদের বিদেয় দিয়ে ঘরে গে খিল দিলে, বললে, সমস্ত আত ঘুম হয়নি কাল, এখন একটু ঘুমোব, সঞ্জের আগে যেন কেউ না ডাকে! ব্যস—তারপর সঞ্জে ছেড়ে আত হ'য়ে যায় দেখে ডাকতে গেনু তা সাড়াও নি শব্দও নি। ত্যাখন গিয়ে কত্তাবাবুকে ডাকি। তিনি এসে দারোয়ান ডাকে। দারোয়ান দোর ভেঙে দ্যাখে ঐ কাণ্ড!'

রুদ্ধশ্বাসে শুনছিলেন শ্যামা। মোক্ষদা থামতে প্রায় অসহিষ্ণু ভাবেই বলে ওঠেন, 'তারপর?'

'বলছি গো মা দাঁড়াও, একটু দম নি।......ঐ ব্যাপার দেখে আমরা তো হাহাকার ক'রে উঠনু—ঐ পিশাচ ঐ মেয়ে-খেকোর কিন্তু কি শকুনের দিষ্টি—ওর নজরে ঠিক পড়েছে দুখানা খাম। আমরা কেউ দেখবার আগে কি হাত দেবার আগে যেন ছোঁ মেরে তুলে নিলে খাম দুখানা। তারপর দারোয়ানকে পুলিশ ডাকবার আর সরকারবাবুকে দত্তসাহেবের ওখানে খবর দেবার হুকুম দিয়েই এক ছুটে চলে গেল নিজের ঘরে।

'তারপর?' শ্যামা যেন পুরোপুরি অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তাঁর আর একটুও দেরি সইছে না।

'তারপর পুলিশ যত কালে এসে পেঁছিল ততকালে সে চিঠি গাব হয়ে গেছে। একখানা খাম শুধু বার ক'রে দিলে মিন্‌সে পুলিশের হাতে। তাতে শুধু নাকি ছিল যে আমি নিজের খুশিমতো মরতিছি, রপর কাউকে না কেউ দায়িক করে। যে চিঠিতে দাদাবাবুর বিষয়-আশয় পাবার কথা নেকা ছেল, সেই যে রুইল না কি বলে, তার নামগন্ধও অইল না।'

'তা তোমরা কেউ কিছু বললে না?' উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করেন শ্যামা।

এ যা শুনছেন, এ যে অভাবনীয় অচিন্তিত। কলকাতার বাড়ি একখানা, বিশেষ যে বাড়ির বর্ণনা তিনি শুনেছেন, খুব কম করেও চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম! ও পাড়ায় ভাড়াও বেশী, ভাড়া দিলে এখুনি কোন্ না দেড়শ দুশ' টাকা ভাড়া উঠবে। এত বড় সম্পত্তি—তাঁর কাছে কুবেরের ঐশ্বর্য বলতে গেলে—হাতের কাছ পর্যন্ত এসে বেরিয়ে গেল—তাঁরা একবার কথাটা জানলেন না পর্যন্ত!

'বলেছিলুম বৈকি মা! পুলিশের কাছে পষ্ট পষ্ট বলেছিলুম। তা কত্তাবাবু যে এধারে ঠাকুর মিন্‌সেকে ভেতরে ভেতরে কড়কে একে দিয়েছে তা তো জানি নি—নিস্‌পেক্টার জিগ্যেস করতেই একেবারে ঝেড়ে জবাব দিলে, তার কিছু মনে নি। আমি বলে ফেলে বেকুব। নিস্‌পেক্টার উল্‌টে আমাকেই ধমক দিলে, বললে —রেমন ধারা মিছে কথা বললে তোমাকে বেঁধে নে যাব। বুঝব নিশ্চয় তোমার যোগসাজস আছে এ মরার সংগে। তোমরা খুন ক'রে ঝুলিয়ে রেখেছ কিনা তার ঠিক কি!...শুনে ভয়ে মরি, আর আ কাড়তে প্যারলুম নি। তারপর দারোয়ানের মুখে শুনি যে কত্তাবাবু গোছা ক'রে নোট গুঁজে দেছে নিস্‌পেক্টারের হাতে। সে ত্যাখন ষোল আনা কত্তাবাবুর দিকে!'

'তা ঠাকুর অমন মিছে কথা বললে কেন? সে তো শুনেছি তোমার হাতের লোক?'

বলে ফেলেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন শ্যামা। এসব নোংরা কথা পাড়া তাঁর ঠিক হয় নি।

কিন্তু মোক্ষদা খুব সহজভাবেই নিলে কথাটা, 'হ'লে কি হবে মা, এর জন্যে ফৈজত কি কম ক'রেছি তারে। তা বলে যে কত্তাবাবু বললেন—এসব কথা যদি রুচ্চে-

বাচ্য করো তো আমি পেরমাণ ক'রে দেব, তোমরা সেই নষ্ট দুষ্টু ছোঁড়ার সঙ্গে যোগসাজস ক'রে বাড়িখানা নিখিয়ে নিয়ে মেয়েটাকে আমার খুন করেছ! তোমাদের দুজনারই ফাঁসি হয়ে যাবে তাতে।......সেই ভয়েই সে আর ও কথা তোলে নি।'

তারপর আরও গলা নামিয়ে শ্যামার কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'কিন্তুক আমি শুনেছি মা, দু'জন সাক্ষী থাকলেই এসব মামলা জজে মেনে নেয়। ঠাকুরকে আমি বুঝিয়ে বলেছি, সে আদালতে গিয়ে যা সত্যি সব বলবে ঠিক-ঠিক।......তাতে বাড়িখানা রাদায় করতে পারবে না? হ্যাঁ মা?'

কোথায় সামান্য একটুখানি আশা যেন মাথা তুলেছিল শ্যামার মনের মধ্যে, এতক্ষণ ধরে বুঝি নিজের অগোচরেই তাকে জীইয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন তিনি, কিন্তু আর সেটা বাঁচানো সম্ভব হ'ল না। আশার সেই ক্ষীণ অঙ্কুরটি কিশলয়ের রূপ নেবারও আগে শুকিয়ে মরে গেল!

এই! এতক্ষণ ধরে এইটুকু শোনাবার জন্যেই এত ভণিতা! আইন-আদালত কিছু না বুঝলেও এটুকু সাংসারিক জ্ঞান তাঁর আছে যে, এই সামান্য অবলম্বন ভরসা করে মামলার দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া তাঁর না আছে সহায়, না আছে সম্পদ। এতবড় বিষয় ও-পক্ষ সহজে ছাড়বে না। তাদের সঙ্গে তিনি লড়বেন কী দিয়ে আর কী নিয়ে! এ দু'জন সাক্ষী কতক্ষণ ধোপে টিকবে তারই বা ঠিক কি। ধমকে যা হয়েছে ঘুষ দিয়ে তা আরও সহজে হবে। এরাই হয়ত সাফ উড়িয়ে দেবে কথাটা।

মনের হতাশা বিরক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সে বিরক্তি কণ্ঠস্বরে উপ্‌চে ওঠে যেন, 'তা বাছা, তুমি এই বাজে কথাগুলো বলবার জন্যেই কি এত পয়সা খরচ করে এসেছ, না অন্য মতলব আছে?'

এতখানি আশার বাণী শোনাবার পর—অন্তত তার কাছে আশার বাণীই—এতটা তিক্ততা আশা করে নি মোক্ষদা। মনে মনে অনেক স্বপ্ন দেখেছে সে ইতিমধ্যে, এই বিষয়টা পাইয়ে দিলে মোটা কিছু আদায় করতে পারবে কান্তি-দাদাবাবুর কাছ থেকে, হয়ত আগেও কিছু পাবে—জরুরী সাক্ষী হাতে রাখার জন্যে। সে জায়গায় এই সম্ভাষণ। সে যেন থতমত খেয়ে চেয়ে রইল শুধু শ্যামার মুখের দিকে।

শ্যামার কণ্ঠ অধিকতর রুক্ষ হয়ে ওঠে, 'বলি আমরা তো পাগলও নই আর ছন্নও নই যে তুমি এই কথা বলবে আর আমরা ধেই ধেই করে নেচে উঠব। দলিল নেই, পত্তর নেই—তোমরা এই দুজন ছাড়া কাকে-বকে কেউ জানে না, তাও পুলিশের কাছে একজন কবুল জবাব দিয়েছ যে কিছু জান না—তোমার কথাও পুলিশে নিশ্চয় লিখে নেয় নি—এতবড় মামলাটা করতে যাব কিসের জোরে? লোকে যে আমাদের গায়ে ধুলো দেবে—কেউ কি বিশ্বাস করবে? তারপর তোমরা আজ এই বলছ, কাল হয়ত কত্তাবাবুর কাছ থেকে টাকা খেয়ে কি ধমক খেয়ে উল্‌টো কথা বলবে—তখন মিথ্যে মামলার দায়ে জড়িয়ে পড়ব। না বাছা, আমরা বোকা লোক বটে, তাই বলে এত বোকা নই। তুমি এখন নিজের পথ দেখ—ওসব কথা আর তুলো না!'

অনেকক্ষণ অভিভূতের মতো বসে থাকার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলে নড়ে-চড়ে বসল মোক্ষদা। গুলের কৌটোটা তখনও পর্যন্ত হাতে ধরাই রয়েছে, তা থেকে গুলটুকু বার ক'রে মুখে দেবারও ফুরসুৎ হয় নি। কিন্তু সে কথা তখন আর মনেও পড়ল না! বরং কৌটোটা আবার যথাস্থানে বেঁধে আঁচলের অপর প্রান্তে বাঁধা এক টুকরো কাগজ বার ক'রে আল্‌তো শ্যামার সামনে রেখে দূর থেকে গড় হয়ে প্রণাম করল। তারপর হাত জোড় ক'রে বলল, 'আমি পাপী তাপী মানুষ, আপনি

বামুনের মেয়ে যা বলেছ তা শোভা পেয়েছে। তবু বলি, কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিও নি। বড় ছেলে বাড়ি আসুক, তার সঙ্গে সল্লা-পরামর্শ কর। যদি মত হয়—এই আমার ঠিকানা অইল, এখন এইখেনেই আছি, আমার এক দেশের নোকের বাড়ি। ও বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি সেই দিনই। ঠাকুর পোদ্দারমুখো আর এক বাড়ি কাজ ধরেছে—তা তার ঠিকানাও আমি জানি। আমাকে এক নাইন নিখে দিলেই আমি ছুটে চলে আসব মা। কাকের মুখে বাত্তাটা শুধু পেঁছে দিও।'

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একটু এদিক-ওদিক চেয়ে বললে, 'বুকটা একেবারে শুকিয়ে উঠেছে মা, অব্যেস তো নেই, ওন্দূরে রেতটা পথ হেঁটে এসেছি, পিপাসাটা বড্ড নেগেছে। এক ঘটি জল পাব মা?'

এবার শ্যামা রীতিমতো অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। এটা তাঁরই আগে ভাবা উচিত ছিল। যা-ই ক'রে থাক, কুটুমবাড়ির ঝি, তাঁর কাছে এসেছে, শত্রু হ'লেও আতিথেয়তার ত্রুটি ঘটতে দেওয়া ঠিক নয়। তিনি তাড়াতাড়ি বঁটিটা সরিয়ে উঠে এসে দোরের কাছ থেকে কনককে ডাকেন, 'বৌমা, অ-বৌমা একঘটি খাবার জল দিয়ে যাও না মা। আর দ্যাখো দিকি কুণ্ডু বাড়ির সন্দেশ এক-আধটা পড়ে আছে কি না। নইলে আমার দরুন চালভাজার নাড়ু আছে, দুটো হাতে ক'রে নিয়ে এসো মা।' তারপর মোক্ষদার দিকে ফিরে কোমল কণ্ঠে বলেন, 'বোস মা বোস। জলটা খেয়ে ওঠো। আহা, তেষ্টা তো পাবেই, এতটা পথ এই খর রোদে হেঁটে আসা।...... আমারই মনে করা উচিত ছিল, তা আমার কি আর মাথার ঠিক আছে! একটু দেরি করো তো দুটো গরম ভাতও খেয়ে যেতে পারো—যা আছে বামুনবাড়ীর ডাল-ভাত!'

সে তো আমার মহাভাগ্যি মা, আপনাদের পেসাদ পাব। তবে আজ আর থাকতে পারব নি মা, বলা-কওয়া নেই, তারা ভাববে।'

জল খেয়ে আর একবার প্রণাম ক'রে মোক্ষদা চলে গেল।

'কে মা?' কনক প্রশ্ন করে।

মিথ্যা কথা বলতে পারেন না শ্যামা, কে জানে আড়াল থেকে শুনেছে কি না বৌ, একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'কান্তি যেখানে ছিল, সেই রতনের ঝি।'

প্রসঙ্গটা অপ্রিয় বুঝে কনক চুপ করে যায়—আর কথা বাড়ায় না।......

আশা যে নেই তা শ্যামা ভালরকমই জানেন, তবু হেম বাড়ি আসতে তাকে আড়ালে ডেকে সব কথা বলেন। মোক্ষদার শেষ কথাটাও জানিয়ে ঠিকানা লেখা কাগজটা হাতে দেন। তারপর—হেম কী বলবে তা অনুমান ক'রেও জিজ্ঞাসু উৎসুক নেত্রে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

হেম কাগজটা গুটি পাকিয়ে একেবারে উঠোনে ফেলে দিয়ে বলে, 'যত্ত-সব পাগলের কাণ্ড। কালনেমির লঙ্কা ভাগ করছে বসে বসে। কোথায় কি যে সে বুড়োর সঙ্গে মামলা লড়তে যাব! রেজেষ্টারী করা উইল হলেও না হয় কথা ছিল। টাকা দিলে নকল মিলত। এ দুটো লোকের মুখের কথা। তাও সত্যি বলছে কিনা তার ঠিক কি! হয়ত দুজনে সাজস করে এসেছে, যদি বিষয়টা আদায় হয় তো মোটা বকরা মারবে আমাদের কাছ থেকে। এবার এলে সোজা ঐ আগড়ের কাছ থেকে হাঁকিয়ে দেবো, বদমাইশ মাগী!'

এ সবই জানেন, জানতেন। তবু শ্যামার বুকের মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

কে জানে সত্যি কিনা। এতগুলো টাকার বিষয় হাতের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এসেও হাতে এল না। তাঁর কপাল যে। নইলে এমন বোকামি সে করবে কেন!

মেয়েটার মনে যদি এতই ছিল—উইলখানা খামে পুরে ডাকে পাঠিয়ে গলায় দড়ি দিতে পারল না!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

বহুকাল ঐন্দ্রিলার কোন খবর পাওয়া যায় নি। হাজার হোক মায়ের প্রাণ। মধ্যে মধ্যে শ্যামার বুকের মধ্যেটায় হু-হু করে ওঠে বৈকি। অস্থির হয়ে ওঠেন। সে অস্থিরতা আর কেউ লক্ষ্য না করলেও কনক করে। তবু সে যখন বলে, 'কী হবে মা ও পাগলের ওপর রাগ করে থেকে। একটা চিঠি লিখে দিন, চলে আসুক। মিছি-মিছি লোক হাসিয়ে আর দরকার নেই।' তখনই আবার কঠিন হয়ে ওঠেন শ্যামা, বলেন, 'না বৌমা, আর না। স্বেচ্ছায় এরেবেরে আর ঐ ঝগড়া ঘরে আনব না। লোক যা হাসবার তা তো হেসেছেই, আশ্‌ত-পরে কোথাও কি আর জানাজানি হ'তে বাকী আছে যে মেয়ে আমার রাঁধুনীগিরি করে খাচ্ছে! সেই যখন বিজ্ঞাপন হয়ে গেলই পুরোপুরি, তখন আর আমার কিসের দায়? থাক ও, যখন তেজ কমবে তখন আপনিই আসবে।'

কিন্তু ঐন্দ্রিলাও আসে না। তারও বোধহয় জেদ, মা না ডাকলে সে আসবে না। তবে সে যে সুখে নেই তা কনক জানে। এর ভেতর বহু বাড়ি বদল করল সে। কোথাও বেশীদিন টিকতে পারে না। শ্যামারা বলেন ঝগড়ার জন্যে—কনক জানে যে সবক্ষেত্রে তা নয়। অন্য কারণও আছে। আর হয়ত সেইটেই প্রবল।

আসে না সে, কিন্তু চিঠি লেখে। বিশেষ করে ঠিকানা বা মনিব বদলের সময়। কনককেই লেখে। শাশুড়ীর হুকুম নেই বলে কনক উত্তর দিতে পারে না। তবু ঐন্দ্রিলা চিঠি দিয়ে যায়। কেন, কিসের আশায়—তা কনক বোঝে। যদি কোনদিন এদের দরকার পড়ে, যদি কোনদিন এরা ডাকে। তাই ঠিকানাটা সর্বদা জানিয়ে রাখা। তবে সে চিঠিতে ভেতরের কোন কথা থাকে না। থাকা সম্ভব নয়, এক পয়সার পোস্টকার্ডে লেখা খোলা চিঠি। ভিতরের কথাটা অনুমান করে কনক। অবশ্য ভিত্তিও একটা আছে বৈকি। মধ্যে একবার মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য এসেছিল, কান্তির অসুখের খবর পেয়ে। শ্যামাকে প্রণামও করেছিল কিন্তু শ্যামা শুধু একটি শুষ্ক কুশল প্রশ্ন ছাড়া আর কিছু বলেন নি, সীতার কথাও জিজ্ঞাসা করেন নি। অন্তত সে দিনটা থেকে যেতেও বলেন নি। একেবারেই নিরাসক্ত উদাসীন ছিলেন। সেই সময়ই দু-চার মিনিটের জন্যে রান্নাঘরে এসে কনকের সঙ্গে দুটো কথা বলে গিয়েছিল। ওকে দেখেই রান্নাঘরে এসে ঢুকেছিল কনক, না জানি কি বাধবে এখনই। তবে বাধে নি কিছু। বাধতে পারত অনায়াসেই—কারণ ঐটুকু সময়ের মধ্যেই কান্তির প্রতি সমবেদনা উপলক্ষ্য করে অনেক বাঁকাবাঁকা কথা শুনিয়ে গিয়েছিল ঐন্দ্রিলা। কিন্তু এ পক্ষ থেকে কোন উত্তর না আসাতেই কলহটা জমতে পারে নি। শ্যামা একেবারে পাথরের মতো নীরব ছিলেন।

শ্যামার ধৈর্যে শুধু কনক নয়, ঐন্দ্রিলা সুদ্ধ অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেমন ভয়ও হয়ে গেল তার। মানুষের কাছ থেকে দয়ামায়া পাবার আশা থাকে, পাথরের কাছে যে কোন ভরসাই নেই। বলেছে সে যথেষ্ট। বিঁধিয়ে বিঁধিয়েই বলেছে: 'হবে না। হতেই হবে যে। আমি যে জানি। ঐ উনি, উনি যতদিন আছেন—কারুর ভাল হবে

না আমাদের বংশে। ঐ এক হতেই এ বংশের সর্বনাশ হবে। ঐ যে সর্বস্বখাকী ভালখাকী বসে আছেন, সব্বাইকে খেয়ে, সকলের সব্বনাশ করে তবে উনি যাবেন। লোভ, লোভ যে প্রবল। মেয়েছেলের অত লোভ কি ভাল? অতি লোভেই সব গেল। বড়লোক শুনেই অমনি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলে। তাদের বাড়ির অন্নদাস ক'রে। কী, না ছেলে লেখাপড়া শিখে তালেবর হয়ে আসবে। খুব হ'ল তালেবর বিদ্বান। জজ ব্যারিস্টার হয়ে এল একেবারে। এখন শুধু মাইনের টাকা বাজিয়ে তোলার ওয়াস্তা। তা তো নয়—নিজের খরচটা তো বাঁচল—আর যদি সে মাগীর নজরে পড়ে যায়—কিছু বাগিয়ে আনতে পারে! ঐ পয়সার লোভেই সব যাবে ওর। তা নইলে জলজ্যান্ত জামাইটা চলে গেল—পয়সার আন্ডিলের ওপর বসে আছে—তবু একটা আধলা বার করলে না। বলতে গেলে বেঘোরে মরে গেল জামাইটা। মেয়ের চুড়ি বাঁধা রেখে তবে টাকা বার করলে। ও কি মানুষ! চামার! চামারেরও অধম। ও চশমখোর মেয়েমানুষের মুখ দেখলেও মহাপাপ হয়।' ইত্যাদি—

কনক সেদিন খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল শ্যামার ধৈর্য দেখে। পাথরও তেতে ওঠে এসব কথায়—কিন্তু শ্যামা দুটি ঠোঁট ফাঁক করলেন না। ও'র রকম সকম দেখে মনে হ'ল যে এ সব কথা তাঁর কানেই যায় নি। অথবা আর কারুর কথা বলছে সে, অপরিচিত অন্য কোন লোক সম্বন্ধে।

ঐন্দ্রিলা অনেকক্ষণ একতরফা চেঁচামেচি করে বকে শ্রান্ত হয়ে এক সময় চুপ করে গিয়েছিল। তারপর আর বেশীক্ষণ থাকেও নি। থাকতে পারে নি। একটুখানি চুপ করে বসে থেকেই আস্তে আস্তে উঠে গিয়েছিল। নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল—শ্যামাকে বলে বা প্রণাম করে যেতেও সাহসে কুলোয় নি।

সেই দিনই গোটাকতক কথা ঐন্দ্রিলা বলে গিয়েছিল কনককে। খুলে কিছু বলে নি—সম্মানে বড় হ'লেও বয়সে ঢের ছোট কনক—যেটুকু আভাসে ইঙ্গিতে বলা যায় তাই বলেছে। তবে তা থেকে অনুমান করতে বাধে নি বাকীটা। যেখানে গেছে ঐন্দ্রিলা সেইখানেই প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে—ওর মেজাজ বা শাণিত রসনা নয়—অগ্নিশিখার মতো ওর রূপ। প্রথম যেখানে গিয়েছিল—মহার সেই কে কুটুমের বাড়ি—সেখানে সেই প্রবীণ উকীলবাবুটিও সামলাতে পারেন নি নিজেকে। সাত আটটি সন্তানের পিতা তিনি—পঞ্চাশের অনেক ওপরে তাঁর বয়স। তবু তাঁকে অনেকটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলছিল ঐন্দ্রিলা, তাঁর সদ্য-বিবাহিত বড় ছেলেটিও লুব্ধ হয়ে উঠল। —এবং সেটা তার স্ত্রীর নজর এড়াল না।...সেখান থেকে সে বাড়ির গৃহিণী নিজেই উদ্যোগী হয়ে ও'দের এক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠালেন। সেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। সেখানে আবার বাড়ির বড় জামাই ঘন-ঘন যাওয়া আসা আরম্ভ করলেন। একদিন গোপনে এক চিঠি পাঠালেন যে, ঐন্দ্রিলা যদি রাজী থাকে, ওকে তিনি বিধবাবিবাহ করতে সম্মত আছেন। আলাদা বাসা ভাড়া করে ওকে নিয়েই থাকবেন, এ স্ত্রীর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেন না। ইত্যাদি—। ঐন্দ্রিলা অনেক ভেবে চিঠিখানা বাড়ির গৃহিণীর হাতে দিল। ও ভেবেছিল যে এতে করে সে যে খাঁটি এইটেই প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু হ'ল হিতে বিপরীত। গৃহিণী ভাবলেন যে, ও-ই ফাঁদ পেতে তাঁর জামাইকে ভুলিয়েছে, মেয়ের সর্বনাশ করছে। তাছাড়া তিনিও স্বামী নিয়ে ঘর করেন। হাতের কাছে এমন বিপদ থাকা ঠিক নয়। ফলে তিনি এমনই কিচিকিচি শুরু করলেন যে. ঐন্দ্রিলা পালিয়ে যেতে পথ পেল না।

এইভাবে ইতিমধ্যেই চার-পাঁচ জায়গা বদল করেছে সে। সর্বত্রই প্রায়—এক কারণ। কোথাও বেশীদিন থাকা সম্ভব হয় নি। কাজ পেয়েছেও সে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই।

কিন্তু কনকের মনে হয় সে-ও ঐ কারণেই। কারণ রাঁধুনী চাকর বহাল করেন বাড়ির পুরুষেরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। মেয়েরা হলে ঐন্দ্রিলার মতো মেয়েকে চাকরি দেবার কথা ভাবতে পারত না।

এসব কথা শাশুড়ীকে বলতে পারে নি কনক। সঙ্কোচে বেধেছিল। বলেছিল সে হেমকে। বলেছিল, 'তুমি উদ্যুগী হয়ে মাকে বলে চিঠি লেখাও। কী করছ তোমরা, শেষে কী একটা কেলেঙ্কারী হবে! তোমাদের বাড়ির মেয়ে হয়ে রাঁধুনীগিরি করছে এই তো এক লজ্জার কথা, তার ওপর যদি নষ্ট হয়ে যায় মুখ দেখাতে পারবে?'

কিন্তু হেমও রাজী হয় নি। যদিও সে ইদানীং একটু সমীহ করতেই শুরু করেছিল কনককে—বিশেষত কান্তির ব্যাপারটার পর থেকে—কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার কথায় সায় দিতে পারল না। বলল, 'তুমি বুঝছ না, মা ঠিকই বলেছেন, এখন যেচে নিয়ে এলে আর রক্ষে থাকবে না। মাথায় চড়ে নাচবে একেবারে। তার ওপর যদি ঘুণাক্ষরেও কানে যায় যে আমিই সুপারিশ করেছি তাহ'লে তো কথাই নেই। এখন তবু আমাকে একটু ভয় করে—তখন তাও করবে না। কী দরকার যেচে অশান্তি ঘাড়ে করবার। তুমি যা ভাবছ অত কিছু হবে না, খেঁদি সে মেয়ে নয়। ওর আর যাই দোষ থাকুক, এক হরিনাথ ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের দিকে কখনও তাকায় নি সে, আর তাকাবেও না। ওকে নষ্ট করবে জীবন থাকতে, এমন পুরুষ মানুষ জন্মায় নি এখনও। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

এরপর আর কনকের কথা কওয়া যায় না। কীই বা বলবে সে? যাদের মেয়ে যাদের বোন তাদের চেয়ে কি আর সে বেশী বোঝে?

কনক যা ভেবেছিল—বিপদ সেদিক দিয়ে কিছু না এলেও অন্য দিক থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়ল।

ফাল্গুনের শেষের দিকে হঠাৎ একদিন ঐন্দ্রিলার মেজ দেওর শিবু এসে হাজির হ'ল.হাতে একখানা লাল কালিতে লেখা চিঠি। তখন সন্ধ্যা হয় হয়, পাতা কুড়নো শেষ করে সবে পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্যামা। শিবু হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এসে প্রণাম করল। খাটো কাপড় পরণে—তবু তাই-ই টানাটানি করে গুছিয়ে গায়ে দিতে দিতে পরিহাসের সুরে প্রশ্ন করলেন শ্যামা, 'কী গো, কি মনে করে? বেটার বিয়ে দিচ্ছ নাকি?'

চারদিক ঘোর-ঘোর হয়ে এলেও চিঠির লাল কালিটা তাঁর নজর এড়ায় নি।

শিবুও হাসিমুখেই জবাব দিল, 'বেটার নয়, বেটির।'

'বেটির! তার মানে?'

বেটার বিয়ে হবারও কথা নয়—কারণ শিবুর বড়ছেলের বয়স ন-দশের বেশি হবে না. কিন্তু বেটি আরও অসম্ভব. একেবারেই এই সর্বশেষ সন্তানটি মাত্র ওর মেয়ে—তার বয়স এক পুরেছে কিনা সন্দেহ। তাই সংশয়ে উদ্বেগে তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠ।

'ভায়ের মেয়ে আর নিজের মেয়ে কি আলাদা?' শিবু তখনও হাসিমুখেই বলে, 'আপনার সীতারই বিয়ে।'

ততক্ষণে কনক এসে রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে দিয়েছে—অভ্যস্ত আতিথেয়তায় শ্যামাকেও বলতে হয় 'বসো বাবা'. কিন্তু সেটা সত্যিই যন্ত্রচালিতের মতো বলেন তিনি। তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠছে। ঘরে গিয়ে এই খাটো এবং ভিজে কাপড়টা ছেড়ে আসবার কথাও তাঁর মনে পড়ে না। ওর ঐ অতি-সপ্রতিভ হাসি-হাসি মুখ দেখবার সঙ্গে সঙ্গে, কে জানে কেন, তাঁর মনে হয়েছিল যে খবর ভাল নয়, খুব ভাল

কোন উদ্দেশ্যে শিবু আসে নি। এখন সেই সংশয়টাই সমর্থিত হয় ওর কথায়।

তিনি তেমনি তীক্ষ্ম কণ্ঠেই পর-পর প্রশ্ন করে যান, 'সীতার বিয়ে? সে কি? কোথায়—কে ঠিক করলে? খোঁদি কোথায়? ছেলে কি করে?'

প্রশ্নগুলোর কোন প্রত্যক্ষ উত্তর না দিয়ে শিবু ভারিক্কি চালেই বলল, 'যোগাযোগ একটা আপনাদের আশীর্বাদে হয়ে গেল আবুই মা, তাই আর দেরি করলুম না। বিয়ে যেকালে আমাদেরই দিতে হবে, এ দায়ে যখন আর কেউ ঘাড় পাতবে না, সেকালে আমাদেরই ভেবে-চিন্তে ঠিক করা ছাড়া উপায় কি বলুন! ভায়ের সঙ্গে পরামর্শ করলুম, মায়ের মত নিলুম—আর বেশী লোককে জানাবার কি খবর দেবার তো সময়ও হ'ল না ; এই মাসের শেষ তারিখ পেরিয়ে গেলে এখন দু-মাস আর বিয়ের দিন নেই। সামনে চোত মাস, বোশেখে পড়ছে মলমাস! পাত্র বলেছে এই তারিখেই বিয়ে দিতে হবে, আমরা না দিই অপর মেয়ে তার হাতে আছে। সে আর অপেক্ষা করতে পারবে না। ভাল পাত্তর হাত ছাড়া করে এর পর আবার কোথায় খুঁজে বেড়াব বলুন, আমাদের তো আর এথির জোর নেই—কাজেই না বলতে ভরসা হল না। অগত্যা ঐ তারিখেই রাজী হতে হ'ল। তা ধরুন কালকেই বিয়ে।'

'কাল বিয়ে? সে কি! আর তোমরা আজ আমাদের জানাতে এসেছ? মামা জানল না, দিদিমা জানল না—আমরা এতটুকু মেয়ে থেকে মানুষ করলুম—তার বিয়ে ঠিক করে ফেললে তোমরা আমাদের না জানিয়েই? এ কেমন ধারা কথাবার্তা বাছা, কিছু তো বুঝছি না!'

মনের কুটিল সংশয় আর কণ্ঠে চাপা থাকে না, রাখার চেষ্টাও করেন না শ্যামা।

শিবুরও এবার নিজমূর্তি প্রকাশ পায়। সে বলে, 'হ্যাঁ, মানুষ আপনারা করেছেন তা ঠিক, তেমনি আবার সব দায়িত্ব চুকিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন এটাও তো ঠিক! কৈ, এই তো এতকাল বৌদি পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি করছে বলতে গেলে—মেয়ে তো আমাদের ওখানে পড়ে, এই তো ধরুন আধ ঘণ্টার রাস্তা—কৈ মামা দিদিমা একদিনের তরেও খবর নিতে গেছে বলে তো জানি নি!'

'কেন খবর নিতে যাব বাবা। সুখসমন্দা সে আমাদের না বলে-কয়ে মেয়ে নিয়ে চলে গেছে, আমাদের মত না নিয়েই—আমরা যাব সেধে তার খবর নিতে! আমরা কি যেতে বলেছি—না তাড়িয়ে দিয়েছি?'

'সে স্বেচ্ছায় গেছে!' খুব ভালমানুষের মতোই সায় দেয় শিবু, 'তবেই দেখুন! এই তো আপনার কথাতেই প্রকাশ পাচ্ছে, মেয়ের মা তাহ'লে চায় না যে মেয়ে আপনাদের দায়িত্বে থাকে। যে-কোন কারণেই হোক, মেয়ে সরিয়ে নিয়ে গেছে সে। এক-আধদিন রাগের মাথায় করার তো কথা নয়—ধরুন হয়েও গেল তো অনেকদিন। এর মধ্যে বহুবার এসেছে গেছে। ইচ্ছে করলেই আবার আপনাদের কাছে রেখে যেতে পারত। আজকালকার যা দিনকাল, পরের ঝক্কি কেউ যেচে স্বেচ্ছাসুখে ঘাড়ে করতে চায় না এটা তো বোঝেন। বিশেষ বিয়ের ব্যাপার, খরচার কথা। তবে আমাদের ঘাড়ে যেকালে ফেলে দিয়ে গেছে, সেকালে আমাদেরই সে ভার বইতে হবে, বংশের মেয়ে ফেলে দেওয়া তো চলবে না, দুর্নাম হ'লে তো আমাদেরই হবে, বলবে, অমুকের মেয়ে, অমুকের নাৎনী। তা আমাদের দায় যখন আমাদেরই বইতে হবে, কেউ ভাগ নিতে আসবে না—তখন অপরের মতামত নিতে যাব কেন বলুন, আর এর জন্যে এত কৈফিয়তই বা কিসের?'

বেশ বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে শিবু, বোঝা যায় যে সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

বোধহয় এই-ই প্রথম, অপমানিত হয়েও চুপ করে যেতে হ'ল শ্যামাকে, দেবার মতো উত্তর একটাও খুঁজে পেলেন না। তাঁর নিজের যুক্তিতেই তাঁকে নিরুত্তর করে দিয়েছে শিবু। যার মেয়ে,—যে তার মেয়েকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে—কৈফিয়ত চাইতে গেলে সে-ই চাইতে পারে একমাত্র। ও'দের যে অধিকার, অভিভাবকত্বের দাবী, সে তো তা স্বীকার করে নি, তবে কিসের জোর ও'দের?

চুপ করেই রইলেন শ্যামা। শুধু অপমানে আর দুঃসহ ক্রোধে কানের মধ্যেটা যেন ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

সে ক্রোধ এদের ওপরও ততটা নয়—যতটা তাঁর নিজের মেয়ের ওপর। কী লগ্নেই ঐ মেয়ে জন্মেছিল তাঁর। শুধু জ্বলে আর জ্বালিয়েই গেল সকলকে। নিজের মন্দ-ভাগ্যের আগুনে শুধু নিজেই জ্বলল না, শুধু তাঁদেরই জ্বালাল না, বোধ করি নিজের সন্তানেরও আজীবন দাহের কারণ হ'ল সে আগুন। কে জানে এদের কী মতলব, বিয়ে একটা সাধারণ ব্যাপার, বরং ঠিক হ'লে আগে তাঁদেরই জানাবার কথা, খরচের একটা মোটা অংশ দাবী করার কথা। অবস্থা খারাপ নয় এদের এটা ঠিক, তবু এতও ভাল নয় যে একটা মেয়ের বিয়ে টেরও পাবে না। এরাই যে এদের অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী বড়ভাইয়ের চিকিৎসার খরচের বিনিময়ে বিষয়টা লিখিয়ে নিয়েছিল সে কথা তো তিনি ভোলেন নি!

অথচ—অথচ এক্ষেত্রে কিছুই করবার নেই তাঁদের। কোন প্রতিকার হাতে নেই। সে সমস্ত পথ সেই হতভাগা নির্বোধ মেয়ে নিজেই ঘুচিয়ে দিয়ে গেছে!

এর পর আর তাঁর পক্ষে এ প্রসঙ্গ তোলা সম্ভব নয়—অথচ ভেতরে ভেতরে যে তিনি ছটফট করছেন খবরের জন্যে—এ তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারল কনক। সে এবার মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। এর আগে সে কোনদিন শিবুর সঙ্গে কথা বলে নি, তবে সম্পর্কে ছোট ননদের দেওর, কথা কওয়া আটকায়ও না। সে সামান্য একটু ইতস্তত ক'রে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'মেজঠাকুরঝি কবে এলেন? ভাল আছেন তো তিনি?'

ছোট ও সহজ প্রশ্ন। স্বাভাবিকও। কিন্তু সহজ ও স্বাভাবিক ব'লেই বোধ হয় —শিবু যেন বেশ একটু বিব্রত হয়ে উঠল। তার উত্তর দেওয়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল যে কঠিন কঠিন প্রশ্নের জন্যই তৈরী হয়ে এসেছিল সে—এ ধরনের প্রশ্নর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ঘাড় মাথা চুলকে বললে, 'না—ব্যাপারটা কি জানেন বৌদি—মানে এত তাড়াতাড়ি সব ঠিক হ'ল, বলতে গেলে চার-পাঁচদিনের মধ্যেই দু-পক্ষের দেখাদেখি দেনাপাওনা সব কিছুই ঠিক করতে হ'ল কিনা—। কাল পাকা দেখা শেষ ক'রেই বৌদিকে চিঠি দিয়েছি—কাছেই তো—এই বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর, ক ঘণ্টারই বা পথ, আজই সকালে সে চিঠি পেয়ে গেছে নিশ্চয়, আজ রাত্তিরের ট্রেনে যদি রওনা হয়—কাল ভোরেই এসে পৌঁছতে পারবে।'

'অ। ঠাকুরঝি এখনও জানেন না।...তা ছেলেটি কি করে?'

'করে—মানে করবার খুব দরকার হয় না। বিস্তর জমিজমা বিষয়সম্পত্তি। এই কাছেই ডোমজুড়ে বাড়ি—ধানজমিটমি নিয়ে যা আছে তাতে একটা বড় গেরস্ত বেশ চলে যায়।'

কনক নাছোড়বান্দা। সে খুব শান্ত সুরেই প্রশ্ন ক'রে যায়—একটার পর একটা: 'তা লেখাপড়াটড়া—মানে এমনিই জিজ্ঞেস করছি, কৈফিয়ৎ চাইছি যেন ভাববেন না—'

'না না, কী আশ্চর্য। কি যে বলেন! তা নয়—তবে কী জানেন, অতটা খোঁজ করি

নি। মানে কথাটা আপনাকে খুলেই বলি—ঠিক প্রথম পক্ষে কাজটা হচ্ছে না। এটি দ্বিতীয়পক্ষ। তা নইলে ঘর থেকে মোটা টাকা বার ক'রে কাজ করতে পেরে উঠব কেন বলুন? দ্বিতীয়পক্ষ বলেই খরচাপত্র বিশেষ লাগছে না। অথচ অগাধ সম্পত্তি, যা শোনা গেল স্বভাবচরিত্রও ভাল—মানে সব দিক দিয়েই—বুঝলেন না, পাত্রের মতো পাত্র। কেবল ঐটুকু খুঁতের জন্যে কি আর কিন্তু করা ঠিক হ'ত?"

বলতে বলতে শেষের দিকে বেশ একটু যেন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে শিবু। বোধ হয় বলার ভঙ্গিতে এবং গলার আওয়াজেই পাত্র সম্বন্ধে এঁদের সমস্ত সংশয় সে দূর করতে চায়।

কিন্তু শ্যামা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পূর্বের অপমান ভুলে গিয়েই আবারও কথা কইতে হ'ল তাঁকে। সীতাকে তিনি সত্যিই ভালবাসতেন। যেখানে তার মঙ্গল অমঙ্গলের প্রশ্ন, ভবিষ্যতের প্রশ্ন—সেখানে মান অপমান অত মনে রাখা সম্ভবও নয়। তিনি আবারও প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'তার মানে, মেয়ের মাও জানে না যে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে!...ঐটুকু একরত্তি মেয়েকে একটা দোজবরের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছ, হয়ত বা বুড়োর হাতেই দিচ্ছ, কে জানে—তা মেয়ের মার মতটাও কি একবার নেওয়া দরকার ছিল না বাবা?'

'অবিশ্যি। অবিশ্যি। দরকার ছিল বৈকি!' শিবুর গলা আবার মিষ্ট ও শাণিত হয়ে ওঠে (ওর কথা শুনতে শুনতে কনকের 'মিছরির ছুরি' কথাটা মনে পড়ে যায়) 'তবে কি জানেন আঁবুই মা, আমাদের ওপর মেয়ের ভার ছেড়ে দিয়ে যখন সে নিশ্চিন্ত আছে—তখন আমরা মেয়ের শুভাশুভটাই তো আগে ভাবব—তার মায়ের মতামতটা ঢের পরের কথা।'

বলতে বলতেই একেবারে উঠে দাঁড়ায় সে।

কনক ব্যস্ত হয়ে উঠে, 'ও কি, ও কি—উঠছেন কি, দাঁড়ান, একটু অন্তত মিষ্টি মুখে দিয়ে যান—'

'না, বৌদি, ঐটি মাপ করতে হবে। বুঝতেই তো পারছেন, সব জায়গা ঘুরতে ঘুরতে আসছি—পেটে আর তিল থোবার জায়গা নেই—'

'তা কি হয়। শুভকর্মে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন—একটু কিছু মুখে না দিয়ে গেলে যে মেয়েটার অকল্যাণ হবে ভাই! একটুখানি দাঁড়ান—'

সে ছুটেই ভেতরে চলে যায়। আজ তার বুকে বল আছে অনেকখানি। বড়বাজারের দিকে কী একরকম আকের গুড় উঠেছে—পশ্চিমে নাকি ঐরকম গুড়ই চলে—বড় বড় ডেলা পাকানো, দামেও নাকি ওয়ারা—অথচ খেতেও ভাল, সস্তা পেয়ে অনেকখানি কিনে এনেছে হেম গত সপ্তাহে। তাই দেখে শ্যামাও দিলদরিয়া হয়ে দুটো নারকেল বার ক'রে দিয়েছেন, আজ দুপুরে নিজেই নাড়ু পাকিয়ে রেখেছে কনক।

সে ঘরে চলে গেলে হাতের চিঠিটা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে শ্যামাকে উদ্দেশ ক'রে শিবু বলল, 'কাল আপনারা সবাই যাবেন দয়া ক'রে—দাঁড়িয়ে থেকে কাজটা উদ্ধার করিয়ে দেবেন। মা বলে দিয়েছেন অনেক ক'রে—কোন দোষত্রুটি অপরাধ নেবেন না, মেয়েছেলে সঙ্গে নেই বলে যেন ত্রুটি ধরবেন না। তাঁর তো আসবার উপায় নেই—বাতে পঙ্গু, আমার স্ত্রী সাতমাস অন্তঃসত্ত্বা। এক আমার ছোট ভায়ের স্ত্রী, বৌমা ভরসা--সব কাজ তাকেই করতে হচ্ছে, বুঝছেন তো? এইসব বিবেচনা ক'রে ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে নেবেন—যেন অভিমান ক'রে বসে থাকবেন না। মা একশবার বলে দিয়েছেন।'

'তা তো হয় না বাবা। গায়ে ময়লা মাখলে যমে ছাড়ে না।' শ্যামা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,

'এ সব সামাজিক কাজ, অপারগ বললে চলে না। বিশেষত পাড়া-পড়শী হ'লেও না হয় কথা ছিল, এ কুটুম্বস্থল। বৌমার যাওয়ার কথা তো ওঠেই না— তুমি এসেছ, যেকালে, হেম কান্তি যেতে পারত! কিন্তু বাবা কাল বিয়ে আজ শুকনো নেমন্তন্ন করতে এসেছ, সে তার বড় মামা, ছ'মাসের মেয়ে এনে সে-ই খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টা করেছে—সে যে যেতে রাজী হবে বলে আমার মনে হয় না।'

'দেখুন—সে যা আপনারা ভাল বোঝেন। বাপ-মরা মেয়ে, কাকারা কোনমতে বিয়ে দিচ্ছে, সেখানে গিয়ে যদি দাঁড়ানো কর্তব্য মনে করেন তো যাবেন। কী আর বলব। মা যা বলে দিয়েছেন তাও বললুম। এখন আপনাদের অভিরুচি।'

নিস্পৃহ উদাসীনভাবে বলে শিবু।

ইতিমধ্যে একটা রেকাবীতে চারটে নারকেল নাড়ু আর এক গ্লাস জল এনে সামনে ধরেছে কনক।

'উ'হু উ'হু বৌদি, মাপ করবেন—একটা, একটার বেশী কোনমতেই চলবে না। ভাববেন চাল দেখাচ্ছে তাই, নইলে বলতাম আধখানা। একটা আমার হাতে তুলে দিন।'

'আপনিই নিন না তুলে যা নেবেন।' রেকাবীটা দাওয়ার ওপর নামিয়ে দেয় সে।

আলগোছে, অতি সন্তর্পণে একটা নাড়ু তুলে মুখে ফেলে হাতটা শুধু ধুয়ে নিল সে গেলাসের জলে, জল খেল না।

শ্যামা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ভরসন্ধ্যায় সন্ধ্যা জ্বলার আগে কুটুমের ছেলে বাড়ি থেকে যাওয়া উচিত নয়, কনকেরও সন্ধ্যা দেখাবার আগে এই রাক্ষসী-বেলায় খেতে দেওয়া অন্যায় হয়েছে—এসবই মনে হ'ল তাঁর, কিন্তু কাউকেই কিছু বলতে পারলেন না। শুধু দেহ নয়, মনেরও যেন আর কিছু ভাববার বা স্থির করার শক্তি ছিল না।

হেম বাড়ি আসতে কনকই তাকে খবরটা দিল। শ্যামা তখনও গুম্ খেয়ে বসে আছেন। মেয়েটার জন্যে দুশ্চিন্তা তো বটেই—অপমানের জ্বালাটাও ভুলতে পারছেন না, বার বার অপমান ক'রে গেল বলতে গেলে—অথচ তিনি কিছুই করতে পারলেন না, ভাল রকম একটা জবাব পর্যন্ত দিতে পারলেন না।

কনকেরও মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল খুব। এ বাড়িতে আসার পর ঐ মেয়েটাই ছিল তার প্রধান অবলম্বন। তার সঙ্গে বকে, তার সঙ্গে গল্প ক'রেই তবু একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচত সে। সীতাকে ওদের বাড়িতে ফেলে রাখাটা কখনই তার পছন্দ হয় নি, অনেকবার সে এখানে আনবার কথা তুলেছেও—কিন্তু এ'রা সেধে আনতে রাজী হন নি, ও পক্ষের নরম হয়ে ফিরে আসারই অপেক্ষা করছিলেন। আর আনতেই হ'ল না—একেবারে পরের বাড়িতেই চলে গেল মেয়ে।

তা যাক। নিজের ঘর-বর পাচ্ছে ভালই। কিন্তু কেমন সে ঘর-বর সেই তো দুশ্চিন্তা। ব্যাপারটা কি বোঝা যাচ্ছে না ব'লেই তো ভাবনা। দোজবরে বিয়ে এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়, আখছারই হচ্ছে। অল্পবয়সী দোজবরে হ'লে বলবারও কিছু নেই। কিন্তু এ বর কেমন তা কে জানে! কত বয়স, ও পক্ষের ছেলেমেয়ে কিছু আছে কিনা—কিছুই তো জানা গেল না। হয়ত ভাল পাত্রই, মিথ্যেই ওরা ভেবে মরছে, কিন্তু —কনকের মনে বার বার এই প্রশ্নই জাগতে লাগল—তা'হলে এত লুকো-ছাপার কী আছে! তাদের না হয় না জানাল, মেয়ের মাকে মাত্র একদিন আগে চিঠি দেওয়া হ'ল কেন? এটাই যে মস্ত গোলমেলে ঠেকছে।

হেমও সমস্ত শুনে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'তা আমি আর কি

-করব বল! আমার আর কী করবার আছে!'

কনক ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'ওমা, তা বলে কিছুই করবে না? একটু খোঁজ-খবরও নেবে না—কী পাত্তর, কী বিত্তান্ত?'

'নিয়ে লাভ? যদিই ধরো পাত্র শুনি খুব খারাপ—আমি কি বিয়ে বন্ধ করতে পারব? মিছিমিছি ছুটোছুটি ক'রে লাভ কি?'

'বিয়ে বন্ধ করার কোন উপায় নেই? তুমি তো মামা, তেমন বুঝলেও বিয়ে বন্ধ করতে পারবে না? তাই কখনও হয়!'

'তুমি আইন-কানুন জান না—কী বুঝবে! তুমি গিয়ে বোঝাও গে পুলিশকে। আমি কি করে বিয়ে আটকাব বলো! এক থানা-পুলিশ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। তা তারা যদি বলে মেয়ের মা কোথায়—তার কী মত? তখন? তাঁকে তো চেনো। তিনি যদি এসে বলেন, বেশ করব আমার মেয়ে এই পাত্তরে দেব—তখন? তখন তো সে থানা পুলিশ তারা করবে আমাদের নামে! মানহানির মামলা ক'রে বসবে তারা। সে আমি পারব না।'

'থানা-পুলিশ না-ই করলে। পাড়ার লোকজনকে বলে কিছু করা যায় না?' ভয়ে ভয়ে বলে কনক।

'অত হ্যাঙগামা কে করে বলো! আত্মীয়-কুটুম্বর ব্যাপার। পাড়ার লোক মনে করবে কোন আক্‌চা-আক্‌চির ব্যাপার আছে। তারপর তারা আমাদের চেনে না—ওদের সঙ্গে এতকাল বাস করছে।......আর আমাদের অত ছিষ্টি করবার দরকারই বা কি? আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে যখন নিয়ে গেছে তখন আমাদের কী দরকার ওর মধ্যে মাথা গলাবার? যাচ্ছিও না—কিছুই না! মিটে গেল! যার মেয়ে যে সোহাগ করে রেখে গেছে ওখানে, সে বুঝুক!'

অগত্যা কনককে চুপ ক'রে যেতে হয়। সে আর কি বলবে, তার কতটুকু ক্ষমতা, কতটুকু জোর। শুধু সেই নিরুপায় নিরপরাধ মেয়েটার ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে চোখ ছলছল করতে থাকে তার।

কনক অনুচ্চ কণ্ঠে বললেও দালানের ভেতর থেকে শ্যামা সবই শুনেছেন, হেমের জবাবও। তিনিও আর কিছু বললেন না, শুধু বেশ শব্দ ক'রেই দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল তাঁর। এ তাঁরই ভাগ্যের দোষ, যেখানে একটু সম্পর্কও আছে—কেউ সুখী হবে না, কেউ শান্তি পাবে না।

মুখে যা-ই বলুক, শেষ পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়ার পর হেম বেরিয়ে পড়ে একবার। এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছে কেন যাচ্ছে তা কনক প্রশ্ন করে না, বুঝতেই পারে সে। নিশ্চয় মহাদের বাড়িই যাচ্ছে। ডোমজুড়ে ওদের সব কে চেনা লোক আছে, আত্মীয় কেউ থাকাও বিচিত্র নয়। ওরা হয়ত জানলেও জানতে পারে পাত্রের খবর।......

কিন্তু সেখানেও কোন সুবিধা হ'ল না। তারাও কিছু জানে না। সেখানে শিবু গিয়েছিল আরও রাত্রে—আটটা নাগাদ। এখান থেকে সেরে ও-পাড়ায় গিয়েছিল! বোধ হয় শ্যামার কথাটা স্মরণ করেই—ওখানে আর মেয়েদের কথা তোলে নি—কিংবা সেই রকমই কথা ছিল—শুধু পুরুষ কজনকে নিমন্ত্রণ করেছে, তাও কুঁচো-কাঁচা নয়, তিন কর্তা আর বড় চার-পাঁচটি ছেলেকে নাম ক'রে ক'রে বলেছে। মিনিট পাঁচেকের বেশি নাকি থাকে নি, মেজকর্তাই সামনে ছিল, তাকেই বলে চলে এসেছে। তাকেও ছেলের নাম-ধাম কিছু জানায় নি। কৌশলে এড়িয়ে গেছে। অবশ্য তারও অতটা তখন মনে হয় নি, বিয়েটা যে তাড়াতাড়ি সারা হচ্ছে, মামাদের জানানো হয় নি—এ-সব কিছু জানবার কথা নয় তার। মহা সে সময় বাড়ি ছিল না, সে থাকলে

হয়ত জোর ক'রে জেনে নিতে পারত। ওর অত মান-অপমানের বালাই নেই, চেঁচিয়ে হাট বাধাত, জামা ধরে টেনে বসানোও বিচিত্র নয় তার পক্ষে—কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, আজই সে গিয়েছিল পাড়ায় কাদের বাড়ি আনন্দ নাড়ু ভাজতে। ফিরে এসে খবর পেয়ে হায় হায় করছে—কিন্তু এখন আর উপায় কি?

রাত বারোটা নাগাদ হেম ফিরে এসে যখন এই খবর দিল তখনও এ দুটি স্ত্রী-লোক জেগে বসে। শ্যামা তখনও জল খান নি, তাঁর আর খাওয়া হবেও না। কনক একবার ভাতের সামনে বসেছিল বটে—কতকটা শ্যামার ভয়েই—কিন্তু কিছুই খেতে পারে নি। খাওয়ার কোন প্রবৃত্তিই ছিল না। সীতাকে যে সে এতটা স্নেহ করে—তা এর আগে সে নিজেও কোনদিন বুঝতে পারে নি।

শ্যামা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। যাবার আগে শুধু কনককে উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'তুমি আর মিথ্যে এ নিয়ে মন খারাপ ক'রো না বৌমা, ভাল বিয়ে ওর হবে না, হ'তে পারে না; সে আমি বেশ জানি। আমার ঝাড় যে! যেখানে আমার এক ফোঁটা রক্তও আছে, সেখানে কেউ কোনদিন সুখী হবে না। মিছিমিছি ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।'

এ সান্ত্বনা যে তিনি কাকে দিয়ে গেলেন—কনককে না নিজেকে—তা বোঝা গেল না, তবে তা কতকটা যেন বিলাপের মতোই শোনাল। তেমনি করুণ তেমনি অসহায়।

॥ ২ ॥

পরের দিন আর এ প্রসঙ্গ কেউ তুলল না। শ্যামা রাত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ সামলে নিয়েছেন নিজেকে। তিনি স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্ম করে যেতে লাগলেন। কোথাও যে কোন উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা বা দুঃখ—কি পরিতাপের কোন কারণ আছে তা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কিম্বা কাজকর্মের ও কথাবার্তার সহজ-স্বচ্ছন্দতায় কোনমতেই বোঝার উপায় নেই। শুধু তাঁর চোখের দিকে চেয়ে অস্বাভাবিক রক্তিমা দেখে কনক বুঝতে পারল যে, তিনি সারারাত ঘুমোন নি, হয়ত বসেই কাটিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু কনক অত পোড় খায় নি এখনও--সংসারে সে এখনও শ্যামার তুলনায় নবাগত। তাই তার প্রাণটা ছটফট করতেই লাগল। সারা দুপুর ঘর-বার করল সে—একবারও শোওয়া তো দূরের কথা, স্থির হয়ে বসতে পারল না পর্যন্ত। ইদানীং কে জানে কেন, কিছুদিন ধরেই শরীরটা ভার-ভার লাগছে। যখন-তখন শুয়ে পড়তে ইচ্ছা হয়—সেজন্যে শাশুড়ী পছন্দ করেন না জেনেও, দুপুরে সে ঘুমোয় একটু করে। শ্যামা অত লক্ষ্য করেন নি—সে নিজেও বলতে পারে নি কিন্তু কিছুদিন যাবৎই সে লক্ষ্য করছে যে খাওয়ার ব্যাপারেও নানারকম রুচিবিকার ঘটছে তার। পাঁচজনের সংসারে সে মানুষ। অনেক দেখেছে। এর থেকে যা সন্দেহ হওয়া উচিত তারও তা হয়েছে--তবে সে কথা সে কাকে বলবে তাই ভেবে পায় না।

কিন্তু আজ সেই দুপুরের সকল-শরীর-আচ্ছন্ন-করা দুচোখের পাতা-ভারী-হয়ে-আসা ঘুমও কোথায় চলে গেল। বরং দুপুর গড়িয়ে যত বেলা পড়ে আসতে লাগল, ততই তার অস্থিরতাও বাড়তে লাগল। ওর মনে মনে খুব একটা আশা ছিল যে, আজ সকালে মেজ ঠাকুরঝি নিশ্চয় এসে পড়েছে—সুতরাং দুপুরে কি বিকেলের মধ্যে এখানেও আসবে একবার। বিয়ে যদি খুব অবাঞ্ছিত হয় তো সে এমনি মেনে

নেওয়ার মেয়ে নয়। হৈ-চৈ চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে বিয়ে বন্ধ করতে চাইবে নিশ্চয়ই এবং সেজন্যেও ওদের সাহায্য চাইতে আসবে। আর মনোমত হ'লেও এসে ওদের নিয়ে যাবে জোর করে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে—জীবনের ঐ একটা অবলম্বন—তার বিয়েতে ভাই-ভাজকে বাদ দিতে দেবে না কিছুতেই। কিন্তু এক সময় যখন অপরাহ্ণ শেষ হয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, তবু কারুরই দেখা কি কোন খবর মিলল না, তখন যেন ওর চোখে জল এসে গেল। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করার সময় মনে মনে বলল, 'ঠাকুর, ওর শুভ করো। অনাথা মেয়ে বাপকে দেখল না, তার স্নেহ পেল না, আদর কী বস্তু তা-ই জানল না কখনও—এখন বিয়েটা যেন ওর ভাল হয়। ঘর-বরে যেন সুখী হয় ও।'

বোধ হয় এই প্রার্থনার ফলেই মনে একটু জোর এল। ভাবল, 'সত্যি, কেনই বা আমরা এতটা কু ভাবছি। ওর কাকাদের কী স্বার্থ খারাপ বিয়ে দিয়ে? অনাথা একরত্তি মেয়ে—হাজার হাক নিজেদের ভাইঝি—জেনেশুনে কি তার অনিষ্ট করতে পারে!'

একটু সুস্থির হয়ে সে রান্নায় মন দিল। বাইরে কে এসেছে—বোধ হয় বন্ধকী জিনিস ফেরৎ নিতে—দেখল তার শাশুড়ী সুদের হিসেব নিয়ে তকরার জুড়ে দিয়েছেন। তাতে আরো বল পেল যেন। উনিও নিশ্চয়ই ভাল বুঝছেন, নইলে কি আর তুচ্ছ এক পয়সার হিসেব নিয়ে এত বকাবকি করতে পারেন? হাজার হোক ও'রই নাতনী—সে তো পর, পরের মেয়ে।

রাত্রে হেম এসেও আশ্বাস দিল খানিকটা, 'অত ভাবছই বা কেন—কী আর এমন অনিষ্ট হবে? দোজবরে বিয়ে তো কতই হচ্ছে। আর কিছু না—হয়ত বয়সটাই একটু বেশী—সেইজন্যেই কথাটা চেপে চেপে যাচ্ছে, বিস্তারিত কিছু বলছে না। তা আর কী করা যাবে বলো। বিষয়-সম্পত্তি—যা বলছে যদি সত্যিই অত থাকে—তাহলে অন্তত খেয়ে-পরে তো সুখে থাকবে। হোক গে বয়স বেশী, ওতে এমন কিছু এসে যাবে না। মেয়েরা অতটা ঠিক মাথা ঘামায় না বয়স নিয়ে—আমি দেখেছি।'

'কী করে দেখলে তুমি, মেয়েদের মনের মধ্যে সেঁদুচ্ছ নাকি আজকাল?'

মনটা স্বামীর আশ্বাসে হাল্কা হয়ে এসেছে অনেকটা, তাই একটু কৌতুক করার লোভ সামলাতে পারে না কনক।

হেম কিন্তু দমে না। বলে, 'তা কেন, আমাদের অফিসের এক বন্ধুর বোন, এই নাকি ঠিক ষোল বছর বয়স। আর দেখতেও—যারা যারা দেখেছে অফিসের—সকলেই একবাক্যে বলে, ডানাকাটা পরী একেবারে। মেমেদের মতো রং। সে ওর দাদা—আমাদের অফিসে যে কাজ করে—গুরুচরণকে দেখেই বোঝা যায়। গুরু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে চারদিক আলো হয়ে ওঠে এমন রং। সেই মেয়ের এক সম্বন্ধ এল—পঞ্চান্ন বছরের বুড়ো, তবে অগাধ পয়সার মালিক, শ'বাজারের রাজাদের দোউত্তর কিন্তু ওদের চেয়ে অবস্থা ভাল—রাণাঘাট-নদেয় বিস্তর জমিদারী আছে, উড়িষ্যার একটা মহল থেকে নাকি বছরে থোক আট-দশ হাজার আয়। বুড়োর এক ছেলে এক মেয়ে, তাদের ছেলেপুলে হয়ে গেছে—নাতি-নাত্নী—জাজ্বল্যমান সংসার। বুড়ো নাকি কবে কোথায় দেখেছিল ঐ মেয়ে, বলে পাঠাল এরা যদি রাজী থাকে তো হীরের সেট দিয়ে আশীর্বাদ করবে। এক লাখ টাকার গয়না আর এক লাখ টাকা নগদ দেবে বিয়ের দিন। তা গুরু, গুরুর মা কেউ রাজী হয় নি কিন্তু মেয়ে নাকি কেঁকে বসল, ঐ বরেই আমি বিয়ে করব। কার হাতে না কার হাতে তোমরা দেবে, চিরকাল কাঁচের চুড়ি পরে বাসন মেজে দিন কাটাব, তোমাদের অবস্থা তো আমি জানি—এমনি কুলীকাবারী ছাড়া জুটবে না, হয়ত মদ খাবে, ধরে ধরে ঠ্যাঙাবে। না, অত পয়সা আমি ছাড়তে পারব

না। সেই বিয়ে হয়ে গেল—মেয়েও নাকি খুব সুখী, একটা ছেলেও হয়েছে। এদেরও ভাল হয়েছে অবশ্য, পয়সা দুহাতে ঢেলে দিচ্ছে বাপের বাড়িতে।'

কনক অবাক হয়ে যায়, বলে, 'কে জানে বাবা! স্বেচ্ছায় ষোল বছরের মেয়ে পঞ্চান্ন বছুরে দোজবরকে বিয়ে করলে! কী জানি, হবে হয়ত। কার মনে কি আছে, কে জানে! তাও এক ঘর ছেলেপুলে! তা তারা কি বলে, একে মানে-গণে?'

'সে নাকি এর কথায় ওঠে-বসে, মানে ঐ ছেলে। হবে না কেন, এতকাল ঠাকুর-চাকর ছাড়া মেয়েদের যত্ন কাকে বলে তা তো কখনও জানত না। আর এ হ'ল গে গরীবের মেয়ে—নিজে হাতে চিরকাল সব করেছে, এক একদিন শখ করে এটা-ওটা রান্না করে, ছেলে-বৌকে বসিয়ে খাওয়ায়—তারা গলে গেছে একেবারে।'

'তা ভাল।' বলে চুপ করে যায় কনক। সে তখন মনে মনে অন্য কথা ভাবছে। হেমেরও তো কত বয়সের তফাৎ তার সংগে—অনেকটাই বড় সে কনকের চেয়ে। কৈ, কখনও তো সে কথা মনে হয় না তার। অবশ্য হেমের চেহারা দেখলে বয়সটা বোঝা যায় না এটাও ঠিক। এখনও একবার বিয়ে দিয়ে আনা যায়।...যাক্‌গে বাপু, যার সংগে যার বিয়ে হয় হোক, মনের মিল হলেই হল। দোজবরেই হোক, তেজবরেই হোক, মেয়েটা যেন সুখী হয়।

রাত্রির আহরিত আশ্বাসটুকু যেন স্বপ্নের মতোই রাত্রিশেষে বাস্তব দিগন্তে মিলিয়ে যায়। নিশীথের কুসুম যেন ভোরের আলো ভাল করে ফোটবার আগেই শুকিয়ে ওঠে।

তখনও হেম অফিসে বেরোয় নি—মহা এসে হাজির। ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছে সে। ওরা ফিরেছে অনেক রাত্রে—বারোটারও পরে, নইলে তখনই আসত। এই ক'ঘণ্টা রাত যে কী করে কাটিয়েছে তা সেই জানে।

'পোড়ার রাত কি পোয়াতে চায়? কী বলব—রাত তো নয়, অনন্ত শয্যে একে-বারে! ইচ্ছে হচ্ছিল দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিই। কোনমতে ভোরের পেছনে তাই একটু আলোর ছ্যাঁকা লাগতেই বেরিয়ে পড়েছি। কারুক্ষে বলেও আসে নি—খুঁজে মরবে হয়ত, মরুক গে। তবে হ্যাঁ—অরুণ দেখেছে। ঐ এক ছেলে, রাত থাকতে উঠে বইখাতা নে গিয়ে বাগানে বসবে, কখন সুর্যিদেবের একটু দয়া হবে আলো দেবে একটু। মুয়ে আগুন!'

ধৈর্যচ্যুতি ঘটে হেমের, অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে তার।

'তা বলি কী মতলবে এসেছ সেইটে আগে বলো না।'

'বলছি, বলছি। তবে মোদ্দা আমি বাপু যাই নি সে আমি আগে থাকতে বলে রাখছি। মেয়ে-নেমন্তন্ন যে-কালে হয় নি, সে-কালে যাবই বা কেন! হোক গে বোনঝির বে, অত বড় গুষ্টিটার একটা মান-মর্য্যেদা আছে তো গা? বিনি নেমন্তন্নয় যাওয়া যায় না। তা আমি না যাই—তিন কত্তাই গিয়েছিল। আর বুড়ো ন্যাড়া, ওরা—বড়বড় ছেলেরা সব্বাই গিয়েছিল। ভুল হবার যো নেই। ও গুষ্টির বড় সাফ চোখ, যা একবার দেখবে একেবারে ফটক তুলে নেবে মনের ভেতর। ভুল হয় নি। সকলেই একবাক্যে বলেছে কথাটা!

'তবে তুমি বকে মরো গে—আমার গাড়ির সময় হয়ে গেল। আমি যাই।'

'ও বাবা' এ যে একেবারে ঘোড়ার ওপর জীনকষা দেখতে পাই। আমিও সংসার ফেলে এসেছি। অসুমর কাজ পড়ে সেখানে। আমার কাজ কেউ করে দেবে না, সে যেন মনে ভেবো নি, উল্টে এত্তটি চিপ্‌টেন ঝাড়বে'খন।'

তারপর সত্যি সত্যিই হেম বেরিয়ে যায় দেখে বলে উঠল, 'ঐ সীতিটার বরের কথা বলছি গো। ওকে নাকি কোথা থেকে এক ধোঁককেশো ঘাটের মড়া ধরে বিয়ে দিয়েছে ওরা। তার নাকি এক পা ঘাটে এক পা খাটে—এই অবস্থা। খুব কম হ'লেও নাকি সীতির ঠাকুর্দার বয়িসী হবে। বে করতে বসে নাকি অনাব্রত খক্ খক্ করে কেশেছে আর সাঁই সাঁই ক'রে হাঁপিয়েছে। তাই এত লুকোছাপা—বুঝলে? তাই আমাদের কাউকে বলে নি বে-তে।......নিশ্চয় ঐ ঘাটের মড়ার কাছ থেকে এত-টি টাকা গুণে নিয়েছে। কাকা তো নয়, কসাই সব। মেয়েটাকে বেচে মোটা টাকা ঘরে পুরেছে।'

অপ্রত্যাশিত কিছু নয়—বরং জানাই কতকটা। এমনি যে একটা কিছু হবে ধারণাই তো করেছিল এরা, তবু কিছুক্ষণের জন্যে সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেল। হেমও সদরের বাইরে একটা পা দিয়েছিল বেরোবে বলে—সে সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে গেল।

একটু বেশী বয়স হবে হয়ত—এই ভেবেছিল এরা। বড় জোর চল্লিশ। কিন্তু ঠিক এতটা—। এ কি মানুষ পারে সত্যি-সত্যিই? কনক ঘাড় নাড়ে নিজের অজ্ঞাতেই. এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা।

অনেকক্ষণ পরে কতকটা আড়ষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন শ্যামা, 'তা খে'দী—খে'দী কিছু বললে না? এই বিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে সে?'

যেন খুব একটা কৌতুককর কিছু ঘটেছে কিম্বা কারুর কোন বাহাদুরীর বিবরণ দিচ্ছে এইভাবে দুটি বুড়ো আঙ্গুল মার মুখের কাছে নেড়ে বললে, 'আসে নি—আসে নি। খে'দি কোথায় যে বলবে? সেদিকে একেবারে মুলেই হাভাত।...তাকে খবরই দেয় নি ওরা। বাজে কথা। চিঠি দিয়েছে না হাতি। মিথ্যে কথা ও-সব। দেবে কোন্ ভরসায়, তাকে ওরা চেনে না?...ছেলেরা তো গিয়ে শুরুতেই সেই খোঁজ করেছে—মেজমাসী কোথায়? তা বুড়ী ডাইনী সুর টেনে টেনে কৈফেৎ দিয়েছে. কী জানি, কেন এখনও এসে পৌঁছল না। চিঠি তো দেওয়া হয়েছিল—আসার তো কথা আজ সকালবেলাই। এল না কেন বাপু, আমরাও তো তাই ভাবছি। এসে দশ-কথা আমাদের শোনাবে হয়ত—কিন্তু এখন বে বন্ধই বা করা যায় কী ক'রে বলো!... এই সব। বদমাইশি নাকে কান্না। পাজীর পা ঝাড়া ওরা! মেয়েটার হক্কের পাওনা ফাঁকি দিয়ে নিয়েও আশ মেটে নি, চিরজন্মের মতো 'সব্বনাশ করাটা বাকী ছিল—সেইটে ক'রে নিশ্চিন্তি হ'ল।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে মহাশ্বেতা বোধ করি একটা জুৎসই উত্তরের আশাতেই উৎসুক নেত্রে চেয়ে রইল এদের মুখের দিকে।

কিন্তু সে উত্তর আসতে অনেকক্ষণ দেরি হ'ল আরও।

খানিকটা শুধু আরও চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হেম নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। আর দেরি করলে গাড়ি ধরা যাবে না, এমনিও হয়ত শেষের দিকটা ছুটতে হবে। যা হবার তা যখন হয়েই গেছে, এখন আর কোনমতেই তা যখন ফেরানো যাবে না, তখন মিছি-মিছি আর অফিস কামাই করে লাভ কি?

ঘরে বসে তো আরও মন খারাপ করা শুধু শুধু।

শ্যামা তারপরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তা আমরা আর কী করব বলো! যার মেয়ে সে যদি সব জেনেশুনে, ওদের চিনেও কসায়ের হাতে জবাই হবার জন্যে ওদের ঘরেই মেয়ে তুলে দিয়ে যায়, আমাদের আর কী করবার আছে!'

'ওমা!' মহাশ্বেতা হাত-পা নেড়ে এক পাক নেচে নেয় যেন, 'ওমা, তা বলে চুপ

করে হাত-পা গ্নটিয়ে বসে থাকবে? এর একটা প্রতিকারের চেষ্টা করবে না? বলি তোমার নাৎনী তো গা। মামা দিদিমা বেঁচে থাকতে এমনি কাণ্ডটা করবে ওরা?'

'তুই থাম দিকি! সক্কালবেলা! দ্বর্গা দ্বর্গা।...তোর ঐ পিত্তিজ্বলানো কথা শ্বনলে আমার হাড় জ্বালা করে। আমরা কি প্রতিকার করব লা? আমাদের কি করবার এক্তার আছে? যার মেয়ে সে আমাদের কোন এক্তার মেনেছে? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাব আমরা কোন্ আইনে? আর এখন করবার আছেই বা কি? বিয়েটা কি আর ফিরিয়ে নেওয়া যাবে? না কি আমরা ঢাল-তরোয়াল নিয়ে গিয়ে ওদের কাঁচা মাথাগ্নলো কচাকচ কেটে আনব? বিয়ে যে আর ফিরবে না তা ওরা বিলক্ষণ জানে, জেনেশ্বনে হিসেব করেই এ কাজ করেছে। ওরা তোমার চেয়ে ঢের বেশী সেয়ানা তা জেনো।'

ধমক খেয়ে খানিকটা চ্বপ করে থাকে মহাশ্বেতা। বোকার মতো কনকের ম্বখের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেলে একট্ব। তারপর কতকটা শ্বন্য পানে চেয়েই বলে, 'তাহলে আর কী করব। যে যার তো নিজের কাজে লেগে গেলে। আমিও বাড়ি যাই। সেখানে হয়ত এতক্ষণে তুলক্রাম কাণ্ড হচ্ছে, খোঁজাখ্বজি শ্বর্ব হয়ে গেছে। অর্বণ বেরিয়ে আসতে দেখেছে বটে—তা তাকে কেউ জিজ্ঞেসও করবে না। আর সে যা পোড়া ছেলে—নিজে থেকে বলবেও না। বই-খাতা যদি হাতে পেয়েছে তাহলে আর জ্ঞানগম্যি নেই, কোনদিকে চেয়ে দেখবেও না, কী ক্ষিদে পেলে বলবে না যে ভাত দাও। ম্বয়ে আগ্বন!'

॥ ৩ ॥

একটা ক্ষীণ আশা কনকের মনে ছিল যে পাত্রপক্ষ থেকে বৌভাতে তাদের বলতে আসবে। বরের তরফ থেকে বলতে গেলে মেয়ের বাপের বাড়ির পরই মামার বাড়ি ধরে—ন্যায্যমতো ওদের আগে বলা উচিত। আর তারা খোঁজ করলে কি এরা ঠিকানা দেবে না—না সঙ্গে লোকই দেবে না? আর তো গোপন করার কোন প্রয়োজন নেই। ওদের মতলব তো সিদ্ধই হয়ে গেছে।

কিন্তু কেউই কিছ্ব বলতে এল না। নিয়মমতো যেটা বৌভাত—ফ্বলশয্যের দিন—সেটা কেটে গিয়েও দ্বদিন চলে গেল। কোন খবরই পাওয়া গেল না মেয়েটার। চারদিনের দিন সন্ধ্যের সময় একেবারে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ঢ্বকল ঐন্দ্রিলা।

'ওগো এ আমার কী হ'ল গো! ওগো তোমরা থাকতে আমার মেয়ের এই সব্ব-নাশটা হ'ল গো। ওগো তোমরা কেউ একবার গিয়ে দেখলে না!'

শ্যামা তখন সবে স্নান ক'রে এসে ঘরে কাপড় ছাড়ছিলেন, তিনি ছ্বটে বেরিয়ে এলেন।

'থাম, থাম। চ্বপ কর। ও কি করছিস? ভর্‌সন্ধ্যেবেলা অমন মড়াকান্না তুলছিস কিসের জন্যে? গেরস্তর অকল্যেণ—সে মেয়েটারও অকল্যেণ।...চ্বপ, চ্বপ।'

কিন্তু মাকে দেখে ঐন্দ্রিলা আরও যেন হাহাকার করে উঠল।

'ও মাগো, এ আমার কী হ'ল মা! ওমা, আমার যে ঐ একটা মেয়ে মা। আমি যে ওর ওপর ভরসা করেই ব্বক বেঁধে ছিল্বম মা। তোমরা থাকতে আমার এ সব্ব-নাশ কী করে হ'ল মা।'

'চুপ। চুপ!' একটু ধমকই দিয়ে ওঠেন শ্যামা এবার, 'নিজের সর্বনাশ তো তুমি নিজেই করেছ মা। মাঝখান থেকে আর এদের মাথাটি খাচ্ছ কেন—এখন এই ভরসন্ধ্যেবেলা কান্নাকাটি ক'রে! এখন বলছ আমরা থাকতে—! আমরা কী করব শুনি! মেয়েকে নড়া ধরে নিয়ে যাবার সময় হুঁশ ছিল না! আমরা কি তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, না নিয়ে যেতে বলেছিলুম? টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের ঘরে তুলে দিলে কে? তুমিই তো তাদের গার্জেন করে দিয়ে গেছ বাছা। এখন আমাদের কাছে এসে কাঁদলে কী হবে? আমরা কি করব? আমাদের জানিয়েছে তারা, না মত নিয়েছে!'

'ওগো, আমি না হয় চিরদিনের অজ্ঞান, আমি না হয় অন্যায় করেছি—তোমরা গিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে এলে না কেন! তোমরা যদি জোর করে এনে রাখতে তা হ'লে তো আর এ সব্বনাশটি হ'ত না!'

'হ্যাঁ—তা আর নয়! তারপর তুমি এসে উল্‌টে আমাদের নামে থানা-পুলিশ করো! কার হুকুমে আমার মেয়েকে নিয়ে এলে তোমরা—একথা বললে আমরা কোথায় দাঁড়াতুম? তোমার তো গুণে ঘাট নেই মা। আসলে এ সর্বনাশের জন্যে দায়ী তোমার স্বভাব। তোমার ঐ স্বভাবের জন্যেই চিরকাল জ্বলবে আর জ্বালাবে। তোমার পাপেই তোমার মেয়ের এই হাল হ'ল!'

কনক ততক্ষণে ছুটে এসে ঐন্দ্রিলার হাত ধরে দাওয়ায় বসিয়েছে। ওর এই চিৎকার আর মড়াকান্না শুনে আশেপাশের বাড়ি থেকে লোক বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণে—এবার হয়ত ভিড় করে এসে বাড়িতে ঢুকবে। লোক-জানাজানি কেলেঙ্কারী আর কিছু বাকী থাকবে না।

সে মিনতি করে বলে, চুপ করুন, 'চুপ করুন ঠাকুরঝি। ছিঃ, অমন ক'রে কি কাঁদতে আছে। কী এমন হয়েছে। আর যা হবার তা তো হয়েই গেছে, সে হওয়া তো আর ফিরবে না। মিছিমিছি মেয়েটার আরও বেশী অকল্যেণ করছেন কেন। স্থির হোন একটু।'

সে ছুটে গিয়ে একটা চুম্‌কি ঘটি ক'রে জল এনে ওর চোখে-মুখে দিতে থাকে। মাথাতেও দেয় খানিকটা থাবড়ে থাবড়ে।

'আর কি কল্যেণ হবে ভাই। আর কি বাকী আছে কিছু? ওরা যে আর কোন সব্বনাশটা করতে বাকী রাখে নি তোমাদের সীতার!'

কান্না একেবারে বন্ধ হয় না, কিন্তু কনকের সহানুভূতির স্পর্শে হাহাকারটা কমে আসে একটু একটু ক'রে।

একটু একটু করে সব খবরও পাওয়া যায় তার মুখ থেকেই।

চিঠি পেয়েছে ঐন্দ্রিলা বিয়ের পরের দিন। সে যাদের কাছে কাজ করে তাঁরা ডাকের মোহর দেখেছেন। বিয়ের দিনে মোহর পড়েছে এখানকার। তার মানে সেইদিনই সকালে ফেলা হয়েছে—যাতে ও বিয়ের দিন না পৌঁছতে পারে।

ওকে না জানিয়ে বিয়ে ঠিক হ'ল তাতেই কেমন কেমন বোধ হয়েছিল ওর। নানারকম সন্দেহ মনে দেখা দিয়েছিল তখনই। তবে এতদূর কল্পনাও করতে পারে নি। ওর দেওররা যে ঠিক এতখানি অমানুষ তা ও জানত না।

মন খারাপ খুবই হয়েছিল। একটা মেয়ে—তার বিয়েটাও চোখে দেখতে পেলে না। আবার মনকে বুঝিয়েছে যে ওর যা হুতোশুনে বরাত, না দেখেছে ভালই হয়েছে। ওর নজরেই ক্ষতি হ'ত হয়ত। আরও একটা আশ্বাস মনে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল যে, দাদা আছে, মা আছে, তারা নিশ্চয় দেখেশুনেই মত দিয়েছে। মামা-

দের যে জানানোও হয় নি—এ যে একেবারে ওর ধারণার বাইরে। এক-একবার এও ভেবেছে যে হয়ত বিয়ে-বাড়ীতে গিয়ে নানা রকম অশান্তি বাধাবে কি ঝগড়াঝাঁটি করবে সেই ভয়ে দেরী করে খবর দিয়েছে ওকে।

যাই হোক—চিঠি পেয়েই রওনা দিয়েছে ও। সেইদিনই। মনিবরা বারণ করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন—একা মেয়েছেলে রাত্রের ট্রেনে গিয়ে কাজ নেই। একদিন সবুর করুক বরং—কে চেনাশুনো লোক কলকাতা যাচ্ছে খোঁজ ক'রে দেখে তার সঙ্গে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন তাঁরা। বিয়ে যখন হয়েই গেছে তখন আর এত তাড়া কি? কিন্তু ঐন্দ্রিলা সেই একদিনও অপেক্ষা করতে পারে নি।

এখানে এসে ওর আরও মন খারাপ হয়ে গেছে—ফুলশয্যার কোন আয়োজন নেই দেখে। দেওরদের জিজ্ঞাসা করেছে, তারা এড়িয়ে গেছে। শেষে শাশুড়ীকে গিয়ে চেপে ধরায় তিনি বলেছেন, 'গায়েহলুদ ফুলশয্যা গায়ে গায়ে কাটান গেছে— ফুল-শয্যের তত্ত্ব পাঠানো হবে না।'

খুবই মন খারাপ হয়ে গেল ওর। যতই গায়ে গায়ে কাটান দেওয়া হোক, এমন তো অনেক বিয়ে দেখেছে—নিয়মকর্ম যেটুকু, একটু ফুল, দুখানা কাপড়, একটু ক্ষীর মুড়কি- এও যাবে না, সে আবার কীরকম কথা?

তখনই পাড়ায় বেরিয়ে পড়েছে—ঘাট থেকে মুখ হাত ধুয়ে আসবার অছিলায়। পাড়ায় যাদের যাদের বাড়িতে গেছে ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে যেন এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে। বিব্রত হয় উঠেছে যেন ওকে দেখে। বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতেই কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত পাড়ার দাশু মজুমদারের গিন্নীর কাছে গিয়ে খুব কান্নাকাটি করতে তিনি বলেছেন, 'বাপু, বুঝতেই তো পারছ, এক পাড়ায় বাস করি, আর তোমার শাশুড়ীর যা মুখ, সাধ করে কে ঝগড়া টেনে আনবে বলো ওদের সঙ্গে। দুটি ঠোঁট ফাঁক করলেই বিপদ।......তাছাড়া পাড়াঘরে তো কাউকে বলে নি—আড়াল আবড়াল থেকে যা ছেলেরা দেখেছে। সেসব কথা না শোনাই ভাল। তা তুই-বা এর-ওর কাছে গিয়ে মিথ্যে মাথা খুঁড়ছিস কেন, চলে যা না। নিজে গিয়ে দেখে আয়!'

'কিন্তু ঠিকানা জানি না যে কাকীমা।' ঐন্দ্রিলা বলেছে।

আর একটু ইতস্তত ক'রে তিনি ঠিকানাটাও বলে দিয়েছেন। গ্রামের নাম, পাত্রের নাম শুধু। আর গ্রামটা ডোমজুড়ের কাছেই—এইটুকু। এর চেয়ে বেশী ঠিকানা নাকি কেউ জানে না। ওরা কাউকেই বলে নি—ওর দেওররা।

তখনই বেরিয়ে পড়েছে ঐন্দ্রিলা। গাড়ির কাপড় ছাড়া হয় নি, মুখে একটু জলও পড়ে নি। আঁচলেই টাকা কটা বাঁধা ছিল তাই রক্ষে। বাড়িতে গেলেই ওকে আটকে ফেল্‌বে—এটা ও এর মধ্যেই বুঝে নিয়েছিল বেশ!

অজানা অচেনা পথ। প্রতি-হাত লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে যাওয়া, গাড়ি-ঘোড়ার ব্যবস্থাও জানা নেই কিছু—তবু হাল ছাড়ে নি।

একবার ভেবেছিলুম দিদির বাড়ি গিয়ে বুড়ো কি কেষ্ট কাউকে সঙ্গে নিই—আবার ভাবলুম মিছিমিছি আরও দেরি হয়ে যাবে। তাছাড়া তারাও হয়ত পথ-ঘাট চেনে না। দিদি খাওয়ার জন্যে পেড়াপীড়ি করবে গেলেই, ওখানেই দুপুর গড়িয়ে যাবে, যাওয়াই হবে না শেষ পর্যন্ত। তখন আমার জেদ চেপে গেছে—ওদের ফুলশয্যে বৌভাত কেমন হয় দেখতে হবে। ঘর-বরও দেখব নিজের চোখে। তাই অমনিই বেরিয়ে পড়লুম, তখনই। এদেশ ওদেশ ঘুরে পরের বাড়ি চাকরি ক'রে ক'রে আগের চেয়ে সাহস বেড়ে গেছে তো, সেয়ানাও হয়েছি অনেকখানি, শেষ পর্যন্ত

তাই খ‍ু্জে বারও করলুম! কিন্তু কী দেখতে গেলুম বৌদি, কী দেখলুম গিয়ে। এ দেখতে এত কাণ্ড ক'রে কেন গেলুম!'

আবারও হু-হু করে কেঁদে ওঠে ঐন্দ্রিলা।

কনক তখন একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বসে আর এক হাতে মাথায় বাতাস করছে, 'চুপ করুন, চুপ করুন ঠাকুরঝি। স্থির হোন। কেঁদে তো আর কোন ফল হবে না। মিছিমিছি আরও বেশী অকল্যেণ করছেন কেন তার!'

জামাইবাড়ির কাছাকাছি যখন এসে পেঁাচেছে তখন আর সন্ধ্যের বেশী দেরি নেই। আবছা হয়ে এসেছে চারদিক। পথে যাকেই বাড়ি জিজ্ঞাসা করেছে জামাইয়ের নাম ক'রেই সে-ই উত্তর দিয়েছে—কিন্তু মুচকি হেসেছে একটু। তবু তখনও ঐন্দ্রিলা মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে বিয়েবাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করেছে, বিশেষ দোজ-বরের বিয়ে, তাই ওরা হাসছে। সে হাসির কোন গূঢ় অর্থ আছে তা মনে করে নি একবারও।

বরং অন্য চিন্তাই দেখা দিয়েছে মনে।

বিনা নিমন্ত্রণে কর্মবাড়ি যাওয়া উচিত নয়, জামাইবাড়ি তো এমনিই যাওয়া অনু-চিত—এসব কথা এতক্ষণ একবারও মনে হয় নি ঐন্দ্রিলার। একেবারে ওদের পাড়ায় পেঁাছে তার কেমন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল। গাড়ির কাপড়, এমনিতেই আধময়লা হ'য়ে গিয়েছিল, তার-ওপর সারাদিনের 'রহটে' এখন তো রীতিমতো কালোই দেখাচ্ছে, গায়ের চাদরটাও ফুটোফুটো—কবেকার হরিনাথের দরুন চাদর এটা—তার ওপর ময়লাও হয়েছে যৎপরোনাস্তি। এই অবস্থায় জামাইবাড়ি যাওয়া—ছি! কী মনে করবে ওরা। বেশী নিমন্ত্রিত কেউ না এলেও ঘরের লোকজনও তো আছে। তাছাড়া জামাই প্রথম দেখবে শাশুড়ীকে—কী ভাববে। মেয়েরও একটা লজ্জার কারণ।

ফিরেই আসছিল। দু'চার পা এসেও ছিল কিন্তু তাতেও ঠিক মন সরল না। এতদূর এসে এত কাণ্ড করে জামাইকে না দেখেই চলে যাবে? যার জন্যে আসা। তার চেয়ে বরং একটু আড়াল থেকে ঘর-বর দেখে চলে আসবে।

সেই ভেবেই আর একটু এগিয়ে একেবারে ওদের বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখল সামনের বাগানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, বেশ একটা হৈ-চৈও হচ্ছে। প্রথমটায় একটু আশ্বস্তই হয়েছিল। ভেবেছিল বৌভাতেরই ভিড় এটা। কিন্তু সংগে সংগেই অন্য খটকা লাগল। আলো নেই কেন? এত লোক যেখানে নিমন্ত্রিত সেখানে অন্তত দুটো গ্যাসের আলো ভাড়া করা হয়নি—এ যেন কেমন ঠেকছে। একটা হ্যারিকেন শুধু দূরে বসানো আছে, যেখানটায় বেশী জটলা সেখানটায় কিছুই নেই। এ যেন বড় বেশী অস্বাভাবিক মনে হ'ল তার।

তখন আর একটু এগিয়ে গেল। ওরা নিজেদের গোলমালে ব্যস্ত, তাছাড়া বেশ ঘোরঘোরও হয়ে এসেছে, তাকে অত কেউ লক্ষ্য করবে না। কাছে যেতেই বুঝল ব্যাপারটা। উৎসবের আনন্দ-কোলাহল নয়—দাঙ্গা, মারপিট। অতি কুৎসিত ইতর কলহ একটা। দুই দলে বিবাদ হচ্ছে, পাড়ার লোক এসেছে মধ্যস্থতা করতে।

সেই গালিগালাজ ও কটূক্তির বিপরীত-মুখী অবিরাম বর্ষণের মধ্যে থেকে আসল ঘটনাটা যখন বুঝতে পারল, ঐন্দ্রিলা, তখন কিছুকালের জন্য তার হাত-পা পাথর হয়ে গেল। বুকের স্পন্দন থেমে গেল কিছুক্ষণের জন্য।

এইখানে বিয়ে হয়েছে সীতার! এই বিয়ে!

চিনতেও পারল সবাইকে। সীতার বর—আর তার ওপক্ষের ছেলেমেয়ে সকলেই ছিল সেখানে। যে জোয়ান জোয়ান চারজন ছোকরা এদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে

খুন করবে বলে শাসাচ্ছে—তারা জামাইয়েরই ছেলে। তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে তাদের বড় ভগ্নিপতি এবং তার বড় ছেলে। সেও সতেরো আঠারো বছরের ছোকরা। ওর জামাইয়ের দিকে শুধু আছে আর একটি জামাই। সে কলকাতার লোক, ঝগড়া-বিবাদ পছন্দও করে না—এর মধ্যে থাকতেও চায় না। সে পেরেও উঠছে না তাই ওদের সঙ্গে।

আশপাশের দু'একজনকে প্রশ্ন ক'রে এই বিবাদের ইতিকথাও জানতে পারল ঐন্দ্রিলা। এই বিয়ের কথা শুনেই নাকি বুড়োর (তাঁরা সকলেই বুড়ো বলে উল্লেখ করছে, জামাইয়ের নাম উমেশ সে একজনের মুখেও শুনল না, ছেলেরাও বাবা বললে না কেউ, তারাও বুড়ো বলতে লাগল) ছেলেরা রুখে উঠেছিল, ভয় দেখিয়েছিল যে এ তারা কখনও সহ্য করবে না—তাদের জাজ্বল্যমান সংসার, তাদের মা মারা গেছে এখনও ছমাস হয় নি—সে জায়গায় এসে বসবে কে এক হাঘরের মেয়ে—হাঘরে ছাড়া বুড়োকে মেয়ে দেবেই বা কে?—এ তারা দেখতে প্রস্তুত নয়। এ বিয়ে তারা বন্ধ করবেই, দরকার হয় তো দাঙ্গাহাঙ্গামা মারপিটেও তারা পিছ-পা হবে না। বুড়োর ঠ্যাং ভেঙ্গে ফেলে রাখা খুবই সোজা—কিন্তু তাও তারা করবে না, বিয়ের আসরে গিয়ে হট্টগোল বাধিয়ে পাড়ার লোক ডেকে বে-ইজ্জৎ করবে, থোঁতা মুখ ভোঁতা ক'রে ফিরে আসতে হবে।

বুড়ো সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল ওদের এই শাসানিতে। অথচ বিয়েরও এমন লালসা যে কোন অগ্রপশ্চাৎ ভাববারও শক্তি ছিল না। সে তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য তারা যা বলেছে তাতেই রাজি হয়েছে, বাড়িঘর জমিজমা বিষয়সম্পত্তি যেখানে যা ছিল সব ঐ ছেলেদের নামে দানপত্র ক'রে রেজেস্ট্রি ক'রে দিয়েছে। তখন ভেবে-ছিল যে ষোলআনা অধিকার পাবার পর যার সম্পত্তি তাকে আর তার বৌকে একে-বারে ফেলবে না, দুটো ভাতকাপড় দেবেই। অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও দিতে বাধ্য হবে। তার জীবদ্দশাতে তো কোন ভয়ই নেই—মরার পরও বিধবাটাকে কি আর দুটো ভাত দেবে না? হয়ত বিধবার কথাটা মোটে ভাবেই নি, তার কাছে নিজের তখনকার প্রয়োজনটাই বড় হয়ে উঠেছিল সব চেয়ে।

সব হিসেব কিন্তু বানচাল হয়ে গেল যখন কাল নতুন বৌ সুদ্ধ এসে দেখল যে তার নিজের বাড়িতে আর তার ঢোকবার অধিকার নেই, সে দরজা ওদের মুখের ওপরই বন্ধ হয়ে গেল। তখন গালিগালাজ শাপশাপান্ত যা করবার বুড়ো যথেষ্টই করেছে কিন্তু ছেলেরা গ্রাহ্যও করে নি। বহু রাত অবধি কনে-বৌকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে অন্ধকারেই। যে বন্ধুকে অভিভাবক বা বরকর্তা মতো ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, সে বেগতিক দেখে আগেই সরে পড়েছে। তখন এক প্রতিবেশীর হাতে পায়ে ধরে বাকী রাতটা তার বাড়ির সদর-ঘরে কাটিয়েছে। তাদের তখন খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেছে—তাছাড়া তারা অন্য জাতও বটে—সুতরাং রাত্রের আহারও জোটেনি কারুর।

আজ সকালে উঠে যথেষ্ট ছুটোছুটি করেছে বুড়ো। কিন্তু আত্মীয়স্বজন কেউই গা করে নি; পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে। কে এ ঝগড়ায় নাক গলাবে। 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন'—এত বড় একটা জিনিস ঘাড়ে নিচ্ছে যে সে কী বলে বিষয়সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে বসে থাকে! ঐ নাতনীর বয়সী মেয়েটার কত বড় সর্বনাশ সে করছে সেটা খেয়াল ছিল না?

কারুর কাছ থেকে সহানুভূতিসূচক একটি কথাও শোনে নি বুড়ো। তখন চোখে অন্ধকার দেখেছে। শেষ পর্যন্ত বড় ছেলের শ্বশুর এবং ছোট জামাইয়ের কাছে কান্নাকাটি ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে তাদের টেনে এনেছে মধ্যস্থতা করতে। বুড়ো ভেবেছিল যে নিজের শ্বশুরের কথা বড় ছেলে কিছুতেই ঠেলতে পারবে না। আর

সে নরম হলে দল ভেঙেগ যাবে, অন্য ছেলেরাও জুৎ করতে পারবে না তখন।

মধ্যস্থ দুজনকে নিয়ে ঐন্দ্রিলার মেয়ে-জামাই একটু আগেই এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ছেলেরা কোন কথা এবং কারুর কথা শুনতেই রাজী নয়। শ্বশুর আছে শ্বশুরে আছে ঘরে আছে—এসব ব্যাপারে নাক গলাতে আসে কেন? ও বাপকে তারা কিছুতেই এ-বাড়ি ঢুকতে দেবে না। তারা ওকে বাপ বলে মানতেই রাজী নয়। ও তো বদ্ধ পাগল। মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে ধোঁককেশো বুড়োর—নইলে এ কাজ কেউ করে? গঙ্গাপানে পা হয়েছে, খাটে উঠলেই হয় এখন—সে কিনা একটা নাতনীর বয়সী কেন—নাতনীর চেয়েও বয়সে ছোট মেয়েকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এল! এখন ওদের বাড়ি ঢুকতে দেওয়া মানেই তো একটা বিধবার আজীবন খোরপোষের ভার ঘাড়ে নেওয়া। সে কাজে যেতে তারা প্রস্তুত নয়।

এই নিয়েই এখনও তকরার চলছে। বুড়োর বলতে গেলে দুদিন অনাহার, তার ওপর সকাল থেকে ছুটোছুটি ঘোরাঘুরি—তার আর সত্যিই তখন মাথার ঠিক নেই। নিজের আত্মজদেরই যে কুৎসিত ভষায় ইতরের মতো গাল দিচ্ছে, তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। ছেলেরাও অবশ্য কম যাচ্ছে না। সেদিক দিয়ে অন্তত তারাও যে বাপেরই বেটা তা প্রমাণ করে দিচ্ছে।

বিবাদ অনেকদূর গড়িয়েছে। আস্তে আস্তে সে ইতিহাস সংগ্রহ করতে ও বুঝতে ঐন্দ্রিলার সময় লেগেছে বেশ খানিকটা। ইতিমধ্যে কখন যে সে আরও সামনে এগিয়ে গিয়েছে তা নিজেই টের পায় নি। সীতা এতক্ষণ কোনদিকে মুখ তুলে তাকায় নি, ঘাড় হেঁট করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। যাদের বাড়িতে ছিল সারাদিন, তারা ভাত খাওয়াতে সাহস করে নি বামুনের মেয়েকে—জলখাবার খাইয়েছিল সামান্য কিছু। তার খাবার অবস্থাও ছিল না। উদ্বেগে দুশ্চিন্তায়, আশাভঙ্গের বেদনায় সে যেন জড় হয়ে গিয়েছিল। জড় হয়ে গিয়েছিল বলেই বোধহয় রক্ষা, নইলে তার পাগল হয়ে যাবারই কথা। এখনও এই সমস্ত অপরিচিত লোকের মধ্যে এই অতি-ইতর আবহাওয়ায় সে আরও কতকটা ভয়েই কাঠ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একসময়, যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে আটকে যাওয়ায়, হাঁপিয়ে উঠে মুখ তুলতেই মায়ের দিকে চোখ পড়ে গেল তার। সে 'মাগো' বলে চিৎকার করে ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মুখ গুঁজে অজ্ঞান হয়ে গেল।

ঐন্দ্রিলা প্রথমটা ভেবেছিল সীতা বুঝি মরেই গেল। তাছাড়া তারও এতক্ষণের ধৈর্যের বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙেগ পড়েছে তখন, কোন মতেই আর আত্মসম্বরণ করা সম্ভব নয়। সে মাটিতে আছড়ে পড়ে কেঁদে কেটে মাথা খুঁড়ে গালাগাল দিয়ে চিৎকার করে এক প্রলয় কান্ড বাধিয়ে তুলল। তাতেই কিন্তু চাকা ঘুরে গেল শেষ পর্যন্ত। অনেকেরই এবার মনে হ'ল, সত্যিই তো, ঐ একফোঁটা মেয়ের কী দোষ! অভিভাবকদের পাপে ও এত শাস্তি পায় কেন? সে কেন এত সহ্য করবে? বিশেষ ঐন্দ্রিলার কথা থেকে যখন সকলে জানতে পারল যে মেয়ের মাকে না জানিয়ে, তার মত না নিয়েই এ বিয়ে দেওয়া হয়েছে—অনাথা আশ্রয়হীনা বিধবার একমাত্র সন্তানকে ওরা ষড়যন্ত্র করে বিয়ে দিয়েছে—তখন সহানুভূতিটা পুরোপুরি এদের দিকে এসে পড়ল। কে একজন ছুটে গিয়ে ঘটি ক'রে জল এনে সীতার মুখে মাথায় ঝাপ্টা দিতে লাগল। একজন মহিলা এসে ঐন্দ্রিলাকে মাটি থেকে তুলে মুখ-চোখ মুছিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

এইবার পাড়ার লোকরা অনেকেই বুড়োর ছেলেদের ওপর রুখে উঠল। এ কী অন্যায় কথা! 'যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই!' বুড়ো খুবই খারাপ কাজ

করেছে সত্যি কথা—তবু তারই বিষয় সম্পত্তি—এইভাবে তার কাছ থেকে সব সম্পত্তি হাতিয়ে এখন তাকেই এমন করে লাঞ্ছনা করা! নিজের বাড়িতে সে ঢুকতে পারবে না! আর ঐ দুধের মেয়েটা কাল থেকে না খাওয়া না দাওয়া—পরের বাড়ি পড়ে আছে—ওর ওপরই বা অকারণ এ প্রহারী কেন? যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে—এখন এদের বাড়ি ঢুকতে দাও, মেয়েটার একটু শোবার ব্যবস্থা ক'রে দাও। বুড়ো যদি এ আহাম্মকী না ক'রে পুলিশ ডেকে তোদের তাড়িয়ে দিত—তা হ'লে তো এরই যথা-সর্বস্ব। তখন তোরা দাঁড়াতিস কোথায়, খেতিস কি?...এখনও যদি তাদের অল্পে চৈতন্য না হয় তো বুড়োকে নিয়ে ওরা থানায় গিয়ে ডায়রী করিয়ে ছেলেদের নামে মামলা করাবে। ভয় দেখিয়ে যে দানপত্র করা হয়েছে সে দানপত্রের কোন মূল্যই নেই। কোন আদালত তা মানবে না।

এই ওষুধেই ছেলেরা অনেকটা নরম হয়ে এল। এভাবে ঐন্দ্রিলা গিয়ে পড়ে কেঁদে জিতবে তা তারা ভাবে নি। হাতের উদ্যত লাঠি এবার নামল সকলকারই। কেবল মেজ ছেলে মুখ গোঁজ ক'রে বলল, 'জমি-জমাই না হয় লিখে দিয়েছে, হাতের নগদ টাকা-গুলো তো ফুরোয় নি। বুড়ো অন্য বাড়ি একটা কিনে দিক না তার ছুক্‌রী মেয়ে-মানুষকে!'

এতেও চারিদিক থেকে সকলে ধমকে উঠল। 'এ কী অভদ্র কথাবার্তা! ব্রাহ্মণের মেয়ে, দস্তুরমতো নারায়ণ অগ্নিসাক্ষী ক'রে বিয়ে করে এনেছেন তোমাদের বাবা—তার সঙ্গে এ রকম অশোভন আচরণ করা অত্যন্ত অন্যায়।'

কিন্তু সে কথা চাপা পড়ে গেল আর একটি সংবাদে। উমেশের যে বন্ধু বরকর্তা এ বিবাহে (সম্ভবত মোটা টাকা খেয়েই) এবং বিয়ে দিইয়ে নিয়ে এসেছিল কাল—আবহাওয়া অনুকূল দেখে সে এবার এগিয়ে এল,'সে টাকা কি আর আছে বাবা জীবনধন, তার আর একপয়সাও নেই। সে টাকা থাকলে তোমার বাবা এতক্ষণ বাড়ি ঠিক ক'রে বায়না ক'রে ফেলতেন। তিনিও কম জেদী মানুষ নন। নিহাৎ কারে পড়েই তোমাদের চোট খাচ্ছেন।'

শুধু জীবনধনেরই নয়, উপস্থিত সকলেরই কৌতূহল সরব হয়ে উঠল।

তখন তিনি সবিস্তারে সে ইতিহাসটুকু বিবৃত করলেন। আর তখনই ঐন্দ্রিলা জানতে পারল যে সীতার ভাগ্যে আশা বা ভরসা বলতে কোথাও কিছু আর অবশিষ্ট নেই।

সীতার ছোট কাকা ভোলা নাকি কী ফাটকা খেলতে গিয়ে আফিস থেকে হাজার-দুই টাকা ভেঙ্গে বসেছিল। এ কাজ নাকি ইতিপূর্বেও সে অনেকবার করেছে, কোন-টায় হেরেছে কোনটায় জিতেছে—অফিসের টাকা যথাসময়ে পুরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এবার ক্রমান্বয়ে লোকসান হওয়ায় দেনার অঙ্ক বেড়েই গেছে, শোধ দেবার কোন উপায় করতে পারে নি। সামনেই অডিট্—কথাটা আর চাপা থাকবে না বুঝে চোখে অন্ধকার দেখল। কিন্তু অত টাকা কোথা থেকে যোগাড় হবে—কে তাকে দেবে? এজমালি সম্পত্তি, বখ্‌রা হয় নি, সে সম্পত্তি বাঁধা দিতে বা বিক্রী করতে গেলে অন্য ভাইয়ের সই চাই। ভাই তা দিতে রাজী হয় নি। এই যখন অবস্থা—এক পা বাইরে এক পা জেলে—তখনই কার মুখে শুনল উমেশের কথা! সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ের জন্যে মেয়ে খুঁজছে, বয়স পঞ্চান্নর কম নয় এবং তার হাতে অনেক টাকা।

শোনামাত্র সে উমেশের এই বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করে! সোজাসুজি প্রস্তাব করে যে তিন হাজার টাকা পেলে এবং ওরা যদি বিবাহের যাবতীয় ব্যয় বহন করতে রাজী থাকে তো সে উমেশের সঙ্গে নিজের ভাইঝিরই বিয়ে দিতে পারে। পাছে এত-

গুলো টাকা খরচ শুনে ও তরফ ভয় পায় সেই জন্যে প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে কৌশলে মেয়েটিকে দেখাবারও ব্যবস্থা করে। মায়ের মতো অত রূপসী না হোক—সীতা লাবণ্যবতী মেয়ে। গৌরাঙ্গী নয়—তেমনি কালোও নয়, মাজা-মাজা রঙ। মুখশ্রী পেয়েছে সে বাপের কাছ থেকে—সর্বোপরি অল্প বয়স, তখন তার প্রথম কৈশোর। এ বয়সে কুৎসিত মেয়েকেও ভাল দেখায়। উমেশের মাথা ঘুরে গেল। সে এই প্রস্তাবেই রাজী হয়ে পড়ল। কথা হ'ল যে পাকা দেখার দিন দু'হাজার এবং বিয়ের দিন এক হাজার টাকা সে ভোলার হাতে দেবে এবং মেয়ের গহনা কাপড় বাসনপত্র ও খাওয়া-দাওয়ার যাবতীয় বাজার ক'রে পাঠাবে। গহনা কত দেবে তা ভোলা জিজ্ঞাসা করে নি—তার অত মাথাব্যথাও ছিল না। সেইটেই বরং উমেশ কম দিয়েছিল। কারণ অত টাকা তার হাতে সত্যিই ছিল না। সে ভেবেছিল যে তার প্রথমা স্ত্রীর দু'একখানা গহনা ভেঙ্গে নতুন ক'রে গড়িয়ে দিতে পারবে। কিন্তু বাতাসে খবর পেয়েই তার ছেলেরা আগে সে বাক্সটি আত্মসাৎ করেছিল। সুতরাং কয়েকগাছা পাত্‌লা চুড়ি এবং একগাছি সরু হার ছাড়া কোন গহনা সে দিতে পারে নি। বাকী সব খরচটাই কিন্তু ভোলা আদায় করে নিয়েছে, বলতে গেলে ওর কান ম'লে।

এইখানেই ঐন্দ্রিলা উমেশের ঐ বন্ধুর মুখ থেকে প্রথম জানল যে, শিবু আগে এ প্রস্তাবে রাজী হয় নি—বরং খুবই বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। শেষে ভোলা পুরো একটি দিন নিরম্বু পড়ে থেকে মাকে দলে টানতে মা কান্নাকাটি ক'রে মেজছেলের হাতেপায়ে ধরে তাকে রাজী করিয়েছিলেন। তাও শেষ পর্যন্ত একটি হাজার—অর্থাৎ বাড়তি টাকার সবটাই তাকে গুণে দিতে হয়েছিল। জেলটা বাঁচল এবং আপাতত চাকরিটাও রইল—ভোলার এইটুকুই নীট লাভ।

এই ইতিহাস শুনে উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে রইলেন কিছুকাল। এতখানি মূর্খতা ও উন্মত্ততা তাঁদের ধারণার বাইরে। একে ধিক্কার দিয়েও লাভ নেই, নিঃশ্বাসের অপচয়। অতিরিক্ত কামোন্মত্ততায় লোকটা শুধু এই মেয়েটারই সর্বনাশ করে নি, নিজেও সর্বস্বান্ত হয়ে বসে আছে। যতকাল বাঁচবে এদের দয়ার ওপর নির্ভর করতে হবে—এদের হাত-তোলায় থাকতে হবে। মামলা-মোকদ্দমা করে যে নিজের বিষয় ফিরিয়ে নেবে—তারও খরচ আছে, সে টাকাটাও হাতে রাখে নি। মেয়েটাকে কী করে পাবে তা-ই শুধু ভেবেছে—কী ক'রে পালন করবে তা পর্যন্ত চিন্তা করে নি।

কে একজন পিছন থেকে বললেন, 'মেয়েটারই বরাত। নইলে এমন তো কখনও শুনি নি।

উপস্থিত সকলেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সেই কথাটারই সমর্থন করলেন। কী আর করবেন তাঁরা? কী আর করবার আছে এক্ষেত্রে?

যাইহোক—চারিদিক থেকে উমেশকে লক্ষ্য করেই চাপা এবং স্পষ্ট ধিক্কার উঠলেও—তার ছেলেরা এবার বাড়ির প্রবেশপথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল। উমেশ ঘাড় হেঁট করে নববধূকে নিয়ে অবশেষে তার নিজের ঘরে গিয়ে উঠল।

তারপর অবশ্যই কর্তব্যকর্মে কোন ত্রুটি ঘটে নি। উমেশের বড়ছেলের বৌ এসে হাতজোড় করে ভেতরে যেতে বলেছে, 'যা হবার হয়েছে, এখন সন্তান মনে ক'রে মাপ করুন, দয়া ক'রে ভেতরে চলুন। স্নান-টান করে একটু কিছু মুখে দিন।'

বলা বাহুল্য ঐন্দ্রিলা ওদের বাড়ি ঢোকেনি। সেও হাতজোড় ক'রে বলেছে, 'তোমরা যেতে বলেছ এই আমার যথেষ্ট হয়েছে ভাই। কিন্তু জামাইবাড়িতে যাওয়া আমাদের বংশের নিয়ম নয়—সে আমি পারব না। এখানে যদি কোন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক দয়া ক'রে একটু আশ্রয় দেন তো রাতটা কাটিয়ে ভোরেই আমি চলে যাব।

তবুও ওরা অনুনয় বিনয় করেছিল কিন্তু ঐন্দ্রিলা কিছুতেই রাজী হয় নি। উমেশের সেই বন্ধুটি অতটা না বুঝেই, একবার বলেছিল তার বাড়ি যেতে কিন্তু তাকে মুখের ওপরই বলে দিয়েছে সে, 'আপনার বাড়ি যাব? আপনি বলছেন কোন্ মুখে? আপনার সাহস তো কম নয়। আপনি জেনেশুনে সেই কসাইয়ের সঙ্গে ষড় করে আমার মেয়ের এই সর্বনাশ করেছেন—আপনার ভিটেতে পা দিলেও পাপ হবে আমার। ব্রাহ্মণের নিষ্পাপ কুমারী মেয়ে—সাক্ষাৎ ভগবতী—কুমারী পুজো না করলে মার পুজো হয় না। টাকা খেয়ে সেই কুমারী মেয়ের সর্বনাশ করলেন আপনি—এর ফল তোলা রইল, মনে থাকে যেন। মা সর্বমঙ্গলা এর বিচার ঠিকই করবেন। আমি যাব, হাঁ যাব বৈকি—যদি কোনদিন শুনি আপনার ভিটে থেকে জোড়া মড়া বেরোচ্ছে, সেইদিন আনন্দ করতে আপনার বাড়ি যাব। তার আগে নয়!'

এর পর আর সে ভদ্রলোকের সাহস হয় নি কিছু বলতে। মুখ কালি করে চলে গেছেন। পালিয়ে গেছেন বলাই উচিত বরং।

পাড়ার অপর একটি বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা এসে তখন ওর হাত ধরে নিজের বাড়িতে টেনে নিয়ে গেছেন। সেখানে গিয়ে স্নান করেছে, আহ্নিকও করেছে কিন্তু একটু গুড়ের সরবৎ ছাড়া কিছুই খেতে রাজী হয় নি। তাঁদের বাড়িশুদ্ধ সকলে মিলে অনুরোধ করেছিলেন—একটু কিছু খাবার জন্যে। কিন্তু ঐন্দ্রিলা এক কথাতে সমস্ত অনুরোধ এড়িয়ে গেছে, 'খাব তো নিশ্চয়, এত খেয়েও যখন পোড়া পেটের খিদে মেটে নি, তখন খেতে তো হবেই। কিন্তু আজ সত্যিই মুখে রুচবে না মা কিছু। আমার বড়সাধের সন্তান, ওর মুখ চেয়েই সব দুঃখ ভুলেছিলুম এতদিন, সেই মেয়ে আজ ঐ হেঁপো-রুগী বুড়োর পাশে শুয়ে ফুলশয্যা করছে—তা জেনে আর এ গলা দিয়ে কিছু নামবে না। এ অনুরোধ করবেন না আপনারা।

অগত্যা তাঁদের চুপ করে যেতে হয়েছে। সারারাত বসে কেঁদেছে ঐন্দ্রিলা সেদিন—দুটি চোখের পাতা বুজতে পারে নি এক মুহূর্তের জন্যেও। শেষ পর্যন্ত সে ভেবেছিল মেয়েকে জোর করে নিয়ে চলে যাবে, কিন্তু যে ভদ্রমহিলা ওকে টেনে এনে-ছিলেন তাঁদের বাড়ির সকলেই বারণ করলেন, এ কাজ করতে। গিন্নি বললেন, 'দ্যাখ্ মা—তুই আমার মেয়ের বয়সী, তুই-তোকারি করছি কিছু মনে করিস নি।—যা হয়ে গেছে তা আর কিছুতেই ফিরবে না। এ হিঁদুর বিয়ে, এতে তালাক দেওয়া নেই, তবু যতদিন আছে অদৃষ্টে—সোয়ামীর ঘর করে নিক। টেনে নিয়ে গিয়েই বা কী রাজ-ঐশ্বর্য তুই দিতে পারবি মা ওকে? আর তা দিলেও—খেতে পরতে না হয় দিলি—ভাতার তো দিতে পারবি না। তার চেয়ে যা হবার হোক, তুই চলে যা। বরাতে থাকলে ঐ ঘরই দীর্ঘদিন করতে পারবে। এই যে আমার সইয়ের মেয়ে প্রভা, তার বিয়ের আটদিনের মধ্যে জামাইয়ের যক্ষ্মাকাশ ধরা পড়ল—তবু প্রভা আমার দশ বছর ঘর ক'রে সিঁথেয় সিঁদুর নিয়েই চলে গেল ড্যাং ড্যাং করে। আর তা যদি না-ই হয়, সে বরাত যদি না-ই ক'রে থাকে—মেয়েটা এখানে থাকলে, গোবেচারা ভালমানুষ কচি মেয়েটার দিকে চাইলে—ছেলে-বৌদের তবু মায়া পড়বে। ভবিষ্যতের কথাটা ভেবে দ্যাখ্। আর যতই হোক, এখনও না হয় তেমন সোমত্ত হয় নি, দুমাস পরেই হবে, তাকে সোয়ামীর ঘর ঘুচিয়ে কোথায় তুলবি বল? কতক্ষণ পাহারা দিবি? দিনরাত তো আর চোখে চোখে রাখতে পারবি নি। শেষে কি একটা কেলেঙ্কার বাধিয়ে বসবি! না না, ওসব মতলব ছাড়। যেমন একা এসেছিস একাই ফিরে যা।'

মায়ের মতো—ওর নিজের মায়ের চেয়েও বয়সে বড় ভদ্রমহিলার আন্তরিকতা-পূর্ণ কথা ঐন্দ্রিলার বড় ভাল লাগল। বুঝলও সে। ওদিকে আর যাবার চেষ্টা না

করে তাঁকে প্রণাম করে একাই ফিরল।

ওখান থেকে ফিরে সে ওদের সম্পর্কে এক নন্‌দাইয়ের কাছে গিয়েছিল মাকড়দায়। তিনি কিছুই জানতেন না, শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বিশ্বাসই করতে চান নি প্রথমটায়। ঐন্দ্রিলা অনেক ক'রে দিব্যি গেলে বলতে তবে বিশ্বাস হ'ল তাঁর।

সে ভদ্রলোক নাকি এক বড় উকীলের মুহুরী। সেইজনেই গিয়েছিল ঐন্দ্রিলা তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতে। কিন্তু তিনি বিশেষ আশাভরসা দিতে পারেন নি। বলেছেন এ ধরনের মামলা দাঁড় করানো শক্ত। টাকা খেয়ে কাকারা এ কাজ করেছে তার প্রমাণ কি? কোন লেখাপড়া তো নেই। হিন্দু বিয়ে নাকচ করাতে গেলে ঢের কাঠখড় পোড়াতে হবে। হাইকোর্টের এ ধারে কিছু হবে না। তাও, নাবালক মেয়ে ফুস্‌লে এনে বিয়ে দিয়েছে অভিভাবককে না জানিয়ে, প্রমাণ করতে প্রাণান্ত হবে। কারণ ঐ কাকাদের কাছে দীর্ঘকাল আছে, মাও এখানে আসা-যাওয়া করে—এটা প্রমাণ হয়ে যাবে সহজেই, সুতরাং ফোস্‌লানোর কেস টিকবে না, তাছাড়া লুকিয়েও দেয় নি। পাঁচটা আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণও করেছে। এ কেস হাইকোর্ট পর্যন্ত ঠেলতে অগাধ পয়সা খরচ হবে তাও ধোপে টিকবে কিনা সন্দেহ। আর—শেষ মোক্ষম কথা একটি বলেছেন তিনি—যদিই বা মামলা করে এবং জেতে —ঐ দাগী মেয়ে এনে আবার বিয়ে দিতে পারবে ঐন্দ্রিলা?

অর্থাৎ সর্বশেষ যেটুকু আশা মনে টিঁকিয়ে রেখেছিল—সেটুকুও আর রইল না।

দীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত করতে সময় লাগল যথেষ্ট। এর মধ্যেই হেম এসে গেছে একসময়। আজকাল সে বড় একটা গোবিন্দদের বাড়িও যায় না—শনিবার ছাড়া, ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে আসে। আজ বরং একটু বেশী সকাল ক'রেই ফিরেছে। আগের ট্রেনটা পেয়ে গিয়েছিল। এসে নিঃশব্দেই ওর পিছনে বসে পড়েছে—অনর্থক কথা বলবার চেষ্টা করে নি। কাহিনীর অর্ধেকেরও বেশী শুনেছে সে। বাকীটা অনুমান ক'রে নিতে আটকায় নি।

সে এবার আস্তে আস্তে—এই প্রথম প্রশ্ন করল, 'তোর শ্বশুরবাড়ি আর গেলি নি?' ঐন্দ্রিলা রাগ ক'রে সেবার চলে যাবার পর এই প্রথম কথা কইল সে ওর সঙ্গে।

ঘাড় নাড়ল ঐন্দ্রিলা। গিয়েছিল সে। কাল সেই নন্‌দাইয়ের বাড়ি কাটিয়ে আজ ভোরেই পোঁচেছিল ওখানে। ইচ্ছে ক'রেই সে সময় গিয়েছিল। অফিস বেরোবার একটু আগে—সে সময়টা স্নান আহার করার কথা—হিসেব করে ঠিক সেই সময়টায়ই পোঁচেছিল। কিন্তু সম্ভবত দূর থেকে ওকে আসতে দেখেই ভোলা পিছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। শিবু অতটা বুঝতে পারে নি, সে একেবারে সামনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার বুকের পাটাও বেশী। সে ঝেড়ে জবাব দিয়েছে। 'আমাদের কাছে রেখে গিয়েছিলে, আমরা যা ভাল বুঝেছি সেই মতো বে দিয়েছি।' টাকার কথাও সোজাসুজি অস্বীকার করেছে সে। বলেছে, 'মিথ্যে কথা। হয় তুমি বানিয়ে বলছ, নয় তো তোমার পাগলামি কান্ডকারখানা দেখে তারাই ক্ষেপিয়ে দিয়েছে আরও ইচ্ছে করে। অত নগদ টাকা তার হাতে থাকলে আর ভাবনা ছিল না। তাছাড়া কী এমন ফেল্‌না পাত্তর। অত বিষয়সম্পত্তি যার তার কি মেয়ের অভাব হয়! দুপায়ে জড়ো করতে পারত সে। আর তোমার মেয়েই বা কী এমন রূপসী নূরজাহান যে তার জন্যে পয়সা লুটিয়ে দেবে। তবে হ্যাঁ—ঐ বিষয়সম্পত্তি দেখেই দিয়েছিলুম, সত্যি কথা। সে তোমার মেয়েরই জন্যে। সে-ই সুখে থাকবে বলে। তা সে যে সব ছেলেদের নামে লিখে দিয়ে বসে আছে—কেমন ক'রে জানব বলো। তবে ও যা তোখড় লোক, ঠিক সব বাগিয়ে নেবে আবার। তোমার তো পয়সার জোর নেই এক কানা-

কাঁড়রও, এ বিয়ে না হ'লে কী বিয়ে দিতে তুমি? একটা কুলিকাবারি বিড়িওলা দেখে বিয়ে দিতে হ'ত। মাতাল নেশাখোর—এই জুটত শেষ পর্যন্ত। এ তো তবু নাম-করা ভদ্দরলোক একটা—সাতখানা গাঁয়ের লোক চেনে! মেয়েও তোমার সুখে থাকবে দেখো। বুড়ো বয়সের বৌ, হাতের তেলোয় রাখবে। বলি আট বছরের মেয়ে দুগ্‌গা —শখ ক'রে বুড়ো শিবকে বিয়ে করেন নি?'

এইসব অবান্তর কথা বলে গেছে এলোপাতাড়ি। মুখ খোলবার অবকাশই পায় নি ঐন্দ্রিলা। অবশ্য তারপর আর দাঁড়াতে পারে নি বেশিক্ষণ। সে যখন মুখ ছুটিয়েছে-, শাপশাপান্ত শুরু করেছে—তখন অফিসের নাম ক'রে বেরিয়ে গেছে না খেয়েই। ভাত বাড়া ঘরের মধ্যে দেখেছে সে। কিন্তু ভাত খেয়ে যেতেও সাহসে কুলোয় নি শিবুর।

'আর তোর শাশুড়ী মাগী?' হেম জিজ্ঞাসা করলে।

'সে কি আর বেরোল নাকি? আমাকে দেখেই ঘরে খিল দিয়েছিল—সেই খিল দিয়েই বসে রইল। ক্যাঁট ক্যাঁট ক'রে যা মুখে এল শোনালুম। গাল দিলুম, মন্যি দিলুম—সব হজম করলে বসে বসে। শেষে শিবুর বৌটা এসে পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল, বলে, ও দিদি, চুপ কর দিদি, আমি ওর হয়ে মাপ চাইছি ঘাট মানছি—দিদি, পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বাস করি—ওদের মুখের দিকে চাও একটু। ওরা তো কোন অপরাধ করে নি! ওর কান্না দেখেই চুপ করলুম। আর কীই বা করব, গাল দিলে কি আর মেয়ের বে ফিরবে? তাছাড়া, পাড়ার অনেকে ছুটে এসেছিল তো চেঁচামেচি শুনে, তারাও থামিয়ে দিলে—মজুমদার-গিন্নী জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেল নিজের বাড়ি। অগত্যা চুপ ক'রে যেতে হ'ল। বুঝতেই তো পারছি, পয়সা খেয়ে ওরা যে-কালে এই কসাইয়ের কাজ করেছে, সে কালে গাল-মন্দ খাবার জন্যে তৈরী হয়েই আছে। ওতে কিছু হবে না। এখন কিসে একটা বিহিত হয়, তোমরা যুক্তিপরামর্শ ক'রে সেইটে বল। পুলিশে যাব একবার? ওদের নামে এই সব কথা যদি লিখিয়ে দিয়ে আসি? পুলিশ কিছু করবে না?'

অনেক আশা, অনেক আগ্রহ নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে আছে ছোট বোন। তাকে নিরুৎসাহ করতে মন চায় না।• তবু ঘাড় নাড়তেই হয় হেমকে।

'নাঃ!......ও তোর ননদাই যা বলেছে তাই ঠিক। আশা কম—আর লড়তে গেলেও বিস্তর টাকার খেলা। অর্থবল লোকবল দুই-ই চাই। আমাদের ও কোনটাই নেই। পড়ে মার খাওয়া ছাড়া আমি তো আর কোন উপায় দেখি না।'

'কোন উপায় নেই? কী বলছ দাদা?' প্রশ্ন নয়—যেন আর্তনাদ করে ওঠে ঐন্দ্রিলা, 'তাহলে মেয়েটা ঐ ভাবে জ্যান্তে মরা হয়েই থাকবে চিরকাল? কোন বিহিত হবে না?'

চুপ করে থাকে হেম। কী বলবে, কী বোঝাবে ওকে!

প্রাণপণে কটি মুহূর্ত হতাশাকে ঠেকিয়ে রেখে শেষ বিন্দু আশা আঁকড়ে ধরে থাকে ঐন্দ্রিলা উত্তরের অপেক্ষায়। কিন্তু দাদার নিরুত্তর স্তব্ধতায় সে আশা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ে যায়।

আর একবার হাহাকার ক'রে কেঁদে ওঠে। আর একবার নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। এদের ওপর দোষারোপ করে, ওদের গালাগালি ও অভিসম্পাত দিতে থাকে, মেয়ের বৈধব্য কামনা করে। এ বিবাহিত জীবনের চেয়ে সে ভাল। না হয় মা মেয়ে একসঙ্গেই একাদশী করবে। সে ঢের ঢের ভাল। তারপর একসময় আবার দৈহিক শ্রান্তিতেই চুপ করে।

শ্রান্তির মতো সান্ত্বনা আর নেই। বুঝে এরাও চুপ করে থাকে। ওর মিথ্যা অভিযোগেরও উত্তর দেবার চেষ্টা করে না কেউ।

নবম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

এতবড় বাড়িতে বসে পড়বার মতো একটু জায়গা খুঁজে পায় না অরুণ। এটা তার কাছেও সময়ে সময়ে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু তবু কথাটা—তার কাছে অন্তত—মর্মান্তিকভাবেই সত্য। শুধু যে এ বাড়িতে কেউ পড়ে না তাই নয়—আর কাউকে পড়বার সুযোগ দিতেও প্রস্তুত নয়। এখানে যেন দিনরাতই হাট বসে আছে। হঠাৎ দূর থেকে এদের বাড়ির দিকে এলে মনে হয় কী কারণে দারুণ একটা চেঁচামেচি হচ্ছে। এরা সাধারণ কথাও কয় চেঁচিয়ে। কর্তাদের যেমন গলাই শোনা যায় না—সকলেই আস্তে আস্তে কথা বলেন—ছেলেদের তেমনি ঠিক বিপরীত, তারা আস্তে কথা বলতেই পারে না; আর তাদের সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গিন্নীদেরও অভ্যাস হয়ে গেছে সর্বদা চীৎকার করে কথা বলা। তার ওপর এদের আড্ডা যা কিছু বেশীর ভাগই বাড়িতে, ভায়ে ভায়ে। পাড়ার কোথাও এদের আড্ডা জমে না, তার কারণ এই বয়সী ছেলেদের মধ্যে এমন বেকার খুঁজে পাওয়া কঠিন। লেখাপড়া করুক না করুক—ইস্কুল কলেজে যাওয়ার একটা ঠাট বজায় রাখে অন্য ছেলেরা। এরা সেদিক থেকে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ, তাই অবসরও এদের অখন্ড।

এ ছাড়া আর একটা ব্যাপার আছে। পাড়ার অপর ছেলেরা কথাবার্তা কইলেও এদের একটু হীন চোখে দেখে। অন্তত অরুণের তাই অনুমান। সেটা এরাও খানিকটা বোঝে, সে কারণেও কতকটা আরও গৃহকেন্দ্রিক। আর সেই কারণেই অরুণের ওপরেও এদের একটা আক্রোশ। বোধ হয় মনে করে, শিক্ষানুরাগের এই একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ওদের নিরন্তর নিঃশব্দে ধিক্কার দিচ্ছে এবং অহরহ ঘরেবাইরে সকলের কাছে ছোট করে দিচ্ছে। অরুণ যে কখনও এ বাড়ির বাইরে কোথাও যায় না—এমন কি ইস্কুলে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও বড় একটা কারুর সঙ্গে মেশে না—প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি মুহূর্তও বাইরে থাকে না—সেটাও ওদের কাছে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার বলে বোধ হয়।

সেইজন্যেই অনেক খুঁজে খুঁজে যদি বা একটি নিভৃত কোণ বার করে অরুণ—সেটা বেশীক্ষণ নিভৃত থাকে না। এদের সজাগ সতর্ক দৃষ্টি সর্বদা ওকে অনুসরণ করে, একটু পরেই সেখানে গিয়ে হাজির হ'তেও দেরি হয় না। এক খুব ভোরে উঠে বাগানের কোথাও গিয়ে বসলে খানিকটা সময় পাওয়া যায়—কারণ এদের রাতও হয় যেমন অনেক দেরিতে, তেমনি ভোরও সহজে হ'তে চায় না। অনাবশ্যক বসে বসে রাত জাগে বলে এধারেও উঠতে দেরি হয়। অরুণও সকাল করে শুতে পারে না এদের অত্যাচারে। তবু ওকে ভোরে উঠতেই হয়। কারণ দিনেরাতে এই যা একটু অবসর, ওদের ঘুম ভাঙ্গবার আগে পর্যন্ত। সে ওদের ঘুমের সময়টায় সারারাত জেগেও পড়তে প্রস্তুত ছিল—যদি আলোর একটা ব্যবস্থা থাকত। এ বাড়ির মেজকর্তা অর্থাৎ তার মেসোমশাই এতখানি তেল খরচ বরদাস্ত করবেন না, তা সে জানে।

শুধু যদি চেঁচামেচি হট্টগোল হ'ত তাহলেও অতটা অসুবিধা হ'ত না। কারণ সাধারণ প্রতিকূল পরিবেশেও মন বসবার মতো পাঠে আসক্তি যথেষ্ট ছিল ওর। কিন্তু এদের আক্রমণটা যে শুধু পরোক্ষ নয়—অনেকখানি প্রত্যক্ষও। ওকে পড়তে বসতে দেখলেই এরা নানারকম অত্যাচার শুরু করে দেয়। ঠাট্টা বিদ্রূপ টিট্‌কিরির ঝড় বইতে থাকে। ওর কানের কাছে এসে হয়ত চিৎকার করে বলে ওঠে একজন, 'ওগো তোমরা কেউ এখানে কথা কয়ো নি গো কথা কয়ো নি, দুটি ঠোঁট ফাঁক করো নি। বেদব্যাসের ধ্যান ভেঙ্গে যাবে, খুব সাবধান।'

আর একজন হয়ত অমনি সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ো তোলে, 'চেঁচাস কেন ছোঁড়া—তোর চিচ্‌কারে বিদ্যের জাহাজ ফুটো হয়ে যাবে যে।'

সঙ্গে সঙ্গে হেসে গড়িয়ে প'ড়ে হয়ত একজন বললে, 'দূর—চিচ্‌কারে নাকি আবার জাহাজ ফুটো হয়।' আগের লোক আরও চেঁচিয়ে হাত পা নেড়ে জবাব দিলে,—'একি তোর নোহার জাহাজ যে ফুটো করতে কামান বন্দুক চাই—এ বিদ্যের জাহাজ, চিচ্‌কারেই ফুটো হয়ে যায়।'

কেউ হয়ত আবার ওর চোখ এবং খোলা বইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় জোড়হস্ত এগিয়ে দিয়ে—যাতে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকে—বলে, 'ওগো বিদ্যাসাগর মশাই, তোমার বিদ্যে থেকে একটু ভাগ দেবে আমাকে? দাও না ভাই, একটা পেরেক-টেরেক মেরে মগজে ঢুক্যে—একটুখানি বিদ্যে।'

সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে হয়ত প্রচণ্ড ধমক এসে পড়ে, 'না না, তোমরা অমন করে ওর পিছনে লেগো নি। মেজকাকা জানতে পারলে দেক্যে দেবে মজা। ও বলে লেখাপড়া শিখে জজ ম্যাজেস্টার হবে—গোরুর গাড়ি বোঝাই করে ছালাছালা টাকা এনে দেবে মেজ কাকাকে—!' ইত্যাদি ইত্যাদি—চারিদিক থেকে চলবে এই সপ্ত-রথীর আক্রমণ।

প্রথম প্রথম একটু আধটু প্রতিকার বা প্রতিবাদের ক্ষীণ চেষ্টা করত অরুণ। যুক্তি দিয়ে, যথোপযুক্ত উত্তর দিয়ে,—কখনও বা অনুনয়-বিনয় করে ওদের প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করত সে। কিন্তু একেবারেই সে সব চেষ্টা বৃথা দেখে ক্রমশ হাল ছেড়ে দিয়েছে। এ তার শক্তির বাইরে। জ্ঞান হবার পর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত একান্ত দুর্দশায় ও পরানুগ্রহে কাটাবার ফলে ওর মনের মেরুদণ্ডই গেছে ভেঙ্গে। কোথাও কোন কারণে সামান্যমাত্র অধিকার কায়েম করা—এমন কি দাবি করারও শক্তি নেই আর। ওদের এইসব টিট্‌কিরির যোগ্য উত্তর মনে এলেও মুখ ফুটে তা প্রকাশ করতে পারে না। বিনা কারণেই সকলের কাছে সর্বদা যেন ভয়ে ভয়ে থাকে। তাই এদের এই অর্থহীন আক্রোশ এবং ইতর ব্যবহারের কোনরকম প্রতিরোধ করার কথা কল্পনামাত্র করতে পারে না, মাটির দিকে চেয়ে মাথা নামিয়ে বসে থাকা শুধু। খুব অসহ্য হ'লে একবার হয়ত চোখ তুলে অসহায়ভাবে করুণ মিনতির দৃষ্টিতে চায়—কিন্তু সে চাহনির অর্থ অপাত্রে প'ড়ে আরও নিষ্ঠুর কৌতুকেরই সৃষ্টি করে, ফল কিছু হয় না।

শুধু একটা দিকে কিছু শক্তি তার এখনও প্রকাশ পায়—সেটা আত্মদমনের ক্ষেত্রে। নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতোই চোখের জলটাকেও সে শাসন করতে পারে এখনও। ক্ষোভে দুঃখে—প্রতিকারহীন অবিচারে যখন তার বুক ভেঙ্গে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায় তখন—তার এই অবস্থার একমাত্র সান্ত্বনা যে অশ্রুকে সে প্রাণপণ চেষ্টায় ফিরিয়েই দেয়—বাইরে তার একটি বিন্দুও প্রকাশ পায় না। এদের অকরুণ বিদ্রূপ-দৃষ্টির সামনে সে জল যে এতটুকু সহানুভূতির উদ্রেক করতে পারবে না—

বরং নবতর অত্যাচারেরই ইন্ধন যোগাবে তা সে জানে।

প্রতিকার যাঁরা করতে পারতেন—কর্তা বা গিন্নীরা—তাঁদের গোচরে এটা—অন্তত এতটা—কখনই হয় না। মুখ ফুটে এসব কথা তাদের কাছে গিয়ে বলা বা নালিশ করা অরুণের সাধ্যের বাইরে। তাই তাঁরা কেউ জানতেও পারেন না। এক কিছুটা জানে মহাশ্বেতা—তাও সবটা নয়। এতটা জানলে হয়ত সেও প্রতিবাদ করত। তার স্বভাবত স্নেহপ্রবণ মন এতখানি বরদাস্ত করতে পারত না। সবটা জানে না বলেই বরং মনে মনে সে একটু উৎফুল্ল হয়। কারণ ওরও একটা অব্যক্ত নালিশ আছে অরুণ সম্বন্ধে। ওর ছেলেদের যে আদৌ লেখাপড়া হ'ল না, সেজন্যে বিচিত্র মানসিক কারণে অরুণকেই দায়ী মনে হয় তার। তারও মনে হয়, অরুণের এই বিদ্যানুরাগটা অহরহ তার ছেলেদের মূর্খতাকে ধিক্কার দিচ্ছে আর সকলের কাছে ছোট ক'রে দিচ্ছে তাদের।

অরুণ যদি তার নিজের মাসীকেও এটা জানাতে পারত কি তার কাছে কোন প্রতিকার প্রার্থনা করত তাহলে কি ফল হ'ত তা বলা কঠিন। কিন্তু একেবারেই চুপ করে থাকার ফলে প্রতিকার কি প্রতিবিধানের কোন আশাই থাকে না। এক সময় তার এতদিনের এত-ঘা-খাওয়া মনও হতাশায় ভেঙে পড়ে। মনে হয় সে বুঝি পৃথিবীতে আসার সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে দু-হাত ভরে শুধু অন্ধকারের অভিশাপই চেয়ে এনেছে এ জন্মের পাথেয়—তার জীবনে তাই আলোকের আশীর্বাদ কখনই নামবে না।

তবু ওর এই বর্তমান জীবনের আদি-অন্তহীন অন্ধকারে একটি স্বর্ণালোক-রেখা ছিল বৈকি।

আলোক-রেখা না বলে হয়ত তাকে আলোকদূতী বলাই উচিত। অন্তত অরুণের তাই মনে হয় মাঝে মাঝে। নিঃসীম অন্ধকারে সে যেন আলোকশিখা বয়ে এনে হাজির হয়। আর আসে সে আপনা থেকেই, না ডাকতে।

সে হ'ল বুঁচি—মহাশ্বেতার মেয়ে স্বর্ণলতা।

সেই প্রথম দিনটি থেকেই সে ওর সহায়! ওর বন্ধু।

সে-ই মেজকাকীকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওকে ইস্কুলে ভর্তি করিয়েছে, সেই মেজকাকাকে দিয়ে ওর পড়ার বই আনিয়ে দিয়েছে। দিনকতক তাকেও লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিল অরুণ, বই খাতা সুদ্ধ টেনে বসাত রোজ—কিন্তু বেশীদিন সে চেষ্টা ওর ধাতে সয় নি। দিনকতক পরে হাঁপিয়ে উঠেছে, বলেছে, 'না বাপু, রক্ষে করো এ আমার দ্বারা হবে না। মা সরস্বতী কি সকলের সয়? সয় না। পড়তে গেলেই মাথার মধ্যে সব যেন গুইলে যায়। তার চেয়ে আমার হাঁড়িবেড়িই ভাল। তুমি আর ও চেষ্টা করো নি। মিছিমিছি তোমার সময় অপচ। আমাদের বংশে লেখাপড়ার পাট নেই, তুমি চেষ্টা করলে কি হবে বলো! বলি, হ'লে তো আমার ভেয়েদেরই অগে হবার কথা গা? ওরা তো বেটাছেলে। তা ওদেরই কি হ'ল?'

সত্যি-সত্যিই, হাঁড়ি-বেড়ি নিয়েই থাকতে ভালবাসে সে। আর সে-ই হয়েছে অরুণের মুশকিল। রান্নাঘরের বাইরে কোথাও তার টিকি দেখা যায় না। কদাচিৎ এঘর-ওঘর আসা-যাওয়ার পথে হঠাৎ যদি নজরে পড়ে যায় তার ভাইদের কাণ্ড—তখনই ছুটে আসে সে। চোখমুখ গরম করে ভুরু কুঁচকে গুরুজনদের মতোই তিরস্কার করে, 'আবার তোমরা ওর পেছনে লেগেছ? লজ্জা করে না তোমাদের! নিজেদের সবকটি ন্যাজই তো কেটে বসে আছ, এখন ওরটা না কাটতে পারলে মুখ্খুর খাতায় নামটা না তুলতে পারলে—বুঝি মনটায় সোয়াস্তি হচ্ছে না। কেন, কী জন্যে

এখানে এসেছ তোমরা—কি দরকার? সরে পড়ো, সরে পড়ো বলছি সব—সোজা ঐ পগারধারে গিয়ে বসে থাকো, তোমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করার মতো ভাম-ভোদড় বেন্তর মেলবে!'

রাগ হবারই কথা, হয়ও। যদি কাছাকাছি শ্রুতিসীমার মধ্যে মেজকাকা বা মেজ-কাকী না থাকে তো সাহস করে কেউ বলেও বসে, 'দ্যাখ, মুখ সামলে কথা বলবি বলে দিচ্ছি। বেশ করেছি এখানে এয়েছি। আমাদের খুশি এখানে থাকব। কী হয়েছে কি তাতে? ইঃ—উনি লেখা-পড়া করবেন বলে আমরা সবাই দিনরাত মুখে গো দিয়ে থাকব—না? ভারী আমার এলে-বিয়ে পাসের পড়া পড়ছেন রে।'

'বলি এলে-বিয়ে না হয় না'ই হল—ও যে টুকুন পড়ছে তাও তো তোমাদের কারুর সাধ্যিতে কুলোল না। লেখাপড়ার মহিমে তোমরা কি বুঝবে—গো-মুখ্খুর দল।'

'দ্যাখ বুঁচি—,' কেউ হয়ত জোর করে একটু ধমকের সুর গলায় আনবার চেষ্টা করত কিন্তু সূচনাতেই তার সে প্রচেষ্টার অপমৃত্যু ঘটিয়ে হাত-পা নেড়ে চোখমুখের বিচিত্র ভঙ্গি করে বুঁচি উত্তর দিত, হ্যাঁ—দেখেছি দেখেছি, খুব দেখেছি। যাও না মেজকাকাকে গিয়ে বল না যে তোমাদের আমি গোমুখ্খু বলেছি—জবাবটা সে ব্যক্তি কি দেয় শুনে এসো না। যাবে? দ্যাখো—যদি একা যেতে ভরসায় না কুলোয় তো না হয় আমার সঙ্গেই চলো, আমি নে যাচ্ছি।'

তারপরই আবার ভ্রূ কুঁচকে দস্তুরমতো ভয় দেখাবার ভঙ্গীতে বলত, 'কী তোমরা ভালয় ভালয় যাবে এখান থেকে—না আমিই গিয়ে মেজকাকাকে বলব?'

এর পর আর কারুরই সাহস হ'ত না সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে। যেন কিছুই হয় নি, যেন তাদের ভয় পাবার কোন কারণই নেই, বুঁচির কথাটা তারা কানেও তোলে নি ভাল করে—মুখের ওপর প্রাণপণে এমনি একটা নিরুদ্বিগ্ন উদাসীনতা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে করতে একে একে তারা সবাই সরে পড়ত। তারা নিজে-দের মর্জিমতোই যাচ্ছে যেন—অপর কারও হুকুমে নয়, এইটেই প্রতিপন্ন করতে চাইত তারা; কিন্তু পিছনে স্বর্ণের সবিদ্রূপ হাসে তাদের আত্মসম্মানের সেই আশ্রয়টুকুও রাখতে দিত না শেষ পর্যন্ত।

আর ওর ঐ আশ্চর্য শক্তি দেখে বিস্ময়ের সীমা থাকত না অরুণের।

ঐ অতোটুকু মেয়ে—বয়সের তুলনাতেও অনেক ছোট দেখায় ওকে— কিন্তু কী অনায়াসেই না এদের শাসন করে সে—এই অর্ধ বর্বর বড় বড় ভাইদের! কোথা থেকে এই শক্তি এই গাম্ভীর্য আসে ওর?

ওরা সবাই চলে গেলে বহুক্ষণ পর্যন্ত অবাক হয়ে সেই কথাই ভাবত সে বসে বসে।

অবশ্য ঠিক তখনই সময় মিলত না কোন কিছু ভাববার।

ওরা চলে গেলে অরুণকে নিয়ে পড়ত স্বর্ণ।

'আচ্ছা, তুমি কী বলো তো? বিধাতা কী দিয়ে গড়েছেন? এতটুকু হায়াপিত্তি বলে কিছু থাকতে নেই তোমার? ঠায় বসে বসে এই বাঁদরামো সহ্যি করো কি করে? একটু বলতে পারো না ওদের, একটু চোখ রাঙাতে পারো না?'

ওকে দেখলেই—কে জানে কেন—অরুণ যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠত, তার চির-দিনের বোবামুখেও হাসি ফুটত। হয়ত হেসে বলত, 'চোখ রাঙানো কি সব চোখে মানায়? ওর জন্যে ভগবান আলাদা রকমের চোখ দিয়ে পাঠান যে!'

কপট ক্রোধে চোখ মুখ রাঙা করে উত্তর দিত বুঁচি, 'কেন বলো তো যখন-তখন আমার কটা চোখের খোঁটা দাও। বেশ বেশ! আমার চোখ কটা আছে আমারই

আছে—তোমার তাতে কী?'

সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভ হয়ে পড়ত অরুণ। সত্যিই বুঁচির যেমন মেমেদের মতো সাদা রঙ, তেমনি তাদের মতোই কটা চোখ। কিন্তু অত ভেবে কিছু বলে নি অরুণ, কটা চোখের কথা মনেও ছিল না তার। থাকলে কখনই বলত না। আসলে স্বর্ণর চেহারা নিয়ে কোন দিনই মাথা ঘামায় নি সে। ওর মুখচোখ কেমন তা বোধহয় খুঁটিয়ে দেখেও নি।

ঘাড় হেঁট ক'রে তাড়াতাড়ি জবাব দিত, 'না না—বিশ্বাস করো, সত্যিই আমি সে ভাবে কথাটা বলি নি। তুমি কিছু মনে করো না। আর কোন দিন বলব না তোমার চোখের কথা!'

গম্ভীরভাবে বুঁচি বলত, 'হ্যাঁ, মনে থাকে যেন। আর কোনদিন বলো নি।'

তারপরই—অরুণকে চমকিত ও চমৎকৃত ক'রে উচ্ছ্বসিত হাসিতে লুটিয়ে পড়ত সে, 'ধন্যি, বাবা ধন্যি। ধন্যি ছেলে বটে তুমি যা হোক! বেটাছেলে মানুষ, একটুতে এমন আউতে পড় কেন? কটা চোখকে কটা বলে ঠাট্টা করলেই বা দোষ কি? সকলেই তো করে! বেশ করেছি বলেছি—এ বাক্যি কি তোমার মুখে বেরোয় না?'

সে হাসি সংক্রামক রোগের মতোই অরুণের মনেও সঞ্চারিত হয়। সেও হাসে। অল্প-অল্প, অপ্রতিভের হাসি। সুখের হাসিও। স্বর্ণের এ কথা তার মনে কোন বেদনাবোধ জাগায় না, কোন গ্লানি আনে না। বরং একটা আশ্চর্য রকমের সান্ত্বনার, একটা আশ্বাসের প্রলেপ বুলিয়ে দেয় যেন ওর মনের সুগভীর ক্ষতগুলোয়। মনে হয় কোন কঠিন রোগ-ভোগের পর যেন বলকারক পথ্য লাভ করেছে সে, সঞ্জীবনী সালসা সেবন করেছে।

অবশ্য কথা সে বলতে পারে না কিছু! এসব কথা জানাবার শক্তি বা সাহস তার কাছে কল্পনাতীত। সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে শুধু। কিন্তু স্বর্ণেরই বা দাঁড়িয়ে তার কথা আদায় করার অবসর কই। সে যেমন ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে আসে, তেমনি ব্যস্ত-সমস্ত ভাবেই চলে যায়।

আর সে যাবার পর অনেকক্ষণ ধরে ভাবে অরুণ, মেয়েটাকে যদি একটু লেখা-পড়া শেখানো যেত তো বেশ হ'ত। কত কী জানবার আছে পৃথিবীতে, কত কী শেখবার আছে—তার কোন খবরই রাখল না। শুধু হাঁড়ি-বেড়ি আর সংসারের কাজে কী যে রস পায় ও।

॥ ২ ॥

এত টাকার মুখ মহাশ্বেতা কখনও দেখেনি তার জীবনে। এক টাকায় দু আনা সুদ পাওয়া যায় তাও কখনও শোনে নি। তার মা টাকা ধার দেয় সে জানে—টাকায় এক পয়সা সুদ মেলে। তাও একশ কি পঞ্চাশ হ'লে শতকরা এক টাকার হিসেব। একেবারে শুধু হাতে দিলে সেইটেই বড় জোর দেড় টাকায় ওঠে। কিন্তু এক মাসে একশ টাকায় সাড়ে বারো টাকা সুদ—কখনও কখনও সুযোগ-মতো পনেরোও আদায় ক'রে দেয় অভয়পদ—'এ যে গপ্প কথা একেবারে। বাবা, এ যে একরাশ টাকা। একটা বাবুর মাইনে বলতে গেলে।...হ্যাঁ গা, সত্যি টাকা তো এসব—নাকি মেকী? বলি জালটাল নয়?'

অভয়পদ গম্ভীরভাবে বলে, 'বাজিয়ে দ্যাখো না, কাঁসার টাকা বলে কি মনে হচ্ছে?'

'কে জানে বাপ্‌। সন্দ হয় যেন। মড়ারা এত টাকা পায় কোথা থেকে? এ তো কুবেরের ঐশ্বর্য্য!'

সত্যিই তার বিশ্বাস হ'তে চায় না ব্যাপারটা। টাকা হাতে পেলেও না। মাঝে মাঝে অকারণেই নাড়া-চাড়া করে, বার করে গুণে দেখে। দুশো টাকা এনেছিল সে মার কাছ থেকে, পাঁচ-সাত মাসেই বেড়ে সেটা প্রায় ডবল হয়েছে। এ কী সহজ কথা!

তবে টাকাটা হাতে থাকে না বেশী দিন এটা সত্যি। মাসের শেষে ধার দেয়—দশ বারো দিন থাকতে—আবার মাসকাবারে ফেরৎ পায়। মাঝের কটা দিন মাত্র নাড়তে চাড়তে পায় সে। তা তার জন্যে দুঃখ নেই ওর, টাকা খাটাই তো লক্ষ্মী, বসে থাকলে আর তার দাম কি? বলি বাক্সে তুলে রাখলে ষোল বছরেও তো একটা পয়সা বাড়বে না! (এ কথা সবই অবশ্য অভয়পদর মুখে শোনা—তবে এ যে 'লেহ্য' কথা তা সেও বোঝে।)

সব মাস-কাবারে সব টাকা ফেরৎ পায় না। তা না পাক, পরের মাস-কাবারে ডবল সুদ পাবে তা সে জানে। সেদিকে মিন্‌সে খুব হুঁশিয়ার আছে—গলায় জোল দিয়ে আদায় করে। সুদটা ঠিকমতো পেলেই হ'ল। সুদের জন্যেই তো টাকা খাটানো। না-ই বা পেলে হাতে সব মাসে। সে তো বাড়ছে সেখানে।

আজকাল অনেক শিখেছে সে, এ বিষয়ে অনেক জ্ঞান হয়েছে। সুদ পড়ে থাকলে তারও সুদ পাওয়া যায়—এ সে জানত না। এটা বলেছে মেজগিন্নী। মেজগিন্নী অনেক জানে সত্যি। কে জানে হয়ত বা মেজগিন্নী নিজেও এ কারবার করে লুকিয়ে। হয়ত মেজকর্তাই খাটিয়ে দেয় টাকাটা, ওদের কাছে সাধু সেজে থাকে। ওদের টাকা সুদে খাটলে যদি বেড়ে যায় অনেক, ফুলে-ফেঁপে যদি বড়লোক হয়ে ওঠে মহাশ্বেতা—সে কি সহ্য হয়? সেই ভয়েই হয়ত দাদাকে অত সাধু-উপদেশ দিয়ে আটকাতে চেয়েছিল। সব পারে ওরা, কর্তাগিন্নীর অসাধ্য কিছু নেই। নিশ্চয়ই তাই। ভেতরে ভেতরে নিজেরাও ঐ কাজই করছে—মেজগিন্নীর বুকপোঁতা করছে শুধু। নইলে এত কথা জানল কী করে?

শুধু কী তাই। আবার নাকি কি কী চটায় আর কিস্তিতে টাকা ধার দেয় বাজারে, তাও জানে মেজবৌ। বলে, 'ও দিদি, অমন ক'রে বটঠাকুরের হাততোলায় থাকার দরকার কি, টাকা খাটাতে চাও তো বাজারে খাটাও না, মোটা লাভ।'

'সে আবার কি লো? বাজারে খাটাব কি? সে আবার কী ক'রে খাটাতে হয়?'

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বেশ উৎসুকভাবেই জিজ্ঞাসা করে মহাশ্বেতা।

'সে তো খুব সোজা গো। ধরো যার কাছ থেকে মাছ কেনা হয়—তাকে দশ টাকা ধার দিলে, পরের দিন থেকে একশ' দিন পর্যন্ত রোজ সে তোমাকে দশ পয়সা ক'রে আদায় দিয়ে যাবে। মোটা সুদও পেলে, আবার সুদ ছাড়া কোন্ না মাঝে মাঝে কিছু মাছও আদায় হবে মাগ্‌না!'

'অ। তা সে কত ক'রে পোষাল তাহলে?'

আরও উৎসুক, আরও সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে মহাশ্বেতা। প্রাণপণে হিসাবটা মাথায় আনবার চেষ্টা করে।

'বাবা এত হিসেব বুঝছ আজকাল! বলে কত ক'রে পোষাল! দিদি আর সে মানিষ্যি নেই!

'নে বাপু, তোর রঙ্গ রাখ। যা বলছিলি তাই বল।'

'বলি এত কারবার করছ, এ সোজা হিসেবটা বুঝতে পারলে না? এক টাকায় তো

চৌষট্টি পয়সা গো? চৌষট্টি পয়সা ধার দিয়ে সে জায়গায় পাচ্ছ একশ' পয়সা। এক টাকা ন' আনা। তাহলে একটাকায় ন আনা পেলে। অনেক লাভ।'

'তেমনি তো একশ' দিন ধরে চলবে লো! সে তো তিন মাসের বেশী হয়ে গেল তা'হলে। সে আর এমন কি?'

'বাব্‌বা, তুমি তার চেয়েও বেশী চাও। তোমার খাঁই তো কম নয়। আরও বেশী পাও বুঝি? তা'হলে তুমি তো টাকার কুমীর হয়ে পড়বে গো!'

'হ্যাঁ, তা আর নয়! তা'হলে আর ভাবনা ছিল না। লাভ তো কত।...কী যে বলিস!'

অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি কথা চাপা দেবার চেষ্টা করে। আরও গোলমাল হয়ে যায়, আরও উলটো-পালটা বলে ফেলে। নিজেও বুঝতে পারে সে কথাটা। অনুতাপের সীমা থাকে না। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই মনে মনে নিজের কান মলে। কেনই যে এসব কথা তোলে সে, আর কেনই বা হাটিপাটি পেড়ে এ-সব সুদে খাটানোর কথা বলতে যায়! পেটে যে কেন কথা থাকে না তার—তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

এত ঠকে তবু তার লজ্জা নেই! ছি, ছি!

মনে মনে বার বার নিজেকে তিরস্কার করতে থাকে মহাশ্বেতা।

যে কোন কথাই মাথায় ঢুকতে দেরি হয় মহাশ্বেতার, কিন্তু তেমনি একবার ঢুকলেও সহজে আর বেরোতে চায় না। টাকায় টাকা বাড়ে—এই কথাটা মাথায় ঢোকবার পর সে প্রাণপণে মূলধন বাড়ানোর কথাই চিন্তা করে আজকাল। মার কাছ থেকে আর এক খেপ টাকা এনেছে সে। কদিন পরে আরও একবার গিয়েছিল কিন্তু শ্যামা কিছু দেন নি। হাঁকিয়ে দিয়েছেন সোজাসুজি।

'টাকা কি আমার কাছে বসে থাকে? এখন টাকা নেই, যা!'

'তা তুমি যে আমার টাকা খাটাও তা তো বলো নি বাপু এতদিন!' অপ্রসন্ন মুখে বলে মহাশ্বেতা।

ঠিক এই ভয়ই করেছিলেন শ্যামা। এর পর সুদের কথা উঠবে, হিসেব চেয়ে বসবে হয়ত। তিনি প্রস্তুতও ছিলেন সে জন্যে। বললেন, 'সব সময় কি আর খাটাই। এক-আধবার তেমন লোক এসে পড়লে দিতে হয় বৈকি। আর তুমি তো কিছু বারণও ক'রে দাও নি তোমার টাকা খাটাতে। এমন হুট ক'রে চেয়ে বসতে পারো তাও বলো নি টাকা রাখবার সময়। তা'হলে আমি তোমার টাকা রাখতুমই না।'

'না, তা নয়।' মহাশ্বেতা বেশ একটু দমে যায় মায়ের কণ্ঠস্বরে। তাড়াতাড়ি বলে, 'তা নয়--তবে টাকা খাটালে আমার একটা সুদও পাওনা হয় তো।'

'হয় বৈকি। হবেও পাওনা। আমি তো তোমার ভাগের সুদ দোব না এমন কথা কখনও বলি নি। যা দু'চার পয়সা পাওনা হয় তা নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু সে একটা হাতী-ঘোড়া কিছু হবে না। সে পিত্যেশ ক'রো না। কটাই বা টাকা, সব সময়ে তো খাটাইও না তোমার টাকা। তা'হলে আর চাইবা-মাত্র দিলুম কী ক'রে? দৈবে-সৈবে তেমন কেউ এলে তবেই দিই। আর তুমি তো নিয়েও গেলে বার করে চারশ' টাকা। আর কি নশ' পাঁচশ' আছেই বা?'

'তবেই তো বললে ভাল। বেশ গাইলে। তুমি তো যা সুদ দেবে তা বুঝতেই পারছি, মাঝখান থেকে আমারই লোকসান। একশ' টাকা আমার কাছে ছ মাস খাটলে দুশ' টাকা হয়ে যেত।'

'দ্যাখ—,' শ্যামা বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললেন, 'অত বাড়াবাড়ি কোন জিনি-

সেরই ভাল নয়। যা রয় সয় তা-ই ভাল। অত সুদ যে দেয় তার কখনও টাকা শোধ করবার মতলব নেই। সে একদিন সবসুদ্ধ ভরাডুবি করবে। তোর চেয়ে মাথা-ওলা লোক ঢের আছে সংসারে। এতই যদি সহজ হ'ত ব্যাপারটা তা হ'লে সবাই গিয়ে টাকা ঢেলে দিত। আর এত সুদ তা'হলে তারা দেবেই বা কেন? যা পিটে নিয়েছিস, নিয়েছিস—এইবার হাত গুটো। ঐ কটা টাকাই থাক, তাতেই ঢের।'

'হ্যাঁ, তা আর নয়। সব সুদ্ধ এনে তোমাকে ধরে দিই, কবে কে দশ টাকা ধার নিয়ে এক পয়সা সুদ দেবে সেই পিত্যেশে। তোমাদের জামাই নিজে হাতে ক'রে নে যাচ্ছে। বলি সে মানুষটা তো আর বোকা নয়। যাকে দিচ্ছে বুঝে-সুঝেই দিচ্ছে। তেমন কোন সন্দ থাকলে এক পয়সা বার করত না সে। আর এত-সুদই বা কিসের? কী এমন দিচ্ছে শুনি। দারোয়ানদের কাছ থেকে নিত—তাদের সুদ কি কম? আরও ঢের বেশী। টাকায় তিন চার আনা আদায় করে তারা। ওরা কি আর আমাদের মতো, যে এক পয়সায় মরে-বাঁচে। ওরা হ'ল গে সায়েব বাচ্ছা— ওদের কাছে ও দু আনা এক আনার দাম কি?'

এই বলে—যেন খুব বুদ্ধিমতীর মতো কথা বলেছে, বলতে পেরেছে—এইভাবে চারিদিকে সগর্বে চেয়ে নেয় একবার। কিন্তু তার সে বিজয়গর্বের উত্তাপ বেশীক্ষণ ভোগ করা যায় না। শ্যামা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন একেবারে।

'আছে বৈকি মা—খুবই দাম আছে। নইলে এত ছিষ্টি ক'রে তোদের মতো দীন-দুঃখীর কাছ থেকে হাত পেতে ধার নিত না—এই কটা সামান্য টাকা।'

শ্যামা বিরক্ত মুখে চুপ ক'রে যান। তাঁর আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে হয় না। এর সঙ্গে তর্ক ক'রেই বা লাভ কি?

মহাশ্বেতাও বেজার মুখে বসে থাকে চুপ করে। তার পছন্দ হয় না কথাটা—তা বলাই বাহুল্য। তার চেয়েও বড় কথা, স্বামীকে সে জাঁক্ ক'রে ব'লে এসেছে—দুশ' টাকা আজই এনে দেবে, যেমন ক'রেই হোক্। অথচ সে টাকার কোন ব্যবস্থাই হ'ল না, অন্য কোথাও অন্য কোনভাবে হবে—এমন আশাও নেই। এতগুলো টাকা কেউ তাকে উজ্জ্বল সম্ভাবনার ওপর কিম্বা মোটা সুদের প্রতিশ্রুতির ওপর ধার দেবে না—তা সে জানে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তেমনি অন্ধকারপানা মুখ ক'রেই উঠে গিয়েছিল, যাবার সময় একটা বিদায়সম্ভাষণ পর্যন্ত জানায় নি।

কিন্তু তাই বলে যে এমন বাড়াবাড়ি কাণ্ড করবে সে, তা শ্যামা একবারও ভাবে নি। বিশ্বাসই করতে চান নি কথাটা—যখন চট্‌খণ্ডীদের গিন্নী এসে জানালেন যে মহাশ্বেতা গহনা বন্ধক রেখে তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার্ করতে এসেছিল—তিনি দিতে পারেন নি বলে মল্লিকদের কাছে গেছে তাঁর ওখান থেকে; সেখানে কি হয়েছে না হয়েছে তা তিনি বলতে পারবেন না অবশ্য—তবে টাকার জন্যে যে সে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই—এবং বেশ মোটা টাকাই দরকার তার।

চট্‌খণ্ডী-গিন্নী নিজে এসেই খবরটি দিয়ে গেলেন। বড়-একটা এ'দের বাড়ি আসেন না তিনি, দরকার পড়লে শ্যামা নিজেই যান। এতকাল পরে বাড়ি বয়ে এসে তিনি কিছু আর মিছে কথা বলে যাবেন না, সে রকম লোকই নন। তিনি এসেছেন নিছক কৌতূহলবশতঃই। মহাশ্বেতাদের অবস্থা ভাল তা এ অঞ্চলের সবাই জেনেছে এতদিনে, অন্তত 'হন্যে হয়ে' টাকা ধার ক'রে বেড়াবার মতো অবস্থা তাদের নয়। তবে সে কী উদ্দেশ্যে কোন্ প্রয়োজনে টাকা ধার করতে এসেছে—সেইটেই জানতে

চান তিনি। বিশেষত তার মাও যখন আজকাল বন্ধকী কারবার করেন তখন পরের কাছে যেতে হ'ল কেন? মাকে গোপন ক'রে সে কোথাও টাকা খাটাতে চায়, না মায়ের কাছ থেকে যা নেওয়া সম্ভব তা সব নেওয়া হয়ে গেছে বলেই বাইরে বেরোতে হয়েছে?

আসলে তাঁদের অজ্ঞাত বৃহত্তর কোন লাভের পথে এরা যাচ্ছে কিনা মায়ে-বেটিতে সেটা না-জানা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছেন না তিনি।

কিন্তু তাঁর কৌতূহল কিছুই মেটাতে পারেন না শ্যামা। কারণ সত্যিই এ খবরটা তাঁর কাছে একেবারে নূতন। অনেক জেরা ক'রেও তাঁর পেট থেকে কোন খবর বার করতে না পেরে ক্ষুব্ধ হয়েই চলে গেলেন চট্খণ্ডী-গিন্নী। শ্যামা যে একে-বারেই কোন খবর রাখেন না—এটা বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে কঠিন।

শ্যামা অবশ্য তাঁকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টাও করেন না বিশেষ। আসলে তখন কথা বলতেই ইচ্ছে করছে না ও'র। নানারকম সংশয় ও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে মনে। বহু রকমের দুর্ভাবনা। মেয়েটা ও'র বড়ই বোকা। এতটুকু সাংসারিক জ্ঞান নেই। এধরণের মানুষ যখন আবার মাথা খেলিয়ে বুদ্ধিমানের মতো কোন কাজ করতে যায় তখনই বিপদের কথা হয়। সকলের কাছে আরও হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে, নয় তো নিজের সর্বনাশ নিজেই ক'রে বসে। কী করছে সে, গহনা বন্ধক রেখে টাকা ধার করছে সে কিসের জন্যে, কার জন্যে?

যদি ঐ টাকা দিয়ে বাড়ি-ঘর বিষয়-সম্পত্তি কেনে তো তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি নেই। বিষয়ের দাম কমতে পারে—একেবারে মূলে হা-ভাত হয় না। কিন্তু সুদের নেশায় পাগল হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজে ধার করে অপরকে ধার দিচ্ছে না তো? তা'হলে তো সাংঘাতিক ব্যাপার। মেয়েটা না হয় চিরকালের পাগল, জামাইও কি পাগল হয়ে গেল ওর সঙ্গে সঙ্গে? নাকি ও তাকে লুকিয়েই এ কাজ করছে? কিছু বিশ্বাস নেই, সব পারে ও। বুদ্ধি যে পথে যায় সে পথের ফুটপাথ মাড়ায় নি কখনও।...

অথচ বোকা-সোকা পাগল যা-ই হোক—এই একটি মেয়েই তাঁর জীবনে যা কিছু আশ্বাস বহন করে। শুধু যে ওর স্বামীর কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছেন শ্যামা তাই নয়—ও যে সুখী, ও যে নিশ্চিন্ত—এইটুকুই তাঁর যেন মস্ত একটা ভরসা, -এই দিক্-দিশাহীন অন্ধকার জীবনে একমাত্র আলোক-অবলম্বন। শেযে এই সামান্য আলোকশিখাটাও নিভিয়ে দেবে না তো হতভাগা মেয়েটা? নষ্ট করবে না তো তাঁর একমাত্র আশ্রয় ও আশ্বাস-কেন্দ্রটি?

কে জানে—আবার এক সময় এমনও মনে হয়—হয়ত তেমন কোন লোকসান হবে না শেষ অবধি, কিম্বা আদৌ কোন লোকসান হবে না। বরং টাকা আসবেই উল্টে—অনেক টাকা, তাঁর পক্ষে কল্পনাতীত অঙ্ক। এটা ঠিক যে জামাই তাঁর কড়ি-কপালে। ওর মতো অসহায় অশিক্ষিত লোক যা করেছে তা ঢের। যারা ছোট-বেলায় দুঃখ পায় শেষ বয়সে অদৃষ্ট তাদের প্রতি অনেক বেশী প্রসন্ন হন নাকি। জামাইয়েরও হয়ত তাই হবে। আর যার কপাল ভাল, ভগবান যাকে দেবেন—তাকে তুচ্ছ একটা অবলম্বন ধ'রে, যে-কোন পথেই টাকা ঢেলে দেন। হয়ত বাধা দিলে ক্ষতিই করা হবে ওদের। তবু চুপ ক'রেই বা থাকতে পারেন কৈ? তাঁর এই দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা যে জীবন সম্বন্ধে অন্য শিক্ষাই দিয়েছে এতকাল।......

এই নানারকম বিপরীতমুখী চিন্তায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সেদিন আর কোন কাজে

মন দিতে পারলেন না শ্যামা। রাত্রেও ভাল ঘুম হ'ল না তাঁর। শেষ পর্যন্ত সকাল-বেলায় সেকরাদের একটা ছেলেকে ডেকে চারটে চালতা ও গোটাদুই কাঁচকলা ঘুষ দিয়ে মহাদের বাড়ি পাঠালেন। বিশেষ দরকার, দুপুরবেলা যেন অতি অবশ্য সে একবার আসে।

মহা অবশ্য দুপুরের খানিকটা আগেই এসে হাজির হ'ল। কৌতূহল প্রবল—কোথায় কী অঘটন ঘটল বা মজার খবর পাওয়া গেল, এ সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য শিশুর মতোই।

'কী গো, বলি এত জরুরী তলব কিসের! যখন শুনলুম তুমি চাল্‌তে কাঁচকলা খাইয়ে তাকে পাঠিয়েছ—তখনই বুঝলুম কিছু একটা সমিস্যের ব্যাপার আছে। নইলে তুমি যা কিপ্পন মনিষ্যি—দরের জিনিস খরচ ক'রে সুখসোমন্দা লোক পাঠাবে—এ একটা কথাই নয়।......যেমন শোনা, আমি সব ফেলে-ঝেলে কোনমতে দুটো হাতে-ভাতে ক'রেই হুড়তে পুড়তে ছুটে এসেছি। ছোট বৌটাকে বলে এসেছি সব পড়ে রইল ভাই, তুই একটু দেখিস। ফিরে এসে আবার না মহারানীর কাছে চাট্টি কথা শুনতে হয়। আজকাল তো আবার কাজের পালা হয়েছে, ভাগ হয়েছে—যে যার পালা সে তার করবে। মোদ্দা গেরস্তর কাজ ঠিক ঠিক ওঠা চাই, নইলেই এতটি কথা আর চিপ্‌টেন। তা ছোট বৌ দেখবে, তেমন নয় ও। মানুষের ঘরের মেয়ে যে হয় তার চালচলনই আলাদা। ও-ই বললে—তুমি যাও দিদি, মা যখন এমন ক'রে ডেকে পাঠিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই কোন জরুরী দরকার আছে।...তা ব্যাওরাটা কি বলো দিকি—এত জোর তলব একেবারে!'

শ্যামা কোন বৃথা ভূমিকার মধ্যে গেলেন না—একেবারে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, 'তুই নাকি গয়না বাঁধা রেখে টাকা ধার ক'রে বেড়াচ্ছিস? গয়না নিয়ে নাকি এ পাড়ায় এসেছিলি?'

ঠিক এ প্রশ্নটার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না মহাশ্বেতা। তার মুখখানা বেশ একটু বিবর্ণ হয়ে উঠল কিছুক্ষণের জন্য। খানিকটা চুপ ক'রে বসে থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে যেন কোনমতে বলে ফেললে, 'হ্যাঁ!'

'কেন?' কঠিন ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন শ্যামা।

এ কণ্ঠস্বর সে চেনে। চিরকাল একে ভয় করতেই অভ্যস্ত মহাশ্বেতা। ভয় আজও তার কম হ'ল না। সে-ভয় দমন ক'রে বেপরোয়া হ'তে গিয়ে হঠাৎ রূঢ় হয়ে উঠল সে।

'কেন আবার কি? টাকার দরকার পড়েছে বলেই এইছি। আমি তো আর কচি খুকী নই—একটা কাজ যখন করেছি তখন তার অত্থ আছে বৈ কি।'

'সেই অত্থটাই তো জানতে চাইছি বাছা। কথাটা বলতেই বা তোমার দোষ কি? আমি তো তোমাকে আটকাচ্ছি না, তোমারটা কেড়ে বিগড়েও নিচ্ছি না।'

'দোষ আবার কি! দেখা হয় নি তারপর থেকে, তাই বলি নি।—আর এ এমনই বা কি কথা যে, এত ছিষ্টি ব্যাখ্যানা ক'রে বলতে হবে সবাইকে? ধার-দেনা মানুষ ক'রেই থাকে, কেউ আপদে-বিপদে করে, কেউ বা কারবার করতে নেয়। আমিও না হয় ধরো কারবার করতে নিয়েছি কিছু টাকা। তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে?—আর দোষের কথা কে বলেছে? কেড়ে বিগড়ে নেবার কথাই বা উঠছে কেন? আমার গয়না আমি বন্ধক রাখব—তাতে এত কৈফিয়ৎ বা কিসের? আমার কি এটুকু এক্তার নেই?'

ভেতরের ভয়টা বাইরের 'মুখ-সাপোটে' ঢাকতে গিয়ে মহাশ্বেতার কথাবার্তা এলো-

মেলো হয়ে যায়। শেষের দিকে গলাটা কেঁপেও যায় একটু।

কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার মনে করেন না শ্যামা। তুচ্ছ কথার অর্থ ধরে মান-অভিমান প্রকাশ করা তাঁর অভ্যাসও নয়। তিনি শুধু একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'অ। তুমি তা'হলে কারবার করতে টাকা ধার নিচ্ছ। বাঃ, এমন না হ'লে বুদ্ধি!—তাই তো বলি, আমার বুদ্ধিমতী মেয়ে কারও সঙ্গে সলা-পরামর্শ না করেই যখন এমন কাজ করেছেন, তখন একটা ভাল রকমই অর্থ আছে বৈকি!'

শ্যামা তাঁর কণ্ঠস্বরে কঠিন ব্যঙ্গটাকে যতদূর সম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখতেই চেষ্টা করেন, তবু এর ভেতরের খোঁচাটা এতই স্থূল যে মহাশ্বেতারও বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। এবার সে বেশ একটু তেতে উঠেই জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, অর্থ আছেই তো। আমি কম সুদে টাকা ধার ক'রে যদি বেশী সুদে অপরকে ধার দিই তো অন্যায় অলেহ্যটা কি করা হ'ল, তা তো বুঝতে পারছি না। বলি, সব কারবারেই তো এই দস্তুর গা? কম দামে মাল কিনে বেশী দামে বেচা—না কি বলো? বৌদিও তো শুনছ—বলি বলো না আমি হক বলছি কি না বলছি! আর যদি বেহকই বলে থাকি—টাকা গেলে আমার যাবে, এলে আমার আসবে। তোমার তো কিছু লোকসান নেই তাতে? তবে তোমার এত জ্বালানি পোড়ানি কিসের?

রাগ করবারই কথা। অপমানে বিরক্তিতে শ্যামার একদা-গৌরবর্ণ মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠলও একবার—কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে সে উষ্মা দমনই করলেন তিনি। এ এমনই নির্বোধ, এমনই বুদ্ধিহীন যে এর উপর রাগ করা মানে নিজের শক্তিরই অপচয় করা। এর ওপর অভিমান করলে নিজেকেই অপমান করা হয়। তিনি তাই আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে শুধু প্রশ্ন করলেন, 'তা জামাই জানেন এ কথাটা?—তুই যে গহনা বন্ধক রেখে তাঁকে টাকা দিচ্ছিস?

'ও মা, তা জানে না!' সবেগে বলতে গিয়েও কেমন যেন থতমত খেয়ে থেমে যায় মহাশ্বেতা। বুঝি কথাটা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ে যায় যে কথাটা অভয়কে জানাবার কোন কারণ ঘটে নি। সে টাকা চেয়েছে, মহাশ্বেতা বলেছে দেব। কোথায় পাবে সে—কিম্বা কোথা থেকে আনবে—সে প্রশ্ন অভয়ও করে নি, মহাশ্বেতাও বলে নি। হয়ত অভয়ের ধারণা যে তার স্ত্রীর কাছেই আরও টাকা আছে—জমিয়েছে সে। তবে সে সম্ভাবনার কথা মহার তখন মনে হয় নি, তা'হলে সে-ই ভুলটা ভেঙ্গে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত। তখন শুধু এই কথাটাই মনে হয়েছিল যে, এইভাবে টাকাটা চাওয়া মাত্র যোগাড় ক'রে এনে দেবার মধ্যে তার একটা মস্ত বাহাদুরি প্রকাশ পাবে—স্বামীর কাছে তার 'পোজিশান্' বাড়বে (এ শব্দটা সে সম্প্রতি শিখেছে ছোট দেওরের কাছ থেকে—তার ভারী পছন্দ এ শব্দটা)। তাছাড়া ধার করার কথাটা জানানো বা অনুমতি নেওয়া যে দরকার তাও মনে হয় নি তার।

সামান্য দ্বিধায় কণ্ঠস্বর মুহূর্তকালের জন্য স্তিমিত হয়ে আসে, থতিয়ে থেমে যায় একটু, তার পরই আবার গলায় জোর দিয়ে বলে, 'সে আবার না জানে কি? সব যে তার নখ-দর্পণে। বলে মানুষের মুখের দিকে চাইলে সে পেটের কথা টের পায়। তার কাছে কি কোন কিছু চাপা থাকে?'

কিন্তু সেই সামান্য দ্বিধাই শ্যামার কাছে যথেষ্ট। তিনি ওর আসল প্রশ্নটা চাপা দেবার চেষ্টাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'হুঁ! তার মানে তুমি তাঁকে কিছু বলো নি, লুকিয়েই করেছ কাজটা।——সে আমি বুঝেছি মা, জামাই জানলে কখনও এ কাণ্ড করতে দিতেন না! তোমার ভাল লাগবে না, তুমি শুনবেও না তা জানি,

তবু আমার কর্তব্য বলেই বলেছি—কাজটা ভাল কর নি—ভাল করছ না। অন্তত জামাইকে লুকিয়ে এ কাজ করা একেবারেই উচিত নয়। যা করেছ করেছ—আজই গিয়ে তাঁকে সব খুলে বলো আর এ টাকাটা ভালয় ভালয় ফিরে পেলে আগে দেনা শোধ ক'রে গহনা ছাড়িয়ে নিয়ে যাও। ছিঃ—সোনা হ'ল লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মীকে বন্ধক রেখে টাকা ধার করে নিতান্ত যাদের হা-ভাতের দশা তারা। এ কাজ করতে নেই, ক'রো না।'

শ্যামার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে ও আন্তরিকতায় কেমন যেন ভয় পেয়ে যায় মহাশ্বেতা, আস্তে আস্তে বলে, 'তা না হয় সে ফিরলে আজ খুলে বলব কথাটা, তারপর সে যা বলে। তবে মনে তো হয় না, যে সে বারণ করবে। টাকা খোয়াবার পাত্তর সে নয়—টাকা আদায় করবেই যেমন ক'রে হোক। এটুকু জোর আমার মনে আছে। তবু দেখি বলে—। তবে তুমি আর ঐ সব ভাল করো নি, ভালো করো নি বাক্যিগুলো ব'লো নি বাপু—তোমার কথা বড্ড ফলে যায়। কাল-মুখের বাক্যি তোমার।'

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ায় সে! খেয়ে দেয়ে এতটা পথ এসেছে, ছুটেই এসেছে বলতে গেলে—এখনও ভাল ক'রে দম নিতে পারে নি। আরও খানিকটা বসে গল্প ক'রে সেই বিকেলের দিকে ফিরবে বলে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল—কিন্তু এখন যেন আর বসতে ভরসা হচ্ছে না। মার কাছে ধরা পড়ে যাবার লজ্জা তো আছেই—তা-ছাড়া শ্যামার বলবার ধরণটাতে একটু ভয় ধরেও গেছে. এ অবস্থায় মার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে বসে থাকা বড় অস্বস্তিকর। তার চেয়ে বরং ভট্চায-বাড়ি ঢুকে একটু বসে জিরিয়ে নেবে। এক ঘটি জলও খেয়ে নেবে সেখানে। বুক অবধি শুকিয়ে উঠেছে যেন। এখানেও খেয়ে নেওয়া চলত কিন্তু তাতে করে আরও পাঁচটা মিনিট অন্তত এইখানে বসতে হয়। সেটুকুও থাকতে ইচ্ছা করছে না।

কনক অবশ্য পীড়াপীড়ি করে, হাত ধরে বসাতেও যায় কিন্তু সে আর বসে না। ঘাড় নেড়ে বলে, 'না ভাই আমি যাই। কথা তো হয়েই গেল—মিছিমিছি আর দেরি ক'রে লাভ কি? ছোট বৌটার প্রেহারী শুধু। সেও তো বালস্পোয়াতী—তার একার ঘাড়ে অতটা চাপানো ঠিক নয়। মহারানী যা আছেন, মানুষটা মরে গেলেও নিজের পালার বাইরে একটি কাজ করবেন না। তার চেয়ে পারি তো আমিই গিয়ে পড়ি, সে বসে থাকবে না, হয়ত এতক্ষণে কাজে লেগেই গেলে, তবু যতটা পারি। শেষের দিকে খানিকটা হাতাপিতি ক'রে সেরে নিতে পারলেও উগ্গার হয় কিছু।'

সত্যিই সে আর দাঁড়ায় না, হন্ হন্ ক'রে হাঁটতে শুরু করে দেয়।

॥ ৩ ॥

কথাটা যতই আনন্দের এবং ওর পক্ষে সুখের হোক—জিজ্ঞাসা না করলে নিজে থেকে বলা যায় না। অথচ এতদিন যেটুকু সংশয় ছিল কনকের সেটুকুও আর থাকে না। ছেলেই হবে তার—মানে ছেলে কিম্বা মেয়ে। যে-সব লক্ষণগুলোর কথা জানা বা শোনা ছিল তার—সে সবগুলোই মিলে যাচ্ছে। অথচ অনেক আগেই যাঁদের চোখে পড়ার কথা তাঁরা নির্বিকার। শ্যামার সব দিকেই তীক্ষ্ম দৃষ্টি কিন্তু তিনিও—হয়ত ওর দিকে ইদানীং ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখেন নি ব'লেই অথবা এ সম্ভাবনার কথাটা তাঁর আদৌ মনে হয় নি ব'লেই—দেখতে পান নি কিছু। হেমেরও চোখে পড়ে না কারণ দিনের বেলা বৌয়ের দিকে তাকিয়ে দেখার অবসরই তার অল্প। এক

রবিবারেই যা সকালের দিকে বাড়ী থাকে কিন্তু সে সময়টাও কাটে তার বাগানের তদ্বির করে বা মাছ ধরে। তাছাড়া কনকের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখার কোন কারণ আছে ব'লেও মনে হয় না তার।

অগত্যা অনেক ইতস্তত ক'রে কনক বাপের বাড়িতেই চিঠি লেখে। এসব কথা চিঠিতে লিখতেও লজ্জা করে—লিখতে বসে অনেকবারই ভাবতে হয়েছে, অনেক ইতস্তত করেছে সে কিন্তু উপায়ান্তর না পেয়েই শেষ পর্যন্ত ইশারা-ইঙ্গিতে কথাটা জানিয়েছে। আজকাল তার সুবিধাও হয়েছে একটু। কান্তি বাজারে-দোকানে যায় দরকার-মতো—তাকে পয়সা দিলে খাম পোস্টকার্ড সে-ই এনে দিতে পারে। দেয়ও। এর মধ্যে দু-একবার এনে দিয়েছে। পয়সা আজকাল দুটো একটা সে সাহস ক'রে হেমের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। সামান্য দুটো-একটা পয়সা চাইলে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করে না হেম, হাসিমুখেই দেয়। একবার শুধু একসঙ্গে দু আনা পয়সা চেয়ে ফেলেছিল কনক—সেই দিনই, চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হয়ে উঠেছিল হেম, কী দরকার প্রশ্নও করেছিল। সেই থেকেই সতর্ক হয়ে গেছে কনক—আর কখনও দু পয়সার বেশী চায় না। অবশ্য সে দু আনা সে হেমেরই প্রয়োজনে চেয়েছিল—ওর হাড়ের বোতামগুলো সবই প্রায় ভেঙ্গে গেছে, কান্তিকে দিয়ে কিনে আনাবে ব'লে—তাই কথাটা বলতেও কোন দ্বিধা ছিল না, হেমের মুখের গাম্ভীর্যটাও কাটতে খুব দেরি হয় নি—তবু ভাল ঘোড়ার এক চাবুক, সেই একবারেই শিক্ষা হয়ে গেছে তার, আর ভুল করে না।

আর কীই বা দরকার তার! নিজের জন্যে কিছু কেনার উপায় নেই এ বাড়িতে ; ইচ্ছা, প্রয়োজন এমন কি সঙ্গতি থাকলেও নয়। কোন কিছু দরকার হ'লে ভয়ে ভয়ে শাশুড়ীর গোচরে আনতে হয় কথাটা; যদি তিনি বলেন যে, 'দেখি—এখন তো হাতে খুব টানাটানি—সামনের মাসে না হয় মরি-বাঁচি ক'রে যা হয় করব' কিম্বা যদি বলেন যে, 'হেমকে বলে দেখি একবার যদি এনে দেয়'—তো সেটা মহা সৌভাগ্য বুঝতে হবে। আর যদি সোজা ঝেড়ে জবাব দেন যে, 'ও সব এখন হবে-টবে না বাছা অত পয়সা নেই' কিম্বা বলেন, 'আমার ঘরে ইচ্ছে করলেই কোন জিনিস পাওয়া যায় না মা, দরকার হ'লেও অনেক সময় চেপে রাখতে হয়।'—তো ব্যস্—সেইখানেই সে প্রসঙ্গের ইতি। আবার সে কথা তুলবে এত সাহস অন্তত কনকের নেই।

আর তাঁকে না বলে কোন জিনিস কিনবে, কি কিনে আনাবে এমন বুকের পাটা কার? হেমেরও সে সাহস নেই। সে চেষ্টা যে দু-একবার ক'রে দেখে নি কনক তা নয়। ইদানীং হেম তার প্রতি খুবই সদয় হয়েছে—বেশ সস্নেহ ব্যবহার করে—তবু ফরমাশের নাম শুনেই শিউরে উঠেছে। জবাব দিয়েছে, 'ও বাবা, আমি তোমাকে দুম ক'রে কোন জিনিস এনে দেব—সে আমার দ্বারা হবে না। মা টের পেলে রক্ষে থাকবে না। মিছিমিছি একটা অশান্তি। তার চেয়ে ও মাকেই ব'লো।'

অশান্তি যে তা কনকও বোঝে। দেখতেই পাচ্ছে। এমনিতেই শ্যামা যেন তার সম্বন্ধে কেমন বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েছেন আজকাল। কেন তা অনেক ভেবেও সে বুঝতে পারে না। ছেলে যতদিন বৌ সম্বন্ধে উদাসীন ছিল ততদিন তিনি কনকের প্রতি যথাসম্ভব (তাঁর স্বভাবে যতটা সম্ভব) সহানুভূতিই দেখিয়েছেন, প্রকাশ্যেই ছেলের ব্যবহারে অনুযোগ করেছেন। কিন্তু ইদানীং ছেলের মতি-গতি পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে—এমন কি ভাল করে পাল্টাবার আগেই, শ্যামার মেজাজের পরিবর্তন ঘটে গেছে যেন। স্বামীর স্নেহ,—ভালবাসা বলে, আজও মনে করে না কনক, সে টের পাবার অগেই, শ্যামার মেজাজের পরিবর্তন ঘটে গেছে যেন। স্বামীর স্নেহ,—ভালবাসা

বলে, আজও মনে করে না কনক, সে টের পাবার আগেই যেন শাশুড়ী টের পেয়েছেন। তা না হয় পেলেন—কিন্তু সেজন্যে তিনি কেন অসন্তুষ্ট হবেন সেইটেই ভেবে পায় না সে।

চিঠি লেখারও বিপদ কম নয়। শ্যামা নিজে যদিচ মোটামুটি খানিকটা লেখা-পড়া জানেন, তবু মেয়েদের বই নিয়ে বসে থাকা পছন্দ করেন না। ওটা সময়ের অপব্যয় বলেই মনে করেন। বলেন, 'অমন আয়না মুখে ক'রে বসে থাকা বড়লোক-দের শোভা পায়। আমাদের গেরস্ত ঘরে ও-সব সাজে না। আর দরকারই বা কি, দু'পাতা বই পড়ে কি স্বগ্গে বাতি দেবে, না কোম্পানীর দপ্তরে চাকরী করতে যাবে? ঐ সময়টা সংসারের বাড়তি কাজ করলে কিছু তবু সাশ্রয় হয়।'

পড়া যেমন পছন্দ করেন না, তেমনি লেখাও না। চিঠি লিখতে দেখলেই তাঁর দৃষ্টি এবং কণ্ঠ দুই-ই তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে। বিপদ-আপদ না ঘটলে চিঠি লেখার কী সার্থকতা তা তিনি ভেবেই পান না।

'যারা কাজ-কারবার করে তাদের না হয় ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠি পাঠাতে হয়, সে চিঠিতে দু'পয়সা আসে তাদের—তার জন্যেই সাহেবদের আপিসে মাইনে-করা কেরানী রাখে—তোমাদের চিঠিতে তো আর এক পয়সা আয় হবে না, বরং ঐ পয়সাটাই অপচ্ হবে। ঐ যে সব বলেন, ভারী তো এক পয়সা খরচ একখানা পোষ্টকার্ডের—ওটা কি আবার খরচা নাকি! আ-মর্—একটা পয়সাই বা আসে কোথা থেকে! বলে কড়া কড়া নাউটা, কড়াটা না ফেললে তো আর নাউটা নয়। এক পয়সার পোষ্টকার্ড না কিনে নুন কিনলে গেরস্তর সাতদিন রান্না চলে। আর কী দরকারই বা? দুদিন আগেই হয়তো দেখা হয়েছে না হয় আর দুদিন পরে হবে। যা বলবার আছে তখনই বলবে পেটের থলি উজোড় করে সব কথা ব'লো—তাতে তো কোন ক্ষতি হবে না। এক পয়সা লোকসান নেই তাতে। অসুখ-বিসুখ করে কি কোন জরুরী দরকার থাকে—সে এক কথা, নইলে তো সেই বাঁধা গৎ, তুমি কেমন আছ—আমি ভাল আছি। সুখ-সোমন্দা পয়সা উড়িয়ে দেওয়া।'

সুতরাং খাম পোষ্টকার্ড আনলেই শুধু হয় না—চিঠি লেখবার মতো অবসর-টুকুর জন্যও সাধনা করতে হয়। সে অবসর সত্যিই দুর্লভ এ বাড়িতে। সদাজাগ্রত শাশুড়ী অহরহ কর্মব্যস্ত, কখন কোথায় এসে পড়বেন তার ঠিক নেই। দুপুরে তিনি নিজে ঘুমোন না, আর কেউ ঘুমোয় তাও পছন্দ করেন না। কনক দুপুরের দিকে একটু অবসর পায় ঠিকই—কিন্তু কখন তিনি ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হবেন কিম্বা ওকে ডেকে কাছে বসাবেন তার কোন ঠিকই নেই। চিঠি লেখা তো অপরাধ বটেই—লুকিয়ে লেখা আরও কঠিন অপরাধ।

তবু ওরই মধ্যে সময় করে একখানা চিঠি লেখে সে। 'যেটা দশ মিনিটে লিখে ফেলবার কথা সেইটেই তিনদিন ধরে লিখতে হয়। রাত্রে লেখা যায় না—হেম জিজ্ঞাসা করবে হঠাৎ বাপের বাড়িতে চিঠি লেখার কী এমন দরকার পড়ল? বিশেষত ওর বাপের বাড়ির গ্রামের বহু ছেলে লিলুয়ায় কাজ করে—একই গাড়িতে যাতায়াত—কে কেমন আছে তার মোটামুটি একটা খবর পায়ই হেম। সে জিজ্ঞাসা না করলেও তারাই সেধে দেয় সে খবর। আগে বলত না, এখন হেম ওকে বলেও এসে সে খবর। কাজেই—আবার মিছিমিছি এক পয়সা খরচের কী এমন জরুরী প্রয়োজন পড়ল—এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক!

কিন্তু—চিঠি যখন লেখা হয় নি, তখন কী করে লিখব—এই প্রশ্নটাই ছিল প্রধান, চিঠি লিখে গোপনে কান্তিকে ফেলতে দিয়েই অনুতপ্ত হয়ে ওঠে কনক। কেনই

বা একথা ও'দের লিখতে গেল সে! তাঁরা আর কী করবেন? এক বাড়িতে থেকে সে যা জানাতে পারল না—তাঁরা অন্য গ্রাম থেকে এসে কেমন ক'রে জানাবেন? মিছি-মিছি তাঁদেরও বিব্রত করা। এ'রা যে জানেন না সে কথাটা অবশ্য লজ্জায় লিখতে পারে নি সে। তবে তাঁরা অনুমান করতে পারবেন। কারণ জানলে এ'রাই জানা-তেন সে কথাটা। তা-ই নিয়ম। দুম্ ক'রে এসে যদি কেউ কথাটা তোলে, তাহ'লে তার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না।

এক যদি তাঁরা কোন ছুতো ক'রে দু-একদিনের জন্য নিয়ে যান—তারপর সেখান থেকে লিখে জানান তো হয়। সেইটেই লিখে দেওয়া উচিত ছিল। তবে—সে মনে মনে প্রবোধ দেয় নিজেকে—সে বুদ্ধি কি আর বাবা-মার হবে না? তা না হ'লেও, এলে সে টের পাবেই, কাছাকাছি এলে না হয় একটু চোখ টিপে দেবে'খন শাশুড়ীর পিছন থেকে—যাতে চিঠির কথাটা না বলেন শাশুড়ীকে।

কিন্তু এ আশ্বাসও বেশীক্ষণ টেকে না—আশঙ্কাটাই প্রবল হয়ে ওঠে। আশ্চর্য, তার ভাগ্যটা যেন সৃষ্টিছাড়া একেবারে। নইলে এমন কথা কে কোথায় শুনেছে! এক বাড়িতে এক সংসারে বাস ক'রেও শাশুড়ী খবর রাখেন না—কেউ শুনলেও বিশ্বাস করবে না। বিশেষত বিধবা শাশুড়ী—ব্রাহ্মণের বিধবা। কিন্তু শ্যামাও যে একেবারে দলছাড়া গোত্রছাড়া। সাধারণ অন্য বিধবাদের মতো আচারবিচারের ধরাকাঠ তাঁর আদৌ নেই। তিনি বলেন, 'অতশত মানতে গেলে আর কট্‌কেনা করতে গেলে আমার চলে না, আমার বলতে গেলে ভিখিরীর সংসার, দুঃখের পেছনে দড়ি দিয়ে চলতে হয় অষ্টপ্রহর। যে সময় ঐসব করব—সে সময় আমার দু পাঁচসের পাতা চাঁচা হয়ে যাবে।...আর ওসব মানিও না, উনি ঠিকই বলতেন—এটা ক'রো না, এটা করলে অমুক হবে শুনলেই উনি ছড়া কাটতেন, মোকড় মারলে ধোকড় হয় চালতা খেলে বাকড় হয়। সেই কথাটাই ঠিক।' ভতি অবশ্য তিনি বধূর হাতে আজও খান নি, ওর দীক্ষা হয় নি—হুতের জল এখনও অশুদ্ধ বলে—তাছাড়া পাতার জ্বালে ভাত রাঁধা—তিনি ছাড়া কেউ অত ভাল পারেও না। ধৈর্যের অভাব, পাতাও অনেক বেশী খরচ ক'রে ফেলে। কিন্তু ভাত ছাড়া মোটামুটি রান্নাটা কনকই করে আজকাল, দৈবাৎ কোনদিন শ্যামার হাতে কাজ না থাকলে সে অন্য কথা। নইলে কোন নিয়ম-কানুনের ধার ধারেন না তিনি। কাজেই যে কারণে জানা যেতে পারত—সে কারণটা ওদের সংসারে নেই।

চিঠি পেয়ে ওর বাবা প্রথম শনিবারেই এসে হাজির হলেন—আর এমন সময়েই এলেন যে ওর সতর্কতার সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। এ সময়টা কনকের হিসেবে ধরা ছিল না। অর্থাৎ বেলা দুটোর সময়।

ও সেদিন ঘুমোয় নি। আর একটু পরেই হেম এসে পড়বে—হেম আজকাল তিনটের মধ্যেই এসে পড়ে—এসেই গরম জল চাইবে সাবান কাচবার জন্যে; তাছাড়া স্বামী খেটেখুটে এসে দেখবে স্ত্রী আরামে ঘুমোচ্ছে—সে বড় লজ্জার কথা; তাই সে রান্নাঘরের দাওয়াতেই আঁচলটা পেতে গড়াচ্ছিল একটু। আর কতটা পরে পাতার জ্বালে গরম জলের হাঁড়ি চাপাবে—সামনে কার্নিসে-পড়া রোদটা দেখে সেই-টেই হিসেব করছিল মনে মনে।

অকস্মাৎ বাবার গলা কানে যেতেই ধড়মড় ক'রে উঠে কাপড়-চোপড় সামলে বাইরে এল কিন্তু তার আগেই অনিষ্ট যা হবার তা হয়ে গেছে। তখন আর কোন-রকম সাবধান করার উপায়ও ছিল না—তিনি ওর দিকেই পিছন ফিরে রকের ওপর

জেঁকে বসেছেন। আগে কি কথা হয়েছিল তা জানা গেল না, কনক যখন এল তখন ওর বাবা হাসি-হাসি মুখে বলছেন, 'সুখবরটা শুনেই ছুটে এলুম বেনঠাকরুন, বলি যাই, খাড়া খাড়া গিয়ে সন্দেশ খেয়ে আসি গে।...আজ আর সহজে ছাড়ছি না কিন্তু তা আগেই বলে রাখছি, একটি হাঁড়ি মিষ্টি চাই।'

শ্যামার সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল না বটে কিন্তু তাঁর মুখটা দেখার কোন অসুবিধাই ছিল না কনকের। প্রথমটা একটা প্রচণ্ড বিস্ময়, একটা হতচকিত ভাবই মুখে-চোখে ফুটে উঠেছিল—কিন্তু সে এক লহমার বেশী নয়। তারপরই তাঁর মুখ অরুণ বর্ণ ধারণ করল, ধারালো ছুরির ফলার মতোই শাণিত হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি। কিন্তু সেও এক মুহূর্তের বেশী নয়, বোধ করি সে উষ্ণতা ও উগ্রতার একটা ছায়ামাত্র সরে গেল তাঁর মুখের ওপর দিয়ে—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যথোচিত মিষ্ট সৌজন্যের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন যেন। হেসেই জবাব দিলেন, 'খাওয়া তো আমারও পাওনা হয় বেইমশাই, আমি তো পথ চেয়ে বসে আছি—আপনি হাঁড়ি হাতে ক'রে ঢুকবেন। তা সে হবেই এখন—কিন্তু সুখবরটি আপনাকে এরই মধ্যে দিলে কে?'

সুখবরটা কি তা প্রশ্ন করার প্রয়োজন হ'ল না। ঐ যা প্রথমেই কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছিল বেহাইয়ের কথাটা ঠিক কোন্ দিকে যাচ্ছে ধরতে। কিন্তু মনের ওপর ও মুখের ওপর যত দখলই থাক তাঁর—কণ্ঠস্বরটাকে পুরোপুরি আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারেন নি—শেষের প্রশ্নটা করার সময় সতর্কতা সত্ত্বেও কণ্ঠ থেকে ঈষৎ তীক্ষ্ন কঠিন সুরই বেরিয়ে এল। আর তাইতেই হুঁশিয়ার হয়ে উঠলেন পূর্ণ মুখুজ্জে-মশাই। তিনিও পল্লীগ্রামেই বাস করেন—এসব বাঁকা প্রশ্নের সরল পরিণতি তাঁর একেবারে অজানা নয়। প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা সামলাতে একটু সময় লাগল বটে—তবে সহজ সত্য কথার পথে আর গেলেন না তিনি। বার দুই ঢোঁক গিলে বললেন, 'খবর? তা মানে—তা ঠিক বলতে পারব না। মানে ঐ মেয়েমহল থেকে শোনা, বুঝলেন কিনা—ঠিক কী ক'রে খবরটা গেছে—'

অর্ধপথেই থেমে গেলেন পূর্ণবাবু।

শ্যামাও আর বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না। অমায়িক ভাবেই হেসে বললেন, 'যাক—যে-ই দিক, খবরটা পৌঁছলেই হ'ল। আমারই দেওয়া উচিত ছিল, দোবও ভাবছিলুম কদিন থেকেই—কিন্তু জানেন তো বহুদিন মা সরস্বতীর পাট নেই, দোয়াত-কলম এখন যেন বাঘ মনে হয়!'

এর পর কোন পক্ষেই সহজ সৌজন্যের অভাব হ'ল না। বরং শ্যামার দিক থেকে একটু বাড়াবাড়িই হ'ল বলা যায়। কান্তিকে দোকানে পাঠিয়ে সত্যি-সত্যিই দুটো রসগোল্লা আনালেন তিনি—তাও এক-পয়সানে ছোট রসগোল্লা নয়, দু-পয়সানে বড় রসগোল্লাই আনতে বলেছিলেন তিনি—ঘরে তৈরি খুদ ভাজার নাড়ুর সঙ্গে সে দুটোই সাজিয়ে দিলেন এবং পীড়াপীড়ি ক'রে সবগুলো খাওয়ালেন। পূর্ণ মুখুজ্জেমশাইয়ের মনে যেটুকু উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল, এই প্রীতিপূর্ণ হৃদ্যতায় তার আর চিহ্নমাত্র রইল না; তিনি জলযোগ শেষ ক'রে খুশী মনেই বিদায় নিলেন। মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল বটে—কিন্তু সে শ্যামার সামনেই—আড়ালে দেখা করার কোন প্রয়োজন আছে তা তাঁরও মনে হ'ল না, শ্যামাও সে সুযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করলেন না। সুতরাং মামুলী সাবধানে থাকার দু চারটে উপদেশ দিয়ে পূর্ণবাবু হাসিমুখে মেয়েকে আশীর্বাদ ক'রে বেয়ানকে প্রণাম ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন। বহুদিন মেয়ের সন্তান-সম্ভাবনা না হওয়ায় মেয়ে-জামাইয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে কুটিল সংশয়টা দেখা দিয়েছিল, এ সুসংবাদে সেটাও নির্মূল হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক সত্যি-সত্যিই খুশী হয়েছেন।

বেয়াইকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে, তাঁর চোখের আড়ালে চলে যাওয়া পর্যন্ত কানাইবাঁশীর ঝাড়টার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্যামা। সহজ, স্বাভাবিক মানুষ। যেতে যেতে হঠাৎ পেছন ফিরে তাকালেও পূর্ণবাবু কোন বৈলক্ষণ্য টের পেতেন না। কিন্তু তাঁর বগলের বিবর্ণ ছাতাটি ও'দের বাঁশঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। বাইরের ঘরের রকে পাতার রাশ পড়ে, বঁটিটা সেইখানেই কাৎ করা কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে সোজা বাড়ির মধ্যে এসেই ঢুকলেন।

হেম খানিকটা আগেই এসেছে কিন্তু শ্বশুরকে দেখেই বোধ হয়—তখনও পুকুরে নামে নি কাপড় কাচতে—রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে একটু বিশ্রাম করছিল। কনকও আছে সেখানে—সাবান-কাচার জল গরম হয়ে গেছে অনেকক্ষণই, ওদিকে কাজও পড়ে বিস্তর—তবু সেখান থেকে নড়তে পারে নি। সে বহুদিন এই ঘর করছে, শাশুড়ীকে সে বিলক্ষণ চেনে, তাঁর এই কিছু পূর্বের অমায়িক ব্যবহারে ভোলার মতো নির্বোধ নয় সে। সে তাই উনুনের ধারেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝড় যে একটা উঠবে সে বিষয়ে তার সন্দেহমাত্র ছিল না—শুধু কখন উঠবে এবং কী পরিমাণ প্রবল হবে সেইটেই ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না। আশঙ্কাটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকলে উদ্বেগ আরও বাড়ে—কনকেরও বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছিল আসন্ন আক্রমণের সম্ভাবনায়।

শ্যামা এসে দাওয়ার সামনেই দাঁড়ালেন। ছেলে কিংবা বৌ কে অপরাধী, অথবা দুজনেই—ঠিক করতে না পেরে দুজনের মুখের ওপরই একটা কঠোর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'বলি, আমাকে না জানিয়ে বেয়াইবাড়িতে চিঠিটা কে লিখলে জানতে পাই কি?'

উত্তর কারুর দেওয়ার কথা নয়, সেজন্য অপেক্ষাও করলেন না শ্যামা। শাণিত-কণ্ঠ আর এক পর্দা চড়িয়ে পুনশ্চ বললেন, 'এ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার তাড়াটি পড়ে গেল কার? আমাকে না বলে সাত-তাড়াতাড়ি কুটুমবাড়িতে না জানালে চল-ছিল না বুঝি? মহা সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল একেবারে!...আমি কি জানা না কিছু জানি না? যখন দরকার বুঝতুম আমিই জানাতুম। আর যদি এত মাথাব্যথাই পড়েছিল তো এমন ক'রে কুটুমবাড়িতে আমাকে বে-ইজ্জত না ক'রে সোজাসুজি এই দাসীবাঁদিকে হুকুম করলেই তো হ'ত যে—খবরটা জানিয়ে দাও, নইলে আমাদের চলবে না, দিন কাটছে না। না কি, মা-মাগী যে এ বাড়ির কেউ নয়—নিতান্ত ঝি-চাকরাণী, সেই কথাটাই জানানো দরকার ছিল!'

হেম এই আকস্মিক—এবং তার কাছে অকারণ, আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে অবাক হয়ে বলল, 'কী জানানো হয়েছে কি? আর কে-ই বা জানালে?'

'কে জানিয়েছে সেইটেই তো আমি জানতে চাইছি বাছা! কার এতবড় সাহস—বুকের পাটা হ'ল যে কুটুমবাড়িতে মুখটা পোড়াতে গেল আমার!'

ছেলের প্রশ্ন করার ধরণেই শ্যামা বুঝে নিয়েছেন—সেই সঙ্গে কনকের অমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাতেও যে—কাজটা কার। সেই সঙ্গে তাঁর ভাষাও গেছে বদলে।

কনকের মাথাতে যেন কিছু ঢুকছে না। তার সবটাই যেন কাঠ হয়ে গেছে—ভেতরে বাইরে। বাইরে কোথায় একটা কাঠঠোকরা ঠকাস ঠকাস আওয়াজ করছে, দুটো কাঠবেড়ালীতে ঝগড়া বাধিয়েছে—সেই দিকেই যেন প্রাণপণে কান পেতে আছে সে। আজ যে রণরঙ্গিনী মূর্তি তার শাশুড়ীর—আজ নিশ্চিত মার খাওয়া অদৃষ্টে

আছে তার, সেই চিন্তা থেকেই মনটাকে সরাতে চাইছে সে।

হেম কিন্তু এবার বিরক্ত হয়ে উঠল। এ সব কথার প্যাঁচ সে কোনদিনই সইতে পারে না। সেও বেশ গলা চড়িয়েই বলল, কী মুশকিল, অত ভণিতা না করে আসল কথাটা কি খুলে বললেই তো হয়! কী হয়েছে সেইটেই যে বুঝতে পারছি না!'

শ্যামাও সমান ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলেন, 'কি হয়েছে জানো না? ন্যাকা?...তোমার ছিষ্টিধর বংশধর হবেন আমার স্বগ্‌গে বাতি দিতে— বৌ পোয়াতী, সেই খবরটি রাতারাতি তোমার শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে গেল কী ক'রে সেইটেই জানতে চাইছি। ...খবর কি আমি জানতুম না—না কখন খবর দিতে হবে সেটা আমার জানা ছিল না? আমি কি ঘরসংসার করি নি কখনও? না কি বেদের টোল ফেলেই দিন কেটেছে চিরকাল? যে তোমার বৌ বিবেচনা শেখাতে গেল?...কি সাহস ওর! এত সাহস ওর আসে কোথা থেকে?...তুমিই নিশ্চয় এ আস্পদ্দা যুগিয়েছ ওকে! সমঝে দিয়েছ যে মা দাসীবাঁদী, ওকে থোড়াই কেয়ার—তুমি মহারাণী, তুমি যা ভাল বুঝবে তার ওপর আর কথা নেই!'

সংবাদটা এতই অপ্রত্যাশিত আর পেলও এমন আকস্মিকভাবে যে কিছুক্ষণ যেন হেম শব্দগুলোর অর্থই ঠিকমতো বুঝতে পারল না—বিহ্বলভাবে মার দিকে চেয়ে বসে রইল শুধু।

বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল কনকও। কিন্তু সে অন্য কারণে। উনি সটান্ বলে দিলেন যে উনি জানতেন ! এতবড় মিথ্যা কথাটা উনি বললেন কী করে?...এ সংসারে কেউই সুবিধের নয় তা সে জানে—তবু, এতখানি বয়স হল ওঁর— উনি মা, মা বলে ডাকে সেও— সন্তানের সামনে এই তুচ্ছ কারণে এতবড় নির্জলা মিথ্যা কথাটা বলে বসলেন!...কনকও মেয়েছেলে, তায় দিন-রাত এক বাড়িতে বাস করছে ওঁর সঙ্গে, উনি যে টের পান নি এতদিন—তা সে হলপ ক'রে বলতে পারে। শুধু শুধু —নিজের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য ঢাকবার জন্যে ;—তিনি যে সুগৃহিণী, চারিদিকে চোখ আছে তাঁর সেইটুকু জাহির করার জন্যে ; আর সবচেয়ে বড় কথা, কনককে লাঞ্ছনা করবার সুযোগের জন্যেই জেনেশুনে এই মিথ্যা কথাটা বলছেন উনি! উনি অনেক কিছু পারেন- কত যে পারেন তা তো এসে অবধিই দেখছে সে—কিন্তু এতটা যে পারেন তা ওরও জানা ছিল না।...এই নূতন আবিষ্কারের অভাবনীয়তায় সে যেন নিজের আসন্ন বিপদের কথাও ভুলে গেল—বিস্ময়টাই বড় হয়ে উঠল আর সমস্ত কথা ছাপিয়ে।

কিন্তু কনকের জন্য ভগবান সেদিন আরও বিস্ময় জমিয়ে রেখেছিলেন,—অধিকতর বিহ্বলতার কারণ তোলা ছিল তার জন্যে।

মার কথাগুলোর সম্যক অর্থ মাথায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত শরীরটা রিন্ রিন্ ক'রে উঠল হেমের, মনের মধ্যে যেন একসঙ্গে অনেকগুলো তারের যন্ত্র উঠল ঝন্ ঝন্ করে। একটা অব্যক্ত, অজ্ঞাত, অনাস্বাদিত সুখে সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

কিন্তু তার মধ্যেই এ কথাটা তার মাথায় গেছে যে, এ বিহ্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। এ অনির্বচনীয় অনুভূতি উপভোগ করার অবসর বা সময় এটা নয়। এ মুহূর্তে কোন অশান্তি বরদাস্ত করতে রাজী নয় সে। মার যে রকম রণরঙ্গিনী মূর্তি—তিনি সব কিছুই করতে পারেন, গায়ে হাত তোলাও বিচিত্র নয়।...একবার

অপাঙ্গে অপরাধিনীর দিকে চেয়ে দেখল সে।—তার সেই আনত ম্লান শুষ্ক মুখ ও একান্ত দীন ভঙ্গী দেখে একটা অননুভূত মমতাতেও মনটা ভরে গেল তার। আহা বেচারী! এই কথাটাই মনে হ'ল তার সর্বাগ্রে।

সে মুখে যৎপরোনাস্তি একটা আহত ভাব টেনে বলল, 'ওঃ, এই! আমি ভাবছি না জানি কী একটা গুরুতর কান্ড হয়ে গেছে।...কথাটা তো সেভাবে বলা হয় নি অতশত বুঝেও বলি নি। তুমি যে এই কথা নিয়ে তিল থেকে তাল করবে তাও জানতুম না...তাছাড়া ঠিক বলব বলে বলাও হয় নি। সেদিন বড়বাবু হঠাৎ ডেকে বললেন যে, তোমার বদলীর অর্ডার এসেছে, জামালপুরে যেতে হবে।...কবে? না, এই পনেরো দিনের মধ্যে। তখনই আর কিছু ভেবে না পেয়ে বলে বসলুম, যে এখন দিনকতক মাপ করুন—আমার ঘরে এই ব্যাপার।...তা সে কথাটা যে এমন-ভাবে চাউর হবে, তাও জানি না। এখন মনে পড়ছে বটে যে সেখানে ওদের পাড়ার পুলে চক্রবর্তী দাঁড়িয়েছিল। সেই হয়ত গিয়ে রটিয়ে দিয়েছে কথাটা।'

কথাটা শ্যামার বিশ্বাস হ'ল না। বিশ্বাস হওয়ার কোন কারণ নেই। এ পৃথিবী-টাকে তিনি দেখেছেন বহুদিন, এই ছেলেকেও দেখছেন আজন্ম। একথা ও বলে নি। সবটাই বানানো, এই মুহূর্তে যা মনে এসেছে বানিয়ে বলছে। তবু কিছু করার নেই। তাঁর এ বিশ্বাসের কোন প্রমাণ নেই তাঁর হাতে। ছেলে যখন দোষটা মাথা পেতে নিচ্ছে তখন 'বলে নি' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মনের মধ্যেকার ধুমায়িত রোষ তাই প্রচন্ডতর বেগে জ্বলে উঠলেও আত্মসংযমই করতে হ'ল শেষ পর্যন্ত। তিনি বিস্মিতও হলেন। ছেলে যে বৌ সম্বন্ধে আর উদাসীন নেই—এইটুকু জানতেন, কিন্তু বৌ যে এতটা হাতের মুঠোয় পুরেছে ছেলেকে, কান ধরে ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে—এ খবরটা জানা ছিল না তাঁর।

কিন্তু মনে যা-ই হোক, যত দাহই সঞ্চিত হয়ে উঠুক—সেটা প্রকাশ করার স্থান কাল এটা নয়। প্রাণপণে অর্ধোদ্গত বিষ দমন করলেন শ্যামা। নিরতিশয় শীতল কণ্ঠে শুধু বললেন, 'অ। তাহ'লে তুমিই বলেছ! তা কৈ, বলো নি তো সে কথাটা এতদিন। ওটা যে জানতে তাও তো বলো নি!'

'বা রে।' হেম মাথা হেঁট ক'রে জবাব দেয়, 'এ কী আমার বলবার কথা! আর কেনই বা বলব। তুমিও তো জানতে, তুমিও তো বলো নি কাউকে। আমাকেও তো বলো নি। তাছাড়া—'

একটু থেমে গলাটা বোধ করি বা লজ্জাতেই একটু নামিয়ে বললে, 'তাছাড়া আমি ঠিক জানতুমও না। বলতে হয়—একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয় তাই বলা। আন্দাজে ঢিল মারা কতকটা—। লেগে যাবে যে ঠিক ঠিক—'

'হুঃ!' অপরাধ স্বীকারের জাজ্বল্যমান প্রতিমূর্তি আনতবদনা বধূর দিকে এক-বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শ্যামা আরও শীতল কণ্ঠে বললেন, 'সবই জানতে বাছা। বৌ যে লিখেছে তাও জানতে—তাই সাত-তাড়াতাড়ি আগু বেড়ে এসে দোষটা ঘাড় পেতে নিলে। তোমার যে এতটা উন্নতি হয়েছে সেইটেই শুধু আমি জানতুম না—তা জানলে কি আর একথা বলতে আসি?...তোমাদের গুষ্টির দ্বারা তো অনেক শিক্ষা, অনেক ফৈজৎ হয়েছে—এইটেই বাকী ছিল শুধু বোয়ের কাছে অপমান হওয়া। ...যাক্—ঘাট হয়েছে আমার একথা বলতে আসা, তাতে যদি রাজরাণীর কাছে অপ-রাধ হয়ে থাকে তো মাপ করতে ব'লো; আর কী করব তা জানি না—বলো তো না হয় উঠোনে নাক-খৎই দিই সাত হাত মেপে!'

এর পর উত্তর-প্রত্যুত্তরের জন্য দাঁড়ানো যায় না। তাহ'লেই সত্য মিথ্যা সাক্ষী

প্রমাণের কথা উঠবে। ছেলেই বা কী মূর্তি ধারণ করবে তার ঠিক কি! কথাটা শেষ ক'রেই শ্যামা হন্ হন্ ক'রে বাইরে চলে গেলেন।

প্রমাণ-প্রয়োগ না থাক্—মিথ্যাটা কেউ মুখের ওপর মিথ্যা বলে ছুঁড়ে মারলে কারুরই ভাল লাগে না। হেমেরও লাগল না। কিছু পূর্বেকার মনের মধ্যে রিন্-রিনিয়ে ওঠা মিষ্টি সুরটা নষ্ট হয়ে গেল, কোথায় একটা বড় রকমের ছন্দপতন হ'ল যেন। মাধুর্যের বদলে মনের পাত্রে ফেনিয়ে উঠল একটা কটু-তিক্তস্বাদ। সে হন্-হনিয়ে কাছে উঠে এসে চাপা গলায় বললে, 'তুমিই বা আমাকে না জানিয়ে—আমাদের না জানিয়ে চিঠি লিখতে গিছলে কেন? এ এমন একটা কি কথা যে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক পিটিয়ে না বেড়ালে হয় না। এইসব কথা নিয়ে ঘোঁট আদিখ্যেতা যার ভাল লাগে লাগে—আমার ভাল লাগে না, এইটে মনে ক'রে রেখো!'

কনক এ কথার কোন উত্তর দিতে পারে না; অন্তরভরা কৃতজ্ঞতায় এবং উচ্ছ্বসিত প্রেমে তার চোখে যে জল এসে গিয়েছিল এই কয়েক মুহূর্ত আগে—সেইটেই বেদনার অশ্রুতে পরিণত হয় শুধু। বলতে পারে না যে, ওরা অন্ধ বলেই তাকে কথাটা অন্যত্র জানাতে হয়েছিল, বলতে পারে না যে, যে স্বামী উদাসীন তার কাছে এ কথাটা নিজে থেকে মুখ ফুটে কোন স্ত্রীই জানাতে পারে না—বলতে পারে না, তার জন্য হেমকে যে গুরুজনের কাছে মিথ্যা বলতে হয়েছে তাতে এমন কোন দোষ হয় নি, কারণ সেই গুরুজনও একটু আগে তাদের কাছে মিথ্যাই ব'লে গেছেন। কিছুই বলা হয় না। একটু আগে স্বামীর মুখে মধুর মিথ্যেটা শুনতে শুনতে অভাবনীয় সৌভাগ্যের মাধুর্যরসে মন ডুবে গিয়ে যে স্বপ্ন দেখছিল, কল্পনা করছিল কেমন ক'রে সে স্বামীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে বলবে 'তুমি আমাকে মাপ করো আমার জন্যে তোমাকে মিথ্যা বলতে হ'ল'—আর স্বামী কেমন করে মধুর প্রশ্রয়ে ওকে পা থেকে টেনে তুলে বলবেন, 'দূর পাগল, তাতে কি হয়েছে!'—সে স্বপ্ন, সে কল্পনাও কোন্ বাস্তবের রূঢ় দিগন্তে মিলিয়ে গেল। এর পর আর কোন কথাই বলবার প্রবৃত্তি রইল না ওর। হেঁট হয়ে হাঁড়ির গরম জলটা কলসিতে ঢেলে দিতে দিতে শুধু প্রাণপণে চোখের জলটা হেমের কাছ থেকে গোপন রাখবার চেষ্টা করতে লাগল।

দশম পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

শ্যামার ইচ্ছা ছিল সাধের পর বৌকে বাপের বাড়ি পাঠাবেন। সাধের পর এই জন্যে যে—নইলে সাধের তত্ত্ব করতে হয়। সাধের খরচা আইনত শ্বশুরবাড়িরই। এখানে তিনি কোন মতে একখানা মিলের শাড়ি এবং পুকুরের মাছ ধরে পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত দিয়ে সারতে পারেন কিন্তু কুটুমবাড়িতে তা চলবে না। দিতে গেলে একটু গুছিয়ে দিতে হয়। পাঁচজনে দেখবে, যেমন-তেমন করে দিলে নিন্দে হবে।

কিন্তু সাধের পর আর না। বাপের বাড়ির সাধ খেতে তো যেতেই হবে—অমনি ছেলে হয়ে আসবে একেবারে। প্রথম প্রসব হবার খরচাটা বাপেরই করা উচিত—এই ও'র ধারণা। যদিও সে কথা প্রত্যক্ষভাবে বলেন না। সামনে অন্য ওজর দেন, 'ছেলেমানুষ—এই প্রথমবার, মা-বাপের কাছে থাকে, সেই-ই ভাল। নইলে ভয় পাবে। তাছাড়া—আমার এখানে কে-ই বা আছে বলো। এত কন্না কে করবে

এখানে? খেঁদিটা থাকলেও না হয় কথা ছিল!'

তবে আসল কারণটা পরোক্ষে বলেন বৈকি!

অপরকে উপলক্ষ ক'রে বলেন।

'সে কথা একশ'বার। মেয়ের বিয়ে দেবার সময় প্রথম বেন তোলার খরচটাও ধরে রাখতে হয়। শ্বশুরবাড়ির খরচা তো পড়েই রইল—বাপ মিন্‌সে প্রথমবারটাও করবে না! মেয়ে যখন হয়েছে তখন তো এসব খরচা ধরে রাখাই উচিত।'

কনক শোনে, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। সে সাহস তার নেই। তবে উত্তরটা তার মুখের কাছে ঠেলাঠেলি করে। শ্যামা নিজে কোন মেয়েরই বেন তোলেন নি। মহাশ্বেতার প্রথম ছেলে হওয়ার সময় তার শাশুড়ীও এই মতলব এ'টেছিলেন, কিন্তু শ্যামা উচ্চবাচ্য করেন নি। হয়ত তবুও বাঁচতেন না, নিহাৎ ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, সাধের আগেই ছেলে হয়ে গিয়েছিল মহার। এ গল্প শ্যামাই করেছেন কতবার—হেসেছেন বলতে বলতে। কেমন জব্দ মহার শাশুড়ী, সে হাসির এই অর্থ। ঐন্দ্রিলার বেলায় আনবার কোন কথাই ওঠে নি। তরুর তো এই সেদিন ছেলে হ'ল, কনকের সামনেই বলতে গেলে, কৈ, তাও তো শ্যামা তাকে আনবার নাম করেন নি। সে বেচারার শ্বশুরবাড়িতে তো তবু কেউ ছিল না। এমন কি সতীনও না—সেও সে সময় প্রসব হ'তে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। দাই আর পাড়ার লোকের ওপর ভরসা করে ছিল তরু।

কিন্তু শ্যামার ইচ্ছা যা-ই থাক—দেখা গেল ভগবানের ইচ্ছা অন্যরকম। মহাশ্বেতা তবু সাধের খরচাটা করায় নি কিন্তু এ বৌ সেটিও ষোল আনা করিয়ে নিয়ে শ্যামাকে বৃহত্তর খরচার মধ্যে ফেলে দিলে।

শ্যামার তরফ থেকে চেষ্টা ও যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না, হিসাবমতো ন' মাস পড়তেই প্রথম যে দিনটি পাওয়া গেল সাধের, তিনি সেইদিনই তাড়াহুড়ো ক'রে সেরে নিয়েছিলেন। যজ্ঞির ব্যাপার কিছু নয়, বাইরের এয়োও কাউকে বলেন নি—মহাদের তিন জাকেই শুধু বলেছিলেন। মহা পাঁচটা এয়োর ধুয়া তুলেছিল, তাকে ধমকে চুপ করিয়ে দিয়ে ছিলেন, 'পাঁচটাই যে করতে হবে, কে বললে? বেজোড় হলেই হ'ল!'

মহাদের বলার সুবিধা আছে। ওরা ঘরের লোক, তাঁর হালচাল অনেকটা জানে, খুব একটা নিন্দা করবে না। কাজটা সেরেছিলেনও যতদূর সম্ভব কম খরচে। পুকুরে ছিপ ফেলিয়েছিলেন আগের দিন কান্তিকে দিয়ে, একটা মাঝারি কালবোশ আর গোটা দুই বাটা মাছ উঠেছিল। তাইতেই কাজ চলে গিয়েছিল। পায়েসের জন্যে বাজার থেকে এক পো মাত্র দুধ আনিয়েছিলেন—ইচ্ছে ছিল তাইতেই ফুটন্ত ভাত থেকে দুহাতা ফ্যানে-ভাতে ঢেলে দিয়ে গোটাকতক কুণ্ডুবাড়ীর বাসি সন্দেশ গুঁড়িয়ে দেবেন ; তার সঙ্গে খানকতক বাতাসা আর একটু কর্পূর দিলে কেউ টেরও পাবে না। সন্দেশগুলোয় একটু গন্ধ হয়ে গেছে—সেইজন্যেই কর্পূর দেওয়া।

কিন্তু অতকাণ্ড করতে হয় নি। মহাশ্বেতা মাকে ভাল ক'রেই চেনে, পাছে জায়েরা বাড়ি এসে টিট্‌কিরি দেয় তাই ভোরবেলাই এক ছেলেকে দিয়ে লুকিয়ে একপোটাক দুধ পাঠিয়ে দিয়েছিল। একটু একটু ক'রে সকলের দুধ থেকে কেটে নিলে কেউ টেরও পায় না—অথচ কাজ চলার মতো বেশ খানিকটা দুধ পাওয়া যায়। এ মহাশ্বেতার বহুদিনের অভ্যাস। জায়েরা যে জানে না তাও না, কারণ কোন কাজটাই সে গোপনে করতে পারে না, সে বুদ্ধিই তার নেই। আস্তে কথা বলতে

পারে না—কাজেই কোন কথা কি কাজ লুকোবার চেষ্টা করলে আরও হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ে। জায়েরা তাই জেনেও, কতকটা দয়া করেই, কিছু বলে না আজকাল। নিতান্ত ওর গায়েপড়া ঝগড়া খুব অসহ্য হ'লে মেজবৌ এক-আধদিন বলে ফেলে। জোঁকের মুখে নুন দেবার মতোই চুপ করিয়ে দেয় এই খোঁটাটা দিয়ে। তারপর কেঁদে-কেটে চেঁচিয়ে লাফিয়ে যত প্রতিবাদই করুক মহাশ্বেতা, সেদিনের মতো ঝগড়াটা চাপা পড়ে যায়, এ চেঁচামেচিও বেশীক্ষণ থাকে না। অভিযোগটা এতই সত্য যে বেশীক্ষণ প্রতিবাদ করতে বোধ হয় নিজেরই লজ্জা হয় তার।

অবশ্য অল্পস্বল্প খোঁচা দিতে কেউই ছাড়ে না। সেদিনও, কনকের সাথে খেতে বসে ভালমানুষ তরলাও বলেছিল, 'দিদি, পায়েসটা ঠিক আমাদের বাড়ির মতোই হয়েছে, না?'

তাতে প্রমীলা মুখ টিপে হেসে বলেছিল, 'কেন লো—আমাদের বরদা গয়লানীর দুধের বাস্ পাচ্ছিস নাকি?'

মহা তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়ে বলেছিল, 'তোর যেমন কথা ছোট বৌ! অল্প দুধে পায়েস করা—তা আবার সেদ্ধ চালের, ও সব-বাড়িই এক রকম হয়।'...

এ পর্যন্ত ভালয় ভালয় কাটলেও বৌকে পাঠাতে একটু দেরি হয়ে গেল। পরের দিনই পড়ল গ্রহণ, গ্রহণের পর আট দিন যাত্রা নেই। তারপরই সংক্রান্তি মাস-পয়লা বৃহস্পতিবার—পরপর পড়ে গেল! শ্যামার ভাষায় 'আমার কপালে যেন ভগবান সার সার সাজিয়ে রেখেছিলেন দিনগুলি!' তার পরদিন পাঠাবেন সব ঠিক, বেয়াই-বাড়িও সে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে—কিন্তু সেই বৃহস্পতিবারই হঠাৎ কনকের ব্যথা উঠল, আর সারা দিনরাত ব্যথা খেয়ে শুক্রবার ভোরে ছেলে হয়ে গেল তার।

অগত্যা পাড়ার দাইকে ডাকতে হ'ল, আনুষঙ্গিক যা কিছু খরচ তাও করতে হ'ল। শ্যামার ভাষায়—'এতটি গলে গেল। ছেলে এলই আমার সঙ্গে আক্‌চা-আক্‌চি ক'রে—যেন মতলব এঁটে ঠাকুমার খরচ করাবে বলে। ও ছেলে যা হবে তা বুঝতেই পারছি। উঠন্তি মুলো পত্তনেই বোঝা যায়। হাড়-মাস ভাজা-ভাজা করে যদি না খায় তো কী বলেছি আমি। কে জানে, সেই মিন্‌সেই আবার আমাকে জ্বালাতে ফিরে এল কিনা। এদান্তে বেটার বৌকে খুব পছন্দ হয়েছিল তো—সেই বোয়ের কোলেই ফিরে এল বোধ হয়।'

শাশুড়ী যা-ই বলুন, কনকের কোন ক্ষোভ হয় না। কোন কথাই আর যেন্ তার গায়ে লাগে না।

ছেলে সুন্দর হয়েছে। কনকের মনে হয় বাপের মতোই সুন্দর হয়েছে। এক এক সময় মনে হয় আরও সুন্দর হবে। কান্তির কথা মনে পড়ে যায়, ওর বিয়ের সময় যেমন কান্তিকে দেখেছিল। শিউরে উঠে উপমাটা মন থেকে তখনই আবার যেন দু-হাতে ঠেলে সরিয়ে দেয়। বাপ্ রে, ও চেহারায় কাজ নেই তার। ঐ রকম বরাত পেলেই তো হয়েছে। ছেলের রূপ নিয়ে কি হবে, গুণটাই বড়। মূর্খ অকর্মণ্য না হয় ছেলে। সে যেমন ক'রে হোক—ভিক্ষে দুঃখ ক'রেও ছেলেকে মানুষ করবে, লেখাপড়া শেখাবে।...

শ্যামাও, বধূর সম্বন্ধে মনে যতই বিদ্বেষ থাক, এই সব খরচপত্রের জন্য যত পরিতাপই হোক্—নাতি দেখে মন জুড়িয়ে যায়। তাঁর গর্ভের সন্তানরা বেশির ভাগই সুন্দর—তেমনিই হয়েছে এও। কান্তির মতো, ঐন্দ্রিলার মতো না হোক, বংশের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে। মনে মনে বার বার বলেন, 'বাঁচুক, মানুষ হোক।... কপাল ভাল নিয়ে এসে থাকে তবে তো—আমার ছেলেমেয়েদের মতো কপাল না

হয়!'

কিন্তু ভাগ্য যেমনই হোক, ছেলের আয়পয় যে ভাল না—সেটা বোঝা গেল শীগগিরই।

ষষ্ঠীপুজো শেষ হ'তেই বৌকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন শ্যামা। বললেন, 'এখন কিছুদিন নিয়মে থাকা দরকার। এখানে থাকলে অনিয়ম হবেই। আর বিশ্রামও পাবে না, কে করবে বলো? আমি না হয় রেঁধে ভাতটা যোগালুম, কাঁথা-কানি তো আর কাচতে পারব না। সেখানে পাঁচটার ঘর—বোনরা আছে, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকতে পারবে। আর খাওয়া-দাওয়াই বা আমার ঘরে কী আছে, ভাত হাঁড়ির ভাত, আলাদা কিছু ক'রে দোব সে ক্ষমতা কৈ?...তার চেয়ে মা-বাপের কাছে যাক, তাদের মেয়ে তারা যেমন ক'রেই হোক একটা ব্যবস্থা করবে।...আমি তো একটা দিক টানলুম—তারা এবার করুক না!'

সেইটেই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এই 'এতটি টাকা' খরচ হয়ে গেল—আবার যদি পোয়াতীকে সারিয়ে তুলতে হয় তো রক্ষে নেই। কোন্ না অন্তত এক পো দুধ জোগানি করতে হবে—পোয়াটাক ঘিও চাই। লুচি হালুয়া না হোক, কদিন ভাত-পাতে একটু না দিলে লোকেই বা বলবে কি! তার চেয়ে ওদের ওপর দিয়েই যাক—চাই কি, মাস-দুই যদি চেপে থাকে তো তাঁর এদিকের খরচও খানিকটা উশুল হবে। হাজার হোক, একটা পেট তো বাঁচবে।

কিন্তু বৌকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতে খবর এল হারানের খুব অসুখ—এদের কারুর যাওয়া দরকার। খবরটা দিলে চিরদিনের ভগ্ন-দূত মহাশ্বেতাই। ছোট ছেলেটাকে পাঠিয়েছিল গাছ-কতক নাজনে-ডাঁটা দিয়ে বোনের খবর নিতে তার মুখেই বলে পাঠিয়েছে তরু। কী অসুখ তা ছেলেটা ঠিক বলতে পারে নি—তবে দেখে এসেছে মেসোমশাই শুয়ে আছেন, অসাড় অনড় হয়ে, মাসীমা কান্নাকাটি করছে।

খবরটা এল দুপুরে, তখন হেম অফিসে। কান্তি বাড়িতেই থাকে বটে, এখনও সে পড়াশুনোর চেষ্টা করে খানিকটা কিন্তু মার তাড়নায় কিছুই হয় না। মা তাকে সারাক্ষণই বাগানে খাটাতে পারলে বাঁচে। এদিকে বইও সব হাতে নেই, তার ওপর মাথাটাও কেমন হয়ে গেছে অসুখের পর থেকে—মাথায় যেন কিছু ঢুকতে চায় না। মুখস্থ করলেও দুদিন পরে ভুলে যায়। সে জন্যে শ্যামার যেমন দুশ্চিন্তারও অন্ত নেই, তেমন গঞ্জনারও না। সে গঞ্জনার ভাষা কানে না গেলেও আকারে-ইঙ্গিতে তার তীব্রতা বুঝতে পারে কান্তি, ফলে আরও যেন দিশাহারা হয়ে যায়। আরও অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে।

শ্যামা একবার ভাবলেন ওকেই পাঠাবেন, বললেনও ইশারায় কিন্তু তারপর নিজেই আবার বারণ করলেন। কোন লাভ নেই। ও'রা দুজনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, উনি আর কনক—ওকে ঠোঁট নেড়ে কথাগুলো মোটামুটি বোঝাতে পারেন। এখনও হেমই পারে না—তরু তো পারবেই না। এই অবস্থায় ঠিক কতটা কি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না তো, যদি বাড়াবাড়িই কিছু হয়ে থাকে তো তরু লিখে জানাবে সব কথা —সে সম্ভব নয়। তাছাড়া তরু তেমন লেখাতে পটুও নয়। মিছিমিছি কান্তিকে পাঠানো মানে তাদের উদ্ব্যস্ত করা। তার চেয়ে হেমই আসুক। আজকাল 'ওপর-টাইম' না থাকলে সে সকাল করেই ফেরে প্রায়। সন্ধ্যার পরই পৌঁছে যায়। ঠাকুর ঠাকুর করতে লাগলেন শ্যামা, যাতে সকাল করেই ফেরে হেম। ওপর-টাইমে সামান্য, কিছু পয়সা আসে বটে, তা হোক,, তবু আজ তা না থাকাই বাঞ্ছনীয়।...

ওভার-টাইম না থাকলেও—সেদিনই হেম ফিরল সামান্য একটু রাত করে। পোস্তায় গিয়েছিল, সস্তায় এটা-ওটা বাজার করতে। অবশ্য তাতে আটকাল না—তখন সবে আটটা, সিদ্ধেশ্বরীতলায় ঘড়ি দেখে এসেছে হেম—গিয়ে খবর নিয়ে আসতে সাড়ে দশটা এগারোটার বেশী হবে না। সে পুঁটলিটা নামিয়েই রওনা হয়ে গেল। অন্ধকার রাত—পথটাও খারাপ। কিছুদিন আগেই সামান্য কটা পয়সার জন্যে মানুষ খুন করেছে ডাকাতরা ঐ পথেই। মন চায় না পাঠাতে। বললেনও একবার শ্যামা, 'এখন না হয় থাক, ভোরে তুলে দিলে—পারবি না ঘুরে আসতে?'

'পাগল! তিন কোয়ার্টার এক ঘণ্টার পথ ভোরে গিয়ে আসব কেমন করে আফিসের আগ? কাল কামাই করাও চলবে না, কোন মতেই—বড়সাহেব আসবে আমাদের সেকশ্যানে। ও কিছু হবে না, আমি ঘুরে আসছি চট করে।'

যেতে দিতেও যেমন ইচ্ছা করে না—বাধা দেবারও শক্তি নেই। শেষ পর্যন্ত শ্যামা জোর করে কান্তিকেও সঙ্গে দিলেন। শুনতে না পাক—দোসর তো থাকবে অন্ততঃ।

'তুমি একা থাকবে?' আপত্তি করে হেম।

'সে আমি বেশ থাকব'খন—আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তোরা ঘুরে আয়। দুগ্গা-দুগ্গা!'

সদর দরজা ভাল ক'রে বন্ধ হয় না, খিলটা কোনমতে ঠেকানো থাকে শুধু। একটা লোহা দা না কিনলে ওর কোন উপায়ও হবে না। কাঠটাও গেছে পচে, বহুকালের দোর জলে-রোদে জীর্ণ হয়ে এসেছে। নতুন লোহা লাগবেও না হয়ত। একেবারে দরজাটা পাল্টাবেন এই মনে করেই কিছু করা হয়নি। রাত্রে খিল বন্ধ করার পরও খান-দুই ইট নিচে ঠেকিয়ে রাখা হয়—কেউ ঠেলে ঢুকলে তবু আওয়াজ হবে। এখনও তেমনিভাবে বন্ধ করে রান্নাঘর আর বাইরের ঘরে শেকল তুলে দিয়ে দালানে এসে বসলেন শ্যামা। অন্য সময় কাজ না থাকলে আলো নিভিয়েই বসেন—অকারণে তেল পোড়ান না, আজ কুপিটা জ্বালিয়েই রাখলেন। যাবার সময় হেম একটু টুকে দিয়ে গেল বলেই—নইলে তাও রাখতেন না।

না, ভয় তাঁর শরীরী অশরীরী কোন প্রাণীকেই নেই। দীর্ঘকাল একা থেকেছেন, কাটিয়েছেন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে। হেম যখন হয়—গুপ্তিপাড়ার অতবড় বাড়িটায় সাতাশ বিঘে বাগানের মধ্যে বলতে গেলে একাই থাকতে হ'ত। বুড়ো শাশুড়ী—সন্ধ্যেবেলাই ঘুমিয়ে পড়তেন। বড় বড় আমগাছ আর কালোজামের গাছে বাতাস লেগে চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন সোঁ সোঁ আওয়াজ করত, উঁচু তালগাছগুলোর পাতায় আপনা-আপনি কটকট শব্দ উঠত—কত কী নাম-না জানা প্রাণীর বিচিত্র গতিবিধির আভাস পাওয়া যেত বাইরের অন্ধকারে—তখন ভয়ে বুকের মধ্যেটা হিম হয়ে আসত এক-একদিন। প্রাণপণে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে তাকে কাঁদিয়ে দিতেন, সেই কান্নার শব্দে শাশুড়ী যদি সজাগ হন, দুটো কথা বলেন—এই আশায়।

হয়ত সব শব্দই সত্যও নয়, হয়ত অনেকখানিই কল্পনা—কিন্তু সেদিন অত বুদ্ধি হয় নি। নানারকম শব্দ পেতেন সত্যি সত্যিই। অন্ধকারে জানলার সামনে বড় বড় গাছগুলো আকাশ আড়াল ক'রে যেন কী এক বিভীষিকার মতোই দাঁড়িয়ে থাকত। তার ওপর তার কন্দরে কন্দরে যখন জোনাকীগুলো দপদপ করে জ্বলত আর নিভত, যেন আরও ভয়ঙ্কর মনে হ'ত সেগুলোকে। মনে হ'ত—এত গাছ-পালা কী করতে হতে দেয় মানুষ? ফল খেয়ে কাজ নেই, তাঁর নিজের বাড়ি হ'লে জন ডেকে কালই গাছগুলো কাটিয়ে দিতেন!

তবু অন্ধকার একরকম। তাঁর আরও ভয় করত চাঁদনী রাত হ'লে। অসংখ্য পত্রপল্লবের ছায়ায় যেটুকু আলো নামত বাগানে, তাতে সবটা পরিষ্কার দেখা যেত না, খানিকটা আবছায়ার সৃষ্টি করত শুধু। গাছের ডালপালা কাঁপার সঙ্গে তাদের ছায়াও কাঁপত, মনে হ'ত কত কী অশরীরী প্রাণী যেন চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক এক সময় আলোছায়ার বিচিত্র যোগাযোগে সত্যিই মনে হ'ত একটা কে লোক দাঁড়িয়ে আছে—আর একটু পরে কিম্বা কাছে গেলে দেখা যেত না, ভূত দেখেছেন মনে করে কতদিন দৌড়ে পালিয়ে এসে ঘরের দোর দিয়েছেন কিম্বা আলো ছুঁয়ে বসে থেকেছেন। লোহা ছুঁলেও নাকি অপদেবতারা কিছু করতে পারে না, আর হাতেই লোহা আছে তাঁর—একথাটা সেদিন কিছুতে মনে পড়ত না। আজ দেখে দেখে বুঝেছেন ওগুলো শুধুই আলো-আঁধারির মায়া—অশরীরী কিছু আছে কিনা তা তিনি জানেন না, থাকলেও তারা শরীর ধরে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না।

ও বাড়িটায় আবার এমন ব্যবস্থা, রাত্রে কোন প্রাকৃতিক কাজের দরকার পড়লে বাগানে বেরোনো ছাড়া উপায় থাকত না। সহজে শ্যামা বেরোতেন না, কিন্তু অসুখ-বিসুখ করলে বেরোতেই হ'ত। সেই সময়গুলো যেন কান্না পেত তাঁর। শাশুড়ী দাঁড়াতেন ঠিকই—কিন্তু সেটা শুধুই দাঁড়ানো—তিনি প্রায়ই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলতেন আমি এই চেয়ে রয়েছি বৌমা, ভয় নেই, তুমি নিভ্‌ভরসায় চলে যাও!'

কিন্তু ভয়টা তা শুধু অশরীরী প্রাণীরই নয়—শরীরী প্রাণীরাও তো নেহাৎ কম যেতেন না! সাপ-খোপ তো আছেই, বাঘ বেরোনোও তখন ও অঞ্চলে খুব অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। একবার মনে আছে—উনি পাইখানায় গিয়েছেন বাগানের মধ্যে —ফেউ ডেকে উঠল একেবারে পাশেই। শাশুড়ী চেঁচাচ্ছেন—'বৌমা পালিয়ে এস, পালিয়ে এস'—তাঁর একবারও মনে হচ্ছে না যে পালিয়ে আসতে গেলে অন্তত বিঘে দুই জমি পেরিয়ে আসতে হবে—হয়ত বা বাঘের সামনে দিয়েই। তবু যেতেই হয়েছিল তাই—ডাক ছেড়ে চিৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে ঐ পথটা ছুটে গিয়েছিলেন, হয়ত তাঁর চিৎকারেই বাঘ সরে গিয়েছিল।

তারপর পদ্মগ্রামে এসেও কম সইতে হয় নি তাঁকে। রাতের পর রাত ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। সেখানে দাঁড়াবারও লোক ছিল না কেউ, তাঁকেই দাঁড়াতে যেতে হ'ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। সরকারবাড়ির বাগানের মধ্যেই ছিল বটে ঘরখানা, তবু ও'দের মূল বাড়ি থেকে একেবারে আলাদা—অনেকটা দূরে। মন্দিরের গায়ে পূজুরীর ঘর—এইভাবেই করানো; ব্রাহ্মণদের দূরেই রাখতে চেয়েছিলেন কর্তারা—যাঁরা ঘর তৈরী করিয়েছিলেন। মঙ্গলা স্পষ্টই বলতেন, 'বাপরে, বামুন হ'ল গে জাতসাপ, ওদের নেপ্‌চোয় কি থাকতে আছে। কত কি কথা ওঠে, কথার পিঠে কথা—কী বললুম না বললুম—অমনি হয়তো মন্যি দিয়ে বসে রইল। একবাড়িতে থাকতে দুরন্ত ছেলেপুলে ঘরে-দোরে ঢুকবে কী সব অত্যাচার করবে, হয়ত হুঁশ রইল না গায়ে পা-ই লাগিয়ে বসল— সে পাপের বোঝা কে বইবে বলো? না, ও ঐ দূরে দূরে থাকাই ভাল।'

তারপর মুচকি হেসে, কৃষ্ণযাত্রায় শোনা গানের একটা কলি গেয়ে উঠতেন হয়ত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় 'দূরে রহুঁ দূরে রহুঁ প্রণাম হামার!'

সেই ঘরে, সেই বিজন অরণ্যের মধ্যে বলতে গেলে দীর্ঘকালই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। এতটুকু এতটুকু বাচ্ছা নিয়ে, একদিনে ওরা বড় হয় নি, তিল-তিল সংগ্রাম করতে হয়েছে ওদের বড় করতে। দিনের পর দিন যখন অন্ন জুটত না, তখন একা ঐ অন্ধকার বাগানে ঘুরে বেড়াতে হ'ত যদি একটা পাকা তাল কি একটা ঝুনো নারকেল কুড়িয়ে

পাওয়া যায়—এই আশায়। গন্ধ শুঁকে শুঁকে আতা-পেয়ারা গাছে পেকেছে টের পেয়ে অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে পেড়ে এনেছেন। অথচ কী না ছিল সে বাগানে, সাপ, গোসাপ, শিয়াল, বিছে—আরও কত কী। কিন্তু সেদিন ভয় করলে চলত না বলেই বেরোতে হয়েছে। এমন কিছু দুঃসাহসী তিনি ছিলেন না, মানুষ, বনপ্রাণী, সরীসৃপ—সকলকেই ভয় করতেন, ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করত, তবু যেতে হ'ত। আর সেই ভাবে যেতে যেতেই ভয়টা কমেছে তাঁর—কেমন একটা ভরসা এসেছে মনে—তাঁর কিছু হবে না।

ভয় তাঁর কাউকেই নেই আজ—অদৃষ্টকে ছাড়া। অদৃষ্ট খারাপ বলেই—বহু দুর্ভোগ কপালে লেখা আছে বলেই জেনেছেন যে, তাঁর কিছু হবে না। সহজে অন্তত মরবেন না তিনি। মানুষ, জানোয়ার, ভূত—কেউই কিছু করতে পারবে না। তাঁর ভয় তাঁর এই কপালটাকেই, কে জানে আরও কী আছে অদৃষ্টে! আরও কী দুর্দিন কী দুর্ভাগ্য তোলা আছে তাঁর জন্যে।...

চুপ করে বসেই রইলেন শ্যামা। দালানের দরজা বন্ধ করেন নি বটে কিন্তু সামনেই কুপির আলো, সেটা ডিঙিয়ে অন্ধকার উঠোনে কিছুই ঠাওর হয় না। তা না হোক, তার জন্য ব্যস্তও নন তিনি। তিনি স্থিরভাবে চেয়ে আছেন কুপির ঐ কম্পমান শিখাটার দিকেই।

বাইরে নিষুতি হয়ে এল ক্রমে। মল্লিকবাড়ির ঝি-চাকররা এ সময়টা প্রায়ই কলহ-কেজিয়া করে রান্নাঘরে বসে—ওঁদের পিছন দিকেই ওদের রান্নামহল—তারাও চুপ করে গেছে—বোধহয় শুয়েই পড়ল। ভূতি মল্লিকদের মাতলামির দাপাদাপি চিৎকারও স্তিমিত হয়ে এল একটু একটু করে। মহাদেবের দিদিমা ঘাটে বাসন মাজতে এসেছিল—জলের ছপছপ আওয়াজে টের পেয়েছিলেন শ্যামা—সেও সম্ভবত বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ল এতক্ষণে। এ পথে পথিক কেউ হাঁটে না রাত আটটার পর—এ পাড়ায় তাঁর ছেলেই সবচেয়ে দেরি করে বাড়ি ফেরে—সুতরাং কারুর হাঁটার শব্দ পাবেন সে সম্ভাবনা নেই।

তবে মানুষের প্রাণলক্ষণ না থাক—অন্য জীবিত প্রাণীর অস্তিত্বের অভাব ছিল না। শব্দেরও না। মানুষ যখন নিস্তব্ধ হয় তখনই বোধহয় ওরা বেশী করে কোলাহলমুখর হয়ে ওঠে। এইটেই বোধ হয় ওদের নিশ্চিন্ত হয়ে বিচরণ করার অবসর, জীবনটা উপভোগ করার সময়। এখনই ওরা যেন বাঁচার মতো বাঁচে।

ঝিঁ ঝিঁ-পোকা সন্ধ্যে থেকেই ডাকে, অশ্রান্ত নিরবচ্ছিন্ন, কিন্তু তখন কানে লাগে না, এখন মনে হচ্ছে অসহ্য। বাগানের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে একাধিক গো-হাড়গেল ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাপের সামান্য শব্দ এ নয়, রীতিমত ভারী কিছু যাওয়ার মড়মড় শব্দ। শিয়াল ডেকে উঠছে থেকে থেকে। অনেকের ধারণা ওরা শুধুই প্রহরে প্রহরে ডাকে, এখানে বাস করলে সে ভুল ভাঙ্গত তাদের। প্রায়ই ডাকে ওরা, সময়ে অসময়ে। মল্লিকদের বাড়ির কার্নিসের কোণ থেকে পেঁচা-দুটোর কর্কশ কণ্ঠস্বর উঠছে—বোধহয় এখন কী একটা ছোট পাখী ধরেছে ওরা, তার করুণ চিঁচিঁ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটু পরে থেমে গেল আবার। মরে গেছে পাখীটা। কোথায়—দূরে কোথাও দুটো বেড়ালে ঝগড়া করছে, তারও শব্দ শুনছেন শ্যামা। মাছে ঘাই দিচ্ছে মধ্যে মধ্যে পুকুরের জলে আলোড়ন জাগিয়ে। হয়ত ভামে খাচ্ছে মাছ। কে জানে!

এই সব শব্দই অন্য দিন হয়। বেশী রাত অবধি জেগে থাকা শ্যামার কাছে নূতন নয় কিছু, অন্যদিন এমনভাবে তাঁর কানে যায় না। সে সব দিনে অন্য চিন্তা থাকে, সেই

চিন্তাতেই জেগে থাকেন। আজও চিন্তা আছে—কিন্তু সেই চিন্তাটাকেই তাড়াতে চাইছেন তিনি মন থেকে, মাথা থেকে। সেই জন্যেই প্রাণপণে কান পেতে আছেন বাইরের দিকে, কোথায় কি শব্দ হচ্ছে শোনবার চেষ্টা করছেন। চিন্তার সঙ্গে তিনি যেন ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছেন তাঁর ভাগ্যকেও।

তাঁর কপালে ভাল কিছু নেই তা তিনি জানেন। খবর যা আসবে তাও আঁচ করতে পারছেন। কিন্তু সে যখন আসবে তখন আসবে—এখন থেকে সে কথা ভাবতে চান না।

হঠাৎ কী একটা দমকা বাতাস উঠল। একেবারে আকস্মিক। মা বলতেন নিস্তব্ধ রাত্রিতে এমনি দমকা হাওয়া তুলে পরিচিত মানুষের আত্মা চলে যায়। যাওয়ার পথে আত্মীয়-বন্ধুকে জানিয়ে দিয়ে যায় তাদের অস্তিত্ব। কে জানে কার আত্মা চলে গেল এ বাড়ির ওপর দিয়ে। মার? নরেনের? তাঁর শাশুড়ীর? কী বলতে চাইল সে আত্মা, কোন্ নূতন বিপদের আভাস দিয়ে গেল, সতর্ক থাকতে বলল!......

সে মর্মর শব্দ যেমন হঠাৎ উঠেছিল তেমনি হঠাৎই থেমে গেল। গাছপালাগুলো কিছুক্ষণ পত্রপল্লব নেড়ে স্থির হয়ে গেল আবার। শুধু বাঁশগাছের ডগাগুলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের কান্ডে কান্ডে কটকট শব্দ তুলে আন্দোলিত হ'তে লাগল।

॥ ২ ॥

ছেলেরা ফিরল রাত বারোটারও পর।

বিপদ একটা নয়—অনেকগুলো।

হারানের অসুখটাও বাঁকা। হঠাৎ পাঁচ-ছয় দিন আগে খেয়ে উঠে কী একটা ব্যাপার নিয়ে বড়বৌয়ের সঙ্গে চেঁচামেচি করতে গিয়ে মাথায় খুব যন্ত্রণা টের পায়। দুহাতে মাথাটা ধরে বসে পড়ে উঠোনেই। সেদিন নাকি অফিস থেকে ফিরেও রাগারাগি করেছিল। কিছু না খেয়েই ক্লাবে গিয়েছিল রিহার্সাল দিতে। সেখানেও চেঁচাতে হয়েছে অনেকক্ষণ, ফিরে এসে ভাত খাওয়ার পর হঠাৎ চেঁচাতে গিয়েই এই বিপত্তি। কিন্তু শুধু মাথার যন্ত্রণাই নয়। ওকে বসে পড়তে দেখে ছুটে এসে দুই বৌ ধরতে গিয়ে দেখে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। খুব বেশী নয়—তবে নাকি নিতান্ত দু-এক ফোঁটাও নয়। তখন আর কিছুই করা যায় নি, ঘরে এনে শুইয়ে মাথায় জল দেওয়া ও বাতাস করা ছাড়া। অত রাত্রে কে-ই বা ডাক্তার ডাকতে যাবে। নিবড়েয় তেমন কোন ডাক্তারও নেই। এখানকার কোন ডাক্তারকে খবর দিলেও যেত না সে সময়ে।

যাই হোক—সে রাত্রে হারান আর কোন উচ্চবাচ্য করেনি, একটু অস্ফুট গোঙানি ছাড়া। ওরা প্রশ্ন করে উত্তর পায় নি, ভেবেছে মাথার যন্ত্রণার জন্যই উত্তর দিচ্ছে না। সকালে বুঝেছে যে তা নয়, অজ্ঞানের মতো হয়ে আছে। তখন বড় বৌ কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ি গেছে খবর দিতে, তবু পাড়ার লোক ডেকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছে।

ডাক্তার আর শ্বশুর একসঙ্গেই এসেছেন। শ্বশুর দেখেশুনে মুখের ওপরই বলেছেন, সন্ন্যাস রোগ—ও আর বাঁচবে না। ডাক্তার অতটা হতাশ করেন নি, তবে তাঁরও মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। কী সব ওষুধ দিয়ে কতকটা জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছেন কিন্তু দেখা গেছে যে হাত-পা আর কিছু নাড়তে পারছে না, কথাও কইতে

পারছে না। কথা কারও বুঝতেও পারছে কিনা সন্দেহ। পক্ষাঘাতের মতোই সব লক্ষণ। ডাক্তার বলেছেন যে, সন্ধ্যা থেকে রাগারাগি করে আর চেঁচিয়ে মাথায় রক্ত চড়ে ছিল, তার ওপর আবার চেঁচাতে গিয়ে এই বিপত্তি। মাথার কোন শির ছিঁড়ে গেছে, এই তাঁর বিশ্বাস। বলেছেন প্রাণের ভয় এখনও যায় নি। তবে হয়ত বাঁচিয়ে দিতে পারবেন শেষ পর্যন্ত, কিন্তু আগের মতো সহজভাবে আর চলে-ফিরে বেড়াতে পারবে কিনা সন্দেহ।

বিপদের ওপর বিপদ—শ্বশুর এসে জামাইবাড়িতে জেঁকে বসে আছেন, সুতরাং তিনিই এখন অভিভাবক। খরচপত্র সব তাঁর হাতে, তিনিই সব করছেন। তরুর বিশ্বাস বুড়ির সিন্দুকে আর হারানের আলমারীতে নগদ টাকা ঢের ছিল, বুড়ির দরুন কিছু গয়না তো ছিলই—সেই জন্যেই হারান কোনদিন বাড়িতে চাবি রেখে যেত না। বুড়ি মরার পর থেকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। শ্বশুর এসে প্রথম দিনই চাবির গোছা হস্তগত করেছেন। এবং প্রকাশ্যে মেয়ের গহনা সব নিজের বাড়িতে রেখে এসেছেন বাক্স সুদ্ধ। কিন্তু তরু বলে যে, তার মধ্যে ওর সতীনের গহনা ছাড়াও অনেক জিনিস তিনি বই করেছেন। বুড়ির দরুন যা কিছু ছিল সবই। এ-ছাড়াও অফিস থেকে ওর বন্ধুদের সাহায্যে টাকাকড়ি নিয়ে এসেছেন খানিকটা, অসুখের অজুহাতে। সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। তরু একেই ভীতু আর লাজুক, তবু সর্বনাশ হয় দেখে একটু মৃদু প্রতিবাদ করতে গিছল। তিনি চাবির গোছা ফেলে দিয়ে বলেছেন, অফিসের টাকা না পেলে তো চিকিচ্ছেই চলত না, ঘরে তো কিছুই ছিল না। সিন্দুক আর আলমারী তো নামেই—ভেতরে তো ঢু-ঢু, অষ্টরম্ভা। বিশ্বাস না হয় খুলে দ্যাখো না।'

মরীয়া হয়ে তবু বলতে গিছল তরু যে, সে নিজে দেখেছে সিন্দুকে নগদ টাকা আর গিনি ছিল, আলমারীতেও কিছু কিছু টাকা রাখত হারান। এরই মধ্যে সব ফুরিয়ে যাবার কথা নয়—কিন্তু কথা শেষ করার আগেই ওর সতীন তেড়ে এসেছে, তবে কি তার বাবা মিছে কথা বলছেন? তরু কি বলতে চায় তিনি চুরি করেছেন সে টাকা?

তেড়ে এসেছেন সতীনের বাবাও। তাঁর সে সময়কার ভয়ঙ্কর চোখমুখের চেহারা দেখে তরুর মনে হয়েছে যে তিনি হয়ত ওকে মার-ধোরই করবেন।

শুধু তাতেই ক্ষান্ত হন নি, আজই নাকি বিকেলে ওকে শুনিয়েছেন, 'যে রকম ঘটায় চিকিৎসা হচ্ছে, টাকা যা পেয়েছি, তাতে আর কদিন? এরপর তো তোমার গয়না বেচতে হবে। তোমার ছেলে হয়েছে, বিষয়-সম্পত্তি তো সবই সে পাবে। ওর তো মেয়ে—আশাভরসা বলতে তো ওর কিছুই নেই, ঐ গয়না কখানা ছাড়া। সেও তো আমারই দেওয়া। ওতে তো আর হাত দিয়ে বলতে পারি না! ওরও তো সারা জীবন পড়ে রইল। মেয়েটা যদি বাঁচে, তার বিয়েও দিতে হবে।... না, ওর কাছ থেকে কিছু পিত্যেশ করো না। সোয়ামীকে যদি বাঁচাতে চাও তোমা-কেই টাকা বার করতে হবে!'

এ-ও সব নয়, ছেলেটা নাকি গত দুদিন একজ্বরী হয়ে আছে। জ্বর বাড়ছেও না কমছেও না—ছাড়বারও কোন লক্ষণ নেই। তার কোন ওষুধের কথা তো কেউ চিন্তাই করছে না—এখন আরও কিছু খারাপ না হ'লে হয়। তরু ঠিক মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি—কিন্তু হেমের মনে হ'ল সে একটু কিছু ভয় করছে। তার মনে হচ্ছে হয়ত যে সতীনের দিক থেকে ছেলেটাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করাও বিচিত্র নয়।

দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে হেম চুপ করল। তার বলার ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে যে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভোর ছটায় খেয়ে গেছে, এখনও পেটে কিছু পড়ে নি। অফিসে সে কোনদিন কিছু খায় না, জলখাবারের বিলাসিতা এখনও অভ্যাস হয় নি তার। দুবেলা দুমুঠো ভাত ছাড়া নিজে থেকে কিছু খায় না। বড় মাসী-মার বাড়ি গেলে তিনি হয়ত কিছু খেতে দেন। আজ তাও যায় নি, উল্টে বাজারে বাজারে ঘুরছে। তার ওপর এই দীর্ঘ পথ হাঁটা। কিন্তু শুধু শারিরীক ক্লান্তিই নয়—মনে মনেও আজ যেন বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সেটা ওর মুখের চেহারা দেখেই টের পাচ্ছেন শ্যামা। মনের জোর আর কিছুমাত্র নেই, শরীরের চেয়েও মনই বেশী অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

কান্তিরও দুই চোখ ছলছল করছে, সামান্য আলোয় ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু তাঁর মনে হল চোখ দুটো অস্বাভাবিক লালও হয়ে উঠেছে। হয়ত পথে আসতে আসতে কেঁদেছে কিম্বা প্রাণপণে কান্না চাপার ফলেই অত লাল। এসে পর্যন্ত আলোটার দিকে চেয়ে বসে আছে চুপ করে। আরও ওকে যেটা পীড়ন করছে সেটা ওর উপায়হীনতার লজ্জা—এবং গ্লানিও। ওর মনের মধ্যেটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন শ্যামা।...কিছুই করতে পারছে না সে, কিছুই করবার নেই। কোন কাজেই লাগাতে পারছে না এদের, আর হয়ত পারবেও না কোন দিন...

এরা সকলেই মুহ্যমান, এরা সকলেই বিচলিত কিন্তু শ্যামা সে রকম কিছু বোধ করছেন না কেন! খুব যে একটা দুশ্চিন্তা, একটা দুঃখ—কৈ, তেমন মনে হচ্ছে না তো। বরং বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন ওদের, লক্ষ্য করছেন। মনে হ'ল এদের অলক্ষ্যে একবার বুকটা টিপে দেখেন—ভেতরের মতো বাইরেটাও পাথর হয়ে গেছে কিনা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বলে ফেললেন শ্যামা, 'অনেক রাত হয়ে গেল তো, বোধহয় বারোটা একটা হবে—মুখ হাত ধুয়ে নে, তোদের ভাত দিই।'

হেম চমকে উঠল ও'র কথা শুনে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখল মার মুখের দিকে।

এতক্ষণ কি এসব কথা কিছুই শোনেন নি? না, বহু আঘাতে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? অমন নির্বিকারভাবে বসেই বা আছেন কী করে? যেন অপর কারও কথা বলা হচ্ছে! ও'র নিজের মেয়ে নয়—পরস্যাপি পর কেউ!

শ্যামা কিন্তু প্রস্তাব করেই দাঁড়িয়েছেন। ও'র কথা শোনে নি কান্তি—হঠাৎ ও'কে সহজভাবে উঠে দাঁড়াতে দেখে সেও চমকে উঠল। অবাক হয়ে মুখের দিকে চাইল সেও।

শ্যামা হাতটা মুখে তোলার ভঙ্গি করে ইশারায় ওকেও বললেন, 'হাত-পা ধুয়ে নে ভাত দিই।'

হেম যেন একটু বিরক্ত কণ্ঠেই বলল, 'তোমার তো সেই সকালের ভাত-ব্যান্নন, সে কি এখনও আছে? সে-তো পচে বজ্‌কে উঠেছে এতক্ষণে। আর থাকলেও এত রাত্রে খেতে পারব না। এক গ্লাস জল দাও, তাহলেই হবে।'

কনক চলে যাওয়ার পর থেকে দুবেলা আর রাঁধেন না শ্যামা—বেলায় যা রাঁধেন তাই এই দু'ভায়ের জন্যে রেখে দেন। সন্ধ্যাবেলা এসে হেমকে প্রত্যহই কড়কড়া ভাত খেতে হয়। আজ সে ভাতের কী অবস্থা হয়েছে তা বুঝতে পারছে সে।

শ্যামাও তা বুঝলেন। তিনি আর দ্বিরুক্তি করলেন না। আগের দিন মল্লিকরা

কী উপলক্ষে হরির লুঠ দিয়েছিল—তারই কখানা বাতাসা দিয়ে গেছে। সেই বাতাসা কখানা বার ক'রে দিয়ে দু'ঘটি জল গড়িয়ে দিলেন ঘড়া থেকে। একহাতে সব কাজ সারতে হয় বলে খুদ ভাজার লাড়ুও করতে পারেন নি কদিন—ফলে খাবার মতো আর কিছু ঘরে নেই।

হেম মুখ-হাত না ধুয়ে সেই অবস্থাতেই দুখানা বাতাসা মুখে দিয়ে ছোট ঘটির পুরো একটি ঘটি জল খেল। এত যে তেষ্টা পেয়েছে তা সে নিজেও এতক্ষণ বোঝে নি।

জল দিয়ে শ্যামা দাঁড়িয়েই আছেন। অর্থাৎ শুয়ে পড়তে চান এবার। হেম চলে গেলে দোর দিয়ে শুয়েই পড়বেন হয়ত।

সে আবারও মার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। সত্যিই কি মার মাথার গোলমাল হয়ে গেল?

একটু ইতস্তত করে আবার সে নিজেই কথাটা পাড়ল, 'কান্তি একটা কথা বলছিল আসতে আসতে—বলছিল এখানে এ রোগের যে ঠিক ঠিক চিকিৎসা হচ্ছে তা তো মনে হয় না। তার চেয়ে, খরচ তো হচ্ছেই পাল্কী করে এনে ট্রেনে তুলে কোন মতে ধরাধরি করে কলেজে নিয়ে গিয়ে ফেললে কি হয়?'

এবার শ্যামা কথা কইলেন। মনে হ'ল যেন একটা অন্ধ আক্রোশে দুই চোখ জ্বলে উঠল তাঁর। সে আক্রোশ তাঁর ভাগ্যবিধাতার ওপর। সামনে পেলে বাঘিনীর মতোই নখে-দন্তে টুকরো টুকরো করে ফেলতেন হয়ত—

তীক্ষ্ন কণ্ঠে বললেন, 'এসব করবে কে? তুমি তো আপিস নিয়ে আছ, আর ও তো ঐ—না মনিষ্যি না জানোয়ার। যা পার করো—আমি আর ও নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। ঢের মাথা ঘামিয়েছি, ঢের ভেবেছি। আর না। আর আমি ভাবতে পারি না। ভেবেই বা কি হবে?...যতই যা করো—ও যা হবে তা তো আমি জানিই। আমার ভাল কিছু হয় না কোন দিন। এও হবে না। কেউ থাকবে না আমার, কেউ না—। শুধু আমি রাক্ষুসী চারযুগ বসে থাকব সবাইকে খেতে, সকলের সর্বনাশ দেখতে—'

বলতে-বলতে এতক্ষণ পরে দুই চোখ ছাপিয়ে হু-হু করে জল নামে তাঁর। ললাটে করাঘাত করতে থাকেন সজোরে। হাহাকার করে কেঁদে ওঠেন।

হেম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

পরের দিন ভোরবেলা অফিস যাবার পথ হেম ডাক্তারের বাড়ি হয়ে গেল। এ পাড়ারই ডাক্তার—বড় ডাক্তারের ছেলে, ভাল প্র্যাক্‌টিস। এত ভোরে দেখা পাবার কথা নয়—তবে সে শুনেছিল ডাক্তারের পুজোপাঠের অভ্যাস আছে, হয়ত ভোরেই ওঠেন। দেখা পেয়েও গেল সে। অত সকালেই ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছিলেন ডাক্তার—দেখা হয়ে গেল। তিনি প্রস্তাবটা শুনে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আমার তো মনে হয় না এ ঝুঁকি আপনাদের নেওয়া উচিত। হার্টের অবস্থা খুব ভাল নয় এখনও—অত টানা-হেঁচড়া কি সইবে? এখান থেকে একেবারে গাড়িতে নিয়ে যেতে পারতেন কিম্বা পাল্‌কীতে—সে আলাদা কথা। তাও রাস্তা যা, গাড়িতেও নিয়ে যেতে বলি না। ঝাঁকানিতেই দফা রফা। পাল্‌কীও বোধহয় কলকাতা পর্যন্ত যেতে রাজী হবে না। তাছাড়া সেও, পাল্‌কীতে তোলা নামানো কম কাণ্ড নয়—ও-তো হাত-পা কিছুই নাড়তে পারছে না। কলকাতা হ'লে য়্যাম্বুলেন্স ডাকতে পারতেন। এখানে তো সে ব্যবস্থা নেই!'

তবু হেম বাড়ি ফিরে সন্ধ্যাবেলা অনেক ঘুরে দেখল। কোন পাল্‌কীওলাই রাজী হ'ল না যেতে। কলকাতায় গেলে নাকি পুলিশে বড় দিক্‌ করে, সে হ্যাঙ্গামে ওরা যেতে রাজী নয়। তাছাড়া রুগী নিয়ে যাওয়া—যদি পাল্‌কীতেই মরে যায়? তাহলে ওদের পাল্‌কীতে কেউ চড়বে না।

খুব পীড়াপীড়ি করতে একজন পঞ্চাশ টাকা হেঁকে বসল।

অর্থাৎ না যাওয়ারই মতলব। সুতরাং কিছু করা গেল না।

রাত্রে হেম গিয়ে কান্তিকে রেখে এল তরুর কাছে। তবু একটা দোসর। আর কিছু না হোক, ছুটে এসে খবরটাও দিতে পারবে। ওকে কাগজে লিখে ওখানের ব্যাপারটাও বুঝিয়ে দিলে একটু, যাতে একটু নজর রাখতে পারে হারানের শ্বশুরের ওপর। ছেলেটাকেও একটু দেখতে পারবে কান্তি।

খানিকটা ইতস্তত করে শ্যামার কাছেও কথাটা পাড়ল, 'তুমি একবার গেলে বোধহয় ভাল হ'ত। অতটা পারত না ওরা।...বিপদের সময় জামাইবাড়ি বলে সঙ্কোচ করতে গেলে চলে না।'

কিন্তু শ্যামা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন, 'না। আর পারাপারির কিছু নেইও। যারা জামাইয়ের মরণ টেঁকে আগেই টাকা-পয়সার কথা চিন্তা করে, তারা এত বোকা নয় যে রয়ে-বসে নেবে। যা করবার তা ক'রেই ফেলেছে। হরিনাথের বেলা নিজের মা-ভাইই ঠকিয়ে নিলে—এ তো শ্বশুর।...মিছিমিছি আমি গিয়ে নিমিত্তের ভাগী হ'তে চাই না, ওরা মজা পেয়ে যাবে, বলবে ও মাগীও সরিয়েছে।'

অগত্যা হেমকে চুপ ক'রে যেতে হয়।

অভয়পদকে বলতে হবে কথাটা। তার একটা পরামর্শ নেওয়া দরকার।

॥ ৩ ॥

শরৎ খবরটা পেলেন গোবিন্দর কাছ থেকে। ওদের বাড়িও আসতে পারে নি হেম, কাকে দিয়ে যেন খবর দিয়েছে। গোবিন্দ আপিস থেকে ফেরার পথে বলে গেল।

তখন উমা ছিলেন না। ফিরে এসে স্বামীর মুখে শুনলেন সব। আগে বলেন নি শরৎ, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বললেন।

উমা শুনে চুপ ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'যা শুনছি তাতে তো আশা-ভরসা বিশেষ আছে বলে মনে হচ্ছে না। যদি বা অন্য লোকের ক্ষেত্রে বাঁচত, ছোড়দির যা বরাত—।...ঐ মেয়েটাও না আবার ঘাড়ে চাপে! ...কেউ তো নেই শুনেছি জামাইয়ের তিন কুলে, আর কে-ই বা দেখবে?...যদি অমনি অনড় হয়ে পড়ে থাকে, সে তো আরও বিপদ। তখন ওকে সুদ্দু টেনে এনে তুলতে হবে। যা পিশাচ শ্বশুর প্রথম পক্ষের—সে ঘেঁষ নেবে না।...তাই তো!'

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, 'আহা, বড্ড ভালমানুষ মেয়েটা, সাত চড়ে রা করে না। ওর কপালেই কি যত দুর্ভোগ!...একে তো ঘাড়ে একটা সতীন চাপল, আগেকার কালে ওটা গা-সওয়া ছিল, এখন তো সতীন নিয়ে ঘর করা শোনাই যায় না, ওর কপালে তাও হ'ল। তার ওপর—'

তার ওপর কি সেটা আর বলতে পারেন না উমা, মধ্যপথেই থেমে যান। কন্যা-স্থানীয়া সম্বন্ধে সে দারুন সম্ভাবনার কথাটা মুখে উচ্চারণ করতে পারেন না।

শরৎ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ও'র মুখের দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করেন, 'যাবো নাকি?'

'না, না। আর না।'

প্রবলবেগে মাথা নাড়েন উমা। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ লাল হয়ে ওঠেন। সে অকারণ লজ্জা ঢাকতেই বোধহয় মুখটা ফিরিয়ে বসেন একটু।

আগের সে উজ্জ্বল কান্তি আর নেই, রোদে রোদে ঘুরে মুখখানা তো রীতিমতো তামাটে হয়ে উঠেছে. তবু সে বর্ণান্তর টের পান শরৎ। এ লজ্জার কারণটাও মনে পড়ে যায় তাঁর। তিনিও মাথাটা নামান একটু।

অনেকদিনের কথা হ'ল। তবু মনে আছে। স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছেন যেন।

হরিনাথের অসুখের খবর পেয়ে উমা পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলেন। ঐন্দ্রিলা তাঁর কাছেই মানুষ বলতে গেলে. তাই তার আসন্ন বৈধব্যের সম্ভাবনায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। অন্য কোন লোক না পেয়ে শরতের প্রেসে ছুটে এসেছিলেন সঙ্গে যাবার জন্যে। তখন কোন সম্পর্কই ছিল না, যেটুকু ছিল সেটুকু অভিমানেরই. তার আগে কোন দিন নিজে থেকে এসে কিছু চান নি উমা, বোধহয় সুদূর কল্পনা--তেও ভাবতে পারেন নি যে কোনদিন কোন সাহায্য চাইতে হবে এই স্বামীর কাছে —যে স্বামী একদিনও গ্রহণ করেন নি তাঁকে, যে স্বামী পরের প্রেমে উন্মত্ত। তবু এসেছিলেন, প্রেস কোন্ দিকে তা ধারণা ছিল না—গোবিন্দ এসে দেখিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে স্বামীকে ডেকে বাইরে এনে মিনতি করেছিলেন—কোনমতে একটু সঙ্গে যাবার কি সুবিধা হবে? হরিনাথ মরণাপন্ন. ঐন্দ্রিলা একা অসহায়—তিনি এখনই একবার ওদের দেখতে যেতে চান।

খুবই বিব্রত বোধ করেছিলেন শরৎ। অনুরোধটা অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক বলেই শুধু নয়, বিব্রত হবার আরও কারণ ছিল। তাঁর রক্ষিতা গোলাপীর কাছে তিনি আমরণ বিশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু সে তাঁকে সম্পূর্ণ পেয়েও নিশ্চিন্ত থাকতে পারত না, তার সংশয় কখনও যায় নি। সে টের পেলে কী পরিমাণ অশান্তি করবে তা তিনি জানতেন—আর ক'রেও ছিল তা—তবু সেদিন শরৎ তাঁর কর্তব্যই পালন করেছিলেন, এক মুহূর্তের বেশী ইতস্তত করেন নি।

সেদিনের কথা মনে আছে বৈকি। ট্রেনের পথটুকু একরকম, যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে যাওয়া যায়, স্টেশনে নেমে অপরিসর পাল্‌কীতে ঘেঁষাঘেঁষি বসে যাওয়া—অন্ধকার নির্জন পথ দিয়ে—সেই বয়সেও একটু মোহ, খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। তারপর সেখানে নেমেও, হরিনাথের মার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সন্দিগ্ধ প্রশ্নে দুজনেই যথেষ্ট অসুবিধায় পড়েছিলেন।

'আর না।' কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ করি সচেতন হয়ে উঠেছেন উমা। সেদিনের স্মৃতিটাই মনে পড়ে গেছে তাঁর।

তাই এ সুগভীর লজ্জা।...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লেন শরৎ।

উমাও বোধ করি সেই বিশেষ দিনটার স্মৃতিতেই ডুবে গিয়েছিলেন—শরতের নিঃশ্বাসের শব্দে সম্বিৎ ফিরল তাঁর। তিনিও একটা নিঃশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে বসলেন। বললেন, 'আমার দ্বারা আর ওসব খবরদারী করা সম্ভব নয়। আমার শরীরে আর বয় না। তার ওপর একটু উদ্বেগ দুশ্চিন্তা হ'লেই যেন মাথার মধ্যে কেমন করে—শরীর আরও দুর্বল বোধ হয়।...আর কেনই বা, ভগবান যখন দিলেনই না—তখন পরের ঝঞ্ঝাট বইতে যাই কেন শুধু শুধু।'......

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন উমাও।

কিন্তু শোওয়া আর ঘুমনো এক কথা নয়। উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলতে চাইলেই তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। উমাও পেলেন না। বহুরাত্রি পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করলেন, মধ্যে একবার উঠে গিয়ে মাথায় জল দিয়েও এলেন, তবু তাঁর চোখে তন্দ্রা নামল না।

দুটো বিছানার মধ্যে ব্যবধান সামান্যই। একজন জেগে থাকলে আর একজনের সেটা অগোচর থাকা কঠিন। শরতেরও তা অজানা রইল না।

তার কারণ তিনিও জেগেই ছিলেন। ইদানীং হাঁপানীটা কম ছিল, রাত্রে ঘুমও হচ্ছিল কদিন। তাঁর অনেক সাধনার ঘুম বলেই উমারও সতর্কতার অন্ত ছিল না। পাছে তাঁর ঘুম ভেঙে যায় বলে অতি সন্তর্পণে পাশ ফিরছিলেন—যতটা সম্ভব নিঃশব্দে বাইরে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু সেদিন শরৎ ঘুমোন নি। বহু রাত্রিই অনিদ্রায় কাটাতে হয় বলে স্থির হয়ে থাকাটা অভ্যেস হয়ে গেছে। স্থির হয়েই শুয়েছিলেন বলে উমা তাঁর জেগে থাকাটা টের পান নি। নইলে তন্দ্রা নামে নি তাঁর চোখের পাতাতেও।

তিনিও ভাবছেন আকাশ-পাতাল। ভাবছেন উমার কথাই।

অনেকদিন ধরেই ভাবছেন।

উমা মিছে বলেন নি, কথার কথা নয়। সত্যিই উমা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। শরৎ কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছেন সেটা। সুগভীর ক্লান্তি ফুটে উঠেছে মুখেচোখে।

হয়ত সবটাই তার কায়িক দুর্বলতা নয়—দীর্ঘদিন ধরে একঘেয়ে পরিশ্রমে হয়ত মানসিক অবসাদও এসেছে একটা। কিন্তু সেটাও তো কম কথা নয়; মানসিক ক্লান্তি যখন মুখের ভাবে চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে, তখন সেটা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন বুঝতে হবে।

আর শারীরিক ক্লান্তিরই বা অপরাধ কি। হ'লও তো বহুদিন—প্রায় ত্রিশ বৎসর হতে চলল। এই একই কর্মসূচী। বেলা বারোটা না বাজতে বাজতে বেরিয়ে যাওয়া—রাত আটটা নটায় বাড়ি ফেরা। এক টাকা দু'টাকা—বড় জোর চার টাকার টিউশ্যনী, বহু বাড়িতে অনেক মেয়েকে না পড়ালে একজনের খরচ চলে না। টাকা যা-ই দিক, সকলেই ঘড়ি মিলিয়ে নেয়। দেড় ঘণ্টার আগে উঠলে মুখ ভার হয় মেয়ের মায়েদের। এখন ইংরেজী পড়ার রেওয়াজ হয়েছে, পাড়ায় পাড়ায় মেয়ে-ইস্কুল, সেখানকার মাস্টারনীরাও টিউশ্যনী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। প্রতিযোগিতা খুব বেশী। উমার মতো শুধু ফার্স্ট বুক পড়া শিক্ষয়িত্রীর টিউশ্যনী জোটাও আজকাল কঠিন।। সেজন্যে ভয়ে ভয়েই থাকেন উমা।...এসব কোনদিন খুলে না বললেও কথায় বার্তায় বেরিয়ে আসে। কতকটা শুনলে বাকীটা অনুমান করে নেওয়া চলে।

শুধু অবিশ্রাম বকাই নয়—হাঁটতেও হয় অনেক। শ্যামবাজার, আহিরীটোলা, বিডন স্ট্রীট,—এক এক জায়গায় এক একজন। পুরনো বাড়ি খুব বেশী নেই। বছর দুই পড়লেই ও'র বিদ্যা শেষ হয়ে যায়—শুধু প্রাথমিক পাঠ ছাড়া ও'কে দিয়ে পড়াবে কে? যে বাড়িতে অনেকগুলি বোন পর পর সাজানো থাকে, সে বাড়িতেই টিকে থাকেন উমাও। কিন্তু সে রকম বাড়ি এখন একটিই আছে বিডন স্ট্রীটে। ইদানীং —অনেক মেয়ে হাতছাড়া হওয়ায়, জানাশুনোর মধ্যে ভাল কাজ না পেয়ে উমা ভদ্র গৃহস্থ বাড়ি থেকে একটু নামতেও বাধ্য হয়েছেন। খারাপ পাড়ায় না, ভদ্র পাড়ায় ভদ্রলোকের মতোই বাস করে, অথচ পরিচয়টা গোলমেলে বিবাহিত দম্পতি নয়—

জেনে শুনেই এমন বাড়িতে পড়ানো ধরতে হয়েছে তাঁকে। এরা মাইনে ভাল দেয়, টাকা ছাড়াও অন্য জিনিস দেয়—যত্ন করে সম্মান করে—তবু, উমার অপমান বোধ হয় বৈকি। প্রথম যেদিন এইরকম বাড়িতে কাজ নিতে হয়েছে—বেশীদিনের কথা নয়—শরৎ আসার পরের কথাই—সেদিন বাড়ি ফিরে অবসন্নভাবে বসে পড়াটা শরৎ কোন দিনই ভুলবেন না। কী সুগভীর লজ্জা আর অবসাদই না ফুটে উঠেছিল মুখে—মনে হচ্ছিল বোতল ভরা কালি কে ঢেলে দিয়েছে।

গোপন করেন নি—সবই বলেছিলেন উমা। গত তিন চার মাস ধরেই আয় কম হচ্ছে—কিছুতেই কোন ভদ্রবাড়িতে আর কাজ যোগাড় করতে না পেরেই এ কাজ নিতে হয়েছে তাঁকে। বাজারে দেনা হয়ে গেছে—মুদির দোকানে, এমন কি সবজি বাজারেও বাকী পড়েছে—আর অপেক্ষা করবার সাহস নেই তাঁর।

সেইদিনই কথাটা বলেছিলেন শরৎ। অনেক ইতস্তত ক'রে কোন মতে বলে ফেলেছিলেন।

বহুদিন ধরেই ভাবছিলেন—কিন্তু সাহস হয় নি। সেদিন বোধ করি উমার ঐ প্রায়-ভেঙ্গে-পড়া মূর্তি দেখেই মরীয়া হয়ে পড়েছিলেন।

গোলাপী মরার পর যখন নিজের স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়ল তখন প্রেস লীজ দিয়েছিলেন। সেই লীজই আছে এখনও, সব মাসে টাকা আদায়ও হয় না। তিন-চারদিন ঘুরে বকাঝকা করে আদায় করতে হয়। যে মাসে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন সে মাসে আদৌ কিছু পাওয়া যায় না। তবে সে-ই সব নয়, তাঁর হাতেও কিছু আছে। যত কমই হোক, কষ্ট ক'রে চলে যায়। আর কদিনই বা বাঁচবেন তাঁরা!

সেই কথাই বলেছিলেন, 'কিন্তু কেন এত কষ্ট করছই বা তুমি—আমার যা আছে তাতে কোনমতে শাকভাত আমাদের দুজনের চলেই যাবে। কিছু ছিল হাতে, এই কবছরে কিছু জমেওছে, তুমি তো আমার খোরাকীর বেশী এক পয়সাও নাও না—যা নাও তাতে আমার খোরাকীও বোধহয় চলে না পুরো—কাজেই আর যত কমই হোক, কিছু কিছু তো জমেছেই।...আর না হয় ছাপাখানাটা বেচে হাতে নগদ টাকা নিয়ে চলো কোন তীর্থস্থানে চলে যাই। কাশীতে শুনেছি খুব সস্তা-গণ্ডা—বহু বুড়ী মাসে দু'টাকা তিন টাকা আয়ে চালায় সেখানে—কাশীতে গিয়েও থাকতে পারি। কদিনই বা আর বাঁচব আমরা, যা আছে দুটো পেট চলেই যাবে!'

'না!'

কথাটার গতি কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রথম থেকেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন উমা—প্রতিবাদ করার জন্য কথার ফাঁক খুঁজছিলেন শুধু—এবার একেবারে যেন ফেটে পড়লেন।

'না। এ যত দুঃখই পাই না কেন, যত নীচু দোরেই ঢুকতে হোক না কেন—এতে আমার লজ্জার কোন কারণ নেই। নিজের কাছে নিজের মাথা উঁচু আছে। তোমার ভাতের চেয়ে এ ঢের ভাল। এতকাল যদি তোমার ভাত না খেয়ে কেটে থাকে তো বাকী কটা দিনও কাটবে।...মা সতীরাণীর কাছে এই প্রার্থনাই করি অহরহ—অনেক দুঃখ অনেক অপমান জীবনে দিয়েছ—এই অপমানটা আর দিও না; তোমার ভাত যেন না খেতে হয়। তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয় অন্তত!'

বলতে বলতে যেন হাঁপাতে থাকেন উমা। উত্তেজনায় মুখচোখ আরক্ত হয়ে ওঠে তাঁর।

এর উত্তর দেবার শক্তি নেই শরতের, এরপর আর কথা বলার সাহস নেই।

তিনি মাথা হেঁট ক'রে বসে রইলেন।

এ উমার আর এক মূর্তি। আর কোন কারণে কোন প্রসঙ্গেই এত উত্তেজিত হন না উমা। এত কঠিন কথাও অন্য সময় তার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

ব্যথা পান শরৎ, ব্যথা পান এই দুর্বাক্যের জন্য নয়, ভর্ৎসনার জন্যও নয়—ব্যথা পান উমার জন্যই।

প্রথম জীবনে যেন অন্ধ হয়েই ছিলেন। অত্যন্ত স্বার্থপর ও আত্মসর্বস্ব মায়ের কাছে মানুষ হয়েছিলেন বলে বাপের কাছ থেকে পাওয়া স্বাভাবিক ভদ্রতা নিয়ে জন্মেও অপর মানুষের দিকটা ঠিক দেখতে শেখেন নি। ও'র বাবার অকালমৃত্যু হয়েছিল—কিন্তু তাকে আত্মহত্যা বলাই উচিত। প্রবল জ্বরের ওপরও বারবার স্নান করে নিমোনিয়া ডেকে এনেছিলেন তিনি—আজ শরৎ বুঝতে পারেন—সে ঐ স্ত্রীর জন্যেই।

শরতের বহু গুণ ছিল কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীকে গ্রহণ না করলে তার জীবনে কী হ'তে পারে, সে-কথাটা ভাববার মতো মানসিক গঠনই তাঁর ছিল না। লেখাপড়া শেখেন নি, ভদ্রসমাজে মেশেন নি—তাই কোন কথা গুছিয়ে ভাবতেও পারতেন না সেদিন।

প্রথম যৌবনের সুতীব্র আবেগে গোলাপীকে ভালবেসেছিলেন—তার কাছে শপথ করেছিলেন যে, সে জীবিত থাকতে অন্য স্ত্রীলোককে কামভাবে স্পর্শ করবেন না। মার কথায় তিনি বিবাহে সম্মত হয়েছেন শুনেই সে শপথ করিয়ে নিয়েছিল—অন্যথায় আত্মহত্যা করবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। পতিতার কাছে করা শপথ রাখতেই তিনি উন্মুখযৌবনা বিকশিত পদ্মের মতো স্ত্রীকে গ্রহণ করেন নি সেদিন। আজ সে-কথা মনে হ'লে হাসি পায়। দুঃখের হাসি। সে শপথ এমনভাবে রক্ষা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আজ বুঝতে শিখেছেন যে, এ-শপথ রক্ষা করতে গিয়ে বৃহত্তর শপথ ভঙ্গ করেছেন তিনি—অগ্নি ও নারায়ণের কাছে করা শপথ!

আশ্চর্য। এসব দিকে চোখ খুলে দিয়েছে কিন্তু সে-ই। সে-ই বলতে গেলে ওকে মানুষ করেছে। গোলাপী ছোট জাতের মেয়ে, তায় অতি নীচু ঘরের পতিতা কিন্তু অসামান্য রূপলাবণ্যের আকর্ষণে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাঁর ঘরে এসেছেন। শরতের সংস্পর্শে আসার আগে তো বটেই, পরেও। শরৎকে জেনে-শুনেই সে প্রস্তাবে রাজী হ'তে হয়েছে—সময়ে সময়ে তার জন্য ঈর্ষার জ্বালাও ভোগ করতে হয়েছে কিছু কিছু। তার কারণ ঈশ্বর-দত্ত রূপ ছাড়া তাঁর আর কিছুই ছিল না, এক পয়সাও দেবার সঙ্গতি ছিল না তাঁর। বরং গোলাপীই তাঁকে দিয়েছে ঢের। ছাপাখানা করেছিলেন, সে-ও তারই পয়সায়। অর্থাৎ গোলাপী তাঁর রক্ষিতা ছিল বলা ভুল—তিনিই তার রক্ষিত ছিলেন।

হয়ত সেই জন্যেই গোলাপীর কথাবার্তা আচার-আচরণ ভদ্রঘরের মেয়ের মতোই ছিল। তার সংস্পর্শে এসেই শরৎ অনেক ভদ্র হয়েছিলেন। অবশ্য ব্যবসার কল্যাণেও বহু ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে—জেনেছেন-শিখেছেন ঢের। নইলে তাঁর বাল্যের পরিবেশ ও শিক্ষাদীক্ষা ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেবার মতো নয়।

ভুল বুঝতে পেরেও তা সংশোধনের চেষ্টা করেন নি কেন? শুধুই কি গোলাপীর প্রতি প্রেম, কৃতজ্ঞতা, সেই ছেলেমানুষী শপথের ভয়—নাকি আরও ছেলেমানুষী সংকোচ একটা, বৃথা চক্ষুলজ্জা? কে জানে—আজও ঠিক মনের এ-খবরটা পান নি শরৎ—আজও প্রশ্নের কোন উত্তর নিশ্চিত ক'রে দিতে পারেন না।

কে জানে—যখন সামান্য একটু পরিচয় হয়েছিল ও'দের—যখন কিছুটা কাছাকাছি এসেছিলেন, তখন এ পক্ষ থেকে যদি একটু জোর দেওয়া হ'ত—এদিক থেকে

যদি সঙ্কোচ ভাঙবার চেষ্টা করা হ'ত, তাহলে কী করতেন উনি। আজ ঠিক করে বলা শক্ত! কে জানে তখনও শপথের ভয় থাকত কি না।

কিন্তু সে কিছুই হয়ে ওঠে নি। কিছুই করা হয় নি। শুধু দুহাতে এই জীবনটা উড়িয়ে দিয়েছেন, নষ্ট করেছেন। নিজেরই শুধু নয়—এঁরও। দুটি দুর্লভ জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আজ তার জন্য অনুতাপ হয় বৈকি। আজ মনে হয় তিনিও ঠকেছেন। সে যতই ভালবাসুক, তার কাছ থেকে যতই পান—দাম্পত্য-সুখ সেখানে পান নি তিনি। এ আলাদা জিনিস। ঘর-সংসার করেছেন, সন্তানও হয়েছে—তবু গৃহ-সুখে বঞ্চিতই থেকে গেছেন চিরকাল। ছোট একটি নিজস্ব সংসারে সর্বময় কর্তা, একেশ্বর হয়ে থাকার যে তৃপ্তি, তা অনাস্বাদিতই রয়ে গেল এ-জীবনে। ভদ্রসমাজে সাধারণ গৃহস্থ হয়ে বাস করার মধ্যে যে সম্মান, তারও কি মূল্য কম?

না, অনেক কিছুই হারিয়েছেন তিনি। অনেকখানি। আজ মনে হয়, কোন-মতে যদি জীবনের এই কটা বছর ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করা যেত! অন্তত কিছুটা সময় যদি পিছিয়ে যাওয়া যেত—যখন স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি এতটা কঠিন হতে পারতেন না, সে-ক্ষমা পাওয়া যেত।

এখন এই স্ত্রীর সামান্য কিছু প্রয়োজনে লাগতে পারলেও ধন্য হয়ে যান তিনি, কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু আজ বুঝি কোথাও কোন পথ খোলা নেই তার।

স্ত্রীর প্রিয়-সাধনের জন্যেই তিনি খোকাকে এনে রেখেছেন, কান্তিকে সাহায্য করেন। কিন্তু সে আর কতটুকু?

বরং মনে হয় এখানে এসে এই চোখের সামনে থাকাটাই উমার পক্ষে আরও যন্ত্রণা-দায়ক মনে হচ্ছে। কোন দিন সামান্য কোন যত্ন করলে, কোন মিষ্টি কথা বললে, কি ওর কাজে কোন সাহায্য করতে গেলে উমার চোখে জল এসে যায় তা তিনি লক্ষ করে-ছেন বহুদিন। যেদিন ঐ কাজ ছেড়ে দেবার কথা তোলেন সেদিন শেষ রাত্রে ঘরের বাইরে উঠোনের দিক থেকে চাপা কান্নার আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল—খুবই সামান্য শব্দ—কিন্তু তাঁরও হাঁপানির টানের মধ্যে বসে বসে ঘুম—ভাঙতে দেরি হয় নি। অন্ধকারেই উঠে এসে দেখেছেন রকের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদ-ছেন উমা। মুখে কাপড় গোঁজা—তবু সে কান্নার শব্দ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নি, এমনই আকুল সে-কান্না।

এক একবার মনে হয় এর চেয়ে তিনি দূরে কোথাও চলে যাবেন—বহু দূর কোন দেশে—সেখানে তাঁর অদৃষ্টে যা হয় হবে, উমাকে তো মুক্তি দেওয়া যাবে। কিন্তু তা-ও পারেন না, বড় বেশী মায়া পড়ে গেছে। লোভও হয়—যদি কোনদিন কোন কাজে লাগতে পারেন, যদি কোন একটি সামান্যতম বেদনার কাঁটাও তুলে দিতে পারেন ওর এই বিড়ম্বিত জীবন থেকে। সেই তো পরম লাভ। সে সম্ভাবনাটুকু নষ্ট করতে মন চায় না।

॥ ৪ ॥

গলির ওপাশে ঘোষেদের বাড়ির সাদা দেওয়ালটায় ভোরের আভাস লাগামাত্র উমা উঠে পড়লেন। এমনিই ওঠেন তিনি প্রত্যহ। কোন কোন দিন আরও আগে ওঠে। বেশ খানিকটা রাত থাকতেই উঠতেন এতকাল কিন্তু তাতে আলো জেবলে ঘরের কাজ সারতে হয়। শরৎ আসার পর সে-ব্যবস্থায় একটু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। দেশ-

লাই জ্বালার আওয়াজে ও'র ঘুম ভেঙ্গে যায়, চোখে আলোটাও লাগে। শরতের যেদিন হাঁপানির টান ওঠে, সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকেন, ভোরের দিকেই যা একটু তন্দ্রা আসে। সেটুকু ভাঙ্গাতে মায়া হয় উমার। আর সেই জন্যই—একটু অন্তত আবছা আলো আসার অপেক্ষা করতে হয়।

তা নইলে রাত থাকতে ওঠাই সুবিধা তাঁর। গঙ্গাস্নানের অভ্যাস করেছেন মার মতো। তাতে নাকি মাথা ঠান্ডা হয়, শরীরটাও ভাল থাকে। আসলে, শরতের বিশ্বাস, মার মতোই নিরিবিলিতে চোখের জল ফেলে মনটা হাল্‌কা করতে যান ওখানে—গঙ্গাজলে চোখের জলে একাকার হয়ে যায়, সে-কান্না কেউ টের পায় না।

গঙ্গাস্নানের জন্যই এত ভোরে উঠতে হয় তাঁকে। আরও ভোরে উঠলেই ভাল হয়, ফরসা হলে ভিড় বেড়ে যায়, সে বড় অসুবিধা। পাঁচটা মেয়ে এক জায়গায় হলেই পাঁচটা বাজে প্রসঙ্গ—ও আর উমার ভাল লাগে না। অথচ এক ঘাটে যাঁরা প্রত্যহ স্নান করতে আসেন, তাঁদের সঙ্গে একটু মুখচেনা গোছেরও পরিচয় হয়ে যায়—তাঁরা কথা কইলে মুখ ফিরিয়ে চলে আসা যায় না, দুটো কথা ওঁকেও বলতে হয়। এইটেই এড়াতে চান উমা। অথচ এখানেও কিছু কাজ থাকে—বিছানা ঠিক করা, দুটো ঘর বাইরের রকটুকু মোছা, নিজের প্রাতঃকৃত্য সারা—খুব কম করেও এক-ঘণ্টার ধাক্কা। একটু রাত থাকতে না উঠলে সবদিক সামলাতে পারেন না।

ঘুম ভাঙ্গলে বিছানাতেই উঠে বসে বালিশ ঠিক করতে করতে (রাসমণির শিক্ষা এটা, ওয়াড় টেনে চোস্ত করে বালিশ ফুলিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে, যাতে রাত্রে মাথায় দেবার চিহ্ন না থাকে) একদফা ঠাকুরদের নাম করেন উমা। তাঁর মা-ও করতেন, শুনে শুনে শেখা। সাধারণত অনুচ্চকণ্ঠেই করেন—এ-ও মার শিক্ষা, তোমার ঘুম ভেঙ্গেছে বলেই অপরের ঘুম ভাঙ্গাতে হবে এমন কোন আইন নেই—ইদানীং আরও সাবধান হয়েছেন, পাছে শরতের বিশ্রামে ব্যাঘাত হয়। একরকম মনে মনেই বলেন।

আজও উঠে ঠাকুরদের নাম সেরে বিছানা থেকে নামতে যাবেন, হঠাৎ শরতের বিছানার দিকে চোখ পড়ে গেল। মনে হ'ল শরৎ তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। শরৎ জানলার দিকটায় শোন্, যেটুকু আলো ঐদিক থেকেই আসে। তাই আলো-আঁধারিতে স্পষ্ট কিছু বোঝা আগেই উঠেছেন। নেমে কাছে এসে দেখলেন সত্যিই চেয়ে আছেন শরৎ, চোখে ঘুমের লেশ মাত্র নেই, সম্ভবত অনেক আগেই উঠেছেন।

'ওমা তুমি জেগে আছ! আমি বলি ঘুমোচ্ছ। পাছে ঘুম ভেঙ্গে যায় বলে—'

শরৎ তেমনি স্থির দৃষ্টিতে ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ আর গঙ্গাচানে না-ই বা গেলে। সারা রাত তো ঘুমোও নি—এখন একটু ভোরাই হাওয়ায় ঘুমিয়ে নাও না!

'সারারাত যার ঘুম হয় নি—এখন এই সকালের আলোয় শুলে তার ঘুম হবে? তোমার কি বুদ্ধি!... কিন্তু তুমি জানলে কি ক'রে আমার ঘুম হয় নি? তুমিও কি জেগে ছিলে? কৈ, আমি তো টের পাই নি।'

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চান উমা।

'তুমি ঘুমোও নি কেন? শরীর খারাপ করেছে?'

কাছে এসে কপালে হাত দেন।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ও'র হাতখানা ধরে ফেলেন শরৎ। খুব কোমলকণ্ঠে বলেন, 'আমার কিছু হয় নি, বেশ আছি। কিন্তু তোমার শরীর সত্যিই খারাপ হয়েছে। আজ আর বেরিও না, ঘুম না হয়, এমনিই একটু বিশ্রাম কর।'

'হ্যাঁ, শুয়ে থাকলেই আমার চতুর্বর্গ হবে! ছাড় ছাড়, অসুমর কাজ পড়ে—এমনিই বেলা হয়ে গেছে। গঙ্গায় গিয়ে সেই মাগীর দঙ্গলে পড়তে হবে।'

তবু হাতটা ছাড়েন না শরৎ। বলেন, 'একদিন গঙ্গায় না গেলে কি হয়?'

'তা কিছু হয় না। এই তো কতদিন যাই না। তবে সারারাত না ঘুমিয়ে আজ এখন মাথা আগুন হয়ে আছে, গঙ্গায় না গেলে ভীষণ মাথা ধরবে, কোন কাজ করতে প্যারব না।'

আর বাধা দিলেন না শরৎ। একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে হাতখানা ছেড়ে দিলেন। বাধা দেবার কোন অধিকারই রাখেন নি তিনি। এ হাত ধরারও কোন যোগ্যতা। এটুকু সময়ও যে সহ্য করেছে, কটু কথা বলে নি এই ঢের।...

বালতি-ন্যাতা এনে ঘর মুছতে মুছতে ঈষৎ অপ্রতিভভাবে হেসে উমাই আবার কথাটা তুললেন।

'আমি ভাবছি আজ পড়িয়ে আসবার সময় খোকাটাকে নিয়ে আসব। কাল তো বড় বৌমার আসবার কথা গেছে—আর না এলেও, একটা দিন বড়দি বেশ চালিয়ে নিতে পারবে।'

খোকা এক মাসেরও ওপর কমলার বাড়ি আছে। গোবিন্দর বৌ বাপের বাড়ি, ছেলেমেয়েসুদ্ধ নিয়ে গেছে সে—কমলা টিকতে না পেরে খোকাকে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন। নাতি-নাতনি হবার পর আজকাল আর একা থাকতে পারেন না তিনি। গোবিন্দ কোনদিনই রাত ন'টার আগে আসে না, এক-একদিন আরও দেরি করে—কমলার বড় কষ্ট হয় অত রাত অবধি একা একা বসে থাকতে।

'একটা দিন আমিও চালিয়ে নিতে পারব—তার জন্যে নয়। কিন্তু একদিনের অত চিন্তা কেন? তরুর ওখানে যেতে হবে বুঝি?'

সলজ্জ হেসে উমা বলেন, 'হ্যাঁ—ভাবছিলুম কাল রবিবার আছে, পড়ানো নেই, একটু ঘুরেই আসি।'

'তা খোকাকে আনবার কী দরকার—আমার জন্যে? না সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

'না, তোমারই জন্যে। আজকাল ও তো সব পারে, তোমার অনেক সুসার হবে।'

'আমার জন্যে অত কাণ্ড করবার দরকার নেই। আমি বেশ থাকব। তুমিই বরং নিয়ে যাও—একলা গিয়ে পথঘাট খুঁজে পাবে না—আতান্তরে পড়বে।'

'না, না। সে আমি একরকম ক'রে খুঁজে নেব এখন। তোমার কাছেই একজন থাকা দরকার। সারাদিনের ফের, কখন ফিরব—মানে ফিরতে পারব তারও তো ঠিক নেই। তুমি অসুস্থ মানুষ—কখন শরীর খারাপ হয়ে পড়বে কি হবে, হাঁপ শুরু হ'লে তো নড়তে পারো না। খোকা থাকলে এদিকে তোমার ফাই-ফরমাশ খাটা কি বুকে একটু মালিশ করা—এগুলো তো পারবে, উনুন জেবলে চা-টাগুলোও ক'রে দিতে পারবে।'

'এখন ভালই আছি, সে সব কিছু হবে না। সে যেদিন শুরু হবে আগে থাকতেই টের পাই।...এই তো কদিন একা রয়েছি, তুমি তো রাত আটটার আগে ফেরো না। তা যদি পারি তো আরও না হয় দুটো ঘণ্টা পারব 'খন থাকতে। তা অত-শতরই বা দরকার কি, চল না আমিও যাই তোমার সঙ্গে—'

'তুমি যাবে? যেতে পারবে অতটা? ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা হাঁটতে হয় শুনেছি—'

মুখচোখ যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে উমার।

'তা পারব না কেন? এখন তো শুনেছি গাড়ি হয়েছে। স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি

দাঁড়িয়ে থাকে।'

'হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে, খোকা বলছিল। তা তাই চল তাহ'লে। সেই বেশ হবে। তাহ'লে আর কোন পেছ্‌টান থাকে না। তোমাকে রেখে গেলে ঐ একটা দুর্ভাবনা থাকবে—'

কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ গাঢ়স্বরে শরৎ বললেন, 'তুমি আমার জন্যে এত ভাব—? সত্যি? এইটে শুনলে মনে বড় বল পাই। আমার তো কোন জোরই নেই—এই কথা শুনলে তবু মনে হয়—আমি যত অপরাধই ক'রে থাকি না কেন তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে দেখবে, তাড়িয়ে দেবে না। আজকাল বড় ভাবনা হয় জান—যতদিন একা ছিলুম সে একরকম সয়ে গিয়েছিল, এখন মনে হয়, তুমি ছেড়ে দিলে আমার একদিনও চলবে না। আর অমন ক'রে থাকতে পারব না আমি—একা একা ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে হয়ে—'

'আজ আবার সকাল থেকে কী আদিখ্যেতা শুরু হ'ল তোমার!' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন উমা। কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রূঢ়তা আনবার চেষ্টা সত্ত্বেও—আশা ও আশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্য করেন শরৎ—মনের আবেগটা ধরা পড়ে যায়। তাতেই একটু বেশী রূঢ় শোনায় যেন। তারপর যখন কথা বলেন তখন আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় সেটা।—'তোমাকে ছেড়ে দিতে আর পারলুম কৈ? তাহ'লে আর যেচে ঘরে নিয়ে আসব কেন? এখন একবার যখন বোঝা ঘাড়ে নিয়েছি তখন আর নামাব কি ক'রে? কার ঘাড়ে চাপাব আর? এক—'

'হ্যাঁ', শরৎ তাড়াতাড়ি ও'রই কথার সূত্র ধরে যেন বলেন, 'সেইদিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রো—দোহাই তোমার! একেবারে যমের ঘাড়ে চাপিয়ে দিও, তাহ'লেই তোমার ছুটি। সেইটুকুই আমি চাইছি!'

'ও আবার কি কথা! বলে এত দুঃখ দিয়েও আশ মিটল না বুঝি? দেবার মধ্যে দিয়েছ তো এই লোহা আর সিঁদুরটুকু—সেটাও সইছে না?......ও আশীর্বাদে আর কাজ নেই।'

'কিন্তু তুমি গেলে আমার কি গতি হবে?...এই তো—একবেলা কে দেখবে সেই ভাবনায় অস্থির হচ্ছ—তখন কে দেখবে?'

অনেকক্ষণ উমা কোন উত্তর দেন না, নীরবে বাকী ঘরটুকু মুছে নেন। তারপর মুখ টিপে হেসে বলেন, 'তা যম এলে তাকে কি বলব শিখিয়ে দিও।...কখনও তো আমার হয়ে কাউকে কিছু বললে না—পারো তো তাকে বলে ব্যবস্থা ক'রো—যাতে দুজনেই এক সঙ্গে যেতে পারি।...না কি, সেখানে তো আবার আর একজন বসে আছেন! আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আবার ফ্যাসাদে পড়বে না তো?'

শরৎ প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে গাঢ় কণ্ঠে বলেন, 'না না, আর কেউ নেই। সে যা ঋণ ছিল তার কাছে এ জন্মেই শোধ হয়ে গেছে, পরকালে আর কোন দাবী তার নেই। আর যদিই বা বসে থাকে, দাবী করে—তোমার হক্ তুমি ছাড়বে কেন? তোমার তো জোরের জিনিস—এবার জোর ক'রেই তোমার পাওনা আদায় করবে, এমন ভাল মানুষের মতো ছেড়ে দিও না—'

'তবু ভাল!' বলে উমা আর একটু হেসে বাল্‌তি হাতে কলতলায় চলে যান।

খেয়ে দেয়ে পান মুখে দিয়ে বেরোবার সময় হাসিহাসি মুখে এসে দাঁড়ান উমা।

'দ্যাখো গো, গোটা-দুই টাকা হবে তোমার কাছে?'

'তা হবে।...হঠাৎ টাকা চাইলে যে?'

'মাসের শেষ, হাতে যে কিছু নেই। ধারই চাইতুম, তা তুমি মেসো সঙ্গে যাচ্ছ —তোমারও তো কিছু কর্তব্য আছে। একটু লেবুটেবু কিনে নেবো আর কি।'...

'তা সে আজ কি—?' শরৎ টাকা দুটো বালিশের তলা থেকে বার ক'রে দিতে দিতে প্রশ্ন করেন, 'যাবে তো কাল?'

'আজই এনে রাখব মনে করছি। কাল ভাবছি রাত থাকতে উঠে যা হয় দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে খেয়ে নটা দশটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। নইলে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আর না খেয়ে গেলে সে বড় পীড়ন করা হয়—তার যা অবস্থা শুনছি—মেয়েটা তো জ্যান্তে মরা হয়ে রয়েছে—সেখানে না খেয়ে গিয়ে হাজির হওয়া—সে বড় লজ্জা করে!'

'না না—খেয়েই যাব। তা দু'টাকাতেই হবে?'

'ঢের ঢের। বইবে কে অত?......তাছাড়া খরচাও তো হবে ঢের।......ট্রেন-ভাড়া আছে, গাড়ি-ভাড়া আছে—একগাদা খরচা। তোমার তো আর কুবেরের ভান্ডার নয় —ধর যদি কাল আমি মরেই যাই—তখন তো মাইনে ক'রে লোক রাখতে হবে, এমন আপ-খোরাকী বিনে-মাইনের ঝি আর মিলবে না তো!'

'আবার ঐ কথা? বললুম না যে তোমাকে আমি ছাড়ব না?'

'আচ্ছা আচ্ছা—ধরেই রেখো। যতদিন পারো খাটিয়ে নিও—আর কি! তবে যমরাজের সঙ্গে ব্যবস্থাটা ক'রে নিও কিন্তু—'

টাকা দুটো আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে যান উমা।...

খবরটা পেলেন পাড়ার দু-তিনটি ছেলের মুখে। বাড়িওলাদের একটি ছেলেও ছিল তাদের মধ্যে। ছুটতে ছুটতে এসেছে তারা। বোধ হয় ঊর্ধ্বশ্বাসেই ছুটে এসেছে।

উমার আসবার সময় হয়েছে আন্দাজ ক'রেই—তাঁকে একটু চমক লাগাবার জন্যে —শরৎ তখন গুলের উনুনটায় আঁচ দিয়ে সাগু চাপিয়ে দিয়েছেন। উমা বারোমাসই রাত্রে দুধসাগু খান। একা থাকার সময় ঐ অভ্যাস করেছেন—এখন আর কিছু সহ্য হয় না। আগে সকালেই ক'রে রেখে দিতেন, এখন ফিরে এসে এই উনুনটা জেবলে ক'রে নেন। শরৎ যেদিন ভাল থাকেন সেদিন রুটি কিংবা পরোটা খান দুখানা—সেও এই উনুনেই হয়। নইলে তিনিও সাগু খান। তার সঙ্গে হয় কোন সস্তা দামের মিষ্টি, কি দুটো নারকোল নাড়ু—কিংবা নিদেনপক্ষে বাতাসা। সকালের তরকারী একটু-আধটু রাখা থাকে, সেটাও গরম ক'রে নেওয়া হয় একবার। শরৎ রুটি না খেলে সাগুর সঙ্গেই খান দুজনে।

অন্যদিন উমা ফিরলে এই উনুনে আঁচ পড়ে। তিনিই এসে দেন। একটা কেরোসিনের পলতে দেওয়া পুরনো আমলের স্টোভ আছে, সেইটে জেবলে শরৎ শুধু একবার নিজের মতো চা ক'রে নেন বিকেলে। আজই হঠাৎ খেয়াল হয়েছে; কালকের ঐ সারারাত জাগার পর আজ তো অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটিই হয় নি, গঙ্গাস্নান বাজার, রান্না—তারপর সারাদিন হাঁটা আর বকুনি—সবই তো চলেছে। আসবে তো মড়ার মতো হয়ে। আবার এইসব করবে—তার চেয়ে তিনিই করে রাখবেন। ও'রও সুসার হবে খানিকটা, এসে একটু স্থির হয়ে বসতে পারবেন—বিশ্রাম পাবেন, আর শরতেরও একটু বাহাদুরী নেওয়া হবে, দেখিয়ে দেবেন উমাকে যে, তিনি যতটা অকর্মণ্য ভাবেন স্বামীকে ততটা অকর্মণ্য উনি নন।

ভেতরে উনুনের ধারেই বসে ছিলেন—ছেলেরা এসে দোর ঠেলে এক সঙ্গে 'মেসোমশাই' বলে ডাকতেই চমকে উঠেছেন শরৎ। উমা সকলেরই মাসীমা, সেই সুত্রে

তিনি মেসোমশাই ঠিকই—কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো ওদের বিশেষ আলাপই নেই বলতে গেলে। কথা-বার্তা বলে ওরা কদাচিৎ। উনি অধিকাংশেরই নামটাও জানেন না। ওরা কেন অমন ভাবে ডাকবে ও'কে—এত ছেলে এক সঙ্গে—?

তাড়াতাড়ি দোর খুলে বাইরে বেরিয়ে আরও চমকে উঠলেন। আগে যেটা ছিল শুধুই বিস্ময় সেটা এবার আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠল।

ওরা সবাই ও'কে দেখে অমন মাথা নামিয়ে দাঁড়াল কেন? কেউই যেন কিছু বলতে পারছে না—?

'কি—কী হয়েছে বিমু? ব্যাপার কী?' একমাত্র যে ছেলেটিকে চেনেন এদের মধ্যে, তাকেই জিজ্ঞাসা করেন। এক পা আরও এগিয়ে আসেন ওদের দিকে।

'তোমাদের মাসীমা—তাঁর কিছু হয় নি তো?'

এইবার ওরা মাথা তুলল। না বললেও নয় আর। কিন্তু বলাও কঠিন। বিমুর চোখ ছলছল করছে, রাস্তা থেকে আসা গ্যাসের আলোতেও তা লক্ষ্য করলেন শরৎ, চোখের কোণে কোণে চিক্ চিক্ করছে জলের আভাস।

'আপনি—আপনি একটু এই মোড়ে চলুন মেসোমশাই, এই বড় রাস্তার মোড়ে—। একটা—একটা য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে।'

'য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে? তা বেশ তো তা আমি যাব কেন? কি য়্যাক্‌সিডেণ্ট?'

ছেলেমানুষের মতোই প্রশ্ন করেন শরৎ। আর করতে করতেই বুঝতে পারেন যে, ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে খুব। কী হয়েছে, কার হয়েছে—য়্যাক্‌সিডেণ্ট তাও বুঝতে পারেন, তবু সেই বুঝতে পারাটাকেই যেন যতক্ষণ সম্ভব উপলব্ধি থেকে সরিয়ে রাখতে চান। যতক্ষণ না পরিষ্কার শুনছেন ততক্ষণই যেন বাঁচোয়া। যেটুকু সময় পান সেইটুকুই লাভ।

ওরা তাঁর আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে আবারও বলে, 'আপনি একটু চলুন মেসো-মশাই। আপনার যাওয়া দরকার।'

'দরকার? অ। তা চল। দরজাটা দিয়ে যাব—না খোলাই থাকবে?'

একেবারে বুঝি ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছেন শরৎ। কি বলছেন তা তিনি নিজেও বুঝতে পারছেন না বোধ হয়।

ভাবছেন, প্রাণপণে ভাবছেন সকালের কথাগুলো। সে ছেড়ে যাবে না কোথাও, যেতে পারে না। তাহ'লে তাঁকে দেখবে কে?

বাড়িওলাদের ছেলে বিমু আর একজনকে ইশারা করলে। সে ও'র একটা হাত ধরে মৃদু টান দিয়ে বলল, 'আসুন মেসোমশাই, আমি নিয়ে যাচ্ছি—'

বিমু বলল, 'আপনি চলুন, আমি মাকে বলে যাচ্ছি দরজা বন্ধ ক'রে দেবে—'

কেমন একরকম অসহায় ক্ষীণকণ্ঠে বললেন শরৎ, 'উনুনে সাবু চড়ানো ছিল মানে তোমার মাসীমা খাবেন—তা—'

কথা শেষ করতে পারেন না ; ছেলেটি টেনে নিয়ে যায়।

ও'দের গলি ছাড়িয়ে রামহরি ঘোষ লেন। তারপর বিডন স্ট্রীট। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা?

'কোথায়, কোথায় হ'ল য়্যাক্‌সিডেণ্টটা?'

'ঐ হে'দোর মোড়টায়—এই কাছেই। আর দূর নেই।'

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যান শরৎ। এতক্ষণের অভিভূত ভাবটা যেন কেটে যায়। সবল সুস্থ মানুষ হয়ে যান যেন অকস্মাৎ। অনেকটা সহজ কণ্ঠে বলেন, 'এখনও বেঁচে আছে তো? হ্যাঁ বাবারা—?'

'বোধহয় আছেন।' আস্তে আস্তে বলে বিমু। সে মাকে বলে ছুটে এসে ও'দের ধরে ফেলেছে।

আর কোন প্রশ্ন করেন না শরৎ। সহজভাবেই হে'টে যান। একটু জোরেই চলেন বরং।

দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে। ভিড় জমে গিয়েছে। বহুলোক ঘিরে রয়েছে কিছু একটা। ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে একটা। তার পিছু পিছু আরও অনেকগুলো ট্রাম। পুলিশও এসেছে—

হে'দোর ওদিক থেকে আসছিলেন উমা। হঠাৎ একটা মোটরগাড়ি এসে পড়ে উল্‌টো দিক থেকে—সেইটে বাঁচাতে গিয়ে ট্রামে ধাক্কা খেয়েছেন। হাতপা কেটে বেরিয়ে যায় নি কোনটা, থে'তলে গেছে বেশী। মাথাতেও নাকি চোট লেগেছে। রাস্তাতেই পড়ে আছেন, এখনও।

শরতের ভালো ক'রে দেখা হ'ল না। তাঁরও দুর্বল দেহ—মাথা ঘুরে উঠল, সেইখানেই তিনি বসে পড়লেন।

কে একজন যেন বলল, 'ওরই স্বামী।'

'তাই নাকি!' ফিস ফিস ক'রে বলল আর একজন, 'আহা আহা—তাই মাথা ঘুরে উঠেছে অমন ক'রে—। বুড়োমানুষ, দ্যাখো দিকি, এই বয়সে এ শক্‌! বেচারী।'

এই সবই যেন কত দূর থেকে ভেসে আসছে—এই গলার আওয়াজগুলো। যেন দূরে কোথাও কারা বলাবলি করছে!

কারা সব ও'কে হাত ধরে তুলে এনে একটা বাড়ির সদরে বসিয়ে দিল।

শুধু একটাই প্রশ্ন করলেন শরৎ, এতক্ষণ চেষ্টা ক'রে করতে পারলেন 'প্রাণটা —প্রাণটা আছে বলে কি মনে হ'ল? তাহ'লে একবার হাসপাতালে পাঠাবার চেষ্টা —মানে যদি বাঁচত এখনও—'

ভিড়ের মধ্যে থেকেই কে একজন বললে, 'বুকের কাছটা বোধহয় ধুকধুক করছে এখনও। প্রাণটা এখনও আছে বলেই মনে হচ্ছে। আপনি ভাববেন না কিছু— টেলিফোন করা হয়েছে—য়্যাম্বুলেন্স এতক্ষণে এসে যাবারই কথা। ঐ বোধহয় আসছেও—যা ভিড়—'

হঠাৎ শরতের মনে হ'ল—সাগুটা? নামিয়েছে তো ওরা? সবসুদ্ধ যদি পুড়ে যায় উমা এসে রাগারাগি করবে—

য়্যাম্বুলেন্সটা সত্যিই এগিয়ে এল। স্ট্রেচার নিয়ে কারা নামছে না?

একবার দেখে নিলে হ'ত। তখন তো ভাল করে চাওয়াই হ'ল না—সব যেন ঝাপসা একাকার হয়ে গেল। শুধু নজরে পড়েছিল চওড়া লাল শাড়ির পাড়টা, আর হাতের সাদা শাঁখাটা। সেও চকিতে, তারপর আর কিছু দেখতে পান নি।

কে একজন এসে একটা পুঁটুলি রেখে দিল ও'র পাশে।

'ওনার হাতেই বোধহয় ছিল পুঁটুলিটা। দেখুন তো...কী ছিল তা তো জানি না, খুলে ছড়িয়ে গিয়েছিল। যতটা পেরেছি কুড়িয়ে এনেছি—'

পুঁটুলির গেরোটা খোলে নি—এদিকটা বোধহয় রাস্তায় ঘষড়ে ছি'ড়ে গেছে। কাদা-মাখামাখি—তবু ঝাড়নটা ও'দের বলেই মনে হ'ল। নতুন ঝাড়নটা, মাত্র ক'দিন আগে এনেছেন উমা। কে এক ছাত্রীর মা দিয়েছে—ও'র ঝাড়নটা ছি'ড়ে গেছে দেখে। সেই ঝাড়নের এই অবস্থা দেখলে উমা হায়-হায় করবেন—

কতকটা যেন যন্ত্রচালিতের মতোই পুঁটুলি খুলে দেখলেন শরৎ, ছে'ড়ার দিকটাই খুলে দেখলেন। একটা গোল কাঠের বাক্স—আঙুর নিশ্চয়ই, গোটা দুই বেদানার মতোও মনে হচ্ছে, আরও সব কী রয়েছে। একটা খালি শালপাতার ঠোঙ্গা—

খালি কেন? ও—এই যে ক্ষীরের বরফি ছিল, ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে—এক-পয়সানে চিনি-কচকচে বরফি, যা পুজোয় দেয় সাধারণতঃ, শরৎ ভালবাসেন এগুলো খেতে। দুধসাগু কি পরোটার সঙ্গে খাবেন মনে করেই নিয়েছিল বোধহয়—

চুপ করে বসে রইলেন শরৎ। য়্যাম্বুলেন্সে তোলা হ'ল, একটু পরে তা চলেও গেল। পাহারাওলা ভিড় ঠেলে এসে ও'র নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলো। ভাগ্যে বিমু কাছে ছিল, সেই বলে দিলে। উনি হয়ত বলতে পারতেন না। নম্বরটা আজও জানেন না বাড়ির, কাউকে কোনদিন ঠিকানা দেবার তো দরকার হয় নি।

পাহারাওলা ঠিকানাটা নিয়ে বোধহয় য়্যাম্বুলেন্সকেই দিলে। কে জানে—য়্যাম্বুলেন্স চলে যেতেই ট্রাম ছেড়ে দিল। পর পর ট্রামগুলো চলল সার বেঁধে। এইবার ভিড়ও হাল্‌কা হয়ে গেল, মজা দেখা মিটে গেছে, অনেকেরই এবার বোধহয় মনে পড়েছে বাড়ির কথা, কাজের কথা। যেটুকু ভিড় রইল এখন ও'কে ঘিরে।

কে একজন এসে ও'র হাত ধরল, 'উঠুন মেসোমশাই। বাড়ি চলুন।'

'বাড়ি?...হ্যাঁ, যাব বৈকি। কোন্ হাসপাতালে নিয়ে গেল ওরা বাবা—জান কেউ? একটু খবর পাওয়া যাবে না?

'বিমু গেছে মেসোমশাই। বিমু আর তারক। ওরা ফিরলেই সব খবর পাবেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি...আপনি এখন বাড়িতেই যাবেন তো?'

'আমি? তা বাড়িতেই তো—। মানে আর কোথায় যাবো?'

'আর কাউকে খবর-টবর দিতে হবে?' বাড়িওলাদেরই আর একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করে। তার মুখটা এতক্ষণে চিনতে পারেন শরৎ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,—খবর দিতে হবে।...এই কাছেই মদন মিত্তিরের লেনে আমার বড় শালী থাকে। কিন্তু নম্বর জানি না...আমার সঙ্গে যাবে কেউ বাবা? তাদেরই খবর দিতে হবে। তারাই ওর আপন—'

'চলুন চলুন, আমরা সবাই সঙ্গে যাচ্ছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে একবার পুঁটলিটার দিকে হাত বাড়ালেন।

'আমরা নিচ্ছি মেসোমশায়। আপনি চলুন।'

মাথাটা এখনও ঘুরছে। একজনের কাঁধে হাত রেখে সামলে নিলেন টালটা। তা কাঁধটা ধরেই চললেন ধীরে ধীরে।...সাগুটা ওরা নামাবে তো? কড়াসুদ্ধ যদি ধরে যায়—উমা বড় বকাবকি করবে—

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

এখনও যেন ভাল করে বুঝতে পারেন না শ্যামা। এত দ্রুত, এত অল্প কদিনের মধ্যে এতগুলো ব্যাপার ঘটে গেল—এত সাংঘাতিক, কল্পনাতীত সব ঘটনা—আর সেগুলো একটু নিঃশ্বাস ফেলবার সময় না দিয়েই এমন পর পর প্রবলভাবে ঘা দিয়ে গেল তাঁর মনে ও মস্তিষ্কে যে, ভাল করে ভেবে দেখা তো দূরের কথা, সেগুলো পরিষ্কার ধারণাই করতে পারেন না সম্পূর্ণভাবে। কেমন যেন তালগোল খিচুড়ি পাকিয়ে গেছে সবটা। এখন ভাবতে গেলে ঠিক ঠিক মাথায় আসে না। সব ঘটনাগুলোই যে সত্যি সত্যি ঘটেছে তাও মনে হয় না। মনে হয় এসব স্বপ্নে

দেখছেন তিনি, অসুখের মধ্যেকার বিকার এগুলো। কিম্বা আর কোন লোকের সংসারে এসব ঘটেছে, লোকমুখে শুনছেন। আঘাত পেয়েছেন যে একটা খুব, তাও মনে হয় না। শুধু শরীরটা নয়, মনটাও যেন জড়ভরত হয়ে গেছে কেমন।

শরীরটা তাঁর খুবই ভেঙ্গে গেছে এই কদিনে। সেইটে প্রত্যক্ষ, সেইটে টের পাচ্ছেন তিনিও।

সবাই বলত তাঁর পাথরের শরীর, রোদে, জলে, অনিয়মে, উপবাসে তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। তিনিও তাই জানতেন। এত অত্যাচারে, এত অনাহার ও অপুষ্টিতেও কখনও শক্ত অসুখ তাঁর হয় নি। স্বামী কোন সাংঘাতিক ব্যাধির বীজাণু তাঁর দেহে সংক্রামিত করে গেছেন বলেই তাঁর বিশ্বাস—কিন্তু তাও আজ পর্যন্ত বিশেষ মাথা তুলতে পারে নি। কোন শক্ত অসুখই তাঁর করে নি কখনও। সব অবস্থাতেই নিজের অভ্যস্ত কাজ করে যেতে পারেন—এ অহঙ্কারও ছিল তাঁর মনে। এবার সে সব অহঙ্কারই ঘুচেছে।

উমার ঐ ঘটনাটা যেদিন ঘটে—সেদিন তিনিও একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিলেন। আঘাটায় নেমে শুষুনি শাক তুলতে গিয়ে শামুকের খোলায় পা কেটে রক্তারক্তি। এতখানি ফালা হয়ে কেটে গিয়েছিল গোড়ালির কাছটা। তারই তাড়সে প্রবল জ্বর আসে, পা-টা বোধহয় বিষিয়েই উঠেছিল, ফুলে উঠেছিল সমস্ত পাটাই। গোবিন্দ যখন খোকাকে পাঠিয়ে খবর দিলে, তিনি তখন অজ্ঞান-অচৈতন্য। ভাগ্যে কান্তি ও'র ঐ জ্বর আর পা ফোলা দেখে সেইদিনই ফকির ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল, নইলে কী হ'ত বলা যায় না। ফকির ডাক্তার নাকি বলে গেছেন আর একদিন দেরী হলে পা কেটে বাদ দিতে হ'ত।

সবাই বলে যে যমজ ভাই কি বোন একজন গেলে অপরজন ঠিক টের পায়। শ্যামা কিছু টের পান নি। অবশ্য টের পাবার মতো অবস্থাও ছিল না তাঁর। চটখণ্ডীদের গিন্নী যেটা বলেছেন সেইটেই ও'র মনে লেগেছে। যম তাঁকে ধরেও টেনেছিল। যমজের একজন যখন মরে, আর একজনেরও প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়। নিহাৎ ও'র সব পাপের সাজা এখনও ভোগ হয় নি বলেই যমদূত ছেড়ে দিয়ে গেছে।

উমার খবর শুনলেন উনি অনেক পরে। সব চুকে-বুকে গেছে তখন। একটু ভাল রকম জ্ঞান হ'তে তবে ওরা বলেছে—তাও একসঙ্গে বলে নি, সইয়ে সইয়ে বলেছে। হেম নাকি কদিন এখানে আসতেই পারে নি। লোক দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল—ওর শ্বশুররা এসে কনককে রেখে গেছেন। অসুখের মধ্যে চোখ খুলে কনককে দেখে প্রথমটা ও'র ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। এরই মধ্যে—? তারপর নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারলেন। এই জন্যেই ওরা এনেছে। কে কার মুখে ভাত জল দেয়। কান্তি তো কিছুই পারে না। দুদিন নাকি মুড়ি চিবিয়ে আছে।

এত কাণ্ড হয়ে গেছে উমার, তখনও শোনেন নি। আর দুদিন পরে শুনলেন। হেম সব কাজ শেষ করে ফিরে এসে বলল।

গোবিন্দ খবর পেয়েই হাসপাতালে গিয়েছিল। প্রাণ ছিল তখনও কিন্তু সে প্রাণরক্ষার জন্য কিছুই করেন নি ও'রা। কী হয়েছে কতদূর হয়েছে তাও কেউ দেখে নি। অত রাতে নাকি কিছুই করা যাবে না। কাল বড় ডাক্তার না দেখলে তেমন ব্যবস্থা কিছু করা সম্ভব নয়। শুধু মাথায় বরফ দিয়ে ফেলে রেখেছে। রক্তও মুছিয়ে পরিষ্কার করা হয় নি। নিঃসাড়ে পড়ে আছেন উমা—খুব লক্ষ্য করলে বোঝা যায় বুকের কাছটা একটু উঠছে নামছে।

অনেক কাণ্ড করে 'আর-এস'-কে খুঁজে বার করেছিল গোবিন্দ—তাতেও কোন

লাভ হয় নি। তিনি মুখ বাঁকিয়ে বলছেন, 'আমার তো মনে হয় ও আর বাঁচবে না। হাউএভার, বড় সার্জন কেউ না দেখলে ঠিক বলতে পারছি না। তাও এক্স-রে না নিলে তাঁরাও যে কিছু ডেফিনিট বলতে পারবেন—তা মনে হয় না। সেও কাল সকালের আগে তো নয়। আমাদের যেটুকু করবার করেছি—আর কিছু করবার নেই। মরফিন ইঞ্জেকশন পড়েছে, মাথায় বরফ চলছে—আর কী করব বলুন? যদি বাঁচার হয় তো ঠিক সারভাইভ্ করবে--নিত্য দেখছি তো!'

পরের দিন বড় ডাক্তার এলেন যখন তখন বেলা বারোটা বাজে। তখনও প্রাণ আছে কিন্তু আর তখন নাকি কিছু করার নেই। তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে স্কাল্-এ খুব বড় একটা ফ্র্যাকচার হয়েছে, ব্রেনে সুদ্ধ চোট লেগেছে। তার মানে জটিল অপারেশন। সে সব যন্ত্রপাতিও নেই আমাদের, তা ছাড়া যা অবস্থা পেসেন্টের--এখন এক্স-রে করিয়ে অপারেশনের তোড়জোড় করতে করতেই ও মারা যাবে। বাইরে থেকে টের পাচ্ছেন না আপনারা, ভেতরে ভেতরে খুব হেমারেজ হয়েছে। শক্ত হার্ট বলেই এখনও টিকে আছে—'

সুতরাং কিছুই করা হ'ল না, একটা চেষ্টা পর্যন্ত না। বেলা দুটো নাগাদ মারা গেলেন উমা।

কিন্তু তখনই শব হাসপাতালের ভাষায় 'লাশ' পাওয়া গেল না। এ নাকি পুলিশ কেস, পোস্টমর্টেম পরীক্ষা করতে হবে। গোবিন্দ আর হেম—হেমকে হাওড়া স্টেশনে ধরে সকালেই খবর দিয়েছিল গোবিন্দ, সে অফিসে সই করেই চলে এসেছে—থানায় গিয়ে দারোগাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করল ; ব্রাহ্মণের শব, সকলের সামনেই তো দুর্ঘটনা হয়েছে—মিছিমিছি কাটা-ছেঁড়া করবেন কেন, ডোমে ছোঁবে—যদি দয়া করে এমনিই ছেড়ে দেন উনি, চিরকৃতজ্ঞ থাকবে এরা, ইত্যাদি ; কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। পরে সকলে বলল যে কিছু প্রণামী পেলেই ছেড়ে দিত—কিন্তু সেটা হেমরা জানত না। অত মাথাতে যায় নি। সঙ্গে টাকাও ছিল না। তবে জানা থাকলে হয়ত শরতের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যেতে পারত, ধার করেও দিত হয়ত। ওরা কিছুই জানত না, আগে কেউ বলেও দেয় নি। তবে সেও তো অনুমান।

ফলে বাসিমড়া পড়ে রইল। শেষ পর্যন্ত পরের দিন যখন মর্গ থেকে লাশ ছাড়া হ'ল তখন বেলা একটা বাজে।

শরৎ সেই রাত থেকে কমলার ওখানেই আছেন। তাঁকে ও-বাড়ি মানে ওঁদের সে-বাড়ি যাবার কথা কেউ বলে নি, তিনিও তোলেন নি। এখানে যে আছেন—এদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা—তাও জিজ্ঞাসা করেন নি। কোথায় আছেন সেটাও অত মাথাতে যায় নি বোধহয়। সহজ ভাবেই থেকে গেছেন। সেই যে এসেই ধপ করে বসে পড়েছিলেন, সেই ভাবেই বসে ছিলেন। ওঠেন নি, নড়েন নি, কারও সঙ্গে কথা বলেন নি। অনেক রাত্রে—প্রায় শেষ রাত্রে কমলা এসে জোর করে শুইয়ে দিতেই শিশুর মতো শুয়ে পড়েছিলেন। কোন বাধা দেন নি—কোন প্রশ্ন করেন নি। শুধু কিছু খাবেন কিনা গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করাতে একটা অদ্ভুত অনুরোধ করেছিলেন। গোবিন্দকে কিছু না বলে কমলার দিকে চেয়ে অনুরোধের সুরে বলে-ছিলেন, 'ঐ যে পুঁটুলির মধ্যে ক্ষীরের বরফিগুলো পড়ে আছে—তুলে রেখে দেবেন দিদি? ও এনেছিল আমার জন্যে। আমি ভালবাসি বলে। আজ নয়—কাল সকালে আমি খাবো।'

পরের দিনও চুপ করে বসেই ছিলেন এক জায়গায়। হাসপাতালে যাবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি--কেমন আছে তাও জানতে চান নি। সকালে কমলাই কথাটা

তুলেছিলেন, 'একবার দেখতে যাবে না ভাই?'

মৃদু মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'না দিদি, কাজ নেই। কাল দেখার চেষ্টা করেছিলুম, দেখতে পাই নি। সব ঝাপ্‌সা দেখেছিলুম। ও অবস্থায় দেখতে পারবও না।......না-ই বা দেখলুম আর।......এক যদি—যদি—বাঁচে—'

আর কিছু বলতে পারেন নি। স্বর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মৃত্যুসংবাদটা পাবার পরও চুপ করে বসেছিলেন। কান্নাকাটি করেন নি, কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নি। গোবিন্দ নিজে থেকেই বলেছিল পোষ্টমর্টেমের কথা, তাও কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। স্থির দৃষ্টিতে সামনের দেওয়ালের রঙীন ক্যালেণ্ডারটার দিকে চেয়ে বসে ছিলেন।

কমলা আছাড়ি-পিছাড়ি করে কাঁদছিলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে হেম গোবিন্দ খোকা সকলেরই চোখে জল এসে গিয়েছিল—কিন্তু শরৎ তখন কাঁদেন নি। কেঁদেছিলেন অনেক পরে রাত্রিবেলা। অন্ধকারে বসে কেঁদেছিলেন। রানী দেখেছে, রানীই বলেছে হেমকে, গোবিন্দকে।

রানীকে কেউ খবর দেয় নি, সে এমনই এসে পড়েছিল বিকেলে। এদের ভাগ্যক্রমেই সে এসে পড়েছিল বলতে হবে। সে এসেই জোর করে নিজের ছেলেমেয়ে কোলে দিয়ে কতকটা শান্ত করল কমলাকে। সে না এলে সেদিন সন্ধ্যায় এদের ঘরে বোধহয় আলো জ্বলত না, কারও মুখে জল পড়ত না এক বিন্দু। হেম আর গোবিন্দ তো ছুটোছুটি করছিল। খোকা গিয়েছিল মহাশ্বেতাদের বাড়ি খবর দিতে। কমলা কাঁদছেন—শরৎ চুপ করে বসে আছেন, রানী যখন এল।

রানী বৌ-ই সন্ধ্যার পর চা করে শরৎকে দিতে গিয়ে দেখেছিল তাঁর দু-চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে, কান্নার বেগ নেই—শুধু নিঃশব্দে জল পড়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরেই পড়ছে বোধহয়, সামনের গেঞ্জিটা ভিজে গেছে।

রানী ফিরেই আসছিল। কী ভেবে আবার কাছে গিয়ে কুণ্ঠিত মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, 'মেসোমশাই, চা এনেছি।'

শরৎ মুখ তুলে চেয়েছিলেন। তারপর নিঃশব্দে চায়ের কাপটা ওর হাত থেকে নিয়ে পাশে নামিয়ে রেখেছিলেন। বোধহয় খেয়েছিলেনও, সেটা আর রানী দেখে নি। দেখতে পারে নি। তার দুই চোখ জ্বালা করে জল ভরে এসেছিল। আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে হয়ত সে-ও কান্নায় ভেঙে পড়ত।...

পরের দিন মর্গ থেকে কখন শব পাওয়া যাবে খোঁজ করে সেই মতো লোকজন ঠিক করে হেমকে খাট এবং দুর্গাপদকে ফুল কিনতে পাঠিয়ে গোবিন্দ শরৎকে ডাকতে এল।

'আপনাকে একটু উঠতে হবে মেসোমশাই এবার। একবার যেতে হবে আমাদের সঙ্গে—'

উনি যেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'আমি—আমি যাব? আমি কেন বাবা?'

একথার জবাব গোবিন্দ দিতে পারত না! এ ধরনের কথার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কমলা আবার হাহাকার করে কাঁদছেন। ওদের সে যাত্রা বাঁচিয়ে দিলেন রানী বৌ-ই। কাছে এসে পাশে বসে পড়ে বললে, 'শেষবারের মতো সিঁদুরটা যে আপনারই দেবার কথা মেসোমশাই, ঐটুকু না করলে তিনি পরলোকে গিয়েও শান্তি পাবেন না। আপনার কাছে এটা তাঁর পাওনা যে। আপনারও তো ঋণ কম নয় তাঁর কাছে!'

হঠাৎ শরতের একটা কথা মনে পড়ে যায়। কে যেন কবে বলেছিল, কোন্ দূর-শ্রুত, প্রায়-বিস্মৃত কথাটা—এ জীবনে দেবার মধ্যে দিয়েছ তো এই লোহাটা আর সিঁদুরটুকু, তা সেইটুকুও সহ্য হচ্ছে না বুঝি?'...

'আমারই সিঁদুরটা দেওয়ার কথা, না মা? তা'হলে যাই। আর কি দিতে হয়? লোহা কি দেয় এ সময়ে? না শুধুই সিঁদুর?... ঠিকই বলেছ মা, অনেক ঋণ আমার, কিছু শোধ করা হ'ল না!'

তারপরই—এই প্রায় দুদিন পরে হু হু ক'রে কেঁদে উঠলেন, 'আমারই ভুল হয়েছিল মা—ওর কাছে আসা। আমি না এলে হয়ত এমনভাবে মরত না, এত তাড়াতাড়ি। আমারই নিশ্চয় রাক্ষসগণে জন্ম—আমি যাকে ধরেছি সে-ই মরেছে। আমার কেউ বাঁচে নি, আমার আর কেউ রইল না। আমার জন্যেই সে গেল। কখনও কিছু দিতে পারিনি, অপঘাত মৃত্যুটা দিলুম শেষকালে—'

শ্মশান পর্যন্ত সঙ্গে গিয়েছিলেন শরৎ, দাঁড়িয়েও ছিলেন শেষ পর্যন্ত—কিন্তু মুখাগ্নি করেন নি। অনেক ক'রে বলেছিল হেম আর গোবিন্দ, অভয়পদ নিজে এসে অনুরোধ করেছিল কিন্তু তিনি রাজী হন নি। বলেছিলেন, মুখ-অগ্নি করলেই শ্রাদ্ধ করতে হয়। আমি ওকে পিণ্ডি দেব না। আমার ভাত খেতে ওর বড় আপত্তি ছিল. দিনরাত ও ভগবানকে ডাকত আমার ভাত না খেতে হয়। আমি সে ভাত দেব না। জ্যান্তেই যখন একদিনও ভাত দিলুম না, মরার পর আর দিই কেন। তাছাড়া ব্রাহ্মণের মেয়ের পিণ্ডি—ব্রাহ্মণের হাতে পাওয়াই উচিত। আমার আর ব্রাহ্মণত্ব কিছু নেই। আমি—আমি অতি নীচ অন্ন খেয়েছি। হেমই দিক—ওকেই সবচেয়ে ভালবাসত, ও-ই করুক শেষ কাজটা। খরচপত্র সব আমি করব—কিন্তু ওটি বলো না তোমরা!'

অগত্যা হেমকেই দিতে হয়েছিল মুখাগ্নি। সেইজন্যেই এতদিন আসতে পারে নি। অপঘাত মৃত্যুর ত্রি-রাত্র অশৌচ। একেবারে শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে নিয়মভঙ্গ সেরে এসেছে।

'কোথায় শ্রাদ্ধ হ'ল?' শ্যামা জিজ্ঞাসা করলেন।

'কালীঘাটে গিয়েই সেরে এলুম। আর কোথায় হ্যাঙ্গামা করব! অবশ্য জিনিসপত্র মেসোমশাই ভাল ভাল দিয়েছে দানে। বারোটি ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হয়েছে—সেও বেশ পরিতোষ ক'রে।'

'সেটা কোথায় হ'ল?' ঈষৎ যেন সজাগ হয়ে ওঠেন শ্যামা।

'সে ঐ যে-বাড়িতে মাসী থাকত সেইখানেই। মেসোমশাই বললেন, এতকাল ওখানে ছিল, ওখানে কিছু করা দরকার। ব্রাহ্মণ খাওয়ানোই নাকি আসল, সে পুরুতও বললে। তাই ওখানেই করা হ'ল। বাড়িওলারা অনেক করেছে অবশ্য। ...রান্না করলে বড় মাসী আর রানী বৌদি—বামুন রাখতে চেয়েছিলেন মেসোমশাই, ওরা রাজী হ'ল না।'

'তা শরৎ জামাই এখন কোথায় রইলেন? ঐ বাড়িতেই?'

'না না। ওখানে কোথায় থাকবেন! বড়দা ওদের ওখানে এনে রেখেছে। বেশীদিন থাকবেন না তো—প্রেসের খদ্দের খুঁজছেন দালালও লাগিয়েছেন, প্রেস বিক্রি ক'রে দিয়ে কাশী চলে যাবেন। সেখানে কে ও'র দূর-সম্পর্কের বোন আছে, তার কাছেও থাকবেন না—তাকে লিখেছেন কম ভাড়ায় একটা ঘর খুঁজতে—'

'তা সব জিনিসপত্তর—?'

হেম একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসল। বলল, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মেসো-

মশাই, যে, তোমরা কিছু নেবে—না সব বেচেকিনে দিয়ে তারই নামে টাকাটা কোথাও দিয়ে দেব—কোন সৎকাজে?

'তা তুই কি বললি?' কথাটা শেষ করতে দেন না শ্যামা—তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন ক'রে ওঠেন। উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রেই আবার বলেন, 'যে মুখে আগুন দেবে, তারই তো সব পাওনা!'

'হ্যাঁ—সব ঐ হাড়পেকের বোঝা কে ঘাড়ে করবে!...আমি বললুম, একেবারে সব বেচে না দিয়ে কিছু কিছু আমাদের কাছে রাখা ভাল—তাঁর স্মৃতি তো।......তা মেসোমশাই ঠিক করেছেন দিদিমার দরুন বাসনের সিন্দুকটা আর মাসীর কাপড়-চোপড় সুদ্ধ তোরঙ্গটা আমাদের দেবেন। বড়দাকে দেবেন ঘড়িটা। আর হাতের রুলি দুটো আর দিদিমার দরুন কী সামান্য দু এক কুচি বুঝি আছে—সেগুলো রানী বৌদিকে দিয়ে বাকি সব বেচে দেবেন।'

'তাহ'লে বড়বোয়েরই জিৎ হ'ল বলো।'

'তা সে যা বোঝ।'

'কেন, বাসনকোশন কি আমরা কিছু পেতে পারি না?'

'সে কিছু কিছু বাড়িওলাদের দিয়ে দিয়েছেন, মাসীর ভাতখাবার থালাটা আর জলখাবার ঘটিটা মেসোমশাই নিজে রাখবেন। বাকি সব কালই বিক্রী হয়ে গেছে। সব টাকা বড়মাসীর কাছে থাকবে—মেসোমশাই বলেছেন, তুমি তো রেলের পাস পাও, একসময় গিয়ে ঐ টাকাতে গয়াটা সেরে এসো। অপঘাতে মরেছে—গয়া না করলে মুক্তি নেই। ঐ-ই নাকি আসল। পিণ্ডি দিয়ে ঐখানেই ব্রাহ্মণ খাইয়ে আসতে বলেছেন!'

শেষের দিকের কথাগুলো আর শ্যামার কানে যায় নি। তিনি ভাবছিলেন অন্য কথা।

সুদূর অতীতে চলে গিয়েছিল তাঁর মন। অনেক, অনেকদিন আগেকার কথা ভাবছিলেন তিনি।

ও'দের মা রাসমণি তখন প্রায় মৃত্যু-শয্যায়। ও'দের সকলকে ডেকে মার যা ছিল ক্ষুদকুঁড়ো—সামান্য একটু সোনা ও বাসন কখানা—ভাগ করে নিতে বলে-ছিলেন। তাঁর সামনে সব আনতে বলেছিলেন—অর্থাৎ তিনি যাকে যা দেবার বলে দেবেন, সেই মতো নেবেন ও'রা।

সমান ভাগ করারই কথা। রাসমণির সেই রকমই ইচ্ছা আন্দাজ করেছিলেন শ্যামা। কিন্তু উমাকে ও'দের সমান ভাগ দিতে শ্যামার আপত্তি ছিল। ওর কেউ নেই, ও'দের ছেলেপুলে আছে—ও'র মেয়ে আছে, বিয়ে দিতে হবে, জামাই আসবে কুটুম-সাক্ষাৎ আসবে—উমা কেন ও'দের সঙ্গে চুল-চেরা ভাগ পাবে? ইঙ্গিতে সে কথাটা জানিয়েও ছিলেন মাকে। মা রাগ করেছিলেন তাতে। বলেছিলেন, ও'দের ছেলেমেয়ে আছে সেইটেই তো বড় কথা, তারা এরপর ও'দের দেখবে। উমার তো কেউ নেই, ওর কোন একটা ব্যবস্থাও কিছু করে যেতে পারলেন না তিনি ভালমতো—ওরই তো বেশী দরকার এসবের। দরকার হলে এই বেচেই খেতে পারবে তবু দু-চার মাস।

দিয়েছিলেনও তাই। অন্তত শ্যামার যা বিশ্বাস। উমার দিকেই যেন পাল্লাটা একটু বেশি ঝুঁকল। শ্যামার সেটা পছন্দ হয় নি। মনে মনে রাগ করেছিলেন, মার ভীমরতি হয়েছে মনে করে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য প্রকাশ্যে সে বিদ্রোহ জানাবার সাহস ছিল না। রাশভারী লোক ছিলেন রাসমণি—তাঁর স্থির শান্ত

দৃষ্টির দিকে চাইলেই মুখের কথা মুখে থেকে যেত। শ্যামা অন্য পথে গিয়েছিলেন, কিছু বাসন সরিয়ে রেখেছিলেন সকলের অজ্ঞাতে, বয়ে নিয়ে আসার অজুহাতে। কিন্তু মার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে এড়ায় নি সেটা। তখনও পর্যন্ত আশ্চর্য রকমের স্মরণ-শক্তি ছিল তাঁর। ওঃ, সে নিয়ে কী অপমানটাই করেছিলেন সেদিন শ্যামাকে।

সেই সব বাসনই আজ তাঁর ঘরে আসছে। কোনটাই উমার ভোগে আসে নি। সবই বুকে করে রেখে দিয়েছিল সে, একটিও খোয়ায় নি। অনেক দুঃখ কষ্ট করেছে তবু প্রাণ ধরে বেচতে পারে নি একটা।

সে-ই আসছে তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি কি খুব একটা আনন্দ বোধ করছেন? খুব একটা বিজয়গর্ব? মজ্জাগত অর্থলোলুপতার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় এগুলো সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন বটে—কিন্তু এখন যেন কেমন ভয়-ভয় করছে। উমার কোন কাজে লাগে নি, তাঁরই কি লাগবে? এই তো সবই ফেলে চলে যেতে হ'ল একনিমেষে। কাকে কি দেবার ইচ্ছে ছিল তাও বলে যেতে পারল না। কে জানে তাঁরই বা কখন কিভাবে ডাক আসবে। এই যে সব জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকছেন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিস, আরও চাইছেন, প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষায় সর্বদা যেন দুই-হাত বাড়িয়ে রয়েছেন—এও কি একদিন এমনি বিনা নোটিশে ছেড়ে যেতে হবে! তাঁর এত কষ্টের এত দুঃখের জিনিস সব পাঁচভূতে নষ্ট করবে—তিনি বাধা পর্যন্ত দিতে পারবেন না, নিজের ইচ্ছাটা পর্যন্ত জানাতে পারবেন না।......ভাবতে ভাবতে যেন শিউরে ওঠেন শ্যামা।......এসব কি ভাবতে শুরু করলেন তিনি? দুর্বল শরীর বলেই বোধ হয় এইসব ছাইভস্ম কথা মনে আসছে!...

জোর করে মনকে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করেন।

এই তো দুনিয়ার নিয়ম—তাই বলে কি সকলে সব বিলিয়ে নাগা-ফকির হয়ে যাচ্ছে? তুমিও যেমন!

কান দেন হেমের দিকে। কী যেন বলছে হেম—?

'বরাত বটে ছোট মাসীর—মরেও কি শান্তি আছে? শেষ পর্যন্ত পোড়াটাও সুশৃঙ্খলে হ'ল না। পুরো দেহটা পোড়ানোই গেল না।'

'সে আবার কী রে? কি বলছিস?'

'আর কি বলছি! শয়ে তো চাপানো হ'ল, বেশ জ্বলছে, আমরা একটু এদিকে সরে আছি, কাছাকাছি আছেন বরং মেসোমশাইই—অকস্মাৎ একটা সোরগোল, মেসো-মশাইও চিৎকার করে উঠলেন। কী ব্যাপার—না চেয়ে দেখি একটা সন্ন্যাসী-মতো লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে আর তার পিছু পিছু কতকগুলো লোক দৌড়চ্ছে তাকে ধরবার জন্যে। কিছুই বুঝতে পারি না—কী হ'ল জিজ্ঞাসা করতে একজন বললে, আপনাদের চিতা থেকে ঠ্যাং নিয়ে গেল যে মশাই! মেসোমশাই কোথায়? চেয়ে দেখি তিনিও দৌড়েছিলেন, শ্মশানের বাইরেটায় এসে বুক চেপে বসে পড়ে হাঁপাচ্ছেন। একে ওঁর হাঁপানির ব্যায়রাম তায় বুড়ো মানুষ, পারবেন কেন? তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম—ঐ লোকটা আস্তে আস্তে এসে একটা কাঠ দিয়ে মাসীর একটা ঝলসানো পা টেনে বার করে সেই আগ-জ্বলন্ত পা-টা নিয়েই দৌড় দিয়েছে—'

'সে কি রে? কে সে? করবেই বা কি ওটা দিয়ে?'

ভয়ে শিউরে ওঠেন তিনি। কনকও পিছনে বসে শুনছিল, সে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে কাঠ হয়ে যায় একেবারে।

'কী করবে জানো? সে তোমরা চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে না।...খাবে, খাবে। খাবার জন্যেই নিয়ে যাচ্ছিল।'

'ধ্যেৎ! খাবে কি? ওসব গল্প-কথা রামায়ণে লেখা আছে। এখনকার দিনে বুঝি রাক্ষস আছে—'

'রাক্ষস কেন হবে—সন্ন্যাসী। একজন গঙ্গাপুত্তুর আমাদের বললে, ওদের বলে অঘোরপন্থী সন্ন্যাসী—কোন ঘোর থাকে না, আপন মনেই থাকে, যখন হুঁস হয় খিদে পেয়েছে—তখন সামনে যা পায় তাই খায়। একবার অনেকদিন আগে নাকি এমনি এক অঘোরপন্থী জ্যান্ত গোখ্‌রো সাপ ধরে খেতে শুরু করেছিল—তাও ধরেছিল ল্যাজের দিক থেকে, সেও ছোবল দিয়েছে তিন-চারটে—পরের দিন দেখা গেল দুটোই মরে পড়ে আছে!

'বলিস কি—পিশাচ বল!'

'তবে আর বলছি কি! এ লোকটা নাকি কদিন ধরেই ওখানে আছে। শ্মশানের বাইরে একটা গাছতলায় বসে থাকে থুম হয়ে—তা সন্ন্যাসী তো অমন কতই থাকে শ্মশানের ধারে, বিশেষত নিমতলায় তো লেগেই আছে—কেউ তাই অত গ্রাহ্য করে নি। পরে শোনা গেল এ লোকটা দিনকতক খড়দা না পেনেটি কোথায় গঙ্গার ঘাটে বসেছিল অমনি। কেউই তত লক্ষ্য করে নি,—হঠাৎ একদিন মার সঙ্গে একটা চার-পাঁচ বছরের ছেলে যাচ্ছিল গঙ্গা নাইতে, তাকে ধরে হাতটা কামড়ে এতখানি মাংস তুলে নিয়েছে একেবারে। তারা সব ধরে খুব গোবেড়েন মার দিয়েছে—তাইতেই পালিয়ে এখানে এসেছে!'

এতক্ষণে কনক কথা বলে। শাশুড়ী স্বামী একত্রে থাকলে আগে সে কথাই কইত না, এঁরা পছন্দ করেন না বলে—এখন দু-চারটে কথা বলে, যদিচ খুব জরুরী অবস্থায় না পড়লে সোজাসুজি স্বামীর সঙ্গে বলে না, শাশুড়ীকে উপলক্ষ করে বলে। আজও তাই বলল, 'তা যার হুঁশ নেই, খিদে পেলে যা সামনে পাবে তাই খাবে—সে তো গু-গোবরও খেতে পারে। বেছে বেছে মাংসটি খাবে, তা আবার মানুষের মাংস—চুপিচুপি এসে চিতা থেকে ঝলসানো মাংস নিয়ে পালাবে—এ আবার কেমন অঘোর—হ্যাঁ মা?'

'তুমি রেখে ব'সো দিকি বৌমা? ও বজ্জাতী, বজ্জাতী। সন্ন্যাসী না হাতী —ধরে গরম সাঁড়াশি দিয়ে ঐ জিভ টেনে বার করলে তবে ও নোলা জব্দ হয়।'

তারপর মনে পড়ে গেল আসল কথাটা—'তা হ্যাঁরে, শেষ অবধি কি হ'ল তারপর? পাওয়া গেল?'

'পাওয়া গেল—কিন্তু পুরোটা নয়। তখন দু-তিন কামড় খেয়ে ফেলেছে। বেগতিক দেখে বেশ খানিকটা কামড়ে তুলে নিয়ে বাকিটা গঙ্গার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালাল। আবার একজন গঙ্গাপুত্তুর গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আসে—'

কনকের ছেলে কেঁদে উঠতে সে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে এল। তার নিজেরও যেন হঠাৎ নতুন করে চোখে জল এসে গেল আবার। খুব বেশী দেখে নি সে ছোট মাসীমাকে কিন্তু তার সব কথাই শুনেছে সে। কী বরাত নিয়েই এসেছিল মানুষটা, এমন ভাগ্য যেন অতিবড় শত্রুরও না হয়। জীবনের একটা দিনও মানুষ অন্তত সুখী হয়—এঁর অদৃষ্টে ও জিনিসটা যেন দিতেই ভুলে গিয়েছিলেন বিধাতা।...সারা জীবনটাই তো দগ্ধে গেলেন, আবার মরেও শান্তি পেলেন না। মরণটা এল—তাও একটা ভয়ানক কান্ড করে, মরার পরে পুরো দেহটা পর্যন্ত দাহ করা গেল না। এমন কখনও শোনে নি কনক, আর কারও মুখে শুনলে বিশ্বাস করত না।...লোকে বলে গতজন্মের পাপে নাকি এ জন্মে দুঃখ পায়। সারা গতজন্ম ধরেই কি পাপ করে এসেছিলেন উনি?—যাকে বলে নির্জনে বসে আপন মনে পাপ

করেছিলেন, বাধা দেবার কেউ ছিল না? তাই মরার পরেও সে পাপ ধাওয়া করল?...

কে জানে এ-জন্মেই শেষ হ'ল কিনা। আর যেন সে পাপের ফল পরজন্ম পর্যন্ত না জের টানে। এ-জন্মে তো কোন পাপ করেন নি, সতীসাধ্বী—সাধ্য মতো পরের ভালই করে গেছেন; আসছে জন্মে যেন সুখী হন, স্বামীপুত্র নিয়ে যেন মনের শান্তিতে ঘর করতে পারেন—হে ভগবান!

মনে মনে উদ্দেশে প্রণাম করে সে ভগবানকে।

বাইরে প্রথম অপরাহ্নের সোনালী আলো গাছপালার পত্রপল্লবে ঝলমল করছে—জানালার বাইরে সজনে গাছের পাতাগুলো খেলা করছে সে আলোতে—একটা সির-সির শব্দ হচ্ছে তার। মৃদু বাতাসে পুকুরের কাকচক্ষু জলে অতি সামান্য লহর উঠেছে—অদ্ভুত দেখাচ্ছে জলটা। ঠিক লহর বললেও ভুল বলা হবে—যেন পুলক-শিহরণ। সে শিহরণ শুধু পুকুরের জলেই সীমাবদ্ধ নেই, জলের ধারে শুষুনি-কলমী দলেও তা বিচিত্র আলোড়ন জাগিয়েছে। শান্তি, শান্তি। চারিদিকেই অপূর্ব শান্তি একটা। কোলে তার আধোঘুমন্ত দেবশিশুর মতো ছেলে, স্তন্য পান করতে করতে চোখ দুটো বুজে আসছে ওর—এখনও যেটুকু খোলা আছে, সেই অর্ধনিমীলিত-অক্ষিপল্লবের ভেতরকার ঢুলুঢুলু দৃষ্টিতে অপরিসীম তৃপ্তি ও মার প্রতি নির্ভরতা। এ সময় বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে কোথাও কোন দুঃখ, কোন অশান্তি আছে। কনকেরও যেন নিজের মনেই একটা আশ্বাস জাগে।...সুখী হবে, নিশ্চয় সুখী হবে এ জন্মে মাসীমা। আর এমন ক'রে দুঃখ পাবে না।

ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে চাপড়াতে চাপড়াতে হঠাৎ মনে হ'ল, 'আচ্ছা যদি আমার কাছেই আসে আবার!...মাগো, তা আসবে নাকি? অতবড় মানুষটা আবার এতটুকু হয়ে আমার কোলে শুয়ে দুধ খাবে?'

পরক্ষণেই বিষম লজ্জা করতে লাগল তার—কথাটা কল্পনা করার জন্যে। আচ্ছা কান্ড বটে! যত কি বিদ্ঘুটে কথা তার মাথাতে আসে!

॥ ২ ॥

বাইরে তত প্রকাশ না পাক—উমার মৃত্যুতে একটা বড় রকমেরই আঘাত পেয়েছিলেন শ্যামা। সংবাদটা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তত বোঝা যায় নি; এতই আকস্মিক যে সংবাদের সম্পূর্ণ অভিঘাতটা তখন উপলব্ধি করতে পারেন নি। সেটা ক্রমে ক্রমে একটু একটু ক'রে করলেন। শূন্যতাটা সম্বন্ধে সচেতন হ'তে অনেকখানি সময় লাগল তাঁর। দীর্ঘজীবনের পৃষ্ঠপটে স্মৃতির রেখায় আঁকা যে ছবিটা অল্পে অল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর মনের পর্দায়—তার মধ্যে উমা অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। সেই উমা তাঁর জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল, সেই উমা আর নেই—আর কোনদিন তার দেখা পাবেন না, আর কোনদিন তার কাছে ছুটে যেতে পারবেন না দুঃখ জানাতে, তার কাছ থেকে কোন কিছু আর আশা করারও রইল না—দ্বেষ-রোষ-কলহ-ঈর্ষা—সমস্ত রকম মানবিক ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল সে—এই নির্মম সত্যটা অতি ধীরে ধীরে অনুভূত হ'তে লাগল তাঁর। আর যেমন সেটা একটু অনুভব করতে পারলেন, অমনি যেন হাঁফিয়ে ছটফট ক'রে উঠলেন এই ভয়ঙ্কর শূন্যতা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য। এখনও যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না কথাটা। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। বিস্ময়ও বোধ হয়। সেটা বোধহয় অন্য কারণে। উমা যে এতখানি জড়িয়ে ছিল

তাঁর জীবনের সঙ্গে—আজও, এটাও একটা নূতন উপলব্ধি। সেই জন্যেই বিস্ময়।

কিন্তু এ আঘাত সামলাবার মতো সাতটা দিনও সময় পেলেন না শ্যামা। এ আঘাতে দুঃখ ছিল, সেই সঙ্গে স্মৃতি-রোমন্থনের একটা অভিনবতাও ছিল। এবার যে আঘাত এল তা শুধুই তিক্ততা এবং মর্মান্তিকতা নিয়ে এল—তার মধ্যে কোথাও কোন আশ্রয় কি অবকাশ রইল না।

কদিন এইসব হ্যাঙ্গামে হারানের খবর কেউ বিশেষ নিতে পারে নি। কান্তির ওখানে থাকার কথা ছিল কিন্তু সেও থাকতে পারে নি মার অসুখের জন্যে। তবু মধ্যে মধ্যে গিয়ে সে-ই খবর নিয়ে আসত। ভালই ছিল হারান। কথাও দুটো একটা কইতে পারছিল ইদানীং জড়িয়ে জড়িয়ে—কেউ কিছু বললে বুঝতেও পার-ছিল। উমা তার এখানে আসার জন্য ফল কিনে ফিরছিলেন—গাড়ি চাপা পড়েছেন শুনে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। এইসব দেখে সবাই আশা করেছিল যে এ-যাত্রা বেঁচে উঠবে। হেম এর মধ্যে একদিন রাত্রে ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করেছিল। তিনিও বলেছিলেন, 'বোধহয় এ ধাক্কাটা সামলে গেল। এখন কথাটা যদি ঠিকমতো ফিরিয়ে আনতে পারি তা'হলে ধীরে ধীরে হাত-পাও ফিরে পাবে। তবে সময় লাগবে। আর খুব সাবধানে থাকতে হবে এখন দীর্ঘকাল। কোন রকম উত্তেজনা কি দৌড়ঝাঁপ চলবে না।'

অকস্মাৎ খবর এল একেবারে সব শেষ হয়ে গেছে।

সেদিন রবিবার, খোকাকে সঙ্গে নিয়ে উমার দরুন মালপত্র আনতে গিয়েছিল। শরতের ছাপাখানা বিক্রি হয়ে গেছে, এধারেও সব গুছিয়ে এনেছেন তিনি, কাশী চলে যাবেন দু'একদিনের মধ্যে—মাল সরানো দরকার। ঠেলাগাড়ির ওপর সিন্দুক আর তোরঙ্গ চাপিয়ে পাথরের ভারি বাসনগুলো পুঁটুলি বেঁধে হাতে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ঢুকছে হেম, তরুদের পাড়ার একটি ছেলে এসে খবর দিলে।

শ্যামা আছড়ে পড়লেন কিনা সেদিকে আর তাকায় নি হেম। কনক আছে—যা হয় করবে। খোকাও থাক—এইমাত্র এই চার-পাঁচ ক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসেছে, ছেলে-মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নিশ্চয়—কান্তিকে মহাশ্বেতাদের বাড়ি পাঠিয়ে হেম একাই ছুটল সেখানে।

তখন অবশ্য কিছুই জানা যায় নি। এমন আকস্মিক মৃত্যুর কারণ কি, বা শেষ উপসর্গ কি হ'ল—সেটা জানা গেল অনেক পরে। তরুর মুখ থেকেও সব জানা যেত না—কারণ প্রথমত সে ঠিক সেই সময়টায় ছিল না—দ্বিতীয়ত তার তখন একটা স্তম্ভিত অবস্থা। বললেন, ওদের পাশের বাড়ির দত্তগিন্নী। তরুর কথাও তিনিই বললেন। সেই সময়টা—অর্থাৎ যখন ঠিক প্রাণটা বেরিয়ে গেল—নাকি একটা বুকফাটা চিৎকার ক'রে উঠেই ফিট হয়ে যায় ওর। তখন কে কাকে দেখে কী ব্যবস্থা করে, কোথায় লোকজন, পাড়ার ডাক্তারের কাছে ছুটে যাওয়া—একটা আতান্তর অবস্থা, তবু তারই মধ্যে ওরা মুখে মাথায় জল দিয়ে বাতাস ক'রে জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছেন বটে কিন্তু তার পর থেকেই ঐ অবস্থা। চুপ করে বসে আছে—ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে। কথাও কইছে না কাঁদছেও না। অনেক প্রশ্ন করলে একটা আধটা জবাব দিচ্ছে। এ অবস্থা হেম জানে, আগেও একবার হয়েছিল। ওকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা এ অবস্থায় বৃথা। সে চেষ্টাও সে করে নি।

হারানের খবরটাও দত্তগিন্নীর কাছে শোনা গেল। তিনি তরুকে ভালবাসেন তাই বড়বৌ পছন্দ করেন না জেনেও না এসে থাকতে পারেন না। মধ্যে মধ্যেই আসেন, বিশেষত দুপুরের দিকটা তিনি এসে বসলে তরু অনেকটা কাজ পায়।

সেদিনও খাওয়া-দাওয়া সেরেই একটা পান মুখে দিয়ে এসে বসেছিলেন। তরু গিয়েছিল এক বালতি ক্ষারসিদ্ধ নিয়ে পুকুরে কাচতে। ইত্যবসরে হারানের শ্বশুর এসে ঘরে ঢুকেছিলেন।

হারানকে ওর শ্বশুরের কীর্তি-কলাপ কেউ বলে নি। অসুস্থ অবস্থা, ডাক্তারে পই-পই করে বলে দিয়েছে যে রাগ হয় কি উত্তেজনা হয় এমন কোন কথা না ওর কানে যায়। আজকাল বুঝতে পারছে যখন সব কথা, তখন বুঝে সমঝে চলতে হবে। ওঁরাও সাবধান ছিলেন সকলে। কিন্তু হারান বোধহয় এদের কথাবার্তার মধ্যে বা এদের আচারে-আচরণে কিছু আঁচ করে থাকবে। আরও কথা যে টাকাকড়ির ব্যাপারটা একেবারে গোপন করা যায় নি। দত্তগিন্নীর এক ছেলেই বাজার-হাট ক'রে দিত, সে এসে একদিন টাকা চাইতে তরুর মুখটা একটু বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। সেই দেখে হারান উঁ-উঁ শব্দ ক'রে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আলমারীটার দিকে বার-বার চায়। অর্থাৎ আলমারী খুলে টাকা বার ক'রে দিতে বলে। তরু কিছু বলে নি কিন্তু আলমারীও খুলতে পারে নি ওর সামনে। কী একটা বাজে কথা বলে দত্তগিন্নীর ছেলেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল বাইরে। সম্ভবত সে বাজে কথায় হারান ভোলে নি, সেই সময়েই বুঝতে পেরেছিল খানিকটা। বোধহয় তরুর মুখের চেহারা দেখেই আঁচ করেছিল। কারণ ও বেরিয়ে চলে যাবার পরই অব্যক্ত কতকগুলো শব্দ করে খুব অস্থির হয়ে ঘন ঘন মাথা চালতে শুরু করে। সেদিনও ঠিক সেই সময়টাতেই দত্তগিন্নী এসে পড়েছিলেন, তিনিই বকে ধমকে ভুলিয়ে ওকে শান্ত করেছিলেন।

কিন্তু ঠিক অতটা যে বুঝেছিল তা কেউ ভাবে নি। তাছাড়া ওর শ্বশুর অনেক দিন আসেন নি, হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকবেন তাও কেউ জানত না। আগে দেখতে পেয়েছিল হারানই, দত্তগিন্নী দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিলেন, তিনি দেখলেও ফিরিয়ে দিতে পারতেন আগেই। শ্বশুরকে দেখেই হারান বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আর সেই উত্তেজনারই ফলে প্রাণপণ চেষ্টায় বাক্‌শক্তি ফিরে পায়। চিৎকার ক'রে ওঠে, 'নিকাল যাও, আভি নিকাল যাও হামারা বাড়িসে—শুয়ার কাঁহাকা! গেট আউট!'

দত্তগিন্নী ওকে থামাবার কি ওর শ্বশুরকে ঘর থেকে বার ক'রে দেবার কোন চেষ্টা করবার আগেই যা ঘটবার তা ঘটে গেল। কথা বলতে বলতে মাথাটা একটু উঁচু করেছিল, হঠাৎ ধপ্‌ করে পড়ে গেল। গলার কাছে কী একটা ঘড়ঘড় শব্দ হ'ল—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাক দিয়ে ও মুখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল। তারপরই সব স্থির হয়ে গেল। ডাক্তার অবশ্য ওর শ্বশুরই ছুটে ডাকতে গিয়েছিলেন, দত্তগিন্নীর চিৎকারে পাড়ার লোকজনও জড়ো হয়েছিল, তাদের কে একজন দৌড়ে গিয়ে পাড়ার হাতুড়ে ডাক্তারকেও ডেকে আনলে কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। ডাক্তার দেখে বললে, ঐসময়ই প্রাণ বেরিয়ে গেছে।...

তরুকে এবার পাকাপাকি ভাবেই এ বাড়িতে এনে তুলতে হ'ল। ওখানে থাকার উপায় নেই। কার কাছে থাকবে এবং কিসের ওপর নির্ভর ক'রে থাকবে। জমিজমা যা আছে তা নিজেরা তদ্বির করলে কিছু আয় হয়—নইলে কিছুই না। লোকও নেই কেউ। ওর সতীনকে তার বাবা এসে পরের দিনই নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘাট করাবার জন্যও এখানে আনেন নি। শ্রাদ্ধ করল তরুই—ছেলে নিতান্তই ছোট, শ্রাদ্ধ করবার মতো নয়। তরু এখনও সেইরকম জড়ভরত হয়ে আছে—পাশে বসে জোর করে করাতে হ'ল হেমকে। বস্তুত হেমই করল কাজটা। তরু বোধহয় ভাল

ক'রে কিছু বুঝতেও পারল না—কী হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে। তার কত বড় সর্বনাশটা হয়ে গেল তাও মাথায় পুরো ঢুকেছে বলে মনে হ'ল না।

শ্রাদ্ধের আগেই একদিন লোকজন এনে ওর সতীনের বাবা জিনিস-পত্র অর্ধেক বার ক'রে নিয়ে গেছেন। অর্ধেক অবশ্য তাঁর মতে, পাড়ার লোকের মতে বেশিই নিয়ে চলে গেছেন তিনি। হঠাৎ এসেছেন, তরু তো অমনি চুপ, কান্তি ছিল বটে, সে একা কি করবে ভেবে না পেয়ে মহাদের বাড়ি ছুটেছিল খবর দিতে—কিন্তু যাওয়া আসায় সাড়ে তিন ক্রোশ পথ, মহার ছেলেরা আসতে আসতে সব কাজ সেরে চলে গেছেন তাঁরা। অভয়পদদের তখন বাড়ি থাকার সময় নয়, আর থাকলেও তাঁরা ছেলেদের আগে আসতে পারতেন না।

শোনা গেল দুই গোরুর গাড়ি বোঝাই মাল নিয়ে গেছেন ও'রা। আলমারী, বাক্স—বহু জিনিস। সবই নিয়ে যেতেন বোধহয়, দত্তগিন্নীর আর আশপাশের বাড়ি থেকে আরও দু-চারজন মহিলা এসে খুব রাগারাগি চেঁচামেচি করায় বাসনকোশন কিছু কিছু রেখে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

পাড়ার লোকেরা পরামর্শ দিলেন, 'কেস করো। আমরা সাক্ষী দেব। জেল হয়ে যাবে ও শালার। যেমনকে তেমনি। চশমখোর শয়তান!'

দত্তবাবু বললেন, 'আমার হাতে ভাল উকিল আছে, তুলো ধুনে ছেড়ে দেবে বাছাধনকে। ওর মালে হাত দেবার অধিকার কি? তাছাড়া টাকা ছিল অনেক, আমরা জানি। সে টাকা কি করলে হিসেব দিক! টাকা ঐ ছেলের, নাবালকের টাকা—চালাকি নাকি?'

কিন্তু অভয়পদ বারণ করলে, 'ও কাজ ক'রো না। অগাধ জলে গিয়ে পড়বে। আলমারী সিন্দুকে যে টাকা ছিল তা প্রমাণ করতে পারবে না। ওসব সাক্ষীর কোন দাম নেই, ওরা উড়ো উড়ো জানত যে বুড়ির হাতে টাকা ছিল, সঠিক কেউ বলতে পারবে না। দু-তিনজন একরকম না বললে কিছুই টিকবে না। থাকলেও ওরাই যে নিয়েছে—সে কে দেখেছে? এক অফিসের ঐ টাকাটা নিয়ে এসেছে প্রমাণ করা যাবে। কিন্তু সে এমন কিছু নয় যে তার জন্যে কেস করা পোষাবে! একটা যা হয় খরচের হিসেব তো দেবেই, আর সত্যি কিছু খরচ হয়েছেও, জমানো টাকার কথাটা প্রমাণ না হ'লে এ থেকে বিশেষ কিছু আদায় করা যাবে না। যেটুকু আদালত দেবে তাতে এত কাণ্ড করার মজুরী পোশাবে না। এক জিনিসপত্তর—তা তারই বা কত দাম, দাম ঠিক করবে কে? তাছাড়া তারও মেয়ে আছে, কিছু তো পাওনা হয়ই। গেরস্তালির জিনিস আটকানো যায়ও না বোধহয়। অর্ধেকের বেশি নিয়েছে তাই বা প্রমাণ করা যাবে কি করে?......আমার তো মনে হয় জমিজায়গাতেও বোধহয় টান দিতে পারে ওরা।......যাইহোক, সে পরের কথা, পরে দেখা যাবে, জমি কিছু উঠিয়ে নিয়ে পকেটে পোরা যায় না—এখন এসব নিয়ে কেস করতে গিয়ে লাভ নেই। ও আশা ছেড়ে দাও।'

হেম তা জানে। তাদের মতো লোকের কোন আশাই রাখতে নেই। আর এসব করবেই বা কে, পুঁজি কৈ? তম্বির আর টাকার অভাবেই তো রতনের অতবড় সম্পত্তিটা হাতছাড়া হয়ে গেল, মামলার ঝুঁকি নিতে ভরসা হ'ল না। তার তো তবু কিছু সাক্ষীসাবুদ ছিল।......

অফিসেও গণ্ডগোল কম নয়। মাইনের টাকা ছাড়াও হারানের শ্বশুর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা খানিকটা বার ক'রে এনেছে। সেটা বে-আইনী। কিন্তু আইনের প্রশ্ন তুলতে গেলে ওর সেকশ্যানের তিনজন বাবু বিপদে পড়েন। তাঁরা সরল বিশ্বাসে হারানের চিকিৎসা আটকে গেছে শুনে জামিন হয়ে টাকাটা বার করে দিয়েছেন। শুধু

শুধু তাঁদের বিপন্ন করে লাভ নেই।

এই টাকাটা তোলার ফলেও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা খুব কমার কথা নয়। কিন্তু দেখা গেল কিছুদিন আগে হারান নিজেই বেশ খানিকটা টাকা ধার নিয়েছিল। তার সইসাবুদ সব ঠিক ঠিক মিলে গেছে, সে নিজেই নিয়েছে তাতে কোন ভুল নেই। কী করল এ টাকাটা নিয়ে তা কেউ বলতে পারল না। ওর সেকশ্যানের একটি বাবু বললেন, 'একবার আমায় বলেছিল কোন্ বন্ধুর বোনের বিয়ে হচ্ছে না, কিছু টাকা ধার দেবে। তা আমি তো পই পই করে বারণ করেছিলুম, তখন আমার সামনে বলেছিল—তা তুমি যখন বারণ করছ প্রকাশদা, তখন আর দেব না। কিন্তু তারপর বোধহয় মুখ এড়াতে পারে নি—লুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কে বন্ধু তা তো বলে নি। এর মধ্যে আমাদের আপিসে তিনজনের বোনের বে হয়েছে, হয়ত ওর পাড়া-ঘরেও কাউকে দিয়ে থাকতে পারে—ক্লাবের বন্ধুও তো বেস্তর, তিনটে ক্লাবে থিয়েটার করত ও—কাকে ধরব বলুন?'

এসব বাদ দিয়ে বাকি যা—তাও সবটা পেল না তরু।

সাহেবরা বললেন, 'তাহ'লে আদালত থেকে সাক্‌সেশ্যান্ সার্টিফিকেট দিতে হবে। নইলে যেখানে দুই স্ত্রী বর্তমান এবং প্রথম স্ত্রী ইতিমধ্যেই নোটিশ নিয়ে এর অর্ধেক দাবী করেছেন—সেখানে আমরা ওকে সব টাকাটা তো দিতে পারি না।'

ঐ টাকার জন্য সাকসেশ্যান সার্টিফিকেটই বা নেয় কে! ওরা হয়ত সেখানেও আপত্তি করবে, সেও দীর্ঘকাল কোর্টঘর করতে হবে। হারানের প্রথম পক্ষের শ্বশুর নাকি বিখ্যাত মামলাবাজ, তার পয়সাও আছে সময়ও আছে—তার সঙ্গে হেম পেরে উঠবে কেন? অতএব বিনা মামলায় যে অর্ধেক টাকা পাওয়া গেল তাই নিয়ে এল হেম।

টাকাটা নেবার সময় হেমের সঙ্গে তরুকে যেতে হয়েছিল। মূর্তিমতী বিষাদের মতো নির্বাক স্তম্ভিত তরুকে দেখে ওর অল্পবয়সের কথা চিন্তা করে সাহেবরা খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন—নিজেরা পকেট থেকে যে যা পারলেন দিয়ে আরও শ আড়াই টাকা ক'রে দিলেন—কিন্তু তা মিলিয়েও দু হাজার টাকা পুরো হ'ল না।

ঐ সামান্য টাকা, কিছু বাসনকোশন, একটা সিন্দুক এবং কিছু কাপড়জামা ও গোটা দুই পুরনো তোরঙ্গ নিয়ে এক মেঘমেদুর অপরাহ্নে তরু আবারও বাপের বাড়ি এসে উঠল—দীর্ঘকাল হয়ত বা চিরকালের জন্যই। ঐ একরত্তি গুঁড়োটুকু যদি মানুষ হয়ে উঠে কোন দিন আবার সংসার পাততে পারে, তবেই আবার স্বাধীন হবে তরু—না হ'লে আর কোন আশা আর ওর জীবনে রইল না কোথাও।

ওকে দেখে শ্যামা ও কনক হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠলেন কিন্তু তরু কাঁদল না, কাঁদতে পারল না—শান্তভাবে এসে রান্নাঘরের দাওয়াটায় বসে পড়ল। তার শূন্য উদাস দৃষ্টির দিকে চেয়ে কনকের যেন ভয় ভয় করতে লাগল। এইরকমই হয়ে থাকবে নাকি?

আবার মনে হ'ল—না, ছেলে যখন আছে তখন ওকে অবলম্বন করেই আবার বুক বাঁধতে পারবে, শক্ত হয়ে দাঁড়াবে আবার।......

॥ ৩ ॥

এবার তরু আসার কয়েকদিন পরেই কোথা থেকে ঐন্দ্রিলা এসে হাজির হ'ল। কেন এল কদিনের জন্য এল, তা কেউ জিজ্ঞাসা করল না তাকে, সেও বলল না। তবে সঙ্গে কাপড়-চোপড়ের পুঁটুলিটা দেখে মনে হ'ল হয়ত যেখানে কাজ করছিল এতদিন, সেখানকার কাজ ছেড়েই চলে এসেছে।

অর্থাৎ বেশ কিছুকাল স্থিতি এবার।

ওকে দেখেই যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন এঁরা কিন্তু এবার আর সে তরুর দুর্ভাগ্যে সে রকম উল্লাস প্রকাশ করল না, বরং দু'ফোঁটা চোখের জলই ফেলল। তবে এও বলল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, 'তাও তো তুই জিতে গেলি রে!... হাজার হোক তোর তো ছেলে, কোনমতে যদি বেঁচে থাকে বড় হয়ে মোট বয়েও খাওয়াবে। একদিন স্বাধীনভাবে বেটার সংসারে বসে খেতে পারবি।...আমার মতো মেয়ে নিয়ে তো জ্বলেপুড়ে মরতে হবে না। এই পরের বাড়ি হাঁড়ি-হেঁসেলের সঙ্গে যুদ্ধ করে যা ঐ পাঠাচ্ছি, তাই মেয়ে খেতে পাচ্ছে। খুব বিয়ে হ'ল মেয়ের! জামাইয়ের ছেলেরা তো দয়া করে দুটি চাল ফেলে দেয় ভিক্ষের মতো। তাও বলে, বাপকে খাওয়াতে পারি—তার মেয়েমানুষকে খাওয়াতে যাব কিসের জন্যে? নতুন মা কি ছোট মা বলে না—বলে বাপের মেয়েমানুষ!'

এ খবরটা এদের জানা ছিল না। তাই যদি হয় তো কাজ ছেড়ে দিয়ে এল কিসের ভরসায় তাও বুঝতে পারে না। অবশেষে কনকই কথাটা বার করলে। অথবা ঐন্দ্রিলাই বলবার সুযোগ খুঁজছিল, বলতে পেয়ে বেঁচে গেল সে। কারণ, তারও না বললে নয়। ও পক্ষ থেকে কৌতূহল প্রকাশ পাওয়াতে তার সুবিধাই হ'ল।

আর, সে জানে এ বাড়ির মধ্যে একমাত্র কনকই যা সহানুভূতির সঙ্গে শুনবে সব কথা। মা কি দাদাকে বলতে গেলে হয়ত সূচনাতেই থামিয়ে দেবে। বরং কনকই তাদের শোনাতে পারবে। কনকের দ্বারা তার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হ'তে পারে।

কাজ ঐন্দ্রিলা ছেড়ে আসে নি, তারাই ছাড়িয়ে দিয়েছে।

মেয়েকে টাকা পাঠাতে হয় নিয়মিত। কিন্তু কীই বা পাঠাতে পারে সে। পায়ই তো খাওয়া-পরা আর মোটে আটটি টাকা মাইনে। আট টাকাই পাঠাত সে, নিজের জন্যে এক পয়সাও না রেখে—কিন্তু তাতেও সীতার কুলোয় না। শুধু ধান ছাড়া সতাতো ছেলেরা কিছু দেবে না, ধান ভেনে চাল ক'রে নিতে হয় সীতাকে। ঐ চাল আর বাগানে যা আনাজ-পাতি হয়—এই ভরসা। তাও দেয় ভিক্ষের মতো, নিজে থেকে নিতে গেলে যাচ্ছেতাই অপমান করে। বলে, 'এ কী তোর বাপের সম্পত্তি পেয়েছিস?' বুড়ো কিছু বলতে সাহস পায় না—ছেলেরা গুণ্ডার মতো রাগী, বদ-মেজাজী—তারা বাপের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, মামলা-মোকদ্দমা করতে গেলে প্রাণে বাঁচবে না। ওরা 'গুম-খুন' করে ফেলবে। বুড়োমানুষ প্রাণের ভয়ে যেন জন্তুর মতো হয়ে গেছে—সব অপমান নিঃশব্দে হজম করে।...এর ভেতর গত শীতের সময় সীতা চিঠি লিখল যে, গায়ে দেবার লেপ কুটি কুটি হয়ে গেছে, পরনে একটা গোটা কাপড় পর্যন্ত নেই; শীতে বিষম কষ্ট পাচ্ছে। ছেলেদের বলতে দুখানা পুরনো কাঁথা বার ক'রে দিয়েছে, তাতে শীত ভাঙ্গে না। আরও, সীতার মা টাকা পাঠায় একথা তারা টের পেয়েছে—সেই জন্যে এখন কিছুই দিতে চায় না। ওদের ধারণা

মোটামুটি কিছু পাঠায়। দোষ এদেরই—সীতা পাড়ার একটি ভদ্রলোকের ঠিকানা দিয়েছিল, ঐন্দ্রিলা সেখানেই টাকা পাঠাত মনিঅর্ডার ক'রে, তিনি নিয়ে ওকে দিতেন। তাইতেই কত পাঠায় তা তারা জানতে পারে নি—পাঠায় এটা জেনেছে। না জানিয়ে উপায়ও নেই তো, এক বাড়িতে থাকা, খরচ করলেই ধরা পড়বে যে কোথাও থেকে টাকা আসছে। এখন বাড়িতেই পাঠায় অবশ্য, তাও তারা বিশ্বাস করে না—ভাবে যে ওখানে লুকিয়ে আরও কিছু আসে। এখন কিছু চাইতে গেলে বলে, বড়লোক মা মোট-মোট টাকা পাঠাচ্ছে, সেটা জমিয়ে আমাদের কাছে ভাগের ভাগ চাইতে এসেছ বুঝি? ও-সব হবে-টবে না, ঐ টাকা ভাঙিয়ে খরচ করগে!'......

সীতার ঐ চিঠি পেয়ে ঐন্দ্রিলার মাথা খারাপ হয়ে গেল। একবার ভাবল এখানে এসে এদের কাছ থেকে কিছু চায়। কিন্তু মা কিছু দেবে না তা সে জানত। এক দিলে দিতে পারে দিদি—তা সে হয়ত বড়জোর দশটা টাকা দেবে—ওর যাওয়া-আসায় গাড়ি-ভাড়াই পড়ে যাবে ছ'টাকার ওপর—লাভ কী হবে?

অকূল-পাথার ভাবনা—কাউকে জানাবার কি পরামর্শ করবার লোক নেই। বাবুরা আগাম দিতে পারে—কিন্তু তাতে মাসের টাকা পাঠাতে পারবে না। কোন লোক না পেয়ে সে ওদের ঝি-স্থানীয় একটি মেয়ে একাদশীকে মনের কথা জানিয়েছিল, পরামর্শ চেয়েছিল তার কাছে। একাদশী বোধ হয় এই সুযোগই খুঁজছিল বহুদিন থেকে—ঐন্দ্রিলার চাল-চলন দেখে কিছু বলতে সাহস করে নি। সে বললে, 'তেল-ঘি-চাল-ডাল সবই তো তোমার হাতে, কিছু কিছু সরাও, আমি লুকিয়ে বেচে দেব।' প্রথমটা খুব আপত্তি করেছিল ঐন্দ্রিলা। কিন্তু একাদশী বোঝাল যে, এতে কোন দোষ নেই, সবাই তাই করে। তাছাড়া ব্রাহ্মণের মেয়ে দু-বেলা আগুন-তাতে মুখের রক্ত তুলে মরছে—তাকে ঐ আটটি টাকা দেওয়া এদের মানুষের মতো কাজ হচ্ছে? এদের কি টাকার অভাব আছে কিছু? যেমন-কে-তেমনি-জব্দ করা উচিত চুরি করেই।

ক্রমশ ঐন্দ্রিলাও বুঝল, গরজ বড় বালাই। না বুঝে তখন আর উপায় ছিল না। অন্তত কোন উপায় সে দেখতে পায় নি।

ঐন্দ্রিলা কিছু কিছু সরাতে শুরু করতেই একাদশী আগাম দশটা টাকা এনে দিল কোথা থেকে। সে হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেল। কিন্তু তারপরই ভুল বুঝতে পারল। একাদশীর চাপ বড় বেশী, তার খাঁই আর মেটে না। সে চায় ঐন্দ্রিলা পুকুর চুরি করুক। ঐন্দ্রিলার অত সাহস হ'ত না। তা ছাড়া, সে বুঝেছিল যে এর বেশির ভাগই—টাকায় বারো আনা—উঠছে একাদশীর ঘরে। শেষে একাদশী ওকে ভয় দেখাতে শুরু করল। চুরি না করলে বাবুদের বলে দেবে এমন ভয়ও দেখাল। ঐন্দ্রিলা ভয়ে দিশেহারা হয়ে একাদশীকে খুশী করতে—অর্থাৎ চুরির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হ'ল।

টাকাটা যেত মনিঅর্ডারে—ঠিকানাটা থাকত একাদশীর। স্থানীয় ডাকঘর—পোস্ট-মাস্টার বাবুদের সবাইকে চেনেন। তাঁর সন্দেহ হ'তে তিনি গোপনে এঁদের জানালেন। বাবুরা তক্কে তক্কে থেকে যে মুদীর দোকানে একাদশী আধাকড়িতে মাল বেচত—তাকে ও একাদশীকে হাতে-নাতে ধরে ফেললেন। মারের চোটে সব কথাই বেরিয়ে পড়ল। ঐন্দ্রিলা সামনা-সামনি অস্বীকার করতে পারল না। করলেই বা তাঁরা শুনবেন কেন? ওর যোগসাজস ছাড়া এসব জিনিস বেরোনো সম্ভব নয়। ওকেই তাঁরা বিশ্বাস করতেন সবচেয়ে বেশী, ঝি-চাকরের ভাঁড়ারে যাওয়ার নিয়ম ছিল না।

বামুনের মেয়ে ব'লে মার-ধোর করলেন না—শুধু তখনই বিদায় করে দিলেন—

খাড়া খাড়া, সেই দিনই।

অথচ বিপদের ওপর বিপদ—মাসখানেক আগেই চিঠি পেয়েছে—সীতা অন্তঃসত্ত্বা। কিছু বেশী টাকা তাকে না পাঠালেই নয়। এমনিই তো মাস-কাবারে টাকা না পাঠালে তারা শুকিয়ে মরবে। অথচ সে টাকাই বা কোথা থেকে পাবে। বাবুরা টিকিটটা কিনে দিয়েছেন তবু দয়া করে—নইলে তো ভিক্ষে ক'রে আসতে হ'ত!...

দীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত ক'রে কনকের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চায়, 'তুমি ভাই দাও একটা ব্যবস্থা ক'রে—নইলে মেয়েটা শুকিয়ে মরবে। এই প্রথম পোয়াতী, কোথায় ভাল-মন্দ খাওয়াবার কথা, তায় একেবারেই উপোসের ব্যবস্থা। লক্ষ্মী ভাই বৌদি, আমি কাজকর্ম খুঁজে নেবই একটা, মাসে এক টাকা ক'রেও অন্ততঃ শোধ করব ; তোমার কোন ভয় নেই!'

কনক তো অবাক।

'তুমি কি ভাই ঠাকুরঝি তোমার দাদাকে চেন না? একটা টাকাও কি আমার হাতে দেয় কোন দিন? সেই মানুষ কি? আমি কোথায় পাব?'

'কিছু দেয় না তোমাকে? তুমি কিছু জমাও নি? ওমা, তবে আর বরকে কি হাত করলে? ছেলে হয়েছে—এখন তো তোমার জোর।...কিছু নেই তোমার হাতে এ আমি বিশ্বাস করি না। দেবে না তাই বলো!'

অনেক দিব্যি-দিলেশার পর খানিকটা বিশ্বাস করে।

তখন অন্য অনুরোধ, 'তুমি একটু মাকে কি দাদাকে বুঝিয়ে বলো। মা তো সুদে টাকা খাটায়—আমি সুদ দোব। কুড়িটা টাকা আমাকে ধারই দিক!'

এ অনুরোধের ফল কি হবে তা তো জানাই—ঐন্দ্রিলারও জানা উচিত, কারণ সে মাকে কনকের চেয়ে অনেক বেশী দিন দেখেছে—তবু ওর অনুনয় ও মিনতি এড়াতে না পেরে বলবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

রাত্রে হেমের কাছে কথাটা পাড়বার উপক্রম করতেই সে বলে, 'ওসব প্যান-প্যানানিতে কান দেবার তোমার দরকার কী? ওর সঙ্গে আত্মীয়তা করতে যাও কেন? কী গুণের বোন আমার! খাচ্ছে-দাচ্ছে সে-ই ঢের, তার ওপর আবার দক্ষিণে দিতে পারব না। টাকা এত সস্তা নয় আমার!'

হেমের এ গলার আওয়াজ এতদিনে ভালই চিনেছে কনক। এর ওপর কথা কইতে যাওয়াই বৃথা।

পরের দিন শাশুড়ীকে বলতে গিয়ে আরও কর্কশ কথা শুনতে হ'ল।

'কেন, তোমাকে উকীল পাক্ড়ে বলতে হ'ল কেন? তাঁর মুখ কি হ'ল? সে পোড়ার-মুখ তো এখনও পোড়ে নি, সে তো ঠিক আছে।...আসলে বুঝেছে যে এখন বৌদিই বাড়ির গিন্নী, গিন্নী বললে মা মাগী ভয়ে ভয়ে দিতে পথ পাবে না। দাসী-বাঁদী বৈ তো নয় মা।...তা এতই যখন গিন্নী হয়েছ বাছা, টাকার জন্যে সুপারিশ করতে এসেছ কেন—তুমিই ফেলে দাও না টাকা কটা! ভাতার তো মোট মোট টাকা এনে শ্রীপাদপদ্মে ঢালছে, সে কি আর আমরা টের পাই না?—না, আমরা ধানের চালের ভাত খাই না। বেটা বিইয়ে দিয়ে ভাতারের সো হয়েছ—এখন তো হাতের মুঠোর মধ্যে ভাতার।...টাকাটা ফেলে দিলেই পারতে—ছলনা ক'রে আবার আমাকে বলতে এসেছ কেন? লোক-দেখানো কাষ্টনৌকতা না করলেই নয়?'

অবশ্য মেয়ের উদ্দেশ্যেও হ'ল তারপর, 'সুদের কড়ারে টাকা ধার করতে এসে-ছেন উনি—দেবে কে ও'কে, কিসের ভরসায় দেবে? ভারী তো ও'র মুরোদ—বলে

টিকে ধরাতে জামিন লাগে, সম্পত্তি বলতে আধ পয়সার জিনিস নেই কোথাও—উনি আবার বড় গলায় সুদের লোভ দেখান। এত যখন দরের মানুষ হয়েছেন উনি—যান না, বাজারে মহাজনের অভাব আছে! কাকে কত সুদের লোভ দেখাতে পারেন—দেখিয়ে আসুন না!'

এসব কথা বলা যায় না ঐন্দ্রিলাকে, বলতে পারেও না কনক। শুধু টাকাটা পাওয়া যাবে না, ও'রা দিতে পারবেন না—এই কথাটাই বলে। ফলে ঐন্দ্রিলা মনে করে, কনক বিশেষ কোন চেষ্টাই করে নি—হয়ত আদৌ কোন চেষ্টা করে নি। সে কনকের ওপর পর্যন্ত বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে।

দিনকতক ছট-ফট ক'রে শেষে একদিন তরুকে গিয়ে ধরে, 'এই, তোর হাতে তো টাকা আছে—হাতে না থাক, তোরই তো টাকা—মাকে বল্‌ আমায় কুড়িটা টাকা ধার দিতে—আমি তোকে দুটাকা বাড়িয়ে বাইশ টাকা ক'রে শোধ দোব। হয়ত এক মাসেই পারব না—তিন-চার মাসে শোধ করব, তবে ঐ টাকাটা পুষিয়ে দোব।

তরু হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না, উদাসীন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আজকাল তার সঙ্গে কথা কইতে গেলে বক্তার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে বটে, তবে তার মুখ দেখে বোঝা যায় না কথাগুলো সে শুনতে পাচ্ছে কি না।

'কী লো দিবি—না দিবি না? সেইটে পষ্ট বলে দে না বাবু।'

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে ঐন্দ্রিলা অল্পক্ষণেই।

তাতেও কোন জবাব না পেয়ে নিজমূর্তি ধরে সে, 'নেকী! কত কল্লাই জানিস্‌ মাইরি!...এই কল্লা ক'রে মা-ভাইকে তো ভুলিয়েও রাখিস! আমরা এসব কিছু শিখলুম না বলেই আমরা চিরকাল পাজী বদমাইশ হয়ে রইলুম সকলের কাছে। আমরাও একদিন হাত-শুধু ক'রে এসেছিলুম এ বাড়িতে—তোর চেয়ে ঢের কম বয়েস—তবু কেউ আহা-উহু করে নি। আমরা যে কল্লা শিখি নি—তার কী হবে!'

কিন্তু এসব কথারও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না—অব্যর্থ অস্ত্র পাষাণ-প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে যেন। এবার ঐন্দ্রিলা ছিটকে উঠোনে নামে, গলা চড়িয়ে মাকে উদ্দেশ করে বলে, 'এত টাকা আসছে—এক-এক জন গিয়ে শয়ে চড়ছে আর সিন্দুক-ভরা বাসন, বাক্স-ভরা টাকা তো এসে ঢুকছে ও'র পেটে—তবু পয়সার মায়া এত! নিজের মেয়ে-নাতনীকে একটা পয়সা দেওয়া যায় না! আর কত লোকের সব্বনাশের পয়সা খাবেন উনি, কত খেলে ও'র পেট ভরে—সেইটে জানতে পারলে যে হ'ত! কাউকে রেখে যাবেন না উনি, সব কটিকে গব্বায় পুরবেন—তবে যাবেন। তখন ঐ বাসন আর পয়সা পাঁচভূতে খাবে, এই বলে দিলুম। আমাদের সঙ্গে-বঙ্গে করা ঐ পয়সা!'

মর্মান্তিক আঘাত, শ্যামার বুকেও তা প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। কদিন আগে তরুর বাসনের সিন্দুক যখন নামছে তখন তিনি নিজেই সেই কথা ভেবেছেন। এত জিনিসের শখ তাঁর—কিন্তু এ কী জিনিস আসছে, এ তো তিনি চান নি। ভগবান তার আকাঙ্ক্ষাকে এ কী পরিহাস করছেন। আর মেয়ের এই কথায় সেই ক্ষত-টাই আবার দগ্‌দগিয়ে উঠল যেন। তাঁর মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠে আবার তা বিবর্ণ হয়ে গেল। চোখে জলও এসে পড়ল। তবু তিনি প্রাণপণে আত্মসম্বরণই করলেন। তরল ময়লায় ঢিল ছুঁড়লে সে ময়লা ছিটকে নিজের গায়েও এসে লাগে। দরকার নেই।

এর পর ঐন্দ্রিলার হিংসা ও হিংস্রতা নিরাবরণ হয়ে উঠল। একটু শান্ত থাকত শুধু হেমের বাড়ি থাকার সময়টায়। সে অফিসে চলে গেলেই নিজমূর্তি ধারণ

করত। অকারণ গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করত—সেটা ঠিক বাধত না বলেই আরও ক্ষেপে যেত যেন। গালাগাল দিয়ে চেঁচিয়ে অভিসম্পাত ক'রে জীবন দুর্বহ ক'রে তুলত সবাইকার। বোধ হয় এটুকু সে বুঝে নিয়েছিল যে, যাকে লাগানো-ভাঙানো বলে—কনক তা করবে না। অন্তত তার সব অত্যাচারের কথা পুরোপুরি হেমের কাছে বলবে না। মা-ও—বললে খানিকটা বলবে, সবটা বলতে পারবে না।

অসহ্য হ'ত অবশ্য শ্যামারই। শুধু তাঁকে বললে অত গায়ে লাগত না তাঁর—কিন্তু সদ্যোবিধবা ঐ মেয়েটা—একে শোকে-দুঃখে নীরব নিথর হয়ে গেছে—ওকে যখন আক্রমণ করত, অসহ্য কটু কথা শোনাত—তখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ রাখা অসম্ভব হয়ে উঠত এক একদিন। কিন্তু প্রতিবাদ বা তিরস্কারে কোনই ফল হ'ত না। এমন কাণ্ড করত ঐন্দ্রিলা, আরও অজস্র কুবাক্য এমন জলপ্রপাতের মতো অবিরল ধারায় বেরিয়ে আসত তার মুখ দিয়ে—যথাযথ অঙ্গভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরের সহযোগিতায় যে, সেদিক দিয়ে তার ওপরে ওঠা কোন ভদ্রমহিলার পক্ষেই সম্ভব নয়। কনক অবাক হয়ে যেত এইসব শুনে। সে ভেবে পেত না যে ও এত শিখলে কোথায়, শিখলে কার কাছে! এ সবই কি অন্যত্র শুনে শেখা ওর—না স্বকপোল-কল্পনা?

'বেরিয়ে যাও', 'দূর হয়ে যাও' এসব বলেও কোন ফল হ'ত না। সদম্ভে জবাব দিত ঐন্দ্রিলা, 'কেন, কিসের জন্যে বেরোব আমি? আমি শুনেছি মায়ের সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার বেশী। বাড়ি তোমার নামে—আমি তো জোরের সঙ্গে থাকব। চিরকাল বাঁচবে নাকি তুমি? আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে এসেছ?......মরতে হবে না একদিন ভেবেছ? তখন তো এ-সব আমাদের হবে।...তবে কিসের জোর তোমার? এক মেয়ে যখন বসে আছে আমিই বা বসে থাকব না কেন? আমি তোমার মেয়ে নই? তাড়াতে হ'লে ওকেও তাড়াও।' ইত্যাদি।

পাগলকে যুক্তি দিতে যাওয়া বৃথা। বিশেষ সে এমনই চিৎকার করে যে তার ওপর গলা চড়িয়ে ওকে কোন কথা শোনাবেন—সে ক্ষমতা শ্যামার আর আজকাল নেই। অত চেঁচাতে গেলে তাঁর কষ্ট হয়।

এক উপায় হেমকে বলা। কিন্তু সে হয়ত মার-ধোর করবে শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে। সে এক কেলেঙ্কারী। এমনিই তো পাড়াঘরে মুখ দেখাতে লজ্জা করে তাঁর। তা-ছাড়া, বয়স হ'লেও ঐন্দ্রিলার সে অসামান্য রূপ এখনও এমন কিছু নষ্ট হয় নি--শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার আর পথ নেই তার, মেয়ে তো বলতে গেলে ভিখিরী—তাড়িয়ে দিলেই বা কোথায় কার কাছে গিয়ে উঠবে। হয়ত গুণ্ডা-বদমাইশের পাল্লায় পড়বে—কে কোন্ দিকে টেনে নিয়ে যাবে তার ঠিক কি! আরও সেই ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেন। চাকরি-বাকরি কি আর একটা জুটবে না। সে তবু কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকা, কতকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। পাজী হোক—বজ্জাত হোক—নিজে থেকে স্বেচ্ছায় খারাপ পথে পা দেবে না ও—সে বিষয়ে শ্যামা নিশ্চিন্ত।

মধ্যে মধ্যে আজকাল বেরিয়েও যায়—তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা, কোন কোন দিন বা আরও বেশীক্ষণ অনুপস্থিত থাকে। কাজের জন্য ঘুরছে কি টাকা ধার করতে—তা ঠিক বুঝতে পারেন না। সম্ভবত দুই উদ্দেশ্যেই।......যাই হোক—সেই সময়টা একটু শান্তিতে, একটু স্বস্তিতে থাকেন।......

এর মধ্যে একদিন একখানা মনিঅর্ডারের রসিদ ফিরে এল। সীতার নামে কুড়ি টাকা পাঠানো হয়েছিল, তারই রসিদ। কোথা থেকে টাকাটা পেলে ও? দুর্ভাবনায়

মুখটা কালো হয়ে উঠল শ্যামার! অন্য কোথাও ধার করে করুক—কুটুমবাড়িতে মুখটা পোড়াচ্ছে না তো? অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি খোকাকে পাঠালেন মহাশ্বেতার কাছে। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করে আসবে।

খোকাকে এখানের স্কুলে ভর্তি করা হয় নি। ওখান থেকে ছাড়িয়ে সার্টিফিকেট আনিয়ে এখানে ভর্তি করতে গেলে নাকি এক গাদা টাকা খরচা। হেম বলেছে, এখন বাড়িতে পড়ুক, আসছে জানুয়ারীতে কোথাও পড়ে না বলে এখানকার ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবে—তাতে টাকা অনেক কম লাগবে। শ্যামা আপত্তি করেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে কমলার ওখানেই থাক, কমলাও রাজী ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ রাজী হয় নি। অল্প যে ক'দিন ছিল ওখানে—গোবিন্দ ওকে লক্ষ্য করেছে। সে নাকি বলেছে যে, 'ও ছেলের হাবভাব ভাল নয়, বাইরে অমনি ঠাণ্ডা ভিজে বেড়ালের মতো থাকে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ও বিগড়ে গেছে। ওকে রাখবে—তারপর যদি কিছু হয়, আরও বকে যায় তো আজীবন খোঁটা শুনতে হবে মাসীর কাছ থেকে। পয়সা কে পয়সাও যাবে—একটা ছেলেকে রেখে তার খরচা টানা কি সোজা—আমার গুনিও তো বড় হচ্ছে—মিছিমিছি তার ওপর দুর্নাম কিনি কেন!'

গোবিন্দর এ কথা হেম গোপন করে নি। শ্যামা খুবই চটে গেছেন তাতে। বলেছেন, 'আসলে খরচার কথাই বড় কথা। অতগুলো লোক খাচ্ছে, আমার ছেলে কি একেবারে য্যাত য্যাত খেত!......না হয় ইস্কুলের মাইনে, জামা-কাপড় আমিই দিতুম। শুধু খোরাকীটা--তাও দিতে পারলে না!......সেই বলে না—ধান ভানাবি গা?—না না ভানাবার গা! তা পারবি না পারবি না—মিছি-মিছি একটা দুর্নাম দেবার দরকার কি? আমার ঐটুকু গুয়ের গোবলা ছেলে—চোদ্দ-পনরো বছর বয়স হয়েছে—এর মধ্যে ও কী বিগড়ে গেল? কী বিগড়ে যেতে দেখলেন তিনি! একটা গেছে বলে কি সব কটাই যাবে? তাও সে গেছে বলে কি আর ঐ বয়সে গেছে!' ইত্যাদি—

এ তো শুধু হেমের সামনে। হেমের আড়ালে গোবিন্দ সম্বন্ধে আরও যে-সব মন্তব্য করেছেন, তা ভদ্রতার সীমায় আবদ্ধ থাকে নি—বলাই বাহুল্য।

খোকা ফিরে আসতে বোঝা গেল, তাঁর আশঙ্কাই ঠিক। তাও মহাশ্বেতা নয়—চেয়েছে জামাইয়ের কাছেই, তাঁর মুখটা ভাল ক'রেই পুড়িয়ে এসেছে।

মহাশ্বেতা বলেছে, 'আমিই তো বললুম ছুঁড়িকে—যা না, তোর দাদাবাবুকে গিয়ে ধর না। আমিও হয়ত দিতে পারি—কিন্তু সে আর কত, পাঁচটা সাতটা না হয় বড় জোর দশটা। তা সে থাক না, তোর কি আর দরকার হবে না? এযাত্রা তোর দাদাবাবুকে গিয়ে বলগে যা সব দুঃখু জানিয়ে—দিয়ে দিতে পারে। তা মিনসেও তো তেমনি, নিজের কাছে কি এক পয়সা রাখে—সব তো এনে ঐ মহারাজার শ্রীপাদপদ্মে। সুদে খাটায় যে টাকা সেই টাকা শুধু থাকে, তা তা থেকে দেবে না আমি জানি—আর সে পড়েও থাকে না। সে খাটেও তো আমার টাকাই বেশী। তা বলবামাত্তরই ওর দাদাবাবু মেজকত্তাকে গিয়ে বললে—এক রকম দায়ে পড়েই, কী করবে এখন? কী ভাগ্যি মেজভাই সংগে সংগে সুড়সুড় করে টাকাটা বার করে দিলে। এও বলে দিয়েছে যে—এ আর শোধ দিতে হবে না, এ তোমার মেয়েকে আমরা দিলুম। দিয়েছে তাই—না দিলে কি আমি অমনি ছাড়তুম নাকি, ওর শালীর ছেলেকে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে না?'

আবার বলেছে, 'তা মারই বা কী আক্কেল—হাজার হোক পেটের মেয়েই তো—পর তো আর নয়! মেয়ে আর নাতনী—একটা দুঃসময়ে পড়েছে—ঐ কটা টাকা দিতে

পারলে না! এই যে সুদে খাটাচ্ছে টাকা—কিছু কি আর মারা পড়ে না? না হয় ভাবত যে তেমনি মারাই পড়েছে। বলিস মাকে যে কথাটা শুনে দিদি খুব অসন্তোষ হয়েছে।'

খোকা আনুপূর্বিক এসে বলে মাকে—যা যা দিদি বলেছে, সব।

শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন শ্যামা, 'তবেই তো আমি তাঁর ভয়ে ইঁদুরের গর্ত খুঁজতে বেরোলুম আর কি—লুকোবার জন্যে। এত যদি তোর টান নিজে দিলি নে কেন—আমার মুখটা পোড়াতে জামাইয়ের কাছে পাঠাতে গেলি কেন।......সারা কুটুমবাড়িময় জানাজানি হয়ে গেল—মুখটা পুড়তে কোথাও আর বাকী রইল না। বুদ্ধি না থাকে, হায়াপিত্তিও তো থাকে মানুষের—তুই কী বলে জামাইয়ের কাছে পাঠাতে গেলি! হাত্তোর ভাল হোক রে!'

তিনি বহুক্ষণ পর্যন্ত গজরাতে থাকেন।

॥ ৪ ॥

অশান্তি কমে না—বেড়েই যায় দিন দিন। ঐন্দ্রিলা খুবই ঘুরছে চাকরির জন্যে কিন্তু চাকরি কোথাও পাচ্ছে না ভালমতো। একজনরা রাজী হয়েছিলেন, মাইনেও পুরো দশটা টাকাই দিতে চেয়েছিলেন—তাছাড়া একাদশীতে একাদশীতে দু'আনা করে পয়সা—কিন্তু ঐন্দ্রিলাই পিছিয়ে এল শেষ পর্যন্ত। শোনা গেল লোকপরম্পরায় সে বাড়ীতে নাকি কোন ঝি-রাঁধুনী দশদিনের বেশী টেকে না—কর্তার দোষ আছে। কর্তাই দেখে শুনে পছন্দ করে নেন—অল্পবয়সী না হলে পছন্দ হয় না তাঁর, ইত্যাদি। এসব শুনে আর সাহস হয় না সে বাড়ীতে কাজে যেতে।

এধারে যত দেরি হয়—ততই মেজাজ আরও খারাপ হ'তে থাকে তাব। মাস শেষ হতে চলল—মেয়েকে আবার টাকা পাঠাবার সময় হয়ে এল। আর কোথায়ই বা পাবে টাকা। এখন কাজ ধরলেও এক মাস পরে টাকা—অথচ এখন কাজই ধরতে পারল না। ফলে মনের সব দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা বিষ হয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। সারাদিনই চেঁচামেচি করে সে—যতক্ষণ বাড়িতে থাকে। কাকচিল বসতে দেয় না বাড়িতে—এমন চিৎকার করে।

কনকের আর যেন সহ্য হয় না। দম বন্ধ হয়ে আসে তার। সারাদিনে ছেলেকে ঘুম পাড়াতে পারে না সে, ননদের চেঁচানির চোটে।

আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে ইদানীং—শাশুড়ীর অহেতুক বিদ্বেষ তার প্রতি।

এটার কোন মানেই বুঝতে পারে না কনক। সে কি দোষ করল? প্রাণপণে খাটছে সংসারে, সকলের সেবা করছে—শাশুড়ীও তার বিশেষ খুঁত ধরতে পারেন না আজকাল। সেও তো তাঁর মন-যুগিয়ে চলবারই চেষ্টা করছে অহরহ।...মেয়ের প্রতি যে রোষ রুদ্ধ আবেগে জমতে থাকে মনের মধ্যে, প্রকাশের পথ খুঁজে পায় না—সেটাই যেন তির্যক গতিতে এসে ওর ওপর আছড়ে পড়ে। বৌয়ের ওপর আক্রোশ চেপে থাকার প্রয়োজন হয় না—কারণ সে প্রতিবাদ করতে পারবে না, করতে সাহস করবে না—সেই ভরসাতে নিশ্চিন্ত হয়েই সব বিষটা ঐখানে উদ্গার করেন। দিনে দিনে সে আক্রোশটা যেন বড় বেশী উগ্র বড় বেশী প্রকট হয়ে উঠছে। কনক অনেক সয়েছে এ-বাড়িতে এসে, অনেক কিছুর জন্যই প্রস্তুত থাকে সে আজকাল—কিন্তু তারও সহ্যের সীমা যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আগে সে ভাবত যে সব রকম লাঞ্ছনাই

তার গা-সওয়া হয়ে গেছে—এখন চোখের জলে বুঝেছে যে তার অভিজ্ঞতা খুবই সীমাবদ্ধ। এমনই কথা বলেন শ্যামা—এমন চোখা চোখা আঘাত করেন কথার দ্বারা—যে কনকের মনে হয় এর চেয়ে হাত দিয়ে মারা ঢের ভাল ছিল। 'বাক্যবাণ' শব্দটা বহু লোকেই ব্যবহার করেন বটে কিন্তু সে বস্তুটি ঠিক কি তা কেউ জানে না। এখানে না এলে জানা সম্ভব নয়।

সবচেয়ে দুঃখ এই, আঘাতগুলো আসে সম্পূর্ণ অকারণেই—তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপলক্ষ ধরে। এ কেউ বিশ্বাসও করবে না বললে। সেই জন্যেই সে বলেও না হেমকে। তাছাড়াও, কেমন যেন বাধে তার—মার নামে নালিশ করবে ছেলের কাছে? ছেলে যদি ভুল বোঝে? হাজার হোক তার মা। এখনও সে স্বামীর মনোরাজ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করতে পেরেছে বলে মনে হয় না তার। হয়ত সে কনকের ওপরই বিমুখ হয়ে উঠবে।

বলে না—তবে হেম তার মুখ দেখে কিছু কিছু বুঝতে পারে বৈকি। প্রদীপের সামান্য আলোতেও ঢাকা পড়ে না এক একদিন। বোঝে যে তা মুখে না বললেও তার ব্যবহারে প্রকাশ পায়। হয়ত মুখে বলে না বলেই হেমের সহানুভূতি বেশী। সে যে সহ্য করছে—নালিশ করছে না, লাগাচ্ছে না তার কাছে—এতে শ্রদ্ধাই বাড়ছে হেমের। রানী বৌদি ঠিকই বলেছিল—এ রত্ন হেমই চিনতে পারে নি।

হেম একদিন নিজের কানেও শুনল। শনিবার বিকেলে কলকাতা যাবে বলে বেরিয়েও ফিরে এসেছিল সে—শরীরটা খারাপ লাগাতে। জ্বর জ্বর ভাব বলে এসে অন্ধকারেই শুয়ে পড়েছিল। শ্যামা টের পান নি। ছেলের সামনে একটু সতর্কই থাকেন তিনি। কত তুচ্ছ কারণে কী বিষ তিনি ঢালছেন শুনতে শুনতে অসহ্য হয়ে ওঠাতে হেম তেড়ে বেরিয়ে এল, 'ও কি হচ্ছে কি! ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো বুঝি? শক্ত মাটিতে দাঁত বসাতে পারো না—মেয়ের কাছে ধ্যাঁতানি খেয়ে সেই ঝালটা ওর ওপর ঝেড়ে গায়ের জ্বালা মেটাও—না?'

এর ফল যে ভাল হ'ল না—তা সহজেই অনুমেয়। ছেলেকে মনে মনে একটু সমীহ করলেও সামনাসামনি সেটা অস্বীকার করবার লোক নন শ্যামা। তিনি জানেন যে একেবার মেনে নিলে আর কোন দিন নিজের অধিকার মানাতে পারবেন না।

তিনি সামন তেজের সঙ্গেই জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তা মেটাই তো। তার জন্যে কী করবি কি? মারবি নাকি? সেইটে হ'লেই মাগপুজোর ষোড়শোপচার পূর্ণ হয়।...তুই তোর মেগের পা ধুয়ে পাদোক জল খেতে পারিস—আমি কেন খেতে যাব? আমার বাড়ী আমার ঘর।...বেশ করব বলব—না পোষায়, ভাল না লাগে মাগ ঘাড়ে করে বেরিয়ে যা। ভাবিস নি যে ঐ কুড়ি টেক্‌লো করে মাসে ঠেকিয়ে আমার মাথা কিনে রেখেছিস—না দিলে আমার দিন চলবে না। ব'লে তোর জন্মদাতাই আমাকে উপোস করিয়ে মারতে পারলে না—তা তুই!'

বৌয়ের ওপর ঝালটাও আর গোপন করবার দরকার হয় না।

'ভেড়ুয়া ভাতার পেয়েছিস, ভাবছিস দুনিয়ার সবাই তোকে ভয় ক'রে চলবে, না? বলা হয়েছে ওৎ পেতে শোন তোমার মা মাগী কি রকম বলে, দ্যাখো ব্যাভারটা। ...তা শোনানো তো হ'ল—এইবার কি হবে কি? আমার কাঁচা মাথাটা উলিয়ে নেবে তোর ভাতার? নাকি হেঁটে-কাঁটা ওপরে-কাঁটা দিয়ে উঠোনে পুঁতবে আমায়? যা পারে করতে বল—আর সাধ্যি থাকে তুইও আয়! হারামজাদার বংশ—হারামজাদী আমার সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ ক'রে দিলে গা! যেদিন থেকে ভিটেয় পা দিয়েছে সেইদিন থেকে অশান্তি। কী আয়পয় দেখেই বৌ এনেছি, আহা! এসে

পর্যন্ত মড়াই মরছে শুধু। সবাইকে খেয়ে উনি একা এখানে রাজত্ব করবেন! করাচ্ছি রাজত্ব তোমাকে। তেমন তেমন দেখব—খ্যাংরা মারতে মারতে বাড়ী থেকে দূর করে দেব। দেখি তোর কোন্ বাবা রাখে।'...

ঘরের মধ্যে রুদ্ধস্বরে কনক হেমকে বলে, 'কেন তুমি কথা কইতে গেলে। এই সওয়া আমি নিত্যি চার প্রহর সইছি—তুমি একদিন সইতে পারলে না? আরও বিষ বাড়লই শুধু। তোমার কি, তুমি তো দিনে বারো ঘন্টার ওপর বাইরে থাক—আমায় তো দিনরাত থাকতে হয়। এর পর আরও কি কান্ড হবে তা বুঝতে পারছ!' হেম গুম হয়ে বসে থাকে তখন, কথা কয় না।

রাত্রে স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে বলে, 'পীড়ন হচ্ছে বুঝতে পারি কিন্তু এতটা বুঝি নি। তুমিও তো বল নি কখনও?'

এ কথার কি উত্তর দেবে কনক! এইটুকুই হেমের পক্ষে যথেষ্ট সপ্রেম ব্যবহার, এই সামান্য স্নেহের সুরেই তার চোখে জল এসে গেছে। কথা কওয়ার শক্তিও নেই তখন।

হেম একটু চুপ করে থেকে আবারও বলে, 'কেন এমন করছে মা—যেন কী এক বিষের জ্বালায় ছিটফিটিয়ে বেড়াচ্ছে। কী করলে কি তুমি?'

এ কথারও উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ওর যা মাঝে মাঝে মনে হয় তা কাউকেই বলা সম্ভব নয়। ওর মনে হয় বিষ নয়—রীষ এটা...ও'র মেয়েরা একে একে এ জন্মের মতো সব সৌভাগ্য ঘুচিয়ে এসে ঢুকছে তাঁর কাছে—বৌ পরের মেয়ে, স্বামী-পুত্র নিয়ে মনের সুখে ঘর করবে কেন—যেন এই ধরনেরই ঈর্ষা একটা ও'র!

কথাটা ভাববে না বলেই মনে করে কনক, বড় নোংরা কথা, বড় খারাপ কথা—তবু ঘুরে-ফিরে বারবারই মাথায় আসে কথাটা। আজও, হেমের এই প্রশ্নে কথাটা মনে হ'তেই, শিউরে উঠে কথাটাকে মন থেকে তাড়াতে চাইল সে।

হেম ওর মনের কথাটা বুঝল না কিন্তু শিহরণটা টের পেল। সে আরও সস্নেহে ওকে একটু কাছে টেনে বলল, 'আর কটা দিন একটু ধৈর্য ধরে থাকো। আমি চেষ্টা করছি কিছুদিন থেকেই—বদলির অর্ডারও হয়ে গেছে—সেখানে কোয়ার্টার এখনও তৈরি হয় নি সব, কোয়ার্টার পেলেই চলে যাব। যা শুনছি, বড়জোর আর দুটো মাস।'

সংবাদটা এতই অপ্রত্যাশিত, এত আনন্দের যে, কনকের মনে হ'ল একটা চিৎকার করে সে উল্লাস প্রকাশ করে। পাবে সে—একদিন মুক্তি পাবে! তোমরা সবাই শোন—সে চলে যেতে পারবে এই জীবন্ত সমাধি থেকে!

কিন্তু এ সব আনন্দ ও অধীরতা মুখে প্রকাশ করতে নেই—এই অসহ সুখের মধ্যে সে জ্ঞান তার ছিল। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণই করল সে, মুখে শুধু প্রশ্ন করল, 'তারপর, এখানে?'

'এখানে মা রইল, তরু রইল—কান্তি রইল। যা হয় হবে—আমি আর ওদের কথা ভাবতে পারব না। ঢের ভেবেছি। কান্তেটা বলেছে সামনের বার এগজামিন দেবে, দিতে পারে দিক। মেসোমশাই বলেছেন যে, ও যদি এগজামিন দিতে চায় তো তাঁকে জানালেই তিনি ফীয়ের টাকা পাঠিয়ে দেবেন। পারে পাস করতে, একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখতে হবে। বড়দাকে বলেছি কোন বাঙ্গালী বাড়ির কাজ খুঁজতে—যা দু-চার পয়সা দেয়। সাহেবের চাকরি তো আর হবে না ওর দ্বারা। সরকারী কাজও পাবে না।'

তারপর একটু থেমে বললে, খোকাটাকে মনে করছি আমাদের সঙ্গে নিয়ে

যাব। তোমারও হাত-নুড়কুৎ হবে একটু—ওখানের ইস্কুলে ভর্তি করে দেব! তবু চোখে চোখে রাখা যাবে। কে জানে বড়দা কী বোঝে, সে তো বলে, ওর পিপুল পেকেছে, ওর আর কিছু হবে না।'......

কিন্তু গোবিন্দ যা-ই বলুক তার কথাটা যে এত শীগ্‌গির ফলে যাবে তা বোধহয় সেও ভাবে নি।

ঘটনাটা ত্বরান্বিত করলেন অবশ্য শ্যামাই।

অনেকদিন পরে এক কাঁদি ভাল কালীবৌ কলা পড়েছিল বাগানে। কদিন আগে কান্তিই সেটা কেটে নামিয়ে রেখেছে। সেদিন সকালে উঠে ছালা সরিয়ে শ্যামা দেখলেন, যে সবগুলোই পেকে উঠেছে, সেদিনই বিক্রীর ব্যবস্থা না করলে কালো হয়ে যাবে সব।

তিনি কান্তিকে বললেন, ওপরদিককার মাথার ছড়াগুলো কেটে সাবধানে একটা ধামাতে সাজাতে, আর খোকাকে বললেন ধামাটা নিয়ে বাজারে গিয়ে ফলওয়ালা-দের কাছে বেচে আসতে।

কথাটা তাঁর কাছে এতই স্বাভাবিক যে, কোন প্রতিবাদ আশাও করেন নি। কিন্তু খোকা ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'সে আমি পারব না।'

'পারবি না!' আশ্চর্য হয়ে যান শ্যামা, 'পারবি না কেন?......ও কালা-মানুষ কি শুনতে কি শোনে, ওকে ঠকিয়ে দেয়—তুই রয়েছিস তুই যাবি, এই তো সোজা কথা। বেশ ভাল ফল হয়েছে, ভাল দাম পাওয়া যাবে দরদস্তুর করতে পারলে। তা তোমার কি হ'ল কি?'

সে তেমনি মুখ ফিরিয়েই উত্তর দিলে, 'বাজারে মোট ঘাড়ে করে বেচা বেচতে যাব—আমি কি ছোটলোক!'

'ও আবার কি কথা! নিজের বাগানের জিনিস নিজে বেচবি—তাও তো আমি তোকে বাজারে বসে খুচরো বেচতে বলছি না, তাতে তো দু'পয়সা বেশীই পাওয়া যায়—পাইকিরি বেচবি একজনকে, তা আবার ছোটলোক ভদ্দরলোক কি! যা বলছি—! কান্তি এই তো কতদিন ধরে করছে, ও পারে—তুমি পার না? ও ছোটলোক হয়ে গেছে—না?'

'যে পারে পারে—আমি পারব না। এমনিই আমাদের দেখলে পাড়ার ছেলেরা হাসে। তার ওপর ধামা মাথায় ক'রে কলা বেচতে গেলে আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না।'

শ্যামা এই কথাতে আরও ক্ষেপে যান। পাড়ার লোক তাঁকে একটু বিদ্রূপের চোখে, অবহেলার চেখে দেখে তা তিনি জানেন। কিন্তু সেই কথাটারই কেউ ইঙ্গিত দিলে সহ্য করতে পারেন না।

'পারবি না কি, পারতেই হবে। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!......আমার মুখের ওপর পারব না বলা! গোবিন্দ দেখছি ঠিকই বলেছে, পিপুল পেকেছে তোমার।...দুদিন কলকাতার জল গায়ে পড়ে ধরাকে সরা দেখছ, না? চাল বেড়েছে! চাল বার করছি। দুদিন ধানের চাল পেটে না পড়লেই সব চাল চলে যাবে। ভিরকুট-বীচি ও, ওর বড় দাম; পাড়ার ছেলেরা কি বলবে এই ভয়ে আমার দুটো পয়সা আয় বন্ধ করে দেব, না? এত বড় সংসারটা চলবে কিসে? পাড়ার ছেলেরা খেতে দেবে তোকে—না, আমাকে দুটো টাকা দিয়ে সাহায্য করবে! যাদের ছেলেরা হাসে তারাই দেখিস না মাথা হেঁট করে টাকা ধার করতে আসে আমার কাছে?... নে ওঠ বলছি, ভাল চাস তো! মাথায় করতে হবে কেন, হাতে ক'রেই নিয়ে যাও না।'

কিন্তু শ্যামা যতই যা বলুন, খোকা নড়ে না। বজ্জাত ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ ক'রে। কথা যে সে শুনবে না সেটা স্পষ্ট সবাইকার কাছেই—

এত বেয়াদপি শ্যামার সহ্য হয় না। তিনি এক চড় বসিয়ে দেন ওর গালে। পাতা-কুড়নো আর পাতা-চাঁচা, মাটি কোপানো হাত—পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসে যায় ওর গালে।

কিন্তু তাতেও এক ইঞ্চি নড়ে না সে।

তখন পাগলের মতো মারতে থাকেন শ্যামা। কনক ধরতে এসে পিছিয়ে যায়—শ্যামার সে সময় রণরঙ্গিনী মূর্তি! পাখার বাঁটের এক ঘা সজোরে তার হাতেও পড়ে ঝনঝনিয়ে ওঠে হাত। ছুটে আসে ঐন্দ্রিলাও। কান্তি এসে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে।

'আমি যাচ্ছি মা। আমিই তো যাই।...ওকে ছেড়ে দাও।'

ঐন্দ্রিলার ব্যঙ্গেই বেশী কাজ হয়, 'কেন গো, তোমার ছেলেমেয়ে সবাই তো লক্ষ্মী, সব ভালো। যত বদ তো আমি।...তবে আবার এ মূর্তি কেন?......কেউ তোমার কথা শুনবে না, কেউ না—এটি মনে রেখো। মারের চোটে আর কদিন শোনাবে? এর পর ওরাই ধরে মারবে যখন?'

শ্যামার হাতের মুঠো থেকে এইবার পাখাটা টেনে নেয় কনক।

'আচ্ছা, আমিও দেখে নোব তোমার এ ভিরকুটি কদিন থাকে। ও ভিরকুটি ভাঙ্গতে আমি জানি। বালাম চাল পেটে পড়ে কদিনেই বড় বাড় হয়েছে তোমার। ...ঐ চাল বন্ধ করলেই টিট্ হয়ে যাবে তুমি! আজ থেকে ভাত বন্ধ তোমার এ বাড়িতে। মাথায় করে আনাজ নিয়ে বাজারে গিয়ে বেচে আসবে তবে ভাত পাবে আবার। যে কথা সেই কাজ আমার—আমাকে তুমি চেন না!'

সত্যিই সেদিন ভাত দেন না শ্যামা। দালানের জানালায় সেই যে কাঠ হয়ে বসে থাকে খোকা—বসেই থাকে তেমনি। ঘামে গা ভিজে যায়—কিন্তু চোখে এক ফোঁটা জল বেরোয় না। সারা গায়ে দাগড়া দাগড়া দাগ হয়ে গেছে, দেখে কনকের মন-কেমন করে। আহা, ঐটুকু ছেলে—কী চোরের মারই খেলো। ইচ্ছে হয় কাছে টেনে নিয়ে গা মুছিয়ে দেয়—সান্ত্বনা দেয় একটু—কিন্তু শ্যামার ভয়ে পারে না। তবু শ্যামা যে সত্যিই ওকে খেতে দেবেন না—তা কখনও ভাবে নি ওরা। সবাই শুকিয়ে বসে আছে, শুধু তরুকে ডেকে খাইয়ে দিয়েছে কনক। বেলা দেড়টা নাগাদ শ্যামা গম্ভীরভাবে নিজের ভাত বেড়ে নিয়ে যখন খেতে বসলেন, ঐন্দ্রিলাকে ডেকে বললেন, ডাল-তরকারী কি কি হয়েছে দিয়ে যেতে—তখন সে সুদ্ধ অবাক হয়ে গেল।

'তা ও—?' কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে ইঙ্গিতে দালানের দিক দেখিয়ে প্রশ্ন করে সে।

'ওর কথা তো একবার বলে দিয়েছি বাছা। আমার কথা না শুনলে এ বাড়িতে ওর অন্ন নেই—সাফ্ কথা। কেউ যেন কোন রকম দয়াধম্ম না করতে যায়—শুনলে আমি কিন্তু তাকে সুদ্ধ সেই দণ্ডে বাড়ির বার ক'রে দেব!'

এর পর ওকে ডেকে ভাত দেবে সে সাহস কারও নেই।

অনেক ইতস্তত করে ঐন্দ্রিলা ভাত নিয়ে নিজেও খেতে বসল। কিন্তু কনক পারল না। তারও সেদিন দুপুরে খাওয়া হ'ল না।

শ্যামা খাওয়া-দাওয়ার পর একটু জিরিয়েই যথারীতি প্রশান্ত বদনে বাইরের রকে গিয়ে পাতা নিয়ে বসলেন।

ঐন্দ্রিলা খেয়ে এসে ছোট ভাইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে ফ্যাশ ফ্যাশ ক'রে বলল, 'এই—যা না, গিয়ে একবার মাপ চাইগে যা না। উপোস করে থাকবি নাকি! এখনই তো তোকে বাজারে পাঠাচ্ছে না। আর কী আছে ঘরে যে পাঠাবে? সে কলা তো কান্তি বেচেই এল।...যা ওঠ—। ...আ মর, তেজ দ্যাখো, কথা শোনে না। মরুক গে, মরলে তুই-ই মরবি—আমার কি! পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে!'

হেসে অংগভংগি করে ঘরে চলে গেল ঐন্দ্রিলা।......

কনক দাওয়াতেই বসে ছিল চুপ করে। সে-ই দেখল খানিক পরে খোকা উঠে খিড়কীর দোর দিয়ে বাগানের দিকে গেল। সে ভাবল পাইখানায় যাচ্ছে বোধহয়, এসে স্নান করবে। কিন্তু বহুক্ষণ কেটে গেল যখন—এদিকে ফিরল না, পুকুরেও কারুর স্নান করার সাড়া পাওয়া গেল না—তখন সে উদ্বিগ্ন বোধ করল। বাগানে বেরিয়ে দেখল পাইখানার দিকে কেউ যায় নি—পিছনটা সব দেখে এল—যদি কোন গাছতলা-টলায় বসে থাকে, সেখানেও নেই। তখন বাইরে এসে সাহসে ভর করে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'মা—ছোট্ ঠাকুরপো কোথায় গেল বলুন তো?'

'গেল?' একটু চমকেই উঠলেন শ্যামা, 'কোথায় যাবে? কই—এদিকে তো আসে নি। ওখানে নেই?'

তখন কনক বলল, উঠে বাগানের দিকে যাবার কথাটা।

'তাহলে বোধহয় ওদিক দিয়ে বাইরে চলে গেছে—আমার সামনে দিয়ে যাবে না বলে। যাক না—বন্ধুবান্ধব ঢের হয়েছে পাড়ায়, কে কত খাওয়াতে পারে খাওয়াক না! যাবে কোথায় বাছা, ঠিক ফিরে আসবে। তুমি খেয়ে নাও গে—একজন সোহাগ করে বসে আছে দেখলে জব্দ হবে না।'

কনক যে খায় নি তা শ্যামা লক্ষ্য করেছেন। গলার কোমল সুরে বোধ হ'ল মনে মনে খুশীই হয়েছেন তাতে।

কিন্তু বিকেলেও ফিরল না খোকা। সন্ধ্যার পরও না। এবার শ্যামা সুদ্ধ উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। তিনি নিজেই বেরোলেন পাড়ায় খোঁজ করতে। ঐন্দ্রিলাও কতকগুলো বাড়িতে গেল। খালি গায়ে এক কাপড়ে বেরিয়েছে, কোথায়ই বা যাবে?...কিন্তু পাড়াঘরে কোথাও খবর পাওয়া গেল না। কেউ দেখে নি তাকে।

হেম এসে সব শুনে খুব বকাবকি করল মাকে। শ্যামা চুপ ক'রে রইলেন। তাঁর ভয় হয়েছে—অনুশোচনাও হয়েছে। ইতিমধ্যে কান্তিকে পাঠানো হয়েছিল মহাদের বাড়ি, সে ফিরে এল। সেখানেও যায় নি। ওর সংগে বুড়ো ন্যাড়ারা এসেছিল খবর পেয়ে—তারা আলো নিয়ে স্টেশন লাইনের ধার খুঁজে এল। হেম তখনই গেল কলকাতায় বড়মাসীর বাড়ি। সেখানেও নেই।

জানাশুনো কোন জায়গাতেই খবর পাওয়া গেল না তার। পরের দিনও সবাই যতটা পারল ঘোরাঘুরি করল। হেম আপিস কামাই করে থানায় থানায়, হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে বেড়াল—কিন্তু কেউই কোন খোঁজ দিতে পারল না। অত বড় ছেলেটা যেন উবে গেল একেবারে।

শ্যামা পরের দিন থেকে অন্নজল ত্যাগ করলেন; কান্নাকাটিও ঢের করলেন। গালাগাল দিলেন সদ্য-মৃতা বোনকে! বিশ্বাস করে তার কাছে রেখেছিলেন, সে এত ছেলে-মেয়ে চরাত সে লক্ষ্য করে নি যে ছেলে বিগড়ে যাচ্ছে? গোবিন্দ তো একদিনেই চিনল!......বিশ্বাস করতে নেই কাউকে, খুব শিক্ষা হ'ল তাঁর। তার নিজের ছেলে হয় নি তো, কী বুঝবে পেটের একটা নষ্ট হ'লে কী দুঃখ হয়।

কদিন পরে আবার ঠেলে উঠলেন নিজেই। আবার শুরু হ'ল নিয়মিত প্রাত্য-

হিক জীবনযাত্রা। যেমন চলছিল সব তেমনই চলতে লাগল। সবাইকে শুনিয়ে বোধ করি নিজেকেই সান্ত্বনা দিলেন, 'যাবে আর কোথায়? মরে নি এটা তো ঠিক, ম'লে হয় এখানেই রেলে গলা দিত, নয়ত কোন পুকুরে ডুবত।...সে খবর পাওয়াই যেত এতদিনে। কলকাতার হাসপাতালেও তো খবর নেওয়া হ'ল।......না মরে নি। আমার মন বলছে ফিরে আসবে সে। তবে কী মূর্তিতে আসবে সে-ই হ'ল কথা। কোন্ গুণ্ডাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ল, নেশা-ভাঙ বদখেয়ালী শিখে আসবে--চোর ডাকাত খুনে হবে—সেই এক ভাবনা।......তা আমি আর কি করব। মায়ের পেটের বোনকে দিলুম বিশ্বাস ক'রে সে-ই যখন—' ইত্যাদি—

কিন্তু শ্যামার আশা বা আশঙ্কা কোনটারই আশু কোন চেহারা দেখা যায় না। দিন সপ্তাহ-মাস কেটে যায়—গাছপালায় প্রকৃতিতে ঋতু পরিবর্তনের ইতিহাস রচিত হ'তে থাকে—তবু খোকা ফেরে না। শ্যামার মন ভার হয় আবার, সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে বসে চোখের জল ফেলেন—কিন্তু ছেলেকে ফিরিয়ে আনার কোনও উপায় খুঁজে পান না। কোথায় আছে যদি জানতে পারতেন! ৪।

মন খারাপ হয় সকলকারই। কনকের তো আরও বেশী, নূতন সংসারে তার সঙ্গে থাকবার কথা। কোথায় গেল কে জানে, দুটো দিন যদি ধৈর্য ধরে থাকত! অতবড় ছেলেটা বরবাদে চলে গেল!

তার কথা ভাবলেই সেই মার-খাওয়া ম্লানমুখ চেহারাটা মনে পড়ে যায়। চোখ ফেটে জল আসে যেন। আহা, যেখানেই থাক, সুখে থাক, মানুষ হোক!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

খবরটা যখন পৌঁছল তখন অরুণকে দেখা গেল না। সে যে কোথায় লুকিয়ে বসে আছে তা কেউ জানে না। খবর সেদিন বেরোবে তা অরুণও জানত—কিন্তু কলকাতায় গিয়ে দেখে আসার সাহস হয় নি। এমনিই গত কদিনে যেন শুকিয়ে উঠেছে সে, মুখ-চোখের এমন ম্লান অবস্থা যে তাকানো যায় না। তিন-চারদিন ধরে বলতে গেলে ভাতের সামনে বসেছে শুধু। তাও সাধ্য-সাধনা করে বসানো, বুঁচি গিয়ে খুঁজে-পেতে নিয়ে আসে তাই—বাগানের কোন্ কোণে লুকিয়ে বসে থাকে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধই করে দিয়েছে এক রকম।

বুঁচি খুঁজতেও আসে—আবার সে জন্যে ফৈজতও কম নয়।

মুখের সামনে তার অভ্যস্ত ভঙ্গীতে হাত-পা নেড়ে বলে, 'বলি, তুমি পেয়েছ কী আমায়? কত মাইনে দাও যে পেত্যহ এমনি করে খুঁজে পেতে সাধ্যিসাধনা করে নিয়ে যেতে হবে! ভাত খেয়ে কি আমার মাথাটা কিনবে?'

ওর সেই তিরস্কারের ভঙ্গীতে রাগ হয় না অরুণের, বরং তার সেই অপরিসীম শুষ্ক মুখেও প্রসন্ন হাসি ফোটে।

তুমি খোঁজো কেন—আমি কি বলি খুঁজতে? কৈ, আর তো কেউ খোঁজে না।

'তুমি বলবে কেন, তুমি যদি দুটো কথা বলতে কি একটা দুটো ফরমাশ করতে কাউকে তাহলেও তো বুঝতুম যে খানিকটা মানুষের মতো কাজ হ'ল।......আমার যে হয়েছে যত জ্বালা। আর তো কারুর মাথাব্যথা নেই। একটা মনিষ্যি খাচ্ছে না

চান করছে না, মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়াচ্ছে তা কি কারুর হুঁশপব্ব আছে?—আচ্ছা, তাও বলি, এত ভাবনার কি আছে, ফেল তো তুমি করবে না বাপু।'

'তা কি বলা যায়—যদি ফেল করি! এঁদের এতগুলো পয়সা খরচ করালুম, ফেল করলে আর মুখ দেখাতে পারব না। একে তো এই বুড়ো বয়সে এগজামিন দেওয়া বলতে গেলে—'

'নাও, তুমি আর হাসিও নি বাপু। আঠারো-উনিশ বছরে একটা পাস করে যাবে—সেটা কি কম কথা হ'ল! ঐ-তো মজুমদারদের গ্যাঁড়া—ওর তো বয়সের গাছ পাথর নেই—ফী বছর এগজামিন দিচ্ছে ফেল করছে আর বিড়ি ফুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।......নাও, এখন ওঠো, দয়া করে নেয়ে খেয়ে আমায় উদ্ধার করবে চলো।......তুমি যেদিন ফেল করবে সেদিন পুবের সুয্যু পশ্চিমে উঠবে।'

'কেন আমি কি একেবারে বিদ্যের জাহাজ—ফেল করতে পারি না!......আমার তো মনে হচ্ছে কিছুতেই পাস করতে পারব না।'

'রেখে বোস দিকি বাপু! এমন পাগলামী ছেমো কে তোমার মাথায় ঢোকালে! তুমি যদি ফেল করো তাহ'লে বুঝব সাক্ষেৎ মা সরস্বতীর সাধ্যি নেই এ এগ্‌জামিনে পাস করার। বিদ্যের জাহাজ কি বলছ—বাব্‌বা, যে পড়াটা তুমি পড়লে আমি তো মনে করি এক জাহাজ বিদ্যে তোমার পেটে ঢুকে গেছে।......নাও নাও ওঠো—খেয়ে আমার মাথা কিনবে চলো, তোমার সঙ্গে এত বাজে বকবার সময় নেই আমার।'

অগত্যা অরুণকে উঠতে হয়, স্নানাহারও করতে হয়। অন্তত ভাতের সামনে বসতে হয় একবার। এই ভাবেই চলছে কদিন। স্বর্ণলতা ধরে না আনলে বোধহয় এর মধ্যে তার একবারও খাওয়া হ'ত না—খাওয়ার কথা মনেই পড়ত না। রকম-সকম দেখে প্রমীলা হেসে বলত, 'মা-লক্ষ্মীর আমার চাকরীটি হয়েছে ভাল! ও বুঝি তোমার খাস তালুকের প্রজা—হ্যাঁ-গা গিন্নীমা, তাই তুমি না বললে উঠবে না খাবে না?'

মহাশ্বেতা আড়ালে গজরাত, 'মুয়ে আগুন মেয়ের। ঘরজ্বালানী পরভালানী। নিজের ভেয়েরা খেলে কিনা—তা একবারও খোঁজ নিস? পরের জন্যে তো মাথা-ব্যথার সীমে-পরিসীমে নেই একেবারে।'

'নিজের ভেয়েদের খবর নোব কি, নিত্যি-তো চোখে দেখছি—চারবার সদরে চার-বার চুরি করে—এই আটবার খাওয়া তো বাঁধা! খবর নিতে গেলে তো চুরি-বিদ্যের খবরও রাখতে হয় গো—বাপ-কাকাকে জানাতেও হয়। সেটা কি ভাল হবে—বুঝে দ্যাখো।'

ঝঙ্কার দিয়ে চলে যেত স্বর্ণলতা। মহাশ্বেতার শুধু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করা ছাড়া উপায় থাকত না। চারবার না হোক, চুরি করে এটা-ওটা খাওয়া যে তার ছেলেদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে তা সেও জানে। বরং বলা যায়, সে-ই শিখিয়েছে।......

সেদিন খবর বেরোবে, ইউনিভার্সিটির দেওয়ালে টাঙিয়ে দেবে—এ খবরটা রটে গিয়েছিল আগের দিনই। দুর্গাপদ অরুণকে ডেকে বলেছিল, 'তাহলে আমি বলি কি অরুণচন্দর, আমার মান্থলী টিকিটটা নিয়ে ভোরের গাড়িতে চলে যাও তুমি-দেখে সাতটার মধ্যে ফিরতে পারবে না?...না হয় আটটার গাড়িতে এসো, আমি ইস্টি-শানে টিকিটটা নিয়ে নেব'খন্ তোমার কাছ থেকে।'

কথাটা শুনে অরুণের মুখ বিবর্ণতর হয়ে উঠল। স্বর্ণলতা লক্ষ্য করল, তার পা দুটো ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে।

সে বললে, 'খুব লোককে গিয়ে খবর নিতে বলছ ছোটকা, দেখছ না ওর অবস্থা।......হাওড়া ইষ্টিশানে পৌঁছে কোথায় ভিরমি লেগে দাঁত ছিরকুটে পড়ে থাকবে—তখন তোমার আপিস যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ও বাপু তুমিই একটু কষ্ট করে জেনে দাও—'

স্বর্ণলতা কর্তাদের সকলেরই প্রিয়। দুর্গাপদর একটু ভুরু কুঁচকে উঠেছিল আগে প্রস্তাবটা শুনে—কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল শেষ পর্যন্ত, 'আমাকেই খবরটা জেনে দিতে হবে?......তা দেব। তবে বাছা ভোরে গিয়ে ফিরে এসে সাত-তাড়াতাড়ি বেরোনো, সে আমার দ্বারা হবে না, বরং একটা ট্রেন আগে, কি মেজদার সঙ্গেই, খেয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে যাব—খবরটা জেনে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব! কেমন?'

স্বর্ণলতা খুশী হয়ে বলে, 'সেই ভাল।'

তখন থেকে অরুণের অবস্থা দাঁড়িয়েছে শোচনীয়। রাত্রে নাকি ঘুমোয় নি এক বিন্দুও, যারা ওর ঘরে শোয় তারা সবাই বলেছে সে কথা; যে যখন উঠেছে রাত্রে ওকে দেখেছে বসে থাকতে। তার ওপর ভোর-না হতেই এমন উধাও হয়েছে যে বহু খুঁজেও কেউ পাত্তা পাচ্ছে না। বাগান, পুকুরপাড়, ওধারের বাগান—সব নাকি দেখা হয়ে গেছে।

পাত্তা কে পাবে তা অবশ্য গিন্নীরা সকলেই জানে। প্রমীলা মুখ টিপে হেসে বলে, 'তোদের ব্যস্ত হতে হবে না—তোরা নিজের ধান্দায় যা। আমার গিন্নীমায়ের দুধ জ্বাল দেওয়াটা শেষ হোক—খবর সে-ই পৌঁছে দেবে এখন।'

লজ্জা পায় স্বর্ণলতা, 'বেশ বলছ তো বাপু, কেউ খুঁজে পেলে না যেকালে সেকালে আমিই বা পাব কি করে? আমি তাকে ট্যাঁকে পুরে রেখেছি, না সিন্দুকে চাবি দে রেখেছি?'

'কোথায় রেখেছ—কোথায় রাখো তা তুমিই জান মা—তুমিই তো খুঁজে পাও দেখি ঠিক!'

স্বর্ণলতার আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে তরলা তাড়াতাড়ি কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দেয়, বলে, 'আসলে ওর স্বভাবটা লক্ষ্য করেছে আর কি, কোথায় বসে থাকতে পারে সেটা ওর জানা হয়ে গেছে।......তা তুই যা না বাপু, আমি দুধ দেখছি।'

'সে বাপু আজ বলা শক্ত।' নরম হয়ে আসে স্বর্ণ, 'আজ সে মোক্ষম লুকোন লুকিয়েছে—বেশ বুঝতে পারছি।......তা এসো তাহলে তুমি, দুধ দেখসে।......ভ্যালা জ্বালা হয়েছে বাপু, দেখি আবার, কোন সাপের গত্তে কি ব্যাঙের গত্তে লুকোলো!'

সে কিন্তু সোজাই খুঁজে বার করলে ওকে—একবারেই। সবাই সব জায়গা দেখেছে যখন—তখন আবার নতুন করে দেখতে গিয়ে লাভ নেই সেই সব জায়গাই। সে এমন কিছু দূরবীন চোখে এঁটে যাচ্ছে না যে অপরের চোখে যা পড়ে নি তা তার চোখে পড়বে। সে জানত যে পাইখানার দিকটা কেউ যাবে না, অথচ ঐখানে পগারের ধারে নোনাগাছে আর জামরুল গাছে জড়াজড়ি করা বাঁশঝাড়ের আড়ালে বেশ একটি নিরাপদ জায়গা আছে—লোকচক্ষুর আড়ালে।

আর সত্যিই সেইখানে পাওয়া গেল অরুণকে।

'বলি তোমার ব্যাওরাটা কী বলো দিকি! তুমি মনিষ্যি না ভূত! বলি কাউকে খুন করে ফেরার হয়েছ নাকি যে এমন জায়গায় এই গুয়ের বনে এসে নুকোতে হবে! ধন্যি বাবা, ধন্যি!'

ওকে দেখে অরুণ উঠে এল অবশ্য। কিন্তু ভয়ে বোধ করি তার পা অবশ হয়ে

গেছে তখন—আসতে আসতে দু-তিনবার টাল খেল সে।

'ওগো ভয় নেই—পাস করেছ! পাস করেছ! ছোট-কা নিজের চোখে দেখে খবর পাঠিয়েছে। খুব ভাল পাস করেছ নাকি, কী একদাঁড়ি না কি বলে—তাই পেয়েছ। একদাঁড়ি কাকে বলে গা?'

'ফা-ফার্স্ট ডিভিসন। প্রথম বিভাগ। খ-খবরটা কে দিলে বুঁচি?'

'যে দিয়েছে ভাল লোক। ছেলেছোকরা কেউ নয়। মতি ভট্‌চাযের ছেলেও তো এই এগজামিন দিয়েছিল, ছেলের সঙ্গে সেও গিয়েছিল দেখতে, তাকে দিয়েই বলে দিয়েছে। মতিবাবুর ছেলে নাকি তিন দাঁড়ি পেয়েছে। দুঃখ করছিল খুব। আমি তো জানি বেশী পেলেই ভাল—তা এ বাপু দেখছি তোমার এই পাসের পড়ার সবই বিপরীত!'

'ছোট-কা—ছোট-কা ঠিক দেখেছেন তো—ভুল হয়নি?'

'তোমার বাপু ধরণধারণ দেখলে আমার গা জ্বালা করে। এ কি ভুল দেখবার জিনিস? তার এ জ্ঞান নেই? তোমার যা কাণ্ড তা তো নিজে চোক্ষে দেখেছে সে, ভুল খবর দিলে যে তোমার ধাত ছেড়ে যাবে তা জানে না? মতিবাবুও দেখেছে—ছোটকা দেখিয়েছে তাকে। ওরা আপিসে কাজ করে—কত সায়েবের কাজ ওদের হাতে, ওদের ভুল করলে চলে না—জানো! তাহলে য়্যাদ্দিন চাকরি করে খেতে হ'ত না।'

এবার অরুণের মুখ পরিষ্কার হয়। মুখে হাসি ফোটে তার! হঠাৎ কি মনে করে—সম্ভবত ধারে-কাছে জনপ্রাণী ছিল না বলেই ভরসা হয় কতকটা—স্বর্ণলতার একটা হাত ধরে বলে, 'তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে—না বুঁচি?'

'তা বাপু হচ্ছে একটু, মিছে কথা বলব না।......তা এ কথাটা জিগ্যেস করলে কেন হঠাৎ? তুমি এগজামিন দিয়ে পাস করেছ, আমার আনন্দ হবে কেন?'

ওর মুঠির মধ্যে থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না, শুধু একটু বিস্মিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে চায় ওর মুখের দিকে।

কিন্তু অরুণের ভরসার পুঁজি ততক্ষণে ফুরিয়ে এসেছে। সে অপ্রতিভ ভাবে নিজেই হাতটা ছেড়ে দেয়, অন্যদিকে চেয়ে বলে, 'না—তুমিই তো এর মূলে,—তুমি চাড় না করলে আমার পড়াই হ'ত না হয়ত। তোমার দয়াতেই আমার পাস করা হ'ল—সে কথা আমি ভুলব না কোনদিন।'

স্বর্ণলতা তার অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ধমক দিয়ে ওঠে, 'তুমি আর ঐ সব নেকচার ঝাড়তে বসো নি বাপু!......ঐ সব দয়া-ধম্ম হ্যানো ত্যানো—কথাগুলো শুনলে আমার রাগ ধরে যায়। চলো দিকি, এখন বাড়িতে চলো। মুখ-চোখের কী ছিরিই হয়েছে। আহা!...দয়া ক'রে এখন গিয়ে মুখে একটু কিছু দেবে চলো, ব্যাগত্তা করি। আমার এখন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার ঐ নেকচার শোনবার সময় নেই—এখুনি খাড়া-খাড়া হরিন্নুট পাঠাতে হবে ঠাকুরঘরে—মানসিক রয়েছে!'

'কে মানসিক করেছিল—তুমি? আমার পাসের জন্যে?' যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে যায় অরুণ। তার গলার কাছে কী যেন একটা ঠেলে উঠছে, কথা বেরোতে চাইছে না ঠিকমতো।

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ! নইলে আর কার মানসিকের জন্যে মাথাব্যথা পড়ে যাবে শুনি! বলি কাউকে তো করতে হয় একটা। পাসটা কি অমনি হয় নাকি? দেবতা-ঠাকুরকে না জানালে চলে? মেজকাকীও হয়ত করতে পারে—তা জানি না। মা-মাসীরই তো করবার কথা। তবে আমি বাবার কাছ থেকে চেয়ে নে স' পাঁচ আনা পয়সা

আলাদা করিয়ে রেখেছি। সুভালাভালি ভাল খবর এলে সেই দণ্ডে হরির লুট দেব—এই মানসিক!...নাও নাও—চলো, আবার দাঁড়ালে কেন!'

'যাচ্ছি। চলো।' অস্পষ্ট ধরা গলায় উত্তর দেয় অরুণ। তার চোখ দুটো কে জানে কেন, ঝাপসা হয়ে গেছে! একটু মুছে নিতে পারলে হ'ত। কিন্তু পাছে মুছতে গেলে জল বেরিয়ে যায়—জলের চিহ্ন ধরা পড়ে, সেইজন্যে সাহস হচ্ছে না তার।

কয়েক পা গিয়ে স্বর্ণলতাই দাঁড়িয়ে পড়ে।

'তা এবার তা'হলে তুমি কি করবে?'

তেমনি ধরা-গলায়ই অরুণ উত্তর দেয়, 'দেখি মেসোমশাই কি বলেন। একটা চাকরি-বাকরিরই চেষ্টা দেখতে হয়।'

'কেন—আর পড়বে না? বি-এ পাস করার অত শখ তোমার—!'

'কত দিন আর পরের ঘাড়ে চেপে এমন বসে বসে খাব বলো? কলেজে পড়ার যে অনেক খরচা?'

'জলপানি পাবে না? ছোট-কা বলেছিল সেদিন, ও জলপানি পেতে পারে।'

'কী জানি, আমার কি আর অত ভাগ্য হবে?'

তারপর একটু থেমে বলে, 'স্কলারশিপ পেলেও, হয়ত একটা দশ টাকার ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পাব। তাতে তো কলেজের খরচাই চলে যাবে। যদি ফ্রী হ'তে পারি তাহ'লেও না হয় কথা। তাতেও—ভর্তির টাকা তো আর ফ্রী হয় না, সেও এক-গাদা টাকা লাগবে। আর এ'দের ঘাড়ে এমনভাবে বসে খাওয়া কি ঠিক?'

'দ্যাখো, এ তো নারদের গুষ্টি দেখতেই পাচ্ছ—রান্নাঘরে রাবণের চিতে জ্বলছেই—তা যেখানে এতগুলো লোক বসে খাচ্ছে সেখানে আর একটা লোককে খাওয়াতে কি আমার বাপ-কাকারা দেউলে হয়ে যাবে?...আমার ভাইগুনিকেও তো দেখছ—না পড়াশুনো না রোজগার, কোন চেষ্টাই নেই, হল্লো হল্লো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু। তারাও তো খাচ্ছে চারবেলা! তুমি অত কিন্তু হচ্ছ কেন? তুমি এ সংসারে দুটো ভাত খেলে তবু তো বুঝব ভাল কাজে গেল।...তোমার দিন তুমি কিনে নাও। জলপানি পাও তো উত্তম কথা, না হ'লেও তুমি মেজ-কাকে কিছু জিগ্যেস করতে যেও নি। মেজকাকে আগে বললেই বলবে চাকরিতে ঢুকে পড়ো, আর একবার বলে ফেললে মুশকিল।...কথা যা পাড়বার আমিই পাড়ব। এখন কলেজে ভর্তির কত টাকা লাগে চুপি চুপি আমাকে বলো—'

আবার চলতে শুরু করল ওরা। চলতে চলতেই অরুণ বলল, 'দেখি—।'

'না না, দেখি-টেখি নয়। ও ঠিক করেই ফ্যালো। তুমি কালই খোঁজ ক'রে আমাকে বলবে। তোমার ভত্তির টাকা—বই-খাতা—কী কী লাগবে সব বলে দিও। মেজ-কাকে বলে আমি সব আদায় ক'রে দিয়ে যাব যাবার আগে। আমার তো আবার শিয়রে সংক্রান্তি—গোনা-গাঁথা দিন আর থাকা এখানে!'

'তার—তার মানে? তুমি কোথাও যাবে নাকি?' কথাগুলো উচ্চারণ করতে অরুণের যেন রীতিমতো কষ্ট হয়। উত্তরটা যেন সে আগেই আশঙ্কা করে, 'কোথায় যাবে—কত দিনের জন্যে?'

'কতদিন কি গো? তুমি কিচ্ছু জান না? একেবারেই তো যাচ্ছি। কোথায় আর যাব বলো, মেয়েরা কোথায় যায় বড় হ'লে? আমায় যে এরা বিদেয় ক'রে দিচ্ছে এ বাড়ি থেকে।'

এতক্ষণে জিনিসটা কি মনে পড়ে তার লজ্জা হয় একটু, সে মাথা নামায়।

'তোমার—তোমার বিয়ে হচ্ছে? আশ্চর্য। আমি কিছু শুনি নি তো!'

'শুনবে কি ক'রে বল, তুমি কি আর মনিষ্যির সংসারে বাস করো? তুমি তো শ্যালের মতো গত্তে ঢুকে বসে থাক চোপর দিন!...ও কি, আবার দাঁড়ালে কেন, চলো চলো—'

এবার স্বর্ণই অসহিষ্ণু হয়ে ওর একটা হাত ধরে টানে।

আবার চলতে শুরু করে অরুণ—কিন্তু মনে হয় যেন পৃথিবীতে আর কোথাও কোন জিনিস সম্বন্ধে তার আগ্রহ নেই। পাস হ'ল কিনা এখন যেন তাও তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে। এই বাড়িতে, এই পৃথিবীতে একমাত্র যে অবলম্বন ছিল,—সে চলে যাচ্ছে, অবলম্বন বলতে আশ্রয় বলতে আর কিছু রইল না, পায়ের নিচের মাটিটাই যেন সরে যাচ্ছে তার।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে শুধু জিগ্যেস করে, 'সে—সে কবে হবে?'

'কী হবে,*বে?...এই তো সামনের মাসের আটুই। এদের এত তাড়াতাড়ি করবার ইচ্ছে ছিল না। তারাই জোর করছে। মুয়ে আগুন! তাদের যেন ঘর চলছে না একেবারে। ঐ তারিখের পরই বুঝি কি অকাল পড়ছে, তার আগে সারতে চায় তারা।'

আপন মনেই বলে যাচ্ছিল, হঠাৎ অরুণের মুখের দিকে চোখ পড়ে যেন চমকে উঠল সে।

হয়ত কারণটাও অনুমান করল সে—সঙ্গে সঙ্গেই।

'ও মা, কী হ'ল গো তোমার? তোমার মুখ অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন আমার বের কথা শুনে? তুমি কি ভাবতে আমি চিরকাল এখানে থেকে তোমাকে আগলে আগলে রাখব? কোন কালে আমার বে-থা, ঘর-কন্না হবে না?'

তারপর গলা নামিয়ে—ছেলেমানুষকে যেমনভাবে সান্ত্বনা দেয়—তেমনি ভাবে বলে, 'ওগো বাবু, এখন থেকেই তোমাকে অত ভাবতে হবে না তা বলে! যাব বলে কি আমি সেই দিন থেকেই একেবারে চলে যাব? আটদিন বাদে ফিরে এসে তো এখন তিন-চার মাস থাকবই. সে বাবা যাচোই নিয়েছে তাদের সঙ্গে—তারপরও আসব যাব। এই কাছেই তো—শিবপুরে বে হচ্ছে। তবে তুমি এবার থেকে একটু সেয়ানা-শঠ্ঠ হও বাপু। চিরদিনই কি এমনি গো-বেচারা ভাল-মানুষ থাকবে?'

বাড়ির মধ্যে থেকে প্রমীলা হাঁক পাড়ে, 'কৈ লো বুঁচি, পেলি সে ছোঁড়াকে?'

'পেয়েছি মেজকাকী—যাচ্ছি।...চলো চলো, ওরা ভাবছে।'

সে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে যায় অরুণকে।

॥ ২ ॥

স্বর্ণলতার বিয়ের চেষ্টা চলছে অনেকদিন ধরে। অরুণই শুধু খবর রাখত না, নইলে সবাই জানে। ইদানীং বড় দুই কর্তা ছুটির দিনেও অফিসের মতো সকাল সকাল খেয়ে বেরিয়ে পড়তেন পাত্রের খোঁজে. চেনা-জানা যত ব্রাহ্মণ পরিবার আছে সকলের বাড়িতে গিয়ে হাজির হতেন। বলতেন, সামনে গিয়ে না পড়লে গরজ হবে না। খিদিরপুর, বেহালা, কালীঘাট. ঢাকুরে মায় বারুইপুর, মল্লিকপুর—এদিকে এই, ওদিকে শ্রীরামপুর, গোঁদলপাড়া, বরানগর, নৈহাটী—সব চষে ফেলেছেন। একটি মেয়ে তাঁদের, ভাল পাত্রে দেবেন, তাতে কিছু খরচ হয় হোক্—এই জন্যেই এত

খোঁজাখুঁজি। আবার তাঁদের পছন্দমতো পাত্রপক্ষ মেয়ে পছন্দ করে না। কটা চোখ, মানানসই যা তার চেয়েও বেঁটে—এই সব আপত্তি হয় তাদের।

অনেক কাণ্ডর পর এই পাত্র ঠিক হয়েছে। পাত্র খুব সুন্দর দেখতে, শিবপুরে নিজেদের বাড়ি, দুটো পাস, কোন্ বিলিতী ফার্মে চাকরী করে। এর চেয়ে ভাল পাত্র গৃহস্থ সংসারে আশা করা যায় না। খরচ কিছু বেশীই পড়বে, সব রকম গহনা, খাট-বিছানা, আলমারী ছাড়াও তিন হাজার টাকা নগদ দিতে হবে। এটা কিছুতেই কমাতে চাইলেন না হরেনের মা। মেজকর্তা দাদাকে বললেন, 'আমি শুনেছি ওর মার কিছু দেনা আছে, সেই জন্যেই জোর করছে টাকাটার জন্যে। মানুষটা একটু মেয়ে-কাপ্তেন গোছের আর কি!......নগদ টাকাটা পাবার আশাতেই এক কথায় ওরা পছন্দও করেছে, নইলে অমন সুন্দর ছেলে, আমাদের মেয়ে ওর পাশে মানায় না, সে তো আমরাই বুঝছি। ওটার জন্যে এ পাত্র হাতছাড়া ক'রো না।'

'টাকার কথা তুমি জান' অভয়পদ চিন্তিত মুখে উত্তর দিলে, 'কিন্তু শাশুড়ীর যে রকম হাত—এর পরে? আবারও যদি দেনা করে? এখানে দেবে মেয়ে?'

'এর পর দেনা করে সে বুঝবে! আমি খুব ভাল ক'রে খোঁজ নিয়েছি—বাড়ি ছিল হরেনের বাবার নামে—চার ভাই ওরা, ছোট এখনও নাবালক, বাড়ি তো আর বাঁধা দিতে পারবে না। তাছাড়া, বুঁচিই তো হবে বড় বৌ, ছেলে-পুলে হ'লে ও-ই বাড়ির গিন্নী হবে—তখন আর শাশুড়ীর কী জোরই বা থাকবে। ছেলে ভাল চাকরী করে—আপনার গণ্ডা আপনি বুঝে নিতে পারলেই হ'ল!'

'দ্যাখো যা ভাল বোঝ।' অভয় নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় ভাইয়ের ওপর ছেড়ে দেয় সব।

সেইখানেই বিয়ে ঠিক হয়েছে, সামনের আটই বিয়ে।

ঘটা ক'রেই বিয়ে দেবে কর্তারা। এ গ্রামের সব বাড়ি থেকেই একটি ক'রে বলা হবে, পাড়ায় বাড়িসুদ্ধ সবাই। এ ছাড়া আত্মীয়-কুটুম্ব তো আছেই। পৈতে-টৈতে যা এর আগে হয়ে গেছে, এই বলতে গেলে প্রথম কাজ—সকলকে আনা চাই-ই, ক্ষীরোদা বার বার করে বলে দিয়েছেন। তিনি এখন আর খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। কিন্তু চোখ কান, দুই-ই ভাল আছে। বসে বসে তিনিই সব ফর্দ করলেন—কোথায় কোথায় বলতে হবে। সবসুদ্ধ পাঁচশ' লোক দাঁড়াল।

মহাশ্বেতা এরই মধ্যে একদিন স্বামীকে ধরে বললে, 'হ্যাঁ গা, তা তোমরা অত বোকা কেন?'

স্ত্রীর মুখে অপরের সম্বন্ধে বুদ্ধিহীনতার অভিযোগ এতই অভিনব যে, এই প্রথম না হ'লেও, অভয় বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আর স্বামীর এই বিস্ময় তার নিজের বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি ভেবে মহাশ্বেতা যৎপরোনাস্তি পুলকিত হয়ে ওঠে।

'বলি সেই যেকালে এতটি খরচ হচ্ছে—ও পাঁচশ' লোক ধরছ, শেষ পজ্জন্ত ছশ, সাতশ'য় দাঁড়াবে—তখন এক কাজে দুই কাজ সেরে নিলে না কেন?'

'তার মানে?'

তবুও বুঝতে পারে না অভয়পদ।

'একেবারে এই সঙ্গে আমাদের বুড়োর বিয়েটা দিয়ে কাজ চুকিয়ে দিলে না কেন?'

'বুড়োর বিয়ে? বুড়োর বিয়ে দোব?' অভয়পদ প্রায় বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ গো। ছেলের বিয়ে দিতে হবে না?'

'তা সে এরই মধ্যে কি?'

'ওমা, তা ওর কি বিয়ের বয়স হয় নি? তুমি তো পেরায় ঐ বয়সেই বিয়ে করেছিলে!'

'আমি রোজগার করতুম, তাছাড়া তখন সংসারে করবার কেউ ছিল না।'

'হ্যাঁ তাই সাত বছরের মেয়ে এনেছিলে! আর আমিই কি আর বুড়ো ধাড়ী মেয়ে আনতে বলছি, ছোটখাটো দেখেই একটি আনতে চাই আমি। আমার এক মেয়ে যাচ্ছে আর এক মেয়ে আসবে। এই তো সোজা কথা।'

'তা তোমার ছেলে বিয়ে করবে—বৌকে খাওয়াবে কি? না লেখাপড়া শিখল, না কোন কাজকম্ম। কিছু তো একটা ক'রে খেতে হবে।'

'নাও! তোমার ছেলের বৌকে তুমি দু-মুঠো ভাত দিতে পারবে না বুঝি? এ বাড়িতে যে ভাত রোজ গরুর ডাবায় যায় সে ভাতে একটা ছোট-খাট সংসার প্রিতি-পালন হয়। সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি মেয়ে দ্যাখো!'

'আমরা না হয় এখন খেতে দিলুম। এর পর? সংসার বাড়বে না ওর?'

'সে যখন বাড়বে তখন নিজেরই জ্ঞানচৈতন্যি হবে। মাথার ওপর চাপ পড়লেই বাপও বলবে।...লেখাপড়া তো আমার কোন ছেলেই শেখে নি—তাই বলে ওদের বিয়ে হবে না? বেটার বিয়ে আবার লেখাপড়ার জন্যে আটকায়?'

যেন অকাট্য যুক্তি দিয়ে বিজয়গর্বে মুখটা ঘুরিয়ে নেয় মহাশ্বেতা।

এ লোকের সঙ্গে তর্ক করা চলে না, আপাতত প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে অভয়পদ বলে, 'আচ্ছা সে হবে এখন!

স্বামীর নির্বুদ্ধিতায় করুণা হয় মহাশ্বেতার, 'ওমা, অবাক করেছে! সে হবে কি গো! এই তো আটুই বুঁচির বে, দিলে তো ছ তারিখেই বুড়োরটা দিতে হয়—তবে তো বে-বৌভাত এক যজ্ঞিতে হবে!'

'তা সে তো আর মাঝে দশটি দিন বাকী—মেয়ে কোথায়? মেয়ে কিছু ঠিক করেছ?'

'আমি ঠিক করব কি? আমি কি ঠিক করবার কত্তা? এ বাড়িতে আমার ঠিকে কিছু হয়? যাঁরা করবার কত্তা সেই আসল কত্তাগিন্নীকে বলো!'

'তাঁদের তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—এই আট-দশ দিন সময় আছে হাতে, —এখন কোথায় মেয়ে কোথায় মেয়ে খুঁজে বেড়াক!'

'কী তুমি বলো—আমার ছেলের বে দেব শুনলে পঞ্চাশ গন্ডা মেয়ে এসে পায়ে গড়াবে—'

'তা আগে গড়াক, মেয়ে ঠিক করো—তারপর দেখা যাবে। আর ছেলের বিয়ে দিয়ে যদি চিরকাল তার সংসার টানতে পারি তো বৌ-ভাতে দু'-একশ' লোকও খাওয়াতে পারব। তার জন্যে তোমায় এত মাথা ঘামাতে হবে না।'

ঐখানেই ও প্রসঙ্গের পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে যায় অভয়পদ।

মহাশ্বেতা গজ-গজ করতে থাকে আপনমনেই, 'দেবে না তাই বলো! মহা-রাণীদের মত নেই তাই বলো। নইলে মেয়ের আবার ভাবনা! দশ দিন কেন, তিন দিনে মেয়ে ঠিক হয়। খবরটা একবার চাউর হ'লে হয়—বলে কত মেয়ের বাপ হাত ধুয়ে বসে আছে এ বাড়িতে মেয়ে দেবে বলে—।'

অরুণকে সবাই মুখ-চোরা, লাজুক, ঘরকুনো বলেই জানত—কিন্তু স্বর্ণলতার বিয়েতে যেন নবকলেবর ধারণ করল সে। এ যেন সে অরুণই নয়। হঠাৎ যেন তার উৎসাহই শুধু নয়—সপ্রতিভতাও বেড়ে গেল। সে-ই খাটল সবচেয়ে বেশী, দৌড়ঝাঁপ ছুটোছুটিতেও সে কারুর চেয়ে কম গেল না। ওর কর্মক্ষমতা দেখে

সবাই অবাক হয়ে গেল।

অরুণের এই সক্রিয় সহযোগিতায় কর্তাদেরই উপকার হ'ল সবচেয়ে বেশী। আর কোন ছেলেই মানুষের মতো নয়, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার মতো তো নয়ই। সবচেয়ে যেটা বিপদের কথা—পয়সাকড়ির ব্যাপার তাদের দিয়ে আদৌ বিশ্বাস নেই। ওদের যা বয়স তাতে হাত-খরচা দরকার হবার কথা, অথচ এ বাড়ীতে সে কথা কেউ চিন্তাও করে না। এই বিবাহে তাদের অনেকখানি আশা-ভরসা ছিল। যে ভাগাড়ে মড়া পড়ে কদাচিৎ, সেই ভাগাড়ের শকুনিদের মতোই ক্ষুধার্ত অবস্থা তাদের। সে সম্বন্ধে কর্তারাও সচেতন, তাই হাতে ক'রে পয়সা খরচ করার, যা কাজ তার বেশির ভাগই এসে পড়ল অরুণের ঘাড়ে। এতে করে ছেলের দল আর একদফা বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল তার ওপর। কিন্তু কর্তারা উপকৃত হলেন।

অরুণের সেই অমানুষিক পরিশ্রম সকলেরই চোখে পড়ল। বলাবলিও করতে লাগল সকলে, 'দ্যাখো, কার ভেতর কি গুণ থাকে কেউ বলতে পারে না! করছে তো বাপু, সময়ে খাওয়া নেই ঘুম নেই—ভূতের মতো খাটছে উদয়-অস্ত চৌপরদিন!'

স্বর্ণলতার বিয়ে—সে সম্বন্ধে তার নিজের উদাসীন থাকারই কথা, তার ছোট কাকী তাকে সে কথা বলেও দিয়েছে, 'খবরদার, তুই কোন কথায় কথা কইতে যাস নি যেন—তাহ'লে ভারি নিন্দে হবে। বলবে মেয়ে বড় বেহায়া, পাঁচটা কুটুম-সাক্ষেৎ আসছে তো......তোমার তো আবার সব তাতেই ফোড়ন দেওয়া স্বভাব, তাই আগে থাকতে সাবধান ক'রে দিচ্ছি!'

তা এ কদিন মুখে 'গো' দিয়ে ছিলও সে। কিন্তু একটা মানুষ মুখে রক্ত তুলে মরে যাচ্ছে, তার দিকে কেউ তাকাবার লোক নেই—দেখেই বা সে চুপ করে থাকে কী করে? সে ওকে আড়ালে ডেকে বলে, 'বলি, ও কী আদিখ্যেতা হচ্ছে একটা ভারী অসুখ না বাধালে বুঝি চলছে না? এ সব আমাকে জব্দ করার মতলব আঁটা—নয়?'

আগের মতো কাঁচু-মাচু মুখে ঘাড় হেঁট করল না অরুণ, বেশ সপ্রতিভ হাসি-মুখেই বলল, 'কেন—কী করলুম?'

'কী করলুম! সময়ে না হোক, দিনান্তে দুটো ভাতও তো মুখে তুলতে হয়! খাওয়া-দাওয়া যে ছেড়েই দিলে একেবারে......আর তার ওপর এই ভূতের খাটুনি। দুটো খেয়ে অন্তত আমায় কেতাত্ত করো!'

'খাওয়া তো আছেই—রইলও; তোমার বিয়ে তো আর হবে না, এই একবার!'

'আমার বে-তে তোমার কি হাত বেরোচ্ছে শুনি যে, তোমায় ওপোস করতে হবে? আর দুটো ভাতে বসলেই বা কত দুপোর সময় নষ্ট হয়? না না, ও-সব চালাকী ছাড় বলছি, নইলে আমাকেই সেই ধরে নে গে রান্নাঘরে জোর ক'রে বসিয়ে খাওয়াতে হবে। তা সে লোকে আমাকে বেহায়া বলুক আর যাই বলুক!'

'ও, বেহায়া বলবার ভয়ে এই কটা দিন চুপ করে আছ বুঝি?'

'আছিই তো, নইলে দেখিয়ে দিতুম মজা। আদিখ্যেতা ক'রে না খেয়ে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ ক'রে দিতুম একেবারে। তা কথা তো কেবল এইড়ে যাচ্ছ—খাবে না কি?'

'খাব খাব।...কিন্তু বুচি, তুমি যখন থাকবে না—তখন কে আমার খাওয়ার খবরদারী করবে?'

'সে তো আমি দেখতে আসব না—কী করছ! আর সেদিন তো আমাকে কথা দিয়েছ—ঠিক ঠিক খাওয়া-দাওয়া করবে, শরীরের দিকে নজর রাখবে!'

'*কথা দিয়েছি নাকি?*'

'বা-রে ছেলে! এরই মধ্যে ভুলে মেরে দিয়েছ! তা'হলে তুমি যা করবে এর পরে—তা বুঝতেই পারছি! কিন্তু আমি আসব মধ্যে মধ্যে সেটি মনে রেখো—এসে যদি দেখি অমনি শুকনো চেহারা, তা'হলে কিন্তু পুঁথি-পত্তর সব টান মেরে পুকুরের জলে ফেলে দেব!'

'দিও দিও, তাই দিও। সে রকম চেহারা দেখলে তো দেবে।' হাসতে থাকে সে।...

অরুণ জলপানি পেয়েছে পনেরো টাকা করে। সে খবরটা পাওয়া গেছে কদিন আগেই। স্বর্ণলতাকে আর কিছু বলতে হয় নি, অম্বিকাপদ নিজেই ডেকে বলেছে অরুণকে, 'কোন্ কলেজে পড়বে এবার—কিছু ঠিক করলে?......বিয়েটা চুকে যাক্ আর দেরি করে দরকার নেই, কোন্ কলেজে পড়বে, আই-এ না আই-এস-সি ঠিক ক'রে ভর্তি হয়ে যাও, টাকা-পয়সা কি লাগবে জানিও, আমি দিয়ে দোব। আমি কাজে থাকি—তোমার মাসীর কাছ থেকে চেয়ে নিও, কোন লজ্জা করো না।'

পুঁথি-পত্রের কথাতেই বোধহয় কথাটা মনে পড়ে যায় স্বর্ণর, হঠাৎ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার জলপানির টাকা থেকে আমাকে কি দেবে অরুণদা?'

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অরুণ, সে কোন উত্তর দেয় না। স্বর্ণর মুখের দিকে তাকিয়েই থাকে শুধু।

'কৈ বললে না?' অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ঝঙ্কার দিয়েই ওঠে স্বর্ণ, 'বাব্বা, এরই মধ্যে পয়সায় এত টান! খরচার কথা উঠতেই মুখে কুলুপ পড়ে গেল!'

'তোমাকে?' অরুণের যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গে, 'তোমাকে তো পুরো টাকাটাই দিতে পারি। কিন্তু তুমি কোথায় থাকবে আর আমি কোথায় থাকব—।'

'ওমা, এই তো এ-পাড়া ও-পাড়া বলতে গেলে। কত নশ পঞ্চাশ কোশ দূরে যাচ্ছি গা?......তা কি দেবে সেইটেই বলো না বাপু!'

'আর যদি জলপানি না পাই?' কেমন একটা বিচিত্রদৃষ্টিতে চায় অরুণ।

'সে আবার কি কথা! সরকারী কাগজে নাম উঠে গেল, মেজ-কা ছোট-কা—দু-দুজনে স্বচক্ষে দেখেছে—পাবে না কেন?......তোমার যত সব উদ্ঘুটি কথা বাপু!...চলো চলো—তুমি যা জিনিস দেবে তা খুব বুঝেছি, সেই থেকে হেজ্জাহিজ্জি, মুখের কথা একটা তাই বেরোল না—তা পয়সা বেরোবে! এখন দয়া ক'রে দুটো খাবে চলো দিকি!'

'তুমি বেড়ে দেবে ভাত?...বেহায়া বলবে না লোকে?'

'ওমা ভাত-বেড়ে দিলে বেহায়া বলবে কেন? কথা কইতেই দোষ। যার বে তার সেই বে-র কথায় থাকতে নেই—বুঝলে?'...

বিয়ের রাত্রেও একা যেন দশ হাতে কাজ করল অরুণ। কোন মানুষ যে এত খাটতে পারে, বিশেষ তার মতো ঘরকুনো গ্রন্থকীট মানুষ—তা কেউ ধারণাই করতে পারে নি এর আগে। চোখে না দেখলে বিশ্বাসও করত না কেউ। শুধু বিয়ের সময় যখন পিঁড়ি ঘোরাতে বলেছিল—সে রাজী হয় নি। বলেছিল, 'আমার যে এদিকে অনেক কাজ, তোমরা আর কাউকে দ্যাখো বরং—'। অবশ্য তারপরই কে কথা তুলিছিল, 'যাদের বে হয়েছে—গুষ্টির জামাইরাই পিঁড়ি ধরবে। এতগুলো জামাই থাকতে আইবুড়োরা ধরবে কিসের জন্যে! তবে দেখো বাপু, যাদের বৌ মরেছে তারা যেন ধরো নি।'

সন্ধ্যের আগে থেকে, কনে-সাজানোর শুরু থেকেই—আর তার দেখা পায় নি স্বর্ণ। উৎসুক চোখে দরজার দিকে তাকিয়েছে বারবার, বারবারই প্রত্যাশা করেছে তাকে। বিশেষত সাজানোর সময় অনেকেই এসে দেখে গেল, ভাইয়েরা সবাই এল

—অরুণদা আসতে পারল না। 'কেমন দেখাচ্ছে' অনুচ্চারিত এই প্রশ্ন সব মেয়ের মনেই থাকে এ সময়টা, এবং সকলের মুখ থেকেই শুনতে চায় সে। অরুণ আসবে এবং প্রশংসা করবে—এটা খুবই আশা ছিল স্বর্ণর কিন্তু সে যেন এ দিক দিয়েই হাঁটল না।

শেষে আর থাকতে না পেরে ছোটভাই গুপোকে ডেকে একসময় প্রশ্ন করল সে, 'হ্যাঁ রে, অরুণদাকে একবারও দেখতে পাচ্ছি না কেন রে? কোথায় কী করছে সে?'

'ও বাবা, তার কি কাজের অন্ত আছে আজ—সে-ই তো ম্যানেজার গো। মেজকাকা তাকেই সব বুঝো দিয়েছে যে!'

'তবেই তো মাথা কিনেছে! এই শোন্ না, তোকে কাল যাবার সময় একটা পয়সা দোব, একবার ছুট্টে গে ডেকে আনবি অরুণদাকে?'

একটা গোটা পয়সার লোভেও গুপো উৎসাহিত হয়ে উঠল না তেমন। সন্দিগ্ধ সুরে বলল, 'আসবে কি—দেখি! তার আজ পাত্তা পাওয়াই দায়!'

সে গেল কিন্তু আর ফিরল না। বর আসতে যখন তাকে বরের চাদরের ওপর বসিয়ে রেখে যে যার চলে গেল তখন একা একা বসে ভাবতে লাগল—দুপুর-বেলা ছোট কাকী ওকে ডেকে খাইয়েছিল কি না। পই-পই করে তো বলে দিয়েছিল। ও যা ছেলে, ওকে জোর ক'রে না খাওয়ালে খাবেই না কখনও, তা সে তুমি কেন তিন-দিন শুকিয়ে রাখো না! তবু ভাগ্যিস দুপুরবেলা দুধ-সন্দেশ খাবার সময় জোর করে সে একটা সন্দেশ খাইয়ে দিয়েছিল। তাই কি খেতে চায়, কত বকা-ধমকা ক'রে খাইয়েছে সে।...হয়ত ঐ পর্যন্তই। আর কিছুই পেটে পড়ে নি।...বাবুরা সব ফোড়ন কাটতেই আছেন—একটু নজর রাখতে পারেন না কেউ। তাই সেই সন্দেশ খাওয়ানোর সময় ছোটকাকার কী কথা—বলে, 'হ্যাঁরে, তা ওর গার্জেন তো পরের বাড়ি চলল, এখন ওকে কে দেখবে?...তুই বরং এক কাজ কর—ওকে তোর তোরঙ্গের মধ্যে করে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যা!'

শোন কথা একবার। সে নিয়ে যাবার হ'লে ও ঠিকই নিয়ে যেত—নিজের ভাইয়ের মতো—দোষই বা কি? কিন্তু কিছুদিন পুরনো না হ'লে, তাদের চিনে না নিতে পারলে কি আর স্যাহস করা যায়? তা সেও খুব শুনিয়ে দিয়েছে ছোট কাকাকে, 'কেন তোমরা একটু দেখতে পার না? দেখা তো উচিত। একটা বামুনের ছেলে উপোস ক'রে থাকলে পাপটা মন্যিটা কার লাগবে শুনি? আমি তো পরের ঘরে চললুম! পর গোত্তর হয়ে যাব আজ থেকে!'

বিয়ের সময় কোন দিকে চাইতে পারে নি স্বর্ণ, তবে অরুণ ছিল না সেখানে। থাকলে অন্তত গলা পেত সে। রাত্রে বাসর ঘরে সবাই এসে একবার ক'রে উঁকি মেরে মেয়েদের কাছে তাড়া খেয়ে চলে গেল—অরুণ ছাড়া। তার খবরও পেলে না, বর-মিন্‌সে পাশে বসে, লজ্জায় সে কথাই কইতে পারল না কারুর সঙ্গে।

একেবারে সকালে একবার খুঁজে বার করেছিল সে। কী চেহারাই হয়েছে বাবুর —অসুরের মতো খেটে আর না খেয়ে। চোখ-মুখ বসে গেছে একেবারে—দৃষ্টি রক্তবর্ণ, চোখের কোলে তিন বুরুল কালি।

'বা, চেহারার তো বেশ খোলতাই হয়েছে! বলি এবার এ দেহ ত্যাগ করবে বলে মতলব এ'টেছ নাকি! কী পেয়েছ কি!'

সে কথার উত্তর দেয় নি অরুণ, ম্লান হেসেছিল একটু! অবসন্ন, ক্লান্ত হাসি।

'বলি কাল থেকে তো কিছুই পেটে নেই, তা সকালে একটু চা-টাও কি খেতে নেই! হাঁড়ি হাঁড়ি চা ফুটছে তো দেখতে পাই, যেমন মেজকা চা দুচোক্ষে দেখতে

পারত না—তেমনি চায়ের রেলা হয়েছে আজকাল। তা একটু চা, দুটো মিষ্টিও তো খেতে পারো?'

'খাবই এখন। খেতে তো হবেই। তোমারই বা চেহারার কী ছিরি হয়েছে। আয়নায় দেখেছ?'

'দেখেছি! রুক্ষু চুল, রাতজাগা—ও অমন হয়। কাল ছিলে কোথায়—কাল যখন সাজলুম গুজলুম তখন দেখতে পারলে না?'

সে কথার উত্তর দিল না অরুণ। বলল, 'তা তুমি কি খাবে এখন?'

'ওমা, আমি খাব কি। এখন কুশণ্ডিকেয় বসতে হবে না? খাওয়া আজ যার নাম ধরো গে সেই তিনটেয়—। কিন্তু তুমি এক কাজ করো দিকি, চট্ করে দুটো পান্তুয়া নিয়ে এসো দিকি!'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চায় অরুণ।

'কেন বলো তো? কার জন্যে?'

'নিয়েই এসো না বাপু। আমি কি এ বাড়ির দুটো পান্তুয়াও খরচ করতে পারি না—তার জন্যে এত কৈফেৎ দিতে হবে!'

অগত্যা নিয়ে আসে অরুণ। একটা মাটির গেলাসে করে।

'নাও, খাও।' মুখের সামনে ধরে স্বর্ণ।

'পাগল নাকি? আমার এখনও মুখ পর্যন্ত ধোওয়া হয় নি।'

'খাও বলছি, নইলে অনর্থ কুলুক্ষেত্তর কাণ্ড করব। আমাকে চেন না!'

অগত্যা খেতে হয়। কিন্তু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খায় সে—স্বর্ণর মুখের দিকে চাইতে পারে না। স্বর্ণর মনে হয় ওষুধ-গেলা পাঁচনগেলা করে খাচ্ছে—তাই এদিকে চায় না।

নরম গলায় বলে, 'মিষ্টি খেতে ভাল লাগছে না—না? দুখানা মাছ খাবে? আমিই নিয়ে আসছি নয়?'

কিন্তু অরুণ আর উত্তর দেয় না, স্বর্ণ কিছু বোঝবার কি বাধা দেবার আগেই ছুটে পালিয়ে যায় সেখান থেকে!...

সেই যা ওর সঙ্গে দেখা। আর সারা দিনে ধারে-কাছেও আসে নি স্বর্ণর।

যাত্রাকালে মেয়ে-জামাই আশীর্বাদের সময় অন্তত সে এসে দাঁড়াবে আশীর্বাদ করবে—সবাই আশা করেছিল, তাও এল না। স্বর্ণর সে সময় অবশ্য কোন জ্ঞান নেই—সে কেঁদে ভাসাচ্ছে, কিন্তু খেয়াল করেছিল মহাশ্বেতাই, কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিল, 'অরুণটা কোথায় গেল, সে আশীব্বাদ করবে না? ওরে, তোরা কেউ দ্যাখ না!'

প্রমীলা বলেছিল, 'হ্যাঁ, সে যা ছেলে—এই কান্নাকাটির ভেতরে সে আসবে! সে যা ভালবাসে ওকে, দ্যাখো গে যাও বাগানের কোন্ কোণে সেঁদিয়ে বসে আছে—মাটি ভাসাচ্ছে সেখানকার। এমনিই তো চোখ দুটো জবাফুলের মতো হয়ে রয়েছে সকাল থেকে—'

তবু, গাড়িতে ওঠার সময় অন্তত তাকে কাছাকাছি কোথাও দেখা যাবে ভেবেছিল সকলে, তাও এল না। তারপর অবশ্য অত কারও খেয়ালও ছিল না। বড়রা কান্নাকাটি করছে তখনও, কুটুম্বিনীরা এলিয়ে পড়েছে—কর্তারা বসে গিয়েছিল পরের দিন ফুলশয্যার তত্ত্ব সম্বন্ধে পরামর্শ করতে। কী কী আছে—কী কী কিনতে হবে, ক্ষীরের ছাঁচগুলো মেয়েরা তুলতে পারবে কি না—এই নিয়েই তাদের চিন্তা।

আজ রাতটুকু পোয়ালে কালই তো তত্ত্ব গুছনো—সময়ই বা আর কই?

খেয়াল পড়ল অনেক রাত্রে, খেতে দেবার সময়ে। তরলাই সকলকে ভাত দিচ্ছিল, সে-ই বললে, 'অরুণ? অরুণ কোথায় গেল রে?'

বুড়ো মুখ বাঁকিয়ে বললে, 'কে জানে বাবা তোমাদের ভালছেলের খবর আমরা রাখব কেমন করে? দ্যাখো গে যাও, হয়ত বাগানে গিয়ে বসে আছে কোথাও!'

'তা যা, কেউ খুঁজে গিয়ে নিয়ে আয় তোরা—'

'কে যায় এই এত রাত্তিরে বাগানে খুঁজতে। সে বুঁচিরই পোষায়, আমরা কোথায় খুঁজব!'

কেষ্ট বললে, 'থাক না—দুপুর রাত্তিরে যখন শ্যালে এসে ঠ্যাং ধরে টানবে তখন হুঁশ হবে বাছাধনের, বাগানে গিয়ে থাকার মজা টের পাবেন।'

'ও কি কথা রে!' মহাশ্বেতা ধমক দিয়ে ওঠে। এই কদিন তার মেয়ের বিয়েতে অরুণ যা অমানুষিক পরিশ্রম করেছে তা সে চোখেই দেখেছে। তারপর তার সম্বন্ধে স্নেহার্দ্র হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। মহাশ্বেতার তো বিশেষ করে, রাগ বা দ্বেষ সে কারুর সম্বন্ধেই বেশীক্ষণ মনে রাখতে পারে না, দুটি লোক ছাড়া। সে বলে, 'দ্যাখ্ খুঁজে ভাল ক'রে, যা গাধার খাটুনি খাটল কদিন, খাওয়া নেই ঘুম নেই —হয়ত কোথাও ঘুমিয়েই পড়েছে বাছা। ছাদটা দেখে আয় দিকি, চিলেকোঠার ঘরটা আগে দ্যাখ—'

ছাদ, চিলেকোঠার ঘর, উপর, নিচে, বাগান সব খোঁজা হ'ল—অরুণ নেই। আলো নিয়ে হৈ হৈ করে একপাল ছেলে বেরিয়ে পড়ল বাগানে—শেষের দিকে অভয়পদ অম্বিকাপদও বেরোল—যেখানে যত সম্ভাব্যস্থান ছিল বসে থাকার মতো সব দেখা হ'ল, অভয়পদ পাইখানা তার পিছনের বাঁশঝাড় সব দেখে এল নিজে—কোথাও কোন চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

এবার সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল! গেল কোথায় ছোকরা?

এখন অনেকেরই মনে হ'ল যে ওর ভাবভঙ্গীটা কদিন ধরেই খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। কিন্তু তাই বলে—এমন নিঃশব্দে কোথায় যাবে, করবেই বা কি?

কে একজন বললে, 'বুঁচির শ্বশুরবাড়িতে চলে গেল না তো? খুব ভালবাসত তো বুঁচি—দ্যাখো, হয়ত কাঁদতে কাঁদতে সেইখানেই চলে গেছে!'

'দূর, পাগল নাকি—সে যা লাজুক!' কথাটা উড়িয়ে দিল প্রমীলা।

হঠাৎ মনে পড়ল অম্বিকাপদর—বিকেলের দিকে, ঠিক আশীর্বাদের আগে কী একটা কাগজে-মোড়া প্যাকেট মতো ওর হাতে দিয়ে বলেছিল, 'এটা একটু বাক্সয় তুলে রাখবেন মেসোমশাই?'—কী জিনিস সেটা সেও বলে নি, অম্বিকাপদও জিজ্ঞাসা করে নি। তখন জিজ্ঞাসা করার সময়ও ছিল না তার। প্রয়োজন আছে বলেও মনে করে নি অবশ্য। এই কদিনেই যেন সাবালক হয়ে উঠেছিল অরুণ, ওর ওপর একটা আশ্চর্য নির্ভরতা এসেছিল সকলের। অকারণে সে কিছু বলছে না বা করছে না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল অম্বিকাপদ।

এখন গিয়ে তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে দেখল, বিভিন্ন দফায় বিভিন্ন কাজ বাবদ ওকে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল, তারই জমা খরচ—নির্ভুল হিসাব। যেখানে যা রসিদ, ক্যাশমেমো বা ফর্দ পাওয়া গেছে—তাও আছে সেইসঙ্গে একটা পিনে গাঁথা—আর বাকী টাকা পয়সা। এগারোটি পয়সা মেলে নি, তাও লেখা আছে গরমিল বলে।

এত কাজ এত ব্যস্ততার মধ্যে এমনভাবে হিসাব দিতে গেল কেন?

এই প্রথম একটা সন্দেহ দেখা দিল সকলকার মনে।

তবে কি আগে থাকতেই ছোকরার কোথাও সরে পড়বার মতলব ছিল মনে মনে?

কিন্তু এভাবে কোথায় যাবে? কিছুই তো নিয়ে যায় নি। খোঁজ ক'রে দেখা গেল—যা জামা কাপড় তার পরণে ছিল তাছাড়া বাড়তি জামা-কাপড়ও নেয় নি।...

সে রাত্রে আর কিছু করা সম্ভব নয়। সকলেই মানসিক একটা থমথমে অবস্থায় চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়ল। এমন কি ছেলের দলও কেমন যেন হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল—তারাও নির্বাক হয়ে গেল। এ আবার কী হ'ল, এরকম একটা-কিছুর জন্যে তো প্রস্তুত ছিল না তারা!

পরের দিনও একটু আধটু খোঁজ করা হ'ল পাড়াঘরে। কেউই দেখে নি। তাকে বিশেষ কেউ চিনত না, কারণ বাড়ির বাইরে যেত সে কদাচিৎ।

তার পরের দিন ডাকে একটা চিঠি এল অম্বিকাপদর নামে। হাওড়া স্টেশন থেকে ফেলা হয়েছে, হাওড়া আর, এম, এস্-এর ছাপ রয়েছে।

চিঠিতে লেখা ঃ

"শ্রীচরণেষু, মেসোমশাই, আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, আমি ভালই আছি। আপনারা আমার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার ঋণ শোধ হওয়ার নয়। যদি পারি তো মানুষ হইয়া সে ঋণ শোধের চেষ্টা করিব। বলিয়া আসিতে পারি নাই, অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনি প্রণাম লইবেন, প্রণম্য ও প্রণম্যাদের প্রণাম দিবেন।

ইতি—সেবক অরুণ।"

এ চিঠিতে কৌতূহল বেড়েই গেল, শুধু কিছুই জানা গেল না।

কেন গেল সে—এ প্রশ্ন নিরুত্তরিতই থেকে গেল। কেন এবং কোথায় গেল।

কেন? কেন? কী দুঃখে? কী ভাবল সে, কী মনে ক'রে এমনভাবে সরে পড়ল?

সে কি কারও ওপর অভিমানে? ছেলেদের ওপর রাগ ক'রে?

সম্ভব অসম্ভব বহু জল্পনা-কল্পনা ও বহু উত্তরেও সমস্যাটা যেমন অমীমাংসিত ছিল তেমনই রয়ে গেল।

শেষ অবধি দুর্গাপদ এক কথায় আলোচনার উপসংহার টেনে দিল, 'গ্রহ! গ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়। ওর জন্মলগ্নে বোধহয় সবকটা গ্রহই বিরূপ ছিল—নইলে বাপ-মাই বা এমন বাদে-ছরাদে যাবে কেন? এখানে এমন ভাল ব্যবস্থা—মেজদা কলেজে পড়াতে চাইলে, জলপানি পেয়েছিল, হয়ত ফ্রীও পড়তে পারত কলেজে--কোথায় লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করবে ভাল দেখে—জীবনে উন্নতি করবে, তা নয় ভাগ্যাবণ্ডের খাতায় নাম লেখাতে গেল। গ্রহ ছাড়া আর কী বলব! দ্যাখো, যদি দিনকতক বাদে ফিরে আসে, সুমতি হয় আবার!'......

স্বর্ণলতাকে ওখানে কেউ কিছু বলে নি, এখানে এসে শুনল। শ্বশুরবাড়ির হাজারো গল্প করবে বলে পেট ফুলছিল তার, কলকল করতে করতে নেমেছিল পাল্‌কি থেকে, খবরটা শুনে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার সমস্ত আনন্দ, মনের মতো সুন্দর বর পাওয়ার সমস্ত সৌভাগ্য-বোধ যেন নিমেষে ম্লান হয়ে গেল।

অরুণদা এমন করলে! কলেজে পড়ল না। কত শখ তার বি-এ পাশ করার! সেইজন্যে অমনভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, 'যদি জলপানি না পাই!' এই মতলব ছিল তাহলে!

কিন্তু কেন এমন করলে সে? কেন? কেন?

তার দুই চোখের কূল ছাপিয়ে অশ্রুর ধারা নামল। নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল সে।

আহা, কোথায় আছে, কী খাচ্ছে সে। কেউ কি তাকে ডেকে খাওয়াচ্ছে? যা লাজুক, হয়ত না খেয়েই মরে যাবে। সে যে কারুর কাছ থেকে চেয়ে কিছু খাবে

তা তো মনে হয় না।......

তবে একেবারে নিঃসম্বল যায় নি সে। দু-তিন-দিন পরে মনে পড়ল স্বর্ণলতার চ এক পয়সা এক পয়সা করে জমানো সাতটা টাকা ছিল ওর। ভায়েদের ভয়ে অনেক কষ্টে লুকিয়ে রাখত। বিয়ের দুদিন আগে সেই টাকা-সাতটা সে অরুণের জিম্মা করে দিয়েছিল। বলেছিল, 'আমি তো কদিন থাকব না, এরা সব উটকে পাটকে বার ক'রে নেবে। এ কটা টাকা তুমি একটু ঠিকানা করে রেখে দাও অরুণদা—'

অরুণ বলেছিল, 'বেশ লোককে জিম্মে করছ! কেন, তোমার তো নতুন পোর্ট-ম্যাণ্ট কেনা হয়েছে—তুমি নিয়ে যাও না।'

'না না—তুমি বোঝ না। ওরা যদি বাক্সপ্যাঁটরা খুলে দেখে? শুনেছি অনেক শ্বশুরবাড়িতে বৌয়ের বাক্সে মুখদেখানি আশীব্বাদী টাকা যা থাকে বার করে নেয়। এটাও যদি সেই সঙ্গে বার করে নেয়?'

'আর আমাকে দিচ্ছ, আমি যদি মেরে দিই? খরচ করে ফেলি?'

'সে তো খুব ভাল। তুমি এক্ষুনি খরচ করো না—আমার কোন দুঃখ নেই!' বলেছিল স্বর্ণ। অবশ্য তখন স্বপ্নেও ভাবে নি অরুণ প্রাণ ধরে তার টাকা খরচ করতে পারবে!

সেই টাকা সাতটাই সঙ্গে আছে নিশ্চয়। সব পাই-পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে—সেটা তো দেয় নি! হয়ত ঐটুকু সুমতি হয়েছে তার, হয়ত ওর টাকাতে তার জোর আছে, নিয়ে গেলেও কিছু মনে করবে না—এ বিশ্বাস হয়েছে শেষ পর্যন্ত। হে ভগবান, তাই যেন হয়, হে মা কালীঘাটের কালী, টাকা কটা যেন নিয়ে থাকে সঙ্গে, এখানে যেন না কোথাও ফেলে গিয়ে থাকে। হে বাবা তারকনাথ—তাকে দেখো।

কথাটা কিন্তু কাউকে বলে না স্বর্ণ। কী দরকার, হয়ত ভুল বুঝবে সবাই, ভায়েরা রটাবে বুচির টাকা ভেঙ্গে পালিয়েছে।

স্বর্ণ তো জানে—সে তেমন ছেলেই নয়।

যদি এমন হবে জানত তো তার আশীর্বাদী টাকা থেকেও আর কটা টাকা দিয়ে যেত ওকে!

॥ ৩ ॥

অভয়পদ ভেবেছিল স্বর্ণলতার বিয়ের গোলমালে বুড়োর বিয়ের হুজুগটা মহাশ্বেতা ভুলে যাবে। ভুলে গিয়েও ছিল অনেকটা—বেশ কটা মাস চুপচাপ ছিল—হঠাৎ পাড়াতে কোন্ ছেলের বিয়ে হচ্ছে শুনে আবার মনে পড়ে গেল তার।

তখনই খুঁজে খুঁজে গিয়ে স্বামীকে ধরলে, 'বলি কৈ গো, আমার বুড়োর বে দেবার কী করলে?'

সেদিন রবিবার, বাইরের রকে বসে কী একটা হিসেব দেখছিল অভয়পদ, অন্য-মনস্কভাবে মুখ না তুলেই উত্তর দিলে, 'মেয়ে ঠিক হয়েছে?'

'পোড়া কপাল আমার। মেয়ে তোমাদের না জানিয়ে না দেখিয়ে আমরা ঠিক ক'রে ফেলব!'

'তা কৈ সে মেয়ে?' সেই রকম অন্যমনস্কভাবেই আবার বলে সে।

'মেয়ে কৈ তা আমরা কী জানি, মেয়ে কি আমি খুঁজব?......বাঃ, বেশ কথা তোমাদের!......আমরা মেয়েছেলে মেয়ে দেখে বেড়াব পাড়ায় পাড়ায়—না?'

'তাহলে দুদিন সবুর করো। এই তো এখনও মেয়ের বিয়ের ধাক্কাই কাটে নি, তত্ত্ব-তাবাসে জেরবার হয়ে যাচ্ছি—এরই মধ্যে ছেলের বিয়ে দেব কি করে? আর এত তাড়াই বা কি—ছেলে তো আর অরক্ষণা হয়ে যাচ্ছে না।'

'ও মা, তা ছেলের বে'তে কি ঘর থেকে খরচ করব নাকি? সে তো ঘরে আনবে উল্‌টে!'

হ্যাঁ, তা আর নয়! কত গুণের ছেলে তোমার, তাই আবার একগাদা টাকা-পয়সা ঢেলে বিয়ে দেবে লোকে!'

'ছেলে যেমনই হোক, বংশটা কেমন? তোমাদের একটা নাম নেই? সবাই জানে তোমরা বড়লোক, তোমাদের অবস্থা ভাল। দেখো, এ বাড়িতে মেয়ে দিতে পারবে জানলে হন্যে হয়ে ছুটে আসবে সব—'

'দেখি।' বলে আবার হিসেবে মন দেয় অভয়পদ......

এবার কিন্তু আর কথাটা জুড়োতে দেয় না মহাশ্বেতা। দুদিন একদিন অন্তরই তাগাদা করে। যতই প্রতিজ্ঞা করুক 'মহারাজ-মহারানীকে কোন দিন কোন কাজে সুপারিশ করবে না—সে নিচু হ'তে যাবে ওদের কাছে, কিসের জন্যে গা, সে কি এ বাড়ির বড়বৌ নয়?'—সে প্রতিজ্ঞাও শেষ অবধি রাখতে পারে না। মেজবৌকে গিয়ে বলে, 'কতদিন খেটে খেটে মরবি লো এমন ক'রে—একটা বৌ আন!'

'বৌ—?' এক মুহূর্ত সময় লাগে প্রমীলার কথাটা বুঝতে, ও, বুড়োর বে'র কথা বলছ? সে তো ভাল কথা। লাগাও দিদি। সত্যি বুঁচিটা চলে গিয়ে যেন বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে, অমনি একটি ছোটোখাটো মেয়ে ঘুরে বেড়াবে, তবে না!'

এবার শুরু হয়ে যায় ডবল তাগাদা। প্রমীলারও যেন উৎসাহের অন্ত নেই।

অগত্যা মেয়ে খুঁজতে বেরোন ছাড়া উপায় থাকে না কর্তাদের।

অবশ্য ওদের খুব চেষ্টা করতে হয়ও না। মহাশ্বেতাই ঠিক বলেছিল, কথাটা প্রচার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক-হাঁটাহাঁটি শুরু হয়ে গেল। সকাল বিকেল বাড়িতে বসতে পারে না কর্তারা। অনেক সময় কুটুমের সূত্র ধরে লোক আসে, তাদের জলখাবার দিতে হয়, খরচাও হয়ে যায় বিস্তর।

মহাশ্বেতা বিজয়গর্বে বলে 'কী গো, মেয়ে দেবে কে এই ভেবে তো অস্থির হচ্ছিলে! এ তো সদরের জমি চষে ফেলছে দেখি মেয়ের বাপরা। বলি সংসারটা আমি বেশী চিনি না তুমি বেশী চেনো—এবার টের পাচ্ছ কিছু?'......

মেয়ে দেখলও এরা খুব।

মেয়ে পছন্দ হয় তো ঘর পছন্দ হয় না—আবার এদের পছন্দ তো তারা পিছিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। এদের পয়সার কথা শুনে ছুটে আসে—কিন্তু ছেলের সঙ্গে কথা-বার্তা কয়ে বেশভূষা দেখে ভয় পেয়ে যায়। পয়সাটার নাম আছে কিন্তু ঠিক যে কত তা কেউই জানে না। কেউ কাউকে সিন্দুক খুলে দেখায় না—জিগ্যেসও করা যায় না সোজাসুজি। আর জিগ্যেস করলেই বা সত্যি কথা বলবে তার ঠিক কি? খুব পয়সা থাকলে কি কেউ এভাবে থাকে?

এদের যতই পয়সা হোক, কাপড়-জামা দেখে বোঝার উপায় নেই। বড়কর্তা বারোমাস 'গুণচট'-এর মতো একটি ধুতি পরে, সেটাও হাঁটুর উপর উঠে থাকে সর্বদা, তার সঙ্গে একটি পুরু জিনের কোট। এ কোটগুলো নাকি রেলের—কোন বাবুর সঙ্গে ব্যবস্থা করে সামান্য কিছু দিয়ে কেনে, এই জামা ভারী পছন্দ অভয়পদর—কারণ এ এক-একটা জামা দুবছর ক'রে যায়। ধোপার বাড়ি দেবার বালাই নেই, সপ্তাহে একদিন ক্ষারে কেচে নেয়। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তিনশ' ষাট দিনই ঐ একই

পোশাক। বিয়ে-পৈতে নেমন্তন্ন বাড়িতেও ঐ পোশাকেই যায় সে, তখনও ধুতিটা হাঁটুর নিচে নামানো প্রয়োজন বোধ করে না। একটা গেঞ্জিও কখনও ব্যবহার করে না কোটের নিচে। মেজকর্তা সাধারণত টুইলের হাফশার্ট পরে, তার ধুতিটাও অপেক্ষাকৃত ভদ্র। তবে সে ধুতিও হাঁটুর নীচে নামে না। লম্বা কোঁচায় নাকি যতরাজ্যের পথের ধুলো ঘরে আসে—তা ছাড়া রাস্তায় লুটিয়ে কাপড়ও নষ্ট হয়। পায়ে বেধে পড়ে যাবারও সম্ভাবনা থাকে।

এদের মধ্যে ছোটকর্তাই একটু শৌখীন, ছিটের শার্ট পরে। ধুতিও তার পাতলা, শুধু তাই নয়, সামনের কোঁচা পাট করে নিচের অংশ ওপরে গুঁজলেও তার কাপড় গোছ পর্যন্ত নামে। দু'একখানা দেশী ধুতিও বেরোবে তার বাক্স খুঁজলে।

ছেলেদের মধ্যে একেবারে ছোটরা এখনও পাঠশালায় বা স্থানীয় মিড্‌ল্‌ স্কুলে যায় কেউ কেউ, মেজোর ছেলেরা দু'একবার ক'রে সব ক্লাসেই ফেল করলেও খাতায় নাম আছে তাদের হাই স্কুলেও—তাদের জামা আছে, তবু সেও যৎপরোনাস্তি সাধারণ ও সামান্য। বড়রা কোন কাজই করে না, লেখাপড়ারও কোন পাট নেই—তারা জামাও গায়ে দেয় না বিশেষ কেউ। বাড়িতে খালি গায়েই থাকে, শীতকাল হ'লে কিছু একটা গায়ে দেয়, ছেঁড়া গায়ের কাপড় কি বড়দের পরিত্যক্ত জামা—যে যা পায়। বাইরে বেরোবার জামা আছে প্রত্যেকেরই কিন্তু সেও ক্ষারে কেচে তুলে রাখা, ইস্ত্রী করা হয় না—বার করে কোনদিন পরে বেরোলে এই গ্রামের ছেলেরাও হাসে। বাড়িতে ইস্ত্রী আছে—অভয়পদ কোন জিনিসেরই অভাব রাখে নি—কিন্তু এত পরিশ্রম করার কোন প্রয়োজন বোঝে না ওরা। একমাত্র ন্যাড়া এবং মেজকর্তার দুই ছেলে যতটা পারে ইস্ত্রী করে নেয়, নিজেরা, ওদের জামা ছমাসে-নমাসে ধোপার বাড়িতেও যায়। ধুতি যা পরে ওরা সবাই প্রমাণ দশহাত-চুয়াল্লিশ ইঞ্চি, কিন্তু বাড়িতে যখন থাকে চলাচলের সুবিধার জন্য কোমরের দুদিকে খানিকটা ক'রে তুলে, কোঁচা ভাঁজ করে নিয়ে কিংবা কোমরে জড়িয়ে হাঁটুর ওপরে রাখে সর্বদা। সে অবস্থায় তাদের দেখলে—আর যারা হঠাৎ এসে পড়ে তারা তো দেখেই—এদের পয়সা আছে বলে মনে হয় না, এদের কারও হাতে মেয়ে দিতেও ইচ্ছে করে না। বুড়ো যখন ছেলে-দেখা দিতে আসে তখন জামাও গায়ে দেয় একটা, একখানা কাচা ধুতিও পরে—তবু তাতে বিশেষ কোন উন্নতি হয় না তার আকৃতির। ফলে অনেক মেয়ের বাপই মেয়ে কাঁটা হয়ে গলায় বিঁধে থাকা সত্ত্বেও—এ পাত্রে মেয়ে দিতে সাহস করে না, বৃহত্তর কাঁটা হয়ে চিরজীবন বিঁধে থাকবার ভয়ে।

অনেক খুঁজে অভয়পদ অবশেষে তার এক পুরনো বন্ধুর মেয়েকেই ঠিক করে ফেলল। অভয়ের সঙ্গেই কাজ করতেন ভদ্রলোক, অবশ্য তার চেয়ে বয়সে বড়—কিছুদিন আগে অবসর নিতে হয়েছে তাঁকে। বহুদিন একসঙ্গে কাজ করেছে. মেয়ের বাবা এসে হাতদুটো জড়িয়ে ধরতে আর 'না' বলতে পারল না। বিশেষ করে কী টাকা সম্বল করে বাড়িতে এসে বসতে হয়েছে তা অভয়পদ ভালই জানে। মেয়েটিও অবশ্য এদের বেশ পছন্দ হ'ল—তিন ভায়েরই। মেয়েরা কেউ দেখতে গেল না. একবার প্রমীলা কথা তুলেছিল, 'চ না ভাই দিদি দেখে আসি, এই তো কাছেই—?' কিন্তু মহাশ্বেতা সেটা বলতে গিয়ে ধমক খেলে অভয়ের কাছে, 'তোমাদের যা পছন্দর নমুনা —তা তো ছোট বৌমার বেলাই দেখেছি, আর বাহাদুরীতে কাজ নেই।...তাছাড়া আমাদের সকলের পছন্দ হয়েছে—কথা দেওয়া হয়ে গেছে—এখন গিয়ে কি করবে তোমরা?'

সুতরাং বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। কিছুই দিতে পারবেন না পাত্রীপক্ষরা। একশ' একান্ন টাকা নগদ। মেয়ের চুড়ি হার, চারখানি নমস্কারী আর সামান্য কিছু

দানের বাসন। এ বাসন নাকি দীর্ঘকাল সিন্দুকে তোলা ছিল, সেইগুলোই রসান দিইয়ে নেবেন—মেয়ের বাবা স্পষ্টই বলে দিলেন।

অম্বিকাপদ একটু খুঁত-খুঁত করছিল কিন্তু দাদার মুখের দিকে চেয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেল। যদিও বেশ বারকতকই শুনিয়ে দিল যে, 'তাই তো, এখনই তো দেখছি তাহ'লে স্যাকরা ডেকে তাগা বালা গড়াতে দিতে হয়। বাড়ির বড় বৌ—মোটা-মুটি-গা সাজানো না হ'লে এদের সঙ্গে বেরোতেও তো পারবে না কোথাও—এটা তো আগেই করাতে হবে। তার ওপর লোকজন খাওয়া, গায়ে হলুদ—ধরো একটি হাজার টাকা খরচ—কম পক্ষে। সবটাই তো দেখছি ঘর থেকে বার করতে হবে।'

অভয়পদ কিন্তু চুপ করেই রইল। মেজভাই দাদাকে চেনে, কথা দেওয়া হয়ে গেছে, আর সে কথার নড়চড় হবে না। অগত্যা অপ্রসন্ন মনে হ'লেও সব ব্যবস্থাই এ বাড়ির মাপে করতে হয় তাকে।

কন্যাপক্ষ গায়ে-হলুদ ফুলশয্যার তত্ত্ব গায়ে-গায়ে কাটাবার প্রস্তাব করেছিল, অম্বিকাপদরও খুব আপত্তি ছিল না তাতে, কারণ সে জানে তত্ত্ব যা আসে তাতে খরচের কিছু কম্‌তি হয় না, যা যায় তা নগদ টাকা বার করে নিয়ে যায়—কিন্তু প্রমীলাই ঘোরতর আপত্তি করল, 'আমাদের প্রথম ছেলের বে, সাধআহ্লাদ কিছু মিট্‌বে না, এ আবার কি কথা? তত্ত্ব আমরা ছাড়ব না।'

অর্থাৎ তাদেরও গায়ে-হলুদের তত্ত্ব পাঠাতে হবে। খুব নমো নমো করে সারলেও কোন্ না সওয়াশ' দেড়শ' টাকা খরচা! মেয়েবুদ্ধি আর কাকে বলে!

মুখখানা বিকৃত করলেও স্ত্রীর মুখের ওপর বেশী প্রতিবাদ করার সাহস হ'ল না অবশ্য। তত্ত্বের ফর্দ করতে বসতে হ'ল।

বুড়োর বিয়ে হয়ে গেল বেশ সমারোহ সহকারেই। স্বর্ণর বিয়ের মতো অত লোক না হলেও—শেষ পর্যন্ত চার শ' সাড়ে চারশ' লোক খেল। অবশ্য বৌভাতের দিনটা কী একটা ছুটির দিন পড়ায় মেজকর্তা 'ভেতো যজ্ঞি' ক'রে সারল। দুপুরবেলা মাছ-ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা। এইটেই যা একটু মন খুঁত-খুঁত করতে লাগল মহাশ্বেতার। তার বিয়েতেও এরা এই কাণ্ড করেছিল, তখনও পছন্দ হয় নি তার। কেমন যেন অসম্পূর্ণ মনে হয়েছিল বিবাহের উৎসবটা। এটুকু ছেলেবেলার সংস্কার এখনও আছে। কিন্তু মেজকর্তা অকাট্য যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিল, 'পয়সা তো কিছু ঘরে আসে নি, ঘর থেকে খরচা করে আর কাঁহাতক কী করব? রাত্তিরে লুচির যজ্ঞিতে যে শুধু ঘি খরচা হয় তাই তো নয়—কুটুম-সাক্ষাতের অর্ধেক লোক রাতটা থেকে যাবে। তাদের শোবার ব্যবস্থা রে, পরের দিন খাওয়া জলখাবারের পাট রে—অনেক হাঙ্গামা। তার চেয়ে এ দিনে দিনে চুকে যাবে, যতই দেরি হোক্ সন্ধ্যের বেশী তো নয়—সবাইকে যে যার বাড়িতে চালান করে দেওয়া যাবে।

অগত্যা চুপ করে যেতে হ'ল মহাশ্বেতাকে।

তা অবশ্য তার বিয়ের যজ্ঞির মতো কিছু নয়; বেশ ভাল ব্যবস্থাই করেছিল মেজকর্তা। প্রথম পাতে শাক সুক্তো থেকে শুরু করে মুড়িঘণ্ট ছ্যাঁচড়া ভাজা—কিছু বাদ দেয় নি। মিষ্টিও করেছিল দুরকম—সন্দেশ লেডিকেনি। উপরন্তু নগদ পাঁচসের দুধ কিনে পায়েস করিয়েছিল, তাও প্রায় সবাইকে এক চামচ এক চামচ বাটা হ'ল—শুধু যা একেবারে শেষ 'ব্যাচ' আর বাড়ির লোকদেরই কুলোয় নি। তা না হোক, তাতে দুঃখ নেই, শেষের দিকে কম পড়েই—এ পাড়ায় তো যত বাড়িই কাজ হয় মহাশ্বেতা দেখে—শেষের দিকে মাছই থাকে না, আলু আর কাঁটা পড়ে পাতে।

এ তো মাছের এলকেল একেবারে।

না মোটামুটি খুশীই হয়েছে মহাশ্বেতা।

শুধু একটা নিরানন্দর কথা সে কাউকে মুখ ফুটে বলতে না পারলেও কাঁটার মতো খচখচ করতে লাগল। এত কাণ্ড হ'ল—এত লোক খেয়ে গেল তার বাড়ি এউ-ঢেউ করে, কেবল তার বাপের বাড়ির লোকই কেউ এল না। হেম নতুন বদলি হয়ে গেছে জামালপুরে, মধ্যে একবার ছুটি নিয়ে এসে বৌ আর ছেলেকে নিয়ে গেছে —তার পক্ষে এখনই ছুটি নেওয়া নাকি সম্ভব নয়। সে বুচির বিয়েতেও আসতে পারে নি। দুর্গাপদ অবশ্য বাঁকা কথা বলে। সে বলে ঃ 'তুমি রেখে বোস দিকি, বৌ-ছেলে আনবার পাস আর ছুটি তো গুনতির বাইরে। তার যা ছুটি পাওনা আছে তাতে তিনবার আসতে পারে ওরা। পাসও তো একগাদা পাওনা, ঢুকে এস্তক পাস তো কখনই নিলে না। তা নয়, আসল কথাটা আলাদা, পাসে না হয় গাড়ি ভাড়াটাই বাঁচল, বলি আসা-যাওয়ার আর খরচা নেই? অতদূর থেকে আসা! ওখান-কার নতুন খরচ বেড়েছে, সস্তাগণ্ডার দেশ বটে—তবু তো একটা সংসার পেতে বসা, এখানে তোমার মাও তো তাঁর হোটেল খরচা ছাড়েন নি, সেটি তো ঠিক গুণে নিচ্ছেন। পাবেই বা কোথা থেকে?'

তা হয়ত হবে। তবে বিশ্বাস হয় না কথাটা ঠিক। দাদা কেন মিছে কথা লিখবে? এরা নিজেদের মতোই জগৎ দেখে!

আবার ভাবে সত্যিই, টাকা তো আর টানলে বাড়ে না, পাবেই বা অত কোথা থেকে।......

তবু তো দাদার নজর আছে। দুটো টাকা মণিঅর্ডার করে পাঠিয়েছে—মুখ-দেকানি। মা টাকার আণ্ডিলে বসে থেকেও একখানা কোরা ধুতি আর কখানা চিনির পুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন আইবুড়ো ভাত! এই বড় নাতি, সব্বার বড় এ। তাও একদিন নাতি-নাতবৌকে নেমন্তন্ন পর্যন্ত করতে পারলেন না! কে জানে করবে কিনা—এখনও তো সে নাম মুখে আনে নি......গজগজ করে মহাশ্বেতা আপন মনে।

তা হোক, কেউ যদি আসতও! এত মাছ এত মিষ্টি, ফেলা-ছড়া গেল। কে যে সব কোথায় রইল! সীতার শ্বশুরবাড়িতেও নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল ন্যাড়া। তারা কেউ আসে নি। সীতা আসতে পারে নি টাকার অভাবে। ন্যাড়াকে সে চুপিচুপি বলেই দিয়েছে, 'ভিক্ষের অন্নে তো বেঁচে আছি, নৌকতা করব কী দিয়ে? যাওয়া আসার গাড়ি-ভাড়াও তো আছে! না মেজদা, সে আর হবে না। তুমি বড়-মাসীকে বুঝিয়ে বলো।'

কান্তি আসতে পারত, সেও এল না। তার আবার লজ্জা। একে ঐ অবস্থা, লোকের কথা শুনতে পায় না, তার ওপর এবার যাহোক মরিবাঁচি করে এগজামিন দিয়েছিল—পাস করতে পারে নি। সেই লজ্জাই বড়। বড় অসুখটা শুধু ওর কান নিয়েই যায় নি, মাথারও সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে......হতভাগা যারা হয়, তাদের সর্বদিক দিয়েই যে মারেন ভগবান।

এদিকে যা হোক্—বুড়োর স্ত্রী-ভাগ্যটা খুব ভাল—তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করল। অভয়পদরও পছন্দর তারিফ করল সবাই। বৌ শুধু যে ফুটফুটে হয়েছে তাই নয়, এই তো মোটে বছর বারো তেরো বয়স, এরই মধ্যে যা ছেয়ালো গড়ন দেখা যাচ্ছে তাতে বয়সকালে বেশ ভালো চেহারাই দাঁড়াবে, রীতিমতো রূপসী হয়ে উঠবে।

মহাশ্বেতার আড়ালে প্রমীলা বললে, 'হ্যাঁলো ও ছুট্‌কী—এ কী করলেন বট্‌-ঠাকুর—বেছে বেছে মুক্তোর মালা এনে বানরের গলায় ঝোলালেন?'

তরলার নিজের একদিন এ বাড়িতে এসে যে অবস্থা হয়েছিল তা সে এখনও ভোলে নি, বুড়োর বৌ এত ভাল না হ'লে বোধহয় তার কিছু সান্ত্বনা থাকত—সুশ্রী বৌ আসাতে কোথায় যেন তার একটু আশাভঙ্গও হয়েছে মনে-মনে, বিশেষ ক'রে বড় ভাসুরের মন্তব্যটা কাঁটার মতো খচখচ করছে—সে একটু ম্লান হেসে বলে, 'এ বাড়ির এই ধারা যে মেজদি, নইলে আমাকে আপনারা বেছে বেছে নিয়ে এসে ঐ সুন্দর মানুষের ঘাড়ে চাপাবেন কেন?'

'তা হোক! উত্তেজিত হয়ে ওঠে প্রমীলা, 'ছোট কত্তার মহাভাগ্যি যে তোমার মতো বৌ পেয়েছে। জা-দেইজী চিরকেলে শত্তুর, তবু একথা যদি গরমানি্য খাই তো মহাপাতক হবে। ও কটা রঙে কী এসে গেল। মানুষটা তো শিমুল ফুল!'

তরলা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'দিদি, ভগবান কখনও দুটো জিনিস মেয়েদের একসঙ্গে দেন না! রূপ দিলে আর বরাত দেন না। ও মেয়ে ভাল পাত্তরে পড়বার নয়—কথাতেই তো আছে, অতিবড় রূপসী না পায় বর! তাছাড়া হাজার হোক বট্‌ঠাকুরের প্রথম সন্তান তো—তিনি কি আর ছেলের বিদ্যেবুদ্ধির কথা ভেবে কুচ্ছিত মেয়ে আনবেন? তাঁর প্রথম বৌ! মানুষটা যতই চাপা হোক, বাপ তো!'

তারপর আরও একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'তবে কালোকুচ্ছিত আনলেই ভাল করতেন হয়ত; সে নিজের বরাত ফলিয়ে হয়ত ঐ বরেরই লক্ষ্মী উছলে দিত!'

'বলা যায় না। দ্যাখ্। বড়গিন্নীর এখন পাথরে পাঁচ কীল, ঐ মেয়েই হয়ত কপাল ফলাবে দেখিস!'

ঈষৎ একটু প্রচ্ছন্ন-ঈর্ষাতুর কণ্ঠে বলে প্রমীলা।......

বৌ মহাশ্বেতারও খুব পছন্দ হয়েছিল গোড়ায়। বেশ একটু বিজয়গর্বও অনুভব করেছিল সে। তার ছেলে অক্ষম, মূর্খ—ওর আবার মেয়ে জুটবে কি?—একথা মুখ ফুটে ঠিক সকলে না বললেও মনের ভাব যে সকলকারই এই রকম ছিল তা তো আর অজানা নেই। আর লোকেরই বা অপরাধ কি, ওর জন্মদাতাই যদি তাই বলে তো তারা বলবে না কেন? এবার তারা দেখুক—মেয়ে জোটে কি না। শুধু জোটা নয়, কী মেয়ে এনেছে ওই ছেলে তাও দেখে যাক সবাই। এ মেয়ে রাজারাজড়ার ঘর থেকে এসে সেধে নিয়ে যেত সবাই—সন্ধান পেলে।

কিন্তু সে আনন্দ আর গর্ব বেশীদিন থাকে না। নতুনের চমক কেটে গেলে তার একটু দুশ্চিন্তাই হয়। এ কী মেয়ে, একে সে সামলাবে কেমন করে?

মেয়েটা যেন দস্যি একেবারে—যেমন সদা সপ্রতিভ, তেমনি চঞ্চল-স্বভাব। কতকটা মেজগিন্নীরই ধরণ। প্রথম যখন মেজবৌ আসে অমনি ছিল। অপছন্দটা হয়ত আরও বেশী সেই কারণেই। কিন্তু মেজবৌও ঠিক এতটা চঞ্চল এতটা সপ্রতিভ ছিল না। এ যেন বড় বেশী চঞ্চল। ছেলেমানুষ বলে মানিয়ে যাচ্ছে, সকলে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে কিন্তু বড় হয়েও যদি না শোধরায়?

মহা চেয়েছিল তার এক মেয়ে গিয়ে আর এক মেয়ে আসবে। বরং সে ছিল ঘর-জ্বালানে পর-ভালানে, মাকে মানত না, ওদের—মানে 'শত্তুর'দের বশ হয়েছিল, এ ব্যাটার বৌ, তাকে ভয় ক'রে চলবে—মনের মতো ক'রে গড়ে নিতে পারবে। কিন্তু এ যে এল এককাঠি সরেস! স্বর্ণর স্বভাবের বিপরীত একেবারে। সে ছিল ছেলেবেলা থেকেই যেন গিন্নীবান্নী, ঘর-সংসারের কাজে ঝোঁক বেশী, রান্নাঘরে থাকতেই ভালবাসত। এ এক মিনিট কোথাও স্থির থাকতে পারে না। এধারে খাটতে চায় না যে তা নয়—গতরও খুব, এই ছেলেমানুষ মেয়ে বোধহয় ওর চেয়ে বেশী ওজনের ঘড়া ক'রে দমাদম জল আনে ঘাট থেকে, বড় বড় শীলনোড়া পেড়ে তাল তাল বাটনা

বেটে দেয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে, কিন্তু বসে বসে ধীর কাজ একদম করতে চায় না। কড়াইশঁটি ছাড়াতে বললে কি শাক বাছতে বললে যেন মাথায় বজ্রাঘাত হয় একেবারে, মুখ শুকিয়ে যায়—কোনমতে জোর করে এনে বসালেও একটু এদিক ওদিক দেখেই উঠে পালায়।

তা সে কাজকর্ম যাই হোক, স্বভাবটা নিয়েই বেশী চিন্তা মহার। 'একটু যেন বেহায়া-মতো বাপু, যা-ই বলো। বেহায়া আর বাচাল। এখন তোমরা যাই বলে ঢাকো না কেন, আমাদের কালে এসব রীতি-ধরণকে বেহায়াপনাই বলত!' এক এক সময় মনের ভাবটা প্রকাশ ক'রেই ফেলে।

মেজগিন্নী বলে, 'ছেলেমানুষ, মেয়ের মতো। ও যে বৌ, এটা এখনও ওর মাথায় যায় নি। কীই বা বয়স। একটু সেয়ানা হোক, জ্ঞানগম্যি হোক, আপনিই শান্ত হয়ে যাবে। এখন থেকে অত ভাবতে হবে না!'

কিন্তু মহাশ্বেতা তা মানতে পারে না।

হোক্‌গে ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষ বলে কি সাতখুন মাপ নাকি? ছেলেবেলা থেকেই সহবৎ শেখাতে হয়। কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ!

তাছাড়া কীই বা এমন ছেলেমানুষ? মহাশ্বেতা তো আরও ছেলেমানুষ এসেছিল এ বাড়িতে। তখন ওর শাশুড়ী বড় বড় দেওরদের সঙ্গেই কথা কইতে দিতেন না। বলতেন, 'ভাসুরের মতো দেওর ওসব—ওদের সঙ্গে কথা কয়ো না বৌমা, পাড়াঘরে নিন্দে হবে!' মেজবৌ নিজেও তো এমন কিছু বয়সে আসে নি, প্রায় এই রকম বয়সেই তো এসে ঢুকেছিল এ বাড়িতে—কৈ, হাটিপাটি পেড়ে ভাসুরের সঙ্গে গল্প করেছিল কি? আর এ মেয়ে ভাসুর তো ভাসুর—শ্বশুরদের সঙ্গেই কথা কয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ মহাশ্বেতা শাসন করবে কি, যারা বড়—শাসন করার কর্তা, তারাই কিছু বলে না। অমন যে রাশভারী লোক অভয়পদ, তা তার সঙ্গেই বসে কলকল ক'রে এক গঙ্গা কথা বলে—সেও বেশ বসে বসে শোনে, হাসেও মধ্যে মধ্যে—শাসন করা তো চুলোয় যাক! মেজকর্তার সঙ্গেই যা আলাপটা খুব জমে না, তবে দুটো-চারটে কথা সেও যে না কয় তা নয়—ছোট কর্তা তো গলে গেছে একেবারে। আপিস থেকে ফিরে রোজ এক ঘণ্টা ধরে গল্প করা চাই ঐটুকু মেয়ের সঙ্গে। ওরাই যদি এমন ধারা ক'রে প্রশ্রয় দেয় তো সে শাশুড়ীর শাসন মানবে কেন?

মহাশ্বেতার সত্যিই ভাবনা হয় এক এক সময়ে।

অথচ কী যে করবে তাও ভেবে পায় না। কাউকে বলবারও যো নেই। সকলেই হেসে উড়িয়ে দেয়, ওকেই বরং পাগল বলে, উপহাস করে। জায়েরা বলে, 'দিদির যেমন কথা! এখনই যেন ছিষ্টি রসাতলে গেল একেবারে বোয়ের বেহায়াপনায়। দুদিন যাক না বাপু, তারপর ভাবতে বসো। এই তো সবে এয়েছে। এখানকার জল গায়ে বসুক। এখনই অত কেন?'

না, ওদিকে কারও সহানুভূতি নেই। মেয়েটা যেন সবাইকে জাদু করেছে বাড়িতে পা দিতে না দিতে। সবচেয়ে রাগ হয় যখন শাশুড়ী বলেন, 'অ বড়বৌমা, ও ছেলেমানুষ, মেয়ের মতো হেসেখেলে বেড়াচ্ছে বেড়াক না—দুটো একটা পেটে আসুক, একটু গিন্নীবান্নী হোক, আপনিই শুধ্‌রে যাবে। বলি মেজবৌও কি কম গেছো ছিল!'

ও ছেলেমানুষ, আর মহাশ্বেতা এসেছিল বুঝি তিনকেলে বুড়ী! তখন এসব বিবেচনা কোথায় ছিল!

না, শাসন করলে তাকে একাই করতে হবে। সাধারণভাবে যেটুকু করবার তা সে করেও মধ্যে মধ্যে, আবার কাছে বসিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর ক'রেও বোঝাবার চেষ্টা করে—কিন্তু মেয়েটা কোনটাই যেন গায়ে মাখে না। কথা তো শোনেই না, তার জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিতও নয়। অনুযোগ করলে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

অথচ ওকে যে ভয় করে বা এড়িয়ে চলে তাও নয়। এক পেট খেয়ে উঠেও শাশুড়ীর পাতের কাছে বসে অনায়াসে টকের বড়ি চেয়ে খায়। কাসুন্দির হাঁড়ি রোদে দিলেই ধর্ণা দিয়ে পড়ে, 'হেইমা আমাকে একটু দাও, তোমার পায়ে পড়ি!' এ মেয়েকে শাসন করবে সে কী করে?

তড়িৎপ্রভা নাম বৌয়ের। তড়িৎ মানে নাকি আকাশে ঐ যে বিদ্যুৎ চমকায়, ঐ বিদ্যুৎ। ছোটবৌ বলেছে তাকে। তা নাম সার্থক করেছে বটে। বিদ্যুতের মতোই চঞ্চল, এই আছে এই নেই।......

'মুয়ে আগুন বাপ মিন্‌সের! রাখার মতো আর নাম খুঁজে পেলে না! আমাদের হাড় ভাজা ভাজা করতে ঐ নাম দিয়ে বসে রইল!'

মাঝে মাঝে তার অরুণের কথাও মনে হয়।

'কোথায় যে গেল ছেলেটা। কী যে দুর্মতি হ'ল! থাকলে তার কাছে বই নিয়ে বসাতুম। আজকাল তো মেয়েদের লেখাপড়া শেখা হয়েছে—তবু একটু লেখাপড়া করলে যদি শান্ত হ'ত!'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

এ নতুন হুজুগটা যে কী তা বুঝতেই বেশ একটু সময় লাগল এদের। কারণ 'আইন মানব না' একথা পাগল ছাড়া যে আর কেউ বলতে পারে, তা কখনও ভাবে নি এরা। বাইরে যে বাতাস পাল্‌টেছে—বাতাস যে দ্রুত পালটাচ্ছে সে খবর এখানে পৌছয় না। ইংরেজের আইন মানবে না, আইন ভেঙ্গে জেলে যাবে—এই নাকি ঢেউ উঠেছে শহর-বাজারে, সে ঢেউ নাকি ওদের গাঁয়েও এসে পৌচেছে। সে তরঙ্গে আন্দোলিত হয়েছে ইতিমধ্যে অনেকগুলো জায়গাই ওদের আশেপাশে; সে ঢেউ এসে ভেঙ্গে পড়েছে ওদিকে সাঁতরাগাছি রামরাজাতলা এদিকে ডোমজুড় মাকড়দা—সর্বত্র। সে ঢেউ নাকি ওদের গাঁয়ে এসে আছড়ে পড়েছে। তার তরঙ্গে নাচছে দুলছে এই গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনও।

কিন্তু আইন মানবে না! আইন ভেঙ্গে জেলে যাবে! এ আবার কি কথা! এ যে অবিশ্বাস্য। এতবড় বুকের পাটা কার? জেল মানে কি, সেখানে পাথরভাঙ্গায়, ঘানি টানায়, রাস্তা পেটায়—সেখানে এতটুকু বদমাইশি করলে বুকের ওপর বাঁশ দিয়ে ডলে।

হ্যাঁ তাই করছে। আরও করছে। ঠেকো রুদ্দুরে সূর্যের দিকে মুখ করে ফেলে রাখছে, নখের মুড়িতে মুড়িতে পিন ফোটাচ্ছে, পায়ের নিচে দিচ্ছে বিছের কামড়—আরও কত কী। তবু জেলে যাচ্ছে দলে দলে সবাই, বড়লোকের ছেলেরা, বাবুদের ছেলেরা। বুড়োরাও নাকি যাচ্ছে। উকীল ব্যারিস্টার মাস্টার জমিদার—সব এক-

সঙ্গে। মার খেয়ে কত লোক পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে জন্মের মতো—তবু যাচ্ছে।

তাদের ওপর অত্যাচার দেখে বাঙ্গালী পুলিশ নাকি ক্ষেপে গেছে—সরকার তাই গুর্খা পুলিশ আমদানী করেছেন। তবু তাঁরা পেরে উঠছে না। মার খাবার এত লোক যে তারা মেরে শেষ করতে পারছে না।...

চোখ বড় বড় ক'রে খবরটা দেয় মহাশ্বেতা তার মাকে। খবরটা দিতেই ছুটে এসেছে সে। সেও বেশীদিন খবরটা পায় নি। তার জগৎ তার ঐ সংসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ শুধু নয়—একরকম সম্পূর্ণও। সংসারকেন্দ্রিক মনের শক্ত উঁচু পাঁচিল দিয়ে তা ঘেরা, তার মধ্যে বাইরের বাতাস ঢোকে কদাচিৎ। বাইরের খবর নিয়ে পুরুষরা মধ্যে মধ্যে আলোচনা করে বটে—কিন্তু সে যেন সুদূর কোন দেশের খবর, কারা যেন, কাদের যেন কথা—তার সঙ্গে ওদের সম্পর্ক ক্ষণিক কৌতূহলের শুধু। বিলেতে কি মার্কিন মুলুকে কি হচ্ছে তাও যেমন—পাঞ্জাব বা কাশ্মীরের ঘটনাও তেমনি ওদের কাছে। সে কোন্ দেশ কতদূরে, স্পষ্ট কোন ধারণা নেই—ধারণা করার কোন চেষ্টা বা আগ্রহও নেই। কী প্রয়োজন ওদের?

এ খবরেও প্রথমটা ওরা কান দেয় নি। দেবার সুযোগও হয় নি।

এসব খবর মেজকর্তা আর ছোটকর্তাতেই আলোচনা করে বেশির ভাগ। ছোট-কর্তাই এ বাড়ির গেজেট চিরকাল—কারণ সেই যা পাঁচজনের সঙ্গে মেশে, পাঁচ জায়-গায় যায়। মেজকর্তা তাই মধ্যে মধ্যে ছোটভাইকে ধরেই মোটামুটি খবর সংগ্রহ করে। বড় কোন দিনই কারুর সঙ্গে বসে গল্প করে না, বাড়িতে যতক্ষণ থাকে কোন না কোন কাজ নিয়ে থাকে। তাকে কেউ গিয়ে কোন কথা 'ওপরপড়া' হয়ে না শোনালে সে শোনে না। দরকারী কথা ছাড়া অত গরজ করে তাকে শোনাবেই বা কে? তা এবার নাকি তাও শোনাচ্ছে ছোটকর্তা। বাগানে গিয়ে তাকে শুনিয়ে আসে এসব খবর—কোথায় কী ঘটছে।

'তা তাদের ভেয়েভেয়ে কত কী কথা হয় বাপু বুঝিনে তো! কী কথা তো কী কথা। ওসব কথায় কান দিতে গেলে এ সংসার ঠেল্‌বে কে বলো! এই নারদের গুষ্টির ডানহাতের ব্যাপার দুবেলা চালানো তো চাট্টিখানি কথা নয়।...কাল আমা-দের ছোটকত্তা শোনালে ধরে তাই শুনলুম। ছোঁড়াগুলোও অবিশ্যি বলছিল কদিন ধরে—বলছিল আর হাসাহাসি করছিল—তা আমি বলি দূর হ, যে কথা নয় সেই কথা! তোরা সব যা পণ্ডিত, কী শুনতে কি—ধান শুনতে কান শুনেছিস। মুখ্খুর ডিম, তোরা বুঝিসও তো খুব, তোদের কারা বোকা বানিয়েছে। ইংরেজের রাজত্বে বাস করে তাদের আইন মানব না, পুলিশকে কেয়ার করব না, যা খুশী তাই করব, মনময় রাজত্বি—এ আবার নাকি হয়। বলি পুলিশের রুলের গুঁতো খেয়ে আর জেলে গিয়ে যদি ইংরেজ তাড়ানো যেত তো চোর-ডাকাতরা কবে ইংরেজকে তাড়িয়ে এদেশের রাজা হয়ে বসত।...তা ছোঁড়ারা বলে বিশ্বাস না হয় ছোটকাকে জিজ্ঞেস করো।... ওমা, কাল ছোটকত্তা নিজেই এসে বললে, ব্যাপার গতিক ভাল নয়, এমনি ধারাই সব হচ্ছে, সত্যিই নাকি। পুলিশও নাকি গেছে ক্ষেপে, যাকে পাচ্ছে তাকে ধরছে আর তেমনি নাকি বেধড়ক ঠেঙ্গাচ্ছেও। ছোটকর্তা আরও বললে অল্পবয়িসী ছেলে এক-জায়গায় দু'তিনজন দেখলেই পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—ও আর কিছু বাচছে না।... বিশেষ যদি হিঁদুর ছেলে হ'ল তো নাকি, কথাই নেই। বলে—তোমাদের বাড়ির এ যা দঙ্গল এর খবর পেলে আর রক্ষে থাকবে না, সামলে সুমলে রাখো কদিন।... তা কোথায় সামলাই বলো দিকি। এ কি আর এতটুকুটি আছে যে আঁচলের তলায় লুকিয়ে রাখব?'

ভুরু কুঁচকে—যেন একটু উৎসুকভাবে মায়ের মুখের দিকে চায় মহাশ্বেতা, বুদ্ধিটা নিতেই চায় হয়ত, সেইজন্যেই ছুটে এসেচে। কিন্তু তারও বলা শেষ হয় নি। মাকে উত্তর দেবার মতো অবসর না দিয়েই তাই আবার শুরু করে সে, 'মুখ-পোড়ারা কি কারও কথা শোনে! বলতে গেলে উল্‌টে আমায় দাবড়ায়, বলে থামো থামো তুমি আর বকো নি, আমাদের যারা ধরবে তারা এখনও মায়ের গব্‌ভে!...শোন কথা। বড় বড় দামড়া হয়েছে সব, ওদের কি কুলুপ দিয়ে রাখব গা? তাও বললুম আমার পাঁটাগুলোকে, দিনকতক নয় তোদের দিদ্‌মার কাছে গিয়ে থাক্‌গে যা না! তা বলে কি, হ্যাঁ, যাচ্ছি ঐ কিপটে বুড়ীর কাছে, আমাদের না খাইয়ে মেরে ফেলবে! যদ্দিন মাম্মী ছিল তদ্দিন তবু যা হোক—এখন তো বুড়ীর মজা।...এদের আমি কী করে সামলাই বল দিকিন! ভেবে ভেবে তো পেটের ভাত চাল হয়ে গেল!

আবারও একটু থামে। একটু উদ্বিগ্নভাবে মায়ের মুখের দিকে চায় কিন্তু এবারও তাঁর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে না। উদ্বেগের বদলে একটু গর্বের সুরই বরং ফোটে এবার। বলে, 'তবে তাও বলি, মুখ্‌খুই হোক আর যাই হোক্, এদিকে ছোঁড়াগুনো চালাক আছে খুব। ওরা ক'ভাই দাঁড়িয়ে যদি মুখ ছোটায় তাহলে পুলিশ তো পুলিশ—জজ ম্যাজিস্টারও ভেসে যাবে সে কথার তোড়ে।...আরও গুণ আছে বাপু, হক্ কথা যা বলব—ওরা বাইরে বিশেষ যায় না, নিজেদের মধ্যেই যা কিছু আড্ডা। পাড়া-ঘরে ঘুরে বেড়ানো কি বাজারে গিয়ে মুড়ুলি করা—সে সবে ওরা থাকে না। কোন খারাপ নজরও নেই, আর নেশাভাঙেও তেমন রত নয় ওরা। তাই ভাবি মরুক গে, নিজেদের জমিতে বসে থাকবে না বাড়ির ছেলেরা তো কি যে যার ঘরে খিল এ'টে থাকবে? এটুকু কি আর বুদ্ধি নেই পুলিশের, কে বজ্জাত আর কে ভাল—তারা খবর নেবে না? তবে তারা এতবড় রাজত্বিটা চালাচ্ছে কি করে? ..আবার ভয়ও হয়—কে জানে বাপু কী হবে, বুঝিও না তো কিছু!'

এবার অসহিষ্ণু হয়ে থামিয়ে দেন তাকে শ্যামা।

'তুই একটু চুপ কর দিকি। তোর ঐ একঘেয়ে ধগ্‌বগানি আর আমার ভাল লাগে না! ওসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাস কেন? অনেক দেখলুম এ পর্যন্ত! এ বয়সে হুজুগ কি আর কম দেখলুম! হুজুগ না তুললে যাদের পেটের ভাত হজম হয় না তারাই মধ্যে মধ্যে এই সব হুজুগ তোলে।...ও তুই রেখে বোস, রেখে বোস! অনেক দেখলুম এই বয়েসে। হুজুগ কি আর একটা—না একরকম! সেই এক রেলা দেখলুম দিনকতক—কী সমাচার, না বিলিতী কাপড় পরব না, বিলিতী চিনি খাব না। বিলিতী কাপড় পুড়েই নষ্ট হ'ল দেদার—তারপর তো আবার যে-কে সেই! আবার এক ঢেউ উঠল কি না, চরকা কাটো, খদ্দর পরো—তাহলেই দেশ স্বাধীন হবে! আর সব ইস্কুল কলেজ ছেড়ে দাও, ইংরেজদের ইস্কুলে পড়ব না! আ মর্—তাতে লাভ হ'ল কার? মাঝখান থেকে কতকগুলো ছেলের ইহকাল পরকাল মাটি। সে সব চরকা তো কোথায় কি গেল—উনুনে পুড়ে ভাত রান্না হয়ে নিশ্চিন্তি!...ঐ যে তোদের গুষ্টি বলত না—ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সন্দার! তা এও তাই!...আর বাপু তোদের কি ক্ষ্যামতা তোরা লড়বি ইংরেজদের সঙ্গে, কী আছে তোদের, কামানবন্দুক আছে? তাও তো অতবড় জার্মানীরা পারলে না! হুঃ! যে মহারানীর রাজত্বে সুয্যি অস্ত যেতে সাহস করে না সেই মহারানীর ফৌজের সঙ্গে লড়বি তোরা?'

দীর্ঘ বক্তৃতা দেন শ্যামাও। কিন্তু তাতেই যেন মনে মনে একটু বল পায় মহাশ্বেতা। তবু খানিকটা চুপ করে থেকে বলে, 'কিন্তু তা যাই বল বাবু, সেবার

তো ভাগ্যে বাংলা জোড়া লাগিয়ে ছিল ঐসব করে।'

'হ্যাঁ—তা আর নয়! ওদের সুবিধের জন্যে দুখানা করেছিল, সুবিধে হল না—আবার জুড়ে দিলে। তোদের এইসব তালপাতার সেপাইদের ভয়ে তো তারা শ্যালের গর্তে গিয়ে লুকিয়ে থাকে একেবারে!'

মহাশ্বেতা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে কী ভাবে, বুঝি মার কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করে। তারপরই আসল কথা মনে পড়ে যায়। বলে, 'মরুক গে, সে তো পরের কথা! এখন এ পাঁটাগুলোকে সামলাই কী করে তাই একটা যুক্তি দাও দিকিনি। দুষ্টু গোরুর সঙ্গে যদি কপ্‌লে গাইও বাঁধা পড়ে? বাবা অমনি ক'রে চোরের মার মারবে নাকি গো!'

বিরক্ত হয়ে ওঠেন শ্যামা, 'তোর যেমন কথা! শুধু শুধু সুখ-সোমন্দা ওদের ধরবে কিসের জন্যে রে? ওরা যদি ওসব হ্যাঙ্গামে না যায় তো ধরবে কেন? জেলে পুরলে তো খেতে দিতে হবে—বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে কেন শুধু শুধু?... আর খাওয়ালে তো ভালই—তবু জামাইয়ের দুটো পয়সা বাঁচে, ওদের নাম হয়। বেকার বসে বসে অন্ন ধ্বংসাচ্ছে বৈ তো নয়! তবে সে ভয় নেই, তোর ও পাঁটা-দের যমেও ছোঁবে না, তুই নিশ্চিন্ত থাক্!'

'ষাট্ ষাট্!' রাগ ক'রে উঠে দাঁড়ায় মহাশ্বেতা, 'যমের কথা আবার কী গা এর মধ্যে! ওরা তোমার কী করলে যে ওদের যমের অরুচি বলছ! ওরা কি তোমার খাচ্ছে, না তোমার পয়সা খসাচ্ছে?......তোমাকে কিপ্‌টে বলেছে বলে তুমি অত বড় গালটা দিলে?......দুর্গা দুর্গা, এখানে আসাই আমার ঝকমারি হয়েছে!'

সে আর দাঁড়ায় না। দালানের জানলায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বিধবা বোন, আসার আগে ভেবেছিল তার সঙ্গে বসে দুটো গল্প ক'রে যাবে—একেবার মতো ছুটি নিয়েই এসেছে জায়েদের কাছে, বলে এসেছে, 'এখন তো এক্‌টিনি দিয়ে রেখেছি আমার বৌকে, আমি যদি দুদণ্ড না-ই থাকি, সংসারটা চলবে না? আমি কি চির-জন্ম খাটব?'—এই ভেবেই ছুটি নিয়ে এসেছিল। এখন মার এই কথার পর আর সে প্রবৃত্তি রইল না। সে যখন আসে তখন কান্তি দেখতে পায় নি, পেছন ফিরে বাগানে কাজ করছিল, শব্দ তো পায়ই না—এখন ওকে দেখতে পেয়ে হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এল কথা কইবার জন্য—কিন্তু মহাশ্বেতা কোন দিকে তাকাল না, চোখ মুছতে মুছতে হন্‌হন্ করে বেরিয়ে গেল সোজা একেবারে রাস্তায়।

এ দৃশ্য নতুন নয়, বুঝলে যে মা কিছু বলেছেন, মর্মান্তিক কিছু। তার কান নেই, শুনতে পায় না, তবে বুঝতে পারে। মার মুখের কথা যে কী সাংঘাতিক, ইচ্ছে করলে যে তিনি সত্যি সত্যি বাক্যবাণই প্রয়োগ করতে পারেন তা সে জানে। ইদানীং আরও বেড়েছে, বৌদি—অমন ভালমানুষ শান্ত মেয়েও অস্থির হয়ে পড়ে-ছিল দুবেলা কথা শুনতে শুনতে। চলে গিয়ে বেঁচেছে। কিসের যেন একটা সাংঘাতিক জ্বালায় জ্বলছেন দিবারাত্র, সেই দাহই—চারিদিকে যারা থাকে—তাদের দগ্ধ করে। খুব দুঃখের দিনেও এত জ্বালা ছিল না, এখন যেন ঢের বেড়েছে। হয়ত কান্তিই এর প্রধান কারণ। ছোড়দিও। মেজদি—মেজদির মেয়ে। সব জড়ি-য়েই যে এ জ্বালা তা কান্তি বোঝে। তবু মনে হয়, এতদিন এতই সহ্য করলেন, মিছিমিছি এই শেষ বয়সে এমন করে সকলকে দুঃখ দিয়ে কী সান্ত্বনা পান উনি? ও'র জ্বালা কি এদের চোখের জলে কমে?

দিদির মুখখানা মনে ক'রে কান্তির চোখ ছল ছল করতে থাকে।

মনে পড়ে যায় ওর—বৌদিরা যেদিন জামালপুর চলে যাবে তার আগের দিনের

কথাটা। ছোটখাটো তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিস নিয়ে সেদিন সকাল থেকেই তার পিছনে লেগেছিলেন মা। ঘরমোছার সময় বুঝি পাপোশটা ঝাড়া হয় নি ঠিকমতো—যদিও কান্তি নিজের চোখে দেখেছিল বৌদিকে পাপোশ ঠুকেঠুকে ঝাড়তে, বাটনা বাটাও নাকি দায়-ঠেলা-গোছের হয়েছে (মায়ের ভাষায় কি তা জানে কান্তি, মা বলেন দুই সতীনে চিবিয়ে রাখা!)—এমনি নিতান্ত ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট উপলক্ষ।... সবচেয়ে শেষকালে কী কাণ্ডটাই না করলেন! দুপুরবেলা ও'র কাজ করতে দেরি হবে বলে বৌদিকে খেয়ে নিতে বলেছিলেন, বৌদি খায় নি—বোধহয় শেষ দিনটা বলেই; মা আরও যেন কতকটা ইচ্ছে করেই সেদিন চরম দেরি করলেন, একেবারে বেলা সাড়ে তিনটেয় খেতে এলেন। এটাও যেন বৌদির অপরাধ, খেতে বসে এই নিয়েই কী না শোনালেন এক ঝুড়ি কথা। কান্তি শুনতে পায় না তবে ঠোঁট-নাড়া দেখে আজকাল অনেক কথাই বুঝতে পারে, বিশেষ করে পরিচিত লোকদের কথা, যাদের ঠোঁটের ভঙ্গিতে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মনে হ'ল, মা এটাকে লোকদেখানো আদিখ্যেতা, কাষ্ঠনৌকতা ইত্যাদি বলে বিদ্রূপ করছেন। কিন্তু শুধু বিদ্রূপেই শেষ হ'ল না, সেটা শুধু শুরু। ক্রমশ কথাগুলো তীব্র ও তীক্ষ্ন হয়ে উঠল, তা ও'র ওষ্ঠের ভঙ্গীতেই শুধু নয়—দৃষ্টির পরুষ কঠোরতা থেকেও বুঝতে পারা গেল। বৌদি ও'র ছেলেকে নাতিকে ও'র কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, সন্তানকে পর করে দিচ্ছে—তার ষড়যন্ত্রেই ও'র অমন বাধ্য মাতৃভক্ত ছেলে ও'কে এই অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে বিদেশে চলে যাচ্ছে; ইচ্ছে করে তম্বির করিয়েই নাকি এই বদলির ব্যবস্থা করিয়েছে বৌদি—শাশুড়ীকে জব্দ করবে বলে—এইসব অভিযোগ করতে লাগলেন। অন্তত কান্তির তাই অনুমান। সে স্পষ্ট দেখেছে—ঝরঝর করে বৌদির চোখের জল ঝরে পড়েছে ভাতের ওপর; একে তো সেই কোন্ ভোরের চাল-হয়ে-যাওয়া ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত—তবু সেই চোখের জলমাখা কদন্নগুলোই গিলতে হয়েছে বৌদিকে, মার ভয়েই ফেলে উঠতে পারে নি। অথচ কী লাভই বা হয় এতে!

মানুষ তো আরও দূরে সরে যায় মনের মধ্যে।

মা এত বোঝেন, এটা কেন বোঝেন না।

ওর অমন বৌদি, দুটো মিষ্টি কথা বললেই চিরকাল তাকে বেঁধে রাখা যেত।

॥ ২ ॥

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েও অমনি দ্রুত হন হন করে হাঁটছিল মহাশ্বেতা। পথের মাঝে মাঝে জটলা বা তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা কোনটাই লক্ষ্য করে নি। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীতলা ছাড়িয়ে বাজারের মোড়ে এসে ওদের বাড়ির রাস্তা ধরতে গিয়েই চমকে উঠল। থামতেও হ'ল ওকে।

'বাবা, এত ভিড় কিসের গা? এ যে লোকে লোকারণ্যি একেবারে!'

কতকটা যেন মনে মনেই প্রশ্ন করে সে।

সত্যিই এ রাস্তায় এমন ভিড় কোনদিন দেখে নি মহাশ্বেতা, মেলার সময়ও না। তখন লোক এ পথে বিস্তর হাঁটে বটে কিন্তু সে এমন দাঁড়িয়ে থাকে না এক জায়গায় —স্রোতের মতো দু'দিকে দুমুখো এগিয়ে চলে ক্রমাগত। আর এ তো কোন মেলার দিনও নয়—অন্তত কৈ মনে তো পড়ছে না তেমন কোন মেলার কথা! তার যদি-বা

ভুল হয়, মেলাটেলা কিছু হ'লে এতক্ষণ দু'দিকের সার সার তেলেভাজা খাবারের দোকান বসে যেত; বেগুনি ফুলুরি পাঁপরের পাহাড় জমে যেত এক-একটা বার-কোশের ওপর—আর সবচেয়ে ঐ অনামুখো মাগীগুলো, এই দিন দুপুরেও তা'হলে মুখে খড়ি মেখে ঠোঁটে-গালে আলতা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত গড়াগ্‌গড়!

না, মেলা-ফেলা কিছু নয়। এ অন্য কোন্ ব্যাপার!......

মহাশ্বেতার স্বভাবে কৌতূহলটাই প্রবল।

প্রায় শিশুর মতোই সব বিষয়ে কৌতূহল তার।

'ব্যাওরা'টা কি জানবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল সে। এত পুরুষের ভিড়ের মধ্যে তার এগোবার কথা নয়, সাধারণত বাইরের অপরিচিত পুরুষকে যতদূর সম্ভব দূরেই রাখে সে—সেই শিক্ষা পেয়ে এসেছে জ্ঞান হওয়া অবধি—কিন্তু আজ তার স্বভাব-কৌতূহল সে সংস্কারও ভুলিয়ে দিল। এ ভিড় এড়ানো চলত অনায়াসেই। ওদিক দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলে রাজবাড়িকে বাঁয়ে রেখে পোলের কোল দিয়ে শ্মশানের ধার দিয়ে যেতে পারত—এমন কিছু ঘুর-পাক নয় সেটা, সেদিকে এখন ভিড়ও কম—কিন্তু এদিকে ব্যাপারটা কি ঘটছে সেটা না জেনে চলে যেতে পারল না কিছুতেই।

পুরুষের ভিড় ঠেলে এগোনো মুশকিল, তবু ঘোমটাটা আর একটু সামনের দিকে টেনে দিয়ে চাদরটা ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে একেবারে দোকানগুলোর কোল ঘেঁষে এগোবার চেষ্টা করল। এতক্ষণে তার লক্ষ্য হ'ল এদিকের দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে গেছে, সবাই ঝাঁপ ফেলে বা দোর বন্ধ ক'রে বসে আছে ভেতরে, শুধু চোখ বার ক'রে একটু দেখবার মতো ফাঁক রেখেছে একটু একটু। তবে কি লুঠতরাজ কিছু হচ্ছে? ডাকাত পড়ে নি তো কাছে-পিঠে কোথাও? কিন্তু এত লোকের সামনে ডাকাতি বা লুঠতরাজই বা হবে কী করে? না কি হরতাল? আজকাল তো আবার ঐ এক হুজুগ বেরিয়েছে। ছেলেরা বলে এসট্রাইক। কিন্তু সে রকম কিছু হ'লে তো সব বাজারই বন্ধ থাকত। আর হরতাল তো সকাল থেকেই শুরু হয়—বরং সন্ধ্যের দিকে তাতে কেউ কেউ দোকান খোলে। আজ তো এই একটু আগেও আসার পথে দেখে এসেছে দিব্যি সব খোলা। এখনও তো ওদিকের সব দোকান খোলা রয়েছে দেখে এল। এখান থেকে যতটা দেখা যাচ্ছে, ভোঁদা গয়লার দোকানের ওপাশ থেকে ওধারের দোকানগুলো তো এখনও খোলা।

তবে? এটা হচ্ছে কী এখানে?

পথের ওপর কেউ বেদের ভেল্‌কি-টেল্‌কি দেখাচ্ছে না তো? তাই বোধহয় হবে। অনেকদিন আগে আর একবার দুটো ভেল্‌কীওলা এসেছিল—মনে আছে ওর। ওঃ, সে কী কাণ্ড! একটা ঝুড়ির মধ্যে একটা মেয়েকে পুরে তার বর কী কোপানোটাই না কোপালো তলোয়ার দিয়ে—'রক্তে রক্তাকিনি' একেবারে—আর মেয়ে-টার সে কী চিচ্‌কার প্রথম প্রথম, তার পরে সব চুপ। ওমা, ভয়ে মরে সবাই, এ কী খুনো-খুনি ব্যাপার রে বাবা, খেলা দেখতে গিয়ে থানা-পুলিশ ছুটোছুটি করতে হবে নাকি? তা সে মিন্‌সে তো খোঁচাখুঁচি ক'রে বৌটাকে মারলে, তারপর তলো-য়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল বৌয়ের শোকে—কাঁদে আর কী সব হিন্দী-মিন্দীতে বলে—এই কাণ্ড চলছে, ওরা সবাই ভয়ে ভাবনায় কাঠ, তারই মধ্যে কিনা পেছন থেকে ভিড় সরিয়ে সে মেয়েটা দাঁত বার ক'রে হাসতে হাসতে হাজির। দিব্যি জ্যান্ত। ওদিকে তখনও তলোয়ারটা পড়ে রয়েছে, তাতে রক্ত মাখা-মাখি! তা খেলা বাপু মন্দ নয়, সে কথা মহাশ্বেতাও মানতে বাধ্য—তবে সে যতই

ভাল হোক, পাড়াঘরে এসে দেখায় সে আলাদা, কিন্তু সরকারী সদর রাস্তা জোড়া ক'রে বসে খেলা দেখানো—এ আবার কী অনাছিষ্টি কাণ্ড।

মহাশ্বেতার কেমন সত্যি-সত্যিই ধারণা হয়ে গেল যে, বেদের ভেল্‌কীই দেখানো হচ্ছে। আর যে কিছু হ'তে পারে, অন্য কোন কারণ থাকতে পারে এ ভিড়ের—তা একবারও মনে হল না ওর। তাই, আরও যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই আর একটু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। অবশ্য চেষ্টা করাও খুব সহজ নয়—কারণ 'রৈ-রাবণের ব্যাপার যেন চারিদিকে, বাপ্‌রে বাপ্‌, মনিষ্যি যেন কারও বাড়ির মধ্যে নেই আর, সব্বাই বেইরে পড়েছে। আর সবাই তো দেখছি মদ্দ মিনসে—যেতে দেবে কি এগিয়ে—?' মনে মনে বলে মহাশ্বেতা।

তবু ওরই মধ্যে একটা ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতেই কে একজন রুষ্ঠ কণ্ঠে বলে উঠল, 'এ সব খুন খারাপী থানা-পুলিশের কাণ্ড, চারদিকে র-র করছে গুর্খা পুলিশ, এর মধ্যে মেয়েছেলে সেঁধুচ্ছ কেন বাছা! বলি তোমার কি একটু ভয়ডর হুঁশপব্ব নেই? কেমন ধারা মেয়েছেলে তুমি?......যাও যাও, পালাও শীগগির।'

ওমা কী হবে! এ যে আরশোলা মল্লিকের গলা। চিনে ফেলে নি তো?

ঘোমটাটা আগেই যথেষ্ট দেওয়া হয়েছিল, এখন টানাটানি করে আরও খানিকটা বাড়াতে গিয়ে পিঠের দিকটাই অনাবৃত হয়ে পড়বার উপক্রম হল। সে তাড়াতাড়ি পিছিয়ে আসবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু পেছনো আর হ'ল না। তার আগেই আর একটা হৈ-হৈ—লোকগুলো যারা সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও যেন পিছু হটে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। সে চাপ ওর ওপরেও এসে পড়ল এবার। সে যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল সেখানে দেওয়াল নেই ফলে একটা দোকানের ঝুলনো—বাইরে বেরিয়ে আসা কাঠের পাটাতনের ধারে লেগে পা দুটো ভেঙ্গে যাবার যোগাড় হ'ল।

যন্ত্রণায় একটা অস্ফুট চিৎকার ক'রে উঠল ও, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হ'ল।

যে দোকানে এই কাণ্ড—তার মালিক ও কর্মচারীরা সবগুলো কাঠ বন্ধ করে নি—একটা কাঠ ফাঁক ক'রে রেখে তার মধ্যে দিয়ে সব দেখছিল। তারা এখন এই ব্যাপার দেখে একজন চট্‌ ক'রে কাঠটা সরিয়ে এক হ্যাঁচকায় ওকে টেনে নিল পাটাতনের ওপর—তারপর ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে সে কাঠটা যথাস্থানে পরিয়ে দিল আবার।

'ওমা, এ আবার কী?...কে গা তোমরা?...ওমা এ কী কাণ্ড! রাহাজানি নাকি? এমন ক'রে ভদ্দরলোকের মেয়েছেলের হাত ধরে টানো—তোমাদের সাহস তো কম নয়! এতো ভারী আস্পদ্দা দেখতে পাচ্ছি।'

মহাশ্বেতা চেঁচামেচি ক'রে ওঠে, পায়ে তখনও যন্ত্রণা হচ্ছে কিন্তু তার চেয়েও ভয়টা বেশী।

'ভদ্দরলোকের মেয়েছেলে তো মরতে এসেছিলে কেন? পাটা যে ভেঙ্গে এতক্ষণে নড়নড় করত! সেইটে বুঝি ভাল হ'ত? তার ওপর চারদিকে গুর্খা পুলিশ, তাদের হাতে পড়লে ভদ্দরতা থাকত কোথায়; মান-ইজ্জৎ নিয়ে ফিরতে পারতে?'

দোকানদার চাপা গলায় খিঁচিয়ে উঠল।

মহাশ্বেতা থতমত খেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আমি তো এত কাণ্ড জানি না। যাবার সময় তো অত দেখি নি কিছু। তাহলে কি আর এ পথে আসতুম!......তা হ্যাঁগা বাছা, পুলিশ-টুলিশ এসেছে কেন—কী হয়েছে কি এখানে?...কী সব গুণ্ডো-

মুখ্খ্যা বলছ—তা তাদের আনতে হ'ল কেন? আমাদের খোট্টা পুলিশ সব কোথায় গেল? এখানে কি হচ্ছে কি? ডাকাত পড়েছে নাকি কোথাও? না কি খুন-জখম হয়েছে?'

বিপদের মধ্যেও কৌতূহলটাই প্রবল হয়ে ওঠে আবার।

'খুন জখম হবে কেন! পিকেটিং হচ্ছে কদিন থেকে শুঁড়িখানায়—জান না? বলি কোন্ দেশে থাক গা মেয়ে?'

'কি—হচ্ছে? কি টিং বললে?...শুঁড়িখানায় কি হয়েছে কি?'

'পিকেটিং, পিকেটিং!...স্বদেশী ছেলেরা মদের দোকানে পিকেটিং করছে, কাউকে মদ খেতে দেবে না!'

'তা সে তো ভাল কথাই, তার আবার অত থানা-পুলিশ কিসের?

'ভাল কথা তো তোমার আমার কাছে। যারা এক গাদা টাকা দিয়ে সরকারী লাইসিং নিয়েছে মদ বেচবে বলে—? তাদের কাছে কি ভাল? তারাই পুলিশ ডেকেছে, তাদের যে ভাতে হাত পড়ে নইলে! আর কোম্পানীও তো মুকিয়ে আছে, স্বদেশী ছেলেদের জব্দ করতে পেলে তো আর কিছু চায় না...তাছাড়া তাদেরও তো ক্ষেতি, লোকে মদ না খেলে তাদের রোজগারও তো বন্ধ। কোম্পানীর ঘরে মোটা টাকা যে যোগান দেয় এরা!'

আর কোন কথার অবকাশ হ'ল না। বাইরের হৈ-চৈটা যেন আরও বেড়ে গেছে। এর পর আর নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। মহাশ্বেতা দোকানের কারিগর-দের এক রকম ঠেলে সরিয়েই কাঠের ফাঁকে চোখ লাগাল।

এবার ঠেলাঠেলির কারণটা বোঝা গেল। পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসছে—বোধ হয় ভিড় সরাতে। ফলে লোকগুলো সব পোঁ পোঁ ক'রে পালাচ্ছে।

'আ মরণ, কী সব বীরপুরুষ রে! তাই আবার আরশোলা মল্লিক আমাকে বকছিল, মেয়েমানুষ এর ভেতরে কেন!...তোরাও তো পোঁ পোঁ দৌড়াচ্ছিস। অবিশ্যি বলেছে একটা কথা ঠিক, আমি কি আর ওদের মতো পালাতে পারতুম। এমনিই তো পা-টা যেতে বসেছিল।'

কিন্তু সে যা হোক, এ আবার কি হচ্ছে! মহাশ্বেতার চোখ সেই আব্‌ছা অন্ধ-কারেই বিস্ফারিত হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসবার যোগাড় হ'ল। তিনটে ছেলেকে টানাটানি করছে পুলিশ, তারা আসবে না, শুয়ে পড়েছে। তাদের পা ধরে রাস্তার ওপর দিয়েই টেনে নিয়ে চলল হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে। আহা রে, এবড়ো-খেবড়ো খোয়া বারকরা রাস্তা—পিঠের জামা ছিঁড়ে এতক্ষণে বোধ হয় ক্ষতবিক্ষত রক্তারক্তি হয়ে গেল। ছাল-চামড়া কি আর রইল কিছু! তাও তো মোটা জামা—কোট ফোট কারুর গায়ে নেই। অভয়পদ যে মোটা জিনের কোট পরে বারো মাস—যেটা এতদিন পর্যন্ত চক্ষুশূল ছিল ওর কাছে—তার উপকারিতা এবার বেশ বুঝতে পারল মহা-শ্বেতা। সব তো বেশ ভদ্রলোকের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে তবে এ দুর্মতি কেন বাপু!...খা-দা বাড়িতে বসে থাক, নিজের ধান্দা দ্যাখ, তা নয়—এই সব হুজ্জুগ করতে আসা। চাকরী-বাকরী ক'রে বাপ-মায়ের দুঃখ ঘোচাবি তবে তো ছেলের জন্ম—কে মদ খেলে না খেলে তা নিয়ে তোদের অত মাথাব্যথা কেন? বিশেষ যখন কোম্পানী চায় না!...তোরা না খেলেই তো হ'ল!

দূরে একটা পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। ছেলেগুলোকে টেনে নিয়ে চলল সেই দিকেই। ঐ তো, রাস্তাতেই রক্তের দাগ পড়েছে, মাটি লাল হয়ে গেছে ওদের রক্তে।

'মরে যাই, মরে যাই—কাদের বাছা রে!'

আপন মনেই সহানুভূতিসূচক আওয়াজ করে মহাশ্বেতা।

তবু, তখনও ওদের লাঞ্ছনার শেষ হয় নি। গাড়ির দরজা অবধি টেনে নিয়ে গিয়ে ওদের পা ছেড়ে দিলে সিপাইরা, তারপর বোধ হয় গাড়িতে উঠতে বললে। ছেলে তিনটে কিন্তু শুয়েই রইল চুপচাপ, যেন শুনতেই পায় নি। দুবার-তিনবার বললে—ওরা তেমনি নির্বিকার, নিস্পৃহ। একজন ওপরওলা ছিল ওদের সঙ্গে, সে এবার কী যেন বললে, সিপাহিগুলো দমাদম বুটসুদ্ধ লাথি মারতে লাগল ওদের।... একজনের নাক দিয়ে দরদর ক'রে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, আর একজনের বুঝি দাঁতই ভেঙ্গে গেল দু-তিনটে। নিশ্চয়ই পেটে লাথি পড়েছে—ও ছেলেটা নইলে অমন ধনুকের মতো বেঁকে উঠবে কেন! এ কী প্রহারী গো। ওমা, ওদের কি দয়ামায়া নেই একরত্তি! কিন্তু তবু কৈ তো কেউ টুঁ শব্দ করছে না একটা। ঐ ভারী ভারী বুটের লাথি সইছে কি করে? ওদের কি পাথরের জান!

আহা রে, ঐ ছেলেটার পেটেই লেগেছে সত্যি, সত্যি কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছে যন্ত্রণায়—

এততেও কিন্তু ওঠানো গেল না ওদের। আবারও সেই ওপরওলা কি বললেন, গাড়ির দোর খুলে ধরল একজন, চারজনে চারদিক থেকে ধরে গাড়ির মেঝেতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল, চালের বস্তার মতো। তারপর তারাও গাড়িতে উঠে দোর বন্ধ ক'রে দিল। কতক উঠতে পারল না, তারা হেঁটে যেতে লাগল। গাড়ি চলে গেল।

এতক্ষণ চারিদিকের ভিড় যেন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, ভয়ে ও কৌতূহলে। নিঃশ্বাস রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল তারা। চোর-ডাকাতকে মারে সে আলাদা কথা। ভদ্রলোকের ছেলেদের এমন প্রকাশ্য নির্যাতন, এমন অমানুষিক লাঞ্ছনা তারা কখনও দেখে নি, শোনেও নি বোধ হয়। পুলিশের রুদ্রমূর্তি তাদের মনে ও মুখে এক সুগভীর আতঙ্কের ছাপ ফেলেছে গত কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে। তারা পালাতে পারলে বাঁচে, এতক্ষণ সে চেষ্টা করে নি পাছে সামান্যমাত্রও নড়াচড়ায় সিপাইদের দৃষ্টি তাদের ওপর এসে পড়ে—এই ভয়।

এইবার—পুলিশের গাড়ি সরস্বতীর পুলের বাঁকে অদৃশ্য হ'তেই একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সবাই। ভিড়ও পাতলা হয়ে গেল দেখতে দেখতে। তবু, লোক একেবারে গেল ন্যা, পুলিশের বড় দল গাড়ির সঙ্গে চলে যেতে তাদের মনে বোধহয় আশ্বাসের ভাব ফিরে এসেছে খানিকটা। তারা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে জটলা করতে লাগল।

তবে রাস্তা এবার অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। এবার যাওয়া চলবে। দোকান-দার ওদিকের দরজাটা দেখিয়ে বলল, 'নাও, এবার ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাও গো বাছা ভাল-মানুষের মেয়ে।...এখন হ্যাঙ্গামা-হুজ্জুতের সময় অমন হুট করতে বেরিও না। দিনকাল ভাল নয়, এসব সময়ে যে যার ঘরে বসে থাকতে হবে।...যাও, বেরিয়ে পড়ো এই বেলা। এখন ভালয় ভালয় মানে মানে ঘরে ফিরতে পারো তো গুরুবল।'

মহাশ্বেতা কোন মতে দেওয়াল ধরে ধরে দোকানের মালপত্র বাঁচিয়ে ভেতর দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে বাজারে পড়ল। পা-দুটো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে তার, ভয়ে আর কী এক রকমের উত্তেজনায়, এখনও সেই কাঠের কোণের সঙ্গে চেপে যাওয়ার ব্যথাটা টনটন করছে—কিন্তু অপেক্ষা করার সাহসও আর নেই। সত্যিই এখন মানে মানে বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে। যদি কিছু কেলেঙ্কারী হয়—কর্তারা কি বলবে। পাড়া-ঘরে কি আর মুখ দেখানো যাবে?

বাজারের ওপাশের ফটক দিয়ে বেরিয়ে, যতটা দূর দিয়ে হয় এগিয়ে এসে চেয়ে দেখল—মদের দোকানটার সামনে তখনও চার-পাঁচজন সিপাই দাঁড়িয়ে আছে। ফলে রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে সেখানটায়। ওদের সামনে দিয়ে পথ চলবারও সাহস হচ্ছে না কারও। মদের দোকান খুলে রেখেছে বটে দোকানী মিন্‌সে—কিন্তু যমদূতের দল অমন করে সামনে পাহারা দিলে কার একটা ঘাড়ে তিনটে মাথা আছে যে ওখানে মদ গিলতে যাবে? মরণদশা বুদ্ধির!

অদম্য কৌতূহলে কখন বুঝি একটু সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে মহাশ্বেতা, তা খেয়ালও নেই। হঠাৎ একটা সিপাই মুখ তুলে সোজা ওর দিকে চাইতেই চমকে উঠল। বুকের মধ্যে গুর-গুর ক'রে উঠল ভয়ে—মাগো, চাইছে দ্যাখো না চোখ পাকিয়ে—সাক্ষাৎ যমের দূত একেবারে!—ছুটে এসে ধরবে না তো? তাকেও যদি অমনি মারধোর করে, হাজতে নিয়ে যায়? বাপ রে, তাহ'লে শুধু ভয়েই মরে যাবে সে।

কেন তাকে ধরবে আর কেনই বা মারবে—তা একবারও মনে হ'ল না ওর। কিছু-ক্ষণ আগেকার দেখা দৃশ্যটাই বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল শুধু, ফলে যখন সবচেয়ে ক্ষিপ্রপদের প্রয়োজন তখনই যেন পাদুটো সবচেয়ে অবশ হয়ে পড়ল।

কী করবে, চিৎকার করবে কিনা—চিৎকার ক'রে আশপাশের লোককে ডেকে বলবে কিনা 'আমাকে বাঁচাও আমি অমুকদের বাড়ির বৌ' কিংবা মাটিতে বসে পড়ে সামলে নেবে কিছুই বুঝতে না পেরে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। কিন্তু পা দুটোতেও সত্যিই আর কিছুমাত্র জোর নেই, দাঁড়িয়ে থাকাও বেশীক্ষণ যাবে না—তা বেশ বুঝতে পারল। মাথাটার মধ্যেও যেন কেমন করছে, ফাঁকা লাগছে সব।

ঠিক সেই মুহূর্তে—অন্তত মহাশ্বেতার মনে হ'ল—যে সিপাহীটা তার দিকে চেয়ে দেখেছিল, সে যেন তার দিকে এগিয়ে এল দু পা, মনে হ'ল আরও এগোচ্ছে—

অধিকতর আতঙ্কের এই বৈদ্যুতিক আঘাতেরই প্রয়োজন ছিল বুঝি তার। ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে এইবার ছুটল সে। পা-দুটো যে অবশ লাগছিল, তা তার মনে রইল না, সে রকম কিছু আর বোধও করল না সে। বাজার ছাড়িয়ে, রাজবাড়ি ছাড়িয়ে খালধার দিয়ে একেবারে শ্মশানের সামনে পড়ে একবার থামল শুধু—কেউ পেছনে আসছে কিনা, সেই সেপাইটাও দৌড়চ্ছে কিনা তার পিছু পিছু তাই দেখবার জন্যে—তাহলে বোধ হয় সে সোজা শ্মশানেই ঢুকে সেখান দিয়ে খালে নেমে পড়ত। ওদের হাতে পড়ার চেয়ে ডুবে মরাও শ্রেয়। কিন্তু দেখল যে, কেউই আসছে না তেড়ে, এ দিকের দোকানদারগুলোই শুধু মজা-দেখবার মতো ক'রে হাসিহাসি মুখে চেয়ে আছে দু'-চারজন, বোধ হয় পাগলী ভেবেছে তাকে। তা ভাবুক, মহাশ্বেতা আর থামল না; আবার তেমনি করে—অত জোরে না হোক—দৌড়তে শুরু করল।

বাড়িতে পৌঁছে অবশ্য আর দালানে কি রকেও উঠতে পারল না, যেন প্রাণপণ চেষ্টায় এই শক্তিটুকুই জীইয়ে রেখেছিল, কোনমতে বাড়িতে পৌঁছবার কথাই ভেবেছে সারাক্ষণ, রাস্তায় না মুখ থুবড়ে পড়ে মরতে হয় সেইটুকুর জন্যেই একাগ্র প্রার্থনা জানিয়েছে মা সিদ্ধেশ্বরীর কাছে—সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার পর তাই আর বিন্দুমাত্র শক্তিও অবশিষ্ট রইল না। খিড়কির দরজা পেরিয়ে ভেতরের উঠোনে ঢুকেই সেই মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল এবং পড়েই রইল। ঠিক অজ্ঞান হয়ে পড়ে নি হয়ত কিন্তু জ্ঞানও পুরোপুরি ছিল না, সত্যিই যেন মাথার মধ্যে চিন্তা-শক্তি ধারণা-শক্তি কেমন ঝাপ্‌সা একাকার হয়ে গেছে, কথা কইবার অবস্থা তো ছিলই না। কী হয়েছে, কোথাও কোন চোট লেগেছে কিনা—কিংবা পথে আসতে আসতে কোন অসুখ-

বিসুখ করেছে—উগ্র ধরনের পেট ব্যথা কি শূলব্যথা বা ঐ রকম কিছু—নাকি শুধু মাথা ঘুরেই পড়ে গেল—তাও কিছু জানা গেল না।—একটি কথাও কইতে পারল না মহাশ্বেতা, চোখ বুজে মূর্ছিতের মতোই পড়ে রইল।

কারণ যা-ই হোক, ভয় পাবার মতোই অবস্থা—ভয়ই পেল সকলে। যে যেখানে ছিল ছুটে এল, ছোটবৌ এক ঘটি জল এনে মুখে মাথায় থাবড়ে থাবড়ে দিতে লাগল, বুড়োর বৌকে বললে একটা পাখা এনে জোরে জোরে বাতাস করতে—এমন কি স্বয়ং মেজবৌ এসে মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে ঝিনুকে ক'রে ক'রে খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দিলে।

কিন্তু তারপর একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসে যখন ঘটনাটা খুলে বলল সব তখন লাঞ্ছনার আর কিছু অবশিষ্ট রইল না। কর্তারা তো যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলই, ছেলের দলও—মহাশ্বেতার নিজের ভাষায় তারা পাঁঠারাও—যা মুখে এল তাই বলল। এক কথায় তিরস্কার ও ধিক্কারের একটা ঝড় বয়ে গেল তার ওপর দিয়ে।

মহাশ্বেতা ঘাড় হেঁট ক'রে সব তিরস্কারই মেনে নিল। একথা একবারও সে বলতে পারল না যে, এতে তার কোন দোষ নেই, এমন তো হামেশাই যায় সে বাপের বাড়ি, পথে যে এমন কাণ্ড হবে তা সে জানবে কেমন ক'রে? আজকাল যে এই সব কাণ্ড ঘটছে তা তাকে কেউ বলে নি, তার জানবার কথা নয়। সে কিছু বলল না এই জন্যে যে, এই প্রথম সে সম্মিলিত তিরস্কারে একটা মাধুর্যও অনুভব করছে। আজ যেন তার পুনর্জন্ম লাভ হয়েছে এবং এই কটুমিষ্ট তিরস্কারগুলো সেই নব-জন্মেরই অভিবাদন! যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটত তার, যদি পুলিশের হাতে পড়ে তাকে লাঞ্ছনা সইতে হ'ত, যদি এমন ক'রে ছুটে আসতে গিয়ে দম আটকে মরেই যেত—কী সর্বনাশ হ'ত, তিরস্কারের শব্দে যাই তফাত থাক, মূল বক্তব্য একই। তার অভাবে এদের সর্বনাশ বোধ হ'ত, তার জন্য এদের মনে এত উদ্বেগ এত দুশ্চিন্তা—এইটুকু জেনেই তার মন ভরে গেছে—এই আন্তরিকতাতেই সে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তার আর কোন ক্ষোভ নেই কোথাও, কিছুর জন্যেই। শুধু মনে হচ্ছে যে সত্যি সত্যিই দম আটকে মারা গেলে এইটেই চরম ক্ষতি হ'ত— এই তিরস্কারটাই শুনতে পেত না সে, তার জন্য এদের মনে এমন আন্তরিক উদ্বেগ আছে সেইটেই জানতে পারত না। বিশেষত এসে যখন অমন ক'রে পড়েছে—তখন সেই অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থাতেও তরলার আর বুড়োর বৌয়ের চোখের জলটুকু সে লক্ষ্য করেছে—সেইটুকুই জীবনের পরম সম্পদ বলে বোধ হচ্ছে তার। সেই সম্পদই কোথায় যেন বাইরে একটা বর্ম পরিয়ে দিয়েছে, আর কোন আঘাতই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

এরই মধ্যে খবরটা দিল ছোটকর্তা। আজই অফিস থেকে শুনে এসেছে সে। অরুণের খবর। অরুণ নাকি অনেক ঘুরে শেষ পর্যন্ত কলকাতাতে কাদের বাড়ি ছেলে পড়াবার কাজ নিয়েছিল। ছোট ছোট চার-পাঁচটা ছেলেমেয়েকে পড়াবে—তার বদলে খাওয়া-থাকা আর মাসে দু'টাকা হাত-খরচা পাবে—এই বন্দোবস্ত হয়েছিল। যাদের বাড়ী—সেই গাঙ্গুলীবাবুদের এক ভগ্নীপতি বোল্‌তা চাটুয্যে ওদের অফিসে কাজ করেন, তিনিই খবরটা দিয়েছেন। অরুণের দেশের অনেকে দুর্গাপদদের অফিসে কাজ করে—সেই সূত্রে অরুণকে চিনতে খুব অসুবিধা হয় নি তাঁর। গাঙ্গুলীবাবুরা ওর ব্যবহারে নাকি খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা ক-ভাইই ভাল চাকরে, টিকে থাকলে তাঁরাই একটা কোথাও চাকরি-বাকরিতে বসিয়ে দিতে পার-

তেন, সে কথাও নাকি তাঁদের আলোচনা হয়েছিল—কিন্তু ছেলেটার জন্মলগ্নে বোধহয় একসঙ্গে শনি আর রাহুর দৃষ্টি আছে—কোথায় কোন বাসা বাঁধা বা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ওর ভাগ্যে নেই, তাই সেখানেও টিকতে পারল না। এই স্বদেশী হুজুগে মেতে নাকি কাদের সঙ্গে মহিষবাথান চলে গিয়েছিল নুন তৈরী করতে—পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। মারধোর তো যথেষ্ট খেয়েছেই, জেলেও পুরেছে তারা। মারধোরের চোটেই কোথায় কী করত সব বার ক'রে নিয়েছে, তারপর এদের নিয়ে টানাটানি, পঞ্চাশ রকম জেরা, ওকে কোথায় পেলে, ওর কে আছে, কী জানো ওর কথা—এই সব ঠিকুজী-কুলুজী—থানায় যাওয়া এজাহার দেওয়া—একেবারে নাজেহাল ক'রে ছেড়েছে গাঙ্গুলী বাবুদের। তাতে ও'রা খুব চটে গেছেন, আর কখনও কোন অজানা অচেনা লোককে বাড়িতে আশ্রয় দেবেন না তাঁরা—প্রতিজ্ঞাবন্ধ। জেল থেকে বেরিয়ে আর ও-মুখো হ'তে হচ্ছে না বাবুকে—এ বিষয়ে সবাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

খবরটা ফলাও করেই বিবৃত করল দুর্গাপদ। তারপর বেশ যেন পরিতৃপ্তির হাসির সঙ্গেই বক্তব্য শেষ করল তার, 'যাদের বাড়া ভাত তেতো লাগে, সুখশয্যেয় শয্যেকণ্টকী হয়—তাদের তো এমনি দুগ্গতি হবেই গো, হ'তে বাধ্য। ওদের সেই যাকে বলে না—রাহুর দশা, তাই। কোথাও স্থির থাকতে দেবে না, সুখে আছে দেখলেই পেছনে চাবুক মেরে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। তবে আর বলে কেন সুখে থাকতে ভূতে কিলানো। সত্যিই ভূতে কিলোয় ওদের। নইলে এ বাড়ি ছেড়ে অমন ভূতে তাড়ানোর মতো পালাবে কেন বলো তোমরা। আমরা কি ওর পাকা ধানে মই দিচ্ছিলুম, না বুকে বাঁশ দিয়ে ডলছিলুম দু'বেলা। তা নয়, বরাত। ওর বরাতে আছে পাঁচ দোর ঝাঁট দিয়ে বেড়ানো, ভিক্ষে করে খাওয়া—তুমি আমি চেষ্টা করলে কি আর তা বন্ধ হয়? বরাত এমন না হলে বাপ-মায়েরই বা অমন হাল হবে কেন? ও-সব লোককে যারা বাড়িতে ঠাঁই দেবে তাদেরও মন্দ হবে। হয় না হয়—গাঙ্গুলীবাবুদেরই ব্যাপারটা দ্যাখো না। আমাদের যে কোন বড় ক্ষেতি হয় নি সেই গুরুবল!'

ছোটকর্তা আরও কত কি বকে যায় কিন্তু মহাশ্বেতার কানে ঢোকে না সে সব কথা। মহাশ্বেতার যেন দু'চোখ জ্বালা করে জল ভরে আসে ছেলেটার কথা ভেবে। আহা অমন ভাল ছেলেটা কী থানছাড়া মানছাড়া হয়েই না ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী দরকার ছিল বাপু, বেশ তো ছিলি এখানে, খাচ্ছিলি দাচ্ছিলি থাকছিলি—কেউ তো কিছু বলেও নি। চেপে থাকলে এতদিনে পড়াশুনো কতদূর এগিয়ে যেত, আর একটা পাস দিতে পারত। চাকরী-বাকরী যা হোক একটা জুটিয়ে নিয়ে বিয়ে-থা ক'রে ঘরবাসী হতে পারত চাই কি! তা নয়—এ ওর কী দুর্মতি হ'ল বাপু!

ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ল বুচির কথা। বুঁচি শুনলে দুঃখু পাবে, হয়ত কান্নাকাটি করবে। ওর ওপর টানটা খুবই ছিল। নিজের ভায়েদের চেয়েও বেশী দেখত ওকে। সে থাকলে ও ছোঁড়াও বোধহয় অমন ক'রে পালাতে পারত না।

অনেকদিন বুঁচিরও কোন খবর পাওয়া যায় নি। কে জানে সব কে কেমন আছে। এইসব হ্যাঙ্গামা হুজ্জুত ওদিকেও হচ্ছে কিনা কে জানে। ওর দেওরেরই তো পাল একেবারে—খুড়তুতো-জাঠতুতো মিলিয়ে সোমত্থ দেওর একগাদা। তারা যদি এইসব হুজুগে মেতে থাকে? মাগো, শেষে জামাইয়ের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে না তো?......

কালই পাঠাবে বড়কর্তাকে খবরটা নিয়ে আসবার জন্যে।

বরং অমনি বলে আসবে যদি দিনকতকের জন্যে পাঠায় এখানে।......তা কি

আর পাঠাবে!

'মরে আগুন! ঐ হয়েছে এক কুটুম। এক মিনিটের জন্যেও বৌকে কোথাও পাঠাবে না। পাঠাবার কথা তুললেই সাত কাহন ওজর ফেঁদে বসবে। মা-বেটা সব সমান। বৌ না হ'লে ওদের যেন ত্রিভুবন অন্ধকার, সংসার বন্ধ একদম। আ-মরণ বৌ যখন হয় নি—তখন চলত কী করে? তোরা কি সব ওপস ক'রে থাকতিস নাকি?......এবার আমি আনবই, তাতে ঝগড়া হয় সেও ভাল!'

॥ ৩॥

বুড়োর ইচ্ছে, বাবুদের বাড়ির আসন্ন উৎসবে তার শালাশালীদের নিয়ে আসে ছাঁদার জন্যে। এবার যদিও লুচি ও সন্দেশের সংখ্যা নাকি কমিয়ে দেওয়া হবে, মাথাপিছু বারোখানা লুচি এবং আটটা সন্দেশ মাত্র বরাদ্দ হয়েছে—আর সে জন্যে ঘোঁটও চলছে খুব, একদল বলছে আমরা যাব ঠিক নিয়ম মতো তবে কম ছাঁদা দিতে এলে নেব না, চলে আসব; আর একদল বলছে—না নেবে তো ওদের বড় বয়ে গেল, যারা নেবে না সামনের বারে তাদের নাম কাটা যাবে, তাতে ক্ষতিটা কার হবে? এ তো আর জোর কিছু নেই, কবুলতি দলিলদস্তাবেজও কিছু ক'রে দেয় নি ওরা—ইচ্ছেসুখের দেওয়া, একেবারে এ পাট তুলে দিলেই বা ঠেকাচ্ছে কে? ওরা বোকা তাই এ বাজাবে দিয়ে যাচ্ছে এখনও, বন্ধ করাই তো উচিত ছিল! এই সব নিয়ে নানান কথা তক্কা-তক্কি, আলোচনা চলছে পাড়ায় পাড়ায়—কিন্তু কম দিলেও, এবারে নাকি একটু বিশেষ ব্যাপারও আছে। এবার শুধুই লুচি আর মোণ্ডা নয়, সেই সঙ্গে নাকি নগদ পয়সাও কিছু করে দেওয়া হবে। আর তার অঙ্কও খুব সামান্য নয়—কেউ বলছে একটা করে সিকি বন্দোবস্ত হয়েছে, কেউ বলছে আধুলি। যাই দিক, কলকাতার টাকশালে লোক পাঠানো হয়েছে, নতুন সিকি বা আধুলি তারা গাড়ি ক'রে পৌঁছে দিয়ে যাবে। তবে সিকিই হোক আর আধুলিই হোক, এটা ঠিক যে মাথাপিছু প্রত্যেকেরই দেওয়া হবে, এক মাসের শিশু হ'লেও পাবে। বাবুদের কার নাকি একটা বড় মকদ্দমায় জিত হয়েছে, তারই মানসিক ছিল; সেই হিসেবেই এবার এই দমকা খরচের ব্যবস্থা। তা ছাড়াও শোনা যাচ্ছে, এবারের সামাজিক অন্যবারের মতো পেতলের সরা দিয়ে সারা হবে না, একখানা ক'রে ভরুণে থালা দেওয়া হবে প্রত্যেক বাড়িতে। অবশ্য সবাই তা বিশ্বাস করছে না এখনও, কেউ কেউ বলছে থালা না হাতি, দেখো শেষ পর্যন্ত একটা ক'রে জলখাবারের মতো রেকাবি বেরোবে।

সে যাই হোক, পাওনা এবার কিছু বেশী হবেই—এত যখন শোনা যাচ্ছে, কিছু কি তার ফলবে না?

'যা রটে তার কিছুটাও তো বটে।' বুড়ো বলে, 'আর বারোখানা নুচি আটটা সন্দেশই বা কম কি। নুচির সাইজ তো আর পাল্টাবে না, অন্তত তেমন তো কই শোনা যাচ্ছে না এখনও। একোখানা বারকোশের মতো নুচি—আটখানা খেলেই পেট ভরে যায়। আনলে—ওরা যদি কজন আসে তো বেশ বড় এক পুঁটলি ছাঁদা নিয়ে যেতে পারে—'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় বুড়ো। বক্তব্যটা এইখানেই শেষ ধরে নেওয়া যেতে পারত যদি না বলবার ভঙ্গিতে অসমাপ্ত সুর একটা প্রকাশ পেত। আরও কিছু বলবার আছে ওর—সেটা কোথায় বাধা পেয়ে আটকে যাচ্ছে। ওর মনের এই

এত বড় বাসনাটা চরিতার্থ হবার পথে একটা অন্তরায় ঘটেছে—সেটা কারুর কাছেই আর অস্পষ্ট নেই, শুধু সেই অন্তরায়ের কথাটা খুলে বলতে কেন ইতস্তত করছে সে, সেইটেই কারও ঠাওর হচ্ছে না।

ওর খুড়তুতো ভাই হাবলা বলে, 'তা, আনিয়েই নাও না। এখনও তো সময় আছে। একটা খবর পাঠালে ওরা তো নিজেরাই চলে আসতে পারে!'

'দূর! বাড়ির মত না নিয়ে আমি অমনি খপ ক'রে খবর পাঠাতে পারি!'

'তা বাড়ির মতটা নিয়ে নাও না, কী হয়েছে!'

'সে বড় লজ্জা করে। শ্বশুরবাড়ির কথা কি আর বলা যায়।'

কয়েক মিনিট সবাই চুপ ক'রে থাকে। কী বলবে চট ক'রে ভেবে পায় না বোধহয়।

ওদের আসর বসেছে চিরাচরিতভাবে ওদের ভেতরের বাগানে। গোল হয়ে বসেছে সবাই, মাঝখানের খানিকটা জায়গা ফাঁক রেখে। হাবলারা তিন ভাই ইস্কুলে যায়, অন্য দিন তাই এ সময় আসর বসতে পারে না। আজ কী একটা ছুটির দিন বলে মজলিসের সভ্যসংখ্যা পুরো হয়েছে। বুদ্ধি বা যুক্তি নেবার পক্ষে এটাই সবচেয়ে অনুকূল অবসর।

আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ বাইরের জীবনমূলে যতই নাড়া দিক, এ বাড়ির এই কটি দেওয়াল ভেদ ক'রে সে তরঙ্গের স্পন্দন পৌঁছয় না। এদের জীবন পুরনো নিয়মেই চলে, প্রতিদিন কাটে চিরদিনের মতো। কর্তারা চাকরী করে, সাবধানে চাকরী বাঁচিয়ে চলে। চাকুরেরা অবশ্য সর্বত্রই হুঁশিয়ার—প্রথম সেই অসহযোগ আন্দোলনে কয়েকজন যা চাকরী ছেড়েছিল—কিন্তু তাইতেই, তাদের দুর্দশা দেখেই বোধহয় সকলের চোখ খুলেছে, এ আন্দোলনে বিশেষ কেউ চাকরী ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি। যাঁরা আগের আন্দোলনের মার্কামারা—তাঁরাই এবার নেতৃস্থানীয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরাই যা আছেন বড়দের মধ্যে। বাকী সবাই তরুণের দল। ছাত্ররা এবং যারা ইস্কুল কলেজ ছেড়ে বেকার বসে আছে, চাকরীতে বা অন্য কোন কাজকর্মে লেগে পড়ার অবসর পায় নি—তারা। এরাই মার খাচ্ছে জেলে যাচ্ছে দলে দলে, এমন কি প্রাণের মায়াও করছে না, জান দিতে ও নিতে প্রস্তুত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—স্বাধীনতা-যুদ্ধের এ আহ্বানে।

কিন্তু এসব কোন নিয়মই এ বাড়ীতে খাটে না। এদের কথা স্বতন্ত্র সব ব্যাপারেই। এ বাড়ির এত বড় ছেলের দল—যার অধিকাংশই বেকার—এরা ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধদের মতোই সন্তর্পণে দূরে সরে আছে। এদের মধ্যে এ হুজুগ বা ওদের অভিভাবকদের মতে পাগলামী ঢোকে নি। ওরা সব এসব খবর শোনে, আলোচনা করে, মজা দেখে। শোনেও লোকপরম্পরায় কারণ এ বাড়িতে খবরের কাগজ আসে না। পাড়ার মধ্যে কোন কোন বাড়িতে আসে—ইচ্ছে করলে চেয়ে পড়তে পারে কিন্তু এদের সে ঔৎসুক্য নেই। পড়ার ক্ষমতা কম—ইচ্ছা আরও কম। তাই ওদের জীবনে রাজনৈতিক ঘটনা-সংঘর্ষের সংবাদের চেয়ে বাবুদের বাড়ির চার আনা দক্ষিণার খবর বেশী চিত্তাকর্ষক। ওদের জীবন যে অতি পুরাতন বৃত্তে আবর্তিত হয় সেখানে বাবুদের বাড়ির ছাঁদার পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলে বিপুল তরঙ্গ ওঠে। এ ঘটনা—এই পাওনার দিনগুলো বছরে আসে মাত্র তিন-চারবার, তাই এর আগমনের বহু পূর্ব থেকে এদের থিতিয়ে আসা জীবনে আলোড়ন জাগে—আলোচনা ও তর্কবিতর্কের অবসান থাকে না।

আজও সেই প্রসঙ্গ উঠেছে। কদিনই উঠছে। কিন্তু বুড়োর এই গোপন

ইচ্ছেটার কথা জানা যায় নি। অথচ এতে অভিনবত্ব কিছু নেই। এই ছাঁদার সময় হ'লে এবাড়িতে বহু আত্মীয়সমাগম হয়, কুটুম্বদেরও আনানো হয় অনেককে। যাদের অভাবের সংসার—আর অভাব এখনকার দিনে নেই কার—তাদেরই আনানো হয়। বুড়োর বড়পিসীদের সচ্ছল অবস্থা, তবু সেবাড়ির ছেলেরাও আসে। পিসতুতো ভাইয়ের খুড়তুতো ভাইদেরও আসতে বাধা নেই। তাতে ক'রে সেই একটা দিন এবাড়িতে যে পরিমাণ ভাত-ডাল-তরকারির খরচা হয় সেটাও খুব অকিঞ্চিৎকর নয় —তবু বাবুদের বাড়ি থেকে যে আদায় হয় সেটাই বড় কথা, সেটাই বাঞ্ছনীয় এদের কাছে।

সুতরাং বুড়ো বলতে পারত অনায়াসেই। তবু বলে নি। বলতে পারে নি—সঙ্কোচে বেধেছিল বোধ হয়। আজ খুলে বলতে পেরে বাঁচল। যে সমস্যাটা ওর মনে দেখা দিয়েছে তার সমাধান ওর বুদ্ধির সাধ্য নয়। এদেরই পরামর্শ নিতে হবে তাও সে জানে—সুতরাং যত তাড়াতাড়ি এদের জানানো যায় ততই ভাল। সেই জানানো হয়ে যেতে তাই সে প্রাণপণে ভুরু ও কপাল কুঁচকে কেমন এক রকমের উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ভাইদের মুখের দিকে।

প্রথম মুখ খুললে ওদের মধ্যে কেষ্টপদ অর্থাৎ ন্যাড়া।

'তুমিও যেমন! মার কাছে আগে ছোটমাসীর ছেলেটার কথা পাড়ো না। বল যে কেউ গিয়ে ছাঁদার দিন কোলে ক'রে নিয়ে আসবে—আবার পোঁছে দেবে। ওদের তবু তো একটা ছাঁদা আদায় হবে। ছোটমাসী না থাক বুড়ি তো দশ দিন ধরে তাংড়ে তাংড়ে খেয়ে বাঁচবে!'

'তা তো বললুম। তারপর? ছোটমামাও তো থাকবে—সে কী আর কোলে করে নিয়ে আসবে না?'

'তা আনুক না। আসবে যে তার কোন ঠিকও তো নেই। কথাটা তুমি পাড়োই না। তারপর সেই কথার সুত্তুর ধরে তোমার শ্বশুরবাড়ির কথাটা তুলব অখন!'

বুড়ো খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে একেবারে। এইটেই সে চাইছিল। আর একজনকে দিয়ে বলাতে পারলে সঙ্কোচের কোন কারণ থাকে না। তার পর কথার পৃষ্ঠে কথা—নিজেও বেশ গুছিয়ে বলা যায়, তাতে কেউ তত দোষ ধরতে পারবে না।

তখনই সে হয়ত উঠে যেত কিন্তু ভোম্বলের একটা কথাতে আবার যেন কেমন চুপসে গেল। ভোম্বল বললে, 'আবার দল ভারী করছ মেজদা, মনে আছে গত বছর রাসের সময় অনেক বাঁকা বাঁকা কথা বলেছিল। বড়পিসীর বাড়ি থেকে গেল বার এক গাদা ছেলে এসেছিল, তাইতেই বলেছিল—এদের বাড়ি কি ছারপোকার বেয়ান নাকি রে বাবা, নাকি খোদা ছপ্পর ফুঁড়ে দেয় এই সময়টা হ'লে? কোথাও থেকে ভাড়া ক'রে আনে নাকি আদ্দেক ভাগ দেবার বন্দোবস্তয়!'

কেষ্ট বললে, 'হ্যাঁ—বলেছিল যেমন তেমনি তার জবাবও তো পেয়েছে! জবাব কি দিয়েছিলুম মনে নেই?...ওদের মাথায় ডাঙ্গশ মেরে রেখেছি, আর কোনদিন মুখ খুলতে সাহস করবে না!'

জবাবটার কথা মনে আছে বৈকি। সকলেরই মনে আছে। কেষ্টই দিয়েছিল জবাবটা, সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছিল, যেন সাক্ষাৎ দুষ্ট সরস্বতী এসে ওর জিভে ভর করেছিলেন। কেষ্ট বলেছিল, 'এত বড় গুষ্টিটার ভাগ্না-ভাগ্নী দৌউত্তুর মিলিয়ে কি কম হয়—না কম হবার কথা? বাড়বাড়ন্ত সংসার হ'লে এমনিই হয়। এ তো আর আঁটকুড়োর ঘর নয়—ছেলেমরার বংশও নয়। আমাদের সব জে'ওজ পোয়াতীর ঘর!'

যিনি শোনাতে এসেছিলেন কথাটা—বাবুদের হেড সরকার সুরেন পাল—তাঁর মুখ অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠেছিল কথাটা শুনে, কিন্তু কোন জবাব দিতে পারেন নি। তাঁর ছেলেপুলে হয় নি। এক ভাইঝির ছেলেকে পোষ্য নিয়েছিলেন সেও মরে গেছে। আর তাঁর মনিবদের মধ্যে যিনি মেজবাবু তাঁর পাঁচটি ছেলের মধ্যে এখন একটিতে ঠেকেছে, শিবরাত্রির সলতে যাকে বলে। সেই জন্যেই জবাব কিছু দিতে পারেন নি সুরেন পাল। হঠাৎ কোন কথা মুখে যোগায় নি। কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হয়েছে।

কথাটা বলার জন্যে অবশ্য বাপের কাছে ধমক খেয়েছে কেষ্ট পরে। অভয়পদ সাধারণত সাংসারিক ব্যাপারে, বিশেষ করে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও, এ কথাটায় চুপ করে থাকতে পারে নি, বাইরে বেরিয়ে এসে বলেছিল, 'অমন ক'রে লোকের আঁতে ঘা দিয়ে কথা কইতে নেই, ছিঃ!...এ তো আর মানুষের হাত কিছু নয়—ভগবানের মর্জি। কার কখন কী হয় কেউ বলতে পারে? আমাদের বাড়ি এত ছেলে কিন্তু ভগবানের ইচ্ছে হ'লে এই বাড়ি ফাঁকা হয়ে যেতেও দেরি লাগবে না। মুনির শাপ আর মনস্তাপ দুইই সমান—ও কুড়োতে নেই অমন ক'রে। এবার থেকে সাবধান হয়ে কথা কয়ো।'

তা অভয়পদ যাই বলুক, ভায়েদের কাছে বাহবার অভাব হয় নি। তারা এক-বাক্যে প্রশংসা করেছে ওর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের।

কিন্তু আজ ভোম্বল অন্য সুরে কথা বলল। খানিকটা চুপ থেকে বলল, 'তা হোক, আর হয়ত কিছু বলবে না— কিন্তু কী দরকারই বা এত কান্ড করবার তাও তো বুঝি না। বড়দার শালারা আসবে কত দূর থেকে—তার মজুরী পোষাবে? বুঝলুম না হয় গাড়ী পালকী করবে না, হেঁটেই মেরে দেবে—তবু এতটা পথ হেঁটে লাভ কি হবে?...এই তো কাল থেকেই ভিয়েন বসবে শুনছি, তেবাসি চতুর্ব্বাসি লুচি খানকত, তার জন্যে এ দুক্‌চেটেপনার দরকার কি?'

ভোম্বলের কথার জবাব অবশ্য কেষ্টপদকে আর দিতে হয় না। তার নিজের ভাই চাঁদাই টাকরা আর জিভে একটা অদ্ভুত শব্দ ক'রে বলে ওঠে, 'ইল্‌লো—দেখিস! বড্ড বড়লোক হয়েছিস যে দেখতে পাই। ঐ চতুর্ব্বাসি লুচিই তো পড়তে পায় না। কৈ সামনে ধরে দিলে পড়ে থাকতে তো দেখি না কোন দিন। পরম পদার্থ ক'রে উঠে যায় যে।...আর ঘিয়ে ভাজা লুচি কি বাসি হয় নাকি? ও যেদিন পাবে সেদিনই টাটকা।'

ভোম্বল আর চাঁদা পিঠোপিঠি—এক বছরের ছোট-বড়। পিঠোপিঠি বলেই বোধ হয়, দিন-রাত টক্‌রা-টক্‌রি ওদের লেগেই থাকে।

পিঠোপিঠি ভাই-বোনে বা ভায়ে ভায়ে এমন অবশ্য হয়েই থাকে কিন্তু ভোম্বলের এই অকারণ খোঁচা তোলায় বা 'ফুট কাটা'য় সব ভাই-ই তার ওপর একটু অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। ওরা কেউই বৌদিকে খুশী করবার এই হঠাৎ-পাওয়া সুযোগ ছাড়তে রাজী নয়। এই ছাঁদার জন্যে এতদূর আসা তাদের পোষাবে কিনা সে তাদের বিবেচ্য, কিন্তু ভাই-বোনদের অপ্রত্যাশিতভাবে কাছে পেলে বৌদি যে খুশী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সুযোগ দেবার জন্য তারা মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল বুড়োর কাছে।

এতকাল পর্যন্ত এবাড়ির ছেলেরা এবাড়ির মেয়েদের সম্পর্ক নির্বিশেষে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে প্রাণপণে। মেয়েদের কাছাকাছি থাকা মানেই সংসারের খাটুনী ঘাড়ে চাপা—এবং অনেক অপ্রীতিকর কথা শোনা। কোন-না-কোন উপলক্ষ

ধরে 'খ্যাচ-খ্যাচ' করা তাদের স্বভাব। হয় পড়ার জন্যে—লেখাপড়া হ'ল না বলে, নয় চাকরির জন্যে—চাকরি জুটিয়ে নেবার জন্যে তাদের যথেষ্ট উদ্যম দেখা যাচ্ছে না বলে, নয়ত সংসারের কাজের জন্যে—অবিরত খ্যাচ-খ্যাচ তারা করবেই। কিন্তু বুড়োর বৌ এবাড়িতে পা দেবার পর থেকেই সব ধারণা যেন গোলমাল হয়ে গেছে। হঠাৎ ওরা আবিষ্কার করেছে যে, এমন মেয়েও আছে যার সাহচর্য রুচিকর, যার ফরমাশ ভার মনে হয় না বরং সে ফরমাশ খেটে সুখ পাওয়া যায়, খ্যাচখ্যাচানিও এমন কি মিষ্টি লাগে। সুতরাং তার প্রিয় হবার জন্যে সকলেই উৎসুক, ব্যগ্র। এদের মধ্যে একমাত্র বোধ হয় ভোম্বলই দলছাড়া, তারই বৌদির প্রিয়সাধনে উৎসাহ কম, তাই সে এদের এই আকস্মিক উষ্মার কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে একটু অবাক হয়েই চেয়ে রইল।

অবশ্য উষ্মা প্রকাশের বা ঝাল ঝাড়া'র খুব অবসরও মিলল না। কারণ—কথা যে পাড়ে পাড়ুক, সে তো পাড়বে বুড়ো আর ন্যাড়া, সে যখন হয় হবে, আর সে হবেই জানা কথা—এখন সবচেয়ে যেটা বেশী দরকারী সেটা হচ্ছে বৌদিকে শুভ সংবাদটা দেওয়া। তিন-চারজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হৈ-হৈ ক'রে উঠে পড়ল। কেউই মুখে যদিচ খুলে বলছে না,কিন্তু সকলকারই ইচ্ছে বাকী সকলের আগে গিয়ে খবরটা দেবে বৌদিকে।

তবে সে সৌভাগ্য সেদিন বিধাতা ওদের কারও অদৃষ্টেই লেখেন নি। বাগান পেরিয়ে উঠোন পার হয়ে দালানে ঢোকবার মুখেই দেখা গেল ছোটকাকাকে। সে যেন ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল, ওদের দেখেই বলে উঠল, 'এই যে! এতক্ষণে গুণধরদের টিকি দেখা গেল।...এই শোন্‌ তোরা কেউ গিয়ে বৌমার বাপের বাড়িতে খবর দিয়ে আসবি, কালই বরং ভোরে গিয়ে একেবারে ওর ভাই-বোনদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবি!'

বোধহয় পাথর হতে বাকী আছে ওদের, এমনি আড়ষ্ট কাঠ হয়ে গেছে। এত জল্পনা-কল্পনা, বুড়োর এত দুশ্চিন্তা ও তার নিরসন, ওদের এত আশা উৎসাহ—সব কি তাহ'লে মাটি হয়ে গেল! সকলেই যেন বিমূঢ় জড়বৎ দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

'কী হ'ল কি তোদের? অমন কাঠ হয়ে গেলি কেন? কেউ কি কোন দিন ওখানে হেঁটে যাস নি?'

'না—তা নয়। ইয়ে—', হাবলা বলে ফেলে, 'বৌদিকে বলা হয়েছে? বৌদি জানে?'

'বৌদির জানাজানির কী হয়েছে এতে?' তেড়ে ওঠে দুর্গাপদ, 'তার অনুমতি চাইতে হবে নাকি?...তোদের যা বলছি শোন, অত কত্তাত্তি করতে ডাকে নি কেউ তোদের! আ গেল যা! আমাকে জেরা করতে এসেছ!...সে আমি সক্কাল বেলা উঠেই বলে দিয়েছি, তোমার ভাই-বোনদের সব আনিয়ে নিচ্ছি—দু'দিন রেখে ছাঁদা দিয়ে ফেরত পাঠাবে, তার আগে নয়...এ তো তার আনন্দের কথা!'

'না তাই বলছি!' অনুচ্চ ক্ষীণকণ্ঠে বলে হাবলা। কিন্তু তারপর—কে যাবে, কখন যাবে সে কথা আর কেউ কিছু বলে না। হঠাৎ সব উৎসাহ যেন তাদের মিইয়ে গেছে। আরও কিছুক্ষণ নিজেদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে একে একে সরে পড়ে তারা।

একেবারে আবার সেই বাগানে নিজেদের 'কোটে' ফিরে গিয়ে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করে—অথবা বলা যায় সে মনোভাব যেন ফেটে বেরিয়ে আসে তাদের মুখ দিয়ে।

'ছোট্‌কার সব তাইতে আগ বাড়িয়ে মুড়ুলি করতে যাওয়া! কর্তামো করা যেন স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এ আমাদের ছোটদের ব্যাপার—আমরা যা হয় করতুম! তোমার এত নাক-গলানোর কী আছে! এটুকু কি আর আমরা পারতুম না! সেই তো যেতে হবে সাত কোশ পথ ভেঙে তাদের ঘাড়ে ক'রে নিয়ে আসতে আমাদেরই! ...কেন, অত যদি শখ তো নিজেই যাও না!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে সে কথাগুলো বাঁশ বাগানের ছায়াচ্ছন্ন নির্জনতাতেই আটকে থাকে, চারিদিকের কাঁঠাল জাম কলাগাছের প্রাচীর ভেদ ক'রে ছোট্‌কার কানে পৌঁছয় না তাই রক্ষা।

পৌঁছবে না তা বক্তারাও জানে।

ক্ষোভ শুধু ওদের মনেই নয়, বিচিত্র জটিল পথে এসে অন্যত্রও কিছু জমা হয়েছিল। সে ক্ষোভের কারণ এমন কিছু স্পষ্ট নয়, ঠিক অভিযোগ করার মতো তো কিছু নয়ই—তবু কোথায় একটা মেঘ জমে উঠল এই তুচ্ছ ঘটনা উপলক্ষ ক'রেই।

দালানের মুখে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। কে জানে, হয়ত ইচ্ছে ক'রেই দুর্গাপদ গলা একটু চড়িয়ে দিয়েছিল স্বাভাবিক পর্দার চেয়ে। সোজাসুজি শোনানোর দায়িত্ব স্বীকার না ক'রেও যাতে কাজটা সারা যায়—বোধহয় সেই উদ্দেশ্যই ছিল। সুতরাং রান্নাঘরে যারা ছিল তাদের শুনতে কোন অসুবিধা হয় নি। মহাশ্বেতা তখন ছিল না, সেদিন তার ঠাকুরঘরে 'ডিউটি' (এ কথাটা সে সম্প্রতি শিখেছে)। সে সময়ে ছিল মেজ আর ছোট। কথার সূচনাতেই ছোট বৌয়ের হাতের কাজ থেমে গিয়েছিল, সে বেশ মন দিয়েই শুনেছিল কথাগুলো। শুনেছিল মেজবৌও, তাই তরলার হাত থেমে যাওয়ায় তত বিস্মিত হয় নি, সত্যি সত্যিই বিস্মিত হ'ল—যখন ওদিকের কথা শেষ হ'তেও এদিকে এক জোড়া হাত থেমে রইল। এবার ভাল ক'রে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল প্রমীলা, ছোটবৌ যেন কেমন কাঠ হয়ে উঠেছে, তার দৃষ্টি নত কিন্তু হাতের কাজে আবদ্ধ নয়—কিছু দূরের খালি মেঝেতেই তা স্থির।

মেজবৌ কুটনো কুটছিল, সে বঁটিখানা কাত ক'রে উঠে দালানে এল। দুর্গাপদও কী এক দুর্বোধ্য কারণে তখনও দালান ছেড়ে যেতে পারে নি, সেইখানেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রমীলা কোন ভূমিকা করল না। দুজনেই দুজনের মনের চেহারা জানে—দীর্ঘকাল ধরে, ভূমিকার কোন প্রয়োজন হয় না আর। সে একেবারে সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'তুমি একথা আমাদের কাউকে না জানিয়ে একেবারে বৌমাকে গিয়ে বলতে গেলে কেন?'

ঠিক এই ধরনের স্পষ্ট প্রশ্নের জন্য বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না দুর্গাপদ। সে একটু চমকে উঠল। উত্তর দিতেও খানিকটা সময় লাগল তার। উত্তর যখন দিল, তখনও খুব ভালভাবে দিতে পারল না, জড়িয়ে জড়িয়ে আমতা-আমতা ক'রেই বলল, 'কেন —মানে—তা তাতে দোষ কি হয়েছে?'

'দোষ হয়েছে বৈকি! আর কী দোষ হয়েছে তা কি তুমিই বুঝতে পারছ না? কুটুমবাড়ির ব্যাপার, তার ভায়েদের আনব কি না আনব সে আমরা বুঝব। তার শ্বশুর আছে, শাশুড়ী আছে—তাদের মত নেওয়া দরকার ছিল, আর বলবার হ'লে তারাই বলতে পারত—এ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাবার কি দরকার পড়ল তোমার শুনতে পাই?'

বলতে বলতে ক্রমশ প্রমীলার কণ্ঠস্বর যেন বেশ রূঢ় হয়ে আসে।

এবার কিন্তু দুর্গাপদও ছেড়ে কথা কইল না। এতক্ষণে সে সামলে নিয়েছে নিজেকে। সেও বেশ একটু চড়া সুরেই বলল, 'বেশ তো, তারা বলে নি, না হয় আমিই বলেছি। এর আর ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার কি আছে! আমি কি এ বাড়ির কেউ নই?...আমিও তো তার শ্বশুর একজন!...আর বেশ তো কথাটা তোমাদের অপছন্দ হয়, মান-মর্যাদায় আঘাত লাগবে মনে করো তো—বারণ করে দাও না। এখনও তো কাজটা হাতের বাইরে চলে গিয়ে চুকে-বুকে যায় নি! আমিই না হয় বারণ করে দিচ্ছি!'

'সে যদি বারণ করতে হয় তো আমরাই করতে পারব, তা নিয়ে আর তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।......আর তুমি শ্বশুর বলেই তো বলছি, তুমি একশোবার বোয়ের সঙ্গে ছুতোয়-নাতায় কথা কইতে যাও কেন? যদি এতই দরকার মনে করেছিলে—আমাদের কাউকে দিয়েও তো বলাতে পারতে, ছোটবৌও তো ছিল!'

'তাও কি দোষের নাকি?'

একটা ব্যঙ্গের সুরই ফোটাতে চেষ্টা ক'রে দুর্গাপদ, যেন ওদের সঙ্কীর্ণতাকে ধিক্কার দিতে চায়—কিন্তু সে সুর সে ধিক্কার যেন গলায় ঠিক ফোটে না। কেমন বিকৃত শোনায় গলাটা নিজের কানেই।

'হ্যাঁ—দোষের। খুবই দোষের। এ-বাড়িতে এ অঞ্চলে এসব রেওয়াজ এখনও যে হয় নি তা তুমিও জান। তুমি তো কচি খোকা নও, এবাড়িতে কিছু নতুনও আসো নি।...তার নিজের শ্বশুর তার সঙ্গে কটা কথা কয়?'

'ঐ লাও! তোমাদের মনের মধ্যে এত প্যাঁচ তা জানতুম না বলেই—। এত ছিষ্টির কথা উঠবে এই তুচ্ছ কথা থেকে, এমন তিল থেকে তাল হবে জানলে কি আর—!'

কথাটা শেষ করে না দুর্গাপদ, যেন উত্যক্ত বিরক্তভাবেই মেজবৌকে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে যেতে চায়।

কিন্তু অত সহজে তাকে অব্যাহতি দেয় না প্রমীলা। তেমনি শাণিত শীতল কণ্ঠেই বলে, 'প্যাঁচটা কারণে কি অকারণে জন্মেছে তা নিজের মনেই বুঝে দ্যাখো না।...বলি তোমাকে তো আর নতুন দেখছি না, তোমার হাবভাবও আমার কিছু অজানা নেই।...সে যাক গে মরুক গে, কথা বাড়ালেই বাড়বে, বয়স হচ্ছে—এখন একটু বুঝে সমঝে চলো, ব্যাগত্তা করি!'

এই বলে, আর বাদানুবাদের অবসর না দিয়েই প্রমীলা আবার যখন রান্নাঘরে ফিরে আসে তখনও তরলা তেমনি স্থির হয়ে বসে আছে।

'ও কি লো! এখনও অমনি ক'রে বসে আছিস! চচ্চড়ি যে ধরে উঠল, নাড়, নাড়। এতগুলো লোকের কুঁড়ে-পাতর উঠবে কি দিয়ে! সত্যি-সত্যিই আঙুল-ঠেলায় ভাত নামাবি নাকি? কী এত ধ্যান করছিলি এতক্ষণ ধরে?'

অপ্রতিভ তরলা তাড়াতাড়ি চচ্চড়ির কড়ায় চাপা দেওয়া বড় কাঁসিখানা খুন্তির ডগা দিয়ে উল্‌টে দেয়।

সত্যিই নিচের দিকটা তখন ধরে উঠেছে। গন্ধটা ঢাকতে তাড়াতাড়ি খানিকটা কাঁচা তেল ঢেলে দেয় সে।

আঘাতটা এল একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই। কেউ প্রস্তুত ছিল না, কোন প্রস্তুতি ছিল না। সেদিন শনিবার—সকাল করেই ফেরার কথা সকলের, মেজ-ছোট ফিরলও যথাসময়ে, ফিরল না খালি অভয়পদ—বড়কর্তা। যে লোকটা ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক তিনটেতে বাড়ি এসে হাজির হয় অন্য শনিবারে—সে আসছে না, কোন খবরও দেয় নি, ভাবনার কথা বৈকি। তবু প্রথমটা এক মহাশ্বেতা ছাড়া কেউ তত ভাবে নি। কিন্তু যখন সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হয়ে গেল, পাড়াঘরে শাঁখ বাজল আলো জ্বলল, ওদের ঠাকুরঘরেও আলো দিয়ে গেল ওদের খুড়তুতো জা—তখন সকলেই চিন্তিত হয়ে উঠল।

মেজকর্তা আর স্থির থাকতে না পেরে তার চিরাভ্যস্ত হিসাবের খাতা ফেলে (অফিস থেকে ফিরে মুখ হাত ধুয়েই এই খাতা নিয়ে বসা তার অভ্যাস) বাইরের রকে এসে দাঁড়াল—অন্ধকারে যতটা দৃষ্টি যায় প্রাণপণে বিস্ফারিত চক্ষু মেলে চেয়ে রইল ওদের বাড়ির মোড়ে ছোট্ট পুকুরটার দিকে। এলে ঐ পথ দিয়েই আসবে।... ছোটকর্তা দুর্গাপদ এর আগে থেকেই ঘন ঘন নস্যি নিচ্ছে আর পায়চারি করছে। সকলের মুখেই উদ্বেগের ছায়া। মহাশ্বেতা বিকেল থেকেই ঘরবার করছিল, এখন—এদেরও এই দুশ্চিন্তা লক্ষ্য করেই সম্ভবত—উপরি উপরি বাগানে যেতে লাগল। মেজবৌ বেগতিক দেখে রান্নাঘরের ভার তরলা আর তড়িতের ওপর ছেড়ে দিয়ে বড় জায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। তারও মুখ শুকিয়ে উঠেছে এতক্ষণে কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—মহাশ্বেতার সঙ্গে সঙ্গে কারও থাকা দরকার, কোথায় পড়ে মরবে, কি হবে!

শেষে যখন কুণ্ডুবাবুদের কাছারীর ঘড়িতে ন'টা বেজে গেল তখন আর মহাশ্বেতা স্থির থাকতে পারল না। ছেলেরা ভেতরের দালানের যেখানটায় বসে জটলা করছিল সেইখানে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'দিদ্মা বলতেন না যে, যে আঁটকুড়ো হয় তার পোত্তুরটি আগে মরে—তা তাই হয়েছে আমার! সর্বনাশ হবে বলে ছেলেগুলোকেও ভগবান পাঠিয়েছেন এক একটি পাঁঠা করে!...মুয়ে আগুন তোমাদের! বাপ এখনও আসছে না, তা একটা ভাবনা-চিন্তেও কি থাকতে নেই তোদের?...—হ্যা হ্যা করে বত্তিশপাটি দাঁত মেলে হাসছেন আর ইয়ার্কিবোটকেরা করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!...... ওরে এটা জেনে রাখিস—গেলে আর কারুরই কিছু হবে না, তোদেরই মুখে ভাত ওঠা বন্ধ হবে। খেতে পাবি না, রাস্তার ধারে গামছা পেতে বসে ভিক্ষে করতে হবে—এই বলে রাখলুম, তাও জুটবে না!'

কতকটা কেষ্টকে উদ্দেশ্য করেই বলা, সে-ই সামনে ছিল, অকস্মাৎ এই তাড়া খেয়ে সে একটু দিশাহারাই হয়ে উঠল। বলল, 'বা রে! তা আমাকে খিঁচোচ্ছ কেন, আমি কি করব?'

'কি করবি তার আমি কি জানি!......দ্যাখ্ খোঁজ নিয়ে মানুষটা কোথায় গেল। তার আপিসেই নয়ত যা একবার! ইস্টিশনে দেখগে যা, থানায় খবর নে। আমি মেয়েছেলে, আমি বলে দেব কি করবি তোরা?......তোদেরই তো গরজ! আর কার মাথাব্যথা আছে যে ছুটোছুটি করবে?......গেলে তোদেরই যাবে—আর কারুর নয়, এটা মাথায় ঢুকছে না গব্ভছেরাবের দল! মুখে আগুন তোমাদের। জ্যান্তে

নুড়ে-জেবলে দিতে হয় তোমাদের মুখে! যত রেলে গলা দেওয়া মড়া, খালে ডোবা ভাগাড়ের মড়া কি আমার পেটে এসে জুটেছে গা!'

এবার মেজকর্তা ওকেই ধমক দিয়ে ওঠে।

'বলি আপিসে গিয়ে কি করবে শুনি? সে তো বন্ধ হয়ে গেছে সেই বেলা একটায়: এতক্ষণে দারোয়ানরা সুদ্ধ ফটক বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। সেখানে যাবার হলে আমরাই যেতুম। আজ আটমাস ওপর-টাইম বন্ধ, আর সে ওপরটাইম থাকলেও এত-ক্ষণে বন্ধ হয়ে যেত।......দেখি আর একটু, তারপর বেরোতে হবে বৈকি। থানা হাসপাতালে সব জায়গাতেই খবর নিতে হবে।......সে আর ওরা কি নেবে? থানায় গিয়ে দারোগার সঙ্গে কথা কইতে পারবে কি হাসপাতালে গিয়ে খবর নেবে—তেমন-ভাবে কি মানুষ করেছ ছেলেদের?'

ধমক খেয়ে মহাশ্বেতা অনেকটা নরম হয়ে আসে। বলে, 'বেশ তো, ওদিকে যেতে না পারুক, পিসীর বাড়ি মামার বাড়িও তো খবর নিতে পারে! সেখানে কারও কোন বিপদের খবর পেয়েই সোজা চলে গেল কিনা তাই বা কে জানে। এমন যে এর আগে যায় নি মানুষটা—তাও তো নয়।......যা হোক একটা খবর নিক্—চুপ করে ঠুঁটো জগন্নাথের মতো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে এমনি পর রাত?'

পাগল-ছাগল যা-ই হোক, মহাশ্বেতার এ কথায় যুক্তি আছে তা মেজকর্তাকেও মানতে হয়। সে তখন ন্যাড়া আর নিজের বড় ছেলেকে পাঠায় বড় বোনের বাড়ি। বুড়ো আর হাবলা যায় শ্যামা-ঠাকুরুনের ওখানে। আরও যা দু-একটা সম্ভাব্য জায়গা আছে—নিকট-আত্মীয়দের বাড়ি—সেখানেও পাঠানো হয় দুজন দুজন করে। অনেক রাত হয়েছে, চাপা অন্ধকার রাস্তা—একা কারুর পক্ষেই যাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু এদের পাঠিয়ে দিয়ে যেন যন্ত্রণা আরও বাড়ে। এতবড় বাড়িটা যেন খালি হয়ে গেছে একেবারে; নিজেদের উদ্বেগের জন্যেই হয়ত আরও—থম থম করছে। সেইটেই বেশী ভয়াবহ লাগছে। বাইরে এরা দু'ভাই নিঃশব্দে পায়চারী করছে, ভেতরে রান্নাঘরে তিনটি মেয়েছেলে যেন এক জায়গায় ডেলা পাকিয়ে কাঠ হয়ে বসে। ছোটর দল প্রায় সবাই খেয়ে ঘুমিয়ে' পড়েছে। কথা কইবার কি শব্দ করবার মতো কেউ আর নেই। শুধু আপস-তাপস করে বিলাপ করছে মহাশ্বেতা একা। কিন্তু এই শব্দহীন প্রকাণ্ড বাড়িটায় নিজের গলাই যেন বেখাপ্পা রকমের তীক্ষ্ন আর তীব্র শোনাচ্ছে, কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রাম নিজের কাছেই কটু কর্কশ মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তারও কথা বন্ধ হয়ে গেল এক সময়ে— বোবা ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে চুপ করে বাইরের রকের একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল শুধু।......

অবশেষে, দশটা বেজে যাবারও পরে, ওদিকের রাস্তায় একটা পায়ের শব্দ উঠল যেন। খুব আস্তে কে যেন একটা চটিজুতো টেনে টেনে আসছে। সেই ক্ষীণ শব্দ এবং ঘাসের ওপর শুকনো পাতা পিষ্ট হবার ক্ষীণতর শব্দে বোঝা গেল কোন মানুষই আসছে। অন্য সময় হলে এ আওয়াজ কানে লাগত না—বর্তমানে অস্বাভা-বিক নিস্তব্ধতার জন্যই শুনতে পেল এরা।

আশা করার মতো এমন কিছু অবলম্বন নয় এটা। আরও অনেক লোক হতে পারে। যে-সব ছেলেরা বেরিয়েছে তাদেরও কেউ ফিরে আসা বিচিত্র নয়, তবু, এত মৃদু পদক্ষেপের শব্দই কে জানে কেন এদের মনে হয়—অভয়পদই আসছে।

আবার পরক্ষণেই মনে হয়—এত আস্তেই বা সে আসবে কেন?

মানুষটা শান্ত ধীর, চলনবলনও সে রকমই—তাই বলে এমন নির্বীর্য ধরনেরও তো নয়। তার ভারী পায়ের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এরা সকলেই শুনে অভ্যস্ত, তার

সঙ্গে এ পা ফেলার তো কোনই মিল নেই। তবে—!......

যেটুকু শব্দ উঠেছিল, সেটুকুও যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল ক্রমশ। যেন সেই অপরিমাণ শব্দহীনতার সমুদ্রে এক বিন্দু শব্দ—এক বিন্দু জলের মতোই মিলিয়ে গেল।

তবে কি ওরা ভুল শুনল?

ছোটকর্তা আর চুপ করে থাকতে পারল না, ঘরের মধ্যে থেকে হ্যারিকেনটা টেনে নিয়ে অধীরভাবেই নেমে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়ল।

হ্যাঁ অভয়পদই তো বটে।

কিন্তু এ কোন অভয়পদ? যে অভয়পদকে জন্মাবধি দেখে আসছে তারা—এ যে তার প্রচণ্ড ব্যতিক্রম! অভয়পদের শ্রান্তি বা অবসাদ বলে যে কিছু আছে তা তো তারা জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত কখনও দেখে নি। অথচ—

ওদের বাড়ি ঢুকতেই মজুমদারদের ছোট্ট পুকুরটা—তারই কোণাচে একফালি বাঁধা ঘাটের ওপরের পৈঠেটায় চুপ করে বসে আছে অভয়পদ। কিন্তু সে সাধারণ বসে থাকা নয়—কোন অপরিসীম শ্রান্তিতে যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে সে। ওর এ রকম অবসন্নভাবে বসে পড়া কিছুতেই স্বাভাবিক কোন কারণে সম্ভব নয়। তাছাড়া—লণ্ঠনের ম্লান আলোতেই স্পষ্ট চোখে পড়ল—কে যেন ওর সারা মুখে এক বোতল কালি ছিটিয়ে দিয়েছে—এমনই কালো হয়ে উঠেছে তা। এত দুঃখ-কষ্টেও, এমন দুঃসহ জীবনসংগ্রামেও যে মুখের সুশুভ্র বর্ণাভা সম্পূর্ণ ম্লান করতে পারে নি—সেই মুখ মাত্র কয়েক ঘণ্টায় এমন কালো হয়ে উঠল কি করে?

'এ কি কাণ্ড! দাদা—কী হয়েছে কি তোমার? রাস্তায় পড়ে-টড়ে গিছলে নাকি? কোন য়্যাকসিডেণ্ট হয় নি তো?'

একটা চাপা আর্তনাদের মতো আওয়াজ করে ছুটে কাছে যায় দুর্গাপদ। আলোটা তুলে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করে—কোথাও কোন আঘাতের চিহ্ন নজরে পড়ে কি না।

সে আর্তনাদ এবং সেই দ্রুত উদ্বিগ্ন প্রশ্নের শব্দ ওদের কানেও পৌঁচেছিল। এরাও ছুটে কাছে এল। রান্নাঘর থেকে তরলা-তড়িৎ ওরাও বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। সকলেরই মনে এতক্ষণ ধরে যেটা বড় হয়ে ছিল সেটা এই দুর্ঘটনারই ভয়—প্রাণপণে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করার ছলে সেই আশঙ্কাটাকেই লালন করছিল এরা—এবার সেইটে সর্ববাধামুক্ত হয়ে তার সম্পূর্ণ, বীভৎস চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—সেই সম্ভাবনাটাই সমর্থিত হয়েছে দুর্গাপদর অস্ফুট আর্তনাদে—কী হয়েছে, কতটা হয়েছে, কী দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত, সেইটেই এখন বড় প্রশ্ন। কাছে এলেও তাই সামনে গিয়ে ভাল করে দেখবার সাহস নেই কারও, বুক কাঁপছে, পায়ের জোর গেছে ফুরিয়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতেই তরলার মাথা ঘুরে উঠে-ছিল সে কোনমতে রকের ধারের লোহার সরু থামটা ধরে সামলে নিলে নিজেকে কিন্তু মহাশ্বেতা আর পারল না। সে একবার চকিতে অভয়পদর দিকে চেয়েই 'বাবা গো' বলে ঘাটে ওঠবার পথে ঘাসের ওপরই শুয়ে পড়ল।

ভয় দুর্গাপদরও কম হয় নি। কিন্তু তার ভেঙ্গে পড়লে চলে না বলেই সে সামনে এসে লণ্ঠনটা তুলে ভাল করে দেখল।

না, আঘাতের কোন চিহ্ন কোথাও নজরে পড়ে না। পায়ের দিকগুলোও ভাল করে দেখল দুর্গাপদ। সেখানেও কোন গোলমাল নেই। এ আর কিছু, আঘাত ছাড়া এমন চেহারা হবার কোন্ কারণ থাকতে পারে,—সেই কথাটা একসঙ্গেই যেন

সকলের মনে পড়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যেটা।

তবে কি কোন খারাপ খবর আছে? কারও কোন অসুখ-বিসুখ করেছে?

নাকি......মারাই গেছে কেউ?

প্রশ্ন করতে যেন সাহসে কুলোয় না কারও। সকলেই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে।

এরই মধ্যে ক্ষীরোদা কখন উঠে পড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন কেউ লক্ষ্য করে নি। তিনি সন্ধ্যা হলেই শুয়ে পড়েন প্রত্যহ—আজও পড়েছিলেন। ঘুম আসে না তাঁর অত সকালে কোনদিনই—কিন্তু জেগেও থাকতে পারেন না। ঝিমিয়ে থাকেন। তারই মধ্যে এদের সকলের খাওয়া হলে ছোট বৌ একটু দুধ খাইয়ে যায়, কিংবা ঘরে থাকলে তার সঙ্গে একআধটা মিষ্টি। সামান্যই খান—তবু সেটুকু না পেটে পড়া পর্যন্ত নাকি ওঁর পাকা ঘুম আসে না। সেটা অবশ্য অন্যদিন ঢের আগেই হয়ে যায় কিন্তু আজ তাঁকে দুধ খাওয়ানোর কথা এদের কারও মনে পড়ে নি। আরও মনে হয় নি কারণ এদেরও তো খাওয়া হয় নি তখনও পর্যন্ত।

ঘুম তো হয়ই নি—অন্যদিনের মতো ঝিমিয়েও থাকতে পারেন নি পুরোপুরি। কারণ সন্ধ্যা পর্যন্ত অভয়পদ ফেরেনি তা তিনি শুতে যাবার আগে শুনে গেছেন। নিথর হয়ে পড়ে থাকলেও মনটা সজাগ ও সক্রিয় ছিল। তাছাড়া বয়স যতই হোক —কান দুটো তাঁর এখনও খুব পরিষ্কার আছে। এধারের এই সামান্য আওয়াজ— দুর্গাপদর অস্ফুট উদ্বিগ্ন উক্তি এবং এদের খালি পায়ে দৌড়ে যাবার মৃদু শব্দও কানে গেছে তাঁর। তিনি আর শুয়ে থাকতে পারেন নি। উঠে বাইরে এসেছেন অন্ধকারেই। হাতড়াতে হাতড়াতে সেইভাবেই ঘর থেকে দালানে, দালান থেকে রকে পড়েছেন, তখনও কেউ দেখতে পায় নি। কিন্তু রক থেকে নিচে মাটিতে পড়-বার সময়ই হুড়মুড় করে তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেলেন।

এবার সকলে সচকিত হয়ে উঠল। মেজকর্তা দাদার কাছেও যেতে পারে নি— রকেও থাকতে পারে নি—ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল —সে ছুটে এসে তাড়াতাড়ি মাকে টেনে তুলল, 'এ কী কাণ্ড, তুমি আবার এমন করে আসতে গেলে কেন? আমরা কি আর খবর দিতুম না?...ডাকলেও তো হ'ত কাউকে! ...দ্যাখো দিকিনি কী মুশকিল বাধালে। হাত-পা ভাঙ্গল কিনা—। এই বয়সে হাড় ভাঙ্গলে আর জোড়া লাগবে?'

অম্বিকাপদ তিরস্কার করতে থাকে।

ততক্ষণে তড়িৎ দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে লম্পটা নিয়ে এসেছে। দুর্গাপদও হ্যারিকেন নিয়ে এদিকে ফিরেছে।

যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠলেও ছেলের হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারলেন ক্ষীরোদা। বললেন, 'না, না, ও কিছু না। কিন্তু অভয়ের কী হ'ল তাই বল্ না আগে। তার হ'ল কি? সে কোথায়? বেঁচে আছে তো?

মায়ের এই আকুল প্রশ্ন কানে যেতেই বোধহয় অভয়ের সম্বিৎ ফিরল। সে পুকুর পাড় থেকে উঠে এসে তাড়াতাড়ি মাকে ধরল, হাত ধরে সাবধানে রকে বসিয়ে দিল।

ক্ষীরোদার হাত-পা বা হাড়-গোড় কিছু ভাঙ্গে নি কিন্তু লেগেছে খুব। বাঁ-পাটা বিশ্রীভাবে মচকে গেছে। যন্ত্রণায় চোখে জল এসে যাচ্ছে বার বার। তবু সেই ঝাপসা চোখেই, হ্যারিকেন ও লম্পর মিলিত আলোকে প্রাণপণে বড় ছেলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। তারপর, এদের যে কথাটা মাথায় যায় নি এতক্ষণ, অথবা যে

প্রশ্নকে মনে মনে প্রশ্রয় দেবারও সাহস হয় নি, সেই প্রশ্নই খুব সহজভাবে করে বললেন, 'হ্যাঁ রে, আমার কাছে নকুস নি—তোর কি চাকরি গেছে?'

প্রশ্নটা শুনেই এরা চমকে উঠল। তবু, তখনও বোধ করি উত্তরটা শোনবার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। অভয়পদকে এভাবে কথা কইতে কেউ কখনও শোনে নি। সে প্রাণপণে সহজ হবারই চেষ্টা করল, খুব স্বাভাবিকভাবেই কথাগুলো বলতে গেল কিন্তু গলা কেমন যেন কেঁপে বিকৃত হয়ে উচ্চারণগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে গেল। সে মার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'না, চাকরি যায় নি, তবে বহু টাকা ডুবেছে। বাকী জীবনটা—যদি আরও বিশ-পঁচিশ বছরও বাঁচি—রোজগার করেও এর অর্ধেক হাতে পাব না। এতগুলো টাকা কখনও একসঙ্গে দেখব তা-ই কোন দিন মনে করি নি।... নিজের বুদ্ধির দোষে সেই সব টাকাই ক্ষইয়ে এলুম।'

সকলেই নির্বাক। কি টাকা, কিসের টাকা প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন নেই। টাকার অঙ্কটা না জানা থাকলেও সে যে কীভাবে টাকা খাটায় অফিসে তা এতদিনে এ বাড়ির সকলেই জেনেছে।

বুঝেছে সবাই—মহাশ্বেতা ছাড়া। অভয়পদর সঙ্গে সঙ্গে সেও উঠে এসেছে পুকুর ধার থেকে, ওর পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে সে, কথাগুলো শুনতে বোধ হয় কোন অসুবিধা হয় নি—শুধু তাদের শব্দগত অর্থটা যেন এখনও হৃদয়ঙ্গম হয় নি তার। অথবা সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না। সেও সকলের মতোই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তবে তার চোখের বিহ্বল দৃষ্টি দেখে মনে হ'তে লাগল যে যা শুনেছে তার একবর্ণও মাথায় ঢোকে নি।

অভয়পদ এবার মেজভাইয়ের দিকে চাইল। বলল, 'তুমিই ঠিক বলেছিলে খোকা, অতি লোভ করতে গিয়েই সর্বস্ব গেল! সবটাই ডুবল একেবারে। শুধু তাই নয়—টাকাটা সব আমারও ছিল না তো—বেশির ভাগই পরের টাকা খাটছিল—এর, আমার শাশুড়ীর, আরও দুএকজন বন্ধুবান্ধবের। সে দেনাও আমাকে শোধ করতে হবে কিনা কে জানে—তারা তো আমাকে দেখেই দিয়েছিল! কিন্তু সে তো আমি আর এ জন্মে পেরে উঠব বলে মনে হচ্ছে না।...ওঃ!'

এবার আর সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না কোথাও।

'কী সর্বনাশ। য়্যাঁ!' বলে একটা শব্দ করে অম্বিকাপদ সত্যি-সত্যিই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল রকে। টাকা তার নয়, সে ঘর থেকেও বার করে দেয় নি—তবু সে তো জানে তাদের ঘরে একটি টাকা সঞ্চয়ের জন্যও কী প্রাণপণ এবং মর্মান্তিক প্রয়াস করতে হয়। টাকা যারই হোক, বহু দুঃখের টাকা তাতে কোন সন্দেহ নেই। টাকা এমন কি শত্রুর লোকসান যাচ্ছে শুনলেও বুকে বাজে, এ তো নিকট-আত্মীয়ের টাকা। বিশেষত দাদাকে তারা চেনে—তার সারা জীবনটাই তো সুকঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনের ইতিহাস। নিজেকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত করা পয়সা তার। এর একাংশও যদি নিজের ভোগসুখের জন্য ব্যয় করত তো এদের বোধহয় এতটা কষ্ট হ'ত না। এই সংবাদটা তাই অম্বিকাপদর নিজের টাকা ক্ষোয়া যাবার মতোই বাজল।

এবার মহাশ্বেতাও বুঝেছিল নিঃসংশয়ে। সর্বনাশের পরিমাণটা এত তাড়াতাড়ি হিসাব করা সম্ভব নয়—তবু মোটামুটি আবছা আবছা একটা ধারণা করতে পারল বৈকি! আর তাই তো যথেষ্ট। সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল একেবারে, মড়াকান্নার মতো। এই গভীর নিস্তব্ধ রাত্রিতে এই কান্নার শব্দ উঠলে আর রক্ষা থাকবে না। এখনই পাড়াপড়শীরা জেগে উঠবে, কী হয়েছে সেই কৌতূহলে ছুটে বেরোবে সবাই এবং সংবাদটা শুনে মৌখিক সমবেদনা প্রকাশ করে হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরবে। এ

সবই জানা কথা। সকলেরই জানা। বাঁধা ছকের ব্যাপার। মহাশ্বেতারও অজানা নয়, মাথার ঠিক থাকলে সেও এ-কান্নার ফলাফল বুঝতে পারত। কিন্তু তার কাছে তখন এত বিবেচনা আশা করা যায় না। মেজবৌও তাকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল না, 'চুপ! চুপ!' করে তার মুখে নিজের আঁচলেরই খানিকটা গুঁজে দিয়ে একরকম টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল।

তার এই সময়োচিত সতর্কতায় বাকী সকলেরও জ্ঞান হ'ল।

'চল চল, যা হবার তা তো হয়েছেই—এখন ভেতরে চল।'

দুর্গাপদ একরকম সকলকে তাড়িয়ে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এল। ক্ষীরোদাকে অভয়পদই ধরে ধরে এনে শুইয়ে দিলে আবার।

সে রাত্রে কারও খাওয়া হল না। শুধু তড়িৎকে জোর করে দুগাল খাইয়ে দিলে মেজ বৌ। মহাশ্বেতা প্রথম কান্নার বেগটা সামলাবার পর অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে ছিল, তারপর—সর্বনাশের পরিমাণটা সম্পূর্ণ জানা হয়ে গেলে, যখন আর সন্দেহ বা আঁকড়ে ধরবার মতো এতটুকু আশা কোথাও অবশিষ্ট রইল না তখন—ঢিব্ ঢিব্ করে মাথা খুঁড়ে বুক চাপড়ে রক্তগঙ্গা করে তুলল একেবারে।

বলল অভয়পদই। সে এবার অনেকটা স্থির হয়ে এসেছে, আগেকার অবিচলিত প্রশান্তি ফিরে না পেলেও কথাবার্তা সহজ হয়ে এসেছে বেশ। অম্বিকাপদর প্রশ্নের উত্তরে সবই খুলে বলল সে।

না, আশা বলতে আর কোথাও কিছু নেই। যে দুটি সাহেব ওর কাছ থেকে নিয়মিত ধার নিত তাদের দুজনেই দেওয়া নেওয়া করতে করতে অনেক টাকা বাকী ফেলে দিয়েছিল। শুধু অভয়পদর কাছেই না—আরও অনেকের কাছেই। এরা আগে কেউ কাউকে কিছু বলে নি। শেষে দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে দেওয়াটা যখন অনেকদিন ধরে বন্ধ হয়ে রইল তখন সকলেই সজাগ হয়ে উঠল। তখন জানাজানি হয়ে সকলেই প্রমাদ গুনল, কারণ টাকার পরিমাণ ভয়াবহ। এখানে এই চাকরি করে সে ঋণ শোধ করা যায় না। যারা যারা ধার দিয়েছিল তারা বিপদ বুঝে ওপরওলা সাহেবদের কাছে গিয়ে পড়ল। সেটাই হ'ল আরও ভুল। তাঁরা ওদের হাঁকিয়ে দিলেন, শাসালেন যে এরকম অমানুষিক সুদে যারা টাকা খাটায় তাদের প্রতি কোন সহানুভূতিই নেই তাঁদের—ওরা বারদিগর ঐ টাকার কথা মুখে আনলে পুলিশে খবর দেবেন তাঁরা। আর খাতকদের গোপনে বলে দিলেন যে, 'তোমরা যে কাণ্ড করেছ,এর পর আর তোমাদের চাকরীতে বহাল রাখা সম্ভব নয়, এদেরও বেশীদিন সামলে রাখা যাবে না। তোমরা অপমানিত হ'লে আমাদের সকলেরই অপমান। তার চেয়ে এইবেলা মানে মানে সরে পড়ো—clear out! নইলে শেষ অবধি তোমাদের জবাব দিতে বাধ্য হবো।'

তাঁদের এ উপদেশের কথা অভয়পদরা কিছুই জানত না। হঠাৎ একদিন শুনল যে দুজনের একজন বোম্বাইতে চলে গেছে—বলে গেছে সেখানে কে দেশের লোক আছে আত্মীয়—তার কাছ থেকে টাকা এনে এখানকার দেনা শোধ করবে। আর একজন এখানেই ছিল, সে সময় নিয়েছিল গতকাল পর্যন্ত। গতকালই রাত্রে সে আত্মহত্যা করেছে। তার নাকি দেশেও এই অবস্থা—সেখানেও মুখ দেখাবার উপায় নেই। তাছাড়া সে নানা কৌশলে নাকি তার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডেরও বেশির ভাগ টাকা বার করে নিয়েছে—অবলম্বন বলতে তার আর কোথাও কিছু ছিল না।

সকালে অফিসে গিয়ে এই খবর শুনেই ওরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল, এইমাত্র সন্ধ্যাবেলায় আরও খবর এল—সে সাহেবটিও বোম্বে থেকেই চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে

পাওনা টাকাকড়ি সব চুকিয়ে নিয়ে নিরাপদে বিলেতে রওনা হয়ে গেছে। তাকে আর ধরা-ছোঁওয়া যাবে না কোন রকমেই।

সব ইতিহাস শুনে আর একদফা নিথর হয়ে রইল সবাই। শেষে অতিকষ্টে সাহস সঞ্চয় করে অম্বিকাপদ প্রশ্ন করল, 'তোমার—মানে তোমার হাত দিয়ে কত গেল দাদা, সবসুদ্ধ? হিসেব আছে কিছু?'

'আছে বৈকি।' বেশ সহজভাবেই উত্তর দিল অভয়পদ, 'প্রায় সাত হাজার টাকা।'

'সা-ত-হা-জা-র!' দম বন্ধ হয়ে আসে যেন অম্বিকাপদর, অতিকষ্টে টেনে টেনে অক্ষর কটা উচ্চারণ করে সে।

দমবন্ধ হয়ে আসে উপস্থিত সকলেরই। অঙ্কটা তাদের ধারণার অতীত, অবিশ্বাস্য। খানিকটা চুপ ক'রে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অম্বিকাপদ কতকটা আপনমনেই বললে, 'গেল সপ্তাহে আমার ভায়রাভায়ের এক মামা একখানা দোতলা কোঠাবাড়ি বিক্রী করলে—হাওড়া খুরুট রোডের ওপর—সাড়ে ছ হাজার টাকায়। বাড়িটায় ভাড়া ওঠে প্রায় চল্লিশ টাকার মতন!'

আরও একবার বুক চাপড়ে হাহাকার ক'রে ওঠে মহাশ্বেতা।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

খবরটা স্বর্ণলতাকে হরেনই এনে দিলে। কথাটা অভয়পদর অফিস থেকে শুনে এসেছিল হরেনের এক ভগ্নিপতি, সে আবার একদিন কী কাজে এসে শুনিয়ে গেল ওকে! সেদিন অবশ্য হরেন কিছু বলে নি—পরে একটা শনিবার দেখে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল, সেখান থেকে পাকা খবর শুনে এসেছে। চোখে দেখেও এসেছে অবস্থাটা। বললে, 'তোমার বাবাকে আর চেনা যায় না। অমন সাজোয়ান পুরুষটা কদিনেই যেন এতটুকু হয়ে গেছেন! সামনে ঝুঁকে পড়েছেন একেবারে। মেজ কাকীমার মুখে শুনলুম—খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন সব। এমনি তো কিছু খাওয়া ছিলই না—দুবেলা দুমুঠো ছাড়া; জীবনে নাকি জলখাবার কাকে বলে তা জানেন না, বাড়িতে যজ্ঞিটজ্ঞি হলে যখন বাড়িতে মিষ্টির এউঢেউ চলে তখনও নাকি কেউ কোন দিন সকালে বিকেলে একটা খাওয়াতে পারে না কখনও, ঐ যা করে দুবেলা ভাতপাতে;—তা সে ভাতও এমন কমিয়ে দিয়েছেন যে ও'রা সবাই ভয় পেয়ে গেছেন, সে খাওয়া খেয়ে মানুষটা বাঁচবে কী ক'রে। অথচ যেমন অফিস-ঠেলা তা তো ঠিকই আছে; হাঁটারও কমতি নেই—বিকেলে নাকি ফেরেন মড়ার মতো নির্জীব হয়ে।... মেজ কাকী বলছিলেন যে মানুষটা যেন আত্মহত্যা করছে একেবারে!'

'তা ওরা জোর করে খাওয়াতে পারছে না? মা কি করছে? আড় হয়ে পড়তে পারছে না খাওয়ার সময়?'

স্বর্ণলতা বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

'সেই তো হয়েছে আরও মুশকিল! মা নাকি এর ওপরও সামনে হাহুতাশ ক'রে যাচ্ছেন—ঐ টাকার জন্যে, ও'কে যা-নয়-তাই শোনাচ্ছেন দুবেলা! ঐ সামান্য খাওয়া—তাও এক একদিন নাকি খেতে পারেন না মার বাক্যি-যন্ত্রণায় আর চেঁচামেচি কান্না-

কাটিতে। ও'র পাতের সামনে এসে টিপটিপ ক'রে মাথা খুঁড়লে কি কেউ খেতে পারে বসে? অথচ ও'র যত কান্না আর যত মাথাখোঁড়া নাকি সেই সময়েই। এমন অবুঝ, কেউ বললেও বুঝতে পারেন না যে অনিষ্টটা ও'রই হচ্ছে!...তোমার দিদিমা নাকি পইপই ক'রে বারণ করেছিলেন—মা শোনেন নি, নিজের গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা এনে দিয়েছিলেন বাবাকে—সেই হয়েছে ও'র আরও বেশী জ্বালা, কেবল বলছেন যে শত্রু হাসল। টাকার শোকের চেয়েও ঐটে বড় হয়ে উঠেছে।...নিজের মা নাকি ও'র শত্রু—বোঝো ঠেলা।'

হরেন হাসে কিন্তু স্বর্ণলতা হাসতে পারে না। সে মাকে চেনে। কী যে করছে মহাশ্বেতা—কী পরিমাণ চেঁচাচ্ছে আর তুড়িলাফ খাচ্ছে তা সে এখান থেকেই বলে দিতে পারে। মানুষটা চিরকালের নির্বোধ, নিজের ভালমন্দ ভবিষ্যৎ কখনও দেখতে পায় না চোখে। যেটা একেবারে প্রত্যক্ষ, সেটাও না। অভয়পদর কিছু হলে ওর কি হবে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—কী অবস্থা হবে সংসারের—ঐ একপাল মুখ্খুকে খাওয়াবে কোথা থেকে তা একবারও ভাববে না মহাশ্বেতা, সে লোকই নয়। এখন—এই এত বড় লোকসানটার পর বরং আরও বেশী ক'রে যত্ন করা দরকার তাও বুঝবে না সে। বোঝাতে যাওয়াও বিপদ। দরকার হ'লে ওর গলার ওপর গলা চড়াতে পারে এক মেজ কাকী—তা সে কিছু বলতে গেলে উলটো উৎপত্তি হবে। ওরাও তো শত্তুর!

কী হচ্ছে বাড়িতে—তা যেন এখানে বসেই স্পষ্ট দেখতে পায় স্বর্ণ। তার দুই চোখে জল ভরে আসে। বলে, 'আমি যাই একবার, কদিন থেকে আসি গে।...... দুবেলা দুমুঠো ভাত, তাও যদি এমন করে ছেড়ে দেয় তাহ'লে সত্যিই বাঁচবে না বাবা। আর কেউ খাওয়াতে পারবে না, আমি ছাড়া। আড় হয়ে পড়তে হবে, নিজে অন্নজল ত্যাগ করতে হবে—তবে খাবে। আমি গিয়ে অন্ততঃ পাঁচ-সাতটা দিন খাইয়ে আসি সামনে বসে, তারপর বরং বৌদিকে শিখিয়ে দিয়ে আসব—সেই খাওয়াবে অমনি জোর করে। বৌদিকেও বাবা ভালবাসে মেয়ের মতো, মুখে কিছু না বললেও সেটা আমি বুঝি। কিন্তু সে তো কিছু জানে না, ছেলেমানুষ, অত বড় বড় শাশুড়ীদের সামনে সে আর কি বলবে, তাকে শিখ্খে পড়িয়ে আসতে হবে। প্রথমটা অমি না গেলে চলবে না। যাবো? পাঁচসাতটা দিন?'

উৎসুক মিনতিভরা কণ্ঠে বলে স্বর্ণ।

হরেনের মুখ কিন্তু গম্ভীর হয়ে ওঠে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'তুমি যাবে—তারপর? এধারে?'

মুখ ম্লান হয়ে যায় স্বর্ণর।

'কোনমতে উপায় হয় না— হ্যাঁ গো?'

'উপায় কি আর হবে বল। এক উপায় আমার বসে বসে হাঁড়ি-ঠেলা। এই গুষ্টির হাঁড়ি ঠেলা কি সোজা কথা! আপিস তো আছে, আটটায় বেরোতে হয়—দেখতেই তো পাচ্ছ!......তা ছাড়া ওখান থেকে বলে পাঠায় নি, কেউ নিতে আসে নি—মা কি পাঠাবে?'

এবার স্বর্ণ একটু রাগ করে।

'কেউ নিতে আসে নি—বড্ড অন্যায় কথা বটে। কিন্তু এলেই কি তোমার মা পাঠান হুট্ বলতে? এই তো ছোট ভাইটার পৈতে গেল—তাও যেতে পেলুম না। তোমাদের সংসার নিয়েই পড়ে থাকতে হ'ল।......বাপের অসুখ, বাপ যদি মরেই যায় —একবার দেখতে যেতে পাবো না? কেন, আমি কী কইদী নাকি? তাও জেল-

খানার কইদীরাও তো এক-আধবেলা ছুটি পায় শুনেছি!'

'অতশত আমি জানি না!' হরেনও একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, 'পারো মাকে ব'লে যাবার হুকুম করিয়ে নাও গে। আমি বলতে-টলতে পারব না।...আমরা না হয় হোটেলে-টোটেলে খেলুম, রাত্রে বাজারের খাবারও খেতে পারি—কিন্তু মার কি ব্যবস্থা করব? তাহ'লে তাঁকে কদিনই দই চিঁড়ে খেয়ে থাকতে হয়।'

স্বর্ণ খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলে, 'তা তিনি কি কটা দিনও চালাতে পারবেন না? এককালে তো সবই করেছেন একহাতে—'

'সে যখন করেছেন তখন করেছেন, মানুষের শরীর কি চিরদিন সমান যায়? এখন যদি শরীরে না বয় তাঁর—তো কি চাবুক মেরে চালাবে?'

হরেন রাগ ক'রে উঠে চলে যায়।

উত্তরটা মুখের কাছে এসেছিল তবু চুপ ক'রে যায় স্বর্ণ। স্পষ্ট কথা বলেও কোন লাভ নেই, তিক্ততা বাড়বে। মার দোষ ছেলেকে দেখাতেও নেই, মহাপাপ। ছোট কাকী বার বার বলে দিয়েছে। নইলে সে বলতে পারত যে শরীর যদি অতই খারাপ তাহলে অমন ডবল খোরাক একা হজম করেন কি করে? কোন রোগও তো দেখা যায় না কোথাও!

কিন্তু বলে কোন লাভও নেই। ও হরেনের কাছে বলতে পারে বড়জোর—শাশুড়ীর মুখের ওপর কিছু বলতে পারবে না এটা ঠিক। আর বলেই বা কি হবে, শাশুড়ী যে তাতে কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা বোধ করবেন সে সম্ভাবনা নেই। তিনি পারবেন না কিছুই, চিঁড়ে-দইও খাবেন না—হয়ত হরেনকেই শেষ পর্যন্ত রেঁধে দিতে হবে মায়ের জন্যে। সে জন্যে যদি আপিস কামাই হয় তো তাও করতে হবে। মা বলবেও না যে, তুই যা, আমার যা হয় হবে এখন!

না, যাওয়া ওর হবে না কোথাও কোনদিন। এইখানে এই চার দেওয়ালের মধ্যেই আটক থেকে হাঁড়িবেড়ি ধরে কাটাতে হবে চারকাল। যেমন ওর হাঁড়িবেড়ি ধরার সাধ ছেলেবেলা থেকে—তেমনিই ভগবান তাকে এই বাড়িতে এনে ফেলেছেন। সাধটা মিটিয়ে দিচ্ছেন ভালরকম ক'রেই।

স্বর্ণ শ্বশুরবাড়ি পা দিয়েই শুনেছে ওর শাশুড়ীর শরীর খারাপ—সংসারের কাজকর্ম তিনি কিছুই দেখতে পারেন না। তবু তখনও অতটা বোঝে নি, কারণ সে সময় ওর এক পিসতুতো ননদ সুশীলা এখানে ছিল, সংসারের হাল ধরে ছিল সে-ই। অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে—কিন্তু তাই বলে কারও গলগ্রহ নয়। স্বর্ণর শাশুড়ী সে কথাটা প্রথম দিনেই ওকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন, 'ও অক্ষ্যাম নয় বৌমা, পেটের দায়ে পড়ে নেই এখানে। ওর বর খুব সেয়ানা ছিল, ঐ যে বিদ্যেসাগরের কী এক কোম্পানী আছে না—বিধবাদের জন্যে?—সেইখানে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কী সব টাকাকড়ি দিয়ে বৌয়ের নামে আট্‌কে বেঁধে রেখেছিল। এখন ও মাসে মাসে সেখান থেকে মাসোহারা পাচ্ছে। যতদিন বাঁচবে মাসে পনেরো টাকা ক'রে পাবে। ছোঁড়া যেন দেখতে পেয়েছিল চোখে যে বেশীদিন বাঁচবে না।...ও টাকা ছাড়াও, ওর শ্বশুরের মস্ত বাড়ি কলকাতার বৌ-বাজারে, তারও একটা ভাগ সে ভদ্দরলোক ওকে লিখে দিয়ে গেছেন। বেশ পাকা ব্যবস্থা, ওর সে অংশ ও ইচ্ছে করলে ভাড়া দিতে পারবে, এমন কি বেচতেও পারবে। অবিশ্যি সেসব কিছুই করে নি ও, তেমনি ওর ভাশুর-দেওররা জোড়হস্তে থাকে সর্বদা। কোথাও তিত্থিধম্ম করতে যেতে চাইলে মড়মড় টাকা গুনে দেয়। ও এখানে আছে স্বেচ্ছাসুখে, নেহাৎ মামীকে ভালবাসে ব'লেই তাই। ওকে যেন অবীরে বিধবা ভেবে হেনস্তা কি অছেন্দা ক'রো নি বাপু!'

অছেন্দা কি হেনস্তা করার কথা স্বর্ণর মাথাতেও যেত না কখনও। গলগ্রহ, আশ্রিত হ'লেও সে হেনস্তা করতে পারত না, সে রকম মানসিক গঠনই নয় ওর। তার ওপর সুশীলা মানুষটা তো খুবই ভাল। স্বর্ণর তাকে খুবই ভাল লেগেছিল। সে যতদিন ছিল—টুকরো-টুকরো ফায়ফরমাস খাটা ছাড়া বিশেষ কিছুই করতে হয় নি ওকে—হাঁড়ি-হেশেল ঠেলার মোটা কাজ সুশীলাই করত।

কিন্তু, বোধহয় স্বর্ণরই বরাত, মাস ছয়েক যেতে না যেতেই খবর এল সুশীলার বড় জায়ের মরণাপন্ন অসুখ, তার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই, আতান্তর অবস্থা। সুশীলাকে তারা সবাই খুব ভালবাসে, খুবই অনুগত। সুতরাং সে খবর পাওয়ার পর সুশীলার পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকা সম্ভব নয়। সে বলতে গেলে তখনই একবস্ত্রে চলে গেল—যে খবর এনেছিল তার সঙ্গেই। তার সে জা তারপর মারাও গেল—সুশীলার হাতেই পড়ল সেই সংসার, তার আর আসাও হ'ল না। এখন কখন সখনও দৈবেসৈবে আসে স্বামীকে দেখতে—এক-আধঘণ্টার জন্য। পাঁচ দশদিন এসে থাকার মতো তার অবস্থা নেই আর।

সেই সুশীলা চলে যাওয়ার দিনটি থেকেই গোটা সংসারটার ভার এসে পড়ল স্বর্ণর মাথায়। তাতেও আপত্তি ছিল না, যদি সাধারণ খাওয়া-দাওয়া হ'ত এদের। একটা ঠিকে ঝি আছে, সে শুধু বাসন মেজে ঘরদোর মুছে চলে যায়, তার হাতের জল-বাটনা নেন না এঁরা। একটু শুচিবায়ুও আছে, ঝি বাসন-মেজে বাসন উপুড় করে রেখে যায় রোয়াকে, দুবেলা সেইসব বাসন আবার ভিজে কাপড় পরে জলে ধুয়ে নিতে হবে। এর পর খাওয়া। খাওয়ার এত তরিবৎও জানে এরা। হরেনের দুবেলা পোস্ত চাই। যদি কালিয়া পোলাও-ও রান্না হয় কোনদিন—তবু পোস্ত না দেখলে পাতে বসবে না সে। তাছাড়া ধোঁকা, ছানার ডানলা, এঁচোড়ের গুলি-কাবাব, মোচার দম-পোক্ত—নানান্ ঝঞ্ঝাটের রান্না সব ফরমাশ করবে সে। নিজেও জানে রাঁধতে। সে-ই দেখিয়ে শিখিয়ে দিয়েছে। এর ওপর আবার পুরুষরা কাছারী-ইস্কুলে বেরিয়ে গেলে শাশুড়ীর জন্যে ছত্রিশ ব্যঞ্জন রান্না আছে। তাঁর আবার প্রত্যহ ঘি-ভাত চাই দুটিখানি। তাঁর নাকি পেট খারাপ, ঘি ভাত ছাড়া সহ্য হয় না। এমন কথাও স্বর্ণ শোনে নি কোন-কালে। ঘি-ভাত খেলেই পেট খারাপ হয়—এইতো সে জানত, এদের সবই উলটো।

শুধু কি ঘি-ভাত! তার সঙ্গে আবার দুটি সাদা ভাত। বাজারের ভাজামুগের ডাল তিনি খান না, তাঁর জন্যে কাঁচামুগের ডাল ধুয়ে রোদে দিয়ে শুকিয়ে তুলে রাখা হয়—সে-ই কাঠখোলায় ভেজে নিয়ে রাঁধতে হবে। তাও, পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই। একটু কম ভাজা হ'লে বলবেন, 'আজ বুঝি ডাল কটা ভাজো নি বৌমা?' আবার একটু কড়া ভাজা হ'লে বলবেন, 'এঃ, ডালগুলো পুড়ে যে আঙ্‌রা হয়ে গেছে বৌমা, সেই জন্যে ভাল ক'রে গলে নি। কট্‌কট ক'রে লাগছে দাঁতে। ...যদি ভাজতে এত কষ্ট হয় বৌমা তো এ ডাল আর রেঁধো না, যা হয় ঐ অড়র ছোলাই ভাল আমার। রোজ খেয়ে পেট ছাড়ে না হয় দুদিন খাবো না—উপোস দেব! কী আর হবে!'

একটি তো কাজ করবেন না, কোনদিন সংসারের কুটি ভেঙে দুটি করতে দেখল না স্বর্ণ, অথচ বাক্যির বেলায় ষোল আনা আছেন! আজকাল আর এসব ক্ষেত্রে মেজাজ সামলাতে পারে না স্বর্ণলতা, রান্নাঘরে এসে আপন-মনে গজগজ করে—'উঃ উনি আবার উপোস দেবেন! তবেই হয়েছে। এখনও তো ছেলে বৌ সকলের

চেয়ে বেশী খান—ঠিক ডবল খোরাক।...বসে বসে হজমও তো করে। পেটও তো ছাড়ে না! মুয়ে-আগুন, নোলা-সব্বস্ব মেয়ে-মানুষ! ভাতার খেয়ে বসে আছে, গণ্ডাখানেক ছেলেমেয়ে খেয়েছে—তবু নোলার কম্‌তি নেই। আমাদের সব্বাইকে খেয়ে তবে যাবে—তুমি দেখে নিও!'

সত্যিই আর পেরে ওঠে না সে। দুরকম ভাত, ডাল, আবার তার সঙ্গে বড়ি-বড়া দিয়ে ঝোল একটা (লোককে বলেন, 'কী আর খাওয়া, দিনান্তরে দুটো ঝোল-ভাত, এটুকুও যে কেন ভগবান রেখেছেন তা জানি না। এর জন্যেই লোকের মুখ-নাড়া আর খোঁটা খাওয়া!'...কে যে খোঁটা আর মুখনাড়া দেয় তা স্বর্ণ জানে না, এ বাড়িতে কারও সে সাহস নেই, সবাই তো তটস্থ!), ডালনা চচ্চড়ি অম্বল—একেবারে সাধের খাওয়ার ব্যবস্থা চাই প্রত্যহ। নিহাৎ বোধহয় লোকলজ্জার ভয়ে মাছের মুড়োটা খেতে পারেন না, নইলে তাও আনতে বলতেন। পায়েস তো লেগেই আছে, কোনদিন যদি একটু দুধ বাঁচল খবর পেলেন তো আর রক্ষা নেই, ঠিক বলে বসবেন, 'তাহ'লে একটু পায়েস কেন বসিয়ে দাও না বৌমা, তোমরা খেতে!'

ছেলেপুলের সংসারে দুধ যা বাঁচে তাতে পায়েস ক'রে গুষ্টিসুদ্ধ খাওয়া যায় না —তা উনি ভালরকমই জানেন। তবু ন্যাকামি ক'রে ঐটুকু বলা চাই। সে পায়েস যখন সামনে ধরে দেয় স্বর্ণ তখন কিন্তু একবারও জিজ্ঞাসা করেন না, কোনদিন ভুলেও না—যে, 'তোমাদের জন্যে রেখেছ তো?'...জিজ্ঞাসা করেন একেবারে সন্ধ্যে-বেলা, 'ছেলেদের পায়েস দিয়েছিলে তো বৌমা মনে ক'রে? তোমার যা আবার ভুলো মন।'

আগে আগে, নতুন নতুন ভয়ে ভয়ে চুপ ক'রে থাকত, হুঁ-হাঁ বিশেষ করত না। এখন আর রেয়াৎ করে না, কট্‌কট্‌ ক'রে শুনিয়ে দেয়, 'কী আমার এত ভুলো মন দেখছেন মা রোজ রোজ। কী এমন জিনিস আমি আপনার ছেলেদের না দিয়ে পরে নিজে বসে দশহাতে খাচ্ছি!...একপো দেড়পো দুধ ছিল, তা তো আপনিও দেখেছেন—তাতে কত পায়েস হবে যে সবাইকে বেটে দোব? যেটুকু হয়েছিল বাটিসুদ্ধু আপ-নাকেই তো ধরে দিলুম। আর আসবে কোত্থেকে।'

'ওমা তাই নাকি। তা তো জানি না।' শাশুড়ী অপ্রস্তুতভাবে বলেন, 'তা তাহলে আমাকেই বা ধরে দাও কেন বৌমা অমনভাবে? সবাইকে বঞ্চেসঞ্চে নিজে খাব—এমন নোলা আমার নয় বৌমা। আগে ছেলেরা আমার—তারপর তো নিজে!... আমি কি আর অতশত হিসেব ক'রে রাখতে পারি বাছা—শোকাতাপা মানুষ, তার ওপর চিরকাল রোগে ভুগছি, আমার মাথায় কি আছে। বলে মানুষের মতো চলে-ফিরে বেড়াচ্ছি যে এই ঢের! না বৌমা, কাজটা ভাল করো নি বাছা!'

বলেন কিন্তু আবারও যেদিন পায়েস তাঁর সামনে ধরে দেওয়া হয়, আবারও তেমনি নিঃশব্দে খেয়ে নেন, খোঁজ পড়ে আবার সেই বিকেলের দিকে কিংবা তার পরের দিন। একবার ইচ্ছে ক'রেই স্বর্ণ সন্ধ্যেবেলা এইরকম কথা শোনার পর পরের দিনই একটু পায়েস করে দিয়েছিল, বলতে গেলে শিশুদের ভাগ কমিয়েই— কিন্তু সেদিনও কোন প্রশ্ন করার কথা মনে পড়ে নি তাঁর। তবে সেদিন আর বিকেলেও কোন কথা উত্থাপন করেন নি, বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন।

অবশ্য এমন অনেক জিনিসই এ সংসারে শুধু ও'র জন্যে আসে বা রান্না হয়। সকালে আহ্নিক ক'রে উঠে একটু ফল আর মিষ্টি খাওয়া অভ্যেস নাকি ও'র চির-দিনের! যে দুটি ক'রে সন্দেশ কি রসগোল্লা আসে প্রত্যহ—তার বেশী আনবার ক্ষমতা নেই এদের—সেগুলো খাওয়ার সময় কিন্তু নাতিনাতনীদের কথা একবারও

মনে পড়ে না। ফল, শরবৎ, মিষ্টি—পুজোর নৈবিদ্যির মতো পরিপাটী ঠাঁই ক'রে সাজিয়ে দিতে হয় তাঁকে। শুধু দয়া করে বিকেলটাতেই কিছু খান না, সন্ধ্যেবেলা আহ্নিক ক'রে উঠে শুধু এক কাপ চা-ই খান। আবার কিন্তু রাত্রিবেলা ষোড়শো-পচার আছে। আটখানা ফুলকো লুচি, অন্তত দু-রকম ভাজা—একটু আলুচচ্চড়ি কিংবা কোন ডালনা। এ'চোড় কপির সময় ডালনাই খান—অন্য সময় আলুচচ্চড়ি। তাও ক'রে রেখে দিলে চলবে না। যখন খাবেন তখনই গরম গরম ভেজে দিতে হবে। শুধু লুচিই যে গরম চাই তা নয়, বেগুন পটল ভাজাও তখন-তখনই ভেজে দিতে হবে, 'ঠাণ্ডা হ'লে ওর আর কি সোয়াদ থাকে বৌমা! সে তো অখাদ্যি! খাওয়ার কোন বাঁধা সময়ও নেই, কোনদিন রাত নটায় বলবেন খোলা চাপাতে, কোনদিন বা সাড়ে দশটায়। সব খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলেও ও'র জন্যে চুপ ক'রে বসে থাকতে হবে, কখন মর্জি হবে বলবেন, 'বৌমা কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি বাছা!...কী দেবে দাও এবার, যা হয় কিছু গালে ফেলে শুয়ে পড়ি। বসে বসে ঢুলুনি আসছে!' বসে যে আছেন সে যেন স্বর্ণরই দোষ। অনেক আগেই ও'কে শুইয়ে দিতে পারলে স্বর্ণ বাঁচে। ও'র খাওয়ার আগে তার খাওয়া সম্ভব নয়—যদিও শাশুড়ী মাঝে মাঝে বলেন, 'তুমি এত রাত অবধি বসে থাক কেন বৌমা, বালপোয়াতী—তুমি তো পাট চুকিয়ে নিলেই পারো।' কিন্তু সে জানে যে ও'র উপদেশ শুনলে উনিই বাঁকা বাঁকা এতটি কথা শোনাবেন! আরও অনেক শোনাবে। এ ঝাড়কে চিনতে বাকী নেই তার। একদিন দুপুরবেলা থাকতে না পেরে খেয়ে নিয়েছিল—তা জেনে হরেন বলেছিল, 'খাও তো লুকিয়ে খেও, মার খাওয়া হয়ে গেলে আর একবার লোক-দেখানো সদুরেও খেতে বসো।...নইলে শাশুড়ীর আগে বোয়ের খেয়ে নিলে বড় নিন্দে হয়।'

ফলে এক একদিন স্বর্ণর খেয়ে হাঁড়ি হে'শেল তুলে ঘরে ঢুকতে রাত বারোটা বেজে যায়। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ে একেবারে, হাত-পা যেন কুকুরে চিবুতে থাকে! তবু তখনই কি ছুটি আছে, কোন্‌টা কি অকর্ম করেছে, কোনটাকে সোজা করে শোওয়াতে হবে—কাকে দুধ খাওয়ানো বাকী এসব সেরে তবে শোওয়া। তখন আছেন স্বামী। যত রাত্রেই আসুক, হরেনের ঘুম ভেঙে যায়। হরেন ভাল-বাসে ওকে ঠিকই—একটু বেশী ভালবাসে। আর একটু কম বাসলেই যেন বাঁচত স্বর্ণ। বছর বছর আঁতুড় ঘরে ঢোকা—এ যেন ভাল লাগে না ওর। এদিক দিয়ে সে মা কাকী সকলকে টেক্কা দিয়েছে। তারা কেউই বছর বিয়োনী ছিল না। ওর বছর বছর। ফলে ছেলেমেয়েগুলোর স্বাস্থ্য ভাল না, এরই মধ্যে একটা গেছে। আবার সেজন্যে দোষী হয় স্বর্ণই—হরেন বলে, 'কই এত তো আছে আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন —এমন কাণ্ড তো কারও দেখি নি!' কাণ্ডটা যে হরেন ইচ্ছে করলেই বন্ধ করতে পারে, সে কথাটা ঠোঁটের ডগায় এলেও মুখ ফুটে বলতে পারে না স্বর্ণ। ছিঃ, এসব কি পুরুষের সঙ্গে বলবার মতো কথা! কী ভাববে মানুষটা। এমনিই তো, একটু চেঁচিয়ে কথা বলার অভ্যাস হয়ে গেছে বাপের বাড়িতে—এখন আর খুব গলা নামাতে পারে না, সেজন্যে বেহায়া দুর্নাম রটেছে। শাশুড়ী হেসেই বলেন, কিন্তু কথাগুলো গায়ে বেঁধে ঠিকই। বলেন, 'বৌমা আমার বাপের বংশের এক মেয়ে তো—একটু আদুরে হয়ে গেছেন—ঝিউড়ী বেলার অভ্যেসটা ছাড়তে পারেন না, শ্বশুরবাড়ি যে গলা খাটো করতে হয়, সেটা একেবারেই মনে থাকে না। তবে তাও বলি—ও ছেলে-মানুষ, তাঁদেরই একটু হুঁশ রাখা উচিত ছিল। মেয়ে একদিন পরের বাড়ি যাবে জানতেন তো তাঁরা! আমাদের বাড়ি বলে তাই—ও আমার মেয়ের মতোই থাকে—বাড়িতে আলশোলও বিশেষ কেউ নেই—নইলে খোয়ার হ'ত এর জন্যে!'

মুখে 'পারব না' বললেও শেষ পর্যন্ত হরেনই গিয়ে মার কাছে কথাটা পাড়ল। তিনি সব শুনে মুখটা বিরস ক'রে বললেন, 'এসব আর আমাকে বলতে এসেছ কেন বাছা। তোমরাই এখন কর্তাগিন্নী এ বাড়ির, যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমি তো মনিষ্যির বার, আমি যখন কিছু পারব না—তখন বলবই বা কি বলো! ব্যবস্থা ক'রে পাঠাতে পার পাঠাও। সত্যিই তো, ছেলেমানুষ বাপের বাড়ি যেতে পায় না—বাপের শরীর খারাপ, পাঠানো উচিত। কিন্তু এদিকেই বা করে কে! আমার এক পোড়া শরীর—একটু আগুন-তাত সয় না, করতে গেলেও বিপুয্যেয়ে কাণ্ড হবে, সে ভুগতে হবে তোমাদেরই।......আর কে আসবে তাও তো জানি না। এক তো বছর বছর তোমার বোয়ের আঁতুড়-ঘরে ঢোকা আছে—সে সময় একে ওকে তাকে পায়ে ধরে আনতে হয়, তাতেই বিরক্ত হয় সবাই। আবার সুখসোমন্দা কি আসতে চাইবে কেউ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, 'আমার সর্বনাশ ক'রে দিয়ে গেছেন যে তোমাদের গুষ্টি। মোটা মাইনের চাকরি করতেন—ভেবেছিলেন চার কাল বাঁচবেন আর এমনি আদরে রাখতে পারবেন। একটু যদি কোনদিন শখ ক'রে তাঁর জন্যে কিছু রাঁধতে যেতুম তো মহামারী কাণ্ড বাধাতেন একেবারে। কী সমাচার, না তোমার শরীর খারাপ, উনুনশালে গেলে আধকপালে ধরে—তুমি এ বাহাদুরী করতে যাও কেন! তারপর ঠেলা সামলাবে কে, ম্যাও ধরতে গেলেই তো সেই আমাকেই ধরতে হবে।......আর কেনই বা—এত সাতগুষ্টি বসিয়ে খাওয়াচ্ছি, তারা পারে না? ......তা কথাটাও সত্যি, তখন তো তোর পিসী-খুড়ির দল কম ছিল না এ বাড়িতে। বসিয়ে খাওয়াতেন আবার জনা-জাত হাতখরচা ব্যবস্থা ছিল। কম কি উড়িয়েছেন ঐ ক'রে। ফল কি হ'ল—নিজে নবাবী করে চলে গেলেন, আমাকেই পথে বসিয়ে গেলেন। একপয়সা রেখে যেতে পারলেন না—অব্যেসটি খারাপ ক'রে দিয়ে গেলেন। এমন মুখ ক'রে দিয়ে গেছেন যে যা-তা কিছু গলা দিয়ে ওলে না!'...

দীর্ঘ বক্তৃতার পর তিনি চুপ ক'রে গেলেন একেবারেই। প্রশ্নটার কোন মীমাংসাই হ'ল না। হরেনও খানিকটা চুপ করে বসে থেকে থেকে উঠে এল। কাছা-কাছির মধ্যে আছে এক ওর খুড়তুতো বোন নন্দ—তা সে এই সেদিন আঁতুড় তুলে গেছে একমাস থেকে, আবার তাকে আনতে গেলে সে কি আসবে! তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই বা বলবে কি?

কথাটা চাপা পড়ে যায় একেবারেই। তুলতে যাওয়া বৃথা বলেই স্বর্ণও আর তোলে না। কথা তুললে ব্যবস্থাটা বাত্লে দিতে হবে ওকেই। সে ব্যবস্থা কিছু খুঁজেও পায় না। এঁরা রাঁধুনীর হাতে নাকি খেতে পারেন না। খাবেন কি—কোন্ রাঁধুনী এত নানান্-খানা তোয়াজের রান্না ক'রে খাওয়াবে সারাদিন ধরে? করলেও মাইনে হাঁকবে কত। সুশীলা ঠাকুরঝির মুখে শুনেছে যে সে চেষ্টা বার কতক ক'রে দেখেছেন, কোন বাম্নীই টেঁকে নি। এক উড়ে ঠাকুরও রেখেছিলেন, সে চুরি ক'রে ভুষ্টিনাশ ক'রে দিয়েছিল একেবারে—দুদিনে একমাসের উট্নো শেষ ক'রে দিয়েছিল। তাকে ছাড়াতে পথ পান নি এঁরা...

সুতরাং যাওয়া হ'ল না। একদিনের জন্যে যাওয়া যেত হয়ত কিন্তু তাতে লাভ নেই বলেই গেল না স্বর্ণলতা। শুধু শুধু মনখারাপ করতে যাওয়া। তার চেয়ে এই হাঁড়িবেড়ির মধ্যেই জীবনটা যখন কাটাতে হবে তখন এই নিয়ে ভুলে থাকাই ভাল।

তাই ভুলতেই চেষ্টা করে। থাকেও ভুলে—শুধু সকালের খাওয়া চুকে গেলে,

ছেলেমেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নির্জন দুপুরে—কিংবা রাত্রে সকলের খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে শাশুড়ির মর্জির জন্য অপেক্ষা করতে করতে অন্ধকারে বসে আর সামলাতে পারে না নিজেকে। আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে। দেবতার মতো বাপ তার, সর্বংসহ। কাউকে কিছু বলবে না, কোনদিন কোন অন্যায়ের কোন প্রতিবাদ করবে না—নিঃশব্দে মুখ বুজে সব সহ্য ক'রে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করবে! আর হয়ত দেখাই হবে না এ জন্মে—কে জানে! অত আদরের এক মেয়ে তাঁর—তবু সে কিছুই করতে পারল না, কাছে গিয়ে একটু সান্ত্বনা দেওয়া তাও হয়ে উঠল না!...

এক এক সময়ে আর থাকতে পারে না—প্রাণ ভরে গালাগাল দেয় শাশুড়ীকে, 'মর, মর! ওলাউঠা হোক তোর। ঐ নোলা চিরকালের জন্যে ঘুচে যাক!......গলা দিয়ে যা-তা নামে না! আ মর্—আমি যখন আঁতুড়ে থাকি মেয়েরা ভাইঝি দেওরঝিরা এসে যখন থাকে তখন কে অমন ষোড়শোপচারে ক'রে দেয় শুনি, সে তো তখন যা দেয় তাই সোনা-হেন মুখ ক'রে উঠে যায় গপাগপ্। আবার সে কি সুখ্যেত!

আসলে গতর নেই যে গতরখাগীর! তাই তখন যা পায় তাই ভাল বলতে হয়। যত টাঁইস আমার ওপর। আমারই নিকড়ে গতর পেয়েছে খুব। আঁতুড় ওঠার পর আর একদিনও তর্ সয় না, গঙ্গা চান করিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অমনি হেঁশেলে জুতে দেবে!... রক্ত শুষে খেয়ে নিলে আমার, ডাইনী কোথাকার!'

এক একদিন এই সময় ওর অরুণদার কথাও মনে পড়ে যায়। মনটা হু হু ক'রে ওঠে। মুখচোরা লাজুক মানুষ—কোথায় যে গেল, দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটছে কি না জুটছে। কী যে মতি হ'ল, কী করতে গেল অমন ক'রে। যদি থাকত তো আজ তিনটে না হোক আরও দুটো পাশ দিয়ে ভাল চাকরি পেয়ে যেতে পারত। এখানে না থাকলেও, স্বর্ণ বললে ছুটে এসে দেখত সে।

আহা, কোথায় আছে সে—ঠিকানাটাও যদি জানত!

॥ ২ ॥

তবে অরুণের খবর মধ্যে একজন পেয়েছিল। তার সঙ্গে একদিন দৈবাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল ঐন্দ্রিলার। কিন্তু সে এমন একটা সময় যে, সে কোথায় থাকে কি করে তা জিজ্ঞাসা করার কথা মনেও পড়ে নি ওর।

এর ভেতর বহু জায়গা ঘুরেছে ঐন্দ্রিলা। ভাল রাঁধতে পারে বলে যেমন তার কাজেরও অভাব হয় না, তেমনি টিক্‌তেও পারে না বেশীদিন কোথাও। প্রধান অন্তরায় তার রূপ; এত বয়সে এত দুঃখকষ্টেও তা এখনও বহ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল —পতঙ্গ মনকে দুর্বার আকর্ষণে টানে। দ্বিতীয় অন্তরায় তার প্রখর রসনা; বলা-মুখ আর চলা-পা নাকি কোনমতেই সংযত করা যায় না—এ প্রবাদ ঐন্দ্রিলার ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে অনেকটাই। চণ্ডাল রাগ তার, একবার মাথা গরম হ'লে আর কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, লঘুগুরু হিসেব থাকে না। অবশ্য মনিবেরা অনেক ক্ষেত্রে সহ্য করেন—বাধ্য হয়ে। লোক চাই বললেই সব সময় লোক মেলে না। কোন কোন বাড়িতে এমন অবস্থা যে, রান্নার লোক ছাড়া এক মিনিটও চলে না। হয়ত বিরাট সংসার, গৃহিনী অসুস্থ, তেমন কোন বয়স্কা মেয়েও নেই—কি বিধবা আত্মীয়স্বজন—সে সব ক্ষেত্রে অনেকটাই সইতে হয় মুখ বুজে। ঐন্দ্রিলার হাতের রান্না ভাল, কাজকর্ম পরিষ্কার, চেহারা দেখলে 'ছেন্দা' হয়—হাতে খেতে ইচ্ছে করে, বিশেষ

চুরি করে না—সেদিক দিয়ে বিবেচনা করার মতো গুণও আছে ঢের। তবু সহ্যেরও সীমা আছে, যারা পয়সা দেবে তারা আর কতটা সইতে পারে!...সুতরাং কোথাও তিন মাস কোথাও বা চার মাস, এর বেশী টিকতে পারে না ঐন্দ্রিলা। খুব বেশী হ'লে আট মাস। বছর পোরে নি কোথাও।

চাকরি ছাড়া আর নতুন ক'রে পাবার মধ্যের সময়গুলো বেশির ভাগ তাকে মার কাছে এসেই উঠতে হয়। কিন্তু এখন কনক নেই—যেন আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে ওখানের আশ্রয়। শ্যামা বরং আজকাল ধরে রাখতেই চান, কারণ তাঁরও আর কেউ নেই। তরু জড়ভরত জন্তুর মতো হয়ে গেছে, চুপ ক'রে বসে থাকে সর্বদা, খেতে দিলে খায় শুইয়ে দিলে শোয়—না দিলে সারা দিনরাতই বসে থাকে ঠায় এক জায়গায়। তার ছেলে বলাইটা হয়েছে শ্যামার এক বোঝা, পোড়া মেয়ে যদি নিজের ছেলেটার দিকেও তাকাত একবার। বুড়ো বয়সে তাঁর এ কী খোয়ার!...কান্তিটাও ফেল করার পর থেকে যেন কী রকম হয়ে গেছে। টো টো ক'রে ঘোরে চাকরির জন্যে—কিন্তু একে ম্যাট্রিক ফেল তায় বন্ধ কালা—তাকে চাকরি কে দেবে? গোবিন্দ মধ্যে ম্যাপের কাজ শেখাবার জন্য নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেও কিছুদিন পরে ওদের বাবু বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়ে দিলেন। কার এত সময় আছে কর্মচারীদের মধ্যে যে হাত-পা নেড়ে ইশারায় কাজ শেখাবে ওকে বসে বসে!

ওদিকেও কিছু হয় না, এদিকেও শ্যামার কাজে লাগে না। অবসর সময়ে বাগান-বাগিচার কাজে কিছু কিছু সাহায্য করে এই মাত্র—ফল-ফসল বিক্রীর কাজ বিশেষ ওকে দিয়ে হয় না। শ্যামা আজকাল নিজেই যান বাজারে—ফোড়েদের সঙ্গে দর-দস্তুর ক'রে হয় তাদের ডেকে নিয়ে আসেন, নয়তো, কান্তি থাকলে তাকে দিয়ে প্যাঠিয়ে দেন। কিন্তু সংসারের উনখুটি-চৌষট্টি কাজ করতে করতে বাগান দেখবারও সময় হয় না, অসুমর কাজ পড়ে থাকে, পাতার পাহাড় জমতে থাকে, কোন কাজটাই হয়ে ওঠে না। ঐন্দ্রিলা এলে আজকাল তাই তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তিনি যেন বেঁচে যান।

কিন্তু ঐন্দ্রিলা টিকতে পারে না। তার পিছটান আছে, নগদ টাকা চাই। মেয়েকে না পাঠালে চলবে না। তাছাড়া খাওয়ার মুখটাও বড় হয়ে গেছে। যারা রাঁধুনী রেখে চালায় তাদের অবস্থা ভাল, খাওয়া-দাওয়াও সেই অনুপাতে ভাল। ঐন্দ্রিলার হাতেই তা তৈরী হয়—সুতরাং নিজের নিরামিষ রান্না একটু তেল-ঘি বেশী দিয়ে ভাল ক'রেই করে। যেখানে বুড়ো বিধবা গিন্নী বা কর্তাদের মধ্যে কেউ নিরামিষ খাবার লোক থাকে সেখানে তো কথাই নেই—নিত্য-নতুন রান্না ক'রে তাদের তাক্ লাগিয়ে দেয়, নিজেরও সুবিধা হয়।...এখানে দিনদিনই যেন খাওয়ার কষ্ট বাড়ছে। ওর দাদা এখানে থাকতেও যে টাকা দিত এখনও সেই টাকাই দিচ্ছে, তবু ক্রমশ কৃপণতা বেড়েই চলেছে শ্যামার। এখন সব দিকেই হাত টান তাঁর। তেল মাসে আধ সের আসে কিনা সন্দেহ। আজকাল আর এত কম তেল-মশলায় রাঁধতে পারে না ঐন্দ্রিলা—সে অভ্যাসটাই চলে গেছে। তাছাড়া এখানে থাকলেই ভূতের খাটুনি, এও আর ভাল লাগে না। সে পালাই-পালাই করে। কোথাও একটা নতুন কাজের সন্ধান পেলেই সরে পড়ে।

না বলেও চলে যায় কখনও কখনও। সে সময়গুলোয় শ্যামা ক্ষেপে যান, আবার নতুন করে ছড়া বেঁধে উদ্দেশে গাল দেন মেয়েকে। বলেন, 'চেপে ধরলেই চিঁ-চিঁ করেন ছেড়ে দিলেই লাফ মারেন! যখন মাথার ওপর চাল থাকে না, পেটে ভাত জোটে না তখন মনে পড়ে মাকে, তারপর একটা কিছু হলেই মার মুখে লাথি মেরে

চলে যাবেন। কেন, একটা বেলাও কি আর থাকা যেত না, বলে-কয়ে গেলে কী হ'ত? আমি কি ওর ন্যাজ ধরে ঝুলে পড়তুম—না দাঁড় দিয়ে বেঁধে রাখতুম!... মুখে আগুন মেয়ের! অমন মেয়ের মুখে জ্যান্তে নুড়ো জেবলে দিতে হয়।...... ভাত দেবে না আকার ছাই দেবে। আসুক না এবার, ঐ সদর থেকে না যদি দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিই তো কী বলছি! বলে, যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলুম আমি, এখন তোমার সব হয়েছে পর হয়েছি আমি। কাজের সময় কাজী কাজ ফুরুলেই পাজী।......মা ছাড়া তো গতি নেই, ঘুরে-ফিরেই তো আসতে হয় এখানে—এলতলা বেলতলা সেই বুড়ির পাছতলা! তা তার দিকেও তো চাইতে হয় এক-আধবার! জুতো পায়ে থাকে—তবু সে জুতোরও যত্ন করে লোকে। মা-টা মুখের রক্ত তুলে মরে যাচ্ছে তা একবার ভাবে না। যেমন দিন কিনে নেওয়া হয়ে গেল অমনি মার মুখে লাথি। ঝ্যাঁটা মারো এমন সব সন্তানের মুখে। কী ঝাড়ে জন্ম সব, ঝাড় দেখতে হবে তো! উচিত ছিল আঁতুড়ে নুন দিয়ে মেরে ফেলা। হাত্তোর ভাল হোক রে!'

বলেন—কিন্তু আবার যখন আসে—দূর দূর ক'রে তাড়াতেও পারে না। ওরই দুঃসময়ে শুধু নয়—তাঁরও বড় দুঃসময়ে আসে যে!

এমনি ক'রে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় খড়্গপুরে রেলের এক অফিসারের বাড়ি কাজ মিলেছিল। সে ভদ্রলোকের স্ত্রী রুগ্ন, কঠিন রোগে শয্যাশায়ী, হয়ত কোনদিন আর ভাল হবে না। তার ওপর পাঁচ-ছটি ছেলে-মেয়ে, নেহাৎই ছোট ছোট, বড়টিরই বয়স আট নয় হবে। খুবই বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল ঐন্দ্রিলা, ও'র ভগ্নী-পতি ঐন্দ্রিলাকে জানতেন, তাঁর কোন্ আত্মীয়ের বাড়ি দেখেছেন ওকে, খোঁজ-খবর ক'রে আনিয়ে দিয়েছিলেন। ঐন্দ্রিলারও সে সময় চরম দুরবস্থা। দু মাস মেয়েকে টাকা পাঠাতে পারে নি। সে এক নজরে অবস্থাটা দেখে নিয়ে নিজে থেকেই প্রস্তাব করল যে—রান্না ছাড়াও ছেলে-মেয়েদের নাওয়ানো-খাওয়ানো, স্ত্রীর পরিচর্যা সব করবে সে—মাইনে বেশী চাই এবং এক মাসের মাইনে আগাম চাই। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেন একেবারে। তিনি নিজে থেকেই ত্রিশ টাকা মাইনে বললেন; তা ছাড়া একাদশীতে চার আনা ক'রে নগদা পয়সা। পান-সুপুরী যা চায় সব পাবে। বছরে চারখানা কাপড়। ত্রিশ টাকা তখনই বার করে দিলেন। তাও—নোংরা কাজ কিছু করতে হবে না—সেটা এক জমাদারের বৌয়ের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে, সে সকালে দুপুরে সন্ধ্যেয় তিনবার ক'রে আসে—সন্ধ্যার সময় এসে থাকেও অনেকক্ষণ। তবে ঐ বাঁধা সময় ছাড়াও যদি কখনও এক-আধবার দরকার হয়, তখন হয়ত করতেই হবে। ভদ্রলোক নিজে বাড়ি থাকতে থাকতে সে রকম দরকার হ'লে তিনিই ক'রে নেবেন—তাও জানিয়ে দিলেন।

ঐন্দ্রিলার ভাল লেগেছিল জায়গাটা। মেয়েটি বড় শান্ত, এমনভাবে সবাইকে বিব্রত করার জন্যে যেন নিজেকে সকলের কাছে অপরাধী মনে করত সর্বদা, চোরের মতোই থাকত। ছেলে-মেয়েগুলো খুব দুর্দান্ত নয়—সহজেই সামলানো যেত। কিছুদিন যাবার পর ঐন্দ্রিলার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়াতেও খুব ক্ষতি হয় নি—ভদ্রলোক, ছেলেমেয়েদের যত্ন হচ্ছে এবং নিজেও সময়ে ভাত-জল পাচ্ছেন দেখে ওর মেজাজ হাসিমুখেই সহ্য করতেন। বৌকে বলতেন, 'ওসব তুমি গায়ে মেখো না। গিন্নীবান্নীর মতো বাড়িতে আছেন, একটু আধটু বকাঝকা করবেন বইকি। তোমার ননদ ছিল না, মনে করো যে বড় বিধবা ননদ এসে আছেন একজন। সংসারটার চার চালের ভার তুলে নিয়েছেন সেটা তো কম কথা নয়! যে গরু দুধ দেয় তার চাট

সহ্য করতেই হবে—উপায় কি বলো!'

কিন্তু তিন মাস না কাটতেই হঠাৎ একদিন খবর এল সীতা বিধবা হয়েছে। সীতার বড় সতীন-পো চিঠি দিয়েছে জামাই মরবারও তিন-চার দিন পরে। চিঠি পৌঁছতেও দু-দিন চলে গেছে—অর্থাৎ আর দিন তিনেক পরেই কাজ।

এ খবরের পর আর ঐন্দ্রিলার জ্ঞান থাকবার কথা নয়। রইলও না। বিচার-বিবেচনা মুহূর্তে তলিয়ে গেল। চিঠি যখন পৌঁছল তখন বেলা দশটা। ঐন্দ্রিলা বললে, 'আমি এখ্খুনি যাব সেখানে। ইস্টিশানে যাই—প্রথম যে গাড়ি পাব তাতেই চলে যাব।'

সেদিনই ভদ্রলোকের বড় সাহেব আসবেন, তাঁর সঙ্গে লাইনে বেরোবার কথা—কোনমতেই কামাই করা চলবে না। এদিকে শয্যাশায়ী স্ত্রী ও অসহায় কটা শিশু। তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন একেবারে। মিনতি করে বললেন, 'আপনি এ বেলাটা অন্তত থাকুন, দেখছেনই তো এই আতান্তর—কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই। আমি আজকের দিনটা সামলে নিই—কাল পরশু কামাই করলে অতটা ক্ষতি হবে না। না হয় সিক-রিপোর্ট ক'রে তিন-চার দিনই ছুটি নেব। এখন আপনাকে ছাড়ি কি ক'রে? আর যা হবার তা তো হয়েই গেছে—আপনার পক্ষে আজ যাওয়াও যা কাল যাওয়াও তা। কাল ভোরের ট্রেনেই যাবেন বরং আমি নিজে গিয়ে তুলে দিয়ে আসব। কিম্বা আজ রাত্রের কোন প্যাসেঞ্জার ধরবেন, ভোরে হাওড়া পৌঁছে যাবেন, বেলা নটা-দশটার মধ্যে মেয়ের বাড়ি পৌঁছতে পারবেন।'

কিন্তু সে সব কোন কথাই শুনল না ঐন্দ্রিলা, তার তখন পাগলের মতো অবস্থা। কাঁদতে কাঁদতে তখনই বেরিয়ে গেল—ছেলে-মেয়েগুলোর, অসুস্থ বৌটার পর্যন্ত খাওয়া হয় নি তখনও। দুশ্চিন্তায় ভদ্রলোকের চোখে জল এসে পড়েছিল—শেষে বৌটিই বুদ্ধি দিলে, পাশের কোয়ার্টারের মাদ্রাজী অফিসারটির স্ত্রীকে সব জানিয়ে মিনতি করতে তিনি তখনই এ বাড়িতে চলে এলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে ভদ্রলোক না ফেরা পর্যন্ত তিনি এখানেই থাকবেন। রাত্রের ডাল-ভাত তাঁর বাড়িতেই হবে—ভদ্রলোক যেন কিছু না ভাবেন—। একটা লোকও তিনি তিন-চার দিনের মধ্যে যোগাড় করে দিতে পারবেন—এমন আশ্বাসও দিলেন।

ওখানে শ্রাদ্ধ-শান্তির পর ঐন্দ্রিলা মেয়েকে ও নাতিকে নিয়ে যাবে, মনে মনে ঠিক ক'রেই রেখেছিল। সেইটেই সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা বলে মনে হয়েছিল ওর। এমন কি সীতার পক্ষে অন্য কিছু ভাবা যে সম্ভব তা-ই মাথায় আসে নি ওর।

সেইভাবেই সে কথাটা তুলেছিল। একেবারে এখানকার পাট উঠিয়ে চলে যাবার কথা।

কিন্তু সীতা রাজী হ'ল না। সে এখনও, বাইরের আচরণে, তেমনি শান্ত ও ভালমানুষ আছে, কিন্তু তার ভেতরের কাদার তালটা যে শুকিয়ে কঠিন হয়ে উঠেছে, তাকে দিয়ে আর যে কেউ যা-খুশী করাতে পারবে না—সে খবরটা ঐন্দ্রিলা জানত না। ঐন্দ্রিলা কেন অনেকেই সে সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। সীতার বয়স আজও খুবই কম—তার যে কোন পুত্রবধূর থেকেই বয়সে ছোট সে—কিন্তু গত কবছরের চরম দুঃখ ও মর্মান্তিক আঘাত তাকে ভেতরে ভেতরে বেশ খানিকটা বয়স্ক করে দিয়েছে। ও বয়সের অন্য মেয়ের থেকে ঢের বেশী পরিণতবুদ্ধি হয়ে উঠেছে সে। যে সব প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্য দিয়ে তার জীবন কেটেছে—তাতে এক এক বছরে বহু বছরের অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। এখন সে অনেক কিছুই তলিয়ে

ভাবতে শিখেছে। আর একটা ধারণা তার মনে দৃঢ়মূল হয়েছে যে তার জীবনের ভার তাকেই বইতে হবে—অন্য কারও ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না।

সে মার প্রস্তাবের উত্তরে একান্ত অনুত্তেজিত ও নির্বিকার কণ্ঠে শুধু প্রশ্ন করল, 'তারপর?'

ঐন্দ্রিলা বুঝতে পারল না, থতমত খেয়ে গেল কেমন। সেও ভ্রূ কুঁচকে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তারপর কি আবার?'

'মানে তোমার সঙ্গে যাব কোথায়? তোমার মনিব-বাড়ি?'

'না না, সেখানে যাবি কি? তা নয়—। কেন, তোর বাপের বাড়ী? কাকাদের কাছে যাবি। এখন তো জোর করে যাবি। তারাই তো জেনে-শুনে এই সর্বনাশ করলে তোর—এখন এ দায় অপরে কেন বইবে। তাদেরই ঘাড়ে গিয়ে চাপগে যা, যেমনকে তেমনি!'

'হ্যাঁ, এই গুড়োটুকু—আমার জীবনের শেষ ভরসা, তারপর তাকেও নিকেশ করুক। ওরা সব পারে। যারা এ কাজ করেছে তাদের অসাধ্য কি আছে বলো। ...না, আর তাদের মুখ দেখতে পারব না আমি, হয়ত হিতাহিত জ্ঞান থাকবে না, কী করতে কি করে বসব। আমি জেনে রেখেছি যে আমার কেউ কোথাও নেই, সে-ই ভাল। তা ছাড়া তারা তো সব ভেন্ন হয়ে গেছে; কার ঘাড়ে গিয়ে চাপব, কেই বা ঘাড়ে করবে। তারা কি অত সহজে ঘাড় পাতবার লোক?'

একটু চুপ করে রইল ঐন্দ্রিলা। নিয়ে যেতে হবে এই কথাটাই মনে বড় হয়ে ছিল, কোথায় নিয়ে যেতে হবে তা বোধ হয় ভাল করে ভাবে নি।...খানিকটা পরে বললে, 'তাহলে দিদিমার কাছেই চল্, তারও লোকের দরকার। এ বয়সে দুটো ভাত রেঁধে দেয় এমন লোক নেই, সে ফেলবে না।'

'না মা, সে আমি যাব না।' সীতা তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলে, 'সেখানেও গতর খাটিয়ে ঝি-গিরি করতে হবে—হয়ত এখানেও তাই। তবু এ আমার স্বামী-শ্বশুরের ভিটে. খানিকটা জোর আছেই, এখানে ঝিগিরি করাও সম্মানের। তা ছাড়া যদি বনিয়ে মন যুগিয়ে চলতে পারি—শেষ পর্যন্ত হয়ত ছেলেটাকে দেখবে ওরা। হাজার হোক—ওদেরই ভাই, ওদেরই কাকা। দিদিমার ওখানে গেলে দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটবে হয়ত—তার বেশী কিছু না। ছেলে মানুষ হবে না। দিদিমা যে পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শেখাবে তা মনে হয় না। অথচ একবার বেরোলে আর এ বাড়ি ঢুকতে পারবো না, চিরদিনের মতো এ আশ্রয়টাও যাবে।'

'তা বলে এখানে এই বাঁদীর বাঁদী হয়ে থাকবি?'

'তাই তো ছিলুম মা এতকাল। এই গত ক বছরই তো তাই আছি। যে কপাল নিয়ে জন্মেছি সে কপাল আম্যর সঙ্গেই যাবে, যেখানেই যাই না কেন। গেল জন্মে সারাজীবন ধরেই বোধহয় পাপ করে গেছি, তাই এ জন্মে মায়ের পেট থেকে পড়া ইস্তক শুরু হয়েছে তার শাস্তিভোগ। সে পাপের দেনা শোধ হয়ে যাওয়াই ভাল—আর পরের জন্মের জন্যে না কিছু তোলা থাকে।'

ঐন্দ্রিলা একটু অবাক হয়ে তাকায় মেয়ের মুখের দিকে। গত ক বছরে অনেক-বারই আসা-যাওয়া করেছে, কিন্তু কোথা দিয়ে কেমন করে তার এতটা পরিবর্তন হয়েছে তা কৈ লক্ষ্য করে নি তো! আশ্চর্য, এ কোন্ সীতা! এ আবার কবে জন্মাল!...দারুণ একটা বিস্ময় বোধ হতে লাগল ঐন্দ্রিলার।

সীতার মুখে কোন রকমের উত্তেজনার ভাব নেই। খুব একটা দুঃখেরও না। বৈধব্যের যে করুণ অসহায় ভাব থাকে সদ্যোবিধবাদের মুখে—সেটাও নেই। তার

কারণ বৈধব্যটা আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নয়, গত দু বছর ধরেই জামাই শয্যাগত ছিলেন। প্রতিদিনই বলতে গেলে মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। ঐন্দ্রিলাও তা জানত, তাই সংবাদটার অভাবনীয়তায় কোন আঘাত সে পায় নি—কিন্তু দুঃখ তো হবেই। সীতার মুখে সেটুকুও যেন নেই।

কোনদিনই ছিল না অবশ্য। ভীতু ভীতু—বোবা রকমের শান্ত নম্রতা নিয়েই যেন জন্মেছে সে। তবু—। এ যেন অন্য এক রকমের অবিচল স্থৈর্য, এর সঙ্গে ঐন্দ্রিলার আগে যেন কোন পরিচয় ছিল না। আরও একটু লক্ষ্য করে দেখল অপরিচয়ের অন্য কারণও আছে। সেই ভীতু অসহায় ভাবটাও কবে যেন সীতার মুখ থেকে অন্তর্হিত হয়েছে, তার ভাবলেশহীন মুখে কোথায় যেন একটা দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে সে জায়গায়, কোন বিশেষ রেখা বা ভঙ্গীতে তা ধরা যায় না—কিন্তু অনুভব করা যায়।

মেয়ের এই নতুন চেহারার সামনে ঐন্দ্রিলা কেমন একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। খানিকটা পরে, একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই যেন বলে, 'জামালপুরে যাবি? বৌদির কাছে?'

'আমি কোথাও যাব না মা। এইখানেই পড়ে থাকব। পৃথিবীতে এই একটি জায়গাতেই তবু আমার একটু অধিকার আছে, আইনত না হোক ন্যায়ত ধর্মত। অন্য যে জায়গাতেই যাব—সেখান আমায় ভিখারী হয়ে যেতে হবে। আর তাতে দরকার নেই। বলে, এখানেও ঘাস-জল সেখানেও ঘাস-জল। আমার অদৃষ্টে ঘাস-জলের বেশী জুটবে না তা জানি—মিছিমিছি এখান ছাড়ি কেন! এদের তবু এতদিনে ভাগ দেবার ভয়টা ঘুচেছে, বুঝেছে, আমি কোনদিনই ওদের সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা করব না—সংসারে আছি খাটছি-খুটছি—ওদের সুবিধেই হচ্ছে। এখন অনেকটা ভাল ব্যবহার করে। এ-ই আমার ভাল। যদি কোনদিন তাড়িয়ে দেয়, তখন অন্য জায়গায় যাব। যেখানেই যাই গতর খাটিয়ে খেতে হবে—অমনি বসিয়ে কেউ খাওয়াবে? না কেউ লেখাপড়া শেখাবে পয়সা খরচ করে? একটা পাস দিতে পারলে আমিও চাকরি করে খেতে পারি, আজকাল শহরে অনেক মেয়েই করছে শুনছি। কিন্তু সে তো পাঁচ-ছ বছরের ফের—এতদিন টানবে কে?'

'তা তুই না হয় দাদার কাছে যা। আমি যা পারি পাঠাব—তাতে তোর পড়ার খরচ হবে না?'

'না, না, সে বাংলাদেশ নয়, কোথায় ইস্কুল কোথায় মাস্টার—সেখানে হবে না। তোমারও চাকরির ঠিক নেই। এমনিই—ছেলেটাকে যদি লেখাপড়া শেখাতে হয় সেও খরচ আছে। তুমি আর কত টানবে! তুমি ফিরে যাও, তাঁদের আতান্তরে ফেলে চলে এসেছ শুনছি। কালই বরং চলে যাও!'

অগত্যা ঐন্দ্রিলাকে একাই ফিরে আসতে হ'ল। কিন্তু খড়্গপুরে পৌঁছে দেখল যে তাঁরা সে কোয়ার্টারে কেউ নেই। শুনল যে ভদ্রলোক এখানে কোনমতে লোক ঠিক করতে না পেরে একেবারে মাস-দুয়েকের টানা ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছেন, সম্ভবত সেখানেই কোন একটা বন্দোবস্ত করে ওদের রেখে আসবেন। উনি একা থাকলে ও'র ট্রলির ঠেলাওলারাই কেউ রেঁধে দিতে পারে—কিম্বা কোন মেসেও খেতে পারেন। সেই রকমই একটা কিছু করে নেবেন।

এইবার ঐন্দ্রিলার চোখে অন্ধকার দেখার পালা।

টাকা এঁদের কাছে কিছু পাওনা ছিল না, বরাবরই আগাম আগাম নিচ্ছিল ঐন্দ্রিলা। বিশেষ কিছু হাতেও ছিল না, যা ছিল যাবার সময়ে গাড়ীভাড়াতেই চলে

গেছে। আসবার গাড়ীভাড়া সীতার বড় সতীনপোর কাছ থেকে ধার করে এসেছে, এখানে এসেই পাঠিয়ে দেবার কথা। ওর মনে মনে বল ছিল যে যদিও এ'রা নতুন লোক রেখে থাকেন, সে লোক ঐন্দ্রিলার মতো কিছুতেই আপন ক'রে টেনে কাজ করবে না—ও ফিরে এসে নিজের কাজ পাবেই। নিতান্ত না পায়—এ'দের বাসায় থেকে এখানেই কোথাও কাজ জুটিয়ে নিতে পারবে। ভদ্রলোকই বলে দিতে পারবেন কোথাও না কোথাও। ঠিক এ অবস্থা হবে তা একবারও ভাবে নি।

সেই অস্নাত অভুক্ত অবস্থাতেই কাছাকাছি কটা কোয়ার্টারে ঘুরল ঐন্দ্রিলা—কাজের চেষ্টায়। আশ-পাশে বেশী মাইনের লোক যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই মাদ্রাজী—তেলেঙ্গী। ও তাঁদের কথাও বোঝে না, তাঁরা যদি-বা বোঝেন—বাঙালী রাঁধুনী নিয়েঁ তাঁরা কি করবেন? তাঁদের লোক বিশেষ দরকারও হয় না। বাঙালীরা অনেকেই অফিসের বেয়ারা কুলী দিয়ে কাজ সারেন, তাদের শুধু খোরাকী দিলেই চলে। দু-একজনের বাড়ি ঠাকুর থাকে—সে সব বেশীর ভাগ জায়গাতেই পুরনো লোক আছে. তাদের তাড়িয়ে রাখার কথাই ওঠে না। এক জায়গায় দরকার ছিল, তা সেখানকার গৃহিণী স্পষ্টই বললেন, 'তুমি মিছিমিছি এখানে ঘুরছ গো বাছা বামুন-মেয়ে, অজানা অচেনা মানুষকে তো হুট করে কেউ কাজ দেবে না, আর যারা চেনে তারা তোমাকে রাখবে কোন্ ভরসায় বলো? তুমি যে অবস্থায় বোসবাবুদের ফেলে চলে গিয়েছিলে—সে কথা কি কারুর শুনতে বাকী আছে? জেনে শুনে তোমার মতো নির্মায়িক লোককে কেউ রাখবে না!......ঐ কি একটা মানুষের মতো কাজ হয়েছিল! মানুষের চামড়া গায়ে থাকলে কেউ পারে!'

অপমানে মুখ রাঙা হয়ে উঠলেও বিনীত করুণভাবে বলবার চেষ্টা করে ঐন্দ্রিলা, 'কিন্তু কী অবস্থায় গেছি তাও তো শুনেছেন দিদি, আপনার মেয়ের যদি ঐ খবর আসত—'

'ষাট ষাট! আমার মেয়ের ও খবর আসবেই বা কেন! কী এমন মহাপাপ করেছি আমি!......ই কী কথার ছিরি তোমার বাছা! ও খবর আমার শত্তুরের আসুক। আর যারা তিন পুরুষের রাঁড়ী তাদের আসুক।......তবে অবস্থা যাই হোক বাছা, যারা মনিব যাদের অন্ন খাচ্ছ, তাদের অবস্থাটাও ভাবতে হয় একটু, ভাবা দরকার। এ তো মরণাপন্ন অবস্থার খবর নয় যে ছুটে গেলে শেষ দেখাটা হবে বলে, ছুটে গেছ—হুস্বিদিঘ্‌ঘি জ্ঞান ছিল না! মরেই গেছে—তাও চার-পাঁচ দিন আগে—তুমি ত্যাখন গিয়ে কী কাজে লাগবে বাছা—ক ঘণ্টা আগুপিছুতে এমন কি এসে যেত? জামাইকে কি তুমি ফিরে পেলে অমন রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে.....না বাছা, কাজটা তুমি খুবই গর্হিত করেছ। ভদ্দরলোক বামুনের ঘরের মেয়ের মতো কাজ করো নি। মরণাপন্ন খবর পেলেও মানুষ ও অবস্থায় যেতে পারে না। একটা লোক হাত-পা নাড়তে পারে না, মুখে জল না ঢেলে দিলে গলা শুকিয়ে মরে পড়ে থাকবে—বাচ্ছাগুলো টা-টা করছে তাদের কে দেখে ঠিক নেই. হয়ত কোনটা রাস্তায় বেরিয়ে গাড়ি চাপাই পড়বে—সব জেনেশুনে তুমি আর আট-দশটা ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারলে না? পরের দিনে প'ওছালে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত শুনি? ......না বাছা, তুমি এখান থেকে সরে পড়ো—এ খড়্গপুরে আর তোমার ঠাঁই হবে না!'

সরে পড়া ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না হয়ত, কারণ তখনই অপরাহ্ন গড়িয়ে পড়েছে, সন্ধ্যার আর বিশেষ দেরি নেই। অন্ধকারে এখানে ঘুরে বেড়ানো নিরাপদ নয় তা সে অনেকের কাছেই শুনেছে। শরীরও বইছে না। কোন্ সকালে সেখান থেকে বেরিয়েছে একটু শরবত খেয়ে—মুখে এখনও জল পড়ে নি। পা

ভেঙেগ আসছে শ্রান্তিতে।

পা-পা ক'রে সে স্টেশনে এসেই বসে ছিল। মার কাছে যাওয়া ছাড়া কোন গতি- নেই। একবার ভাবলে বৌদির কাছেই চলে যাবে—কিছুদিন সেখানে থেকে মনটা দেহটা সারিয়ে আসবে। কিন্তু গাড়ী-ভাড়ার পয়সা কই! আঁচলে সাতটি মাত্র পয়সা বাঁধা আছে, মার কাছেই যাবার ভাড়া হবে না তাতে। বিনা টিকিটে যেতে হবে, ধরা পড়লে ফৈজৎ—হয়ত পুলিশেই দেবে। আজকাল এধারে খুব চেকার হয়েছে। ধরলে যা তা বলে, মেয়েছেলে বলে রেয়াৎ করে না—তা ও নিজের চোখেই দেখেছে।

থার্ড ক্লাস টিকিটঘরের সামনে মেঝেতে পুঁটুলিটা পেতে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে—এমন সময় কে একটি অল্পবয়সী ছেলে সামনে থমকে দাঁড়াল, ঈষৎ দ্বিধা- গ্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'এ কী—খেঁদী-মাসীমা?'

সাগ্রহে মুখ তুলে তাকাল ঐন্দ্রিলা। তার তখন সেই প্রবাদবাক্যের মজ্জমান ব্যক্তির অবস্থা—একটা তৃণও তার কাছে অবলম্বন। এই নির্বান্ধব অপরিচিতদের রাজ্যে বিপদের সময় একটা পরিচিত মানুষের কণ্ঠস্বর শুনলেও অনেকটা ভরসা হয়। কিন্তু বার বার চোখ মুছে ভাল করে তাকিয়ে দেখেও ছেলেটিকে চিনতে পারল না সে। একটু চেনা চেনা বোধ হচ্ছে—অথচ ঠিক ধরতে পারছে না।

আশ্বাসের আলো ম্লান হয়ে আসে কিছুটা—তবু এ-ও মনে হয়, সে না চিনতে পারুক, এ তো চিনেছে। চেনা কেউ নিশ্চয়ই। সে সোৎসুক কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ বাবা, কিন্তু তুমি—মানে তোমাকে তো ঠিক—'

'চিনতে পারছেন না—না? আমি অরুণ, আপনার দিদির বাড়ি থাকতুম। মেজ- বৌয়ের বোনপো। মনে পড়ছে এবার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়ছে বৈকি! কী আশ্চর্য!···...তা তুমি যে পেল্লায় বড় হয়ে পড়েছ বাবা, চিনব কি করে?'

'কিন্তু আপনি এখানে একা—এমনভাবে বসে কান্নাকাটি করছেন—কী হয়েছে বলুন তো?'

ঐন্দ্রিলা উঠে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে সব কথা বলে। শুনতে শুনতে অরুণের চোখ আসে ছলছলিয়ে। নিজের দুর্দিনের কথা, অসহায় অবস্থার কথা আজও ভোলে নি সে। নিজেকে দিয়েই তাই পৃথিবীর তাবৎ দুঃখীর অবস্থা বুঝতে পেরেছে। খেঁদী-মাসীমারই বা কী জীবন। আশা বলতে আশ্রয় বলতে অবলম্বন বলতে ঐ তো একটি মাত্র মেয়ে। তারও কী সর্বনাশা বিয়ে হল—কী ভয়াবহ বিয়ে। তবু সধবা আছে এখনও, এই আশ্বাসটুকু ছিল এতদিন—সেটুকুও ঘুচল। ঐ মেয়েকে বুকে করেই নিজের বৈধব্য একদিন ভুলেছিলেন—সেই মেয়ের বৈধব্য না জানি কী নিদারুণই বেজেছে।...অরুণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রাণপণে চোখের জল সামলা- বার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু সেটাকে ভুল বুঝল ঐন্দ্রিলা। নিস্পৃহতা বা ঔদাসীন্য মনে করল। হয়ত বা বিরক্তিও। সে ওর হাত দুটো চেপে ধরে বলল, 'দোহাই বাবা, নিদেন আমাকে একটা টিকিট কেটে দাও, মার কাছে চলে যাই, নইলে সত্যি-সত্যিই ভিক্ষে করতে হবে শেষ পর্যন্ত হাত পেতে!'

হঠাৎ যেন অরুণের মনে হ'ল তার কানের কাছে বুঁচি ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কি! মেজমাসীর একটা যাহোক ব্যবস্থা করে দাও না। কী মানুষ তুমি! চিরকাল কি তোমার সমান গেল গা!'

যেন চমকে উঠল অরুণ। তাড়াতাড়ি ঐন্দ্রিলার অলক্ষ্যে চোখটা মুছে নিয়ে বলল, 'এক জায়গায় কাজ করবেন মাসীমা—আমি এইমাত্র সেখান থেকে আসছি, কাজ খালি আছে, লোকেরও খুব দরকার!'

'কোথায় বাবা? ক'রে দাও না—তাহ'লে তো আমি বেঁচে যাই!......তাহলে আর মায়ের কাছে যাই না। দোহাই বাবা, তোমায় ব্যাগত্তা করি—সেখানেই পাঠিয়ে দাও আমায়!'

'কিন্তু একটা কথা। ভদ্রলোক একা থাকেন সেখানে। তাঁর স্ত্রী নেই—ছেলে-বৌ বোম্বেতে, মেয়েরা কেউ কলকাতা—কেউ দিল্লীতে। উনি সরকারী ডাক্তার ছিলেন, পেন্‌সন নিয়ে ওখানে গিয়ে আছেন—ও জায়গাটায় কোন ডাক্তার নেই, লোকের সেবা করবেন বলে। খুবই ভদ্রলোক, কারও কাছ থেকে—স্বেচ্ছায় না দিলে—এক পয়সাও নেন না, বরং বহু লোককে ওষুধপত্র পর্যন্ত বিনা পয়সায় দেন। পেনসনের টাকা থেকে অর্ধেকেরও বেশী স্বদেশী কাজে খরচ করেন লুকিয়ে লুকিয়ে।... অদ্ভুত মানুষ—দেবতার মতো। তবে একাই থাকেন, কোন মেয়েছেলে নেই বাড়িতে। খেটেখুটে এসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হয়—অর্ধেক দিন খাওয়াই হয় না। আজই বলছিলেন আমাকে—লোকের কথা। খুব ভাল মানুষ নির্ঝঞ্ঝাট লোক!'

'একা থাকেন? একেবারে একা!' হতাশায় যেন গলা ভেঙ্গে আসে ঐন্দ্রিলার।

'কিন্তু ও'র বয়স হয়েছে মাসীমা। ষাট বছর বয়স অন্তত। দু-তিন বছর আগে পেনসন হয়েছে।'

'তবে আবার কি! যেন গাঢ় অন্ধকারে হঠাৎ আলো দেখতে পায় ঐন্দ্রিলা, 'তাহলে আর কে কী বলবে! বুড়োমানুষ—বাবার মতো। তুমি সেখানেই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো বাবা।'

'দাঁড়ান। এখুনি গাড়ি আসবে, আমি টিকিট কেটে দিচ্ছি—গিয়ে কোলাঘাটে নামবেন। সেখান থেকে স্টীমারে যেতে হয়, আমি কোলাঘাটের স্টেশনমাস্টারকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, তাঁর বাড়ীতেই রাত্রে থাকবেন—খুব ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ—আমার বিশেষ পরিচিতও—উনি যত্ন ক'রে রাখবেন, কাল ভোরে উনিই লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন সেখানে। তাহলেই হবে তো?'

'খুব হবে বাবা। এ তো আমার আশার অতিরিক্ত! বেঁচে থাকো বাবা, রাজ-রাজেশ্বর হও। একশ বছর পেরমাই হোক। ভগবান তোমার ভাল করুন—কী বলব বাবা, দুঃখিনী অবীরের জীবন রাখলে আজ!'

অজস্র আশীর্বাদ করতে থাকে ঐন্দ্রিলা।

॥ ৩॥

অনেক কাণ্ড করে আসতে হ'ল বলে প্রথমটা একটু দমেই গিয়েছিল ঐন্দ্রিলা। ট্রেন, স্টীমার, নৌকো—শেষে মাইল-খানেক আবার গরুর গাড়ি—যানবাহনের কিছুই বাকী রইল না। নিতান্ত নিরুপায় বলেই শেষ পর্যন্ত এসেছিল বোধ হয়—নইলে অনেক আগেই ফিরে যেত।

কিন্তু এখানে পৌঁছে ভালই লাগল তার। গ্রামে বেশীর ভাগ মাটির বাড়ি, মাটির দোতলাও আছে ঢের—তবে ডাক্তারের বাড়িটা ছোট হলেও পাকা। একটু গ্রামের শেষ দিকেও বটে। বেশ ফাঁকা—বাগানও আছে ছোটখাটো। বাড়িটায় দুটো বড় ঘর, একটা ছোট। একটাতে ডাক্তার নিজে থাকেন, আর একটাতে ডাক্তারখানা। ছোট

ঘরটাই ঐন্দ্রিলার জন্য নির্দিষ্ট হ'ল। একটা তক্তাপোশ পাতাই ছিল, ডাক্তারবাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঘর ধুইয়ে মুছিয়ে সাফ্ করিয়ে একটা পরিষ্কার বিছানা বিছিয়ে দেওয়ালেন। ঝি আছে একজন, কাজ ক'রে দিয়েই চলে যাবার কথা তার—কিন্তু সে কাছেই থাকে। দিনের মধ্যে দশবার আসতেও তার আপত্তি নেই। তাছাড়াও, ঐন্দ্রিলা দু-একদিন থেকেই বুঝে নিল, গ্রামের বহু লোকই ডাক্তারবাবুর কোন কাজ করে দিতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। অর্থাৎ সে রাজার হালেই থাকবে, রান্নার কাজ ছাড়া তাকে কুটোটি ভেঙ্গে দুখানা করতে হবে না।

রান্না-ভাঁড়ার ঘর পাকা নয়—মাটির, তবে বেশ বড় বড়। তাতে ঐন্দ্রিলার কিছু অসুবিধা নেই, সে কাঁচা রান্নাঘরই পছন্দ করে, জন্মাবধিই বলতে গেলে তাতে অভ্যস্ত—মধ্যে কটা বছর দিদিমার ওখানে ছাড়া। মাটির ঘর একবার গোবর-ন্যাতা বুলিয়ে নিলেই তকতক করে—পাকা ঘরে অনেক হ্যাঙ্গামা। মাটির ঘরে নিচু উনুন করা যায়, সেও একটা সুবিধা।

সবচেয়ে যেটা এখানে এসে ভাল লাগল তার, সেটা হ'ল অবাধ স্বাধীনতা। ডাক্তারের নাম অমরবাবু, তাদের সজাতি, ব্রাহ্মণ। ভদ্রলোক একেবারেই নির্ঝঞ্ঝাট নির্বিরোধ মানুষ, কোন সাতে-পাঁচে থাকেন না—থাকতে চান না। ডাক্তারী—ডাক্তারীও নয় সেবা—কারণ ঐন্দ্রিলা দেখল এতে যা আয় হয় তার থেকে ঢের বেশী ব্যয় হয় ডাক্তারের—এই নিয়েই থাকতে চান তিনি, তার বাইরের কোন কিছু বোঝেন না। ঘরে কি হচ্ছে তার থেকে গ্রামে বা গ্রামান্তরে কোন চাষী কি গোয়ালার ঘরে কি হচ্ছে তাই নিয়ে বেশী চিন্তা আঁর। তাঁদের খবরই বেশী দরকারী বলে মনে করেন।

ঐন্দ্রিলা এসে কাপড়-চোপড় কেচে একটু সুস্থ হতেই অমরবাবু একেবারে কুড়িটা টাকা তার সামনে নামিয়ে রেখে বললেন, 'ঘরে কি কি আছে জানি না, দেখে-শুনে নাও। বোধ হচ্ছে বিশেষ কিছুই নেই।...যা দরকার হবে—ঝি মঙ্গলা আছে, তার ভাইপো ধনা আছে, তার পাশে অক্রূররা আছে—যাকে যা বলবে সে-ই তা ক'রে দেবে—ওদের দিয়েই যা লাগে আনিয়ে নাও। কাল হাটবার—সেও ওরা করে দিতে পারবে। আমি মাছ খাই না—মাছের পাট নেই, যা হোক দুটো ডালভাত করে দিও তাই আমার ঢের। অবিশ্যি তোমাকেও ডালভাত খেয়ে থাকতে বলছি না, যা খুশি করে খেতে পারো। যদি পান-দোক্তার নেশা থাকে তাও আনিয়ে নিও, সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। হিসেবপত্র আমাকে দিতে হবে না, ও তুমিই বুঝে নিও। টাকার দরকার হলে আমাকে বলো!'

ঐন্দ্রিলা স্তম্ভিত হয়ে গেল। যাকে দীর্ঘকাল ধরে পরের তাঁবে কাজ করতে হয়েছে এবং সন্দিগ্ধ দৃষ্টির মধ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ চলতে হয়েছে—(অধিকাংশ মনিবই ধরে নেন যে তাঁদের বামুনী বা রসুয়ে ঠাকুর চুরি করছে)—তার পক্ষে এত-খানি বিশ্বাস এবং এই অবাধ স্বাধীনতা একেবারেই কল্পনাতীত। এক কথায় এতদিন পরে একটা সংসারে—তা হোক না কেন ছোট সংসার—সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে বসল। মনে মনে আর এক দফা অরুণকে আশীর্বাদ করল ঐন্দ্রিলা। আর তখনই মনে পড়ে গেল যে তার ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি, কী করছে তাও না।...

এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করল না ঐন্দ্রিলা। মনের মতো করে ভাঁড়ার সাজাল সে। মনের মতো করেই রান্না করল। কাছে বসে যত্ন করে খাওয়াল ডাক্তারবাবুকে। ভদ্রলোক কিছুই খেতে চান না—নিজে হাত পুড়িয়ে ভাতে-ভাতই খেয়েছেন এতকাল, খাওয়ার শক্তিটাই গেছে কমে। ঐন্দ্রিলা প্রথম প্রথম

একটু সঙ্কোচ করেছিল, তার পর বুঝল মানুষটা আপনভোলা উদাসীন—সে জোর করে ধমক দিয়ে খাওয়াতে লাগল। তাতে অমরবাবুরও বিস্ময়ের অবধি রইল না। মাইনে করা লোক এমন যত্ন করে তা কখনও দেখেন নি তিনি—জানা ছিল না। আরও অবাক হলেন যখন ঐন্দ্রিলা স্বেচ্ছায়—যে সব কাজ তার করবার কথা নয়—তাও করতে লাগল। অমরবাবুর কাপড়-চোপড়ের কোন হিসেব থাকত না, ভাল ভাল কাপড়, ময়লা হবার পর এককোণে গুজড়ে হয়ত পড়ে আছে দীর্ঘকাল—তিনি ছেঁড়া কাপড় পরে কাটাচ্ছেন। সে সব কাপড় সেইভাবে থেকে হয়ত মষে ধরে গেছে, হয়ত পোকাতে কেটেছে, তাও ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের অস্তিত্বই মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে। বিছানারও সেই হাল। ঐন্দ্রিলা কয়েকদিন দেখে নিজেই একদিন ক্ষারে ফুটিয়ে মঙ্গলাকে দিয়ে কাচিয়ে নিল। জামাগুলো অক্রুরকে দিয়ে পাঠাল রজক-বাড়ি। বিছানার নতুন চাদর কিনে আনাল হাট থেকে। পরিষ্কার বিছানার ওপর পরিষ্কার পাট-করা জামা-কাপড়ের স্তূপ যখন দেখলেন ডাক্তারবাবু তখন তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

'মঙ্গলা—এত কাপড় জামা কার রে? কোথা থেকে এল? কেউ এসেছে নাকি?' ঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। যখন শুনলেন তাঁরই সব—তখনও বিশ্বাস হ'ল না। উলটেপালটে দেখে যখন মনে হ'ল সত্যিই তাঁর—তখন আবারও প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় ছিল এগুলো রে, কোথা থেকে বেরোল এতদিন বাদে?'

তারপর সব ইতিহাস শুনে খুব একচোট বকাবকি করলেন—ঐন্দ্রিলাকে, ঝিকে, —নিজেকেও।

'দেখ দিকি! এসব করার কি দরকার ছিল এখন। তাও মঙ্গলাকে বললেই হ'ত—আর তুইও হয়েছিস তেমনি, তোদের কি নজরে পড়ে না এসব। অক্রুরকে দিয়ে রজক-বাড়ি পাঠালে তো হ'ত!...ছি ছি! বিষম অন্যায় হ'ল। বামুনের মেয়ে—ও'র কি এই সব করার কথা! আমারও হয়েছে যেমন, কোনদিন হুঁশ থাকে না। এবার থেকে একটু হুঁশ ক'রে চলতেই হবে।...কিন্তু তোমারও এসব করার দরকার নেই—বুঝলে! আমার ভারী খারাপ লাগছে—'

দোরের বাইরে থেকে ঐন্দ্রিলা জবাব দেয়, 'আমি আর কি করলুম—টেনে বার করেছি বই তো নয়, মঙ্গলাই তো করেছে একবেলা ধরে।...পয়সার জিনিস অমনভাবে নষ্ট হওয়া আমরা দেখতে পারি না, গা করকর করে।'

মুখে যাই বলুন—অমরবাবু খুশীই হন ওর আন্তরিকতায়—আর সেটা চাপাও থাকে না। স্বাচ্ছন্দ্য না পেলে চলে যায় অনেকেরই হয়ত সে জন্য চেষ্টা বা উদ্যম করাও পোষায় না তাদের, কিন্তু অযাচিত ভাবে পেলে সকলকারই ভাল লাগে।

অমরবাবুরও ভাল লাগল এবং সে জন্য তিনি তাঁর নতুন বামুন-ঠাকরুনের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলেন। কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা কিভাবে প্রকাশ করবেন—তাঁর তরফ থেকে কি প্রতিদান দেওয়া উচিত ভেবে পেলেন না। এসব সাংসারিক জ্ঞান তাঁর চিরদিনই কম। শেষ পর্যন্ত, আর কিছু ভেবে ঠিক করতে না পেরে, পরের হাট থেকে একজোড়া থান আনিয়ে দিলেন, এক তাঁতি তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য একটি ভাল সাদা উড়ুনি দিয়ে গিয়েছিল সেটা বার ক'রে দিলেন এবং সে ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া করছে কি না, তার জলখাবারের ব্যবস্থা কিছু থাকে কি না, চা খাবার অভ্যাস আছে কি না—যখন তখন প্রশ্ন করতে লাগলেন।

প্রথম প্রথম ও'র এই অতিরিক্ত মনোযোগে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল ঐন্দ্রিলা। কারণ বয়স যতই হোক—ডাক্তারবাবু নিজে মুখে বলেছেন বাষট্টি পেরিয়ে

তেষট্টি চলছে তাঁর—কিন্তু বুড়ো তাঁকে আদৌ দেখায় না। বেশ শক্ত-সমর্থই আছেন, চুলও খুব পাকে নি এখনও পর্যন্ত। খাটতে পারেন অসুরের মতো, সকাল থেকে পায়ে হেঁটে আশপাশের চার-পাঁচখানা গ্রামে রোগী দেখে বেড়ান—দিনে-রাতে হাঁটেন সব মিলিয়ে অন্তত পাঁচ-ছ ক্রোশ। অর্থাৎ বয়স তাঁকে দেহে মনে কোথাও স্পর্শ করতে পারে নি।

তবে—যতই দেখতে লাগল ততই বুঝল ঐন্দ্রিলা—এ মনোযোগের বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই ওঁর কাছে। সাংসারিক জ্ঞানের দিক দিয়ে মানুষটা শিশুর মতোই সরল। তাছাড়া এ ধরনের মনোযোগ ওঁর পরিচিত সকলের সম্বন্ধেই। নজরে পড়ে কম—কিন্তু দৈবাৎ যদি কোন কারণে লক্ষ্য হয় যে মঙ্গলা বা অক্রূর বা অন্য কোন ওঁর অনুগত লোক ছেঁড়া কাপড় পরে আছে তো, তৎক্ষণাৎ তাকে কিছু না বলে অপর কাউকে দিয়ে একেবারে এক জোড়া কাপড় আনিয়ে দেবেন। দয়া এবং মায়া ভদ্রলোকের সকলকার ওপরই, সেও সেই সকলেরই একজন, তার বেশী কিছু নয়।

এখানে এসে অবধি মেয়েকে কিছু পাঠাতে পারে নি—বিশেষ করে ওর সতীন-পোর কাছ থেকে দেড়টা টাকা ধার করে এনেছে—সেটা অবধি শোধ করা হয় নি—কথাটা কাঁটার মতোই খচ্‌খচ করছিল ঐন্দ্রিলার মনে। কিন্তু প্রথম থেকেই ভদ্রলোক যে অমায়িক ও উদার ব্যবহার করছেন, তারপর আগাম মাইনে চাইতেও লজ্জা করছিল ওর। সংসার-খরচের টাকা থেকে ধারের দেড় টাকা অনায়াসে পাঠাতে পারত কিন্তু পাছে কথাটা কানে গেলে তিনি মনে করেন যে চুরি করছে, সেই ভয়ে পাঠাতে পারে নি।...এখন দিন-কুড়ি-বাইশ কাটতে—মানুষটাকে মোটামুটি চিনে নেবার পর—ভরসা ক'রে কথাটা একদিন পেড়েই ফেলল।

খেতে বসার সময় ছাড়া ওঁকে ধরা মুশকিল, তাও খেতে বসারও কোন নির্দিষ্ট সময় নেই—তবু যখন হোক একবার বসেন—নইলে বিশ্রাম বলে কোন কথা জানেন না ভদ্রলোক, ডাক্তারী ছাড়াও গ্রামের উন্নতি-উন্নতি করে পাগল, সে জন্যেও (ঐন্দ্রিলার মনে হয়) বহু বাজে পরিশ্রম করেন। সুতরাং সেদিন খেতে দিয়েই কথাটা পাড়ল। মাথা নিচু করে বলল, 'একটা কথা বলছিলুম, কিছু মনে করবেন না—নিতান্ত নাচারে পড়েই বলা—আমার মাইনে তো কিছু ঠিক হয় নি, তা সে যা হয় দেবেন, এখন একটা ঠিকানা লিখে দেব, সেইখানে গোটা আষ্টেক টাকা পাঠিয়ে দেবেন? আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন—এক মাসে না হয় দুইমাসেই শোধ হবে—?'

'তা দেব না কেন, নিশ্চয়ই দেব। বা-রে! কিন্তু কাকে পাঠাবে? তোমার কে আছে তাও তো জিজ্ঞাসা করি নি।'

সত্যিই কিন্তু জিজ্ঞাসা করেন নি উনি—ঐন্দ্রিলার মনে পড়ল। চেনা লোক চিঠি লিখে পাঠিয়েছে, বামুনের মেয়ে, এ-ই যথেষ্ট। পরিচয় কিছু জানবার কথা মনেই পড়ে নি ওঁর।

ঐন্দ্রিলা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আমার একটি মেয়ে আছে বাবু। ওকে নিয়েই বিধবা হয়েছি, বলতে গেলে ওর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই—অনেক কষ্টে, ভিক্ষে দুঃখু ক'রে মানুষ করা—তাও দেখুন না, আমি তো এই ঘুরে ঘুরে বেড়াই—ওর আপন-কাকারা সড় ক'রে এমন বিয়েই দিলে যে এরই মধ্যে আমার মতো হাতের দশা করে বসে রইল। এখনও বোধহয় ওর কুড়ি বছরও বয়স হয় নি। এরই মধ্যে—। এই তো এখনও দু-মাসও হয় নি, দু কি বলছি দেড় মাসও হয় নি—এই দশা হয়েছে। সেখান থেকেই আপনার এখানে এসেছি।......সতীন-পোর ঘর, একটা বাচ্ছা নিয়ে কি করছে কে জানে, খেতে পাচ্ছে কিনা—'

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল অমরবাবুর। বলতে বলতে স্বাভাবিকভাবেই ঐন্দ্রিলার গলা অশ্রুকম্পিত হয়ে উঠেছিল, সেই কণ্ঠস্বর এবং ওর একমাত্র কচি মেয়ের সদ্য-বৈধব্যের বিবরণ শোনার পর তাঁর মতো লোকের গলা দিয়ে ভাত নামা সম্ভব নয়।

তিনিও প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'সে কী? কী হয়েছিল জামাইয়ের? এত শিগ্‌গির—?'

তখন মেয়ের এবং ওর নিজের দুর্ভাগ্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস বিবৃত করতে হ'ল ঐন্দ্রিলাকে। খাওয়া যে ডাক্তারবাবুর বন্ধ হয়ে গেছে,—থালার ভাত কড়কড়িয়ে উঠছে, হাত উঠছে শুকিয়ে—তা ওর নজর এড়ায় নি। খাওয়া আর হবেও না। কথাটা হয়ত এ সময় না পাড়াই উচিত ছিল, অন্তত শেষের দিকে পাড়লেও হ'ত—তাও বুঝতে পারল, কিন্তু এখন আর উপায় কি? যা হবার তা তো হয়েই গেছে—মিছিমিছি এ সুযোগ ছাড়ে কেন সে?

অবিশ্বাস্য কাহিনী, কারুরই বিশ্বাস হবার কথা নয়, প্রথমটা ডাক্তারবাবুরও বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু ঐন্দ্রিলা যখন ভাত ছুঁয়ে—ইষ্টদেবতার নামে গুরুর নামে দিব্যি গালল তখন আর অবিশ্বাস করার কোন হেতু রইল না। তিনি যেন কী একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে লাগলেন। বিশেষত সীতার বিবাহের ইতিহাস শুনতে শুনতে তাঁর চোখের জল বাধা মানল না। তিনি ভাতের থালা সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়লেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'এসব কথা তুমি এতদিন বলো নি—চেপে রেখেছিলে! আশ্চর্য মা তো!...তোমার পাওনা হোক না হোক—কটা টাকা আমি দিতে পারতুম না? সেই কচি মেয়েটা—ইস্! হয়ত তারা ওকে খেতেই দিচ্ছে না ভাল করে, বাপ ছিল তবু একটা চক্ষুলজ্জা ছিল।...তাই তো। তুমি ঠিকানাটা লিখে দাও। এখনও বোধহয় সময় আছে, আমি ফর্ম লিখে অক্রূরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ডাকঘরে। এ গাঁয়ে ডাকঘরও একটা নেই ছাই—যেতে আসতে দেড় ক্রোশ যার নাম। তা অক্রূর পারবে, ওর খুব পা। আর দেরি হলেও আমার নাম করলে নিশ্চয়ই নেবেন মাস্টারবাবু—'

এই লোককে নিজের স্বার্থের জন্যে আহারে বঞ্চিত করে এমন কি ঐন্দ্রিলার মনেও অনুশোচনা হ'ল। সে একটু ব্যাকুলভাবেই বলল, 'কিন্তু আপনার যে কিছুই খাওয়া হ'ল না বাবু, ও ভাত তো আপনি খেতেও পারবেন না আর!...কেন যে আবাগী এই সময়ে কথাটা পাড়তে গেলুম।...আপনি বরং বসুন—আমি দুখানা লুচি ভেজে দিই—ঘি ময়দা সবই আছে, দশ মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে!'

'না না, ওসব কিছু করতে হবে না।' একটু যেন ধমকই দেন ডাক্তারবাবু, 'আমার ওতেই চলে যাবে। ঠিকানা—তুমি আগে ঠিকানাটা দাও, আর মোটে সময় নেই। দুটো বাজে—অক্রূরের যেতে যেতে তিনটে বেজে যাবে হয়ত—। শিগ্‌গির, শিগ্‌গির!'

আট টাকা নয়, তিনি একেবারেই কুড়ি টাকাই পাঠিয়ে দিলেন সীতার নামে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ ১ ॥

সীতার সতীন-পোকে চিঠি লিখে নিজের শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে অন্তত মাসখানেকের জন্যে সীতা আর তার ছেলেকে এখানে আনিয়ে নেবে কিনা—এই

প্রাচুর্যের মধ্যে মাসখানেক থাকলেও শরীর খানিকটা সেরে যাবে ওদের—এই যখন ভাবতে শুরু করেছে ঐন্দ্রিলা, তখন একটা অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটল।

এখানে এসে পর্যন্ত ডাক্তারবাবুর কোন আত্মীয়স্বজনের দেখা পায় নি কোনদিন। তবে তাদের কথা অনেক শুনেছে তাঁর কাছে। ছেলে ভাল চাকরী করে, বোম্বের কোন্ সওদাগরী আপিসে, হাজার টাকার ওপর মাইনে পায়, বাড়ি গাড়ি দিয়ে রেখেছে তারা। খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ, একমিনিটের ফুরসৎ নেই তার। শেষ প্রায় তিন বছর আগে দেখা পেয়েছিলেন ছেলের। সে লেখে সেখানে গিয়ে থাকতে—কিন্তু তাঁর পোষায় না। আর যেন শহরে থাকতে পারেন না তিনি। তাছাড়া অমন করে হাত-পা গুটিয়ে বসে খেলে দুদিনে বুড়ো হয়ে যাবেন। আর কেনই বা মিছিমিছি জড়ানো? তাঁর কর্তব্য তিনি করেছেন, মানুষ হয়ে গেছে, সেও স্বাধীনভাবে নিজের সংসার নিজে করুক। তিনিও স্বাধীনভাবে থাকুন। ওরা আজকালকার ছেলে ওদের একরকম পছন্দ—তিনি সেকেলে মানুষ তাঁর একরকম—কাছে থাকলেই দুটো কথা বলতে যাবেন, তারা শুনবে না—তখনই অশান্তি। এই বেশ আছেন!

মেয়ে তাঁর দুটি। দুটি মেয়েই ভাল পাত্রে পড়েছে। বড় জামাইও ডাক্তার, সরকারী চাকরি করে, দিল্লীতে থাকে। তার আবার চাকরির বড় ভয়—এর মধ্যেই নাকি দুবার হুমকি দিয়ে শ্বশুরকে চিঠি লিখেছে, তিনি নাকি কী সব স্বদেশী-ওলাদের গোপনে সাহায্য-টাহায্য করেন—এসব দুর্মতি যেন অবিলম্বে ছেড়ে দেন। জানাজানি হ'লে তার চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে যে!

'বোঝ ব্যাপার!' ডাক্তারবাবু বলেন, 'তা আমিও তাকে লিখে দিয়েছি—বুঝেছ, যে—বাপু আমি যা কর্তব্য বলে মনে করি তা করবই, করেও এসেছি চিরকাল। সে সময় বাপকেও ভয় করি নি, তা তুমি!...এখন যদি তোমার চাকরির ভয়ে আমাকে কর্তব্য থেকে পিছিয়ে আসতে হয় তাহলে আমার বেঁচে ফায়দা কি, গলায় দড়ি দেওয়াই ভাল।...আর আমিও তো সরকারী পেনসন খাই—আমি বুড়ো মানুষ যদি পেন্‌সন খোয়াবার ভয় না করি—তুমি জোয়ান ছোকরা, তোমার চাকরি খোয়াবার এত ভয় কেন? ডাক্তারী করে খেতে পারবে না, নিজের বিদ্যের এটুকু ভরসা নেই? '...আমাকে হুমকি দিতে আসে নিজের চাকরির ভয়ে!.. কেন রে বাপু, না হয় সম্পর্কই রাখিস নি এতই যদি ভয়—বলে দিস ও আমার শ্বশুর নয়, ও অন্য কোন লোক! কী বলো, খারাপ লিখেছি কিছু?'

প্রশ্ন করেন কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করেন না—হা হা ক'রে হেসে ওঠেন তার আগেই।

দেখা হয় যা ছোট মেয়ের সঙ্গেই মধ্যে মধ্যে। সে কলকাতায় থাকে, কী তেলের কোম্পানীতে জামাই কাজ করে। মস্ত বড়লোক শ্বশুর—তবু ছেলেকে কোন ব্যবসা ক'রে দিতে পারেন নি, নগদ এক লাখ টাকা জমা দিয়ে ছেলেকে কেশিয়ার ক'রে দিয়ে গেছেন। বছরে দু-একবার ওষুধ আনতে কলকাতা যেতে হয় তাঁকে। সেই সময়ে দেখা হয়। তা মেয়ের বাড়ি থাকেন না তিনি, সে বান্দাই নন—এখানে থেকে থেকে ও'র তো এই চাষার মতো চালচলন হয়ে গেছে, তারপর কি করতে কি করবেন, শেষ কুটুমবাড়ির লোক হাসবে, মেয়ের মাথা হেঁট হবে। কি দরকার, তিনি হোটেলেই ওঠেন। নিজের একটা ছোট বাড়িও আছে কলকাতায়, সে ভাড়া দেওয়া থাকে, ভাড়াটেরাও বলে গিয়ে উঠতে, বিশিষ্ট ভদ্রলোক তারা—কিন্তু অমনভাবে যখন তখন গিয়ে উৎপাত করতে ইচ্ছে করে না তাঁর। তার চেয়ে হোটেলই ভাল—স্বাধীনভাবে থাকা যায়।......

এদের কথা এসে অবধিই শুনছে ঐন্দ্রিলা, অনেকবার শোনা হয়ে গেছে। কিন্তু কখনও যে কাউকে দেখবে সে সম্ভাবনা ছিল না। যা বিবরণ শুনছে, নেহাৎ বাপের অসুখ না করলে এত কাণ্ড ক'রে কেউ দেখতে আসবে বলে মনেও হয় নি। ও তো এই কদিন এসেছে—মঙ্গলাও বলে, 'বাবুর যে সাত কুলে কেউ আছে তা মনে হয় না, কেউ কোনদিন খোঁজখবর করে না। যা করে ঐ চিঠি। তাও কৈ মাসে মোট পাঁচখানা চিঠি আসে তো ঢের, অথচ শুনেছি বাবুর একঘর আপ্তস্বজন। বৌই নেই, তা বই আর সব তো আছে!'

কেউই কোনদিন আসে না—শুধু ঐন্দ্রিলার কপালেই হঠাৎ একদিন কোথা থেকে ডাক্তারবাবুর ছোট শালা এসে হাজির হলেন। তিনি নাকি রেলের কি এক-জন হোমরা-চোমরা, কোলাঘাটে এসেছিলেন রেলের পুল দেখতে, মাঝে রবিবার পড়ে গেছে দেখে ভগ্নীপতির খবর নিতে এসেছেন।

ডাক্তারবাবু অবশ্য খুবই খুশী হয়ে উঠলেন, হৈচৈ চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, ঐন্দ্রিলাকে ডেকে বললেন, 'আজ কিন্তু মাছ রাঁধতে হবে বাপু, আমাদের রঘুনাথ আবার মাছ-মাংসের বড় ভক্ত, অক্রূরকে পাঠিয়েছি জেলের বাড়ি—জাল ফেলতে বলেছি পুকুরে—দ্যাখো কী পায়।...তা না পেলেও কোন ক্ষতি নেই বুঝলে রঘু, আমাদের এই বামুন ঠাকরুনের নিরিমিষ রান্না অমৃত। খেলে বুঝবে। যা ধোঁকা করে, মাছ ফেলে খাবে!'

রঘুনাথের কিন্তু ঐন্দ্রিলাকে দেখেই ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। তিনি তেমনি ভাবেই ঈষৎ বক্রদৃষ্টিতে আর একবার তাকিয়ে বললেন, 'তা ইনি—মানে এঁকে তো ঠিক চিনতে পারছি না। ইনি কবে এলেন, কৈ আমাকে কিছু লেখেন নি তো!'

'কাউকেই লিখি নি।' বোধ করি ওর কথার ধরনটা ভোলানাথ ডাক্তারবাবুরও ভাল লাগল না ; তিনি বললেন, 'হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছিলুম নিজে সে কথাও তো তোমাকে কখনও লিখি নি। রাধবার একটা লোক পেয়েছি—এ আর এমন ঘটা করে জানাবার মতো কী খবর। আমার বন্ধু এক স্টেশন মাস্টারের কি জানা-শুনো, তিনিই চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন, সেই থেকে আছে। বড় স্যাড হিস্ট্রী হে মেয়েটির, শুনলে চোখে জল রাখতে পারবে না। একটিমাত্র মেয়ে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই বিধবা হয়েছিল, সে মেয়ের এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হয়—সেও বিধবা হয়েছে কুড়ি বছর না পেরোতেই। সমস্ত ইতিহাসটা যদি ওদের শোন তো অবাক হয়ে যাবে, একেবারে উপন্যাসের মতো।'

ঐন্দ্রিলা প্রথম একটু দোরের সামনে দাঁড়িয়ে ও'র ভ্রূকুটি দেখেই সরে গিয়েছিল, কিন্তু চোখের আড়ালে গেলেও শ্রুতি-সীমার বাইরে যায় নি। সে শুনতে পেল রঘুনাথ চাপা গলায় বললেন, 'মতো কেন—খুব সম্ভব উপন্যাসই। সত্যিমিথ্যে কে আর যাচাই করছে!'

'ছিঃ, অত সিনিক হয়ো না হে। মানুষকে অত অবিশ্বাস করতে নেই। আর আমি এতকাল এত মানুষ চরাচ্ছি, এটুকু কি আর বুঝি না—কে সত্যি বলছে আর কে বানিয়ে বলছে!'

ডাক্তারবাবু মৃদু অনুযোগের সুরেই বলেন কথাগুলো।

রঘুনাথ আর কথা বাড়াল না, শুধু একটা 'হুঁ' বলে চুপ ক'রে যান। সে দীর্ঘছন্দে উচ্চারিত 'হুঁ'-র অর্থ ঢের ; অনেকখানি অবিশ্বাস, বিদ্রূপ এবং মানব-চরিত্রে ভগ্নীপতির জ্ঞান সম্বন্ধে অনাস্থা প্রকাশ পায় তাতে। অমরবাবু অত বোঝেন কিনা কে জানে, তিনিও চুপ ক'রে যান তখনকার মতো।......

রঘুনাথ পরের দিন ভোরে উঠে চলে গেলেন, কিন্তু ঐন্দ্রিলার অস্বস্তির ভাবটা যেতে চাইল না। ওর কেমন মনে হ'ল এ ব্যাপারের এইখানেই শেষ হ'ল না—এর পরের জন্যেও কিছু তোলা রইল।

কথাটা অমরবাবুর কাছেও একবার পাড়ল সে, 'আপনার শালাবাবুর বোধহয় আমাকে রাখাটা খুব মনঃপূত নয়। আপনি একা থাকেন এখানে—'

ওর বক্তব্য শেষ হবার আগেই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন অমরবাবু, 'ও হো, তুমি বুঝি ওর কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলে? সিলি! চিরকালটা ওর অমনি গেল, যেখানে সেখানে যা-তা বলে বসে দুম্ ক'রে।......ও কিছু না, ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। যখন যা মনে আসে বলে ফেলে—ও পাগল একটা।'

কিন্তু সদাশিব অমরবাবু যত সহজে উড়িয়ে দিলেন তাঁর শালাকে, তত সহজে উড়ে যাবার লোক বলে ঐন্দ্রিলার মনে হ'ল না। আশঙ্কা একটা থেকেই গেল মনে মনে। আর সেটা যে নিতান্ত অমূলক নয়—বোঝা গেল মাত্র কদিন পরেই।

চিঠি আসেই মধ্যে মধ্যে—ডাক্তারবাবু পড়ে কোথাও গুঁজে রেখে দেন, নাতি-নাতনীদের চিঠি পেলে আনন্দ ক'রে শোনান ঐন্দ্রিলাকে। সেদিন যখন চিঠিটা এল তখন দুটো বাজে। খাওয়া-দাওয়ার পর কী একটা জরুরী কাজে বেরোচ্ছিলেন সেই মুখে ডাকঘর থেকে চিঠিটা এনে দিল অক্রূর। খামের চিঠি—স্বাভাবিকভাবেই হাসি হাসি মুখে চিঠিখানা নিয়ে খুলে পড়লেন ডাক্তারবাবু, কিন্তু ঐন্দ্রিলা লক্ষ্য করল চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সদাপ্রফুল্ল মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। ঐন্দ্রিলা বাইরে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল—সে তখন নিজে খেতে যাচ্ছে—হয়ত কোন দুঃ-সংবাদ মনে ক'রে খানিকটা দাঁড়িয়েই রইল সে। সেরকম হলে ডাক্তারবাবু এখনই ডেকে বলবেন—কিন্তু তিনি কোন উচ্চবাচ্যই করলেন না, যে জরুরী কাজে যাচ্ছিলেন তার কথাও মনে পড়ল না বোধহয়—চুপ ক'রে যেন গুম হয়ে বসে রইলেন।

খানিকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐন্দ্রিলা এসে খেতে বসল। রান্নাঘর থেকে ডাক্তার-খানার ঘরটা—সেইটেই অমরবাবুর বসবার ঘরও বটে—পরিষ্কার দেখা যায়। আরও বহুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন তিনি, তারপর উঠে তেমনি অন্যমনস্কভাবেই বেরিয়ে গেলেন। অন্যদিন যাবার সময় ওকে বলে যান, দোর দিতে বলেন—আজ তাও বললেন না, এমন কি চিঠিখানা খামে পুরে কোথাও সরিয়ে রাখা কি ছিঁড়ে ফেলার কথাও মনে রইল না। সেটা বাতাসে উড়তে লাগল, হয়ত একটু পরে উড়ে বাইরেই চলে যাবে।

কোনমতে তাড়াতাড়ি ভাত কটা নাকে-মুখে গুঁজে উঠে পড়ল ঐন্দ্রিলা, নেহাৎ বিধবা মানুষ, একবার পাত থেকে উঠলে আর ফিরে সে পাতে বসতে নেই তাই—নইলে তখনই গিয়ে চিঠিটা কুড়িয়ে পড়ত। কৌতূহলে অস্থির হয়ে উঠেছে সে। কৌতূহল আর সেই সঙ্গে একটু আশঙ্কাও। কে জানে কে কি লিখেছে, কোন সাংঘাতিক রকমের দুঃসংবাদ কিনা।

আঁচিয়ে এসে চিঠিখানা মেজে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে পড়ল। লেখা-পড়া তার বিশেষ জানা নেই, ছেলেবেলায় ছোট মাসী অনেক চেষ্টা ক'রেও সেদিকে এগোতে পারেন নি, বই পড়ার থেকে রান্না-বান্নার কাজই বেশী ভাল লাগত তার—তখন কে জানে যে একদিন এই কাজ ক'রে খেতে হবে!—তবু এ চিঠির হাতের লেখা বেশ পরিষ্কার, গোটা গোটা, পড়তে কোন অসুবিধাই হ'ল না। চিঠিটা লিখেছে রেণু, অমরবাবুর ছোট মেয়ে—নিচে নাম-সই দেখে বুঝতে পারল।

লিখেছে—"শ্রীচরণেষু বাবা, ছোট মামার মুখে শুনিলাম বৃদ্ধবয়সে তুমি একটি মেয়ে-

মানুষ রাখিয়াছ, তাহাকেই গৃহিণীর পদে বসাইয়া সুখে ঘর-সংসার করিতেছ। হয়ত বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু বলিতে বলিতে ছোট মামার মুখে যে বিজাতীয় ঘৃণা ও রাগের ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে কথাটা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলাম। ছি ছি, তোমার এই অধঃপতনের কাহিনী শোনার আগে আমাদের মরণও ঢের ভাল ছিল। ইঁহারা—আমার শ্বশুরবাড়ির লোক জানিতে পারিলে কী বলিবেন, আমি কি আর লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিব! আমাদের মুখ না চাও, এত শীঘ্র তুমি আমাদের সতীলক্ষ্মী মায়ের কথা ভুলিয়া যাইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। তিনি যে স্বামী-অন্ত-প্রাণ ছিলেন। ২৫ বছরেরও উপর তিনি তোমার সহিত ঘর করিয়াছেন, তোমার জন্যই সারা জীবন পাত হইয়াছে তাঁর! এই কাজ করার আগে আমাদের সেই মার কথা মনে পড়িল না। আশ্চর্য! এই জন্যই তাহা হইলে তুমি ওখানে থাক—এই তোমার দেশের কাজ, নরনারায়ণের সেবা! তুমি ভাবিয়াছিলে যে কলিকাতায় বসিয়া এই কীর্তি করিলে বড় জানাজানি হইবে—ঐ বন-জঙ্গলে বসিয়া যা-খুশি করিবে কেহ টের পাইবে না! কিন্তু ধর্মের কল যে বাতাসেই নড়ে, সেটা বুঝি ভাবিয়া দেখ নাই। যাক্—তোমাকে আমরা দেবতার মতো ভক্তি করিতাম, তোমাকে লইয়া কত গর্ব আমাদের। সে গর্ব ধূলায় মিশাইয়া গেল। তুমি এসব করার আগে একবার ছেলে-জামাইদের কথাও ভাবিলে না। ভালই হইল, তোমার জন্য কোন চিন্তা কি কর্তব্যবোধ রহিল না। আমাদের সঙ্গে সম্পর্কেরও এই শেষ। আজই দাদা ও দিদিকে চিঠি লিখিয়া দিলাম, যাহাতে তাহারাও না তোমাকে চিঠি দিয়া বা সংবাদ লইয়া বিরক্ত করে। আজ হইতে শুধু তোমার মৃত্যু-সংবাদেরই অপেক্ষা করিব। আর কোন সংবাদে কাজ নাই। ইতি—রেণু।"

চিঠিটা পড়তে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল ঐন্দ্রিলার। বার দুই চেষ্টা ক'রে পড়তে হ'ল। তারপর পূর্ণ অর্থটা বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা আগুন হয়ে উঠল তার। সেই আগুন, যার সামনে লোকের সমস্ত সহানুভূতি জ্বলে-পুড়ে যায়—ওর অদৃষ্টের আগুন! সেই প্রচন্ড দিক্‌দাহকারী ক্রোধ—যা এখানে এসে পর্যন্ত এই কমাস, ওর পক্ষে বহুদিন, অনুভব করে নি—সেই চন্ডাল ক্রোধে ফেটে পড়ল সে। শূন্য ঘরেই চিৎকার ক'রে গালাগাল দিতে লাগল,—

"মুখে আগুন তোমার। তোমার মরণ হয় নি কেন এ চিঠি লেখার আগে। শয়ে চড়ো নি কেন! বেশ তো, এত যদি ঘেন্নাপিত্তি, এ চিঠি না লিখে কড়িকাঠে ঝুললে না কেন! সেই তো ভাল হ'ত।...মর্ মর্ মর্। নিমতলায় যা। নিমতলায় গেলে উদ্ধার হয়ে যাবি—খাল ধারে যা। ভাতার পুত নিয়ে যা একেবারে। ওলা-উঠায় মর তোরা গুষ্টিসুদ্ধ। প্লেগে মর্। মুখে যেন জল দেবার কেউ না থাকে মরবার সময়ে। তোদের বংশের নামসুদ্ধ শয়ের জলে ধুয়ে-মুছে যাক! বংশে বাতি দিতে কেউ যেন না থাকে ত্রিভুবনে। মেয়েমানুষ! কত বড় আস্পদ্দার কথা! বাজারের মেয়েমানুষ আমি! আমার মতো শুধু-হাত সাদা-সিঁথে হোক, সব্বস্ব খুইয়ে পথে বোস্—তবে বুঝবি কী দুঃখে এই কাজ করতে আসে লোকে।...আমি যেখানে পা ধোব সেখানে তোদের মা-শাশুড়ীরা দাঁড়াতে পারবে না। আমাকে মেয়েমানুষ বলা! আমি রাঁড়, আমি খান্‌কী? তোদের চোদ্দপুরুষে যে যেখানে আছে খান্‌কীগিরি করুক!...খান্‌কীগিরি করার কত মজা টের পা!'

অনেকক্ষণ ধরে সেই শূন্য বাড়িতে ভয়াবহ চিৎকার করে চলল ঐন্দ্রিলা। মেয়েকে গালাগাল দেওয়া শেষ হ'তে মেয়ের মামাকে নিয়ে পড়ল। তারও সর্বনাশ হবে। ওর হাতে চব্যচোষ্য খেয়েগিয়ে ওর নামে এই অপবাদ রটানো। ওর অবীরে সদ্য-

বিধবা কচি মেয়েটাকে তবু যা হোক দয়াধর্ম করছে লোকটা—সেই পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা! ধর্মে সইবে না এ-সব। ওরও যদি সপুরী এক গাড়ে না যায় তো ঐন্দ্রিলা কী বলেছে! কেউ কারও মুখে জল দিতে থাকবে না, মরবার সময় কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হবে না—ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠি আসা, চিঠি পড়া এবং তার এই প্রতিক্রিয়া যখন ঘটছে, তখন আশপাশে কেউই ছিল না। অক্রুর হাটে গেছে, মঙ্গলাও গিয়েছিল পাশের গাঁয়ে মেয়ের বাড়ি। সে যখন ফিরল তখনও ঐন্দ্রিলার আস্ফালন এবং চিৎকার চলছে। তার এ চেহারা মঙ্গলা কখনও দেখে নি। শান্তশিষ্ট ভালমানুষ না হোক, দজ্জালও নয় সে—এই ছিল মঙ্গলার ধারণা। সে মনে করল নির্ঘাৎ বামুন-দি পাগল হয়ে গেছে, নয় তো ভূতে পেয়েছে। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল ডাক্তারের খোঁজে, ডাক্তার যদি এসে সামলাতে পারে।

কিন্তু মঙ্গলাকে ঐ ভাবে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটতে দেখে ঐন্দ্রিলার কতকটা হুঁশ হ'ল। বোধহয় ক্লান্তও হয়ে পড়েছিল খুব। এইবার চুপ করল সে। খানিকটা চুপ ক'রে বসে থেকে, মাথায় খুব ক'রে জল থাব্‌ড়ে থাব্‌ড়ে দিয়ে একটু প্রকৃতিস্থ হ'ল। তারপর উঠে স্বাভাবিক নিয়মে কাজকর্ম করতে শুরু করল।

প্রথমটা মনে হয়েছিল আজই কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু উষ্মার উন্মত্ততাটা কমতে, যখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এল—তখন মনে পড়ল সীতার কথাটা। ভদ্রলোক ওকে মাস মাস মাইনে বলে পনেরো টাকা দিচ্ছেন। তা ছাড়াও সীতাকে আলাদা টাকা পাঠাচ্ছেন—কোন মাসে দশ, কোন মাসে পনেরো। ঐন্দ্রিলা ভদ্রতার খাতিরে একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল—উনি শোনেন নি। বলেছেন, 'ওর ভার যখন আমি নিয়েছি, তখন আমার দায়িত্ব। তোমার পাঠাতে হয় তুমি আলাদা পাঠাও গে।'

বলা বাহুল্য ঐন্দ্রিলা তা পাঠায় নি। ওর মাইনের টাকা সবই জমছে। এ রকম এর আগে আর কখনও হয় নি। একটা বাড়তি পয়সা পর্যন্ত থাকত না। কম দুর্ভোগ ভোগে নি তার জন্য। মেয়েটাকেও কম ভুগতে হয় নি। দুঃসময়ে মার কাছে দুটো ভাত মিলেছে বটে—কিন্তু সে শুধুই দুটো ভাত, তার বেশী কিছু নয়। কেঁদে-ককিয়েও কখনও একটা টাকা বার করতে পারে নি মার কাছ থেকে। যদি দু-চারটে টাকা হাতে জমে তো জমুক—বলা তো যায় না—কখন দুঃসময় আসে। অসুখেই যদি পড়ে, সে কিম্বা মেয়ে কিম্বা নাতি—তখন চিকিৎসা লাগবে। এখন বেশী টাকা পাঠালে সতীনপোরা এলাকাঁড়ি দেবে।

না, এ যদি সাধারণ চাকরি হ'ত তো আজই চাকরিতে লাথি মেরে চলে যেত ঐন্দ্রিলা। এ চাকরি ছাড়া চলবে না। অন্তত সে নিজে থেকে ছাড়বে না এটা ঠিক, উনি যদি ছাড়ান সে আলাদা কথা। তবে তাও সহজে ছাড়বে না সে।

সেদিন আর বিশ্রাম নেওয়া হ'ল না ঐন্দ্রিলার। মাঠের দিকে চেয়ে বুঝল বেলা পড়ে এসেছে। তখনই কাজে লেগে গেল। আরও পরিপাটী ক'রে সেদিন ঘরদোর ঝাড়ল মুছল সাজাল। ডাক্তারখানাও যতটা সাফ্ করা সম্ভব করল। তারপর রান্নাঘর নিকিয়ে নিয়ে বিকেলের রান্নায় মন দিল।

ততক্ষণে মঙ্গলা ফিরেছে। ডাক্তারকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে সে ভয়ে-ভয়েই আসছিল; কিন্তু দূর থেকে বাড়ি নিস্তব্ধ শুনে ভরসা করে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। বামুনদিকে সহজ মানুষের মতো কাজকর্ম করতে দেখে প্রথমটা বেশ একটু অবাকও হয়ে গেল তবে কোন প্রশ্ন করল না। সে শুনেছে এই 'ক্ষ্যাপে-পাগল' লোকগুলোকে

তাদের পাগলামীর কথা মনে করিয়ে দিলেই তারা আবার ক্ষেপে ওঠে। কিছু বলল না বটে, তবে একটু দূরে দূরেই রইল। সে রকম লক্ষণ আবার দেখলে সোজা 'রড়' দেবে।

তবে আর তেমন কিছু দেখা গেলও না। স্বাভাবিকভাবেই কথা-বার্তা বলল ঐন্দ্রিলা, কাজ যা করতে হবে তাও বাৎলে দিল। বরং মঙ্গলা দেখল আজ খাওয়ার জুৎ খুব। ছানা কাটানো হচ্ছে, ছানার ডালনা হবে, ভাল করে ছোলার ডাল হচ্ছে। এই মানুষই যে চার দণ্ড আগে অমন ক'রে তুড়ি-লাফ খাচ্ছিল তা মনে হয় না। কে জানে পাগল না ভূতে-পাওয়া। রাম রাম!...বার বার রাম নাম স্মরণ করতে লাগল মঙ্গলা।

সেদিন ডাক্তার ফিরলেন বহু রাত্রি ক'রে। ঐন্দ্রিলা আড়ে চেয়ে দেখল, উস্‌কো-খুস্‌কো উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। চোখ-মুখ বসে গিয়েছে এই ক' ঘণ্টাতেই। কে জানে হয়ত এতক্ষণ শুধু শুধুই মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

একটু প্রমাদ গণল ঐন্দ্রিলা। আঘাতটা যদি এতখানি লেগে থাকে তাহ'লে কী হয় বলা মুশকিল। হাজার হোক ছেলেমেয়ের টান। মা-মরা ছেলে-মেয়ে সব। একটা রাঁধুনী বামনীর জন্যে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবে তা সম্ভব নয়। কিন্তু সেও সহজে ছাড়বে না। এক কথাতেই বা সে যাবে কি জন্যে! তাদের সন্দেহ হয় এসে দেখে যাক না, মামা একবেলা দেখেই সব বুঝে ফেলল একেবারে! বুড়ো তাই কেন লিখুক না, এসে দেখে যেতে!

কিন্তু তখনই মুখে কিছু বলল না। তাড়াতাড়ি গাড়ু আর গামছা এগিয়ে দিল, মঙ্গলাকে বলল একটু বাতাস করতে। তারপর মুখ-হাত ধোওয়া হ'লে পরি-পাটী ক'রে সাজিয়ে খেতে দিল।

খেতে বসে তৃপ্ত হলেন অমরবাবু। ছানার ডালনা তিনি ভালবাসেন কিন্তু এ বামুন ঠাকুরুণের মতো কেউ রাঁধতে পারে না। আর এই ছোলার ডাল, মাংস ফেলে খাওয়া যায়। খেতে খেতে সমস্ত ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তার ছাপ মিলিয়ে গেল কপাল থেকে—সে জায়গায় ফুটে উঠল একটি প্রসন্ন পরিতৃপ্তি।

তৃপ্ত হয়েছেন বাড়িতে পা দিয়েই। বহুদিন লক্ষ্মীছাড়ার মতো বাস করছেন, তবু সাজানো ঘর, শুভ্র শয্যা দেখলে আজও মনটা প্রফুল্ল হয়।

খেয়ে উঠে প্রাচুর্যের উদ্গার এবং পরিতৃপ্তিসূচক শব্দ করতে করতে বাইরের বারান্দায় বসে সবে একটি বিড়ি ধরিয়েছেন—ঐন্দ্রিলা গিয়ে দাঁড়াল।

'ওকি, তুমি খেলে না?'

'যাচ্ছি। আর খাওয়া তো একেবারে উঠল এখান থেকে। সেই কথাই বলতে এসেছি, আমাকে কালই যাবার একটা ব্যবস্থা করে দিন, আমি চলে যাই—'

'চলে যাই? তার মানে—?' ডাক্তার তখনও বুঝতে পারেন না।

'কী করে আর থাকব বলুন! গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি, এমন দুর্নাম কিনে পড়ে থাকব কেন! আমাদের যতদিন খাটবার শক্তি আছে—চার দোর খোলা। বড় বংশের মেয়ে—বড় বংশের বৌ, পেটের দায়ে কাজ করতে এসেছি বলে এ-সব কথা শুনতে রাজী নই!'

ঠিক এভাবে হয়ত বলবার ইচ্ছে ছিল না, হঠাৎ বলার ঝোঁকে বলা হয়ে গেল। একটু ভয়ও করতে লাগল, বুড়ো যদি রাজী হয়ে যায়।

যদি রাজী হয়ে যায় তো কথাটা কিভাবে ঘোরাবে ভাবছে— কিন্তু তার আগেই অমরবাবু তার দুশ্চিন্তার অবসান করে দিলেন, 'ওঃ, সেই চিঠিটা পড়েছ বুঝি!

আমারই উচিত ছিল ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যাওয়া...ননসেন্স।...যে মেয়ে বাপের চেয়ে মামাকে বেশী বিশ্বাস করে, এতকালের পরিচয়ের থেকে শোনা কথাকেই বড় মনে করে—তার ও চিঠি আমি গ্রাহ্যই করি না। তার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকে তো বড় বয়েই গেল। একবার জিজ্ঞেসা করাও দরকার মনে করল না গুজবটা সত্যি কিনা! তুমি ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। তাদের দিন তারা কিনে নিয়েছে—তাদের প্রতি আমার কর্তব্যেরও শেষ। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কতটুকু—দেখছই তো, তারা কি আমার খোঁজ নিচ্ছে, না কেউ নিজের সংসার ছেড়ে আমার কাছে এসে দুদিন থাকছে। হ্যাঁ, আমি যদি যাই তো তারা দেখবে—ভাত-হাঁড়ির ভাত দুটি দেবে।... না, আমার তাতে দরকার নেই! ঢের করেছি তাদের জন্যে, এখন আমি আমার মতো ক'রে একটু বাঁচতে চাই। আমার যা কর্তব্য বলে মনে করি তাই করব। তাদের ইচ্ছে হয় তারা বাবা বলবে, না ইচ্ছে হয় বলবে না। যদি মরে যাই—এরাই দেখবে। তাদের ইচ্ছা থাকলেও হয়ত তারা আসতে পারবে না।...হুঁ!...নাও, নাও তুমি খেয়ে-দেয়ে নাও গে। ওসব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না!'

সোজাসুজি কথাটা পাড়াতেই বোধহয় ভাল হ'ল। অমরবাবুর মনে যেটুকু দ্বিধা ছিল সেটুকু কেটে গেল। এসব লোককে তাতালেই কাজ হয়, আর তাতাবার পক্ষে এই সোজাপথই ভাল।

ঐন্দ্রিলা মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করে।

॥ ২ ॥

শীতের গোড়ার দিকে একদিন শ্যামার একখানা চিঠি পেল ঐন্দ্রিলা। বহুদিন পরে দেখলেও মার হাতের লেখা চিনতে কো অসুবিধা হ'ল না। মা চিঠি লিখল কেন? কখনও তো লেখে না! চিঠিই তো আসে না তার নামে। কখনও-সখনও যা মেয়ে লেখে। তার সেই আঁকাবাঁকা গোল গোল হরফ দেখতেই চোখ অভ্যস্ত। এ মায়ের মুক্তোর মতো অক্ষর সাজানো, সোজা লাইন—দূর থেকে দেখলেই চেনা যায়। বয়সে এবং অনভ্যাসে হরফের রেখাগুলো একটু এঁকেবেঁকে গেছে—ঠিক আগের মতো নেই বটে, তবু ছাঁদটা সেইরকমই সুন্দর আছে। ছাপার মতো লেখা ছিল এককালে, এখনও সে আদলটা ধরা যায়।

কিন্তু কী লিখল মা?

নিশ্চয় নতুন কোন দুঃসংবাদ। দুঃসংবাদ ছাড়া মা পোস্টকার্ডের একটা পয়সা খরচ করে নি।

কিন্তু দুঃসংবাদটাই বা কার?

মার কোন খবর—যত খারাপই হোক, কখনও তো তাকে জানায় না। তবে কি তারই কিছু? সীতার—?

অকস্মাৎ যেন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। বুকে ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে ভয়ে। হেমন্তের সেই প্রায়-শীতল দিনেও কপাল গলা ঘেমে ওঠে।

হাতেই পোস্টকার্ডখানা—তবু পড়তে সাহস হয় না।

বহুক্ষণ সেইভাবে বসে থাকে। শেষ যখন ডাক্তারবাবুই ডেকে বলেন, 'কার চিঠি, কই পড়ছ না তো!' তখন অপ্রতিভ হয়ে ওঠে। মনে করে, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—দুঃসংবাদ শুনে শুনে তো কানে কড়া পড়ে গেছে, কত আর খারাপ

হবে! সে জোর ক'রে চিঠিখানা তুলে ধরে চোখের সামনে।

দীর্ঘ চিঠি, ক্ষুদি ক্ষুদি লেখা। সমান লাইন আর সমান হরফ বলে অনেক কথাই ধরেছে একখানা কার্ডে। এক পয়সায় দু'পয়সা খরচের কাজ সেরেছেন শ্যামা।

তিনি লিখেছেনঃ—

"কল্যাণীয়াসু, খেঁদি তোমাকে একটি বিশেষ প্রয়োজনে লিখিতেছি। তোমার ছোট বোন তরু এতদিন গুমু-পাগল ছিল এবার সে রীতিমত পাগল হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন মল্লিকদের পুষ্করিণীতে মাছ ধরানো হইয়াছিল, আমার বাড়ি আজকাল ও পাট নাই বলিয়া তাহারা কান্তি ও বলাইয়ের মতো মাছ রান্না করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। উহারা খাইতে বসিয়াছে এমন সময়ে তরু কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া কান্তির পাত হইতে দুইখানা মাছই তুলিয়া লইয়া খাইতে শুরু করিয়া দিল। আমরা হাঁ হাঁ করিয়া ওঠায় হাসিতে হাসিতে কাপড়ের মধ্যে করিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেল। ইহার পর হইতে উপদ্রব বাড়িয়াই চলিয়াছে। এটা-ওটা ভাঙ্গিতেছে, পগারে ফেলিয়া দিতেছে—চুরি করিয়া খাওয়া তো আছেই, ভাত-ব্যঞ্জন ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিতেছে প্রত্যহ। মধ্যে মধ্যে হা-হা করিয়া হাসিয়া ওঠে, ডাক ছাড়িয়া কাঁদেও। সেদিন কখন বাহির হইয়া গিয়া মহাদেবের মার ঘর হইতে মাছের টক চুরি করিয়া খাইয়াছে। আমি একা লোক, কান্তি বাড়ি থাকে না—সে দিনরাত চাকরির খোঁজে টো টো করিয়া ঘোরে, পাগলকেই বা কে দেখে, আর দুটো ভাতই বা কে ফুটাইয়া দেয় তাহার ঠিক নেই। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম তো আছেই। ধোওয়া মোছা ঝাঁট দেওয়াই আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। মহা কান্তির জন্য একটা সম্বন্ধ আনিয়াছিল, মা-মরা মেয়ে—কান্তি কিছুতেই রাজী নয়। এমতাবস্থায় একমাত্র উপায় হয়, তুমি যদি আসিয়া কিছুদিন থাকো। ইতিপূর্বে তোমার দুঃসময়ে আমি অনেক-বার ঠাঁই দিয়াছি, এখন আমার দুঃসময়ে তোমার দেখা উচিত। যদি মেয়ের কথাই বড় হইয়া ওঠে তো আমি তাহার জন্যও মাসে মাসে চার টাকা করিয়া দিতে রাজী আছি। আর তোমার কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। আমার আশীর্বাদ লইও। হেমরা পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছে আজকাল। ইতি—আশীর্বাদিকা মা।"

চিঠি পড়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল ঐন্দ্রিলা। বিশ্বাস হচ্ছে না, নিজের চোখকেও বিশ্বাস হচ্ছে না তার। চোখে দেখেও মনে হচ্ছে না যে সে ঠিক দেখছে। ...আর একবার উলটেপালটে দেখল চিঠিটা। মারই হাতের লেখা তো?

মা মাসে মাসে সীতাকে চার টাকা ক'রে পাঠাতে রাজী হয়েছেন—এ যে কত-খানি নাচারে পড়ে তা একমাত্র সে-ই বুঝেছে। কোথাও কোন উপায় না দেখেই এই চিঠি লিখেছেন। বাইরের লোক, ঝি-চাকর দিয়ে তাঁর সংসারের কাজ হবে না —তা মা বিলক্ষণ জানেন।

প্রাথমিক স্তম্ভিত ভাবটা কাটতে ঐন্দ্রিলার সর্বপ্রথম যে প্রতিক্রিয়া হ'ল সেটা হচ্ছে উল্লাসের। একটা পৈশাচিক উল্লাস বোধ করতে লাগল সে। বেশ হয়েছে। ......এই মেয়ের জন্যে এক এক সময় বিপদে পড়ে দুটো একটা টাকা চেয়েছে সে, কাকুতিমিনতি করেছে তবু মা দেন নি—টাকার আণ্ডিলের ওপর থাকেন—ওর সামনেই কত লোককে শুধু হাতে ধার দিয়েছেন, তবু ওকে দেন নি। ওর কচি মেয়েটা সেখানে শুকিয়ে উপোস ক'রে মরছে জেনেও তাঁর এমন স্বত্ব পোরে নি যে একটা টাকা বার ক'রে দেন। কত টাকা তো মারাও যাচ্ছে, সুদ ছেড়ে আসল পর্যন্ত ডুবছে, না হয় নিজের নাতনীকে দানই করতেন!...বেশ হয়েছে, মাথার ওপর যে

ভগবান আছেন, তা এইতেই প্রমাণ হয়।

ঐন্দ্রিলা চিঠিখানা রান্নাঘরের চালের বাতায় গুঁজে রেখে কাজে লেগে গেল। মরুক গে, ও চিঠির জবাবও দেবে না সে।

কিন্তু কাজ করতে করতে বারবারই অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগল সেদিন।

হাজার হোক মা। অনেক করেছেনও—তাতে সন্দেহ নেই। নিজেরই মা ভাই বোন। সমস্ত কথা ছাপিয়েও, সমস্ত দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও—রক্তের টানটা যেন মনে মনে প্রবল হয়ে ওঠে। বস্তুত রক্তের টান যে এমন হয়, রক্তের টান যে কথার কথা নয়—একটা কিছু সত্যিই আছে—আজ প্রথম অনুভব করল সে। খুবই নাচারে পড়েছেন মা, খুবই বিব্রত হয়ে উঠেছেন। সত্যিই গোটা বাড়িটা ধোয়ামোছা করা নিকোনোই তো একটা মানুষের পক্ষে কষ্টকর। মার শরীরটাও ইদানীং ভাল যাচ্ছে না, কুঁজো হয়ে পড়েছেন। আজকাল বেশ খানিকটা ঝুঁকে পড়ে চলেন সামনের দিকে। তার বয়সটাই কি কম হ'ল! তার ওপরে চারটে ভাইবোন হয়েছিল—দাদার বয়সই বোধ হয় পঞ্চাশের ওপর হয়ে গেল। কে জানে, অত হিসেব থাকে না, কেমন যেন গুলিয়ে যায় সব। তবে মার বয়সও ঢের হয়েছে, তার ওপর কী দুঃখকষ্টটাই না করেছেন সারাজীবন—সেই দশ এগারো বছর বয়স থেকে। কবে ভেঙ্গে পড়বার কথা, অন্য মানুষ হ'লে মরেই যেত—নয়তো শয্যাশায়ী হয়ে থাকত। এ শুধু ওঁর অসাধারণ মনের জোরেই চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন, এখনও খাটছেন।......

ভাবতে ভাবতে কখন হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা মনেও নেই ঐন্দ্রিলার। অকস্মাৎ এক সময় হুঁশ হ'ল মঙ্গলা অবাক হয়ে মুখের পানে চেয়ে আছে দেখে। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে আবার জোরে জোরে হাত চালাতে লাগল সে।

'কী গো, দেশঘাট থেকে কী খবর এল? সেই থেকে অমনি করতে লেগেছ? মঙ্গলা প্রশ্ন করে, 'কে লিখেছে পত্তর?'

'মা লিখেছেন, আমার মা। বোনের খুব অসুখ। তাই লিখেছেন।'

কুটনো কুটতে কুটতে আবারও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ঐন্দ্রিলা। তরুটারই বা কি কপাল! সত্যি বোনে বোনে কপাল নিয়ে ওরা জন্মেছিল বটে। মার গর্ভেরই দোষ। দিদিমার রক্ত। দিদিমার রক্ত যেখানে আছে সেখানে কেউ সুখী হবে না। ...শুধু দিদিমার দোষ দিয়েই বা কি হবে—তার বাপের বংশ তো আরও চমৎকার।

একসময়ে তরুকে সে হিংসে করত। ছিছি!......সে তো তবু যে কদিন হরিনাথকে পেয়েছে পরিপূর্ণভাবেই পেয়েছে, কাউকে ভাগ দিতে হয় নি! শ্বশুরের ভালবাসাও। তার মতো শ্বশুর জন্ম জন্ম তপস্যা করলে তবে পাওয়া যায়। অদৃষ্টে নেই, গেল জন্মে কার পরিপূর্ণ সুখের বাসায় আগুন লাগিয়েছিল, তাই এ জন্মে তারও সুখের বাসায় আগুন লাগল।

না, তরুটা তার চেয়েও হতভাগা। সে তো তবু গতর খাটিয়ে ক'রে কম্মে খাচ্ছে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে আছে—স্বাধীনভাবে। তরুটার কী হাল! সবচেয়ে অভিশাপ পাগল হয়ে যাওয়াটা। তরুটা শেষে পাগল হয়ে গেল। বরাবরই ঐরকম ছিল, গুমপাগল মতো—ঐন্দ্রিলা মনে করত কল্লা (এখন কথাটা মনে হয়ে লজ্জাই করতে লাগল তার)—কেন অমন হ'ল কে জানে। এই ডাক্তারবাবু বলছিলেন সেদিন—কী সব খারাপ ব্যামো থাকলে, লোকে হঠাৎ পাগল হয়ে যায়। কে জানে হারানের ওসব ছিল কিনা। ডাক্তারবাবু বলেন, হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়া, হঠাৎ কালা হয়ে যাওয়া—ওসব রক্তে দোষ থাকার ফল। অবশ্যি অন্য কারণেও হয়—কিন্তু যেখানে সেসব কারণ নেই—? মা তো বলে বাবারও কী সব খারাপ ব্যামো ছিল। বাবা

গো, ভাবলেই যেন মাথার মধ্যে কেমন করে। সেও ঐরকম পাগল হয়ে যাবে নাকি কোনদিন?

আবারও একসময় খেয়াল হ'ল যে হাত থামিয়ে সে বসে বসে ভেবেই চলেছে!

দূর হোক গে ছাই। ভেবে আর কী করবে সে! যা হবার তা হবেই। কিন্তু মার চিঠিটা—। চলেই যাবে নাকি? সে নিজেও বুড়ো হ'তে চলেছে, বুড়ো মার অবস্থাটা বুঝতে পারছে বৈকি! বড় অসহায় হয়ে পড়েছেন নিশ্চয় মা, নইলে এ চিঠি কিছুতে লিখতেন না। বিশেষ ক'রে ঐ টাকার প্রস্তাবটা। এ যে কতখানি কারে পড়ে লিখতে হয়েছে তাঁকে! এক একটি টাকা তাঁর এক-একখানি বুকের পাঁজরা। সেই টাকা মাসে মাসে চারটে ক'রে বার করতে চেয়েছেন—এখন বেগ দিলে হয়ত পাঁচেও রাজী হ'তে পারেন—এ কী কম কথা!

না হয় ডাক্তারবাবুকে লোক দেখতে ব'লে,একটু সময় দিয়ে চলেই যাবে। মেয়েটার লোকসান হবে, তা হোক। এখন তো সীতা লিখেছে—ওর সতীনপোদের সংসারেই একসঙ্গে খাচ্ছে পরছে,—শুধু হাতখরচা আর ছেলেটার জন্যে—তা যেমন ক'রে হোক ঐ চার টাকাতেই চালিয়ে নেবে না হয়।

কিন্তু ডাক্তারবাবু? ডাক্তারবাবু কি ছাড়তে চাইবেন? উনি যা করছেন তা কোন নিকট-আত্মীয়ও করে না। মাইনে ছাড়াও সীতার টাকা প্রতি মাসে দিয়ে যাচ্ছেন, চাইতে বা মনে করাতে হয় না। শুধু তাই নয়—এখানে সে রাজার হালে আছে। সে-ই যেন কর্ত্রী, ডাক্তারবাবু ওর কর্মচারী, তিনিই সর্বদা জোড়হস্তে থাকেন যেন, ভয়ে ভয়ে। এ সুখ কোথায় পাবে সে? স্বামীর ঘরেও শ্বশুর-শাশুড়ী জা-ননদ থাকলে এত স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। এর মধ্যে ভদ্রলোক ওষুধ আনতে কলকাতা গিয়েছিলেন—ওর জন্যে একখানা তসরের থানধুতি আর একটা সরু হার, ঘষা গোট, কিনে এনেছেন। প্রথমটা চমকে উঠেছিল ঐন্দ্রিলা, কিছুতেই নিতে চায় নি—মনে মনে কেমন যেন একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল ওর মনে—কিন্তু ডাক্তারবাবুই সব শঙ্কার কারণ দূর করে দিয়েছেন। বলেছেন, 'তুমি এর জন্যে এত "কিন্তু" হচ্ছ কেন? সুতীর কাপড় পরে সন্ধ্যে-আহ্নিক করো, সেইজন্যেই ওটা আনা। পুরানো লোককে তো দিতে হয় এসব। আর হার—বলে সন্তানের মাকে শুধু গলায় জল খেতে নেই, তাই। তা ওটা ইচ্ছে না হয় নিও না। যাকে হোক দিয়ে দেব। কিন্তু মনে করো না যে ঘুষ দিয়ে তোমার পালাবার পথ বন্ধ করছি। তোমার কোন বাধ্যবাধকতা রইল তাও ভেবো না। প্রতিবারই কলকাতায় গেলে মেয়েটাকে কিছু না কিছু কিনে দিই—তা এবার তো ওর সঙ্গে দেখাও করি নি—সেই পয়সাতেই কিনে এনেছি। এমন কিছু বেশী খরচা করি নি তোমার জন্যে—'

এর পর নিতে হয়েছে জিনিসগুলো। অথবা বলা যায় বিবেককে শান্ত ক'রেও নিতে পেরেছে। ওর মতো দুঃখীর এমন সব জিনিস স্বপ্নে-দেখা দুরাশার ধন—ছাড়াও মুশকিল বৈকি!

তবু বলেছে যে, 'দেখুন দিকি—কী বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার হয়ে গেল আমার জন্যে, আপনাদের বাপবেটির মধ্যে—'

হেসে উঠেছেন অমরবাবু, 'শুধু একটা বেটি কেন গো, বেটাবেটিরা সবাই পর হয়ে গেল। কেউ তো আর চিঠি দেয় না।......কিন্তু তার জন্যে তুমি লজ্জা পেয়ো না—এ ভালই হ'ল, ভগবান যে এত সহজে পিছটানটা কাটিয়ে দিলেন—এই মঙ্গল। মিছিমিছি মায়ায় বন্ধ হয়ে ছিলুম বই তো নয়। ভগবানই দেখিয়ে দিলেন, সন্তানের স্নেহ কৃতজ্ঞতা কী ঠুনকো জিনিস—কত সহজে অকারণে ভেঙ্গে যায়।...

যাক্, ও নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই, তারা তো ছেড়েছেই, আবার তার জন্যে তুমিও ছেড়ে যেয়ো না। তাহলে আমার সেই যাকে বলে—'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।'

আবারও হা-হা করে হেসেছেন অমরবাবু।

ও'র কথা বলার ধরনই এই, ভাল করেই চিনেছে ঐন্দ্রিলা। এর মধ্যে কোন গূঢ়ার্থ নেই। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোনদিন কোন-মুহূর্তে এতটুকু অশোভনতা বা কোন মন্দ অভিপ্রায় দেখে নি ও'র মধ্যে; নির্মল চরিত্র, দেবতুল্য বললে ছোট করা হয়—দেবতাদের চেয়েও নির্মল। নদীর জলের মতোই—কোথাও কোন ময়লা নেই।

এ লোককে ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করে না। সত্যিই, আবার সেই অর্ধেক দিন উপবাস শুরু হবে। এমনিতেই তো উনি ঠাট্টা ক'রে বলেন যখন তখন, 'যেটুকু ক'রে-কম্মে নেবার অব্যেস ছিল সেটুকুও তো চলে গেল। এরপর যেদিন চলে যাবে—ঠায় উপোস ক'রে শুকিয়ে মরতে হবে—নয়তো মঙ্গলা ভরসা। তা ও বেটী যা নোংরা, হাতে জল খেতেও ইচ্ছে করে না। বড্ড আয়েস ধরিয়ে দিচ্ছ তুমি!'

কিন্তু সে যতই হোক, ও ধারেও মা বোন ভাই। তাদের ওপরও কি একটা কর্তব্য নেই? ডাক্তারবাবুর কথাই আবার মনে আসে, 'বাপমার ঋণটা কি সোজা জিনিস? অনেক ভাগ্য থাকলে তবে মানুষ বাপমায়ের সেবা করতে পারে, খানিকটা ঋণ শোধ করতে পারে। রাম বাপের জন্যে কী না ত্যাগ করলেন, কৈ, অন্যায় জেনেও তো প্রতিবাদ করেন নি। এগুলো লেখা হয়েছে মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্যেই। আর আমার ছেলেমেয়েরা—খুব শিক্ষা পেয়েছে সব! খুব শিক্ষা দিয়েছি!...'

কী করবে সে, কী করা উচিত? নিজেকে সহস্রবার জিজ্ঞাসা করেও কোন সদুত্তর পায় না ঐন্দ্রিলা, খুঁজে পায় না গ্রহণযোগ্য কোন পথ। কঠিন দোটানায় পড়ে ছট্‌ফট্ করে শুধু মনে মনে।

অবশেষে, সেই দ্বিধা ও ভিন্নমুখী আবর্তের মধ্যে অনবরত ক্লিষ্ট হ'তে হ'তে, সেই অবশিষ্ট সারাদিন ও সারারাত অতন্দ্র কাটাবার পর, পরদিন সকালে হঠাৎ এক-সময় স্থির ক'রে ফেলল ঐন্দ্রিলা। ডাক্তারবাবুকেই বলবে সে, তাঁরই মতামত জিজ্ঞাসা করবে। আশ্চর্য, এই সহজ কথাটা এতক্ষণে মনে আসে নি কেন! নিজের স্বার্থের জন্য তাকে অসৎ পরামর্শ দেবেন বা কর্তব্যভ্রষ্ট করতে চাইবেন সে লোকই নন। যা উচিত, যা তার করা দরকার—সেই কথাটাই নিশ্চয় তিনি বলবেন।

সে সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে চিঠিখানা নিয়ে গিয়ে কাছে দাঁড়াল।

'কী চাই গো—হঠাৎ আমার ডাক্তারখানায়? ওষুধ দিতে হবে?'

জিজ্ঞাসু সহাস্য দৃষ্টিতে চান ওর মুখের দিকে।

'হ্যাঁ, ওষুধই একরকম। এই চিঠিটা পড়ে দেখুন, তারপর বাত্‌লান কী করব আমি।'

চিঠি দেখেই ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল, পড়তে পড়তে গম্ভীর হয়ে গেলেন অমরবাবু। চিঠি শেষ ক'রেও অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন বাইরের তৃণশূন্য মাঠের দিকে চেয়ে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'তাহ'লে তো যেতে হয় তোমাকে?'

'কী করব বলুন। আমি কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছি না বলেই তো আপ-নাকে জিজ্ঞাসা করতে এলুম।'

'যাওয়াই তো উচিত। মা যে রকম চিঠি লিখেছেন তোমায়—খুবই বিপন্ন মনে হচ্ছে। মা যাই করুন, মা মা-ই—মায়ের বিপদে যথাসাধ্য করাই সন্তানের উচিত।......তোমার মুখে যা শুনেছি, কিপ্পন মানুষ, ঝাঁ ক'রে টাকার লোভ দেখিয়ে—

ছেন যখন—তখন খুবই আতান্তর অবস্থা...তুমি কাল-পরশুই চলে যাও।'

'না না, কাল পরশু যাব কি!' কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলে ঐন্দ্রিলা, 'আপনি লোকজন দেখুন, আপনাকেই বা এই আতান্তরে ফেলে যাব কী ক'রে?'

'লোকজন!' হাসলেন ডাক্তারবাবু, 'এই বনদেশে লোকজন পাব কোথায়, খুঁজবে কে? নিহাৎ কদিনের সুখভোগ কপালে লেখা ছিল তাই সে ছোকরার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গিয়েছিল—আর তুমিও অমনি দৈন্য-দশায় পড়েছিলে, নইলে তুমিই কি আসতে নাকি? ওসব ছেড়ে দাও, আমার নতুন লোক পাবার আশায় থাকতে গেলে এ জন্মে আর তোমার যাওয়া হবে না।...তুমি তোমার সুবিধামতো চলে যাও। অক্রূরকে সঙ্গে দিচ্ছি, কোলাঘাট পর্যন্ত গিয়ে তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে'খন।'

'উঁহু'—ঐন্দ্রিলাও দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'আপনার কোন সুব্যবস্থা না হ'লে আমি যাব না। সে মার যা-ই হোক!'

'এই দ্যাখো পাগল! আমি যেমন খাচ্ছিলুম তেমনি খাবো—না হয় শেষ অবধি মঙ্গলাই যা পারে ফুটিয়ে দেবে।...আর ওখানে যদি অন্য কোন ব্যবস্থা হয়, তোমার ভায়ের বিয়েই যদি হয়ে যায় এর মধ্যে—তুমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসো। একদিনও সেখানে বেশী থাকতে হবে না। আর তোমার মা পাঠান ভালই, আমি যদ্দিন আছি —সীতার দশটা টাকা বন্ধ হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।'

শেষের দিকে ডাক্তারবাবুর গলাটা কি কেঁপে যায় একটু? না—ওটা ঐন্দ্রিলার শোনবারই দোষ?

কিন্তু অকস্মাৎ—এতদিন পরে ঐন্দ্রিলার দু চোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে আসে। এ ভাবে যে কোন অপরিচিত—ওদের ভাষায় নিষ্পর—মানুষের জন্যে ওর চোখে জল আসা সম্ভব, তা-ই কে ভাবতে পেরেছিল। নিজের দুর্বলতায় নিজেই যেন লজ্জিত হয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে এল সেখান থেকে। আর সারাদিন ধরে বার বার এই কথাটাই মনে হ'তে লাগল—এই দেবতার মতো মানুষটাকে এমন আতান্তরে ফেলে যাওয়াটাই কি তার উচিত হচ্ছে? মার তবু আরও অনেক আপনার লোক আছে—এর যে কেউ নেই। তার জন্যেই যে সবাই ত্যাগ করেছে একে!

সারাদিন ধরে তবু এটা ওটা গুছোতে হয়। মঙ্গলাকে ডেকে ভাঁড়ারে কোথায় কি থাকে বুঝিয়ে দেয়। মঙ্গলা তো কেঁদেই আকুল, 'ওগো বামুনদি, তুমি গেলে বাবুর আমার খাওয়া-দাওয়া কিচ্ছু হবে নি, বাবুকে আর বাঁচাতে পারব নি।'

ঐন্দ্রিলা তাকে ধমক দেয়, 'আ মর্ মাগী, তা বলে আমি বাপের বাড়ি যেতে পাবো না? মার কন্না করতে পারব না! তুই—তোরা আছিস কী করতে? একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে চানটান ক'রে এসে সব গুছিয়ে দিবি—বুঝলি? একটু চালিয়ে নিবি—যদ্দিন না আমি ফিরি!'

'ও, তুমি আবার আসবে তা হ'লে! তাই বলো। ধড়ে পেরানটা এল তবু। সে আমি যতটা যা পারব ক'রে দুবো। তার জন্যে ভেবো নি।'

মঙ্গলা কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ মোছে।...

বোধহয় দুপুরে ঘুম হয় নি বলেই বিকেলের দিকে মাথাটা ধরেছিল। সন্ধ্যার সময় রান্না করতে করতে খুব যন্ত্রণা হ'তে লাগল। ডাক্তার সেদিন একটু সকাল সকাল এসেছিলেন—বোধহয় পরের দিন ঐন্দ্রিলা চলে যাবে বলেই—সকাল [illegible] তাঁকে খাইয়ে হেঁশেল সেরে নিল ঐন্দ্রিলা। তারপর বাইরের রকে ডাক্তারবাবুরই বেঞ্চির এক পাশে এসে বসল।

'এরই মধ্যে চলে এলে—তুমি খেলে না?'

'না, মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে—মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। আজ আর খেতে পারব না কিছু। একটু ঠাণ্ডায় বসে যদি কমে—গিয়ে শুয়ে পড়ব।'

'কেন—হঠাৎ এত মাথার যন্ত্রণা? জ্বরটর আসছে না তো?' ডাক্তারবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, 'কই, নাড়িটা দেখি।'

'না না। জ্বরটর নয়। বোধহয় দুপুরে একটু গড়ানো হয় নি বলেই—মঙ্গলাকে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিচ্ছিলুম কিনা, কোথায় কি থাকে!'

একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসে সে।

'কী আশ্চর্য! কেন, ও কি খুঁজে-পেতে নিতে পারত না! না না, কাজটা ভাল করো নি। তোমার যখন ঘুমনো অভ্যেস।...তা এতক্ষণই বা বলো নি কেন, আজকাল মাথা-ধরার খুব ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়েছে যে, একটা বড়ি খেলে কখন ছেড়ে যেত।. দাঁড়াও, একটা বার করে দিই—'

তিনি উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু ঘরে যাবার আগেই—'উঃ, মাগো—মা!' বলে বেঞ্চি থেকে উঠতে গিয়ে যেন হুমড়ি খেয়ে মেজেতে পড়ে গেল ঐন্দ্রিলা।

'কী হ'ল কী হ'ল—ওরে ও মঙ্গলা—', বলতে বলতে ডাক্তারবাবু উঠে বসাতে গেলেন, বসানো গেল না, মাথাটা কেমন নড়নড় করতে লাগল। অগত্যা সেইখানেই শুইয়ে রেখে ছুটে গিয়ে আলোটা নিয়ে এলেন ঘর থেকে—দেখলেন এর মধ্যেই কখন ওর নাক মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত বেরিয়েছে, ওর কোন জ্ঞানও নেই, অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

ডাক্তারবাবু পাগলের মতো মঙ্গলা আর অক্রূরকে ডাকতে লাগলেন।

'ইস্—এ যে—তাইতো। ওরে মঙ্গলা, ও অক্রূর, শিগগির আয় বাবা!'

॥ ৩ ॥

বাঁচবার নাকি কথা নয়,—বাঁচলেও একটা অঙ্গ পড়ে যাবার কথা, কিংবা কথাবার্তা জড়িয়ে যাবার কথা—ডাক্তার যা বললেন। এ রোগে যা হোক একটা গুরুতর ক্ষতি হয়—যদি বা রোগী বেঁচে ওঠে। নিহাৎ ওর বাপমায়ের আশীর্বাদের জোর, অথবা আরও বহু দুঃখভোগ অদৃষ্টে আছে—ঐন্দ্রিলার তাই ধারণা—তাই এমনভাবে গোটা দেহটা সুদ্ধ বেঁচে উঠতে পেরেছে। কিংবা, ডাক্তারবাবু আরও বললেন, খুব খেটে খাওয়া দেহ, ছেলেবেলা থেকেই নিদারুণ পরিশ্রম করেছে বলে দেহটা টন্‌কো আছে—কিছুতেই কাবু করতে পারে নি, স্নায়ুগুলো প্রাণপণে লড়াই ক'রে ঠেলে উঠেছে আবার—ওকেও তুলেছে।

তা ভুগেছেও নাকি অনেকদিন। মঙ্গলার হিসেবে প্রায় একমাস। ডাক্তারবাবু বললেন, পাঁচ সপ্তাহেরও বেশী। ঐন্দ্রিলার এ সব কোন হিসেবই ছিল না। কিছুই বুঝতে পারে নি সে। সেদিনকার সেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার পর থেকে আর কোন হুঁশ নেই। যেদিন প্রথম ভাল ক'রে জ্ঞান হ'ল, ভাল ক'রে চোখ মেলে দেখতে এবং সবাইকে চিনতে পারল, সেদিন মনে হ'ল যেন সদ্য ঘুম থেকে জেগে উঠল সে। তবে বোধহয় একটু অসাধারণ রকমের ঘুম, বহুক্ষণব্যাপী গাঢ় সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠলে যেমন হয় তেমনি।...মনে হ'ল, বাবা, কতবেলা অবধি ঘুমিয়েছে সে, বাইরের দিকে চাইতেই চোখে পড়ল ঝলমল করছে রোদ জানালার পাশের বড় সজনে গাছটায় —সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসতে গেল তাড়াতাড়ি। কিন্তু ওঠা গেল না, ভালরকম

চেষ্টা করবার আগেই ডাক্তারবাবু জোর করে ওর দুটো কাঁধ চেপে ধরে শুইয়ে দিলেন আবার। বললেন, 'উঁহু উঁহু, উঠে বসতে এখনও ঢের দেরি, তার আগে এখন অন্তত আরও এক মাস শুয়ে থাকো, শুয়ে শুয়েই খাও—তারপর ভেবে দেখা যাবে!'

প্রথমটা যারপরনাই বিস্মিত—পরে একটু বিরক্তও হ'ল ঐন্দ্রিলা। এ আবার কী—ফট্ ক'রে গায়ে হাত দেওয়া!......তারপর আরও বিস্মিত হ'ল এই দেখে যে, ঐটুকু ওঠবার চেষ্টা করতেই যেন মাথার মধ্যে ঝিমঝিম ক'রে উঠল, সমস্ত শরীর ঝিন্‌ঝিন্ ক'রে ঘেমে উঠল দেখতে দেখতে।...অনেকক্ষণ চোখ বুজে থেকে ব্যাপারটা ভাববার চেষ্টা করল। তারপর আবার আস্তে আস্তে যখন চোখ খুলল তখন দেখল, ডাক্তারবাবু মুচকি হাসছেন তার দিকে চেয়ে। গা জ্বালা ক'রে ওঠবারই কথা—লোকটার সকাল থেকে এই অসভ্য চালচলন দেখে, জ্বালা ক'রে উঠেও ছিল প্রথমে —কিন্তু তারপরই যেন আব্‌ছা আব্‌ছা মনে পড়ল কথাটা। মনে পড়ল সেই অসহ্য মাথার যন্ত্রণা আগের রাত্রের; মনে পড়ল সেই উঠতে গিয়ে যেন কী একটা—তারপর আর কিছু মনে নেই। তাহলে বোধহয় সে তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল, এঁরা ধরাধরি ক'রে এনে শুইয়ে দিয়েছেন। সেইজন্যেই বোধহয় এতবেলা অবধি ঘুমিয়েছে সে। কিন্তু—আর একটু ভাল ক'রে চেয়ে দেখে চিনতে পারল—এটা যে ডাক্তারবাবুর ঘর! এ ঘরে, এ বিছানায় কেন সে?...ও মা, কী মনে করবে লোকে দেখলে!......

সে আবারও ধড়মড় ক'রে উঠে বসতে গেল, পারল না। আবারও সেই মাথা-ঝিমঝিম-করা, সর্বাঙ্গ-গুলিয়ে-ওঠা ভাবটা।

ডাক্তারবাবু কঠিন কণ্ঠে ধমক দিয়ে ওঠেন, 'ও কী হচ্ছে কি?......অনেক কাণ্ড ক'রে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে—সে সব পরিশ্রম কি পণ্ড করতে চাও? মরবার এত শখ কেন? এখন মুখটি বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকো কিছুদিন—যদি বেঁচে থেকে আবার মেয়ে-নাতিকে দেখতে চাও!'

যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে!

সে কি!

তবে কি সে অনেকদিন ধরে ভুগছে? এমনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে বহুদিন? কতদিন তার এমন চলছে?...বহু প্রশ্ন একসঙ্গে যেন মনের মধ্যে ঠেলাঠেলি ক'রে উঠল—কিন্তু বলতে পারল না। কথা কইতেও যেন কষ্ট হচ্ছে।

এইবার মনে হ'ল—আবার চোখ মেলে দেখে—ডাক্তারবাবু যেন ইতিমধ্যে খুব রোগা হয়ে গেছেন। একরাত্রে বা দুরাত্রে তো এমন হ'তে পারে না। সত্যিই তো। তাহ'লে অনেকদিন ধরেই ভুগেছে নিশ্চয়। আশ্চর্য, কী এমন রোগ হয়েছিল তার?...

মঙ্গলা এগিয়ে এল বিছানার কাছে।

'এই যে. বামুনদির হুঁশ হয়েছে দেখছি।...বাব্‌বা কী কাণ্ডটাই না করলে বাপু. চৌধুড়ি মাত্ দেখিয়ে দিলে একেবারে।...খুব বরাতজোর আর বাপমার পুণ্যির জোর—তাই আমাদের বাবুর এখানে এটা হ'ল—অপর জায়গায় হ'লে আর বাঁচতে হ'ত না। সাক্ষেৎ যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে বাবু—টানাটানি করেছে দিবে-রাত্র, যম একদিকে আর বাবু একদিকে। আহার নিদ্রা কি ছিল এই কদিন? পর পর ঠায় বসে রাত জেগেছে অমন পনেরো দিন। দিনে ঘুম নেই রাতে ঘুম নেই—খাওয়াদাওয়া সে তো ধরো চুলোর দোরে গেছেই—মানুষটা বোধহয় সন্ধে-আহ্নিক করতেও তোমার শেযের ধার ছেড়ে ওঠে নি—'

'আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে!' ধমক দিয়ে ওঠেন ডাক্তারবাবু, 'ওকে খেতে দিতে হবে এই সময়—বলে রেখেছি না!...যা যা, নেবুর রস নিয়ে আয়।'

'দুবো। দুবো।...খেতে তো দুবোই।...না তাই বলতিছি—যা করলে, মানুষে পারে নি বাবু, হক্ কথা যা বলব—এমন সেবা মানুষে করতে পারে—!'

মঙ্গলা বকতে বকতেই চলে যায়।

আবারও যেন মাথাটার মধ্যে কেমন করে ওঠে ঐন্দ্রিলার।

এমন শক্ত অসুখ হয়েছিল তার? এত কঠিন?...কী অসুখ?—ডাক্তারবাবু দিন-রাত জেগে সেবা করেছিলেন?...ইস!...যতই হোক—পুরুষমানুষ, মেয়েদের সেবা করবেন কী ক'রে।—বিশেষ এমন অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থা, যখন নিজের কোন কাজই নিজের করবার ক্ষমতা থাকে না!

যেন ওর মনের কথা টের পেয়েই ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন, 'বাঁচিয়েছে আসলে ও-ই, আমি আর কি করতে পেরেছি, সময়মতো ওষুধ-ইঞ্জেকশন দেওয়া আর বসে থাকা, মাঝে মাঝে নাড়ি দেখা, এই তো! আসল সেবা যেটা—সেটা তো ওকেই করতে হয়েছে। এই ঘরেই শুতে বলেছিলুম, রাত্রেও যে কতবার উঠতে হয়েছে ওকে, তার কি ঠিক আছে!'

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে আস্তে আস্তে। তবুও কতকটা রক্ষা। নইলে—নইলে সে এরপর লোকের কাছে মুখ দেখাত কী করে!...

এবার ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করল ঐন্দ্রিলা, 'আমার মেয়েকে কেন খবর দেন নি?... কিম্বা মাকে—?'

'ইচ্ছে করেই দিই নি। মেয়ে তো তোমার শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আসতেই চায় না। তার ক্ষতি হতে পারে তাতে—এই তো তার ভয়, হয়ত একবার ছেড়ে এলে আর কখনও ঢুকতেই পাবে না সেখানে। সে ক্ষেত্রে তাকে খবর দিয়ে আনানো কি ভাল হ'ত? তারপর এই দুর্গম-পথ, তাকে আসতে হলে চার-পাঁচবার গাড়ি বদলাতে হবে—কে আনবে সঙ্গে করে, কার সঙ্গে আসবে—সে সব প্রশ্নও তো আছে। যদি আসতে না পারে, খবরের জন্যে ছটফট করবে, কান্নাকাটি করবে, মিছিমিছি সেই এক আতান্তর। কী লাভ তাকে খবর দিয়ে বলো?··তবে তেমন তেমন বুঝলে খবর দিতুম বৈকি. সে ঝুঁকি কি নিজের ঘাড়ে রাখতুম! কিন্তু আর কথা নয়—একেবারে মুখ বুজে ফেলো। মঙ্গলা ফলের রস করে আনছে, লক্ষ্মী মেয়ের মতো খেয়ে নাও, আর যতটা পারো ঘুমোও। যা দরকার ওরেই বলবে, কাপড়-চোপড় ছাড়তে হ'লে ও-ই ছাড়াবে; যা করতে হবে ওকে বলো। তবে তোমার নিজের কিছু করা চলবে না। একটিও কথা কইবে না, উঠবে না। এখনও অনেকদিন এমনি শুয়ে থাকতে হবে।'...

দীর্ঘকাল সময় লাগল উঠে বসতেই। এত দুর্বল যে হাত-পা নাড়তেই যেন ক্লান্তি বোধ হয়। শুনল যে মঙ্গলার এক বোনঝিকে আনানো হয়েছিল পরের দিনই। সে-ই রান্নাবান্না করেছে, এ কদিন তো মঙ্গলাও ওদিকে যেতে পারে নি। ডাক্তারবাবুকেও তার হাতে খেতে হয়েছে। অবশ্য, উনি বলেন নাচারে দোষ নেই, হাসপাতালে গেলে কার ছোঁওয়া না খেতে হয়, তাতে কি আর কারও জাত যায়!

সে বোনঝি এখনও আছে। সে-ই রাঁধছে, কাজকর্মও করছিল সব, মঙ্গলা তো দিনরাত ওর ঘরেই থাকত বলতে গেলে—এই তো সবে কদিন একটু-আধটু ওদিকে যেতে পারছে। তবে রাত যা জাগবার ডাক্তারবাবুই জেগেছেন, কিছু দরকার হলে ওকে ডেকে দিয়েছেন মধ্যে মধ্যে। ওকে কাছে রাখা—মঙ্গলা গলাটা নামিয়ে চুপি চুপি বললে,—'নিহাৎ একা মেয়েছেলের ঘরে থাকলে খারাপ দেখায় বলেই। তা ধরো মানুষটার বিবেচনা তো চারদিকেই! সবদিকে নজর।'

মঙ্গলা বলে, 'এমন সেবা আর এমন চিকিচ্ছে কেউ কখনও দেখে নি বামুনদি।

যমরাজও ছাড়বে নি আর ইনিও নিয়ে যেতে দেবেন নি। তোমার জীবন বাবু, চিরদিনের তরে কিনে নিয়েছে।...যাকে বলে মরা মানুষ ফিইরে আনা—তাই। অন্য লোক ডাকে নি, সদর থেকে—কি সব বলে ধাই না কি—আনাতে পারত, তাও আনায় নি। বলে, তাতে নানান কথা উঠবে। আমার আর কি, ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয় —ও ভদ্দলোকের মেয়ে কি শেষে আমার উপকার করতে এসে বদ্‌নাম কিনবে? সে আমি পারব নি।...তা করেছেও বটে। একাই তো সব করলে গো, এই বয়েসে এত খাট্‌নি কাউকে খাটতে দেখি নি। আমি তো শুধু নিতান্ত সকাল-বিকেলের দরকার-গুলো, সরা দেবার কাজটা করেছি। আর যা করেছে উনিই করেছে। তা একটুকু বিরক্তি ছিল না বাপু, হাসিমুখে সব করেছে। সঙ্গে সঙ্গে কত কি ঠাট্টা-তামাশা।... বলে, তোর বামুনদির তো এত মেজাজ, এত কথা—তোরা তটস্থ থাকতিস দিনরাত, ভয়ে ভয়ে জীবন যেতো—তা এখন তো তোর হাতে উনি, দেনা এবার খুব ক'রে দুটো অন্তর-টিপুনি, জব্দ হয়ে যাবে।...বলে আর হাসে।...এই খাট্‌নি, কিন্তু তার জন্যে নিত্যিকারের কাজ তো একদিনও বন্ধ নেই গো। সাতখানা গাঁয়ের রুগী দেখা তো সমানে চলেছে। তবে হ্যাঁ—ঘোরাঘুরি করতে পারত নি, যা হ'ত এখানে বসেই।... তবু, নিত্যি পঁচিশ তিরিশটা করে রুগী দেখা—তার ওপর ঘরে তুমি বেঁহুশ হয়ে পড়ে! এর ভেতর আবার বই পড়া আছে, তোমার জন্যে কত মোটা মোটা বই ঘেঁটেছে কদিন—বয়ের পাহাড় জমে গিছল। কী খাট্‌নিটাই না খেটেছে কদিন। চেহারা দেখ্‌তেছ না, আধখানা হয়ে গেছে একেবারে।'

খুবই দেখছে। যত দেখছে আর যত শুনছে তত যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে সেঁধিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে ঐন্দ্রিলার। ওর মতো একটা সামান্য মেয়েছেলের জন্যে কী না করেছেন ভদ্রলোক! নিজের ছেলেমেয়ের জন্যেও বোধহয় কেউ করে না এত! খুব বেশী দয়া হ'লে উনি নিয়ে গিয়ে কোলাঘাটের হাসপাতালে রেখে আসতে পারতেন। তাতেই কৃতজ্ঞ থাকত সে। যথেষ্ট করা হ'ল বলে মনে করত। ঝি-চাকরের জন্যে আর কীই বা করে লোকে। সে ভদ্রলোকের মেয়ে হ'তে পারে—কিন্তু রাঁধুনী-বামনীর কাজ করে যখন, তখন বিবেচনা আশাই বা করবে কেন? রাঁধুনী-বামনীকে লোকে ঝি-চাকরের সামিলই মনে করে। ওরই মধ্যে হয়ত একটু উঁচু। নিহাৎ জাতটা উঁচু বলেই সামান্য একটু তফাৎ ধরে। তবে সে সামান্যই। তাদের জন্যে কেউ পয়সা খরচ করে ডাক্তার দেখায় না। সেই যে উকীলবাবুর বাড়ি ছিল সে, যেখান থেকে চুরি করার জন্যে তার চাকরী গেল— সেখানে থাকতে খুব একবার সর্দি-কাশি হয়েছিল। কদিন কাশির জন্যে ঘুমই হয় নি তার। হয়ত সেই জন্যেই—মানে তার কাশির শব্দে তাঁদেরও কারও কারও ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছিল বলে—তার একটা চিকিৎসা করা দরকার মনে করে-ছিলেন তাঁরা। তা ক'রেও ছিলেন চিকিৎসার ব্যবস্থা। পাড়ার কী এক ক্লাবে এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সকালে বিনা পয়সায় রোগী দেখতেন ও ওষুধ দিতেন—সেই-খানেই পাঠিয়েছিলেন ওকে ঝি সঙ্গে দিয়ে। অবশ্য সে ওষুধে উপকারও হয়েছিল ওর। আর সেজন্য সে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাও বোধ করেছিল। সেইটুকু বিবেচনাই পর্যাপ্ত বলে মনে হয়েছিল।

কৃতজ্ঞ বোধ করার কারণও ছিল। অনেক দেখেছে সে। যতক্ষণ কাজের ক্ষমতা থাকে—ততক্ষণই মনিববাড়ির আদর—অসুখ করলে তাকে কোনমতে সরিয়ে দিয়ে নতুন লোক খোঁজাই সাধারণ রীতি। তার জন্যে ঝি-চাকররাও মনিবদের দোষ দেয় না।

মনিববাড়ির কথাই বা কি? যদি তার মার কাছে থাকতে অসুখ করত, মা কি ডাক্তার দেখাতেন? হয়ত হাসপাতালে দেবার উদ্যমটুকুও প্রকাশ করতেন না। কে-ই

বা অত করে? ঘরে পড়ে থেকে বেঘোরে প্রাণটা যেত। এ যা রোগ হয়েছিল তাতে হাসপাতালে গেলেও বাঁচত না হয়ত—এতকাণ্ড সেখানে কে করবে আর কেনই বা করবে—তবু তাতে সান্ত্বনা থাকত একটা। কিন্তু মার বাড়ি বা শ্বশুরবাড়ি এ রকম হ'লে সেটুকুও করত না কেউ।

না, মঙ্গলা ঠিকই বলেছে। তার জীবন—অবশিষ্ট জীবনটাকে কিনেই নিয়েছেন ডাক্তারবাবু। যমের কাছ থেকে কিনেই নিয়েছেন—নিজের ঐকান্তিকতার মূল্যে। তার তরফ থেকে সে যতই করুক এ ঋণ শোধ হবার নয়।......

কিন্তু কেন এত করলেন উনি? কেন এত করছেন! ঐন্দ্রিলা নিজেকে প্রশ্ন করে। প্রশ্নটা বারবার মনে এসে মনটাকে যেন কী একটা অজ্ঞাত কারণে আলোড়িত ক'রে দিয়ে যায় তার।

কীই বা তার দাম। কীই বা করেছে সে!

চিরকাল সর্বত্র শুনে এসেছে সে—শ্বশুরবাড়ির সেই স্বল্প-স্থায়ী কটি সৌভাগ্যের দিন ছাড়া যে—সে অবাঞ্ছিত, কোথাও তার স্থান নেই, তাকে কেউ চায় না। সে মুখরা, সে প্রখরা—সে দুর্ভাষিণী, সে দুর্ভাগিনী। যেখানে যায় শুধুই অভিশাপ আর অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায়। তাই সে চলে এলেই সকলে বাঁচে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আর তাদের সে মনোভাব যে একেবারে অকারণ, তা-ও বলতে পারে না। নিজের জ্বালা নিজেই যে অনুভব করে।...

সেই চির-অবাঞ্ছিত মানুষকে উনি কী যত্নই না করছেন।

তার জন্যই সন্তানরা পর হয়ে গেছে ও'র—হয়ত বা চিরকালের মতোই। মাতৃ-হারা সন্তান সব ও'র। তবু, যে এই অনভিপ্রেত অবস্থার জন্য দায়ী তাকেই গৃহিণী করে, সংসারের কর্ত্রী করে রেখে দিয়েছেন বাড়িতে। কিন্তু সেজন্য কোন কিছু অতিরিক্ত দাবী করেন নি। কোন ঘনিষ্ঠতা করতে চান নি। বরং যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রেখেই চলেছেন। স্নেহ করেছেন—তার পরিবর্তে কিন্তু স্নেহ আশা করেন নি। শুধু সামান্য সাধারণ যেটুকু, বাধ্যবাধকতার মধ্যে যা পড়ে—নিতান্তই যেটুকু মাইনে-করা দাসী-চাকরের করার কথা, তার বেশী আশাও করেন না, তার বেশী করেও নি কিছু ঐন্দ্রিলা। তার শিক্ষাদীক্ষা সংস্কার মতোই রান্নাবান্না করেছে, আর অবসর সময়ে—নিহাৎ অসহ্য হয়েছে বলেই এবং হাতে কোন কাজ থাকত না বলেই—ঘরদোর বিছানা-মাদুর ঝেড়ে মুছে একটু ভদ্রস্থ করেছে। এর জন্যেই উনি কী পর্যন্ত না খুশী হয়েছেন, কী পর্যন্ত না কৃতজ্ঞ বোধ করেছেন! সেই কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর উপহার দেওয়া পট্টবস্ত্রে, গলার হারে এবং সসম্ভ্রম ব্যবহারে।

কিন্তু ঐন্দ্রিলা জানে যে এর কোন কারণ নেই। সে এমন কিছু করে নি। এ ও'রই সৌজন্য। ও'রই ভদ্র মনের পরিচয়।...সে নিজে এ যত্ন এ বিবেচনার কিছুই—এক ভগ্নাংশ মাত্রও—দাবী করতে পারে না। বরং আগাগোড়া সে-ই কৃতজ্ঞ। অনেক-খানি স্বাধীনতা পেয়েছে সে এখানে এসে, অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য। এ অবাধ কর্তৃত্ব ওর কাছে অভিনব শুধু নয়—অপ্রত্যাশিত।...

তা হ'লে উনি এত করলেন কেন?...

সেই মূল প্রশ্নটা যে অমীমাংসিতই থেকে যায়। প্রশ্নটা করে নিজেকেই, ক'রেই যায় বারবার, কিন্তু তবু উত্তরটা খুব বেশী খুঁজতেও যেন সাহস হয় না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে, বুকের মধ্যে কাঁপন লাগে একটা...

তবু ঘুরে ফিরে মনটা সেই প্রশ্নেই ফিরে যায়।

সম্ভাব্য উত্তরটাও সে এড়াতে পারে না বেশী দিন।

তবে কি, তবে কি—

তবে কি ও'র আত্মীয়দের, ও'র ছেলেমেয়েদের সন্দেহ একেবারে ভিত্তিহীন—একেবারে অমূলক নয়? কোথায় একটা অদৃশ্য এবং ওদের কাছে অজ্ঞাত কারণ ছিল সন্দেহের, যে সম্বন্ধে ওরা সচেতন না হ'লেও অপরের সন্দেহ গড়ে ওঠবার মতো কিছু ভিত্তি ছিল?...

আচ্ছা—যদিই তাই হয়—এক সময় মরীয়া হয়েই বোঝায় নিজেকে ঐন্দ্রিলা, যদি তাই হয়, ক্ষতি কি? ঋণ শোধ করার সুযোগ সে ছাড়বে কেন? ঋণ শোধ করাই তো কর্তব্য। যে প্রাণ উনি কিনে নিয়েছেন, বলতে গেলে হাতে ক'রে উপহার দিয়েছেন তাকে—সে প্রাণ এবং প্রাণের আধার এই দেহটাতে তো ও'র সম্পূর্ণই অধিকার। সে তো একভাবে দেখতে গেলে ও'র ক্রীতদাসীই। ক্রীতদাসীর স্বাধীনতা কি আত্মরক্ষা করার?

তাছাড়া কীইবা এমন দায়-দায়িত্ব তার, কার কাছে? সমাজের ঋণ, ধর্মের ঋণ অনেক বহন করেছে সে, অনেকদিন ধরে অনেক দুঃসহ মূল্যে শোধ হয়েছে তা। আর কেন?

সুখী হবার অধিকার সকলকারই আছে—শুধু তার নেই?

না, অন্য কোন সুখ নয়। অন্য কোন সুখে আর তার প্রবৃত্তি নেই। সে প্রবৃত্তির উৎস পর্যন্ত শুকিয়ে গেয়ে বুঝি—কোন্‌কালে। এই মানুষটাকে এই দেবতার মতো পবিত্র, ভগবানের মতো দয়াময় মানুষটাকে সুখী করেই সুখী হ'তে চায় সে। এখন শুধু সেইটুকুই তার কাম্য।

এমন দেবতার পায়ে, তাঁর প্রীতিকামনায়, অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হ'তে পারলে জীবন ধন্য সার্থক হয়ে যাবে।

॥ ৪ ॥

কথাটা জিজ্ঞাসা করব করব ক'রেও জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। সঙ্কোচে বেধে ছিল। এই যে প্রায় দু-মাস ও বিছানায় পড়ে—এর মধ্যে কী সীতার টাকাটা পাঠাবার কথা মনে ছিল ও'র? থাকার কথা নয়, না থাকলে বিন্দুমাত্র দোষ দিতে পারে না ঐন্দ্রিলা, আর খরচও যে কী পরিমাণ হয়েছে বা হচ্ছে—জলের মতো—তা তো সে নিজের চোখেই দেখছে। এখন যা হচ্ছে তার পরিমাণ দেখেই, যা হয়েছিল তা অনুমান করতে পারে সে। এ ক্ষেত্রে সে টাকার কথা তোলাটাও অন্যায়। উনি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে হয়ত এর মধ্যেই ধার-কর্জ ক'রে কিছু পাঠাতে চেষ্টা করবেন—কিন্তু তাতে বিরত করেই তোলা হবে ও'কে। দু-হাত পেতে এত নেবার পরও এ প্রার্থনা জানানো অসঙ্গত শুধু নয়—নির্লজ্জও।

তবু চুপ ক'রেই বা থাকতে পারে কই!

ঘুরে ফিরে কেবলই কথাটা মনে পড়ে—কী হচ্ছে মেয়েটার কে জানে।...দু-মুঠো ভাতের অভাব বোধহয় হবে না। সে তারা দিচ্ছে হয়ত ঠিক, ওর সতীন-পোরা। তার কারণও আছে। ভূতের মতো খাটে সীতা তাদের সংসারে এক মিনিটও হাত-পায়ের বিশ্রাম নেই ওর। ছেলেটার দিকে চাইতেই সময় পায় না একটু। বিনা মাইনেয় এমন বিশ্বস্ত ও বিনীত বাঁদী আর কোথায় পাবে তারা।...সুতরাং খেতে

দেবে তারা—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু খেতেই দেবে, আর কোন খরচ দেবে না, সেটা ঐন্দ্রিলা ভাল করেই জানে। আর তার জন্যে পরোক্ষতঃ সে-ই দায়ী। সে নিয়মিত টাকা পাঠিয়ে পাঠিয়েই এই বিশ্বাসটা জন্মিয়ে দিয়েছে তাদের। তারা জেনে গেছে—বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গেছে তাদের যে—ওর মা যেমন ক'রেই হোক টাকা পাঠাবে, ধার দেনা ক'রে ভিক্ষে করে—যেভাবে পারুক। মাঝখান থেকে তারা যদি ঘর থেকে কিছু বার ক'রে দেয় তো সেটাই লোকসান, সে আর ফেরত পাবে না তারা।'

মেয়ের সেই অসহায় অবস্থার কথা ভাবতে ভাবতেই মাথা গরম হয়ে যায়। কিছুতেই যেন স্থির হ'তে পারে না। দুর্বল শরীরে এই অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা আরও অসহ্য লাগে, সারা শরীর যেন ঝিম্-ঝিম্ করে ওঠে কথাটা মনে পড়লেই।

শেষে একদিন আর থাকতে পারে না। পেড়েই ফেলে কথাটা। অসুখ থেকে সেরে জ্ঞান হবার পরও কেটে গেছে বেশ কটা দিন। উঠে হেঁটে বেড়াতে পারে ঐন্দ্রিলা। সে আর ডাক্তারবাবুর ঘরে থাকে না, জোর করেই নিজের ছোট ঘরে চলে এসেছে সে। মঙ্গলারও আর থাকবার দরকার হয় না, তাকেও ছুটি দিয়েছে। অর্থাৎ অনেকটা আবার আগের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে যেন।

সেদিনও খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের বেঞ্চে এসে বসেছিলেন ডাক্তারবাবু। ঐন্দ্রিলাও এসে কাছে বসল। আজকাল প্রতি রাত্রেই প্রায় এমনি বসে ওরা, একই বেঞ্চে বসে—তবে একটু ব্যবধান রেখে।

নানা গল্প চলে অন্য দিন। কিন্তু আজ ঐন্দ্রিলা প্রথম থেকেই নীরব। কী একটা বলবে বলেই যেন উশখুশ করছে। একটু পরে ডাক্তারবাবুও সেটা লক্ষ্য করলেন। স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কিছু কি বলবে? কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে চাও?'

ঐন্দ্রিলা মাথা হেঁট করে বেঞ্চির কাঠটা নখে খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'বলছিলুম কি, আমার কাছে কিছু টাকা ছিল, এখানে তো এক পয়সা খরচ নেই, মাইনের টাকা সবই তো জমেছে—তা তাই থেকে গোটা-কতক টাকা সীতাকে পাঠাব ভাবছি। একটা মনিঅর্ডার ক'রে দেবেন?'

যেন চমকে উঠলেন ডাক্তারবাবু। বললেন, 'কেন, তার বাড়তি টাকার দরকার কিছু জানিয়েছে? কৈ, চিঠি তো আসে নি এর মধ্যে—?'

'না, বাড়তি নয়। এমনি—এ দু-মাস তো বোধহয় পাঠানো হয় নি—তাই বলছিলুম।'

'কে বললে পাঠানো হয় নি। যেমন হয় তেমনই হয়েছে।...ওর টাকা পাঠাতে ভুলে যাব, ছেলেমানুষ, অমন অসহায় অবস্থায় আছে—! আমাকে এত কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাবলে কী ক'রে!'

হঠাৎ মনে হ'ল ঐন্দ্রিলার যে হেঁট হয়ে ওঁকে একটা প্রণাম করে। কিন্তু সম্ভবত অতিরিক্ত আবেগেই মাথাটা কেমন করছে আবার, হেঁট হ'তে সাহস হ'ল না। যদি সেদিনের মতো কিছু হয়? তাছাড়া লজ্জাও করতে লাগল। কখনও প্রণাম করে না—হঠাৎ এত ভক্তির বাড়াবাড়ি কেন—যদি জিজ্ঞাসা ক'রে বসেন।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল, সহসা কোন উত্তর যোগাল না তার। তারপর ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমার জন্যে এত টাকা খরচ হয়ে গেল আপনার—আবার ও টাকাটা পাঠাতে গেলেন কেন? আমার তো মাইনের টাকা ছিলই—'

'তা তো জানতুম না।...আর এত টাকাই যেখানে খরচ হয়েছে—অন্ততঃ তুমি তো তাই বলছ—সেখানে আর ওর কটা টাকাতে কী এমন ইতর-বিশেষ হবে বলো!'

বেশ সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই বলেন ডাক্তারবাবু।

কিন্তু ঐন্দ্রিলার চোখে বারবার যেন জল আসতে চায়। চুপ করে বসে অন্য দিকে চেয়ে থেকে প্রাণপণে সেই জলটাই সামলাবার চেষ্টা করে সে।

অনেকক্ষণ পরে—যেন বেশ একটু ঝোঁক দিয়েই আবার বলে ওঠে হঠাৎ, 'কাল থেকে আমিই রান্নাবান্না করব কিন্তু। ও মেয়েটিকে ছুটি দিয়ে দেব—মঙ্গলার ঐ বোনঝিকে, মিছিমিছি আর ওকে আটকে রাখার দরকার নেই!'

'সে কি?...না না, ও সব গোঁয়ার্তুমি করতে যেও না। শরীর তোমার তত মজবুত হ'তে এখনও ঢের দেরি। এর মধ্যে আগুন-তাতে যাওয়া তোমার চলবে না!'

ডাক্তারবাবু যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

'না না, শরীর আমার বেশ সেরেছে, আর বেশী সারাবার দরকার নেই। কতকাল আর বসে বসে খাব! অন্য জায়গা হ'লে কী করতুম? সে তো কবেই কাজে জুততে হ'ত। তাছাড়া খেটেই যখন খেতে হবে—তখন অভ্যেসটা খারাপ করে লাভ কি?' গলায় অস্বাভাবিক জোর দেয় ঐন্দ্রিলা।

'না না—ও সব কী বলছ! পাগলামি করছ কেন?' মৃদু ধমক দিয়ে ওঠেন ডাক্তারবাবু, 'আমার খরচটা ঐভাবে গতরে খেটে উশুল করতে চাও বুঝি?.....তারপর? আবার যদি পড়ো তখন—? সবই তো বাজে খরচ হবে! সে তো আরও এক গাদা টাকা খরচ!'

'এবার হ'লে আমাকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে রেখে আসবেন।'

ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ নিরুত্তর থাকেন। তার পর—যা কখনও করেন না, আজ পর্যন্ত যা করেন নি—তাই করে বসেন। বাঁ হাতটা বাড়িয়ে বেঞ্চিতে রাখা ঐন্দ্রিলার একখানা হাতের ওপর রেখে বলেন, 'হাসপাতালে দিয়ে আসব বলেই কি এত কাণ্ড করে তোমাকে বাঁচালুম ঐন্দ্রিলা?...হাসপাতালে গেলে বাঁচতেও না—এটা ঠিক।... আবার যদি পড়ো—এখানেও বাঁচাতে পারব কিনা সন্দেহ!'

সে স্পর্শে শিউরে কেঁপে ওঠে ঐন্দ্রিলা—এই বয়সেও। দীর্ঘদিনের অনভ্যাস তার, বহু দিনের অপরিচয় এ স্পর্শের সঙ্গে—তবু সমস্ত দেহের রক্ত উদ্বেল হয়ে ওঠে যেন। কিন্তু সে হাত সরিয়েও নেয় না, শুধু পূর্ববৎ গাঢ়কণ্ঠে বলে, 'কেন আমাকে এত করে বাঁচাতে গেলেন, এত খরচ করলেন কেন আমার জন্যে? আমার জীবনের কী দাম!—কারও কাছে কানাকড়িরও তো দাম নেই! কী সুখ ভোগ করতেই বা বাঁচালেন! সেই অজ্ঞান অবস্থায় শেষ হয়ে যেতুম, সে-ই তো ভাল ছিল।'

ডাক্তারবাবু ওর হাতখানার ওপর যেন সন্তর্পণে—খুব মৃদু একটা চাপ দিয়ে বললেন, 'এমন কোন মানুষ আজও জন্মায় নি ঐন্দ্রিলা যার প্রাণের মূল্য এ পৃথিবীতে কারও কাছে নেই! প্রতিটি মানুষ—তা সে যে দেশে যে ঘরেই জন্ম নিক্ না কেন—যখনই জন্মায় তখনই তার জন্যে এমন মানুষও কাউকে না কাউকে ভগবান পাঠান—যে তার জন্যে উদ্বিগ্ন হবে, চিন্তিত হবে—চাইবে যে এ বেঁচে থাক দীর্ঘদিন।... কারও না কারও কাছে প্রাণের দাম থাকেই—প্রত্যেকটি লোকের!'

কে জানে সব কথা বুঝল কি না ঐন্দ্রিলা—তবে ওঁর বলবার সেই শান্ত সংযত ভঙ্গিতে ওঁর সেই মৃদু অর্ধ-স্বগত কণ্ঠস্বরে—ওঁর আন্তরিকতাটা তার অনুভূতির অগোচর রইল না। সেও আস্তে আস্তে বলল, 'তবু—মরতে তো একদিন হবেই—না হয় আপনার মতো দেবতার পায়েই মরতুম!'

একটু কি শিউরে উঠলেন ডাক্তারবাবু?

সামান্য একটুখানি?

অন্তত ঐন্দ্রিলার তাই যেন মনে হ'ল। কিন্তু তিনি একটু হেসে কথাটাকে লঘু ক'রে দেবারই চেষ্টা করলেন, 'বাঃ, বেশ লোক তো!...আমাকে ফাঁকি দিয়ে, আমাকে রেখে এই বয়সে পালিয়ে যেতে চাও?...তুমি চলে যাবে আর আমরা— বুড়ো হাবড়ারা বেঁচে থাকব?'

তারপর একটু থেমে কেমন যেন এক রকমের বিকৃত কণ্ঠে বললেন, 'না না— দ্যাখো সবাই আমাকে ত্যাগ করেছে, ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন সবাই! তুমি অন্তত আমার মরব্যর সময়টা একটু কাছে থেকো।...যাতে তোমার হাতের সেবাটা খেয়ে যেতে পারি।'

কী একটা হৃদয়াবেগে এবার ঐন্দ্রিলাই ও'র হাতটা দুহাতে চেপে ধরে। বলে, 'ছিঃ, ওসব কথা আমার সামনে কোনদিন মুখে আনবেন না। আমরা কতগুলি প্রাণী আপনার মুখ চেয়ে আছি বলুন তো! কত লোকের কত উপকারে লাগছেন, কত লোকের জীবনদান করছেন, কত লোককে সুখী করছেন। আপনার এখন দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা দরকার।......আপনার সব আপদ-বালাই নিয়ে বরং আমরা যেন মরি—'

'আবার! তুমিই বা ও কথাটা বারবার বলছ কেন?' ডাক্তারবাবু মৃদু ধমক দিয়ে ওঠেন।

কিন্তু আর না। আর কোন মতেই না।...বার বার এই অর্থহীন কথাটাই মনে মনে বলতে থাকেন তিনি। আর কিছুমাত্র সুযোগ দেওয়া এবং নেওয়া উচিত নয়। ঐন্দ্রিলার ঐ হাত দুটো চেপে ধরাতেই তাঁর মাথার মধ্যে কেমন যেন গোলমাল শুরু হয়েছে। দেহেও। যেন কী একটা উন্মত্ততা অনুভব করছেন তিনি রক্তের মধ্যে—

'অনেক রাত হয়েছে। এবার শুয়ে পড়গে।' বলেন ডাক্তারবাবু। নিজেও উঠে দাঁড়ান। কিন্তু গলার আওয়াজটা নিজের কাছেই কেমন যেন অস্বাভাবিক শোনায়। ঐন্দ্রিলাও বিস্মিত হয়ে তাকায় একটু।

সে বলে, 'আপনি যান। আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

'না না, সে কী কথা। এখানে এই অন্ধকারে একলা—', ডাক্তারবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

'ও আমার খুব অভ্যাস আছে। একা বিদেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াই, ভয়ডর রাখলে কি চলে। তাছাড়া এখনও মঙ্গলাদের ঘরে আলো জ্বলছে। ওরাও ঘুমোয় নি এখনও—'

'আহা, সে ভয় কেন। তোমার শরীরটাই কি একেবারে সেরে উঠেছে পুরোপুরি! ...এত রাত করা ঠিক নয়। দশটা বাজে বোধহয়। চল চল শুয়ে পড়বে চল—'

কেমন যেন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন শেষের দিকে।

অগত্যা ঐন্দ্রিলাকে উঠতে হয়। সে ও'র বসবার ঘর দিয়ে ডাক্তারবাবুর শোবার ঘরে আসে আগে। বলে, 'দাঁড়ান আপনার মশারিটা ফেলে গুঁজে দিয়ে যাই।'...

'আঃ—কী হচ্ছে তোমার আজ! এতদিন যদি নিজে গুঁজে নিতে পেরে থাকি তো আজও পারব। যাও—শুতে যাও!'

একটু কর্কশই শোনায় গলাটা। বিরক্তিটা স্পষ্ট।

ঐন্দ্রিলা ভয় পেয়ে যায়। ডাক্তারবাবুর ঐ চেহারাটা যেন একেবারে অপরিচিত। উনি কি রাগ করলেন তা'হলে?

ঐভাবে ঘুরিয়ে সীতার কথাটা তোলা হয়ত উচিত হয় নি। উনি হয়ত তাতেই দুঃখ পেয়েছেন—ও'র বিবেচনায় সন্দেহ প্রকাশ করেছে বলে। কিংবা হয়ত একটু

বেশী লোলুপতাই প্রকাশ ক'রে ফেলেছে!

সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'আপনি—আপনি যেন বড্ড রাগ করছেন আজ। আমি তো তেমন কিছু বলি নি।...জানি,—আমার বরাতটাই এই, বেশীদিন কেউ সহ্য করতে পারে না আমাকে—'

সে বাইরের দিকে মুখ ফেরায়, নিজের ঘরের দিকেই যেতে উদ্যত হয় বুঝি।

কিন্তু তার আগেই ডাক্তারবাবু এগিয়ে এসে ওকে ধরে ফেলেন। একটা হাত ওর কাঁধে রেখে যেন সামান্য একটু আকর্ষণের মতোই করেন নিজের দিকে— তারপর বিকৃত ভগ্নকণ্ঠে বলেন, প্রায় চুপি চুপি, 'তুমি আমাকে বড্ড ভুল বুঝছ ঐন্দ্রিলা, আমি—আমি যে তোমার জন্যই তোমাকে সাবধান হ'তে বলছি, তোমাকে বাঁচাতেই চাইছি যে আমি। তোমার দাম যে আমার কাছে সত্যিই অনেক—এ কি তুমি কিছুতেই বুঝবে না?'

ও'র বলবার সেই দীন অনুনয়ের ভঙ্গিতে, চোখের সেই করুণ অসহায় চাহনিতে অকস্মাৎ ঐন্দ্রিলার চোখেও জল এসে যায়। সে ও'র মুখের দিকে চেয়ে কি বলবার চেষ্টা করে—বলতে পারে না।

কথা আর বলতে পারে না কেউই। কিন্তু ঐন্দ্রিলার সেই আয়ত বিস্ফারিত সুন্দর দুটি চোখের কুলছাপানো জল প্রৌঢ় ডাক্তারবাবুর শেষ বিবেচনা শেষ সতর্কতা-টুকু—নিজেকে প্রতিহত করার শেষ শক্তিটুকুকেও বিনষ্ট ক'রে দেয়। তিনি অভিভূতের মতো ওকে আকর্ষণ করেন শয্যার দিকে, ঐন্দ্রিলাও স্বপ্নাবিষ্টের মতো এগিয়ে যায় ও'র সঙ্গে—

তারপর একসময় তার হাত ধরে টেনে বসান বিছানায়। সেও সেই ভাবেই বসে। একেবারে ও'র পাশে, কাছাকাছি। এত কাছে যে ও'র বুকের শব্দটাও শুনতে পায় যেন।

ডাক্তারবাবু তেমনি অভিভূতের মতোই তাকে আরও কাছে টেনে নেন—একেবারে বুকের মধ্যে। ঐন্দ্রিলা বাধা দেয় না। প্রতিবাদ করে না, বরং যেন সে ও'র সেই আকর্ষণের মধ্যে এলিয়ে পড়ে। অবশ্য তার সেই তখনও অসুস্থ-দুর্বল-শরীরে বাধা দেবার, প্রতিবাদ করবার, এ আকর্ষণ প্রতিনিরোধ করবার মতো শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না। এইটুকু উত্তেজনাতেই ঘেমে উঠেছে সে, মাথার মধ্যে যেন একটা যন্ত্রণা হতে শুরু করেছে—। কিন্তু তখন, সেই মুহূর্তে বাধা দেবার বুঝি ইচ্ছাও ছিল না তেমন।

সে তো মন স্থির ক'রেই ফেলেছে। ভগবান যদি সুযোগ দেন তো সে তা প্রত্যাখ্যান করবে না। নিজের জীবনে সার্থকতা লাভ করার ও অপর একটি মহৎ জীবনকে সার্থক ক'রে তোলার এ সুযোগ সে ছাড়বে না কিছুতেই। কেন ছাড়বে? বরং তার এত বড় ঋণের কিছুটাও যদি শোধ করতে পারে তো সে-ই তার পরম লাভ বলে মনে করবে সে। পাপপুণ্য?...না, ওসব কুসংস্কার তার নেই। এ জীবন তাকে বিগত দীর্ঘকাল ধরে বারবারই শিখিয়েছে যে ওগুলো কথার কথা মাত্র। ওর কোন সত্যকারের প্রভাব নেই মানুষের জীবনে।...

আরও একটু আকর্ষণ অনুভব করে সে। ঐন্দ্রিলা চোখে ঝাপ্‌সা দেখছিল অনেকক্ষণ থেকেই। সে চোখ বোজে এবার। নিশ্চিন্তেই চোখ বোজে বুঝি। এ জীবনে আর কোনদিন কিছু ভাববার দরকার হবে না, ভাববেও না সে।......নিজেকে ছেড়ে দেয় সেই বাহুবন্ধনের মধ্যে—

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে—দীর্ঘকাল পরে—হরিনাথের চেহারাটা পরিষ্কার স্পষ্টভাবে ভেসে উঠল ওর দৃষ্টির সামনে। এত স্পষ্টভাবে অনেক-দিন দেখতে পায়

নি সে। ইদানীং তার মুখটাই যেন ভাল ক'রে মনে পড়ত না। কেমন একটা আবছা আবছা মনে আসত শুধু, আদল একটা মনে পড়ত—এই মাত্র। আজ কিন্তু ভাল ক'রেই দেখতে পেল সে। যেন মনে নয়, সত্যি সত্যিই চোখের সামনে এসেই দাঁড়িয়েছে। সেই হরিনাথ, কোথাও কোন অস্পষ্টতা নেই। সেই হরিনাথ, ওর স্মৃতি মন্থন ক'রে আবেগের সমুদ্রে আলোড়ন জাগিয়ে একেবারে প্রত্যক্ষ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই, স্বামী সম্বন্ধে পুরাতন বহু পরিচিত সেই আবেগটা তার পূর্ব পূর্ণ-শক্তিতে জেগে উঠেছে।

আঃ! আর ঠিক সেই সঙ্গেই হঠাৎ কেন মনে পড়ে যায় স্নেহময় পিতার মতো—বরং পিতার অধিক—শ্বশুর মাধব ঘোষালকে! মনে পড়ে দিদিমা রাসমণির মহিমময়ী মূর্তিটা, মনে পড়ে ছোট মাসীকে......

ধড়মড় ক'রে উঠে বসে ঐন্দ্রিলা। নিজের প্রতি ঘৃণায়, আত্মগ্লানিতে, আত্ম-ধিক্কারে, অনুশোচনায় সর্বাঙ্গে বিছার কামড় অনুভব করছে সে। আর কোন শারীরিক দুর্বলতাও যেন অনুভব করে না। প্রবল এক ঝটকায় বাহুর বন্ধন ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় সে, তারপর এ ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে নিজের ঘরে চলে গিয়ে সশব্দে দোর বন্ধ করে দেয়......

পরের দিন সকালে উঠে আর ডাক্তারবাবুকে দেখতে পেল না ঐন্দ্রিলা। তারও সারারাত ঘুম হয় নি, কেঁদেছে আর ছটফট করেছে—ক্ষমা চেয়েছে বারবার মৃত স্বামীর কাছে। মনে মনে নয়—অস্ফুটে হ'লেও উচ্চারণ ক'রেই ব'লেছে মুখে—যে, 'আমাকে মাপ করো আমাকে মাপ করো। তুমি তো চিরকাল আমার সব অন্যায় মাপ করেছ, সমস্ত ভুল ত্রুটি মানিয়ে নিয়েছ- এবারেও তই নাও। তুমি তো জানতে পারছ আমার সব অবস্থা আমি কত দুর্বল কত অসহায় তা তো তোমার জানতে বাকী নেই- সেটা বুঝে আমাকে মাপ করো এবারে মতো। আমি আর পারছি না গো, আমি আর পারছি না। তুমি এবার আমাকে টেনে নাও। যখন দেখা দিয়েছ, একবার মহা-বিপদ রক্ষা করেছ তখন আর ভুলে যেও না, আমাকে নিয়ে যাও—লক্ষ্মীটি'...

সারারাত অনিদ্রা কান্না এবং বিলাপের ফলে মাথার যন্ত্রণা শুরু হ'ল আবার। ভোরে যখন ঘর ছেড়ে বাইরে এল তখন দেহ আরও দুর্বল, আরও অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

কিন্তু তবুও আর দেরি করল না সে। ডাক্তারবাবুর ফেরবার জন্যেও অপেক্ষা করল না। তখনই স্নান সেরে নিজের সামান্য যা কাপড়চোপড় ছিল গুছিয়ে নিল। টাকা ওর কাছেই থাকত -বিছানার নিচে সেজন্যেও ডাক্তারবাবুর মুখাপেক্ষা করতে হ'ল না। স্নান আহ্নিক সেরে সামান্য একটু মিশ্রীর-জল খেয়েই রওনা হ'য়ে পড়ল জাহাজঘাটার দিকে। বিকেলের দিকে একটা স্টীমার ছাড়ে, সেটা ধরা দরকার—নইলে আবার সেই কাল সকালে। জঙ্গলের মধ্যে একা বসে রাত কাটাতে হবে।

গোরুর গাড়ি আগেই ডাকিয়ে আনিয়েছিল, সেই গাড়িতে চেপেই রওনা হ'ল। মঙ্গলাকে বললে, 'আমার মার খুব অসুখ, খবর এসেছে। ডাক্তারবাবু জানেন তবে আমার শরীর বুঝেই উনি বলেছিলেন আর কটা দিন থেকে যাবার জন্যে কিন্তু আমার মন আর মানছে না। কে জানে গিয়ে আর দেখতে পাব কিনা সন্দেহ—মনটায় যা করছে...তুই ডাক্তারবাবুকে একটু বুঝিয়ে বলিস।'

মঙ্গলা সরল হ'লেও নির্বোধ নয়। সে বলল, 'তা মাকে দেখতে যাচ্ছ—সব কাপড়-চোপড় নিয়ে যাচ্ছ কেন? তুমি কি আর আসবে নি এখানে?'

ঐন্দ্রিলা সহজভাবেই জবাব দিল, 'তা মার যদি বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ে—কি শেষ

পর্যন্ত বলা তো যায় না—ভালমন্দই যদি হয় কিছু—আমি কি আর ঘরবাড়ি ছেড়ে আসতে পারব ?...

গাড়ি যখন গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠে পড়েছে তখন ডাক্তারবাবু ছুটতে ছুটতে এসে ধরলেন ওকে।

দুই হাত জোড় ক'রে বললেন, 'আর কখনও এমন ভুল হবে না ঐন্দ্রিলা, আমি কথা দিচ্ছি। তুমি আমাকে এভাবে ছেড়ে যেও না। আমার আর কেউ নেই, বুড়ো বয়সে তোমার ওপর অনেকখানি ভরসা ক'রে ছিলুম—লক্ষ্মীটি, আর একবার আমাকে বিশ্বাস ক'রে দ্যাখো!'

ওঁকে দেখেছিল আগেই। দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিল। এই গত কয়েক ঘণ্টাতেই যেন অনেকখানি বুড়ো হয়ে গেছেন ভদ্রলোক! সেই সদাপ্রফুল্ল উৎসাহোজ্জ্বল মুখে কে যেন দু বুরুল কালি লিপে দিয়েছে। খুব ক্লান্তও দেখাচ্ছে। ক্লান্ত ও অবসন্ন। উনিও নিশ্চয় সারারাত ঘুমোতে পারেন নি।

মনটা দুলে ওঠে বৈকি। ফিরে যেতেই মন চায়। নতুন রকমের একটা উল্টো অনুশোচনাও দেখা দেয়। এই লোকটাকে আঘাত দেবার, অসহায়ভাবে ছেড়ে আসবার জন্য অনুশোচনা—

কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্যেই। তারপরই নিজেকে সামলে নেয় ঐন্দ্রিলা। অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে সর্বপ্রকার আবেগহীন নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, 'মায়ের অসুখ আপনি তো জানেনই।...অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল হয়ত...কাল একটা ভারী খারাপ স্বপ্ন দেখেছি তাইতেই মনটা খুব উতলা হয়ে উঠেছে। আমাকে আজ যেতেই হবে।'

গোরুর গাড়ির পিছু পিছু যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু। খুব চুপি চুপি, ভগ্নকণ্ঠে—প্রায় কান্নার মতো করে বললেন, 'আর একবার আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না! কিন্ত এবার করলে আর ঠকতে না। আমার তরফ থেকে আর কোন অন্যায় হ'ত না কোনদিন। তাও যদি ভরসা করতে না পারো, তোমার মেয়েকে এনে রাখো। আমার এখানাকার বাড়ি জমি জায়গা সব তাকে লিখে দিচ্ছি। আশ্রয়ের ভয়েই তো সে শ্বশুরবাড়ি ছাড়তে চায় না—এখানে তার ঢের ভাল আশ্রয় মিলবে। আমাকে শুধু দুটি খেতে দিও—আর কিছুই চাই না!'

ওঁর বলার ভঙ্গিতে ঐন্দ্রিলার চোখে জল এসে পড়ে। লোভও বড় প্রবল। চিরকালের মতো নিশ্চিন্ত হওয়া—মেয়ের চিন্তা থেকেও, নিজের চিন্তা থেকেও। নিরাপদ আশ্রয়, নিষ্কণ্টক জীবনযাত্রা...ক্ষণেকের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত, অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে যেন। তারপরই আবার প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে। বলে, 'সে হবে না। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আসবে না। তাছাড়া মার শরীর যদি সত্যিই খুব খারাপ হয়ে পড়ে, আমিই কি তাঁকে ছেড়ে আসতে পারব! আপনি আমাকে মাপ করুন, আমার ভরসা আর করবেন না। আমি চিরকালের বেইমান—আপনার সঙ্গেও বেইমানী করে গেলুম—কিন্তু থাকা আর সম্ভব নয় এখানে...ওরে যজ্ঞেশ্বর, একটু হেঁকে চলে বাবা। আর মোটে সময় নেই। আচ্ছা আসি। শরীরের যত্ন নেবেন। চলে গেছি জানলে মেয়েরা আসবে নিশ্চয়ই, তাদেরই কাউকে আনিয়ে নেবেন!'

ডাক্তারবাবু আর কথা কইলেন না, সঙ্গে গেলেনও না আর। সেইখানেই দাঁড়িয়ে গেলেন। গাড়িখানা শুষ্ক কঠিন তৃণশূন্য মাঠের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলতে চলতে একসময় তাঁর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল, কিন্তু তিনি তেমনি সেই প্রখর রৌদ্রের মধ্যে একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন, বহুক্ষণ পর্যন্ত বাড়ি ফেরার কথাও মনে রইল না তাঁর।

০

—'পৌষ ফাগুনের পালা' প্রথম খণ্ড সমাপ্ত—